

ছোটদের অমনিবাস

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছোটদের ওমনিবাস

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদনায়

লীলা মজুমদার



এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

কলেজ স্ট্রিট মার্কেট ▫ কলকাতা-সাত

বই প্রসঙ্গে

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বড় ছেলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর মেজ ছেলে গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এক সঙ্গে মানুষ, কিন্তু মন-মেজাজ আলাদা। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের বড় হৃদ্যতা, মতের মিল। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম হয়ে, বাড়িতে মূর্তি-পুজো নিষেধ করে দিলেন। গিরীন্দ্রনাথ সাবেক ধর্ম ছাড়লেন না। কাজেই আলাদা বাসস্থানের দরকার হল। দেবেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সাবেক বাড়িটিতে রইলেন। গিরীন্দ্রনাথ গেলেন তাঁদের বৈঠকখানা বাড়িতে। একটি ৬ নম্বর, একটি ৫ নম্বর। ৬ নম্বরের অনুষ্ঠানাদি মহর্ষি লিখিত আদি ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম অনুসারে চলত আর ৫ নম্বরে দ্বারকানাথের সময়কার ঠাকুর-দেবতারা আগের মতোই পুজো পেতেন। বিবাহাদিতে শালগ্রাম শিলা স্থান পেতেন। এটুকু ছাড়া দুই বাড়ির জীবনযাত্রায় খুব মিল ছিল। যদিও বাড়ি ভাগাভাগিতে কারও কারও মনে কিছু ক্ষোভ জমা হয়েছিল। সে-ও বেশি দিনের জন্য নয়।

গিরীন্দ্রনাথ খুব বেশি দিন বাঁচেননি। তাঁর দুই ছেলে, গণেন্দ্র আর গুণেন্দ্র। দুই বাড়ির মধ্যে খুব যাওয়া-আসা, দুই বাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যে খুব ভাব। একই রকম শখ-পছন্দ তাঁদের। পড়াশুনো, গান-বাজনা, নাটক, সাহিত্যালাপ। তার ওপর গুণেন্দ্রের চার ছেলের মধ্যে ছোটটি অকালে মারা গেল, বাকি তিনজনের মধ্যে এক সমরেন্দ্রকে বাদ দিয়ে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, আর দুই মেয়ে সুনয়নী, বিনয়নীর মধ্যে সুনয়নী—এঁরা তিনজন অসাধারণ গুণী শিল্পী।

এঁরা পুরনো ভারতীয় শিল্পকে উদ্ধার করে এমন বলিষ্ঠ, সুন্দর, নতুন রূপ দিলেন যে বিশ্ব-শিল্পের সমালোচকরা আর তাকে কৃপার চোখে দেখতে পারল না। এ বইতে সেসব কথা নেই।

তার ওপর অবনীন্দ্রনাথ পাকা লেখকও বটে। বাপের আপন জ্যাঠতুতো ভাই রবীন্দ্রনাথের এক রকম হাতে গড়া এই আশ্চর্য মানুষটির কোনও লেখাতেই তাঁর 'রবিকা'র প্রভাব দেখা যায় না। তবে তা-ও সম্ভব হয়েছে ঐ 'রবিকা'র জন্যেই। এদিকে রবিকার ছোটবেলাকার স্কুল-পালানোর দৃষ্টান্তটি খুব ভাল ছিল না। ভাইপোও খুব কম বয়সেই স্কুল পালিয়ে, ঘরেতে আর বাইরের প্রকৃতির মধ্যে কেবলই ছবি আঁকার পাঠ নিতে লাগলেন। সেই সঙ্গে নিজের ইচ্ছা মতো পড়াশুনো। অবনীন্দ্রনাথের সংস্কৃতে গভীর পাণ্ডিত্য দেখলে অবাক হতে হয়।

যেমন খুড়ো তেমনি তার ভাইপো। জোড়াসাঁকোর এক তলায় রবিকাকা স্কুল খুললেন। জোড়াসাঁকোর কিছু ফালতু মানুষ হলেন মাস্টারমশাই, ছাত্র-ছাত্রীও নিজেদের মধ্যে থেকে জুটে গেল। অবনীন্দ্রনাথ-ও মাস্টার হয়ে বাংলা পড়াতে বসলেন। কি বাংলা পড়াবেন, না আশ্চর্য সব গল্প বলা শুরু করলেন। ছাত্র-ছাত্রীরা হাঁ করে সে গল্প শুনত। একদিন রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'অবন, তোমাকে গল্প লিখতে হবে।' অবনীন্দ্রনাথ আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, সে আমি পারব কেন? রবীন্দ্রনাথ ছাড়লেন না। 'যেমন করে তুমি গল্প কর, তেমনই করে লিখবে। ভাষার গোলমাল হয় তো আমি আছি।'

লেখা হল 'শকুন্তলা'। লেখকের বয়স তখন ২১-২২। এমন বই বাংলায় কম আছে। মনের মধ্যে যেন একটা দরজা খুলে গেল। লেখা হল 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজ কাহিনী', 'ভূতপত্রীর দেশ', 'খাতাঞ্চির খাতা', 'নালক', 'বুড়ো আংলা', আরও কত বই। তার বেশির ভাগই ছোটদের জন্য। এমন কোমল, মধুর, কল্পনাময়, কাব্যময় রচনা বাংলায় আর আছে কিনা সন্দেহ।

এই গ্রন্থে তাঁর ছোটদের বইয়ের এগারোটি শ্রেষ্ঠ-গল্প স্থান পেয়েছে। এ-কথা মনে রাখতে হবে যে এর মধ্যে একমাত্র 'ভূতপত্রীর দেশ' ছাড়া বাকি সবগুলিই পুরনো গল্পের নতুন রূপ। কিন্তু সে কি রূপ! আন্‌কোরা নতুন, পুরনো গল্পগুলো শুধু কাঠামো ছাড়া কিছু নয়। মনের কথার বাহনমাত্র। আসল গল্পগুলো লেখকের হৃদয়ের বেদনায় বিধুর, মধুতে মধুর। এগুলি পড়া মানে বাংলা শিশু-সাহিত্যের সব চাইতে কোমল সুন্দর পুঁথি-লেখার পাঠ নেওয়া।

অবনীন্দ্রনাথ যে খুব গোছালো মানুষ ছিলেন না, সে-কথা কাউকে বলে দিতে হবে না। তাঁর কাগজ-পত্রের

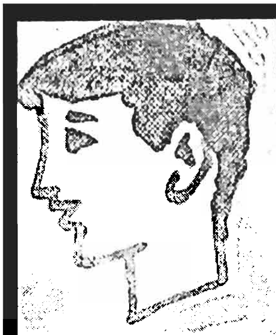
মধ্যে অজস্র ধন-রত্ন লুকিয়ে আছে। ফালতু লেখা; তাঁর নিজের অমনোনীত লেখা; ভবিষ্যতে লেখা হবে বলে খস্‌ড়া; অসম্পূর্ণ লেখা; আঁকিবুকি; রাফ্ নোট্; মজা করে দুটো আঁচড়, দুটো কথা, যা কেউ কোনও দিন কৌতূহলী হয়ে দেখবে বলে ভাবেননি। তাঁর নাতিদের কারও কারও কাছে, পুরনো ফাইলে বা তোরঙ্গে সেসব রাখা ছিল। এখন সেগুলোর কিছু কিছু উদ্ধার হয়েছে, অসাধারণ খেয়ালগুলির সব গদ্য-পদ্য, পালা-গান।

অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে তার কিছু কিছু আমরাও পেয়ে, এখানে গ্রথিত করে দিলাম।

ইতি—

২৫শে বৈশাখ ১৩৮৬

লীলা মজুমদার

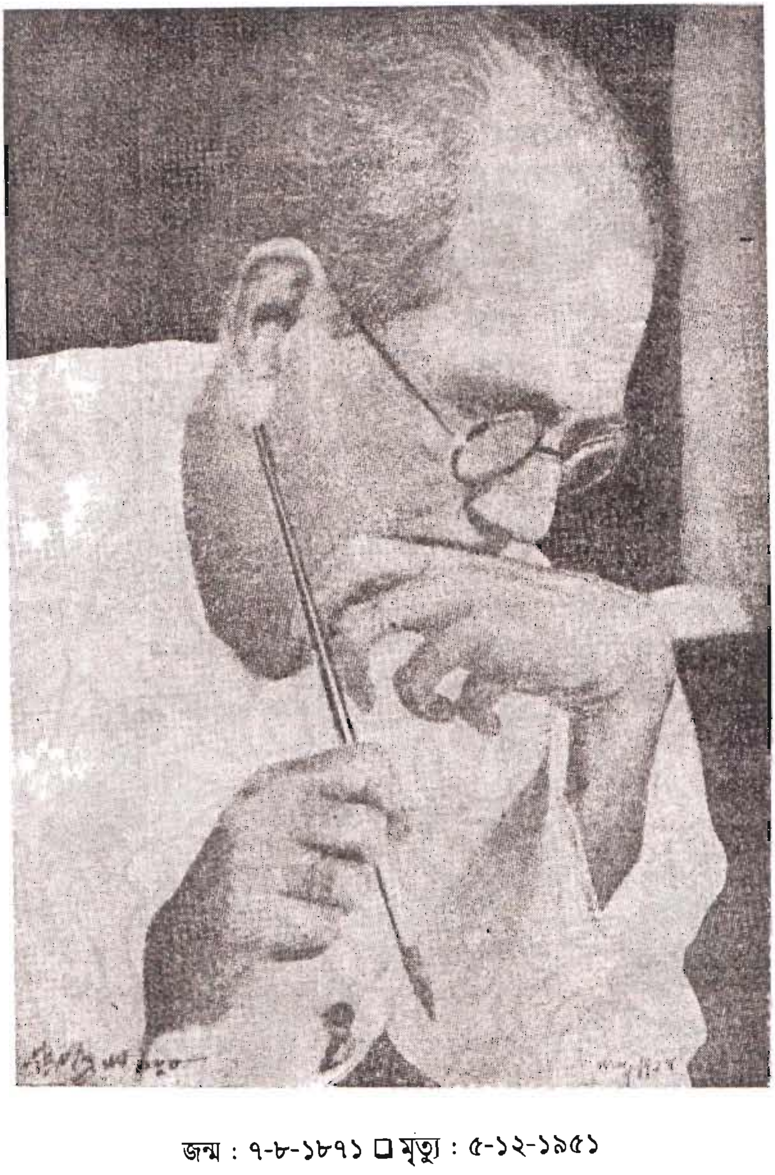



ছোটদের অমনিবাস

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর



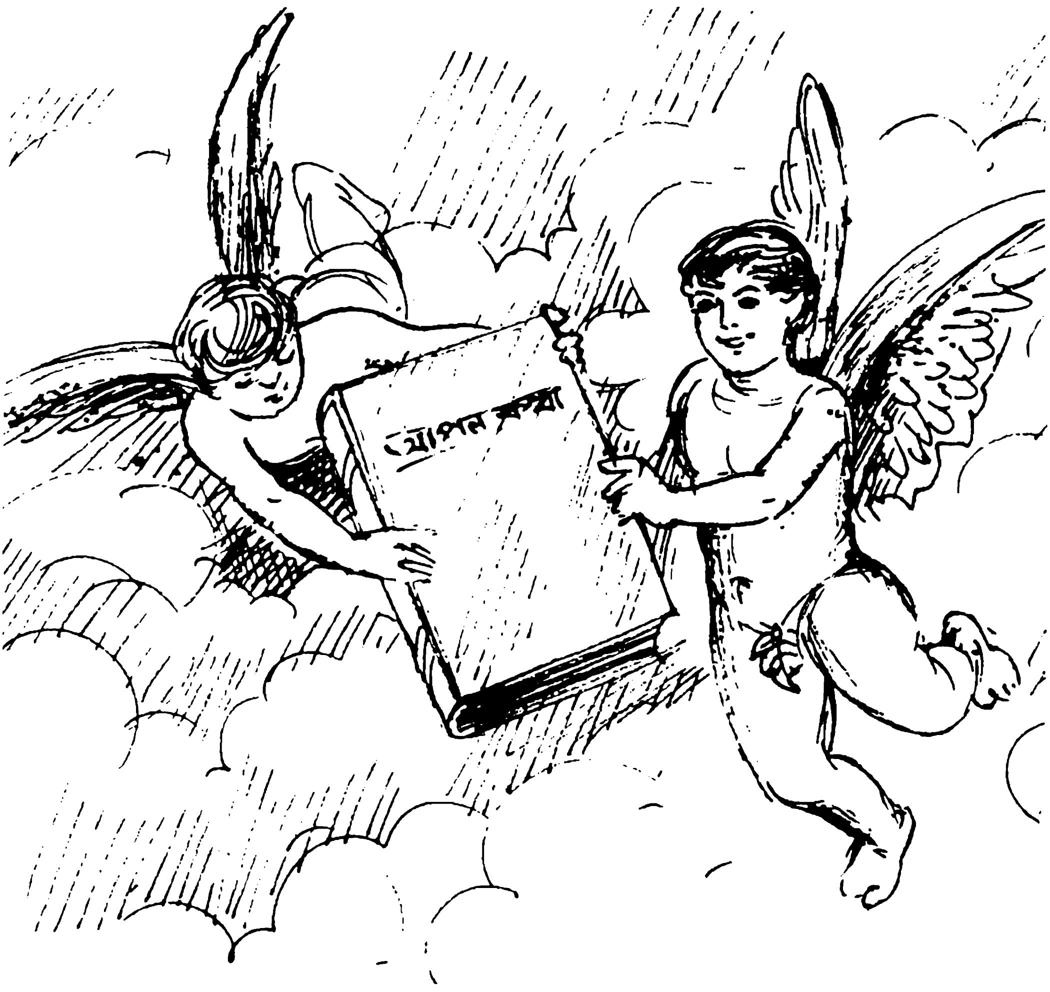

সূচীপত্র



জন্ম : ৭-৮-১৮৭১ ❑ মৃত্যু : ৫-১২-১৯৫১


দিন দুপুরে বাদুড় ঘুমোয় বাদুড়পুরে

আপন কথা



মনের কথা

যে খাতার সঙ্গে ভাব হল না, তার পাতায় ভাল লেখাও চলল না। এই খাতাটা অনেকদিন কাছে কাছে রয়েছে, ভাব হয়ে গেল এটার সঙ্গে। ভাব হল যে মানুষের সঙ্গে কেবল তাকেই বলা চলল নিজের কথা সুখ-দুঃখের। আমার ভাব ছোটদের সঙ্গে—তাদেরই দিলেম এই লেখা খাতা। আর যারা কিনে নিতে চায় পয়সা দিয়ে আমার জীবন-ভরা সুখ-দুঃখের কাহিনী, এবং সেটা ছাপিয়ে নিজেরাও কিছু সংস্থান করে নিতে চায় তাদের আমি দূর থেকে নমস্কার দিচ্ছি। যারা কেবল শুনতে চায় আপন কথা, থেকে থেকে যারা কাছে এসে বলে 'গল্প বলো', সেই শিশু-জগতের সত্যিকার রাজা-রানী বাদশা-বেগম তাদেরই জন্যে আমার এই লেখা পাতা ক'খানা। শিশু-সাহিত্য-সম্রাট যাঁরা এসেছেন এবং আসছেন তাঁদের জন্যে রইল বাঁ হাতে সেলাম; আর ডান হাতের কুর্নিশ রইল তাদেরই জন্যে যারা বসে শোনে গল্প রাজা-বাদশার মতো, কিন্তু ছেঁড়া মাদুর নয়তো মাটিতে বসে; আর গল্পের মাঝে মাঝে থেকে থেকে যারা বখশিস দিয়ে চলে একটু হাসি কিম্বা একটু কান্না; মানপত্রও নয়, সোনার পদকও নয়; হয় একটু দীর্ঘশ্বাস, নয় একটুখানি ঘুমে-ঢোলা চোখের চাহনি! ঐ তারা—যারা আমার মনের সিংহাসন আলো করে এসে বসে, তাদেরই আদর দিয়ে বলি, গরিব পরবৎ সেলামৎ—অব্ আগাজ্ কিস্‌সেকা করতা হুঁ, জেরা কান দিয়ে কর শুনো!

ছাপা হবে হয়তো বইখানা। একদিন কোনও বেরসিক অল্প দামে কিনে নেবে আমার সারাজীবন খুঁজে খুঁজে পাওয়া যা কিছু সংগ্রহ। এইটে মনে পড়ে যখন, তখন হাসি পায়। বলি, এ কি হয় কখনও? সব কথা কি কেউ জানতে পারে, না জানাতেই পারে কোনও কালে? অনেক কথা রয়ে যাবে, অনেক রইবে না, এই হবে, তার বেশি নয়।

একটা শোনা কথা বলি। তখন বাড়িতে প্ল্যানচিট চালিয়ে ভূত নামানো চলেছে। দাদামশায়ের পার্ষদ দীননাথ ঘোষাল প্ল্যানচিটে এসে হাজির। বড় জেঠামশায় তাঁকে জেরা শুরু করলেন—পরকালটা এবং পরকালটার বৃত্তান্ত শুনে নিতে চেয়ে। প্ল্যানচিটে উত্তর বার হল—'যে কথা আমি মরে জেনেছি, সে কথা বেঁচে থেকে ফাঁকি দিয়ে জেনে নেবে এ হতেই পারে না।'

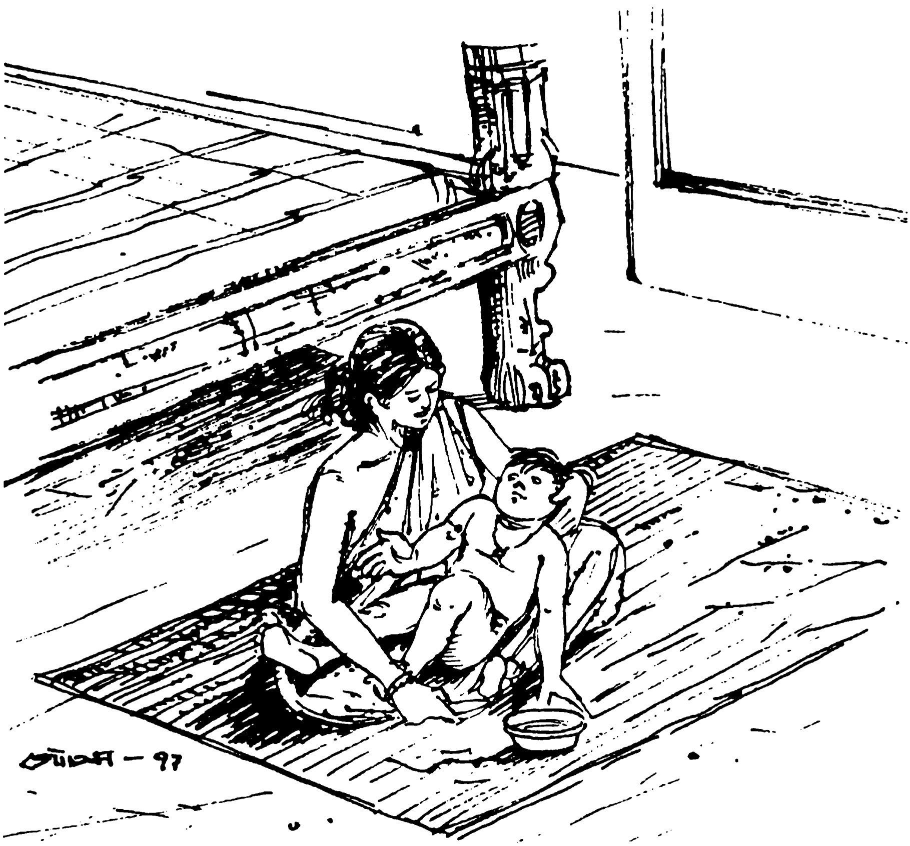
আমিও ওই কথা বলি। অনেক ভুগে পাওয়া এ সব কাহিনী, কিনতে গেলে ঠকতে হয়, বেচতে গেলে ঠকতে হয়!

বলে যাওয়া চলে কেবল তাদেরই কাছে নির্ভয়ে, মনের কথা বেচা-কেনার ধার ধারে না যার্‌া, যাত্রা করে বেরিয়েছে যারা, কেউ হামাগুড়ি দিয়ে, কেউ কাঠের ঘোড়ায় চড়ে, নানা ভাবে নানা দিকে আলিবাবার গুহার সন্ধানে! ছোট ছোট হাতে ঠেলা দিয়ে যারা কপাট আগলে বসে আছে, যে দৈত্য সেটাকে জাগিয়ে বলে, 'ওপুন চিসম্'—অর্থাৎ চশমা খোলো, গল্প বলো। যারা থেকে থেকে ছুটে এসে বলে—'এই নুড়ি ছোঁয়াও, দেখবে দাদামশায়, লোহার গায়ে ধরে যাবে সোনা!' কুড়িয়ে পাওয়া পুরনো পিদুম ঘষে ঘষে যারা খইয়ে ফেলে, অথচ ছাড়ে না কিছুতে সাত রাজার ধন মানিকের আশা।

পদ্মদাসী

রাতের অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়ে সারি সারি পল তোলা থাম, এরই ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে আমাদের তেতলার উত্তর-পুব কোণের ছোট ঘরটা; এক কোণে জ্বলছে মিটমিটে একটা তেলের সেজ। হিমের ভয়ে লাল খেরুয়ার পুরু পর্দা দিয়ে সম্পূর্ণ মোড়া ঘরের তিনটে জানলাই, ঘরজোড়া উঁচু একখানা খাট—তাতে সবুজ রঙের মোটা দিশি মশারি ফেলা রয়েছে। ঘরে ঢোকবার দরজাটা এত বড় যে, তার উপর দিকটাতে বাতির আলো পৌঁছতে পারেনি! এই দরজার এক পাশে একটা লোহার সিন্দুক, আর তারই ঠিক সামনে কোথা থেকে একটা কাঠের খোঁটা হঠাৎ মেঝে ফুঁড়ে হাত তিনেক উঠেই থমকে দাঁড়িয়ে গেছে তো দাঁড়িয়েই আছে। এই খোঁটা—ঘরের মধ্যে যার দাঁড়িয়ে থাকার কোনও কারণ ছিল না—সেটাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেড়হাত প্রমাণ এক ছেলে! খোঁটার মাথার কাছে এতটুকু কুলুঙ্গির মতো একটা চৌকো গর্ত, তারই মধ্যে উঁকি দিয়ে

দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু নাগাল পাচ্ছিনে কুলুঙ্গিটার! আলোর কাছে বসে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি পদ্মদাসী মস্ত একটা রুপোর ঝিনুক আর গরম দুধের বাটি নিয়ে দুধ জুড়োতে বসে গেছে—তুলছে আর ঢালছে সে তপ্ত দুধ। দাসীর কালো হাত দুধ জুড়োবার ছন্দে উঠছে নামছে, নামছে উঠছে ! চারদিক সুনসান, কেবলই দুধের ধারা পড়ার শব্দ শুনছি। আর দাসীর কালো হাতের ওঠা-পড়ার দিকে চেয়ে একটা কথা ভাবছি—উঁচু খাটে উঠতে পারা যাবে কিনা! পর্দার ওপারে অনেক দূরে আস্তাবলের ফটকের কাছে নন্দ ফরাশের ঘর, সেখানে নোটো খোঁড়া বেহালাতে গৎ ধরেছে—এক দুই তিন চার, এহেক দুহি তিহিন চার। এক দুই তিন চার জানিয়ে দিলে রাত কত হয়েছে তা— অমনি তাড়াতাড়ি খানিক আধ-ঠাণ্ডা দুধ কোনরকমে আমাকে গিলিয়ে খাটের উপর তিনটে বালিশের মাঝখানটায় কাত করে ফেলে মনে মনে একটা ঘুম পাড়ানো ছড়া আউড়ে চলল আমার দাসী। আর তারই তালে তালে তার কালো হাতের রহে রহে ছোঁয়া ঘুমের তলায় আস্তে আস্তে আমাকে নামিয়ে দিতে থাকল!



একেবারে রাতের অন্ধকারের মতো কালো ছিল আমার দাসী—সে কাছে বসেই ঘুম পাড়াত কিন্তু অন্ধকারে মিলিয়ে থাকত সে। দেখতে পেতেম না তাকে, শুধু ছোঁয়া পেতেম থেকে থেকে! কোনও কোনও দিন অনেক রাতে সে জেগে বসে চালভাজা কটকট চিবোত, আর তালপাতার পাখা নিয়ে মশা তাড়াত। শুধু শব্দে জানতেম এটা। আমি জেগে আছি জানলে দাসী চুপিচুপি মশারি তুলে একটুখানি নারকেল নাড়ু অন্ধকারেই মুখে গুঁজে দিত—নিত্য খোরাকের উপরি পাওনা ছিল এই নাড়ু!

খাটে উঠব কেমন করে এই ভয় হয়েছিল। কাজেই বোধ হচ্ছে উঁচু পালঙ্কে শোয়া সেই আমার প্রথম! জানিনে তার আগে কোথায় কোন ঘরে আমাকে নিয়ে শুইয়ে দিত কোন বিছানায় সে?

চারদিকে সবুজ মশারির আবছায়া ঘেরা মস্ত বিছানাটা ভারী নতুন ঠেকেছিল সেদিন। একটা যেন কোনও

দেশে এসেছি—সেখানে বালিশগুলোকে দেখাচ্ছে যেন পাহাড় পর্বত, মশারিটা যেন সবুজ কুয়াশা ঢাকা আকাশ যার ওপারে—এখানে আর মনে করতে হত না, দেখতে পেতেম চিৎপুর রাস্তা থেকে যে সরু গলিটা আমাদের ফটকে এসে ঢুকেছে সেটা একেবারে জনশূন্য! দু'নম্বর বাড়ির গায়ে তখনকার মিউনিসিপালিটির দেওয়া একটা মিটমিটে তেলের বাতি জ্বলছে, আর সেই আলো-আঁধারে পুরনো শিব মন্দিরটার দরজার সামনে দিয়ে একটা কন্ধকাটা দুই হাত মেলে শিকার খুঁজে খুঁজে চলেছে! কন্ধকাটার বাসাটাও সেই সঙ্গে দেখা দিত—একটা মাটির নল বেয়ে দু'নম্বর বাড়ির ময়লা জল পড়ে পড়ে খানিকটা দেওয়াল সোঁতা আর কালো, ঠিক তারই কাছে আধখানা ভাঙা কপাট চাপানো আড়াই হাত একটা ফোকরে তার বাস—দিনেও তার মধ্যে অন্ধকার জমা হয়ে থাকে!

সব ভূতের মধ্যে ভীষণ ছিল এই কন্ধকাটা, যার পেটটা থেকে থেকে অন্ধকারে হাঁ করে আর ঢোক গেলে; যার চোখ নেই অথচ মস্ত কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো হাত দুটো যার পরিষ্কার দেখতে পায় শিকার! আর একটা ভয় আসত সময়ে সময়ে, কিন্তু আসত সে অকাতর ঘুমের মধ্যে—সে নামত বিরাট একটা আগুনের ভাঁটার মতো বাড়ির ছাদ ফুঁড়ে আস্তে আস্তে আমার বুকের উপর! যেন আমাকে চেপে মারবে এই ভাব—নামছে তো নামছেই গোলাটা, আমার দিকে এগিয়ে আসার তার বিরাম নেই। কখনও আসত সেটা এগিয়ে জ্বলন্ত একটা স্তনের মতো একেবারে আমার মুখের কাছাকাছি, ঝাঁজ লাগত মুখে চোখে! তারপর আস্তে আস্তে উঠে যেত গোলাটা আমাকে ছেড়ে, হাঁফ ছেড়ে চেয়ে দেখতেম সকাল হয়েছে—কপাল গরম, জ্বর এসে গেছে আমার। দশ-বার বছর পর্যন্ত এই উপগ্রহটা জ্বরের অগ্রদূত হয়ে এসে আমায় অসুস্থ করে যেত। উপগ্রহকে ঠেকাবার উপায় ছিল না কোনও, কিন্তু উপদেবতা আর কন্ধকাটার হাত থেকে বাঁচবার উপায় আবিষ্কার করে নিয়েছিলেম। লাল শালুর লেপ, তারই উপরে মোড়া থাকত পাতলা ওয়াড়, আমি তারই মধ্যে এক একদিন লুকিয়ে পড়তাম এমন যে, দাসী সকালে বিছানায় আমায় না দেখে—'ছেলে কোথা গো' বলে শোরগোল বাধিয়ে দিত। শেষে পদ্মদাসীর পদ্মহস্তের গোটা কয়েক চাপড় খেয়ে যাদুকরের থলি থেকে গোলার মতো ছিটকে বার হতেম আমি সকালের আলোতে!

জীবনের প্রথম অংশটায় সকালের লেপের ওয়াড়খানা গুটি পোকার খোলসের মতো করে ছেড়ে বার হওয়া আর রাতে আবার গিয়ে লুকোনো লেপের তলায়, আর তারই সঙ্গে জড়িয়ে বাটি, ঝিনুক, খাট, সিন্দুক, তেলের সেজ, পদ্মদাসী, এমনই গোটাকতক জিনিস, আর শীতের রাতের অন্ধকারে কতকগুলো ভূতের চেহারা, দিনের বেলাতেও অন্ধকারে ঢিল ফেলার মতো কতকগুলো চমকে দেওয়া শব্দ—দরজার কড়ার শব্দ, চাবি গোছার ঝিন ঝিন মাত্র আছে আমার কাছে, আর কিছু নেই—কেউ নেই!

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের জন্মাষ্টমীর দিনে বেলা ১২টা ১১ মিনিট থেকে আরম্ভ করে খানিকটা বয়স পর্যন্ত রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের পুঁজি—এক দাসী, একখানি ঘর, একটি খাট, একটি দুধের বাটি, এমনই গোটাকতক সামান্য জিনিসের মধ্যেই বদ্ধ রয়েছে। শোওয়া আর খাওয়া এ ছাড়া আর কোনও ঘটনার সঙ্গে যোগ নেই আমার! অকস্মাৎ একদিন এক ঘটনার সামনে পড়ে গেলেম একলা। ঘটনার প্রথম ঢেউয়ের ধাক্কা সেটা। তখন সকাল দেড় প্রহর হবে, তিনতলার বড় সিঁড়ির উপর ধাপের কিনারা—যেখানটায় খাঁচার গরাদের মতো শিক দিয়ে বন্ধ করা—সেইখানটায় দাঁড়িয়ে দেখছি কাঠের সিঁড়ির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধাপগুলো একটা চৌকোনা যেন কুয়োকে ঘিরে ঘিরে নেমে গেছে কোন পাতালে তার ঠিক নেই! এই ধাপে ধাপে ঘূর্ণির মাঝে একটা বড় চাতাল। পশ্চিম দিকের একটা খোলা ঘর হয়ে চাতালের উপরটায় এসে পড়েছে চওড়া সাদা আলোর একটি মাত্র টান। ঠিক এইখানটায় আমার কালোদাসী আর 'রসো' বলে একটা মোটাসোটা ফরসা চাকরানী কথা কইছে শুনছি। আমি তো তাদের কথা বুঝিনে—কথার মানেও বুঝিনে—কেবল স্বরের ঝোঁক আর হাত-পা নাড়া দেখে জানছি দাসীতে দাসীতে ঝগড়া বেধেছে। খাঁচার পাখির মতো গরাদের মধ্যে থেকে বাইরে চেয়ে দেখছি কি হয়। হঠাৎ দেখলেম আমার দাসী একটা ধাক্কা খেয়ে ঠিকরে পড়ল দেওয়ালের উপর। আবার তখনি সে ফিরে দাঁড়িয়ে আঁচলটা কোমরে জড়াতে থাকল। তখন তার কালো কপাল বেয়ে রক্ত পড়ছে, চুলগুলো উস্‌কো—চেহারা রাগে ভীষণ হয়ে উঠেছে; সিঁদুর পরা যেন কালো পাথরের ভৈরবী মূর্তি সে একটি! আমি চিৎকার করে উঠলেম—'মারলে, আমার দাসীকে মারলে!' লোকজন ছুটে এল, ডাক্তার এল, একটা ছেঁড়া কাপড়ের সাদা পটি দাসীর কপালে বেঁধে দিয়ে গেল; কিন্তু আমার মনে জেগে রইল সিঁড়ির ধারে সকালের দেখা রক্তমাখা কালো রূপটাই দাসীর! সেই আমার শেষ দেখা দাসীর সঙ্গে। তারপর থেকে দেখি দাসী কাছে নেই কিন্তু তার ভাবনা রয়েছে মনে—দেশ থেকে খেলনা

নিয়ে ফিরবে দাসী। সিঁড়ির দরজার বসে বীরভূমের গালার তৈরি একটা কাছিম নিয়ে খেলি আর রোজই ভাবি দাসী আসবে! কোন গাঁয়ের কোন ঘর ছেড়ে এসেছিল অন্ধকারের মতো কালো আমার পদ্মদাসী! শুনি সে ভীষণ কালো ছিল। পদ্ম নামটা মোটেই তাকে মানাত না। সে তার বেমানান নাম নিয়েই এসেছিল এ বাড়িতে। রাগ করে গেছে: গল্প বলেছে, ঝগড়া করেছে, কাজও করেছে এবং মানুষ করবার বকশিশ সোনার বিছেহার আর রক্তের টিপ পরে চলেও গেছে বহুদিন। পৃথিবীর কোনওখানে হয়তো আর কোনও মনে ধরা নেই তার কিছুই এক আমার কাছে ছাড়া। হয়তো বা তাই আপনার কথা বলতে গিয়ে সেই নিতান্ত পর এবং একান্ত দূর যে তাকেই দেখতে পাচ্ছি—পঞ্চান্ন বছরের ওধারে বসে সে দুধ ঢালছে আর তুলছে আমার জন্যে!...

আমার কুষ্ঠিখানা লিখেছে দেখি বেশ গুছিয়ে সন তারিখ বছর মাস মিলিয়ে। পরে পরে ঘটনাগুলো ধরে দিয়েছে সেখানে গনৎকার। কিন্তু এভাবে জীবনটা তো আমার চলল না লতার পর লতা পারম্পর্য ধরে। কাজেই কুষ্ঠি অনেকটা ফলে গেলেও আমাদের সেকালের 'কালী আচায্যি'কে দ্বিতীয় বিধাতা পুরুষ বলে স্বীকার করা চলল না। আচমকা যে সব ঘটনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে পড়ে আজও সেইগুলোকেই আমি জানি বিধাতার সাটে লেখা বলে—যেটা তিনি ছ'দিনের দিন সব ছেলেরই একটুখানি মাথার খুলিতে ঘুণাক্ষরের চেয়েও অপাঠ্য অক্ষরে লিখে যান। ঘটনা ঘটল তো জানলেম কপালে এইভাবে এটা লেখা ছিল।

একটা বিস্ময় চিহ্ন কালো কালিতে, তার মাথায় লাল কালির একটা টান—এই সাটটুকুর মধ্যেই ধরা গিয়েছিল আমার আর দাসীর আদ্যন্ত ইতিহাস। তারপর হয়তো খানিকটা ফাঁকা মাথার খুলি; তারপর আর একটা অদ্ভুত চিহ্ন, ঘটাকার কি পটাকার, কি একটা পাখি, কি একটা বাঁদর, কি একটা গোলাকার, কত কী যে তার শেষ নেই—সেঁজুতি ব্রতের আলপনার মতো বিধাতার জল্পনা-কল্পনা জানাতে রইল।

জন্ম থেকে আরম্ভ করে প্রথম বিস্ময়ের চিহ্নটাতে এসে আমার পনের মাস কি পঁচিশ মাস কি কতটা বয়স কেটেছিল তা বলতে পারা শক্ত; তবে হঠাৎ অসময়ে এসে যে চিহ্নটাতে কপাল ঠুকেছিলেম আমি এবং আমার দাসী দু'জনেই—এটা ঠিক!

সাইক্লোন

এটা জানি তখন—দিন আছে, রাত আছে, আর তারা দু'জনে একসঙ্গে আসে না আমাদের তিনতলায়। এও জেনেছি, বাতাস একজন ঠাণ্ডা, একজন গরম; কিন্তু তাদের দু'জনের কারও একটা করে ছাতা নেই গোলপাতার। রোদে পোড়ে, বিষ্টিতে ভেজে ওদের গা। এও জেনে নিয়েছি যে একটা একটা সময় আরেকজন রোদ বাইরে থেকে ঘরে এসেই জানলাগুলোর কাছে একটা একটা মাদুর বিছিয়ে রোদ পোহাতে বসে যায়। কোনদিন বা রোদ একজন হঠাৎ আসে খোলা জানলা দিয়ে সক্কালেই। তক্তপোশের কোণে বসে থাকে সে, মানুষ বিছানা ছেড়ে গেলেই তাড়াতাড়ি রোদটা গড়িয়ে নেয় বালিশে তোশকে চাদরে আমার খাটেই। তারপর চট্ করে রোদ ধরা পড়ার ভয়ে বিছানা ছেড়ে দেয়াল বেয়ে উঠে পড়ে কড়িকাঠে। ছাতের কাছেই আলসের কোণে দুটো নীল পায়রা থাকে জানি, আলো হলেই তারা দু'জনে পড়া মুখস্থ করে—পাক্‌পাখম্‌...মেজদি...সেজদি...

কড়ে আঙুল বলে খাব; আংটির আঙুল বলে কোথায় পাব; মাঝের আঙুল বলে ধার করোগে; আর একটা আঙুল, তার নাম যে তর্জনী, তা জানিনে, কিন্তু সে বলে জানি, শুধব কিসে; বুড়ো আঙুল বলে লবডংকা। কি সেটা, দেখতে লঙ্কার মতো আর খেতে ঝাল না মিষ্টি তা জানিনে, কিন্তু খুব চেঁচিয়ে কথাটা বলে মজা পাই।

বন্ধ খড়খড়ির একটু ফাঁক পেয়ে জানি রাত আসে এক একদিন, সাদা প্রজাপতির মতো এক ফোঁটা আলো, মাথার বালিশে ডানা বন্ধ করে ঘুমোয় সে, হাত চাপা দিলে হাতের তলা থেকে হাতের উপরে উপরে চলাচলি করে। এমন চটুল এমন ছোট যে, বালিশ চাপা দিলেও ধরে রাখা যায় না; বালিশের উপরে চট করে উঠে আসে। চিৎ হয়ে তার উপর শুয়ে পড়ি তো দেখি পিঠ ফুঁড়ে এসে বসেছে আমারই নাকের ডগায়। উপুড় হয়ে চেপে পড়লেই মুশকিল বাধে তার—ধরা পড়া যায় একেবারে, ওইটা নিশ্চয় করে জেনেছি তখন।

পড়তে শেখার আগেই, দেখতে শুনতে চলতে বলতে শেখারও আগে, ছেলেমেয়েদের গ্রহ-নক্ষত্র, জল-স্থল, জন্তু-জানোয়ার, আকাশ-বাতাস, গাছপালা, দেশবিদেশের কথা বেশ করে জানিয়ে দেবার জন্যে বইগুলো তখন ছিলই না। বই লিখিয়েও ছিল না হয়তো, কাজেই খানিক জানি তখন নিজে নিজে, দেখে কতক ঠেকে কতক, শুনে কতক, ভেবে ভেবেও বা কতক। আমি দিচ্ছি পরীক্ষা তখন আমারই কাছে, কাজেই পাশই হয়ে চলেছি

জানাশোনার পরীক্ষাতে। আমাদের শান্তিনিকেতনের জগদানন্দবাবুর 'পোকা-মাকড়' বই কোথায় তখন, কিন্তু মাকড়সার জালশুদ্ধ মাকড়সাকে আমি দেখে নিয়েছি; আর জেনে ফেলেছি যে, মাকড় মরে গেলে বোকড় হয়ে খাটের তলায় কম্বল বোনে রাতের বেলা। 'মাছের কথা' পড়া দূরে থাক, মাছ খাবারই উপায় নেই তখন, কাঁটা বেছে দিলেও। কিন্তু এটা জেনেছি যে, ইলিশ মাছের পেটে এক থলিতে থাকে একটু সতীর কয়লা, অন্য থলি ক'টাতে থাকে ঘোড়ার ক্ষুর, বামুনের পৈতে, টিকটিকির লেজ এমনই নানা সব খারাপ জিনিস যা মাছ কোটার বেলায় বার করে না ফেললে খাবার পরে মাছটা মুশকিল বাধায় পেটে গিয়ে। জেনেছি সব রুই মাছগুলোই পেটের ভিতরে একটা করে ভুঁই-পটকা লুকিয়ে রাখে। জলে থাকে বলে পটকাগুলো ফাটাতে পারে না; ডাঙায় এলেই তারা মরে যায় বলে পটকাও ফাটাতে পারে না নিজেরা। সে জন্যে মাছের দুঃখ থাকে, আর এইজন্যেই মাছ কোটার বেলায় আগেভাগে পটকাটা মাটিতে ফাটিয়ে দিতে হয়। না হলে মাছ রাগ করে ভাজা হতে চায় না, দুঃখে পোড়ে, নয় তো গলায় গিয়ে কাঁটা বেঁধায় হঠাৎ।



কালোজামের বিচি পেটে গেলেই সর্বনাশ, মাথা ফুঁড়ে মস্ত জামগাছ বেরিয়ে পড়ে। আর কাগ এসে চোখ দুটোকে কালোজাম ভেবে ঠুকরে খায়। জোনাকি—সে আলো খুঁজতে পিদুমের কাছে এল তো জানি লক্ষণ খারাপ, তখন 'তারা' 'তারা' না স্মরণ করলে ঘরের দোষ কিছুতেই কাটে না।

বটতলার ছাপা 'হাজার জিনিস' বইখানার চেয়েও মজার একখানা বই—তারই পাণ্ডুলিপির মাল-মশলা সংগ্রহ করে চলেছে বয়েসটা আমার তখন। বড় হয়ে ছাপাবার মতলবে কিম্বা সর্টহ্যাণ্ড রিপোর্টের মতো ছাঁট অক্ষরে সাটে টুকে নিচ্ছে সব কথা—এ মনেই হয় না।

আজও যেমন বোধকরি—যা কিছু সবই—এরা আমাকে আপনা হতে এসে দেখা দিচ্ছে—ধরা দিচ্ছে এসে এরা। খেলতে আসার মতো এসেছে, নিজে থেকে তাদের খুঁজতে যাচ্ছিনে—নিজের ইচ্ছামতো তারাই এসে চোখে পড়ছে আমার, যথাভিরুচি রূপ দেখিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে খেলুড়ির মতো খেলা শেষে। সেই পঞ্চাশ বছর আগে তখনও তেমনই বোধ হত। দেখছি না আমি, কিন্তু দেখা দিচ্ছে আমাকে সবাই; আর এই করেই জেনে চলেছি তাদের নির্ভুল ভাবে। রোদ, বাতাস, ঘর, বাড়ি, ফুল, পাতা, পাখি এরা সবই তখন কি ভুল বোঝাতেই চলল অথবা স্বরূপটা লুকিয়ে মন ভোলানো বেশে এসে সত্যি পরিচয় ধরে দিয়ে গেল আমাকে, তা কে ঠিক করে বলে দেয়?

এ বাড়িটা তখন আমায় জানিয়েছে—মাত্র তেতলা সে। তেতলার নিচে যে আরেকটা তলা আছে, দোতলা বলে যাকে, এবং তারও নিচে একতলা বলে আর একটা তলও আছে—এ কথা জানতেই দেয়নি বাড়িটা। কিন্তু সে জলে না হাওয়ায় ভাসছে এ মিছে কথাটাও তো বলেনি বাড়িটা। অসত্য রূপটাও তো দেখা যায়নি। আপনার খানিকটা রেখেছিল বাড়ি আড়ালে, খানিকটা দেখতে দিয়েছিল, তাও এমন একটি চমৎকার দেখা এবং না দেখার মধ্য দিয়ে যে তেমন করে সারা বাড়ির ছবি ধরে, কিংবা ইঞ্জিনিয়ারের প্ল্যান ধরে, অথবা আজকের দিনে সারা বাড়িখানা ঘুরে ঘুরেও দেখা সম্ভব হয় না। আজকের দেখা এই বাড়ি সে একটা স্বতন্ত্র বাড়ি বলে ঠেকে, যেটা সত্যিই আমাকে দেখা দেয়নি। কিন্তু সেদিনের সে একতলা দোতলা নেই এমন যে তিনতলা, সে এখনও তেমনই রয়েছে আমার কাছে। নিজে থেকে জানাশোনা দেখা ও পরিচয় করে নেওয়া আমার ধাতে সয় না। কেউ এসে দেখা দিলে, জানান দিলে তো হল ভাব; কেউ কিছু দিয়ে গেল তো পেয়ে গেলাম। পড়ে পাওয়ার আদর বেশি আমার কাছে; কুড়িয়ে পাওয়ার নুড়ির মূল্য আছে আমার কাছে; কিন্তু খেটে পাওয়া পাঁঠার মুড়ির দিকে টান নেই আমার। হঠাৎ খাটুনি জুটে গেলে মজা পাই, কিন্তু 'হঠাৎ' সত্যি 'হঠাৎ' হওয়া চাই, নাহলে নকল 'হঠাৎ' কোনওদিনই মজা দেয় না, দেয়নিও আমাকে। আমি যদি সাহেব হতেম তো অবিবাহিতই থাকতে হত, কোর্টশিপটা আমার দ্বারা হতই না। দাসীটা চলে গেল তার যেটুকু ধরে দেবার ছিল দিয়ে হঠাৎ। এমনই হঠাৎ একদিন উত্তর-পুব কোণের ঘরটাও যা কিছু দেখবার ছিল দেখিয়ে যেন সরে গেল আমার কাছ থেকে।

মনে আছে এক অবস্থায় শীত গ্রীষ্ম বর্ষা কিছুই নেই আমার কাছে। সেই সময়টাতে ছোট ঘরে হঠাৎ একদিন সকালে জেগেই দেখলেম—লেপের মধ্যে থাকতে থাকতে, কোন এক সময় শীতকাল গিয়ে গরম কাল এল। আজ সকালে আমার কপালটায় ঘাম দিয়েছে, আজই দাসী বিছানার তলায় লেপটিকে তাড়িয়ে দেবে, আজ রাতে খোলা জানলায় দেখা যাবে নীল আকাশ আর থেকে থেকে তারা, আর আমাকে একটা সাদা জামার উপরে আর একটা সুতোর কাপড়ের ঠিক তেমনি জামা পরে নিতে হবে না, সক্কাল থেকে মোজা পায়ে দিয়েও কর্মভোগে ভুগতে হবে না জেনে ফেললেম হঠাৎ।

সেই ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত না জানা থেকে জানার সীমাতে পৌঁছনোর বেলা একটা কোনও নির্দিষ্ট ধারা ধরে অঙ্কের যোগ বিয়োগ ভাগফলটার মতো এসে গেল জগৎ-সংসারের যা কিছু, তা হল না তো আমার বেলায়। কিংবা ঘটা করে আগে থাকতে জানান দিয়ে ঘটল ঘটনা সমস্ত তাও নয়। হঠাৎ এসে বললে তারা বিস্ময়ের পর বিস্ময় জাগিয়ে—'আমি এসে গেছি!' ঠিক যেমন ছবি এসে বলে আজও হঠাৎ—'আমি এসে গেলেম, এঁকে নাও চটপট।' যেমন লেখা বলে—'হয়ে গেছি তৈরি চালিয়ে চলো কলম।' চমকি দেবী বলে নিশ্চয় জানি কেউ আছেন আর কাজই যাঁর গোড়া থেকেই চমক ভাঙিয়ে দেওয়া। দেখার পুঁজি জানার সম্বল তিল তিল খুঁটে ভরে তুলতে কত দেরি লাগত যদি চমকি না থাকতেন সঙ্গে দাসীটা ছেড়ে যাবার পরেও। কিণ্ডারগার্ডেন স্কুলের ছাত্রের মতো স্টেপ বাই স্টেপ পড়তে পড়তে চলতে দিলেন না দেবী আমাকে, হঠাৎ পড়া হঠাৎ না পড়া দিয়ে শুরু করলেন শিক্ষা তিনি।

বাড়ির অলিগলি আপন-পর সব চেনা হয়ে গেছে, বাড়ির বাইরেটাকেও জেনে নিয়েছি। কাকের বুলি কোকিলের ডাক ভিন্নতা জানিয়ে দিয়েছে আপনাদের। গরু-গাধাতে, মানুষে-বানরে, ঘোড়াতে আর ঘোড়ার গাড়িতে মিল অমিল কোনখানে বুঝে নিয়েছি। বাড়ির চাকর-চাকরানী তাদের কার কি কাজ; কার মনিব কে-বা—

সবই জানা হয়ে গেছে। বুঝেও নিয়েছি আমি এ বাড়ির একজন। কিন্তু কি নাম আমার সেটা বলার বেলায় হাঁ করে থাকি বোকার মতো—অথচ থামকে বলি থামই, ছাতকে ছাতা বলে ভুল করিনে; পুকুরকে জানি পুকুর, আর তার জলে পড়লে হাবুডুবু খেয়ে মরতে হয় তাও জানি। চলি চলি পা নেই—বড় বড় সিঁড়ির চার-পাঁচ ধাপ লাফিয়ে পড়ি। জেনেছি কাঁচা পেয়ারা লুন দিয়ে খেতে লাগে ভাল; ডাক্তারের রেড মিকশ্চার চিংড়ি মাছের ঘি নয়, কিন্তু বিস্বাদ বিশ্রী জিনিস। দুধের সর ভালবাসি কিন্তু দাসীরা কেউ সেটাতে এক-একদিন ভাগ বসায় তো ধরে ফেলি।

কেবল একটা কথা থেকে থেকে ভুলতে পারিনে—আমি ছোট ছেলে। অনেকদিন লাগছে, বড় হতে, গোঁপদাড়ি উঠতে, ইচ্ছামতো নির্ভয়ে পুকুরের এপার-ওপার করতে, চৌতলার ছাতে উঠে ঘুড়ি ওড়াতে এবং তামাক খেতে বিষ্টিতে ভিজতে।

বাড়ির চাকরগুলো স্বাধীনভাবে রোদ পোহায়, বিষ্টিতে ভেজে, ছোলাভাজা খায়। পুকুরে নামে ওঠে, তামুক খায়, ফটকের বাইরে চলে যায় গোলপাতার ছাতা ঘাড়ে হাঁটতে হাঁটতে—এ সব কেবলই মনে পড়ায় বড় হইনি, ছোটই আছি—বুঝি বা এমনই থাকব চিরদিন তেতলায় ধরা। সেই সময় সেই বহুকাল আগের একটা ঝড় পাঠালেন আমাকে দেখতে চমকি দেবী। ঝড়টা এসেছিল রাতের বেলায় এটুকু মনে আছে, তাছাড়া ঝড় আসার পূর্বের ঘটনা, ঘনঘটা, বজ্রবিদ্যুৎ, বৃষ্টি, বন্ধ-ঘর, অন্ধকার কি আলো কিছুই মনে নেই। ঘুমিয়ে পড়েছি, তখন উঠল তেতলায় ঝড়। কেবলই শব্দ, কেবলই শব্দ। বাতাস ডাকে, দরজা পড়ে; সিঁড়িতে ছুটোছুটি পায়ের শব্দ ওঠে দাসী চাকরদের। হঠাৎ দেখেও ফেললেম চিনেও ফেললেম—দুই পিসিমা, দুই পিসেমশায়, বাবামশায়, আর মাকে, যেন প্রথম সেইবার। তিনতলায় এ ঘর ও ঘর সে ঘর সবকটা ঘরই যেন ছুটোছুটি করে এসে একসঙ্গে একবার আমাকে দেখা দিয়েই পালিয়ে গেল।

এর পরেই দেখছি, বড় সিঁড়ির মাঝে একেবারে চৌতলার ছাত থেকে মোটা একগাছা শিকলে বাঁধা লোহার গির্জার চুড়োর মতো সেকেলে পুরনো লণ্ঠনটাকে নিয়ে শিকলশুদ্ধ বিষম দোলা দিচ্ছে ঝড়। নন্দ ফরাশ—আমাদের লণ্ঠনটাকেই ভালবাসে সে, সরু একগাছা শনের দড়া দিয়ে কোনরকমে শিকল সমেত লণ্ঠনটাকে টেনে বেঁধে ফেলতে চাচ্ছে সিঁড়ির কাটরায়। তুফানে পড়লে বজরাকে যেভাবে মাঝি চায় ডাঙ্গায় আটকে ফেলতে, ঠিক তেমনই ভাবটা তার।

কোনদিন এর আগে জানিয়েছিল শিকলি, লণ্ঠন, সিঁড়ি ও ফরাশ আপন আপন কথা আমাকে তা একটুও মনে নেই, কিন্তু এটা বেশ মনে হচ্ছে সেই প্রথমে গিয়ে পড়লেম দোতলায়, বৈঠকখানার মাঝের ঘরটাতে।

কে যে আমাকে নামিয়ে আনলে, হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে আনলে, কিম্বা কোলে করে নামিয়ে আনলে তা মনে নেই। কেবল মাঝের ঘরটা মনে আছে। সেখানে সারি সারি বিছানা, কৌচ টেবিল সরিয়ে, মাদুরের উপর পেতে দিতে ব্যস্ত দাসীরা। হলদে রঙের বড় বড় কাঠের দরজা সারিসারি সবকটাই বন্ধ হয়ে গেছে। ঘরে বাতাস আসতে পারছে না, চাকরানীগুলো দুধের বাটি, জলের ঘটি, পানের বাটা, পিতলের ডাবর ঝনঝন করে ফেলে ফেলে জমা করছে ঘরের কোণে। এরই মাঝে মাদুরে বসে দেখছি : মাথার উপরে সাদা কাপড়ের গোলাপমোড়া একটার পর একটা বড় ঝাড়, দেয়ালে দেয়ালে দেয়ালগিরি, ছোট বড় সব অয়েলপেনটিং বাড়ির লোকের। জানছি ঝড় যেন একটা কী জানোয়ার—গর্জন করে ফিরছে বন্ধ বাড়ির চারদিকে! দরজাগুলোও ধাক্কা দিয়ে কেবলই পথ চাচ্ছে ঘরে ঢোকবার।

এক সময়ে হুকুম হল ছেলেদের শুইয়ে দেবার। দক্ষিণ শিয়রে মায়ের কাছে সেদিন মেঝেতে পাতা শক্ত বিছানায় মুড়ি দিয়ে শুয়ে নিলেম, কিন্তু ঘুমিয়ে গেলেম না। অনেক রাত পর্যন্ত শুনতে থাকলেম—বাতাস ডাকছে, বৃষ্টি পড়ছে, আর দুই পিসি পান-দোক্তা খেয়ে বলাবলি করছেন এমনই আর একটা আশ্বিনের ঝড়ের কথা।

সেই রাতে একটা ইংরিজি কথা জানলেম—'সাইক্লোন'। ঝড়ের এক ধাক্কায় যেন বাড়ির অনেকখানি, বাড়ির মানুষদের অনেকখানি, সেই সঙ্গে ঝড়ই বা কি, সাইক্লোনই বা কাকে বলে জানা হয়ে গেল। এক রাত্তিরে যেন মনে হল অনেকখানি বড় হয়ে গেছি, জেনেও ফেলেছি অনেকটা—ঘরকে, বাইরেকেও।

উত্তরের ঘর

বাড়ির দক্ষিণ জুড়ে ফুলবাগান, পুকুর, গাছপালা, মেহেদির বেড়া ঘেরা সবুজ চক্কর। সেদিকে প্রকৃতির সৌন্দর্য সুষমা ও কল্পনা। চাঁদ ওঠে সেদিকে, সূর্য ওঠে সেদিকে, মস্ত বটগাছের আড়াল দিয়ে। পুকুরজলে দিনরাত পড়ে আলো-ছায়ার মায়া। দুপুরে ওড়ে প্রজাপতি, ঝোপে ডাকে ঘুঘু, আর কাঠঠোকরা থেকে থেকে।

ময়ূর বেড়ায় পাখনা মেলিয়ে, রাজহংস দেয় সাঁতার, ফোহারাতে জল ছোটে সকাল বিকেল। সারস ধরে নাচ বাদলার দিনে, ঝড় বাতাসে নারকেল গাছের সারি দোল খায়। গরমের দিনে দুপুরে চিল স্থির ডানা মেলিয়ে ভেসে ঝিম সুরে ডাক দিয়ে ঘুরে ঘুরে ক্রমেই ওঠে উপরে। পায়রা থেকে থেকে ঝাঁক বেঁধে বাড়ির ছাতে উড়ে উড়ে বেড়ায়। কাক উড়িয়ে নেয় শুকনো ডাল মাটি থেকে গাছের আগায়। সন্ধ্যায় ওঠে নীল আকাশের তারা। রাতে ডাকে পাপিয়া—কতদূর থেকে কোকিল তার জবাব দেয়— পিউ পিউ, কিউ কিউ! আবার শেয়ালও ডাকে রাতে, ব্যাঙও বলে বর্ষায়। বেজিও বেরোয়, বেড়ালও বেরোয় থেকে থেকে শিকার সন্ধানে। একটা একটা নেড়ি কুত্তো, সেও ফাঁক বুঝে হঠাৎ ঢোকে বাগানে, চারদিক দেখে নিয়ে চট করে সরেও পড়ে রবাহূত গোছের ভাব দেখিয়ে।



কিন্তু তখনও বাড়ির এই রমণীয় দিকটাতে নেমে যাবার আমার বয়েস হয়নি, উঁকি দেবারও অবস্থা হয়নি। ওদিকটা ছিল সেকালের নিয়মে বারবাড়ির সামিল। অন্দরে যারা থাকত তারা তেতলার টানা বারান্দার বন্ধ ঝিলমিল দিয়ে ওদিককার একটু আভাস মাত্র পেতে পারত। কি ছেলে, কি মেয়ে, কি দাসী, কি বউ, কি গিন্নিবান্নি— সকলের পক্ষেই এই ছিল ব্যবস্থা। বেশি রাত না হলে দক্ষিণের ঝিলমিল দেওয়া জানলা ক'টা পুরোপুরি খোলা ছিল তখন বেদস্তুর। ঐ দিকটা বন্ধ রাখা প্রথা হয়ে গিয়েছিল কতকটা দায়ে পড়েও। এ বাড়িটা বৈঠকখানা হিসেবে প্রস্তুত করা—এটাকে আমাদের বসতবাড়ি হিসাবে করে নিতে এখানে ওখানে নানা পর্দা দিতে হয়েছে, না হলে ঘরের আব্রু থাকে না। বৈঠকখানায় বাস করতে হবে মেয়েছেলে নিয়ে, সেটা একটা দুর্ভাবনা জাগিয়েছিল নিশ্চয়; তাই কতকগুলো পর্দা, ঝিলমিল ও চলাফেরার নিয়ম দিয়ে বাড়ির কতক অংশ, পুরনো বাড়ি ছেড়ে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গেই, অন্দর হিসেবে দেওয়াল ঝিলমিল ইত্যাদি দিয়ে ঘিরে নিতে হয়েছিল আব্রুর জন্যেও বটে, বাসঘরের অকুলানের জন্যেও বটে। এবং সেই পর্দা দেওয়াল ইত্যাদি ওঠার সঙ্গে কতকগুলি জানলা বন্ধ দরজা বন্ধ নিয়মও সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল আপনা হতেই। যখন আমি হয়েছি তখন বন্ধ থাকত দক্ষিণের ঝিলমিল তিনতলার, ভোর হতে রাত দশটা নিয়মমতো।

দক্ষিণ বারান্দার তিন হাত পাঁচিল, তার উপর রেমো সবুজ রঙ মাখানো টানা ঝিলমিল বন্ধ। আর আমি তখন মোটে দুই হাত খাড়াই কিনা সন্দেহ। ড্রপ সিনের সবুজ পর্দার ওপারে কি আছে জানার জন্যে যেমন একটা কৌতূহল থাকে, তেমনই বাড়ির মনোরম অংশটাকে দেখবার জন্যে একটা কৌতূহল ছিল কি ছিল না, কিন্তু উত্তর দিকটাতেই টানছে এখন মন—যে দিকটাতে জীবন বিচিত্র হয়ে দেখা দেয় খিড়কির ফাঁকে ফাঁকে।

এই খড়খড়ি দেওয়া বাইরের জগতের খিড়কি, এদিকে সকাল বিকেল, যখন তখন, বাড়ির সাধারণ দিক দেখে চলতেম। অষ্টপ্রহর কিছু না কিছু হচ্ছে সেখানে—চলছে, বলছে, উঠছে, বসছে; কত চরিত্রের, কত ঢঙের, কত সাজের মানুষ, গাড়ি, ঘোড়া—কত কী তার ঠিক নেই। মানুষ, জন্তু, কাজকর্ম এখানে সবই এক একটা চরিত্র নিয়ে

অবিশ্রান্ত চলন্ত ছবির মতো চোখের উপরে এসে পড়ত একটার ঘাড়ে আর একটা। সব ছবিগুলো নিজেতে নিজে সম্পূর্ণ—ছেদ নেই, ভেদ নেই, টানা চলেছে চোখের সামনে দিয়ে দৃশ্যের একটা অফুরন্ত স্রোত, ঘটনার বিচিত্র অশ্রান্ত লীলা। উত্তরের সারিসারি তিনটে জানলার তলাতে দেড় ফুট করে উঁচু সরু দাওয়া—সেইখানে বসে খড়খড়ি টেনে দেখি। পুরোপুরি একখানা ছবির মতো চোখে পড়ত না। বাড়ি, ঘর, গাছ—এরই নিচে একটা ময়লা সবুজ টান, তারপর আবার ছবি—ছাগল, মুরগি, হাঁস, খাটিয়া, বিচালির গাদা, খানিকটা চাকার আঁচড় কাটা রাস্তা—তারপর আবার সবুজ টান এমনই একটা করে খড়খড়ির ফাঁক আর একটা করে কাঠের পাটা—এরই উপর সব ছবি ও না-ছবিকে দু'ভাগ করে একটা সরু দাঁড়ি—খবরের কাগজের দুটো কলমের মাঝের রেখার মতোই সোজা—যেটা টানলে হয় ছবি, চাপলে হয় বন্ধ-ছবি দেখা।

বাড়ির উত্তর আঙ্গিনাটায় একটা গোল চক্কর ছিল তখন—এখন সেখানে মস্ত লালবাড়ি উঠে গেছে। এই চক্করের পুব পাশে আর একটা আধা-গোল গোছের চক্কর; পশ্চিম পাশে আর একটা চৌকোনা পাঁচিল ঘেরা বাগান। এই ক'টা আস্তাবল, নহবতখানা, গাড়িখানা। তিনটে বড় বড় বাদাম আর অনেক কালের পুরনো তেঁতুলগাছ একটা। এই গাছ ক'টার ফাঁকে ফাঁকে টানা উঁচুনিচু সব পাকাবাড়ির ছাত আর চিলেকোঠা। সরু সরু কাঠের থাম দেওয়া, ঝুঁকে পড়া বারান্দা দেওয়া রামচাঁদ মুখুজ্যের সাবেক বাড়ি—গরাদে আঁটা ছোটো ছোটো জানলা, ইঁট বার করা ছাতের পাঁচিল আর দেওয়াল। উত্তরের এইটুকুর মধ্যে ধরা তখন বাইরের দৃশ্যজগতটি আমার, বাকি দিকগুলো শোনা আর কল্পনার মধ্যে ছিল। বহির্জগতের খিড়কি দিয়ে, উঁকি দিয়ে দেখার মতো ছবিগুলো। মানুষ, মুরগি, হাঁস, গাড়িঘোড়া, সহিস, কোচম্যান, ছিরু মেথর, নন্দ ফরাশ, গোবিন্দ খোঁড়া, বুড়ো জমাদার, ভিস্তি, মুটে, উড়ে বেহারা, গোমস্তা, মুহুরি, চৌকিদার, ডাক-পেয়াদা—সবাইকে নিয়ে মস্ত একটা যাত্রা চলেছে এই উত্তরের আঙ্গিনাটায়। সকাল থেকে ঘুমের ঘড়ি না পড়া পর্যন্ত কত কি মজার মজার ঘটনা ঘটে চলেছে দেখতেম এই দিকটাতে। কতক সুরকির রাস্তায়, কতক গোল চাকলার মধ্যেটায়, কতক বা খোলার ঘরগুলোর ভিতরে এবং বাহিরে, অথবা কোনও বাড়ির ছাতে অনেক দূরে। চলতি ভাষায় যেন একটা চলনসই নাটক দেখছি। খুব বড় ট্র্যাজেডি কি কমেডি নয়, কিন্তু কতক নড়াচড়া, কতক হাবভাব, কতক বা একটা ছবি—এই দিয়ে ভরতি একটা প্রহসন দেখছি বলতে পারি। সকালে চোখ খোলা থেকে আরম্ভ করে রাত দশটায় চোখের পাতা বন্ধ করা পর্যন্ত একটা বড় নাটক দেখার মতো ছুটি নেই এখন, কিন্তু এটুকু অবসর পেয়েছিলেম তখন। নিত্য নতুন উত্তর চরিতের এক এক অঙ্কের মতো—এই নাটক শুরু হত এবং শেষ হত যেভাবে তার একটু হিসেব দিই।

তখনও বাড়িতে জলের কল বসেনি। রাস্তার ধারে ধারে টানা নহর বয়ে কলের জল আসে। রোজই দেখি এক ভিস্তি, গায়ে তার হাত-কাটা নীলজামা, কোমরে খানিক লাল শালু জড়ানো, মাথায় পোস্ট অফিসের গম্বুজের মতো উঁচু সাদা টুপি—নহরের পাশে দাঁড়িয়ে চামড়ার মোষোকে জল ভরে। মোষকালো চামড়ার মোষোকটা ঘাড় তুলে হাঁ করে জল খায়, যেন একটা জলজন্তু; পেটটা তার ক্রমেই ফুলতে ফুলতে চকচক করতে থাকে। মোষোকটা ফাটার উপক্রম হতেই ভিস্তি একটা সরু চামড়ার গলাট দিয়ে সেটাকে বেঁধে নিয়ে গায়ের জল মুছিয়ে যেন পোষা জানোয়ারের মতো পিঠে তুলে নিয়ে চলে যায়, খানিক দৌড়, খানিক আস্তে চলা মিলিয়ে একটা চমৎকার চালে মাটির দিকে বুক ঝুঁকিয়ে। বাঁধা কাজে বাঁধা ভিস্তি, তার চাল-চোল সমস্তই এমন বাঁধা ছিল যে মনেই আসত না সে মরতে পারে, বদলাতে পারে। ঘড়ির মতো দস্তুরমাফিক বাঁধা নিয়মে কাজ বাজিয়ে চলত; দাঁড়াত যেখানকার সেখানে, জল ভরত যেখানকার সেখানে, চলে যেতও যেখানকার সেখানে দিনের পর দিন। তার চেহারা দেখিনি; শুধু তার চলার ভঙ্গি, কাপড়ের রঙ—এই বিশেষত্ব দিয়েই তাকে আমি দেখতে পাই—সেকাল একাল সব কালেই সে একই ভিস্তি। কাকগুলো যে ভাবে কালের পরিবর্তন ছাড়িয়েছে, ভিস্তিগুলোও সেই ভাবে তখনও যে এখনও সে রয়েছে ভিস্তিই। কৃষ্ণনগরের ভিস্তি পুতুল, যাত্রার সাজা ভিস্তি, বহুরূপীর ভিস্তি, আরব্য উপন্যাসের ভিস্তি—সবগুলোর সঙ্গে মিলে আছে সেই পঞ্চাশ বছর আগেকার ভিস্তি একজন, যে ঘড়ি ধরে জল ভরতো মোষোকে। সেই সেকালের ভিস্তির বেশে বা চেহারায় যদি একটু বিশেষত্ব থাকত তবে একালের ভিস্তির সঙ্গে অভিন্ন হতে পারতই না সে—সে যেন একটা সনাতন চিরন্তন জীবের মতো তখনও ছিল এখনও আছে।

ভিস্তি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মাথায় ফেটি বেঁধে দু'হাতে দুই ঝাঁটা নিয়ে দেখা দিত একটা মানুষ। জাতে

সে ডোম, তার নাম ছিল শ্রীরাম, কিন্তু ডাকত সবাই ছিরে বলে। সে দুই হাত খেলিয়ে চটপট দুটো কলমের মতো করে কাটা ঝাঁটা বুলিয়ে যায়। নিমেষে সব রাস্তাই ঢেউ খেলানো দুই প্রস্থ রেখায় অতি আশ্চর্য অতি পরিষ্কার ভাবে নক্সা টানা হয়ে যায়। চমৎকার চুনোট করা গেরুয়া কাপড়ে সমস্ত সদর রাস্তাটা যেন মোড়া হয়ে থাকে খানিকক্ষণ ধরে। রাস্তার আর্টিস্ট, ধুলোর আর্টিস্ট, ডবল ঝাঁটার আর্টিস্ট—তার কাজ দেখে চোখ ভুলে থাকত কতক্ষণ। আমরা যেমন ছবির নানা কাজে নানা রকম সরু মোটা ভোঁতা চেটালো তুলি রাখি, আমাদের ছিরে মেথরও কাছে রাখত রকম-বেরকম ঝাঁটা। রাস্তার ঝাঁটা ছিল তার কলমের মতো ডগার একধারে ছোলা; জলের নর্দমা পরিষ্কার করবার জন্যে রাখত সে দাড়ি কামানো বুরুশের মতো ছোট এবং মুড়ো ঝাঁটা; বাগানের পাতালতা কুটো-কাটা ঝাঁটানোর জন্যে ছিল চোঁচের মতো খোঁচা দু'ফাঁক ঝাঁটা যাতে সামান্য কুটোটিও ঝুড়িতে তুলে নেওয়া চলে অনায়াসে; উঠোন, দালান, বারান্দা ঝাঁটানোর ঝাঁটা ছিল চামরের মতো হালকা ফুরফুরে, বাতাসের মতো হালকা পরশ বুলিয়ে চলত মেঝের উপরে। এই নানারকম ঝাঁটার খেলা খেলিয়ে চলে যেত সে রোজই। আঙ্গিনা, রাস্তা, অলি-গলি, বারান্দা ঝেঁটিয়ে যেত ছিরু যখন তকতকে পরিষ্কার করে, তখন তারই উপরে চলত যাত্রা অভিনয় আবার।

এবারে কেবল চলন্ত ছবি! একটা ছোট্ট টাট্টু ঘোড়া, তার চেয়ে ছোট্ট একটা পালকি-গাড়ি টানতে টানতে পুরনো বাড়ির ফটকে এসে দাঁড়াতেই বাক্সর মতো ছোট্ট গাড়ি থেকে মোটাসোটা গম্ভীর এক বাবু নেমে পড়েন, মাথার চুল তাঁর কদম ফুলের মতো ছাঁটা। সোয়ারি নামতে না নামতে বোঁ করে গাড়িটা গোল চক্করের পশ্চিম দিকের অশ্বত্থ তলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দেয়। ছোট্ট ঘোড়া অমনি ছোট্ট ফটক ঠেলে কচি ঘাস চোর কাঁটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগে, আর গাড়িখানা কুমির পোকার শুঁড়ের মতো বোম জোড়া আকাশে উঁচিয়ে নৈঋত কোণের দিকে চেয়ে তার বাবুর জন্যে অপেক্ষা করে থাকে।

একটা ছাতি আস্তে আস্তে ফটকের দিকে এগিয়ে চলে, অথচ মানুষ দেখিনে তার নিচে। হঠাৎ দেউড়ির কাছে এসে ছাতিটা বন্ধ হয়ে তলাকার ছোট্ট মানুষটিকে প্রকাশ করে দেয়—মাথায় চকচকে টাক, ছোট্ট যেন একটি মাটির পুতুলের মতো বেঁটেখাটো মানুষটি। ঘণ্টা বাজে এবার সাতবার, তারপর খানিক ঢং ঢং ঢং টান দিয়ে সাড়ে সাত বুঝিয়ে থামে। রোদ এসে পড়ে লাল রাস্তার উপরে একফালি সোনার কাগজের মতো।

চীনেদের থিয়েটার দেখা যেমন খাওয়া দাওয়া গল্প গুজবের সঙ্গে চলে, আমাদের যাত্রা দেখা যেমন—খানিক দেখে উঠে গিয়ে তামাক খেয়ে নিয়ে, কিম্বা হয়তো ঘরে গিয়ে এক ঘুম ঘুমিয়ে এসেও দেখা চলে, তেমনি ভাবের দেখাশোনা চলত এই উত্তর দিকের জানলায় বসে।

হঠাতে ঘরের ওধারে একটা কৌচের তলায় ঢুকে রবারের গোলাটা পালায় কোথায় এই সমস্যার মীমাংসা করতে কৌচের তলায় নিজেই একবার ঢুকে পড়তে চলেছি, পা দুটো আমার হারু শহরের দরজার গিয়ে ঠেকে ঠেকে, ঠিক সেই সময় খড়খড়ির আসরের দিক থেকে ঘোড়দৌড়ের শব্দ আর সহিসদের হৈ হৈ রব উঠল। অমনি নিজের রিজার্ভ বক্সে হাজির। দেখি গোল চক্কর ঘিরে ঘোড়দৌড় বেধে গেছে! সহিস, কোচম্যান, দরোয়ান যে যেখানে ছিল সবাই মিলে ঘোড়া পালানো আর ঘোড়া ধরার অভিনয় করতে লেগে গেছে। এই অশ্বমেধের ঘোড়া ধরা দিয়ে সকালের উত্তরকাণ্ডের পালা প্রায়ই বেলা দশটাতে কিছুক্ষণের জন্যে বন্ধ হত। স্নান আহারের জন্যে একটা মস্ত ইণ্টারভাল। যাত্রা নিশ্চয়ই চলত তখনও—কেননা এই উত্তর আঙ্গিনাটা ছিল সাধারণ দিক; বাড়ির কাজকর্মে লোকের যাতায়াতের অন্ত ছিল না, কামাই ছিল না সেখানে। প্রবেশ আর প্রস্থান—এই ছিল ওদিকের নিত্যকার ঘটনা।

দুপুরবেলা নিঝুমের পালা চলেছে এখানটায় দেখি। উত্তরের আঙ্গিনার পশ্চিম কোণে আধখানা তেঁতুল আর আধখানা বাদাম গাছের ছাওয়াতে খোলার ঘরটা—ঘরের চাল ধনুকের মতো বেঁকে প্রায় মাটি ছুঁয়েছে। ঘরের সামনে আধখানা মাটিতে পোঁতা একটা মেটে জালা, তাই থেকে ছিরে মেথর জল তুলে তুলে গা ধুচ্ছে আর ক্রমান্বয়ে ইংরিজিতে নিজের বউকে গাল পাড়ছে, আর বউটা বাংলাতে বকে চলেছে তার সঙ্গে।

আস্তাবলের সামনে খাটিয়া, তার উপরে পাতা কালো কম্বল, তাতেই শুয়ে ঝকঝকে ঘোড়ার সাজ আর শিকলি! ঘরের মধ্যে ছোট্ট একটা টাট্টু ঘোড়ার শেষের পা দুটো আর চামরের মতো ল্যাজটা দেখা যায়। ল্যাজটা ছপ ছপ করে মশা তাড়ায়, আর পা দুটো তালে তালে ওঠে পড়ে, কাঠের মেঝেতে খটাস খট শব্দ করে।

গোল চক্করের পশ্চিমে আর একটা পাঁচিল ঘেরা চৌকোনা জায়গা, কখনও কপি কখনও বেগুন এই দুই

রঙের পাতায় ভরাই থাকত সেটা। চক্করের পুবধারে আর একটা ঘেরা জমি, সেটার ফটকের দুই ধারের দেওয়ালে চুন-বালিতে পরিষ্কার করে তোলা দুটো হাতি নিশেন পিঠে পাহারা দিচ্ছে। টিনের একটা খালি ক্যানেস্তারা কাদায় উলটে পড়ে আছে; সেইখানটায় হিজিবিজি চাকার দাগ রাস্তায় পড়েছে, তাতে একটু জল বেধে আছে; পাতিহাঁস ক'টা হেলতে দুলতে এসে সেই কাদাজলে নাইতে লেগে যায়। থেকে থেকে মাথা ডোবায় জলে আর তোলে, ল্যাজের পালক কাঁপায়, শেষে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ভিজে মাথা, নিজের পিঠে ঘষে আর ঠোঁট দিয়ে গা চুলকে চলে। একটা বুড়ো রামছাগল ফস করে রাস্তা থেকে একটা লেখা কাগজ তুলে গিলে ফেলে চটপট, তারপর গম্ভীর ভাবে এদিক ওদিক চেয়ে চলে যায় সোজা ফটক পেরিয়ে রাস্তা বেড়াতে দুপুরবেলা।

গোল চক্করের পুব গায়ে একটা আধগোল আধচৌকো চক্কর—মরচে ধরা ফুটো ক্যানেস্তারা, খড়কুটো, ভাঙা গামলা, পুরনো তক্তপোশের উই-খাওয়া ফর্মা আর একরাশ ছেঁড়া খাতায় ভরতি। সেখানে গোটা কয়েক মুরগি চরে—ছাই রঙ, পাটকেল রঙ। সাদা একটা মস্ত মোরোগ তার লাল টুপি মাথায়, পায়ে হলদে মোজা, গায়ের পালক যেন হাতির দাঁতকে ছুলে কেউ বসিয়েছে একটির পাশে আর একটি। মোরোগটা গোল চক্করের ফটকের একটা পিলপে দখল করে বসে থাকে, নড়ে না চড়ে না।

বেলা চারটে পর্যন্ত এই ভাবে নিঝুমের পালা চলে। ঢং ঢং করে আবার ঘড়ি পড়ে। একটার পর একটা ইস্কুল গাড়ি, আফিস গাড়ি, পালকি এসে দলে দলে সোয়ারি নামিয়ে চলে।

গোবিন্দ খোঁড়া রাজেন্দ্র মল্লিকের ওখানে রোজই ভাত খায় আর আমাদের গোল চক্করটাতে হাওয়া খেতে আসে। কতকালের পুরনো আঁকাবাঁকা গাছের ডালের মতো শক্ত তার চেহারা, ঠিক যেন বাইবেল কি আরব্য উপন্যাসের একটা ছবির থেকে নেমে এসেছে। গোল বাগানের ফটকের একটা পিলপে ছিল তার পিঠের ঠেস। বৈকালে সেখানটাতে কারও বসবার যো ছিল না। বাদশার মতো গোবিন্দ খোঁড়া তার সিংহাসনে খোঁড়া পা ছড়িয়ে বসে যেত! পাহারাওয়ালা, কাবুলিওয়ালা, জমাদার, সরকার, চাকর, দাসী—সবার সঙ্গেই আলাপ চলে, খাতিরও সকলের কাছে যথেষ্ট তার। শহর-ঘোরা সে যেন একটা চলতি খবরের কাগজ কিংবা কলকাতা গেজেট! পাঁচিলের উপর বসে সে খবর বিলতো। শুনেছি প্রথমবার প্রিন্স আসবার সময় পুলিস থেকে তেল বিলিয়ে গরিবদের ঘরেও দেওয়ালি দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গোবিন্দর ঘরদুয়োর কিছুই নেই—সে ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে গোছের মানুষ, এটা পাহারাওয়ালারা সবাই জানত। তারা গোবিন্দকে ধরে বসল পিদুম জ্বালাতেই হবে—ঘর না থাকে ঘর ভাড়া করেও পিদুম জ্বালানো চাই। গোবিন্দ তখন আমাদের গোল চক্করে দরবারে বসেছে; পুলিসের রহস্যটা বুঝেও যেন সে বোঝেনি এইভাবে পাহারাওলাকে শুধুলে, 'সরকার থেকে কতটা তেল গরিবদের দেওয়ানোর হুকুম হল?' একপলা করে তেল বিনামূল্যে দেওয়ানোর কথা যেমন পুলিসম্যান গোবিন্দকে বলা, অমনি জবাব সঙ্গে সঙ্গে—'যাঃ যাঃ, তোর বড়সায়েবকে বলিস, গোবিন্দ এক সের তেল নিজে থেকে খরচ করচে।' ভিকটোর হিউগোর গল্পের একটা ভিখিরির সর্দারের মতো এই গোবিন্দ খোঁড়ার প্রতাপ আর প্রতিষ্ঠা ছিল তখনকার দিনে। এখন হলে পুলিসের সঙ্গে তকরার, সিডিশান, রাজদ্রোহ, এমনি কিছুতে ধরা পড়ে যেত নিশ্চয় গোবিন্দ।

এদিকে গোবিন্দ খোঁড়ার দরবার গোল চক্করের পাঁচিলে, ওদিকে নহবতখানার ছাতে বসেছে তখন আমাদের সমশের কোচম্যানের মজলিশ দড়ির খাটিয়া পেতে। সে যেন দ্বিতীয় টিপু সুলতান বসে গেছে ফরসি হাতে। হাবসির মতো কালো রঙ, মাথার চুল বাবরিকাটা, পরনে সাদা লুঙ্গি, হাতকাটা মেরজাই, চোখে সুর্মা, মেদিতে লাল মোচড়ানো গোঁফ, সিঁথেকাটা দাড়ি। বাবামশায় হাওয়া খেতে যাবার পূর্বে ঠিক সময়ে সে সেজেগুজে বার হত। চুড়িদার পাজামা, রুপোলি বকলস দেওয়া বার্নিশ জুতো, আঙুলে রুপো বাঁধা ফিরোজার আংটি, গায়ে জরিপাড়ের লাল বনাতের বুক কাটা কাবা তকমা আঁটা, কাঁধে ফুলকাটা রুমাল, মাথায় থালার মতো মস্ত একটা শামলা, কোমরে দুই সহিসে মিলে জড়িয়ে দিয়েছে লম্বা সাপের মতো জরির কোমরবন্ধ। ফিটফাট হয়ে সমশের লাল চক্করের পাঁচিলে চাবুক হাতে দাঁড়াত আর সহিস সাদা জুড়ির ঘোড়া দুটোকে চক্করের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে বাইরে থেকে ফটক বন্ধ করে দিত। তখন সাদা ঘোড়া দুটোকে প্রায় দশ মিনিট সার্কাসের ঘোড়ার মতো চক্কর দিইয়ে তবে গাড়িতে জোতার নিয়ম ছিল। পাছে রাস্তায় ঘোড়া বজ্জাতি করে সেই জন্যে তাদের আগে থাকতে টিট করাই উদ্দেশ্য। এই দুর্দান্ত কোচম্যান, ঘোড়াও তার তেমনই, গাড়িখানা থেকে ঝড়ের মতো বেরিয়ে পড়ত। কোচবাক্সের উপরে দেখতেম খাড়া দাঁড়িয়ে সমশের হাঁকড়াচ্ছে চাবুক! ফেটিং গাড়ি ছিল খুব উঁচু। গাড়িবারান্দার

খিলেনের কাছটাতে এসেই ঝপ করে সমশের নিজের আসনে বসে পড়ত গম্ভীর হয়ে! তারপরে এক সময়ে ঘোড়া, গাড়ি, কোচম্যান, সাজগোজ, সব নিয়ে একটা জমজমাট শোভাযাত্রার দৃশ্য রাস্তার উপর খানিক ঝলক টেনে বেরিয়ে যেত গড়ের মাঠে—আতর গোলাপের খোশবুতে যেন উত্তর দিকটা মাত করে দিয়ে!

এরই একটু পরেই নন্দ ফরাশ দু'হাতে আঙুলের ফাঁকে বড়ো বড়ো তেলবাতির সেজ দুটো অদ্ভুত কায়দাতে হাতের তেলোয় অটল ভাবে বসিয়ে উঠে চলত ফরাশখানা থেকে বৈঠকখানায়। তারপর ড্রপ পড়ত রঙ্গমঞ্চে, এবং নোটো খোঁড়া, নন্দ ফরাশ দুয়ে মিলে বেহালা বাদন দিয়ে সেদিনের মতো পালা সাঙ্গ হত সন্ধেবেলায়। তখন পিদুমের ধারে বসে রূপকথা শোনা, ইকড়ি মিকড়ি, ঘুঁটি খেলার সময় আসত।

সেই ঘরের এককোণে বসে রূপকথা বলে একটা দাসী—দাসীটার চেয়ে তার রূপকথাটাকে বেশি মনে পড়ে। এই দাসীটা ছিল আমার ছোটো বোনের। সে বলে তার দাসীর নাম ছিল মঞ্জরী। আর দোয়ারি চাকর এই কবিত্বপূর্ণ মঞ্জরী নামটির নাকের ডগাটা বঁটির ঘায়ে উড়িয়ে দিয়েছিল তাও বলে সে; কিন্তু আমি দেখি মঞ্জরীকে শুধু একটা গড়া-পড়া নাক ভাঙা নাম, বসে আছে একটা লাল চামড়ার তোরঙ্গ ঠেস দিয়ে দুই পা ছড়িয়ে। তোরঙ্গটার সকল গায়ে পিতলের পেরেক মালার মতো করে আঁটা। মঞ্জরী ঝিমোচ্ছে আর কথা বলছে— 'এক ছিল টুনটুনি—সে নিমগাছে বাসা না বেঁধে রাজবাড়ির ছাতের আলসেতে থাকে, আর রাজপুত্তুরের তোশক থেকে তুলো চুরি করে করে ছোট্ট একটি বাসা বাঁধে।'

ছাতে ওঠবার সিঁড়ি বলে একটা কিছু নেই তখনও আমার কাছে, অথচ টুনটুনির বাসার কাছটায়—একেবারে নীল আকাশের গায়ে, ছাতের কার্নিসে উঠে গিয়ে বসি পা ঝুলিয়ে। এমনই দিনের বেলায় রূপকথার সিঁড়ি ধরে পাখির সঙ্গে পেতেম ছাতের উপরের দিকটা। আবার রোজই নিশুতি রাতে মাথার উপরে পেতেম শুনতে হুটোপুটি করছে ছাতটা—ভাটা গড়গড় গড়াচ্ছে, দুমদুম লাফাচ্ছে! ছাতটা তখন ঠেকত ঠিক একটা অন্ধকার মহারণ্য বলে—যেখানে সন্ধেবেলা গাছে গাছে ভোঁদড় করে লাফালাফি, আর আকাশ থেকে জুঁই ফুল টিকিতে বেঁধে ব্রহ্মদৈত্য থাকে এ-ছাত ও-ছাত পা মেলে দাঁড়িয়ে।

এমনি করে গল্প-কথার মধ্যে দিয়ে কত কি দেখেছি তখন! যখন চোখও চলে না বেশিদূর, পা-ও হাঁটে না অনেকখানি, তখন কান ছিল সহায়। সে এনে পৌঁছে দিত কাছে ছাত, হাতে এনে দিত কমলাফুলির টিয়েপাখি, চড়িয়ে দিত আগডুম বাগডুম ঘোড়ায়, লাটসাহেবের পালকিতে এবং নিয়ে যেত মাসিপিসির বনের ধারের ঘরটাতে আর আমার বাড়ির দুয়োরেও!

মায়ের অনেকগুলি দাসী ছিল—সৌরভী, মঞ্জরী, কামিনী কত কি তাদের নাম! অনেকদিন অন্তর দেশে যেত এরা সব গাঁয়ের মেয়ে—অনেকদিন পরে ফিরত আবার। কখনও বা এরা দলবেঁধে যেত গঙ্গা নাইতে পার্বণে, আর নিয়ে আসত দু'চারটে করে খেলনা, পীরের ঘোড়া, সবজে টিয়ে, কাঠের পালকি, মাটির জগন্নাথ, সোনার ময়ূর। আতা গাছে তোতা, ঢেঁকি, বঁটি। এমনই জানা রূপকথার দেশের, ছড়ার দেশের পশু, ফুল, ফল, তৈজসপত্র সবাইকে পেতেম চোখের কাছেই কিন্তু মাসিপিসির ঘর আর মামার বাড়ি দেখা দিয়েও দিত না—বাড়িও ছাতের মতোই অজ্ঞাতবাসে ছিল। মঞ্জরী দাসী একমাত্র ছিল, খেয়ালমতো খোলা জানলার ধারে তুলে ধরত আর বলত—ওই দ্যাখ মামার বাড়ি! বাড়ির সন্ধানে উত্তর আকাশ হাতড়াতো চোখ, দেখত না একখানিও ইঁট, শুধু পড়ত চোখে তখন আমাদের বাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণে মস্ত তেঁতুল গাছটার শিয়রে মন্দিরের চুড়োর মতো সাদা সাদা মেঘ স্থির হয়ে আছে! ঐটুকু দেখিয়েই দাসী নামিয়ে দিত কোল থেকে খড়খড়ির তলার মেঝেতে। তারপর সে দরজা-জানলা বন্ধ করে দিয়ে রান্নাবাড়িতে ভাত খেতে যেত একটা বগি-থালা সিন্দুকের পাশ থেকে তুলে নিয়ে।

প্রায় রাতেরই মতো চুপচাপ আর অন্ধকার হয়ে যেত ঘরখানা দিনে দুপুরে। সবজে খড়খড়িগুলো সোনালি দাঁড়ি টানা একটা একটা ডুরে কাপড়ের পর্দার মতো ঝুলত চৌকাঠ থেকে—কাঠের তৈরি বলে মনেই হত না জানলাগুলো! সুতোর সঞ্চারে পৌঁছত এসে আকাশের দিক থেকে চিলের ডাক। বাতাসেরও ডাক খুব মিহি সুর দিয়ে কানে আসত—ঝড়ের একটা আবছায়া মনে পড়ত—একটা দুটো কোমল টান প্রথমে, তারপর খানিক চড়া সুর, তারপর বেশ একটা ফাঁক, তার ঠিক পরেই একটানা তীব্র সুর বাতাসের। এমনই গোটা দুই তিন আওয়াজ আর কিছু নেই যখন তিনতলায়, তখন সেই নিঃসাড়াতে চোখ দুটো দেখতে বার হত—যেন রাতের শিকারী জন্তু খুঁজত। এটা, ওটা, সেটা, এদিক, ওদিক, সেদিক, সন্ধানে চলত সেদিনের আমিও তক্তার নিচে, সিঁড়ির কোণে, সার্সির ফাঁকে, আয়নার উলটো পিঠে এবং চৌকি বেয়ে আলমারির চালে নানা জিনিস আবিষ্কার করার দিকে। ছাতের কথা

ভুলেই যাই—তখন ঘর দেখতেই মশগুল থাকে মন! এক ছোট ছেলেমেয়েদের ছাড়া এই সময়টাতে খানিকক্ষণের মতো কাউকে পেত না তিনতলার ঘরগুলো। কাজেই এ সময়ে আমাদের সঙ্গে যেন ছাড়া পেয়ে জিনিসগুলোও হঠাৎ বেঁচে উঠত, এবং তারাও বেরিয়েছে দিন দুপুরের অন্ধকারে খেলার চেষ্টায়—এটা ভাবে জানাত।

সারা তিনতলার দেওয়াল, ছবি, সিঁড়ি, তক্তা, আলমারি, ফুলদানি, মায় মেঝেতে পাতা মস্ত জাজিম এবং কড়িতে ঝোলানো পাখাগুলোর সঙ্গে এমনি করে দুপুরে ঘরে ঘরে ফিরে আর উঁকি দিয়ে, সারা তিনতলা কতদিনে পেয়েছিলেম, পুরোপুরি ভাবে তা বলা যায় না। একটা দোলনাখাট—ছোট্ট, সেটা খাট থাকতে থাকতে হঠাৎ কবে একদিন জাহাজ হয়ে উঠল এবং দুলে দুলে আমাদের নিয়ে সমুদ্রে চলাচল শুরু করলে। মস্ত জাজিম বিছানা ক'জোড়া ছোট হাতের তাড়ায় যেন ফুলে ফুলে উঠল—যেন ক্ষীর সাগরে ঢেউ তুলে। তক্তার উপরটার চেয়ে তক্তার নিচেটা কবে যে আপনাকে ভারি নিরিবিলি আরামের জায়গা বলে জানিয়েছিল কোন তারিখে, কোন বছরে, কতকাল আগেই বা—তা কি মনে থাকে? জানিনে, ভুলে গেছি এই হল উত্তর তারিখের বেলায়। কিন্তু জিনিসের বেলাতে একেবারে তা নয়—এখনও পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘরে ঘরে কোথায় কি তা স্পষ্ট দেখছি আমি—জিনিসগুলোকে একটুও ভুলিনি। কিন্তু আশ্চর্য এই, মানুষদের মধ্যে অনেকের চেহারাই লোপ পেয়ে গেছে এই তিনতলার থেকে, যেটার কথা আজ বলছি। কাঠের বেড়া দেওয়া দোলনাখাট জাহাজ জাহাজ খেলে যে কোণে বসে আমাদের সঙ্গে, সেখান থেকে দেখা যায় উত্তরে সরু একফালি দেওয়ালে ঝোলানো একটি ছোট্ট আলমারি—ওষুধ থাকে তার মধ্যে! এই আলমারির চালে বসানো রয়েছে দেখি হলদে মাটির নাড়ুগোপাল। সে হামাগুড়ি দিতে দিতে হঠাৎ থেমে গিয়ে ডান হাতের মস্ত নাড়ুটা এগিয়ে দিয়ে চেয়ে আছেই আমার দিকে। এই গোপাল ছেলেটির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে রোগাপানা সরু গলার একটা নীল কাচের বোতল—রাঙা, হলুদ, কালো, সাদা রঙের টিকিট আঁটা সেটার গায়ে। নাড়ু দিয়ে লোভ দেখাত মাটির হলেও নাড়ুগোপালটি। আর বিস্বাদ তেলের দু'তিন চামচ নিয়ে বসে থাকত নীল কাচের বোতলটা। রঙিন টিকিট দিয়ে ভোলাতে চাইত, কিন্তু পারত না! আর একটা জিনিসকে দেখতে পাই—আনারপুরের জালি কাপড়ে মোড়া একটা মস্ত ঢাকনা। ছোটো বোন যখন ছোটো ছিল সে এই ঢাকনে পাখির মতো ঘুমের সময় চাপা পড়ত। যখন তাকে দেখেছি তখন সেটার কাজ গেছে। খালি ঢাকনাটা তখনও কিন্তু ঘরের পশ্চিম ধারে মস্ত একটা আলমারির চালে চড়ায় বেধে যাওয়া উলটানো নৌকার ছইখানার মতো কাত হয়ে থাকে। ঘরের দক্ষিণ গায়ে দেখতে পাই তিনটে মোটা মোটা পলতোলা থাম। অন্ধকারের পর্দার উপরে মাঝের থামটা থেকে একগাছা মশারির দড়ি ঝুলছে, তার গায়ে সারিসারি মাছি বসে গেছে—কালো কালো ফুলের কুঁড়ির মতো, নড়ে না চড়ে না!

আমাদের ঘরের পশ্চিম গায়ে আর একটা ক্যাম্বিসের বেড়াঘেরা ঘর, চমৎকার করে সাজানো। মায়ের বসবার ঘর সেটা। সেখানে প্রত্যেক জিনিসটি দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট স্পষ্ট—যেখানকার যা ধরা রয়েছে, সব ঠিক ঠিক! আজও মনের মধ্যে রয়েছে—এই ঘরটার পুবদিকের দরজার কাছে একেবারে কাচের মতো পিছল কালো বার্নিশ মাখানো বাদামি টেবিল একটা পায়ে দাঁড়িয়ে। টেবিলের কিনারায় সোনালি পাড়, ঠিক মাঝে একটা পাহাড় আর সরোবরের ছবি লেখা। এই টেবিলের নিচে একটা কেমনতর কল ছিল, সেটাতে জোরে টান দিলেই টেবিলের উপরটা কাত হয়ে ফেলে দেয় বই, কাগজ, সেলায়ের বাক্স, উলবোনার কাঠি ইত্যাদি টুকিটাকি! এই টেবিলটার সামনে থাকে হলদে কাঠের ছোট্ট একখানা চৌকি ফুলকাটা কার্পেট মোড়া, ঠেলা দিলে সেটা ভাঁজ হয়ে হাত-পা গুটিয়ে হঠাৎ চ্যাপটা হয়ে পড়ে যায় মাটিতে। এই ঘরে থাকে কাঠির মতো সরু সরু পা একজোড়া ইটালিয়ান কুকুর—কাচের পুতুলের মতো ছোট্ট। কুকুর দুটো পাঁউরুটি, বিস্কুট, মুরগির ডিম খায়। আমার জন্যে পড়ে থাকে কৌচের নিচে খালি ডিমের খোলাটা। লুকিয়ে সেটা চিবিয়ে খেয়ে ধরা পড়ে যাই। হঠাৎ পিঠে পড়ে বেত, নীলমাধব ডাক্তার এসে পরীক্ষা করেন আমার হাইড্রোফোবিয়া হয় কি না; মা, পিসি, দাসী, সবাই ছি ছি করতে থাকে; বাবামশায় হুকুম দেন আমাকে মংলু মেথরের কাছে পাঠিয়ে দিতে। মেথরের সঙ্গে থাকতে হবে শুনে ভয়ে ঘৃণায় লজ্জায় কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি আমি। শেষে দেয়ালের দিকে একঘণ্টা মুখ ফিরিয়ে থাকার শাস্তিটা বাবামশায় দিয়ে চলে যান অন্য ঘরে।

তখন কুকুর দু'টোকে একদিন কি করে মেরে ফেলা যায় তারই ফন্দি আঁটি মেঝেতে পাতা মস্ত গালচের দিকে চেয়ে। এই গালচেখানাকে মনে পড়ে—বড়ো বড়ো সবজে পাতা আর সাদা ধুতরো ফুল, কালো জমির উপরে বোনা। ক'টা কৌচ নীল আর সাদা ছিট মোড়া রয়েছে এখানে ওখানে, আঁকা বাঁকা করে সাজানো। দুটো কৌচ

চন্দ্রপুলির গড়ন, আর একটি দেখতে যেন তিনটে ব্যাঙ একসঙ্গে পিঠে পিঠে জোড়া কিন্তু ঝগড়া করে তিনদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। ডবল ব্র্যাকেটের মতো করে কাটা, গোলাপী রঙের ছোপ ধরানো মার্বেল পাথরের একটা টেবিল এক কোণে রয়েছে, তার উপরে পাথরে কাটা দুটি পায়রা ফল খেতে নেমেছে—সত্যিকার মতো পাখির আর আপেলের রঙ দেখে লোভ জাগে মনে। ঘরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে বড়ো হলটাতে উঠে যাবার পাঁচ ধাপ সিঁড়ি—তারই গায়ে অনেক উপরে একটা ব্র্যাকেটে তোলা আছে, চৌকো কাচের ঢাকনা দেওয়া, গোপাল পালের গড়া লক্ষ্মী আর সরস্বতী—ছোট্ট ছোট্ট আসল মানুষের মতো রঙ করা কাপড় পরানো। দেশি কুমোরের হাতে গড়া এই খেলনা দেবতার কাছেই, দরজার উপর খাটানো চওড়া গিলটির ফ্রেমে বাঁধানো, তেল রঙ করা বিলিতি একটা মেমের ছবি। চোখ তার কালো, চুল কটা নয় একটুও, মাথায় একটা রাঙা কানঢাকা টুপি, খয়েরি মখমলের জামা হাতকাটা, সাদা ঘাঘরা পরনে। সে বাঁহাতে একটা ঝুড়ি নিয়েছে, রুমাল ঢাকা চুবড়ির মধ্যে থেকে যেন একটা সত্যিকারের কাচের বোতল গলা বার করেছে। ডান হাত রেখেছে মেয়েটা ঠিক যেন সত্যিকার মস্ত একটা কুকুরের পিঠে! কুকুর চেয়ে আছে ঝুড়ির দিকে, মেয়েটা চেয়ে আছে কুকুরের দিকে। একেবারে জল-জীয়ন্ত মানুষ আর কুকুর আর মখমল আর ঝুড়ি আর ব্র্যানডির বোতল—কিছুতেই মনে হত না সেটা ছবি নয়।

মায়ের এই বসবার ঘরের পাশেই পশ্চিম দিকে বাবামশায়ের শোবার ঘরটা নতুন করে সাজানো হচ্ছে তখন। মস্ত একটা চাবি দিয়ে সে ঘরের দরজাটা বন্ধ রয়েছে, কিন্তু জানছি সেখানে সাহেব মিস্ত্রি লাল, সাদা, হলদে, কালো নানা রকমের বিলাতি টালি কেটে বসাচ্ছে মেঝেতে—ঠুকঠাক খিটখাট ছেনির শব্দ হচ্ছেই সেখানে সারাদিন। ঘরটা যেদিন খুলল দুয়োর, সেদিন দেখি সেখানে সব ক'টা জানলা দরজার মাথায় মাথায় সোনার জল করা কার্নিস বসে গেছে, আর সেগুলো থেকে ফুলকাটা ফিনফিনে পর্দা জোড়া জোড়া ঝুলছে, সবজে আর সোনালি রেশমে পাকানো মোটা দড়ার ফাঁকে লটকানো। ঘরজোড়া পালঙ আয়নার মতো বার্নিশ করা। ঘরটার পশ্চিমমুখো জানলাটা খুলে তার ওধারটাতে বানিয়েছে অক্ষয় সাহা ইঞ্জিনিয়ারবাবু একটা গাছঘর, কাঠ আর টিন আব ঘষা কাচের সার্সি দিয়ে। সেখানে দেওয়ালগুলো আগাগোড়া গাছের ছালের টুকরো দিয়ে মুড়ে ভাগবত মালি লটকে দিয়েছে সব বিলিতি দামী পরগাছা! কোনওটা সাপের ফণার মতো বাঁকা, কোনওটার লম্বা পাতা দুটো সাপের খোলসের মতো ছিট দেওয়া ডোরাকাটা। কিন্তু এর একটা পরগাছাতেও ফুলফল কিছুই নেই, কোনওটাতে বা পাতাও নেই, কেবল সোটা আর কাঁটা।

এই গাছঘরের মাঝে একটা তিনফুকোর দালানের মতো খাঁচা। তারের টেবিল তাতে হলদে রঙের একজোড়া কেনেরি পাখি ধরা থাকে! শোবার ঘরটা তখনও নিজের সাজ সম্পূর্ণ করেনি ফুলদানি ইত্যাদি দিয়ে। শুধু সরু পাথরের তাকের সঙ্গে আঁটা গোল চুল বাঁধার আয়নাখানা মায়ের রয়েছে একটা দিকে! এই আয়নাখানাকে ঘিরে মিহি গিলটির পাড়, তাতে সবজে আর সাদা মিনকারি দিয়ে নক্সাকরা জুঁইফুল আর কচি পাতার একগাছি গোড়ে মালা। আর এরই সামনে স্ফটিক কাটা চৌকোনা একটি ফুলদানির মাঝখানে সোলার বোঁটাতে আটকানো যেন বরফকুঁচি দিয়ে গড়া ভুঁইচাপা—সোনার ডাঁটি তাকে নিয়ে ঝুঁকে পড়েছে। জলের মতো পরিষ্কার আয়নার দিকে চেয়ে ফুল দেখছে ফুলের একখানি ছায়া স্থির হয়ে!

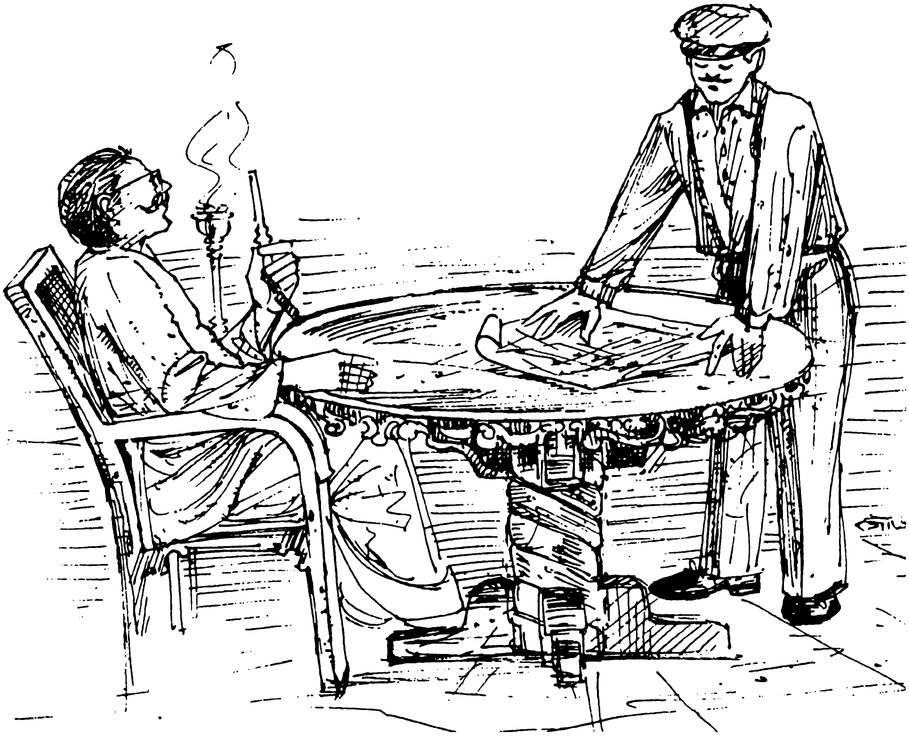
এ আমল সে আমল

ঠিক কত বয়েস তা মনে নেই কিন্তু এবারে একটা চাকর পেলেম আমি! চাকরের আসল নামটা শ্রী রামলাল কুণ্ডু, নিবাস বর্ধমান বীরভুঁই। সে কিন্তু বলত তার নাম—ছি আমনাল কুণ্ডু।

ছেলেবেলা থেকে রামলাল ছিল আমাদের ছোটোকর্তার কাছে। ঘুমের আগে খানিক পায়ে শুড়শুড়ি না দিলে ছোটোকর্তার ঘুমই আসত না, সেই সমস্ত ভার পেয়েছিল রামলাল। কিন্তু কাজে টিকতে পারলে না। সকাল থেকে সন্ধ্যা একেবারে সুনিয়মে বাঁধাচালে চলত ছোটোকর্তার কাজকর্ম সমস্তই। নিয়মের একচুল এদিক ওদিক হলে ছোটোকর্তার মেজাজ খারাপ, বুক ধড়ফড়, অনিদ্রা—এমনই নানা উৎপাত আরম্ভ হত। চাকরদের এইসব বুঝে চলতে হত, না হলেই তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত! এইসব নিয়মের গোটা কতক বলি, তাহলে হয়তো বোঝা যাবে কেন রামলাল ছোটোকর্তার পদসেবা ছেড়ে ছোটোবাবু—আমার কাছে পালিয়ে এল।

শুনেছি সেকালের বড়ো বড়ো পাথরের গোল টেবিলের বাঁকা পায়াগুলো সইতে পারতেন না ছোটোকর্তা। এক চাকরকে প্রত্যহ তোয়ালিয়া দিয়ে টেবিলের পায়া তিনটিকে ঘোমটা পরিয়ে রাখতে হত, এবং সর্বদা নজর

রাখতে হত তোয়ালিয়া বাতাসে সরে পড়ল কিনা। হুঁকোবরদার, তার কাজই ছিল যে প্রথমটানেই সটকা থেকে ধোঁয়া পান যেন কর্তা—একবারের বেশি দু'বার না টান দিতে হয়। দেওয়ালে বাঁকা ছবি থাকলে মুশকিল। ছেলেবেলা থেকে ছোটোকর্তার পা না টিপলে ঘুমই আসত না, সে জন্য ছিল বিশেষ চাকর, যার হাত পরীক্ষা করে ভর্তি করা হত কাজে—কড়া হাত না হয়। ঘুমের আগে গল্পশোনা, সকালে খবর শোনানো—এমনি নানা কাজে নানা লোক ছিল। সব চেয়ে শক্ত কাজ তার—যাকে বারোমাসই ছোটোকর্তার আচমনের জল দিতে হত। কর্তার অভ্যাস ছেলেবেলা থেকেই—এক আঁজলা জল চাকরের গায়ে ছিটোতে হবে! তোপ পড়ার সঙ্গে ছোটোকর্তা একবার হাঁচবেনই, যেদিন হাঁচি এল না সেদিন ডাক্তারের ডাক পড়ল।



ছোটোকর্তার এইসব অকাট্য নিয়মের কোনটা ভঙ্গ করে যে রামলাল বরখাস্ত হয়েছিল তা সেও বলেনি, আমিও জানিনে। রামলাল যখন এল আমার কাছে তখন সে ছোকরা আর আমি কত বড়ো মনেই পড়ে না, শুধু এইটুকু মনে আছে—আমি ধরা আছি তখনও আমাদের তিনতলার মাঝের হলটাতে। আশপাশের ঘরগুলো থেকে পাঁচ সাতটা ধাপ উঁচুতে এই হলটা। মস্ত ছাত, বারোটা পলতোলা মোটা মোটা থামের উপর ধরা, থামের মাঝে মাঝে লোহার রেলিঙ। কড়ি বরগা থাম জানলা দরজার বাহুল্য নিয়ে মস্ত ঘরটা যেন একটা অরণ্য বলে মনে হত! সেকালের বড়ো বড়ো ঝাড় লণ্ঠন ঝোলাবার হুক আর কড়া—সেগুলোকে দেখে মনে হত যেন সব টিকটিকি আর বাদুড় ঝুলে আছে মাথার উপরে—দিনের পর দিন একভাবেই আছে তারা!

এই অনেক দ্বার, অনেক থাম, অনেক কড়ি-বরগা, প্রাচীর আর লোহার রেলিঙ-ঘেরা স্থানটা, এর মধ্যে মস্ত খাঁচায় ধরা ছোট্ট জীব—খাই দাই আর ঘুমোই! এই খাঁচার বাইরে কি ঘটে চলেছে, কি বা আছে, কিছুই জানার উপায় নেই! এক একবার চারদিকের জানলা ক'টা খুলে যায়—আলো আসে, বাতাস আসে, আবার ঝুপঝাপ বন্ধ হয় জানলা—এই করেই জানি সকাল হল, দুপুর এল, বিকেল হল, রাত হল।

সম্পূর্ণ ছাড়া পাইনি তখনও আকাশের তলায়, চলতে ফিরতেও পারিনে ইচ্ছামত। বাড়ির অন্য অংশগুলো থেকেও আলাদা করে ধরা তাই। দাসী দু'একটা কখনও কখনও বসে একে ঘরটায়, তাদের দেশের কথা বলাবলি

করে, মনিবদের গালাগালিও দেয় চুপিচুপি! একটা কালো বেড়াল, রোজই সন্ধ্যায় দেখা দেয়—কি খুঁজতে সে আসে কে জানে—এদিক-ওদিক চেয়ে আস্তে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়! খাট-পালঙগুলো নড়ে না চড়ে না—দিনের বেলায় বালিশ আর তোশকের পাহাড় সাজিয়ে বসে থাকে, আর সন্ধ্যা হলে মশার ভনভনানির মধ্যে ধুনোর ধোঁয়াতে মশারির ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। কেমন একটা ফাঁকা ফাঁকা ভাব জাগায় আমার মনে এই ঘরটা। বৈচিত্র্য নেই বললেই হয় ঘরটার মধ্যে। কল্পনা করবারও কিছু নেই এখানটায়!

এই অবিচিত্র ফাঁকার মধ্যে রামলাল যখন আমাকে তার বাবু বলে স্বীকার করে নিলে তখন ভারি একটা আশ্বাস পেলেম। মনে আহ্লাদও হল—এতদিনে নিজস্ব কিছু পেলেম আমি! রামলাল আসার পর থেকেই বাড়ির আদব-কায়দাতে দোরস্ত হয়ে ওঠার পালা শুরু হল আমার। একজন যে ছোটোকর্তা আছেন, তাঁর যে একটা মস্ত বাড়ি আছে অনেক মহলা, সেখানে যে পূজায় যাত্রা বসে মথুর কুণ্ডুর—এ সব জানলেম! অমনি না-দেখা বাড়ি না-দেখা মানুষদের দিয়ে পরিচয় আরম্ভ হয়ে গেল বাইরেটাতে আর আমাতে! এই সময়টাতেই আরব্য উপন্যাসের এক টুকরোর মতো এই তিনতলার ঘরটার আগের কথা এবং আগের ছবিটাও পেয়ে গেলাম কার কাছ থেকে তা মনে নেই। এই বাড়িটাকে সবাই ডাকে তখন 'বকুলতলার বাড়ি' বলে। শুনেছি বাড়ি ছিল আগে একতলা বৈঠকখানা। এর দক্ষিণের বাগানে ছিল মস্ত একটা বকুলগাছ—পাঁচপুরুষ আগে। সেই গাছের নামে বাড়িখানা 'বকুলতলার বাড়ি' বলে চলছে—আমি যখন এসেছি তখনও! এমনি ছেলেবেলায় চোখে দেখছি যে মস্ত হলটাকে একবারেই ফাঁক, শোনাকথার মধ্যে দিয়ে কল্পনাতে সেই বাল্যকালেই দেখতে পাই হলঘরটাতে সুসজ্জিত, যখন লক্ষ্মী অচলা হয়ে আছেন কর্তার কাছে দিনরাত তখনকার আমলে।

সেই কালের এই হল—হল বললে ঠিক ভাবটা বোঝায় না—চণ্ডীমণ্ডপ তো নয়ই—বারো দোয়ারীর কতকটা আভাস দেয়—কিন্তু ঠিক বুঝি যদি ভেবে নিই, একটা মস্ত জাহাজের ডেক, তিনতলার উপরে জল থেকে তুলে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে! প্রমাণের অতিরিক্ত মোটা মোটা লম্বা লম্বা কড়ি থাম জানলা দরজা এবং আলো হাওয়া আসবার জন্যে আবশ্যকের চেয়ে বেশি পরিমাণ ফাঁক দিয়ে প্রস্তুত আমাদের এই তিনতলার মাঝের ঘরটা! বাইরেটাকে একটুও না ঠেকিয়ে অথচ বাইরের উৎপাত রোদ, বৃষ্টি, লোকের দৃষ্টি ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ আগলে অদ্ভুত কৌশলে প্রস্তুত করে গেছে ঘরখানা কোন্ এক সাহেব মিস্ত্রী—সেই নেপোলিয়ানের আমলের অনেক আগে!

এই সাহেবকে আমি যেন দেখতে পাচ্ছি—পরচুল পরা, বেণী বাঁধা, কাঁসির মতো মস্ত গোল টুপিটা মাথায়, গায়ে খয়েরি রঙের সাটিনের কোট, পায়ে বার্নিশের জুতো বকলস দেওয়া, শর্ট প্যান্ট, হাঁটুর উপর পর্যন্ত মোজায় ঢাকা, গলায় একটা সিল্কের রুমাল ফুলের মতো ফাঁপিয়ে বাঁধা! সাহেব এসে উপস্থিত আমাদের কর্তার কাছে পালকি চড়ে! কর্তা সটকায় তখন তামাক খাচ্ছেন হাউসে যাবার পূর্বে। সাহেব মস্ত গোল পাথরের টেবিলে মস্ত একখানা বাড়ির নক্সা মেলে ধরেছে, আর একটা পালকের কলমের উল্টো দিক নক্সার উপরে টেনে টেনে কর্তা সাহেবকে বোঝাচ্ছেন এ দেশের নাচঘর, বৈঠকখানা, তাওখানা প্রভৃতির সঠিক হিসাব। কর্তা বসে, সাহেব দাঁড়িয়ে। এখন হলে একটা মস্ত বেআদবি ঠেকত, কিন্তু তখনই এইটেই ছিল চাল এবং চল। সাহেব-ইঞ্জিনিয়ার তখন লিখত নিজের নাম ইংরিজিতে কিন্তু নিজের পেশাটা লেখা থাকত সুন্দর বাংলায়—যেমন মিস্টার জর্জ এডওয়ার্ডস ইভস উপরে, নিচে লেখা 'গৃহনির্মাণকর্তা'!

কর্তা ছিলেন ক্রোড়পতি ব্যবসায়ী সওদাগর এবং ঐশ্বর্যের সঙ্গে মান-মর্যাদার ইয়ত্তা ছিল না কর্তার। সুতরাং খাস মজলিসের স্থানটা কেমনতর হওয়া উচিত তা যেন সাহেব মিস্ত্রী বুঝে নিয়েই করেছিল সূত্রপাত এই তিনতলার ঘরটার। আলো, বাতাস, জাহাজ, ঘর—সমস্তকে একটা চমৎকার মতলবের মধ্যে সে ঘিরে নিয়ে বানিয়ে গেছে!

এই হল—ঐশ্বর্যের গৌরবের জোয়ারের চিহ্ন ধরে ধরে একতলা থেকে যখন উঠল ক্রমে আশি ফুট উপরে তখন পৃথিবীতে আমি নেই, কিন্তু শোনা-কথার মধ্যে দিয়ে তখনকার ব্যাপার যেন স্পষ্ট দেখতে পাই!—কর্তার খাশ মজলিস বসেছে রাতের বেলা আমার থেকে চারপুরুষ পূর্বের এই হলটাতে।

দক্ষিণের চল্লিশফুট ফালিঘরে পড়েছে সাহেবসুবোর জন্যে রাত্রিভোজের টেবিল অনেকগুলো। টেবিলের উপরে চীনের বাসন থরেথরে সাজানো। সব বাসনেই সোনার জল করা রঙিন ফুলের নক্সা। প্রত্যেক বাসনে কর্তার নামের তিনটে অক্ষরের সোনালি ছাপমারা। ঝকঝক করছে রুপোর সামাদনে মোমবাতি। খানসামা সবাই জরি দেওয়া লাল বনাতের উর্দি পরা, কোমরে একখানা করে রুমাল।

উত্তরের দিকে একটা বারান্দা—সেখানে আহারের পর আরামে বসে তামাক খাবার ব্যবস্থা রয়েছে—সেখানটাতে হুঁকোবরদার বড়ো বড়ো সোনা রুপোর সটকাতে তামাক সেজে প্রস্তুত, বড়ো সিঁড়ির উপরে চোবদার খাড়া, আসাসোটা হাতে স্থির যেন পুতুল! মানুষ প্রমাণ উঁচুতে থাম আর রেলিঙ ঘেরা বড়ো হল—লোকলস্কর থেকে পৃথক করা উঁচু জায়গাটা ঝাড়ে, লণ্ঠনে, বাতির আলোয় জমজমাট! ঘরজোড়া প্রকাণ্ড একখানা গালিচা—ঘন লাল আর সাদা ফুলের কারিগরি তাতে।

ঘরের পুব-পশ্চিম দুটো বড়ো দেওয়ালে দু'খানা বড়ো বড়ো অয়েল পেনটিং—সাহেব ওস্তাদের আঁকা—বরবেশে এই বংশেরই এক ছেলে আর পেশওয়াজ পরা একটি মেয়ে, দু'জনেই হীরে মানিক আর কিংখাবে মোড়া। এই এখন যেমন খোট্টাদের বর-সাজ তেমনি ধরনের সাজসজ্জা দুজনেরই।

গালিচার উপরে মেহগনি কাঠের বাঘ-থাবা, বাঘমুখো গঠনের কৌচ কেদারা তেপায়া, একটার মতো অন্যটা নয়! আরামে বসার জন্যেই তৈরি এই সব কৌচ কেদারায় সেই সেকালের লাট বেলাট সাহেব সওদাগর ও চৌরঙ্গির বাসিন্দা—তারা বড়ো বড়ো সটকায় তামাক টানছে, আর তয়ফার নাচ দেখছে গম্ভীর হয়ে বসে! সব সাহেবই পাউডার মাখানো পরচুলধারী। হাতে রুমাল আর নস্যদানি! দু'সারি উর্দিপরা ছোকরা ক্রমান্বয়ে বড়ো বড়ো পাখার বাতাস দিচ্ছে তাদের, আর মজলিসে রুপোর সালবোটে সোনারুপার তবক মোড়া পান বিলি করে চলেছে। আতরদানি গোলাপপাশ ফিরিয়ে চলেছে হরকরা তারা।

পাশের একটা খাস কামরা—উত্তর দক্ষিণ ও পুব তিনদিক খোলা—সেখানে কর্তার সঙ্গে মুরুব্বি সাহেব দু'চারজন বসে। সারিসারি খোলা জানলায় দেখা যায় রাতের আকাশ—যেন কারচোপের বুটি দেওয়া নীল পর্দা অনেকগুলো।

পুবের ক'টা জানলার ফাঁকে ফাঁকে দেখা দেয়—খালপারের নারকেল গাছের সারি, তার উপরে চাঁদ উঠেছে—যেন কানা-ভাঙা সোনার একটা আবখোরার টুকরো।

পশ্চিমের খোলা জানলায় দেখা যাচ্ছে সেকালের সওদাগরি জাহাজের মাস্তুলগুলো, ঘেঁষাঘেঁষি ভিড় করে দাঁড়িয়ে। উত্তরে—সেকালের শহর ও বাড়ির অরণ্য একটা।

যে তিনতলার উপর উত্তর-পশ্চিম থেকে বয় গঙ্গার হাওয়া, পুব দিয়ে আসে বাদলের ঠাণ্ডা বাতাস, উত্তর জানলায় শীতের খবর আসে, দক্ষিণ বাতায়নে রহে রহে বয় সমুদ্রের হাওয়া, সেখানটাতে একটা রাত নয়—আরব্য উপন্যাসের অনেকগুলো রাতের মজলিসের আলো, সারি সারি খোলা জানলা হয়ে বাইরে রাতের গায়ে ফেলত একটার পর একটা সোনালি আভার সোজা টান। আর সমস্ত তিনতলাটা দেখাত যেন মস্ত একটা নৌকা অনেকগুলো সোনার দাঁড় কালো জলে ফেলে প্রতীক্ষা করছে বন্দর ছেড়ে বার হবার হুকুম ও ঘণ্টা। এ যারা তখন আশেপাশের বাড়ির ছাদে ভিড় করে দাঁড়িয়ে কর্তার মজলিসের কাণ্ডখানা সত্যি দেখেছে তাদের মুখে শোনা কথা।

আমি যখন এসেছি—তখন স্বপ্নের আমল, আরব্য উপন্যাসের যুগ বাঙলা দেশ থেকেই কেটে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের তখন আরম্ভ। 'গুলব কাওলী', 'ইন্দ্রসভা', 'হোমার', এ সব বইগুলো পর্যন্ত সরে পড়বার যোগাড় করেছে—এই সময় রামলাল চাকরের সঙ্গে বসে দেখি, দুই দেয়ালে দুই সেই সেকালের ছবির দিকে!—বড়ো বড়ো চোখ নিয়ে ছবির মানুষ দুটি চেয়ে আছে, মুখে দু'জনেরই কেমন একটা উদাস ভাব ছবির গায়ে আঁকা। হীরে মুক্তোর জড়োয়া সাজসজ্জা যেন কত কালের কত দূরের বাতির আলোতে একটু একটু ঝিকঝিক করছে। আমি অবাক হয়ে এখনও এই ছবি দেখি আর ভাবি কি সুন্দর দেখতেই ছিল তখনকার ছেলেরা মেয়েরা; কি চমৎকার কত গহনায় সাজতে ভালোবাসত তারা।

কল্পনা নিয়ে থাকার সুবিধে ছিল না তখন, কেননা রামলাল এসে গেছে এবং আমাকে পিটিয়ে গড়বার ভার নিয়ে বসেছে! বুঝিয়ে-সুজিয়ে মেরে-ধরে, এ বাড়ির আদবকায়দা দোরস্ত করে তুলবেই আমাকে, এই ছিল রামলালের পণ! ছোটোকর্তা ছিলেন রামলালের সামনে মস্ত আদর্শ, কাজেই এ কালের মতো না করে, অনেকটা সেকেলে ছাঁচে ফেললে সে আমাকে—দ্বিতীয় এক ছোটোকর্তা করে তোলার মতলবে!

ছোটোকর্তা ছুরি কাঁটাতে খেতেন, কাজেই আমাকেও রামলাল মাছের কাঁটাতে ভাতের মণ্ড গেঁথে খাইয়ে সাহেবি দস্তুরে পাকা করতে চলল; জাহাজে করে বিলেত যাওয়া দরকার হতেও পারে, সে জন্য সাধ্যমতো রামলাল ইংরিজির তালিম দিতে লাগল—ইয়েস নো বেরি ওয়েল, টেক ইত্যাদি নানা মজার কথা।

কোথা থেকে নিজেই সে একখানা বাঁশ ছুলে কাগজে কাপড়ে মস্ত একটা জাহাজ বানিয়ে দিলে আমাকে—

সেটা হাওয়া পেলে পাল ভরে আপনি দৌড়োয় মাটির উপর দিয়ে। এই জাহাজ দিয়ে, আর হাঁসের ডিমের কালিয়া দিয়ে ভুলিয়ে, খানিক বিলাতি শিক্ষা, সওদাগরি ব্যবসা কারিগরি, রান্না, জাহাজ গড়া, নৌকার ছই বাঁধা ইত্যাদি অনেক বিষয়ে পাকা করে তুলতে থাকল আমাকে রামলাল!

তিনতলার ঘরটায়—সেখানে বড়ো কেউ একটা আসত না কাছে, থাকত রামলাল তার শিক্ষাতন্ত্র নিয়ে, আর আমি তারই কাছে কখনও বসে, কখনও শুয়ে, কড়িকাঠের দিকে চেয়ে, সেকালের ঝাড় ঝোলানোর মস্ত হুকগুলো সারিসারি হেঁটমুণ্ড কিম্বাচক চিহ্—¿¿¿¿¿¿¿—চেয়ে দেখত রামলালকে আমাকে মেঝের উপর সেই ঘরে। সেখান থেকে ঝাড়-লণ্ঠন কার্পেট কোদারার আবরু অনেক কাল হল সরে গেছে।

এ বাড়ি ও বাড়ি

কেবলই দূর থেকে জগৎটাকে দেখে চলার অবস্থাটা কখন যে পেরিয়ে গেলেম তা মনে নেই। আমাদের বাড়ির পাশেই পুরনো বাড়িতে প্রহরে প্রহরে একটা পেটা ঘড়ি বাজত বরাবরই। এবং ঘড়ির শব্দটাও এ তল্লাটের সবার কানে পৌঁছত, কেবল আমারই কাছে তখন ঘড়ির শব্দ বলে একটা কিছু ছিল না। এমনই বাড়ির মানুষদের বেলাতেও—এপারে আমি ওপারে তাঁরা! অপরিচয়ের বেড়া কবে কেমন করে সরল—সেটা নিজেই সরালেম কি রামলাল চাকর এসে ভেঙে ফেলে দিলে সেটা, তা ঠিক করা মুশকিল!

রামলাল আসার পর থেকে অন্দরের ধরাবাঁধা থেকে ছাড়া পেলেম! বাড়ির দোতলা একতলা এবং আস্তে আস্তে ও বাড়িতেও গিয়ে ঘুরিফিরি তখন। চোখ-কান হাত-পা সমস্তই যখন আশেপাশের পরিচয় করে নিচ্ছে, সে বয়েসটা ঠিক কত হবে তা বলা শক্ত—বয়েসের ধার তখন তো বড়ো একটা ধারিনে, কাজেই কত বয়স হল জানবারও তাড়া ছিল না! এই যখন অবস্থা, তখন কতকগুলো শব্দ আর রূপ একসঙ্গে, যেন দূরে থেকে এসে আমার সঙ্গে পরিচয় করে নিতে চলেছে দেখি! জুতো, খড়ম, খালি পা জনে জনে রকম রকম শব্দ দেয়। তাই ধরে প্রত্যেকের আসা যাওয়া ঠিক করে চলেছি। দাসী চাকর কেউ আসছে, কেউ যাচ্ছে—কাঠের সিঁড়িতে তাদের এক একজনের পা এক একরকম শব্দ দিয়ে চলেছে। এই শব্দগুলো অনেক সময় শাস্তি এড়ানোর পক্ষে খুব কাজে আসত। বাবামশায় লাল রঙের চামড়ার খুব পাতলা চটি ব্যবহার করতেন। তাঁর চলা এত ধীরে ধীরে ছিল যে অনেক সময়ে হঠাৎ সামনে পড়তেম তাঁর। একদিনের ঘটনা মনে পড়ে। সিঁড়ির পাশেই বাবামশায়ের শয়নঘর, আমি সঙ্গী কাউকে হঠাৎ চমকে দেবার মতলবে দু'খানা দরজার আড়ালে লুকিয়ে আছি, এমন সময়ে দেয়ালে ছায়া দেখে একটা হুঙ্কার দিয়ে যেমন বার হওয়া দেখি সামনেই বাবামশায়! এখনকার ছেলেদের হঠাৎ বাবা দাদা কিম্বা আর কোনও গুরুজনের সামনে এসে পড়াটা দোষের নয়, কিন্তু সেকালে সেটা একটা ভয়ঙ্কর বেদস্তুর বলে গণ্য হত। সেবারে আমার কান আমাকে ঠকিয়ে বিষম মুশকিলে ফেলেছিল।

এমনি আর একটা শব্দ পাখিরা জাগার আগে থেকেই শোবার ঘরে এসে পৌঁছত। ভোর চারটে রাত্রে, অন্ধকারে তখন চোখদুটো কিছুই দেখছে না অথচ শব্দ দিয়ে দেখছি—সহিস ঘোড়ার গা মলতে শুরু করেছে, শব্দগুলোকে কথায় তর্জমা করে চলত মন অন্ধকারে—গাধুসনে গাধুসনে, চটপট, হঠাৎ খাটখোট চাবকান পঠাৎ পঠাৎ, গাধুস গাধুস খাটিস খুটিস চটপট! এই রকম সহিসে ঘোড়ায়, সহিসের হাতের তেলোতে, ঘোড়ার খুরে মিলে কতকগুলো শব্দ দিয়ে ঘটনাকে পাচ্ছি। এমনি একটা গানের কথা আর সুর দিয়ে পেয়ে যেতেম সময়ে সময়ে একজন অন্ধ ভিখারিকে। লোকটি চোখের আড়ালে, কিন্তু গানটা ধরে আসত সে নিকটে একেবারে তিনতলায় উঠে। ভিখারির গানের একটা ছত্র মনে আছে এখন—'উমাগো, মা তুমি জগতের মা, ওমা কি জন্যে তুমি আমায় মা বলচো!' সন্ধেবেলায় খিড়কির দুয়োরে একটা মানুষ এসে হাঁক দেয়—'মুশকিল আসান'! কথাটার অর্থ উল্টো বুঝতেম—ভয়ে যেন হাতপা কুঁকড়ে যেত; গা ছমছম করত আর সেই সঙ্গে পাকা দাড়ি, লম্বা টুপি, ঝাপ্পা-ঝোপ্পা কাপড়-পড়া ভুতুড়ে একটা চেহারা এসে সামনে দাঁড়াত দেখতেম! বেলা তিনটের সময় একটা শব্দ—সেটা সুরেতে মানুষেতে এক সঙ্গে মিলিয়ে আসত—'চুড়ি চাই, খেলোনা চাই'—এবারে কিন্তু মানুষটার চেয়ে পরিষ্কার করে দেখতে পেতেম—রঙিন কাচের ফুলদান, গোছাবাঁধা চুড়ি, চীনেমাটির কুকুর বেড়াল।

বরফওয়ালার হাঁক, ফুলমালির হাঁক এমনই অনেকগুলো হাঁক-ডাক এখন শহর ছেড়ে পালিয়েছে এবং তার জায়গায় মোটরের ভেঁপু, ট্রামগাড়ির হুস্-হাস্, টেলিফোনের ঘণ্টা এসে গেছে শহরে!

কোন বয়েস থেকে দেখাশোনা আরম্ভ, কখনই বা শেষ সে হিসেব বেঁচে থাকতে কষে দেখার মুশকিল আছে, তবে জনে জনে দেখাশোনায় প্রভেদ আছে বলতে পারি। আমাদের পুরনো বাড়িতে পেটা-ঘড়িটা বাজছে যখন শুনতে পেলেম তখন তার বাজনের হিসাবের মজাটা দেখতে পেলেম। সকালে উপরো-উপরি ছ'টা সাতটা, সাড়ে সাতটা বাজিয়ে ঘড়িটা থামত। তারপরে আটটা ন'টা দু'ঘণ্টা ফাঁক। ফের উপরি উপরি দশ আর সাড়ে দশ বাজিয়ে স্নান আহার করে যেন ঘুম দিলে ঘড়িটা দুপুর বেলায়। উঠল বিকেলে, চার ও পাঁচ বাজিয়ে! ঘড়ির এই রকম খামখেয়ালি চলার অর্থ তখন বুঝতেম না। সকালের ঘড়ি—ঘুম ভাঙাবার জন্যে, সাতটার ঘড়ি উপাসনার জন্যে, সাড়ে সাত হল মাস্টার আসার, পড়তে যাবার ঘড়ি। দশ স্নানাহারের; সাড়ে দশ, ইস্কুল ও আপিসের; চার, বৈকালিক জলযোগের, কাজকর্ম ও কাছারি বন্ধের; পাঁচ, হাওয়া খেতে যাবার! ঘুমোতে যাবার ঘণ্টা একটা, দশটা কি ন'টায় বোধহয় বাজত না—কেননা তখন ঠিক ন'টা রাত্রে কেল্লা থেকে তোপ দাগা হত আর আমাদের বৈঠকখানায় ঈশ্বরদাদা 'বোমকালী' বলে এক হুঙ্কার দিতেন, তাতেই পেটাঘড়ির কাজ হয়ে যেত। বেলা একটার তোপ পড়লেই করকর ঘরঘর ঘড়ির চাবি ঘোরার ধুম পড়ত বাড়িতে, ও সময়টাতেও পেটা-ঘড়ির দরকারই হত না। এই ঘড়ির হুকুমে দেখি বাড়ির গাড়ি-ঘোড়া চাকর-বাকর ছেলেমেয়ে সবাই চলে, হাঁড়ি চড়ে হাঁড়ি নামে, মাস্টারমশাই বই বন্ধ করেন!



ও বাড়ির এই পেটা-ঘড়িটাকে এক একদিন দেখতে চলতেম। পুরনো বাড়ির উঠানের দাওয়ায় উঠতে বাঁ ধারে একটা খিলেনের মাঝে ঝোলানো থাকত ঘড়িটা! দেখতেম শোভারাম জমাদার সেখানটাতে বসে ময়দা ঠাসছে—চকচকে একটা লোটা হাতের কাছেই রয়েছে, থেকে থেকে সেটা থেকে জল নিয়ে ময়দার নুটিগুলো ভিজিয়ে দিচ্ছে আর দু'হাতের চাপড়ে এক একখানা মোটা রুটি ফসফস গড়ে ফেলছে। বেশ কাজ চলছে, এমন সময় শোভারাম হঠাৎ রুটি গড়া রেখে, ঘড়িটাকে মস্ত একটা কাঠের হাতুড়ি দিয়ে ঘা কয়েক পিটুনি কষিয়ে কাজে বসে গেল। দেখে দেখে আমার ইচ্ছে হত রুটি গড়তে লেগে যাই; আবার তখনই ঘড়িটা বাজিয়ে নেবার লোভ জন্মাত। হাতুড়িটায় হাত দেওয়া মাত্র জমাদারজী ধমকে উঠত—নেহি, কর্তা মহারাজ খাপ্পা হোয়েঙ্গা!

কর্তা মহারাজ, কে তিনি, জানবার ভারি ইচ্ছে হত। তখন কর্তাদাদামশায় দোতলার বৈঠকখানায় থাকেন, তাঁর ঘরের দরজায় কিনুসিং হরকরা—উর্দি পরে বুকে 'ওয়ার্কস উইল উইন' আর হাতির পিঠে নিশেন চড়ানো তকমা না ঝুলিয়ে, মোটা রুপোর সোঁটা হাতে টুলে বসে পাহারা দেয়, হাতে একটা পেনসিল-কাটা ছুরি, কর্তাকে সহজে দেখার উপায় নেই!

দেখতেন কর্তা পাহাড় থেকে ফিরে যে ক'দিন বাড়িতে আছেন সে ক'দিন সব যেন চুপচাপ। দরোয়ান 'হারুয়া, হারুয়া' বলে হাঁকডাক করতে সাহস পায় না ফটকে, গাড়িবারান্দায় গাড়ি-ঘোড়া ঢোকে বেরোয় সোয়ারি নিয়ে ধীরে ধীরে; বাবামশায়, মা, পিসি-পিসে, এ বাড়ি ও বাড়ির সবাই যেন সর্বদা তটস্থ। চাকর-চাকরানীদের চেঁচামেচি ঝগড়াঝাটি বন্ধ, সবাই ফিটফাট হয়ে ঘোরাফেরা করছে যেন ভালমানুষটির মতো!

এই সব দেখেশুনে কর্তার নাম হলে কেমন যেন একটু ভয় ভয় করত। কর্তাদাদামশায়কে একবার কাছে গিয়ে দেখে নেবার লোভ, কর্তার সামনাসামনি হয়ে তাঁর ঘরখানা দেখারও কৌতূহল থেকে থেকে জাগত মনে! কর্তার ঘরে ঢুকতে সাহসে কুলতো না। কিন্তু চুপি চুপি ঘরের দিকে অনেক সময়ে এগিয়ে যেতেম। দারোয়ান সব সময়ে পেটা-ঘড়িকে পাহারা দিয়ে বসে থাকত না, সিদ্ধি ঘোঁটার সময় ছিল তার একটা। সেই একদিন একদিন ঘড়ির সঙ্গে ভাব করতেও এগিয়ে যেতেম। পাছে ধরা পড়ি সেই ভয়ে হাতুড়ি তোলার অবসর হত না, দুই হাতে ঘড়িটাকে চাপড় কষিয়ে দিতেম। দড়িতে বাঁধা ঘড়ি লাটিমের মতো ঘুরতে থাকত, যেন একঝাঁক ভীমরুলের মতো গুমরে উঠত রেগে। ঘড়ির শব্দ আকস্মিক একটা ভয় লাগত—কর্তা বুঝি শুনলেন, দরোয়ান এল বুঝি-বা। ঘড়ির কাছে থাকা নিরাপদ নয় জেনে এক ছুটে আমাদের তিনতলার ঘরে হাজির হতেম; তারপর সারাক্ষণ যেন দেখতেম—দারোয়ান কর্তার কাছে আমার নামে নালিশ করছে; সঙ্গে সঙ্গে কর্তা ডাকলে কী কী মিছে কথা বলতে হবে তার ফর্দ একটাও তৈরি করে চলত মন তখন।

কর্তামশায় সব সময়ে বাড়িতে থাকেন না—বোলপুরে যান, সিমলের পাহাড়ে যান—আবার হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না বলে ফিরে আসেন। হঠাৎ নামেন কর্তা গাড়ি থেকে ভোরে, দরোয়ানগুলো ধড়মড় করে খাটিয়া ছেড়ে উঠে পড়ে, এবাড়ি ওবাড়ি সাড়া পড়ে যায়—কর্তা এসেছেন! এই সময়টাও দেখতেম—আমাদের বৈঠকখানায় দু'বেলা গানের মজলিস খুব আস্তে চলেছে। কাছারি বসছে নিয়মিত দশটা-চারটে। দক্ষিণের বাগানে বৈকালে বিশ্বেশ্বর হুঁকোবরদার বড়ো বড়ো রুপোর আর কাচের সটকাগুলো বার করে দেয় না। বিলিয়ার্ড রুমে আমাদের কেদারদাদার হাঁক-ডাক একেবারে বন্ধ। যত সব গম্ভীর লোক, তাঁরা পুরনো বাড়িতে সকাল-সন্ধ্যা আসা যাওয়া করেন—কেউ গাড়িতে, কেউ বা হেঁটে। আমাদের উপর হুকুম আসে যেন গোলমাল না হয়, কর্তা শুনতে পাবেন। চাকরগুলো কড়া নজর রাখে—খালি পা, কি ময়লা কাপড়ে আছি কিনা। পাঠান কুস্তিগীর ক'জন খুব কষে মাটি মেখে নিয়মিত কসরত করতে লেগে যায়। বুড়ো খানসামা গোবিন্দ, সেও ভোরে ভোরে উঠে কর্তার জন্য দুধ আনতে গোয়াল ঘরে গিয়ে ঢোকে!

এই গোবিন্দ ছিল কর্তার চাকর। এর একটা মজার কাহিনী মনে পড়ছে। ভোরে উঠে গোবিন্দ কর্তার জন্যে দুধ নিয়ে ফিরছে, ঠিক সেই সময় পথ আগলে পাঠান সর্দার দুটো কুস্তি লাগিয়েছে। গোবিন্দ যত বলে পথ ছাড়তে, পাঠান তারা কানই দেয় না। পাঠান নড়ে না দেখে, গোবিন্দ একটু চটে উঠে অথচ গলার সুর খুব নরম করে বলে—'পাঠান ভাই, রাস্তা ছাড়ো! শুনতা, ও পাঠান ভাই! দেখো, পাঠান ভাই, কাঁদের ওপোর ছাগল নাপাতা হ্যায়, হাতে দুধের ঘট্টে হ্যায়, দুধটা পড়ে যাবে তো জবাবদিহি করবে কে?'

কর্তা বাড়ি এলে বাড়ি দুটো ঢিলেঢালা ঝিমন্ত ভাব ছেড়ে বেশ যেন সজাগ হয়ে উঠত। আবার একদিন দেখতেম কর্তা কখন চলে গেছেন, বাড়ির সেই আগেকার ভাবটা ফিরে এসেছে। দারোয়ান হাঁকাহাঁকি শুরু করেছে, আমাদের ছিরে মেথরে আর বুড়ো জমাদারে বিষম তকরার বেধেছে। জমাদার লাঠি নিয়ে যত ঝেঁকে ওঠে, ছিরে মেথর ততই নরম হয়। জমাদারের দুই পা জড়িয়ে ধরবে এমনি ভাবটা দেখায়। তখন জমাদারজী রণে ভঙ্গ দিয়ে তফাতে সরেন, ছিরেও বুক ফুলিয়ে বাসায় গিয়ে ঢুকে তার বউটাকে প্রহার আরম্ভ করে। আরও চেঁচাচেঁচি বেধে যায়। ওদিকে দাসীতে দাসীতে ঝগড়া—তাও শুরু হয় অন্দরে। বৈঠকখানাতে গানের মজলিস জাঁকিয়ে অক্ষয়বাবু গলা ছাড়েন। আমাদেরও হুটোপাটি আরম্ভ হয়ে যায়! কর্তা না থাকলে বাঁধা চালচোল এমনই আলগা হয়ে পড়ে যে, মনে হয়, ঘড়িতে হাতুড়ি পিটিয়ে চললেও দারোয়ান কিছুই বলবে না! কর্তার গাড়ি ফটক পেরিয়ে যাওয়া মাত্র, ইস্কুল থেকে ছুটি পাওয়া গোছের হয়ে পড়ত বাড়ির এবং বাড়ির সকলের ভাবটা।

শীতকালে যেবারে কর্তাদাদামশায় বাড়ি থাকতেন সেবারে মাঘোৎসব খুব জাঁকিয়ে হত। একটা উৎসবের কথা মনে আছে একটু—সেবারে সঙ্গীতের আয়োজন বিশেষভাবে করা হয়েছিল। হায়দারাবাদ থেকে মৌলাবক্স সেবারে জলতরঙ্গ বাজনা এবং গান করতে আমন্ত্রিত হন।

সকাল থেকে বাড়ি গাঁদা ফুল, দেবদারু পাতা, লাল বনাত, ঝাড় লণ্ঠন, লোকজন, গাড়ি-ঘোড়াতে গিসগিস করছে। আমাদের মুখে এককথা—মৌলাবাকসোর বাজনা হবে! সকাল থেকেই খানিক সিন্দুক, খানিক বাকসো মিলিয়ে একটা অদ্ভুত গোছের মানুষের চেহারা যেন চোখে দেখতে থাকলেম। এখনকার মতো তখন টিকিট হত না—নিমন্ত্রণপত্র চলত বোধহয়। ছেলেদের পক্ষে উৎসব সভাতে হঠাৎ যাওয়া হুকুম না পেলেও অসম্ভব ছিল, অথচ মৌলাবাকসোর গান না শুনলেও নয়। কাজেই হুকুমের জন্য দরবার করতে ছোটা গেল সকালে উঠেই। আমাদের ছোটোখাট দরবার শোনাতে এবং শুনে তার একটা বিহিত করতে ছিলেন ও বাড়ির বড়ো পিসেমশায়। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে সাফ জবাব পাওয়া মুশকিল হল সেদিন। 'দেখব—দেখব' বলে তিনি আমাদের বিদায় দিলেন, তারপর সারাদিন তাঁর আর উচ্চবাচ্য নেই।

উৎসবে যাওয়া কি না যাওয়ার বিষয়ে যখন না যাওয়াই স্থির হয়ে গেছে নিজের মনে, তখন রামলাল চাকর এসে বললে—'হুকুম হয়েছে, চটপট কাপড় ছেড়ে নাও!' এখনও টিকিটের দরবারে ছোকরাদের ও বাড়ির দরজায় যখন ঘুর ঘুর করতে দেখি তখন আমার সেই দিনটার কথাই মনে আসে!

মৌলাবাকসোকে একটা অদ্ভুতকর্মা গোছের কিছু ভেবেছিলেম—জলতরঙ্গ ও কালোয়াতী গানের ভালোমন্দ বিচারশক্তি ছিলই না তখন, কিন্তু মৌলাবাকসো দেখে হতাশ হয়েছিলেম মনে আছে। তার চেয়ে গান-বাজনা, লোকের ভিড়, ঝাড় লণ্ঠন, সবার উপরে তিনতলার ঘরে কর্তাদিদিমার দেওয়া গরম গরম লুচি, ছোকা, সন্দেশ, মেঠাইদানা, ঢের ভালো লেগেছিল আমার মনে আছে।

প্রায় পনেরো আনা শ্রোতাই তখন মাঘোৎসবের ভোজ আর পোলাও মেঠাই খেতেই আসত আমার মতো। মস্ত মস্ত মেঠাই, ছোটোখাট কামানের গোলার মতো, নিঃশেষ হত দেখতে দেখতে। পরদিনেও আবার কর্তাদিদিমার লোক এসে একথালা মেঠাই দিয়ে যেত ছেলেদের খাবার জন্যে।

কর্তাদিদিমা আর বড়োমা—শাশুড়ি আর বউ—দু'জনেই সমান চওড়া লালপেড়ে শাড়ি পরে আছেন। বড়োমা-র মাথায় প্রায় আধহাত ঘোমটা, কিন্তু কর্তাদিদিমার মাথা অনেকখানি খোলা—সিঁদুর জ্বলজ্বল করছে দেখে ভারি নতুন ঠেকছিল।

এই মাঘোৎসবে ভোজের বিরাট রকম আয়োজন হত তিনতলা থেকে একতলা। সকাল থেকে রাত একটা দুটো পর্যন্ত খাওয়া চলত। লোকের পর লোক, চেনা, অচেনা, আত্মপর, যে আসছে খেতে বসে যাচ্ছে। আহারের পর বেশ করে হাত মুখ ধুয়ে, পান ক'টা পকেটে লুকিয়ে নিয়ে, মুখ মুছতে মুছতে সরে পড়ছে—পাছে ধরা পড়ে অন্যের কাছে এরা সবাই।

মাঘোৎসবের ভোজ আর মেঠাই, অনেকে খেয়ে বাইরে গিয়ে খাওয়াদাওয়া ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেও চলেছে এও আমি স্বকর্ণে শুনেছি, তখনকার লোকের মুখেও শুনতেম।

মাঘোৎসবের লোকারণ্যের মাঝখানে কর্তাকে পরিষ্কার করে দেখে নেওয়া মুশকিল ছিল আমার পক্ষে! অনেকদিন পরে একবার কর্তাদাদামশায়কে সামনাসামনি দেখে ফেললেম। সকালবেলায় উত্তরের ফটকের রেলিঙগুলোতে পা রেখে ঝুল দিচ্ছি এমন সময় হঠাৎ কর্তার গাড়ি এসে দাঁড়াল।

লম্বা চাপকান, জোব্বা, পাগড়ি পরে কর্তা নামছেন দেখেই দৌড়ে গিয়ে প্রণাম করে ফেললেম। ভারি নরম একখানা হাতে মাথাটাকে আমার ছুঁয়েই কর্তা উপরে উঠে গেলেন।

বাড়িতে তখন খবর হয়ে গেছে—কর্তামশায় চীনদেশ থেকে ফিরেছেন। আমি যে কর্তাকে দেখে ফেলেছি, প্রণামও করেছি, সব আগেই সেটা মায়ের কানে গেল। ময়লা কাপড়ে কর্তার সামনে গিয়ে অন্যায় করেছি বলে একটু ধমকও খেলেম, আর তখনই রামলাল এসে আমাকে ধরে পরিষ্কার কাপড় পরিয়ে ছেড়ে দিলে।

এই হঠাৎ দেখার কিছুক্ষণ পরে, কর্তার কাছ থেকে আমাদের সবার জন্য একটা একটা চীনের বার্নিশ করা চমৎকার কৌটো এসে পড়ল, তার সঙ্গে গোটাকতক বীরভূমের গালার খেলনা।

আমার বাক্সটা ছিল রুহিতনের আকার, তার উপরে একটা উড়ন্ত পাখি আঁকা। আর গালার খেলনাটা ছিল একটা মস্ত গোলাকার কচ্ছপ।

এর পরেই মা আর আমার দুই পিসির জন্যে হাতির দাঁতের নৌকা আর সাততলা চীনদেশের মন্দির, কর্তার কাছ থেকে বাবামশায় নিয়ে এলেন। চীনের সাততলা মন্দিরটার কি চমৎকার কারিগরিই ছিল! ছোট্ট ছোট্ট ঘণ্টা ঝুলছে, হাতির দাঁতের টবে হাতির দাঁতেরই গাছ, মানুষ সব দাঁতে তৈরি, এক একতলায় গম্ভীরভাবে যেন ওঠানামা করছে। সেই মন্দিরের একটা একটা তলা দেখে চলতে একটা একটা বেলা কেটে যেত আমার। তারপর একটু বড়ো হয়ে সেটাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দেখতে লেগে গেলেম—সেদিনও মন্দিরের দু'একটা টুকরো ছিল বাক্সে!

এর পরে কর্তাকে দেখেছিলেম ছেলেবেলাতে আর একবার। ও বাড়ি থেকে শোভাযাত্রা করে বর বার হল—এখনকার মতো বরযাত্রা নয়—বর চলল খড়খড়ি দেওয়া মস্ত পালকিতে, আগে ঢাক ঢোল, পিছনে কর্তাকে ঘিরে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, সঙ্গে অনেকগুলো হাতলণ্ঠন আর নতুন রঙ করা কাপড় পরে চাকর দারোয়ান পাইক। সদর ফটক পর্যন্ত কর্তা সঙ্গে গেলেন, তারপর বরের পালকি চলে গেলে কর্তা উপরে চলে গেলেন—গায়ে লাল জরির জামেওয়ার, পরনে গরদের ধুতি।

বারবাড়িতে

সেকালের নিয়ম অনুসারে একটা বয়েস পর্যন্ত ছেলেরা থাকতেন অন্দরে ধরা, তারপর একদিন চাকর এসে দাসীর হাত থেকে আমাদের চার্জ বুঝে নিত। কাপড় জুতো জামা বাসন-কোসনের মতো করে আমাদের তোষাখানায় নামিয়ে নিয়ে ধরত; সেখান থেকে ক্রমে দপ্তরখানা হয়ে হাতেখড়ির দিনে ঠাকুরঘর, শেষে বৈঠকখানার দিকে আস্তে আস্তে প্রমোশন পাওয়া নিয়ম ছিল।

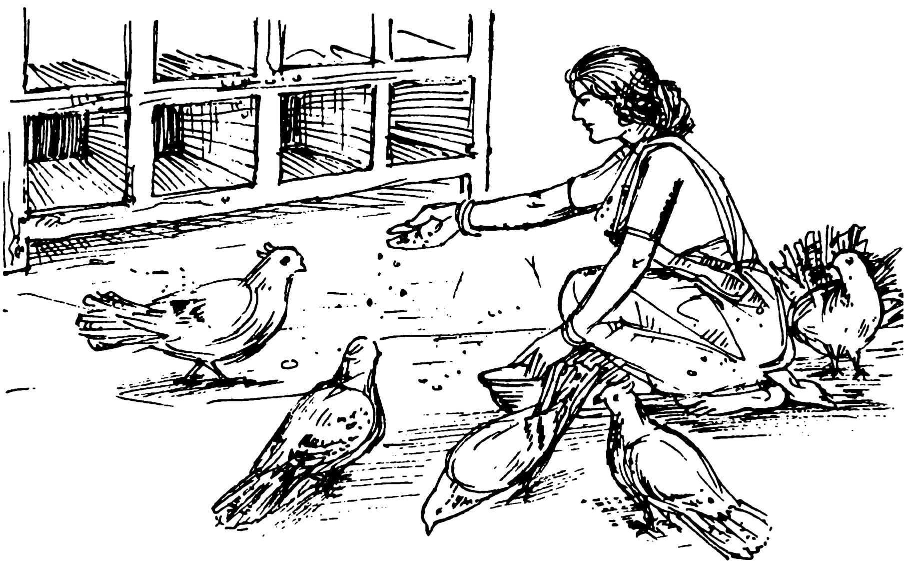
রামলাল যতদিন আমার চার্জ বুঝে নেয়নি ততদিন আমি ছিলেম তিনতলায় উত্তরের ঘরে। সেইকালে একবার একটা সূর্যগ্রহণ লাগল—থালায় জল রেখে সূর্য দেখে পুণ্য কাজ করে ফেলেছিলেম সেদিন। মনে পড়ে সেই প্রথম একলা ছাতে বার হয়ে আকাশ দেখলেম—নীল পরিষ্কার আকাশ। তারই গায়ে সারি সারি নারকেল গাছ, পুবদিক জুড়ে মস্ত একটা বটগাছ, তারই তলায় একটা পুকুর—আমাদের দক্ষিণের বাগানের এইটুকুই চোখে পড়ল সেইদিন।

এই দক্ষিণের বাগান ছিল বারবাড়ির সামিল—বাবুদের চলাফেরার স্থান। এখন যেমন ছেলেপিলে দাসী চাকর রাস্তার লোক এবং অন্দরের মেয়েরা পর্যন্ত এই বাগান মাড়িয়ে চলাফেরা করে, সেকালে সেটি হবার জো ছিল না! বাবামশায়ের সখের বাগান ছিল এটা—এখানে পোষা সারস পোষা ময়ূর—তারা কেউ হাঁটু জলে পুকুরে নেমে মাছ শিকার করত, কেউ প্যাখম ছড়িয়ে ঘাসের উপর চলাফেরা করত। তিন-চারটে উড়ে মালিতে মিলে এখানে সব সখের গাছ আর খাঁচার পাখিদের তদবির করে বেড়াত, একটি পাতা কি ফুল ছেঁড়ার হুকুম ছিল না কারু! এই বাগানে একটা মস্ত গাছ-ঘর—সেখানে দেশ-বিদেশের দামী গাছ ধরা থাকত! পদ্ম ফুলের মতো করে গড়া একটা ফোয়ারা—তার জলে লাল মাছ, সব আফ্রিকা দেশ থেকে আনানো, নীল পদ্মপাতার তলায় খেলে বেড়াত! বাড়িখানা একতলা দোতলা তিনতলা পর্যন্ত, পাখিতে গাছেতে ফুলদানিতে ভর্তি ছিল তখন।

মনে পড়ে দোতলায় দক্ষিণের বারান্দার পুবদিকে একটা মস্ত গামলায় লাল মাছ ঠাসা থাকে, তারই পাশে দুটো সাদা খরগোশ, জাল ঘেরা মস্ত খাঁচার মধ্যে সব ছোটো ছোটো পোষা পাখির ঝাঁক, দেওয়ালে একটা হরিণের শিঙের উপর বসে লালঝুঁটি মস্ত কাকাতুয়া, শিকলি বাঁধা চীন দেশের একটা কুকুর—নাম তার কামিনী—পাউডার এসেন্সের গন্ধে কুকুরটার গা সর্বদা ভুরভুর করে। তখন বেশ একটু বড়ো হয়েছি, কিন্তু বৈঠকখানার বারান্দায় ফস করে যাবার সাধ্য নেই, সাহসও নেই! এখন যেমন ছেলেমেয়েরা 'বাবা' বলে হুট করে বৈঠকখানায় এসে হাজির হয় তখন সেটা হবার জো ছিল না। বাবামশায় যখন আহারের পরে ও বাড়িতে কাছারি করতে গেছেন সেই ফাঁকে এক একদিন বৈঠকখানায় গিয়ে পড়তেম। 'টুনি' বলে একটা ফিরিঙ্গি ছেলেও এই সময়টাতে পাখি চুরি করতে এদিকটাতে আসত। পাখিগুলোকে খাঁচা খুলে উড়িয়ে দিয়ে, জালে করে ধরে নেওয়া খেলা ছিল তার! টুনিসাহেব একবার একটা দামী পাখি উড়িয়ে দিয়ে পালায়। দোষটা আমার ঘাড়ে পড়ে। কিন্তু সেবারে আমি টুনির বিদ্যে ফাঁস করে দিয়ে রক্ষে পেয়ে যাই। আর একদিন—সে তখন গরমির সময়—দক্ষিণ বারান্দাটা ভিজে খসখসের পরদায় অন্ধকার আর ঠাণ্ডা হয়ে আছে; গামলা ভর্তি জলে পদ্মপাতার নিচে লাল মাছগুলোর খেলা দেখতে দেখতে মাথায় একটা দুর্বুদ্ধি জোগাল। যেমন লালমাছ, তেমনই লাল জলেই খেলে বেড়ালে শোভা পায়!

কোথা থেকে খানিক লাল রঙ এনে জলে গুলে দিতে দেরি হল না, জলটা লালে লাল হয়ে উঠল। কিন্তু মিনিট কতকের মধ্যেই গোটা দুই মাছ মরে ভেসে উঠল দেখেই বারান্দা ছেড়ে চোঁ চোঁ দৌড়—একদম ছোটোপিসির ঘরে! মাছ মারায় দায় থেকে কেমন করে, কি ভাবে যে রেহাই পেয়েছিলাম তা মনে নেই, কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত আর দোতলায় নামতে সাহস হয়নি।

মনে আছে আর একবার মিস্ত্রী হবার সখ করে বিপদে পড়েছিলেম। বাবামশায়ের মনের মতো করে চীনে মিস্ত্রীরা চমৎকার একটা পাখির ঘর গড়ছে—জাল দিয়ে ঘেরা একটা যেন মন্দির তৈরি হচ্ছে, দেখছি বসে বসে। রোজই দেখি, আর মিস্ত্রীর মতো হাতুড়ি পেরেক অস্ত্রশস্ত্র চালাবার জন্য হাত নিসপিস করে। একদিন, তখন কারিগর সবাই টিফিন করতে গেছে, সেই ফাঁকে একটা বাটালি আর হাতুড়ি নিয়ে মেরেছি দু'তিন কোপ! ফস করে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ডগায় বাটালির এক ঘা! খাঁচার গায়ে দু'চার ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল। রক্তটা মুছে নেবার সময় নেই—তাড়াতাড়ি বাগান থেকে খানিক ধুলো-বালি দিয়ে যতই রক্ত থামাতে চলি ততই বেশি করে রক্ত ছোটে! তখন দোষ স্বীকার করে ধরা পড়া ছাড়া উপায় রইল না। সেবারে কিন্তু আমার বদলে মিস্ত্রী ধমক খেলে—যন্ত্রপাতি সাবধানে রাখার হুকুম হল তার উপর! কারিগর হতে গিয়ে প্রথমে যে ঘা খেয়েছিলেম তার দাগটা এখনও আমার আঙুলের ডগা থেকে মেলায়নি। ছেলেবেলায় আঙুলের যে মামলায় পার পেয়ে গিয়েছিলেম, তারই শাস্তি বোধ হয় এই বয়সে লম্বা আঙুল এঁকে শুধতে হচ্ছে সাধারণের দরবারে।



আর একটা শাস্তির দাগ এখনও আছে লেগে আমার ঠোঁটে। গুড়গুড়িতে তামাক খাবার ইচ্ছে হল—হঠাৎ কোথা থেকে একটা গাড়ু জোগাড় করে তারই ভিতর খানিক জল ভরে টানতে লেগে গেলাম। ভুড় ভুড় শব্দটা ঠিক হচ্ছে, এমন সময় কি জানি পায়ের শব্দে চমকে যেমন পালাতে যাওয়া, অমনি সখের হুঁকোটার উপর উলটে পড়া! সেবার নীলমাধব ডাক্তার এসে তবে নিস্তার পাই—অনেক বরফ আর ধমকের পরে। দেখেছি যখন দুষ্টুমির শাস্তি নিজের শরীরে কিছু না কিছু আপনা হতেই পড়েছে, তখন গুরুজনদের কাছ থেকে উপরি আরও দু'চার ঘা বড়ো একটা আসত না। যখন দুষ্টুমি করেও অক্ষত শরীরে আছি তখনই বেত খেতে হত, নয় তো ধমক, নয় তো অন্দরে কারাবাস। এই শেষের শাস্তিটাই আমার কাছে ছিল ভয়ের—কুইনাইন খাওয়ার চেয়ে বিষম লাগত।

অন্দরে বন্দী অবস্থায় যে ক'দিন আমার থাকতে হত, সে ক'দিন ছোটোপিসির ঘরই ছিল আমার নিশ্বাস ফেলবার একটিমাত্র জায়গা। 'বিষবৃক্ষ' বইখানাতে সূর্যমুখীর ঘরের বর্ণনা পড়ি আর মনে আসে ছোটোপিসির ঘর। তেমনই সব ছবি, দেশি পেনটারের হাতের। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ যে লোহার সিন্দুকটা, সেটাও ছিল। কৃষ্ণনগরের কারিগরের গড়া গোষ্ঠলীলার চমৎকার একটি কাচ ঢাকা দৃশ্য, তাও ছিল। উলে বোনা পাখির ছবি, বাড়ির ছবি। মস্ত একখানা খাট—মশারিটা তার ঝালরের মতো করে বাঁধা। শকুন্তলার ছবি, মদনভস্মের ছবি,

উমার তপস্যার ছবি, কৃষ্ণলীলার ছবি দিয়ে ঘরের দেওয়াল ভর্তি। একটা একটা ছবির দিকে চেয়ে চেয়েই দিন কেটে যেত। এই ঘরে জয়পুরী কারিগরের আঁকা ছবি থেকে আরম্ভ করে, অয়েল পেনটিং ও কালীঘাটের পট পর্যন্ত সবই ছিল; তার উপরেও, এক আলমারি খেলনা। কালো কাচের প্রমাণসই একটা বেড়াল, সাদা কাচের একটা কুকুর, ঠুনকো একটা ময়ূর, রঙিন ফুলদানি কতরকমের! সে যেন একটা ঠুনকো রাজত্বে গিয়ে পড়তেম! এ ছাড়া একটা আলমারি, তাতে সেকালের বাংলা-সাহিত্যের যা কিছু ভালো বই সবই রয়েছে। এই ঘরের মাঝে ছোটোপিসি বসে বসে সারাদিন পুঁতি গাঁথা আর সেলাই নিয়েই থাকেন। বাবামশায় ছোটোপিসিকে সাহেব-বাড়ি থেকে সেলাইয়ের বই, রেশম কত কি, এনে এনে দিতেন আর তিনি বই দেখে দেখে নতুন নতুন সেলাইয়ের নমুনা দিয়ে কত কি কাজ করতেন তার ঠিক নেই! ছোটোপিসি এক জোড়া ছোট্ট বালা পুঁথি গেঁথে গেঁথে গড়েছিলেন— সোনালি পুঁতির উপরে ফিরোজার ফুল বসানো ছোট্ট বালা দু'গাছি, সোনার বালার চেয়েও ঢের সুন্দর দেখতে।

বিকেলে ছোটোপিসি পায়রা খাওয়াতে বসতেন। ঘরের পাশেই খোলা ছাত; সেখানে কাঠের খোপে, বাঁশের খোপে, পোষা থাকত লক্কা, সিরাজী, মুক্ষি কত কি নামের আর চেহারার পায়রা। খাওয়ার সময় ডানায় আর পালকে ছোটোপিসিকে ঘিরে ফেলত পায়রাগুলো। সে যেন সত্যিসত্যিই একটা পাখির রাজত্ব দেখতেম—উঁচু পাঁচিল-ঘেরা, ছাতে ধরা। বাবামশায়েরও পাখির সখ ছিল, কিন্তু তাঁর সখ দামী দামী খাঁচার পাখির, ময়ূর, সারস, হাঁস এই সবেরই। পায়রার সখ ছিল ছোটোপিসির। হাটে হাটে লোক যেত পায়রা কিনতে। বাবামশায় তাঁকে দুটো বিলিতি পায়রা এক সময়ে এনে দেন, ছোটোপিসি সে দুটোকে ঘুঘু বলে স্থির করেন, কিছুতেই পুষতে রাজি হন না। অনেক বই খুলেও বাবামশায় যখন প্রমাণ করতে পারলেন না যে পাখি দুটো ঘুঘু নয়, তখন অগত্যা সে দুটো রটলেজ সাহেবের ওখানে ফেরত গেল! এরই কিছুদিন পরে একটা লোক ছোটোপিসিকে এক জোড়া পায়রা বেচে গেল—পাখি দুটো দেখতে ঠিক সাদা লাককা, কিন্তু লেজের পালক তাদের ময়ূরপুচ্ছের মতো রঙিন। এবার ছোটোপিসি ঠকলেন—বাবামশায় এসেই ধরে দিলেন পায়রার পালকে ময়ূরপুচ্ছ সুতো দিয়ে সেলাই করা। একটা তুমুল হাসির হোররা উঠেছিল সেদিন তিনতলার ছাতে, তাতে আমরাও যোগ দিয়েছিলেম।

ঠাকুরপুজো, কথকতা, সেলাই আর পায়রা—এই নিয়েই থাকতেন ছোটোপিসি। একবার তাঁর তিনতলার এই ছাতটাতে, বাড়িসুদ্ধ সবার ফটো নিতে এক মেম এসে উপস্থিত হল। আমাদেরও ফটো নেবার কথা, সকাল থেকে সাজগোজের ধুমধাম পড়ে গেল। সেইদিন প্রথম জানলেম আমার একটা হালকা নীল মখমলের কোট-প্যান্ট আছে। ভারি আনন্দ হল, কিন্তু গায়ে চড়াবামাত্রই কোট-প্যান্ট বুঝিয়ে দিল যে আমার মাপে তাদের কাটা হয়নি। এই অদ্ভুত সাজ পরে আমার চেহারাটা কারু কারু অ্যালবামে এখনও আছে—রোদের ঝাঁজ লেগে চোখ দুটো পিটপিট করছে, কাপড়টা ছেড়ে ফেলতে পারলে বাঁচি এই ভাব।

ফটো তোলা আর বাড়ির প্ল্যান আঁকার কাজ জানতেন বাবামশায়। ড্রইং করার নানা সাজ-সরঞ্জাম, কম্পাস-পেনসিল কত রকমের দেখতেম তাঁর ঘরে। বাবামশায় কাছারির কাজে গেলে তাঁর ঘরে ঢুকে সেগুলো নেড়ে-চেড়ে নিতেম। ঠিক সেই সময়, ফার্সি পড়ানোর মুন্সি এসে জুটতেন। কথায় কথায় তিনি আলে বে, পে, তে, জিম—এমনই ফার্সি অক্ষর আমাদের শোনাতে বসতেন। মুন্সির দু'একটা বয়েৎ এখনও মনে আছে—'গুলেস্তাঁমে যাকে হরিয়েক গুলকো দেখা, না তেরি সে রঙ্গ, না তেরি সে বূ হ্যায়'। আরেকটা বয়েৎ ছিল সেটা ভুলে গেছি কেবল ধ্বনিটা মনে আছে—কবুতর বা কবুতর বাক্ বাবাজ! সেকালে ফার্সি-পড়িয়ে হলে কানে শরের কলম আর লুঙ্গি না হলে চলত না, মাথাও ঢাকা চাই! ঠিক মনে পড়ে না কেমন সাজটা ছিল মুন্সির।

ডাক্তারবাবুর আসবার সময় ছিল সকাল ন'টা। অসুখ থাক বা না থাক, কতকটা সময় বাইরে বসে গল্প গুজব করে তবে অন্যত্র রোগী দেখতেন গিয়ে রোজই। সেখানেও হয়তো এমনই একটা বাঁধা টাইম ছিল ডাক্তারের জন্যে পান জল তামাক ইত্যাদি নিয়ে! আর এক ডাক্তারসাহেব ছিল বরাদ্দ—তার নাম কেলি—সে রোজ আসত না, কিন্তু যখন আসত তখনই জানতেম বাড়িতে একটা শক্ত রোগ ঢুকেছে। তখন দেখতুম আমাদের নীলমাধববাবুর মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠেছে, আর ইংরিজি কথাটার মাঝে মাঝে থেকে থেকে 'ওর নাম কি' কথাটা অজস্র ব্যবহার করছেন তিনি; যথা—'আই থিংক—ওর নাম কি—ডিজিটিলিস এণ্ড কোয়নাইন—ওর নাম কি—ইফ ইউ প্রেফার আই সে ডকটার কেলি' ইত্যাদি।

সাহেব ছাড়া হয়ে নীলমাধববাবু তাঁকে ডাক্তারই মনে হত না, মনে হত, একেবারে ঘরের মানুষ আর মজার মানুষটি! বাঘমুখো ছড়ি হাতে, গলায় চাদর, বুকে মোটা সোনার চেইন, ডাক্তারবাবু ভালমানুষের মতো এসে

একখানা বেতের চৌকিতে বসতেন। চৌকিখানা আসত তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই আবার সরেও যেত তাঁর সঙ্গেই। আমার প্রায়ই অসুখ ছিল না, কাজেই ডাক্তারের লাঠিটার বাঘমুখ কেমন করে কাত হয়ে চাইছে সেইটেই দেখতে পেতেম। ছোটো ছোটো লাল মানিকের চোখ দুটো বাঘের—ইচ্ছে হত খুঁটে নিই, কিন্তু ভয় হত—মা আছেন কাছেই দাঁড়িয়ে ডাক্তারের। এখনকার কালে কত ওষুধেরই নাম লেখে একটু অসুখেই, তখন সাতদিন জ্বর চলল তো দালচিনির আরক দেওয়া মিকশ্চার আসত—বেশ লাগত খেতে, আর খেলেই জ্বর পালাত। তিনদিন পর্যন্ত ওষুধ লেখাই হত না কোনও—হয় সাবুদানা, নয় এলাচদানা, বড় জোর কিটিং-এর বন্‌বন্‌। তিনদিনের পরেও যদি উঠে না দাঁড়াতেম তবে আসত ডাক্তারখানা থেকে রেড মিকশ্চার। গলদা চিংড়ির ঘি বলে সেটাকে সমস্তটা খাইয়ে দিতে কষ্ট পেতে হত মাকে।

এখন নানা রকম সৌখিন ওষুধ বেরিয়েছে, তখন মাত্র একটি ছিল সৌখিন ওষুধ, যেটা খাওয়া চলত অসুখ না থাকলেও। এই জিনিসটি দেখতে ছিল ঠিক যেন মানিকে গড়া একটি একটি রুহিতনের টেক্কা। নামটাও তার মজার—জুজুবস। এখন বাজারে সে জুজুবস পাওয়া যায় না, তার বদলে ডাক্তারখানায় রাখে যষ্ঠিমধুর জুজুবিস—খেতে অত্যন্ত বিস্বাদ। অসুখ হলে তখন ডাক্তারের বিশেষ ফরমাসে আসত এক টিন বিস্কুট আর দমদম মিছরি। এখনকার বিস্কুটগুলো দেখতে, হয় টাকা, নয় টিকিট। তখন ছিল তারা সব কোন্‌টা ফুলের মতো, কেউ নক্ষত্রের মতো, কতক পাখির মতো। দমদম মিছরিগুলো যেন সোনার থেকে নিঙড়ে নেওয়া, বসে ঢালাই করা মোটা স্ক্রু একটা একটা।

ডাক্তারের পরই—ঠনঠনের চটি পায়ে, সভ্যভব্য চন্দ্র কবিরাজ—তিনি তোষাখানা থেকে দপ্তরখানা হয়ে, লাল রঙের বগলী থেকে চটি বিলি করে করে উঠে আসতেন তেতলায় আমাদের কাছে। নাড়ি টিপে বেড়ানোই ছিল তাঁর একমাত্র কাজ, কিন্তু নিত্য কাজ। বুড়ো কবিরাজ আমার মাকে মা বলে যে কেন ডাকে তার কারণ খুঁজে পেতেম না।

আর একটি দুটি লোক আসত উপরের ঘরে, তাদের একজন গোবিন্দ পাণ্ডা, আর একজন রাজকিষ্ট মিস্ত্রী। পাণ্ডা আসত কামানো মাথায় নামাবলি জড়িয়ে, কর্পূরের মালা, জগন্নাথের প্রসাদ নিয়ে। দাসীদের সঙ্গে আমরাও ঘিরে বসতেম তাকে। প্রথমটা সে মেঝেতে খড়ি পেতে গুণে দিত দাসীদের মধ্যে কার কপালে ক্ষেত্তরে যাওয়া আছে, না আছে। তারপর প্রসাদ বিতরণ করে সে শ্রীক্ষেত্রের গল্প করতে থাকত পট দেখিয়ে। সেই পট, নামাবলি, কর্পূরের মালা সব ক'টার রঙ মিলে শ্রীক্ষেত্রের সমুদ্র বালি পাথর ইত্যাদির একটা রঙ ধরেছিল মনটা। অল্প কয় বছর হল যখন পুরী দেখলেম প্রথম, তখন সেই সব রঙগুলোকেই দেখতে পেলেম, যেন অনেক কাল আগে দেখা রঙ। নৌকো, পালকি, মন্দির, বালি, কাপড়—সমস্ত জিনিস সাদা, হলুদ, কালো ও নীল—চারটি বহুকালের চেনা রঙের ছোপ ধরিয়ে রেখেছে!

আর একজন সাহেব আসত, তার নাম রুবারিয়ো। জাতে পর্তুগিজ ফিরিঙ্গি—মিশকালো। বড়োদিনের দিন সে একটা কেক নিয়ে হাজির হত। তাকে দেখলেই শুধোতেম—'সাহেব আজ তোমাদের কী?' সাহেব অমনি নাচতে নাচতে উত্তর দিত, 'আজ আমাদের কিসমিস।' সাহেবের নাচন দেখে আমরা তাকে ঘিরে খুব একচোট নেচে নিতেম।

নতুন কিছু পাখি কিংবা নিলেমে গাছ কেনার দরকার হলে, বৈকুণ্ঠবাবুর ডাক পড়ত। দেখতে বেঁটে-খাটো মানুষটি, মাথায় টাক, রাজ্যের পাখি, গাছ আর নিলেমের জিনিসের সংগ্রহ করতে ওস্তাদ ছিলেন ইনি। তখন স্যার রিচার্ড টেম্পল ছোটোলাট—ভারি তাঁর গাছের বাতিক। বৈকুণ্ঠবাবু নিলেমে ছোটোলাটের ডাকের উপর ডাক চড়িয়ে, অনেক টাকার একটা গাছ আমাদের গাছ-ঘরে এনে হাজির করলেন। ছোটোলাট খবর পেলেন—গাছ চলে গেছে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে। সঙ্গে সঙ্গে লাটের চাপরাশি পত্র নিয়ে হাজির—ছোটোলাট বাগান দেখতে ইচ্ছে করেছেন। উপায় কী, সাজ সাজ রব পড়ে গেল। আমার মখমলের কোট-প্যান্ট আবার সিন্দুক থেকে বার হল। সেজে গুজে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলেম—ঘোড়ায় চড়ে ছোটলাট এলেন। খানিক বাগানে ঘুরে একপাত্র চা খেয়ে বিদায় হলেন। বৈকুণ্ঠবাবুর ডেকে আনা গাছটাও চলে গেল জোড়াসাঁকো থেকে বেলভিডিয়ার পার্কে।

বৈকুণ্ঠবাবুর বাসা ছিল পাথুরেঘাটায়, সেখান থেকে নিত্য হাজিরি দেওয়া চাই এখানে। একবার ঘোর বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট ডুবে এক কোমর জল দাঁড়িয়ে যায়। বৈকুণ্ঠবাবু গলির মোড়ে আটকা—অন্যের যেখানে হাঁটু-জল বৈকুণ্ঠ বাবুর সেখানে ডুব-জল—এত ছোটো ছিলেন তিনি। কাজেই একখানা ছোট্ট নৌকা পুকুর থেকে টেনে তুলে তবে

তাঁকে চাকরেরা উদ্ধার করে আনে। ছোটো মানুষটি, কিন্তু ফন্দি ঘুরত অনেক রকম তাঁর মাথায়। কত রকমই যে ব্যবসার মতলব করতেন তিনি তার ঠিক নেই। একবার বড়ো জেঠামশায় এক বাক্স নিব কিনে আনতে বৈকুণ্ঠবাবুকে হুকুম করেন। তিনি নিলেম থেকে একটা গরুর গাড়ি বোঝাই নিব কিনে হাজির! আর একবার এক গাড়ি বিলিতি এসেন্স এনে হাজির বাবামশায়ের জন্য। দেখে সবাই অবাক, হাসির ধূম পড়ে গেল। এই ছোট্ট মানুষটিকে প্রকাণ্ড স্বপ্ন ছাড়া ছোট্টখাটো স্বপ্ন দেখতে কখনও দেখলেম না শেষ পর্যন্ত। বিচিত্র চরিত্রের সব মানুষের দেখা পেলেম তিনতলা থেকে ছাড়া পেয়েই।

অসমাপিকা

উড়ো ভাষায় এসে গেল হাতেখড়ির খবরটা আমার কানে। কিন্তু রামলাল রেখেছিল পাকা খবর ঠিক কখন, কোন তারিখে, কোন মাসে হবে হাতেখড়িটা। কেননা এই শুভ কাজে তার কিছু পাওনা ছিল। কাজেই সে ঠিক সময় বুঝে, রাত ন'টার আগেই আমাকে খাঁচার মধ্যে বন্ধ করে বললে, 'ঘুমিয়ে নাও, সকালে হাতেখড়ি, ভোরে ওঠা চাই।'

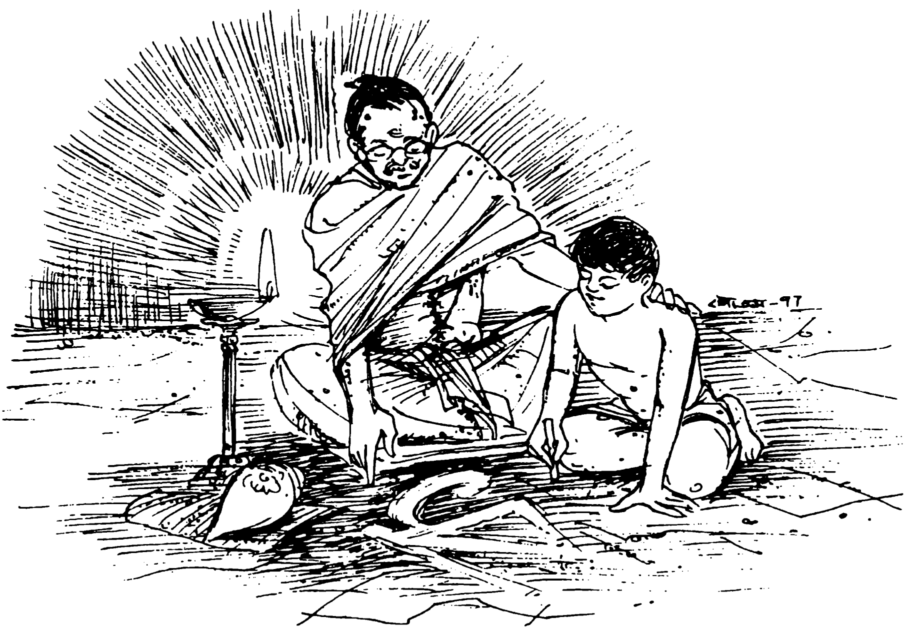
দু'কানের মধ্যে দুটো কথা—'ভোরে ওঠা', 'হাতেখড়ি'—থেকে থেকে মশার মতো বাঁশি বাজিয়ে চলল। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসতে দেরি করে দিয়ে, ঠিক ভোরে আমাকে একটু ঘুমোতে দিয়ে পালাল কথা দুটো। পাছে হাতেখড়ির শুভ লগ্নটা উতরে যায়, রামলালের চেয়েও সজাগ ছিল আমাদের ঠাকুরঘরের বামুন! সে ঠিক মফস্বলের একজন স্টেশনমাস্টারের মতো দিলে ফার্স্ট বেল। রামলালও বলে উঠল—'চলো আর দেরি নেই।'

পাছে দেরি হয়ে পড়ে, সে জন্যে পা চালিয়ে চলল রামলাল। একতলায় তোষাখানা থেকে নানা গলি-ঘুঁজি সিঁড়ি উঠোন পেরিয়ে চলতে চলতে দেখছি কাঠের গরাদে আঁটা একটা জানলা—সেই জানলার ওপারে অন্ধকার ঘরের মধ্যে কালো একটা মূর্তি একটা মোটা জালা থেকে কি তুলছে। লোকের শব্দ পেয়ে সে মূর্তিটা গোল দুটো চোখ নিয়ে আমার দিকে দেখতে থাকল। এর অনেক কাল পরে জেনেছিলেম এ লোকটা আমাদের কালী ভাণ্ডারী—রোজ এর হাতের রুটিই খাওয়ায় রামলাল। কালী লোকটা ছিল ভালো, কিন্তু চেহারা ছিল ভীষণ। আলিবাবার গল্পের তেলের কুপো আর ডাকাতের কথা পড়ি আর মনে এখনও কালীর সেদিনের চোখ, গরাদ-আঁটা ঘর আর মস্ত জালা। ভাঁড়ারঘর পেরিয়ে এক ছোটো উঠোন—জলে ধোওয়া, লাল টালি বিছানো। সেখান থেকে ছাতের ধারের ঠাকুরঘরের উঁচু দেওয়াল দেখা যায়, কিন্তু সেখানে পৌঁছতে সহজে পারিনি। উঠোনের উত্তরের চক-পাশে সিঁড়ি উঠে একটা ঘর জোড়া মেটে সিঁড়ি সোজা দোতলায় উঠেছে। এই সিঁড়ির গায়েই কড়াই বাসনের ঘর, তার পাশ দিয়ে একটা সরু গলি—একধারে দেওয়াল, অন্যধারে কাঠের বেড়া। গলিটা পেরিয়ে পেলেম একটা ছাত আর সরু একটা বারান্দা, তারই একপাশে সারি সারি মাটির উনুন গাঁথা আছে—বড় হাঁড়ি বসানো, রুটি ভাজবার হাতা হাতা চুল্লি। এই সরু বারান্দা, সরু গলির শেষে, চার-পাঁচ ধাপ সিঁড়ি—অন্ধকার, আর ঘরঘর ঘর্ঘর শব্দ পরিপূর্ণ একটা ছোটো ঘরে নেমে গেছে। ঘরের মেঝেটা থরথর করে পায়ের তলায় কাঁপছে টের পেলেম। সেখানে দেখলেম একটা দাসী, হাত দু'খানা তার মোটা মোটা—গোল দু'খানা পাথর একটার উপর আর একটা রেখে, একটা হাতল ধরে ক্রমাগত ঘুরিয়ে চলেছে—পাশে তার স্তূপাকার করা গমচূর্ণ। এই আটা দিয়ে যে রুটি খাই তা কি তখন জানি? সে ঘরটা পেরিয়ে আর একটা উঠোনের চক মিলানো বারান্দা। সেখানে পৌঁছে একটা চেনা লোক—অমৃত দাসী—সে একটা শিল আর নোড়ায় ঘষাঘষি করে শব্দ তুলছে ঘটর ঘটর! এক মুঠো কি সে শিলের উপরে ছেড়ে দিয়ে খানিক নোড়া ঘষে দিলে ঘটাঘট, অমনি হয়ে গেল লাল রঙের একটা পদার্থ। অমনি হলুদ, সবুজ, সাদা, কত কি রঙ বাটছে বসে বসে সে—কে জানে তখন সেগুলো দিয়ে কালিয়া, পোলাও, মাছের ঝোল, ডাল, অম্বল রঙ করা হয় ভাত খাবার বেলায়। এখান থেকে টালি-খসা ফোকলা একটা মেটে সিঁড়ি ঘুরে ঘুরে ঠাকুরঘরের ঠিক দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেম। রামলাল ফস করে চটি জুতোটা পা থেকে খুলে নিয়ে বললে—'যাও।'

ঠাকুরঘরের দেওয়ালে সাদা পঙ্খের প্রলেপ; খাটলে খাটলে ছোটো ছোটো সারি সারি কুলুঙ্গি; তারই একটাতে তেলকালি পড়া পিলসুজে পিদুম জ্বলছে সকাল বেলায়। ঠিক তারই নিচে, দেওয়ালের গায়ে, প্রায় মুছে গেছে এমন একটা বসুধারার ছোপ। ঘরের মেঝেয় একটা সাদা চুন মাখানো দেলকো, আর আমপাতা, ডাব আর সিঁদুর মাখানো একটা ঘট। পুজোর সামগ্রী নিয়ে তারই কাছে পুরুত বসে; আর গায়ে নামাবলি জড়িয়ে হরিনামের মালা

হাতে ছোটোপিসিমা। ধূপ-ধুনোর ধোঁয়ার গন্ধে ভরা ঘরের মধ্যেটায় কি আছে দেখবার আগেই আমার চোখ জ্বালা করতে থাকল। তারপর কে যে সে মনে নেই, মেঝেতে একটা বড়ো **ক** লিখে দিলে। রামখড়ি হাতের মুঠোয় ধরে দাগা বুলোলেম—একবার, দু'বার, তিনবার। তারপরেই শাঁখ বাজল, হাতেখড়িও হয়ে গেল।

পুজোর ঘর থেকে একটা বাতাসা চিবোতে চিবোতে ফিরতে থাকলেম এবারে। একেবারে একতলায় যোগেশদাদার দপ্তরে এসে একতাড়া তালপাতা, কঞ্চির কলম ও মাটির নতুন দোয়াত নিতে হল, বাড়ির বুড়ো আধবুড়ো ছোকরা কর্মচারী সবারই পায়ের ধুলো ও আশীর্বাদের সঙ্গে—এ-ও মনে আছে। তারপর সদরে-অন্দরে সবাইকে দেখা দিয়ে কোথায় গেলেম, কি করলেম কিছুই মনে নেই। কিন্তু তার পরদিনই আবার সরস্বতী পুজোয় দোয়াত, কলম, বই, শেলেট রামলাল দিয়ে এল, তা মনে পড়ে কিন্তু। গুরুমশায় বলে সেদিনের একটা কেউ আমার মনের খোপে ধরা নেই হাতেখড়ির সকালটার সঙ্গে।



একটা অসমাপিকা ক্রিয়ার মতো এই হাতেখড়ি ব্যাপারটা। এরই মতো আরও কতকগুলো অসমাপ্ত, কতকটা বায়োস্কোপের টুকরো ছবির মতো, মনের কোণে রয়েছে জমা।

খুব ছোটোবেলার একটা ঘটনার কথা। সেটা শুনে পাওয়া সংগ্রহ মনের—মা বলতেন—আমাকে নিয়ে কাটোয়াতে যাচ্ছেন ছোটোপিসিমার শ্বশুরবাড়ি। পথে ধানক্ষেতের মাঝ দিয়ে পালকি চলেছে। সঙ্গের দাসী একগোছা ধানের শীষ ভেঙে মাকে দিয়েছে; তারই একটা শীষ মা দিয়েছেন আমাকে খেলতে। মা চলেছেন অন্যমনে মাঠ-ঘাট দেখতে দেখতে, বন্ধ পালকির ফাঁকে চোখ দিয়ে। সেই ফাঁকে হাতের ধান-শীষ মুখের মধ্যে দিয়ে গিয়ে আমার গলায় বেধে দম বন্ধ করে আর কি! এমন সময়—এ ঘটনা বারবার বলতেন মা, কিন্তু এ ঘটনা কোনও কিছু স্মৃতি কি ছবির সঙ্গে জড়িয়ে দেখতে পেত না মন। যেন মনের ঘুমন্ত অবস্থার ঘটনা এটা জন্মের পরের, কিন্তু মনের ছাপাখানা খোলার পূর্বের ঘটনা।

পুরনো বৈঠকখানা বাড়িটা অনেক অদলবদল জোড়া তাড়া দিয়ে হয়েছে জোড়াসাঁকোর আমাদের এই বসত-বাড়িটা। খাপছাড়া রকমের অলি, গলি, সিঁড়ি, চোর-কুঠরি, কুলুঙ্গি ইত্যাদিতে ভরা এই বাড়ি, খানিক সমাপ্ত খানিক অসমাপ্ত ছবি ও ঘটনার ছাপ আপনা হতেই দিত তখন মনের উপরে। অন্দরবাড়ি থেকে রান্নাবাড়িতে যাবার একটা গলি পথ; ছোটোখাটো একটা উঠোনের পশ্চিম গায়ে, সরু দুটো মেটে সিঁড়ির মাথায়, দোতলার উপর ধরা এই গলিটার পশ্চিম দেওয়ালে পিদুম দেবার একটা কুলুঙ্গি।

বাড়ির আর সব কুলুঙ্গি ক'টা ছিল মেঝে ছেড়ে অনেক উপরে, ছোটো আমাদের নাগালের বাইরে। কিন্তু

এই কুলুঙ্গিটা—ঠিক একটি পূর্ণ চন্দ্র যত বড়ো দেখা যায় তত বড়ো—আর সব কুলুঙ্গি থেকে স্বতন্ত্র হয়ে মেঝে থেকে নেমে পড়েছিল। দেখে মনে হত সেটাকে, যেন একটা রবারের গোলা, ভুঁয়ে পড়ে একটু লাফিয়ে উঠে শূন্যে দাঁড়িয়ে গেছে। লুকোবার অনেকগুলো জায়গা ছিল আমাদের, তার মধ্যে এও ছিল একটা। ইঁদুর যেমন গর্তে গুটিসুটি বসে থাকে, তেমনই এক একদিন গিয়ে বসতেম সকারণে, অকারণেও। পূব-পশ্চিমে দেওয়াল জোড়া গলি, ছাওয়া দিয়ে নিকোনো। নানা কাজে ব্যস্ত চাকর-দাসী, তারা এই পথটুকু চকিতে মাড়িয়ে যাওয়া আসা করে—আমাকে দেখতেই পায় না। আমি দেখি তাদের খালি কালো কালো পায়ের চলাচল।

ঠিক আমার সামনেই একতলার ঘরের একটা মেটে সিঁড়ি একতলার একটা তালাবন্ধ সেকেলে দরজার সামনে পা রেখে, দোতলায় মাথা রেখে, আড় হয়ে পড়ে থাকে—যেন একটা গজগীর দৈত্য আজব শহরের তেল কালি পড়া সিংহদ্বার আগলে ঘুম দিচ্ছে এই ভাব। এলামাটির উপরে সোঁতা অন্ধকার—তারই দিকে চেয়ে বসে থাকি লুকিয়ে চুপচাপ। বেশিক্ষণ একলা থাকতে হত না, ঘড়ি ধরে ঠিক সময়ে সিঁড়ির গোড়ায় বিছিয়ে পড়ত রোদ—একখানি সোনায় বোনা নতুন মাদুর যেন। থাকতে থাকতে এরই উপর দিয়ে আগে আসত এক ছায়া, তার পিছে প্রায় ছায়ারই মতো একটি বুড়ি গুটিগুটি। তার লাঠির ঠকঠক শব্দ জানাত যে সে ছায়া নয়, কায়া। বুড়ি এসে চুপ করে বসে যেত তালবন্ধ কপাটের একপাশে। বসে থাকে তো বসেই থাকে বুড়ি। সিঁড়ি আড় হয়ে পড়ে থাকে তো থাকেই—সাড়াশব্দ দেয় না দু'জনে কেউ! রোদ ক্রমে সরে, একটু একটু করে আলো এলামাটির দেওয়ালগুলোকে সোনার আভায় একটুক্ষণের জন্যে উজলে দিয়ে, মাদুর গুটিয়ে নিয়ে যেন চলে যায়। সেই সময় একটা ভিখিরি, দুটো লাঠির উপর ভর দিয়ে যেন ঝুলতে ঝুলতে এসে বসে বন্ধ দরজার অন্য পাশে, হাতে তার একটা পিতলের বাটি। সে বসে থাকে, নেকড়া জড়ানো খোঁড়া পা একটা সিঁড়িটার দিকে মেলিয়ে গম্ভীর ভাবে। বুড়ো-বুড়ি কারু মুখে কথা নেই। কোথা থেকে বড়ো বৌঠাকরুণের পোষা বেড়াল 'গোলাপি'—গায়ে তিন রঙের ছাপ—মোটা ল্যাজ তুলে বুড়ির গা ঘেঁষে গিয়ে বলে মিঁয়া! বুড়ো ভিখিরি অমনি হাতের লাঠিটা ঠুকে দেয়। বেড়াল দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরতলায় উঠে আসে! ঠিক এই সময় শুনি, ঠাকুরঘরে ভোগের ঘণ্টা শাঁখ বেজে ওঠে। অমনি দেখি বুড়ো-বুড়ি দুটোতে চলে গেল—ঠিক যেন নেপথ্যে প্রস্থান হল তাদের থিয়েটারে। কুলুঙ্গিতে বসে আমি শুনতে থাকলেম কাঁসর বাজছে—তারপর.....তারপর.....তারপর.....

একদিন সকালে আমাদের দক্ষিণের বারান্দার সামনে লম্বা ঘরে চায়ের মজলিস বসেছে। পেয়ারী বাবুর্চি উর্দি পরে ফিটফাট হয়ে সকাল থেকে দোতলায় হাজির। আমার সেই নীল মখমলের সেকেন্ড হ্যান্ড কোট আর শর্ট পেন্টুলুনের মধ্যে পুরে রামলাল আমাকে ছেড়ে দিয়েছে—যতটা পারে চায়ের মজলিস থেকে দূরে।

কে জানে কে এক জন—মনে হয় চেহারাও নেই, নামও নেই—সাহেব-সুবো গোছের মানুষ, চা খেতে বসে আছেন। আমাকে কাছে ডাকতে ইশারা করলেন। চায়ের ঘরে ঢুকতে মানা ছিল পূর্বে। কাজেই, আমি ধরা পড়েছি সেই পরদার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় রামলাল কানের কাছে চুপি চুপি বললে, 'যাও ডাকছেন, কিন্তু খেয়ো না কিছু।' সাহস পেলেম, সোজা চলে গেলেম টেবিলের কাছে, যেখানে রুটি-বিস্কুট, চায়ের পেয়ালা, কত রকম প্লেট, হ্যাম-বেকন বাবুর্চি, আগে থেকে মনকে টানছিল। ভুলে গেছি তখন রামলালের হুকুমের শেষ ভাগটা। ঘরের মধ্যে কি ঘটনা ঘটল তা একটুও মনে নেই। মিনিট কতক পরে একখানা মাখন মাখানো পাঁউরুটি চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে আসতেই আড়ালে কেদারদাদার সামনে পড়লেম। ছেলে মাত্রকে কেদারদাদার অভ্যাস ছিল শালা বলা। তিনি আমার কানটা মলে দিয়ে ফিসফিস করে বললেন—'যাঃ, শালা, ব্যাপটাইজ হয়ে গেছি।' রামলাল একবার কটমট করে আমার দিকে চেয়ে বললে—'বলেছিলুম না, খেয়ো না কিছু।' কি যে অন্যায় হয়ে গেছে তা বুঝতে পারিনে; কেউ স্পষ্ট করেও কিছু বলে না। দাসীদের কাছে গেলে বলে—'মাগো, খেলে কি করে?' ছোটো বোনেরা বলে বসে—'তুমি খেয়েছ, ছোঁব না!' বড়োপিসি মাকে ধমকে বলেন—'ওকে শিখিয়ে দিতে পারনি, ছোটোবৌ!'

যে ভদ্রলোক চা খেতে এসেছিলেন তিনি তো গেলেন চলে খাতির-যত্ন পেয়ে। কেদারদাদাও গেলেন শিকদারপাড়ার গলিতে। কিন্তু 'ব্যাপটাইজ' কথাটা আমার আর কাছ ছাড়া হয় না। রুটিখানা হজম হয়ে যাবার অনেক ঘণ্টা পরে পর্যন্ত আমার মনে কেমন একটা বিভীষিকা জাগতে থাকল। কারও কাছে এগোতে সাহস হয় না। চাকরদের কাছে তোষাখানায় যাই, সেখানে দেখি রটে গেছে ব্যাপটাইজ হবার ইতিহাস। দপ্তরখানার পালাই, সেখানে যোগেশদাদা মথুরাদাদাকে ডেকে বলে দেন—আমি 'ব্যাপটাইজ' হয়ে গেছি। এমনই একদিন দু'দিন

কতদিন যায় মনে নেই—একলা একলা ফিরি, কোথাও আমল পাইনে, শেষে একদিন ছোটোপিসিমা আমায় দেখে বললেন—'তোর মুখটা শুকনো কেন রে?'

মনের দুঃখ তখন আর চাপা থাকল না—'ছোটোপিসিমা আমি ব্যাপটাইজ হয়ে গেছি!' ছোটোপিসি জানতেন হয়তো 'ব্যাপটাইজ' হওয়ার কাহিনী এবং যদি বিনা দোষে কেউ 'ব্যাপটাইজ' হয় তো তার উদ্ধার হয় কিসে, তাও তাঁর জানা ছিল। তিনি রামলালকে একটু আমার মাথায় গঙ্গাজল দিয়ে আনতে বললেন।

চলল নিয়ে আমাকে রামলাল ঠাকুরঘরে। পাহারাওয়ালার সঙ্গে যেমন চোর, সেইভাবে চললেম রামলালের পিছনে পিছনে। রান্নাবাড়ির উঠোনের পুব গায়ে, সরু মেটে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে হয় ঠাকুরবাড়ি। এই সিঁড়ির মাঝামাঝি উঠে, দেওয়ালের গায়ে চৌকো একটা দরজা ফস করে খুলে, রামলাল বললে—'এটা কি জান? চোর-কুটুরি পেত্নী থাকে এখানে।'

আর বলতে হল না, সোজা আমি উঠে চললেম সিঁড়ি যেখানে নিয়ে যাক ভেবে। খানিক পরে রামলালের গলা পেলেম—'জুতো খুলে দাঁড়াও, পঞ্চগব্যি আনতে বলি।' ভয়ে তখন রক্ত জল হয়ে গেছে। ছোটোপিসি দিয়েছেন হুকুম গঙ্গাজলের; কেন যে রামলাল পঞ্চগব্যির কথা তুলছে, সে প্রশ্ন করার মতো অবস্থার বাইরে গেছি তখন। মনও দেখছি সেই পর্যন্ত লিখে বাকিটা রেখেছে অসমাপ্ত।

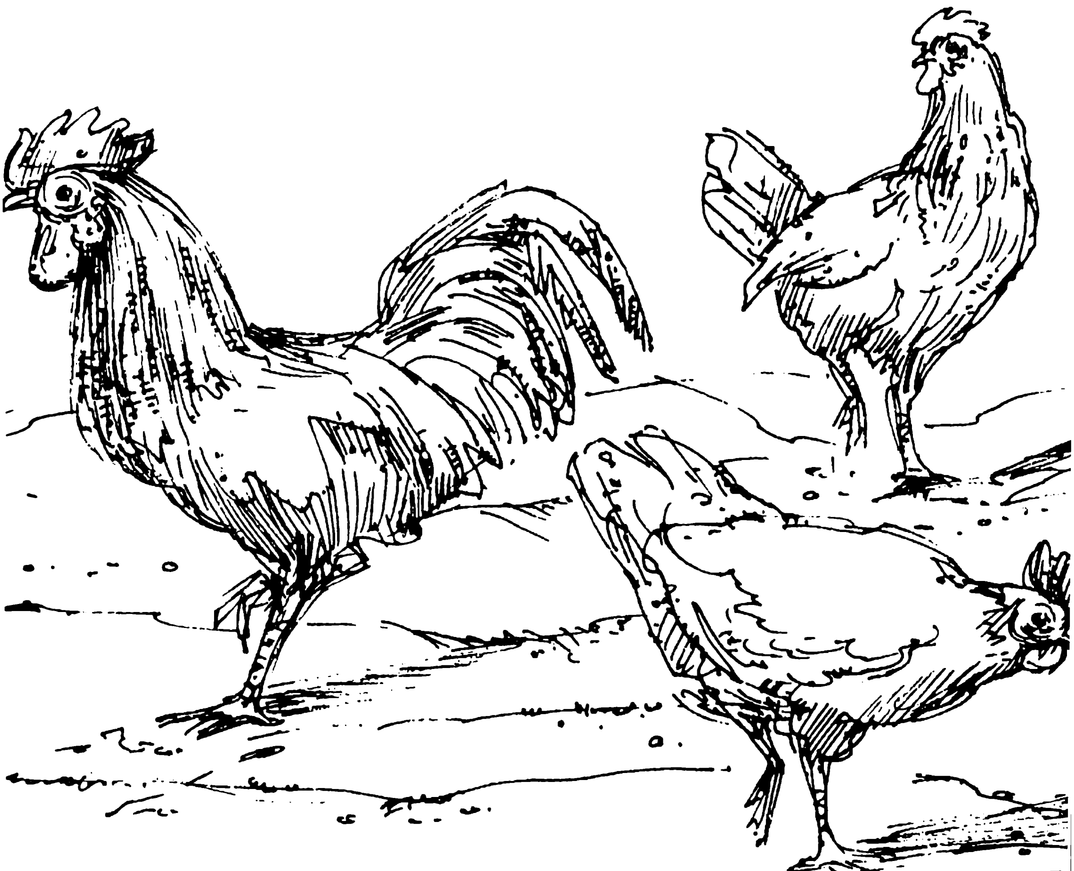
বসত বাড়ি

মানুষের সঙ্গ পেয়ে বেঁচে থাকে বসত বাড়িটা। যতক্ষণ মানুষ আছে বাড়িতে, ভূত ভবিষ্যত বর্তমানের ধারা বইয়ে ততক্ষণ চলেছে বাড়ি হাব ভাব চেহারা ও ইতিহাস বদলে বদলে। কালে কালে স্মৃতিতে ভরে, বাড়ি- স্মৃতির মাঝে বেঁচে থাকে বাড়ির সমস্তটা। বাড়ি ঘর জিনিসপত্র সবই স্মৃতির গ্রন্থি দিয়ে বাঁধা থাকে একালের সঙ্গে। এইভাবে চলতে চলতে, একদিন যখন মানুষ ছেড়ে যায় একেবারে বাড়ি, স্মৃতির সূত্রজাল ঊর্ণার মতো উড়ে যায় বাতাসে; তখন মরে বাড়িটা যথার্থ ভাবে। প্রত্নতত্ত্বের কোঠায় পড়ে জানায় শুধু, সেটা দিশি ছাঁদের না বিদেশি ছাঁদের, মোগল ছাঁদের না বৌদ্ধ ছাঁদের। তারপর একদিন আসে কবি, আসে আর্টিস্ট। বাঁচিয়ে তোলে মরা ইঁট কাঠ পাথর এবং ইতিহাস প্রত্নতত্ত্বের মুর্দাখানার নম্বরওয়ারি করে ধরা জিনিসপত্রগুলোকেও তারা নতুন প্রাণ দিয়ে দেয়। সঙ্গ পাচ্ছে মানুষের, তবে বেঁচে উঠছে ঘর বাড়ি সবই।

আমি বেঁচে আছি পুরনোর সঙ্গে নতুন হতে হতে; তেমনই বেঁচে আছে এই তিনতলা বাড়িটাও, আজ যার মধ্যে বাস নিয়ে বসে আছি আমি। আজ যদি কোন মাড়োয়ারী দোকানদার পয়সার জোরে দখল করে এ বাড়িটা, তবে এ বাড়ির সেকাল একাল দুই-ই লোপ পেয়ে যাবে নিশ্চয়। যে আসবে, তার সেকাল নয় শুধু একালটাই নিয়ে সে বসবে এখানে! দক্ষিণের বাগান ফুঁয়ে উড়িয়ে ওখানে বসাবে বাজার, জুতোর দোকান, ঘি-ময়দার আড়ৎ ও নানা—যাকে বলে প্রফিটেবল—কারখানা; তাই বসিয়ে দেবে এখানে। সেকাল তখন স্মৃতিতেও থাকবে না।

স্মৃতির সূত্র নদীধারার মতো চিরদিন চলে না, ফুরোয় এক সময়। এই বাড়িরই ছেলেমেয়ে—তাদের কাছে আমাদের সেকালের স্মৃতি নেই বললেই হয়। আমার মধ্যে দিয়ে সেই স্মৃতি—ছবিতে, লেখাতে, গল্পে—যদি কোনও গতিকে তারা পেল তো বর্তে রইল সেকাল বর্তমানেও। না হলে, পুরনো ঝুলের মতো, হাওয়ায় উড়ে গেল একদিন হঠাৎ কাউকে কিছু না জানিয়ে!

আলোর ফুলকি



দূরে একটা মহাবন, সেখানে বসন্ত বাউরি 'বউ কথা কও' ব'লে থেকে থেকে ডাক দেয়; কাছে পাহাড়তলির আবাদের পশ্চিমে, ঢালু মাঠের ধারে, পুরনো গোলাবাড়ির গায়ে মাচার উপর কুঞ্জলতার বেড়া দেওয়া কোঠাঘর; সেখানে একটা ঘড়ি বাজবার আগে পাপিয়ার মতো 'পিয়া পিউ' শব্দ করে। যার বাড়ি তার পাখির বাতিক; পোষা পাখি, বুনো পাখি, এই গোলাবাড়ির আর কোঠাবাড়ির ফাঁকে ফাঁকে কত যে আছে ঠিক নেই, কেউ দরজা ভাঙা খাঁচায়, কেউ ছেঁড়া ঝুড়িতে, চালের খড়ে, দেয়ালের ফাটলে বাসা বেঁধে সুখে আছে। ওপাড়ার ডালকুত্তা তম্মা মাঝে মাঝে মুরগির ছানা চুরি করতে এদিকে আসে, কিন্তু পাখিদের বন্ধু পাহাড়ি কুত্তানি জিম্মার সামনে এগোয়, তার এমন সাহস নেই। বাড়ি যার, সে যখন বাইরে গেল, পাহারা দিতে রইল জিম্মা, আর রইল মোরগ ফুল মাথায় গোঁজা কুঁকড়ো—সে এমন কুঁকড়ো যে সবার আগে চোখ খোলে, সবার শেষে ঘুমে ঢোলে।

এই কুঁকড়োর চার রঙের চার বউ। সাদি, মেমসাহেবের মতো গোলাপি ফিতে মাথায় বেঁধে সাদা ঘাগরা পরে ঘুর ঘুর করছে; কালি, চোখে কাজল আর নীলাম্বরী শাড়ি পরা মাথায় সোনালি মোড়া বেনে খোঁপা, যেন কালতে ঠাকরুন; সুরকি, তিনি ঠোঁটে আলতা দিয়ে, গোলাপি শাড়ি পরে যেন কনে বউটি; আর খাকি, তিনি ধূপছায়া রঙের সায়া জড়িয়ে বসে রয়েছে, যেন একটি আয়া।

বেলা পড়ে আসছে, গোলাবাড়ির উঠোনে বিকেলের রোদ এসেছে। সফেদি, সিয়াঙ্গী, সুরকি, খাকি, গুলবাহারি সব মুরগি মিলে জটলা করছে। বাচ্চারা এক দিকে একটা কেঁচো নিয়ে টানাটানি মারামারি চেঁচামেচি বাধিয়ে দিয়েছে; ঘরের মধ্যে ঘড়ি সাড়া দিলে 'পিয়া পিউ।' সফেদি বলে উঠল, 'ওই পাপিয়া ডাকল।' খাকি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বললে, 'পাপিয়া লো কোন পাপিয়া? বনের না ঘরের? ঘড়ির ভিতরে যার বাসা, সে কি ডাক দিলে।' সফেদি তখন ধান খুঁটে খুঁটে গালে দিচ্ছিল; এবার খুব দূর থেকে শব্দ এল, 'পিউ পিউ।' সফেদি বললে, 'এ যেন বনেরই বোধ হচ্ছে। শুনছিস, কত দূর থেকে ডাক দিয়ে গেল।' ঘড়ির মধ্যে থেকে যে 'পিয়া' বলে থেকে থেকে দিনে রাতে অনেকবার ডাক দেয়, খাকি একবার আড়াল থেকে তার চেহারাখানি দেখে নেবার জন্যে থাকে থাকে কুঠিবাড়ির দিকে ঘুরে আসে; 'পিউ' বলে যেমন ডাকা, অমনি সে সোনার মন্দিরের মতো সেই ঘড়িটার কাছে ছুটে যায়, খুট করে দরজা বন্ধ হবার মতো একটা শব্দ শোনে, তখন চক্ষুশূল দুটো ঘড়ির কাঁটাই সে দেখতে পায়। পাখি, যে 'পিয়া পিউ' বলে ডাকলে, তার আর দেখা পায় না, এমনই নিত্য ঘটে বারে বারে। ঘড়ির মধ্যে যে পাখি, সে এখনও ডাকেনি, ডেকে গেল বনের পাখিটা। শুনে খাকি বললে, 'আঃ, তবু ভালো, এই বেলা গিয়ে ঘুলঘুলিতে আড়াসি পেতে বসে থাকি, আজ সে পিউ পাখির দেখা নিয়ে তবে অন্য কাজ, রোজই কি ফাঁকি দেবে।'

খাকি কেন যে ঘন ঘন ঘড়ি দেখে আসে, সফেদির কাছে আজ সেটা ধরা পড়ে গেল। খাকির মন পাখি যে কোন পাখির কাছে বাঁধা পড়েছে, সবার কাছে সেই খবরটা জানিয়ে দেবার জন্যে সফেদি চলেছে, এমন সময় চালের উপর থেকে কে একজন ডাক দিলে, 'সাদি, ও দিদি, ও সফেদি।' 'কে রে, কে রে।'—বলে সাদি চারিদিক চাইতে লাগল। উত্তর হল, 'আমি কবুত গো কবুত।' সফেদি রেগে বললে, 'আরে তা তো জানি। কোথায় তুই?'

'ছাতে গো ছাতে।'

সাদি দেখলে, এক গাঁ থেকে আর এক গাঁয়ে নীল আকাশের খবর বয়ে চলে যে নীল পায়রা তারই একটা একটুখানি জিরোতে আর একটু গল্প করে নিতে কোঠাবাড়ির আলসেতে বসেছে।

গোলাবাড়ির কুঁকড়োকে একটিবার চোখে দেখতে, তার একটুখানি খবর শুনে জীবনটা সার্থক করে নিতে পায়রা অনেক দিন ধরে মনে আশা করে আসছে; সাদা মুরগির কাছে ঠিক খবর পাবে মনে করে পায়রা তাকে শুধোতে যাবে, এমন সময় উঠোনের কোণে একটা মাসকলাই চোখে পড়তেই সাদি সেদিকে 'রও' বলেই দৌড়ে গেল। সাদিকে কলাই খুঁটতে দেখে সুরকি ছুটে এল, কালি বালি গুলজারি সবাই এসে সাদিকে ঘিরে শুধোতে লাগল, 'দেখি, কী পেলি। দেখি, কী খেলি। দেখি দেখি, কী কী।' সাদি টুপ করে মাসকলাইটা গালে ভরে ফিক করে হেসে বললে, 'কট কট কলাট, মা-স ক-লা-ই।' বলেই সাদি কোঠাবড়ির ঘুলঘুলির ধারে যেখানে চুপটি করে বসেছিল, সেখানে চলে গেল!

সাদি বললে, 'ওলো, ঘুলঘুলিটা খোলা পেলি কি।'

খাকি সাদিকে দরমার ঝাঁপে একটা ইঁদুরের গর্ত দেখিয়ে বলছে, 'যেমনি ঘণ্টা পড়বে, আর অমনি সে ওই গর্তটায় চোখ দিয়ে...'

এমন সময় পায়রা ডাক দিলে, খুব নরম করে, মিষ্টি করে, 'দুধি ভাতি সাদি সাহাজাদী, ও সফেদি।'

এবার সাদি সাড়া দিলে, 'নীলের বড়ি, নীল পোখরাজ। কী বলবে বলো।'

পায়রা খুব খানিক গলা ফুলিয়ে গদগদ সুরে বললে, 'যদি একবার, একটিবার, বলব তবে—শুধু একটিবার যদি দেখাও.....'

খাকি, সুরকি, গুলজারি সব মুরগি ইতিমধ্যে সেখানে জুটেছিল। তারা সবাই সাদির সঙ্গে বলে উঠল, 'কী, কী, কী, কী দেখাব।'

পায়রা অনেকখানি ঢোক গিলে বললে, 'তাঁর মাথার মোরগফুলটি যদি একটিবার....'

সব মুরগি হেসে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে বলতে লেগেছে, 'চায় লা, চায় লা, দেখতে চায়, দেখতে চায়।'

পায়রা বলছে, 'দেখবই দেখব, দেখবই দেখব,' আর আলসের উপর গলা ফুলিয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে।

সাদা মুরগি তাকে ধমকে বললে, 'অত ব্যস্ত কেন। আলসেটা ভাঙবে নাকি।'

পায়রা ডানা চুলকে বললে, 'না, না, তবে কিনা আমরা তাঁকে ছেরেদ্ধা করে থাকি....'

সাদি বুক ফুলিয়ে বলে উঠল, 'ছেরেদ্ধা কে না করে।'

খোপ ছেড়ে আসবার সময়, কবুতনিকে সে ফিরে এসে যে জগদবিখ্যাত পাহাড়তলির কুঁকড়োর রূপ বর্ণনা শুনিয়ে দেবে, দিব্যি করে এসেছে, সাদিকে পায়রা সে কথা বলে নিলে। সাদি ইতিমধ্যে আবার ধান খুঁটতে লেগেছিল, সে পায়রার কথার উত্তর দিলে, 'চমৎকার, দেখতে চমৎকার, এ কথা সবাই বলবে।'

পায়রা বলছিল, কতদিন খোপের মধ্যে বসে তারা দুটিতে তাঁর ডাক শুনেছে, নীল আকাশ ভেদ করে আসছে, সোনার সূচের মতো ঝকঝকে সেই ডাক, আকাশ আর মাটিকে যেন বিনি সুতোর মালাখানিতে বেঁধে এক করে দিয়ে।

কুঞ্জলতার আড়ালে বেড়ার গায়ে ভাঙা খাঁচায় তাল চড়াই এদিক ওদিক করছিল, হঠাৎ বলে উঠল, 'ঠিক, ঠিক, সবারি প্রাণ তার জন্যে ছটফটায়।'

এক মুরগি বলে উঠল, 'কার কথা হচ্ছে, আমাদের কুঁকড়োর নাকি।'

চড়াই বলে উঠল, 'কুঁকড়ো কি শুধু তোদেরই না তোরাই শুধু তার। তুই মুই সেই, তোরা মোরা তারা, তোদের মোদের তাদের, সবাই তার, সে সবার।'

কিছু দূরে গোবদামুখো পেরু বসে বসে এসব কথা শুনছিল, এখন আস্তে আস্তে পায়রার কাছে এসে, কুঁকড়ো যে এল বলে এবং এখনই যে সে তার চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করে কুঁকড়োকে দেখে জীবন সার্থক করতে পারবে, এই কথা খুব ঘটা করে জানিয়ে দিলে। পায়রা বললে, 'পেরু মশায় আপনিও তাঁকে চেনেন?'

পেরু গলার থলিটা দুলিয়ে বলে উঠল, 'আমি চিনি নে! কুঁকড়োকে জন্মাতে দেখলেম, সেদিন!'

কুঁকড়োর জন্মস্থানটা দেখবার জন্যে পায়রা ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠল। পেরু তাকে একটা পুরনো বেতের পেঁটরা দেখিয়ে বললে, 'এইখানে কুঁকড়োর জন্ম হয় কর্কট রাশিস্থে ভাস্করে, মুক্তোর মতো এক ডিম থেকে।' যে মুরগি এই ডিমে তা দিয়েছিলেন, তিনি এখনও বর্তমান কিনা, শুধোলে পেরু পায়রাকে বললে, 'এই পেঁটরার মধ্যেই তিনি আছেন, এখন বৃদ্ধা হয়েছেন, বড়ো একটা বাইরে আসেন না, কেবলই ঝিমোচ্ছেন, কুঁকড়োর কথা হলেই যা এক একবার চোখ মেলেন।' বলেই পেরু সেই পেঁটরার কাছে মুখ নিয়ে বললে, 'শুনছ গিন্নি, তোমার কুঁকড়োর এখন খুব বাড়-বাড়ন্ত।'—বলতেই পেঁটরার ডালা ঠেলে বুড়ি মুরগি হেঁয়ালিতে জবাব দিলে, 'পুরনো চাল ভাতে বাড়ে গো, ভাতে বাড়ে।' জবাব দিয়েই বুড়ি পেঁটরার মধ্যে মুড়িসুড়ি দিয়ে লুকিয়ে পড়ল।

পেরু বলে উঠল, 'আমাদের গিন্নি হেঁয়ালি বলতে খুব মজবুত, মুখে মুখে হেঁয়ালি জুগিয়ে বলতে এঁর মতো দু'জন দেখা যায় না। কলির বিষ্ণুশর্মার অবতার কিম্বা চাণক্য পণ্ডিতও বলতে পারো।' অমনি পেঁটরার মধ্যে থেকে জবাব হল, 'ময়ূর গেলেন লেজ গুড়িয়ে, পেরু ধরলেন পাখা!' 'দেখলে, দেখলে' বলতে বলতে পেরু সেখান থেকে সরলেন।

পায়রা সাদা মুরগিকে শুধোলে, 'শুনেছি নাকি, সুখেও যেমন দুখেও তেমনি, শীতে-বর্ষায় কালে-অকালে তাঁর গলার সুর সমান মিঠে।'

মুরগি উত্তর দিলে, 'ঠিক, ঠিক।'

'শুনেছি তাঁর সাড়া পেলে শিকরে বাজ আর একদণ্ড আকাশে তিষ্ঠে থাকতে পায় না, সবার মন আপনা হতেই কাজে লাগে।'

'ঠিক, ঠিক।'

'শুনেছি, ডিমের মধ্যে যে কচি কচি পাখি তাদেরও রক্ষে করে তাঁর গান, বেজি আর ভাম বাসার দিকে মোটেই আসে না।'

অমনি চড়াই বলে উঠল, 'তাওয়ায় চড়ানো ডিমসিদ্ধ খেতে।'

'ঠিক, ঠিক।'

পায়রা এবার আলসে থেকে একেবারে মুখ ঝুঁকিয়ে বললে, 'আর শুনেছি নাকি তিনি কী গুণগান জানেন, যার গুণে তিনি নাম ধরে ডাক দিলেই পৃথিবীর রাঙা ফুল, তারা শুনতে পায়, আর অমনি চারিদিকে ফুটে ওঠে, রাজ্যের অশোক শিমুল পারুল পলাশ জবা লাল পারিজাত গোলাপ আর গুল-আনার?'

'এও ঠিক সত্যি, ঠিক সত্যি।'

'আর নাকি যার গুণে এমন হয়, সে মন্তর জগতে তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।'

সাদা মুরগি উত্তর দিলে, 'না। শুনেছি, তাঁর পিয়ারী যে পাখি, সেও জানে না, কী সে মন্তর।'

'তাঁর পিয়ারী পাখিরা জানে না বলো।'

সাদা মুরগি উত্তর করলে না।

পায়রার একটিমাত্র পিয়ারী—কপোতনি; কাজেই কুঁকড়োর অনেক পিয়ারী শুনে সে একটু চমকে গেল। চড়াই বলে উঠল, 'অবাক হলে যে? কুঁকড়োর পিয়ারী অনেক হবে না তো কি তোমার হবে। তুমি তো বল কেবল ঘু ঘু, আর তিনি যে নানা ছন্দে গান করেন।'

পায়রা বললে, 'কী আশ্চর্য। তাঁর সব চেয়ে পিয়ারী মুরগি, সেও জানে না তবে কী সে মহামন্ত্র।'

অমনি সুরকি খাকি কালি সাদি গুলজারি যে যেখানে ছিল, সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, 'না গো না, জানি না তো, জানি না তো।'

এইসব কথা হচ্ছে, ইতিমধ্যে দেখা গেল একটি মনুয়া কুঞ্জলতার পাতার উপর এসে বসেছে আর একটা সরু আটাকাঠি আস্তে আস্তে মনুয়াটির দিকে বেড়ার ওধার থেকে এগিয়ে আসছে—কাঠির মাথায় সাপের চক্করের মতো দড়ির ফাঁস।

তালচড়াই মনুয়াটিকে দেখছে কিন্তু সেই একটুখানি মনুয়াকে ধরবার জন্যে অতবড় ফাঁস লাগানো আটাকাঠিটা যে এগিয়ে আসছে, সেটা তার চোখে পড়েনি। সে আপনার মনেই বকে যাচ্ছে, 'মন মনুয়া, বনের টিয়া।' হঠাৎ দূর থেকে কুঁকড়োর সাড়া এল, খবরদারি....। অমনি চমকে উঠে মনুয়া পাখি ডানা মেলে উড়ে পালাল, আটাকাঠিটা সাঁ করে একবার আকাশ আঁচড়ে বেড়ার ওধারে আস্তে আস্তে লুকিয়ে পড়ল।

চড়াইটা অমনি ব্যঙ্গ করে বলে উঠল, 'দেখলে কুঁকড়োর কীর্তি। এইবার কর্তা আসছেন।'

কুঁকড়ো আসছেন শুনে সবাই শশব্যস্ত। পায়রা এদিক ওদিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে, তালচড়াই সেটা সইতে না পেরে বললে, 'এমনি কি অদ্ভুত কুঁকড়োর চেহারাখানা। পাকা ফুটিতে দুটি সজনেখাড়া গুঁজে দাও, মাথার দিকে একটা বিটপালং কিম্বা কতকটা লাল পুঁইশাক, চোখের জায়গায় দুটো পাকা কুল, কানের কাছে ঝোলাও লাল দটো পুলি বেগুন, লেজের দিকে বেঁধে দাও আনারসের মুকুটি—ব্যস, জলজ্যান্ত কুঁকড়োটা গড়ে ফেলো।'

পেরু এই কুঁকড়োর রূপ বর্ণনা খুব মন দিয়ে শুনছিল, আর তালচড়াইয়ের বুদ্ধির তারিফ করছিল। পায়রা গলা ফুলিয়ে বললে, 'চড়াই ভায়া, তোমার কুঁকড়ো যে সাড়া দেয় না, দেখি।' চড়াই বললে, 'ওই ডাকটুকু ছাড়া আর সবখানি ঠিক কুঁকড়ো হয়েছে না?'

পায়রা রেগে গলা ফুলিয়ে বলে উঠল, 'বোকো না, বোকো না, মোটে না, মোটে না, বোকো না।' ঠিক সেই সময় বেড়ার উপরে ঝুপ করে এসে কুঁকড়ো বসলেন। পায়রা দেখলে মানিকের মুকুট আর সোনার বুকপাটায়

সেজে যেন এক বীরপুরুষ এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন। সন্ধ্যার আলো তাঁর সকল গায়ে পলকে পলকে রামধনুকের রঙ ধরে ঝিকমিক ঝিকমিক করছে, দৃষ্টি তাঁর আকাশের দিকে স্থির। মিষ্টি মধুর সুরে তিনি ডাকলেন, 'আ-লো। আ-লো। আ-লো।' তারপর তাঁর বুকের মধ্যে থেকে যেন সুর উঠল, 'অ-তু-ল ফু-উ-ল। আলোর ফুল! আলো—প্রাণের ফুলকি আলো, চোখের দৃষ্টি আলো, এসো ফুলের উপর দিয়ে, শিশির মুছে দিয়ে, এসো পাতায় লতায় ফুলে ঝিকমিক। আলোতে ঝিকমিক—দেখা দিক, সব দেখা দিক, ভিতরে যাক তোমার প্রভা, বাইরে থাক তোমার আভা, একই আলো ঘিরে থাক শতদিক শতধারে, অনেক আলোর এক আলো, অনেক ছেলের এক মা। তোমার স্তুতি গাই আলোকবাদিন, আলোকের স্তোতা। তোমায় দেখি ছোটো হতে ছোটো, বড়ো হতে বড়ো, নানাতে, নানাকালে—কাচে, মানিকে, মাটিতে, আকাশে, জলে-স্থলে; সকালে জ্বলজ্বল, সন্ধ্যায় ঝিলমিল, মন্দিরে, কুটিরে, পথে বিপথে। ভিখারির কাঁথার শোভা, রাজার পতাকায় প্রভা—আলো। বনের তলায় সোনার লেখা, সবুজ ঘাসে সোনার চুমকি, আলোর ফুলকি, আলপনা অ-তু-উ-ল অমূল আলো।'

আর সব পাখি যে যার কাজে ব্যস্ত ছিল, কেউ ধান খুঁটছিল কেউ গা ঝাড়ছিল, গুলজারি করছিল কিচমিচ, সুরকি মাখছিল ধুলো, খাকি ঘাঁটছিল ছাইপাঁশ, কালি খুঁড়ছিল গর্ত, সাদি মাজছিল গা, পেরু বকছিল বকবক, চড়াই বলছিল ছি ছি, কেবল সেই আকাশের মতো নীল পায়রা অবাক হয়ে শুনছিল—

জয় জয় আলোর জয়।

পায়রা আর স্থির থাকতে পারলে না, গলা কাঁপিয়ে দুই ডানা ঝটপট করে বলে উঠল, 'সাধু সাধু।' কুঁকড়ো আঙিনায় নেমে পায়রাকে দেখে বললেন, 'ধন্যবাদ হে অচেনা পাখি, এখনই কি যাওয়া হবে।'

পায়রা বললে, 'আপনার দর্শন পেয়ে কৃতার্থ হয়েছি, এখন ঘরে গিয়ে কপোতীকে আপনার আশীর্বাদ দিয়ে চরিতার্থ হই।' কপোতনির প্রবালের মতো রাঙা পায়ে নমস্কার জানিয়ে কুঁকড়ো কবুতকে বিদায় করলেন। পায়রা তালচড়াইয়ের ভাঙা খাঁচায় ডানার এক ঝাপটা মেরে গাঁয়ের দিকে উড়ে গেল।

চড়াইটা গজগজ করতে লাগল, 'শুঁড়ির জয় মাতালে কয়।' কুঁকড়ো ডাক দিলেন, 'কাজ ভুলো না, কাজ ভুলো না।' আর অমনি রাজহাঁস সে আর চুপচাপ বসে রইল না, পাতিহাঁস, চিনেহাঁস, সব হাঁসগুলোকে দিঘির পাড়ে জল খাইয়ে আনতে চলল। কুঁকড়ো হুকুম দিলেন, যত কুঁড়ে হাঁসের ছানা সবাইকে বেলা পড়বার আগে অন্তত বত্রিশটা করে গুগলি সংগ্রহ করে আনা চাই। একটা বাচ্চা মোরগ, তাকে পাঠালেন কুঁকড়ো বেড়ার উপর দাঁড়িয়ে চারশো বার 'কুকুর-কু' বলে গলা সাধতে, এমন চড়া সুরে, যেন ওদিকে পাহাড়ের ঠেকে তার গলার আওয়াজ এদিকের বনে এসে পরিষ্কার পৌঁছয়।

বাচ্চা মোরগ গলা সাধতে একটু ইতস্তত করছে দেখে কুঁকড়ো তাকে আস্তে এক ঠোকর দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে তার বয়েসে তাঁকেও প্রতিদিন ঠিক এমনি করেই গলা সাধতে আর পড়া মুখস্থ কণ্ঠস্থ সবই করতে হয়েছে। বাচ্চা মোরগের মা গুলজারি ছেলের হয়ে কুঁকড়োর সঙ্গে একটু কোঁদল করবার চেষ্টা করতেই, 'যাও, জালার মধ্যে ডিমগুলোতে তা দাও সারারাত।'—গুলজারির উপর এই হুকুম জারি করে আর সব মুরগিদের সবজি বাগানে যেসব পোকা শাক পাতা কেটে নষ্ট করছে, তার সব কটিকে বেছে সাফ করতে পাঠিয়ে দিয়ে কুঁকড়ো পেঁটরার মধ্যে তাঁর মায়ের কাছে উপস্থিত। কুঁকড়োর মা তাঁকে ধমকে বলে উঠল, 'এইটুকু বয়েসে তোর এই বিদ্যে হচ্ছে। কেবল টো টো করে ঘুরে বেড়ানো।' কুঁকড়ো একটু হেসে বললেন, 'মা, আমি যে এখন মস্ত এক কুঁকড়ো হয়ে উঠেছি।' 'যাঃ, যাঃ, বকিস নে। 'বেঙাচি বলতে চান তিনি কোলা ব্যাং, ওরে বাপু সময়েতে সব হয়, চিল হন চ্যাং।' আজ না হয় হবে কাল।' বলেই কুঁকড়োর মা পেঁটরার ডালাটা বন্ধ করলেন।

সাদি, কালি, সুরকি, খাকি-কুঁকড়োর মা-র চার বউ। কুঁকড়ো আসতেই তারা বলে উঠল, 'ঘরে কুঁড়োটি নেই যে তার কি করছ?' 'চরে খাওগে'—বলেই কুঁকড়ো গা ঝাড়া দিয়ে বসলেন। একদল বসে বসে খাবে আর পরচর্চা করবে, আর অন্যদল তাদের খোরাক জোগাবার জন্যে খেটে মরবে, কুঁকড়োর পরিবারে সেটি হবার জো নেই, তা তুমি উপোসই কর, আর না খেয়েই মর। কাজেই কালি সাদি সবাই যেখানে যা পায়, দুমুঠো খেয়ে নিতে চলল। কিন্তু খাকি—সে নড়তে চায় না, সাদিকে চুপিচুপি বললে, 'তোরা যা না, আমি সেই ঘড়ির মধ্যেকার পিউ পাখির সন্ধানে রইলেম।' বলে খাকি একটা ঝাঁপির আড়ালে লুকোল। আর সব মুরগি গেছে, কেবল সুরকি বসে বসে নখে মাটি খুঁড়ছে মুখ ভার করে, দেখে কুঁকড়ো শুধোলেন, 'তোর আজ হল কী!'

সুরকি ভয়ে ভয়ে ঢোক গিলে বললে, 'কুঁ-ক বলি—'

কুঁকড়ো গম্ভীর মুখে বললেন, 'বলেই ফেল না। বনিতার ভনিতার কবিতার কোনটা বাকি?' উত্তর হল, 'বল তো ভালোবাস, কিন্তু—'

'কথাটা চেপে যাও ছোটো বউ, চেপে যাও।' কুঁকড়ো উত্তর করলেন।

ছোটো বউ ছাড়বার পাত্রী নয়, কান্না ধরলে; 'না আমি শুনবই।' কুঁকড়ো বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'আর ছাই শুনবে কি-ই-ই।' কুঁকড়োকে সুরকি একলা পেয়ে কিছু মতলব হাসিলের চেষ্টায় আছে সব মুরগিই সেটা এঁচেছিল। তারা খাবারের চেষ্টায় কেউ যায়নি। এখন সাদি এক কোণ থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে বললে, 'তোমার পাটরানী আমি, সাদি।' কুঁকড়ো বিষম গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কে বললে—না।' সাদি একটু গলা চড়িয়ে বললে, 'আমায় বলতেই হবে।' ইতিমধ্যে এক দিক থেকে কালি এসে বলছে, খুব বিনিয়ে বিনিয়ে, 'কও, আমি তোমার সু-ও-রা-নী।' কুঁকড়ো ঠিক তেমনি সুরে উত্তর করলেন, 'কি—না—বল—গা।' কালি সুর ধরলে 'বল না, বল না...'। অমনি সাদি বলে উঠল, 'মন্তরটা কী? যার গুণে তুমি গুণীর মতো গান গাও?' কাছে ঘেঁষে সুরকিও সুর ধরলেন, 'হ্যাঁগা, শুনেছি তোমার গলার মধ্যে একটা পিতলের রামশিঙে পরানো আছে, আর তাতেই নাকি লোকে তোমার নাম দিয়েছে আম পাখি।'

কুঁকড়ো ব্যাপার বুঝে খুব খানিকটা হেসে মাথা হেলিয়ে বললেন, 'আছে তো আছে। এই গলার একেবারে টুঁটির ঠিক মাঝখানে খুব শক্ত জায়গায় সেটা লুকনো আছে, খুঁজে পাওয়া শক্ত।' বীজমন্তরটা মুরগিদের কানে দেবার জন্যে কুঁকড়ো মোটেই ব্যস্ত ছিলেন না, তবু খুব চুপিচুপি তাদের প্রত্যেকের কানের কাছে মুখ নিয়ে নিয়ে বললেন, 'দেখো, মাঠের মধ্যে যখন চরতে যাচ্ছ, তখন খবরদার ঘাসের ফুল মাড়িয়ো না, ফুলের পোকা খেয়ো কিন্তু ফুল যেন ঠিক থাকে। খবরদার, যা—ও।'

মুরগিরা চলে যাচ্ছিল, কুঁকড়ো তাদের ডেকে বললেন, 'জানো, যখন যাবে চরতে—'

এক মুরগি পাঠ বললে, 'বাগিচায়'। কুঁকড়ো বললেন, 'পয়লা মুরগি—।' ইস্কুলের মেয়েদের মতো সব মুরগি একসঙ্গে বলে উঠল, 'আগে যায়।' কুঁকড়ো হুকুম দিলেন, 'যা—ও।' মুরগিরা যাচ্ছিল, কুঁকড়ো তাড়াতাড়ি তাদের ডেকে সাবধান করে দিলেন, 'সড়ক পার হবার সময় রাস্তায় কি আছে, তা খুঁটে নেবার চেষ্টা করা ভুল, গাড়িচাপা পড়তে পারো।'

মুরগিরা ভালোমানুষের মতো বেড়ার ফাঁকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কুঁকড়ো চারিদিক দেখে বললেন, 'দুই তিন চার, সিধে হও পার।' ঠিক সেই সময় দূরে মটরগাড়ির ভেঁপু বাজল, 'হাউ মাউ—খাউ।' কুঁকড়োর অমনি সাড়া পড়ল—ভেঁপুর চেয়ে জোর আওয়াজ— 'স বু-উ-উ-র।' বেড়ার ধার দিয়ে সাঁ করে খানিক ধুলো আর ধোঁয়া গড়াতে গড়াতে চলে গেল। মিনিট কতক পরে যখন সব পরিষ্কার হল, তখন কুঁকড়ো মুরগিদের যাবার পথ ছেড়ে একপাশে সরে দাঁড়ালেন। একে একে মুরগিরা চলল, সাদি খাকি গুলজারি। সুরকি সবশেষে। সে কুঁকড়োকে বলে গেল, 'ক্যা ব্যাৎ, যা খাই তাতেই আজ তেল তেল গন্ধ করছে, যেন তেলাকুচোর তেলফুলুরি।' ঝাঁপির আড়ালে খাকি মুরগি, সে মনে মনে বললে, 'রক্ষে, তিনি আমাকে দেখেননি, বাঁচলেম বাপু।'

২

সাদি, কালি, গুলজারি—এরা সবাই সেটা জানবার জন্যে ধরাধরি করছে। পায়রা থেকে চড়াই এমনকি, টিকটিকি পর্যন্ত পাহাড়তলির এপাড়া ওপাড়ার ছেলেবুড়ো যে যেখানে আছে, সবাই যে লুকোনো জিনিসের কথা বলাবলি করছে, কুঁকড়ো সেই লুকোনো জিনিসের খবরটা বুকের মধ্যে নিয়ে বসে আছেন; কিন্তু মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারেন না, অথচ না বললেও বুক যে ফেটে যায়। অতি গোপনীয় বীজমন্ত্রটি যার কানে চুপিচুপি বলে দেওয়া চলে, এমন উপযুক্ত পাত্র—সে কোথা। এ যে অতি গোপন কথা, অতি নিগূঢ় রহস্য। মেয়েরা তো এ কথা একটি দিন চেপে রাখতে পারবে না। বিশেষত সাদি কালি সুরকি আর খাকি এমনই সব গুলবাহারি গুলজারি, যাঁদের মুখ চলছেই, তাঁদের এ কথা একেবারেই বলা যেতে পারে না, শোনবার জন্যে তাঁরা যতই ইচ্ছুক থাকুক না কেন। নাঃ, বুক ফেটে যায় যাক, মনের কথা মনেই থাক, গুপ্ত মন্তর, অন্তরের ভাবনা মন থেকে দূর করে যেমন আর সবাই, তেমনই আমিই বা কেন না থাকি—দিব্যি আরামে, পাহাড়তলির রাজবাহাদুর কুঁকড়ো। এইটুকুই যথেষ্ট, আর এইটুকুতেই আমার আনন্দ, কিমধিকমিতি। মনে মনে এই তর্কবিতর্ক করতে করতে বুক ফুলিয়ে কুঁকড়ো ধানের মরাইটার চার দিকে পা-চালি করছেন, আর এক একবার নিজের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে নিজেকে নিজে তারিফ করছেন, 'ক্যা খপ-সু র

তি ই-ই'। তাঁর মাথার মোরগফুলটা আর চোখের কোল থেকে ঝুলছে যে দাড়ি, তার মেহেদি রঙটা যে বনের টিয়া থেকে আরম্ভ করে লাল তুতির লালকেও হার মানিয়েছে এটা কুঁকড়োকে আর বুঝিয়ে দিতে হল না। তিনি খড়ের গাদার উপরে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের পানে একবার, মাঠের দিকে একবার, তাকিয়ে দেখলেন; সোনা আর মানিকের আভায় জল স্থল আকাশ রাঙিয়ে সন্ধ্যাটি কি চমৎকার সাজেই সেজে এসেছে। 'আজকের মতো দিনের শেষ কাজ সাঁঝি আলপনা দেওয়া হল, আজ করবার যা, তা সারা হয়েছে, কালকের চিন্তা কাল হবে, এখন আর কী, দু'মুঠো যা জোটে, খেয়ে নিতে ছু-টি-ই-ই।' বলেই কুঁকড়ো একটিবার ডাক দিয়ে চালাঘরের মটকা থেকে নেমে বাসার দিকে দৌড়ে যাবেন, ওদিক থেকে শব্দ এল, 'রও-ও-ও'! উঠানের মধ্যে শুকনো ঘাসের বোঝাটা একবার খসখস করে উঠল, আর তার তলা থেকে জিম্মা কুত্তানি খড় আর কুটোয় ঝাঁকড়া মাথাটা বের করে জুলজুল করে কুঁকড়োর দিকে চাইতে লাগল।

কুঁকড়ো আর কুকুরের চেহারায় মিল না হলেও নামে নামে যেমন কতকটা, কাজেও তেমনই অনেকটা মিল ছিল। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন দু'জনেরই জীবনের ব্রত। কাজেই দু'জনে যে ভাব খুবই হবে, তার আশ্চর্য কি। তা ছাড়া সূর্য আর মাটি দু'য়েরই পরশ দু'জনেরই ভালো লাগে। এই আকাশের আলো আর পৃথিবীর উপর ভালোবাসা এই দু'টি জীবকে যেন একসূত্রে বেঁধেছে। সূর্যের দিকে মুখ করে মাটির কোলে দুই পা রেখে না দাঁড়ালে কুঁকড়োর গান মোটেই খোলে না; আর কুকুর তার আনন্দই হয় না, রোদে মাটির উপরে এক একবার না গড়িয়ে নিলে। জিম্মা প্রায়ই বলে, 'সূর্যকে ভালোবাসে বলেই না সে চাঁদ দেখলেই তাড়া করে যায়, আর মাটিকে ভালোবাসে বলেই না সে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে মুখটি দিয়ে চুপটি করে থাকে।' ভালবাসার বশে জিম্মা বাড়ির বাগানটায় এত গর্ত করে রাখত যে এক একদিন বুড়ো ভাগবত মালি কর্তার কাছে কুকুরের নামে নালিশ জুড়ত। কিন্তু জিম্মার সব দোষ মাপ ছিল, গোলাবাড়ির সব জানোয়ারের খবরদারি, ক্ষেতে না গরুবাছুর ঢোকে তার দিকে নজর রাখা, এমনই সব পাহারার কাজে জিম্মার মতো আর তো দুটি ছিল না। তাছাড়া জিম্মার জিম্মায় অমন যে কুঁকড়ো এমনকি, তাঁর অত্যাশ্চর্য সুরটি পর্যন্ত রাত্রে না রাখলে চলে না; কাজেই কুকুর হঠাৎ যখন বললে, 'রও' তখন যে একটা বিপদের সম্ভাবনা আছে, সেটা জানা গেল। কিন্তু এমন কী বিপদ হতে পারে। কুঁকড়ো দেখলেন, অন্যদিন যেমন আজও সন্ধ্যাবেলা ঠিক তেমনই চারিদিক নিরাপদ বোধ হচ্ছে, অন্তত তাঁর এই গোলাবাড়ির রাজত্বের বেড়ার মধ্যে কোনও যে শত্রু আছে, তা তো কিছুতেই মনে হয় না। সে যে মিছে ভয় পাচ্ছে সেটা তিনি জিম্মাকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করলে। ভয় কাকে বলে কুকুরের জানা ছিল না; কিন্তু মিথ্যুক আর মিছে নিন্দে রটাতে গোলাবাড়িতে আর পাড়াপড়শির ঘরেতে যারা, তাদের সে ভালোরকমই জানত। কুঁকড়ো না জানলেও ওই বোঁচা ঠোঁট চড়াই আর ডিগডিগে পা ময়ূর যে কুঁকড়োর দুই প্রধান শত্রু, সেটা জিম্মা কুঁকড়োকে জানিয়ে দিতে বিলম্ব করলে না। তালচড়াই, যার নিজের কোনও আওয়াজ নেই, হরবোলার মতো পরের জিনিস নকল করেই চুলবুল করে বেড়ায়, পরের ধনে পোদ্দারি যার পেশা, আর ওই ময়ূর, জরি-জরাবৎ আর হীরে-মানিকের ঝকমকানি ছাড়া আর কোনও আলো যার ভিতরে বাহিরে কোথাও নেই, দরজি আর জহুরির দোকানের নমুনা ঝোলাবার আলনা ছাড়া আর কিছুই যাকে বলা যায় না, এই অদ্ভুত জানোয়ার তাঁর প্রধান শত্রু শুনে কুঁকড়ো একেবারে 'হাঃ হাঃ' করে হেসে উঠলেন। জিম্মা বললে, 'কারও সঙ্গে খোলাখুলি শত্রুতা করবার সাহস আর ক্ষমতা না থাকলেও এরা সবাইকে হেয় মনে করে, এমনকি, কুঁকড়োর নিন্দেও সুবিধে বুঝে করতে ছাড়ে না। এবং খাওয়া পরা সাজগোজের দিক দিয়েও এরা পাড়ার মধ্যে নানা বদ চাল ঢোকাচ্ছে। এদের দেখাদেখি অন্যেরাও বেয়াড়া বেচাল বেয়াদব হয়ে ওঠবার জোগাড়ে আছে। সাদাসিধেভাবে খেটেখটে পাড়াপড়শিকে ভালোবেসে আনন্দে থাকতে চায় যেসব জীব, তাদের এ সব সাজানো পাখিরা বলে 'ছা-পোষার' দল। আর নিষ্কর্মা বসে থাকা পালকের গদিতে কিম্বা মাথায় পালক গুঁজে হাওয়া খেয়ে ঘুরঘুর করাকেই এরা বলে চাল। সেটা রাখতে চালের সব খড় উড়ে গেলেও এরা নিজের বুদ্ধির প্রশংসা নিজেরাই করে থাকে, আর অনেক সুবুদ্ধি পাখির মাথা ঘুরিয়ে দেয় দুর্বুদ্ধি এই দুই অদ্ভুত জানোয়ার, কথাসর্বস্ব হরবোলা আর পাখা সর্বস্ব চালচিত্র।'

কুঁকড়ো কাজে যেমন দড়, বুদ্ধিতে তেমনই; চড়াই আর ময়ূরের চেয়ে অনেক বড়ো, দিলদরিয়া, কাজেই পৃথিবীতে অন্তত এই গোলাবাড়িতে যে তাঁর কেউ গোপনে সর্বনাশের চেষ্টায় আছে, এটা বিশ্বাস করা কুঁকড়োর পক্ষে শক্ত। তিনি বললেন, 'জিম্মা নিশ্চয়ই একটু বাড়িয়ে বলছে, অন্যের সামান্য দোষকে সে এত যে বড়ো করে দেখছে, সে কেবল তাঁকে সে খুবই ভালোবাসে বলে। চড়াই হল তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু আর ময়ূরটা লোক তো

খুব মন্দ নয়। আর যদিই বা তাঁর শত্রু সবাই হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি। তিনি তাঁর গান এবং মুরগিদের ভালোবাসা পেয়েই তো সুখী, নাইবা আর কিছু থাকল।'

জিম্মা অনেকদিন এই গোলাবাড়িটায় রয়েছে, এখানকার কে যে কেমন, তা জানতে তার বাকি ছিল না। কুঁকড়োর উপরে মুরগিদেরও যে খুব টান নেই, তারও প্রমাণ অনেকবার পাওয়া গেছে। 'বিশ্বাস কাউকে নেই।' বলেই জিম্মা এমনই এক হুংকার ছাড়ল যে পাঁচিলের গায়ে চড়াই পাখির খাঁচাটা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। 'ব্যাপার কি!' বলে চড়াই কুঞ্জলতার মাচা বেয়ে নিচে উপস্থিত। জিম্মা চড়াইকে সাফ জবাব দেবার জন্যে চেপে ধরলে। আড়ালে একরকম আর কুঁকড়োর সামনে অন্যরকম ভাব দেখানো আর চলছে না। বলুক সে চড়াইটা সত্যিই কুঁকড়োকে পছন্দ করে কি না, না হলে আজ আর ছাড়ান নেই। চড়াই মনে মনে বিপদ গুনলে। কিন্তু কথায় তার কাছে পারবার জো নেই। সে অতি ভালোমানুষটির মতো উত্তর করলে, 'কুঁকড়োকেও টুকরো টুকরো করে দেখলে বাস্তবিকই আমার হাসি পায়; আর তার খুঁটিনাটি এটি ওটি নিয়েই আমি তামাশা করে থাকি। কিন্তু সবখানা জড়িয়ে দেখলে কুঁকড়োকে আমার শ্রদ্ধাই হয় বলতে হবে। শুধু তাই নয়, কুঁকড়োর খুঁটিনাটি নিয়ে আমি যে ঠাট্টা-তামাশাগুলো করে থাকি, সেগুলো সবাই যে অপছন্দ করে না, সে তো তুমিও জানো জিম্মা।'

জিম্মা ভারি বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, 'শোনো একবার, কথার ভাঁওরাটা শোনো। বাইরের বনে সোনার আলো, ফুলের মধু থাকতে যে পাখিটা দরজা ভাঙা খাঁচায় বসে বাসি ছাতু খেয়ে পেট ভরাচ্ছে, তার কাছে পরিষ্কার জবাব আশা করাই ভুল।'

চড়াই বলে উঠল, 'সাধ করে কি আমি খাঁচায় বাসা বেঁধেছি। বাইরে সোনার আলো আর সোনালি মধু সময়ে সময়ে যে সীসের গরম গরম ছররা গুলি হয়ে দেখা দেয় দিদি।'

জিম্মা ভারি চটেছিল। উত্তর করলে, 'আরে মুখখু, কোনদিন কবে একটা আধটা কার্তুজের খোলা ঢেলার মতো খুরে লাগল বলে বনের হরিণ সে কি কোনওদিন বনের থেকে তফাত থাকতে চায়, না আকাশে বাজ আছে বলে কেউ আকাশের আলোটা আর আকাশে ওড়াটা অপছন্দ করে। ভাঙা খাঁচার পুষ্যিপুত্তুর হরবোলা। ফুলে-ফলে আলোতে-ছায়ায় অতি চমৎকার বনে-উপবনে যে মুক্তি, তুই তার কি বুঝবি।'

চড়াই উত্তর দিলে, 'বেঁচে থাক আমার ভাঙা খাঁচার দাঁড়খানি। কাজ নেই আমার মুক্তিতে। রাজার হালে আছি, পরিষ্কার কলের জল খাচ্ছি, মস্ত সাবানদানিতে দু'বেলা গরমের দিনে নাইতে পাচ্ছি, দোলনা চৌকি, চানের টব বনে এসব পাই কোথা, বল তো দিদি।'

জিম্মা এমন রেগেছিল যে, গলার শিকলিটা খোলা পেলে সে আজ চড়াইটার গায়ের একটি পালকও রাখত না, মেরেই ফেলত।

এই ব্যাপার হচ্ছে, এমন সময় বাড়ির মধ্যে ঘড়ি বাজল, 'পি-উ'।

যেমন 'পিউ' বলা, অমনি খাকি মুরগি ঝুড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে সেদিকে দৌড়। গর্তের মধ্যে মুখ দিয়ে সে কিন্তু কিছুই দেখতে পেলে না; এবারও তার আশা পুরল না, সময় উতরে গেছে, পিউ পাখি পালিয়েছে।

চড়াই খাকিকে বললে, 'কি দেখছ গো। এক পহরের ঘড়ি পড়ল নাকি।'

কুঁকড়ো খাকিকে গোলাবাড়িতে দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'তুই যে চরতে যাসনি?'

খাকি চমকে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে ডানার ঘোমটায় মুখ ঝাঁপলে।

কুঁকড়ো শুধোলেন, 'গর্তটার মধ্যে মুখ গুঁজড়ে হচ্ছিল কি, শুনি।'

খাকি আমতা আমতা করে বললে, 'এই চোখ আর ঘাড়টা টনটন করছিল—'

'কাকে দেখবার জন্যে।' কুঁকড়ো শুধোলেন। খাকি বললেন, 'কাকে আবার।' কুঁকড়ো বললেন, 'হাঁ, শুনি, কাকে।'

খাকি কান্নার সুর ধরলে, 'তুমি বল কি গো।' কুঁকড়ো ধমকে বললেন, 'চোপরাও, সত্যি কথা বল।' খাকি বিনিয়ে বিনিয়ে বললে, 'পিউ পাখিকে।'

কুঁকড়ো খাকির দিক থেকে একেবারে মুখ ফেরালেন, খাকি আস্তে আস্তে পগার পারে দৌড় দিলে।

কুঁকড়ো কুকুরকে বললেন, 'একটা ঘড়িকে ভালোবাসা, এমন তো কোথাও শুনিনি। এ বুদ্ধি খাকিকে দিলে কে বলো তো।'

'ওই ছিটের মেরজাই পরা চিনে মুরগিটার কাজ।' কুকুর উত্তর দিলে।

কুঁকড়ো শুধোলেন, 'কোন মুরগিটি, বলো তো। ওই যেটা বুড়ো বয়েসে ঠোঁটে আলতা দিয়ে বেড়ায় সেইটে নাকি।'

কুকুর উত্তর করলে, 'হাঁ হাঁ, সেই বটে। তিনি যে আবার সবাইকে বৈকালি পার্টি দিচ্ছেন।'

'কোথায় সেটা হচ্ছে।' কুঁকড়ো শুধোলেন।

চড়াই উত্তর দিলে, 'ওই কুল গাছটার তলায় যেখানে পাখি তাড়াবার জন্যে একটা খড়ের সাহেবি কাপড় পরা কুশপুতুলের কাঠামো মালি খাড়া করে রেখেছে, সেইখানে। খুব বাছা বাছা নামজাদা পাখিরাই আজ যাবেন। কাঠামোর ভয়ে ছোটোখাটো পাখিরা সেদিকে এগোতেই সাহস পাবে না।'

কুঁকড়ো আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'বল কি, চিনে মুরগির বৈকালি!'

চড়াই ঠিক তেমনি সুরে উত্তর দিলে, 'হাঁ মশায়, প্রতি সোমবার পাঁচ হইতে ছয় ঘটিকা পর্যন্ত মুরগি-গিন্নির ঘোরো মজলিস হইয়া থাকে।'

'তা হলে আজ বৈকালে—' কুঁকড়ো আরও কি শুধোতে যাচ্ছিলেন, চড়াই বলে উঠল, 'না, আজ ভোরবেলায়।'

'ভোরবেলায় বৈকালি তো কখনও শুনিনি হে।' কুঁকড়ো আশ্চর্য খুবই হলেন। চড়াই তখন কুঁকড়োকে বুঝিয়ে দিলেন, 'ভোর পাঁচটায় বাগানে মালি তো থাকে না, তাই বিকেল ৫টা না করে সকাল ৫টাই ঠিক হয়েছে।'

'এ কি বিপরীত কাণ্ড।' বলে কুঁকড়ো 'হো হো' করে হেসে উঠলেন। চড়াই অমনি বলে উঠল, 'বিপরীত বলে বিপরীত!' জিম্মা তাকে ধমকে বললে, 'তোমার আর খোশামুদিতে কাজ নেই, তুমি নিজে তো কোনও সোমবারে পার্টিগুলো কামাই দাও না দেখি।'

চড়াই উত্তর করলে, 'সত্যি যাই বটে, সবাই আমাকে খাতির করে কিনা।'

জিম্মা গজগজ করে খানিক কি বকে গেল। জিম্মা কি বকছে শুধোলে কুঁকড়োকে সে জবাব দিলে, 'কোনদিন হয়তো তোমাকেও কোন এক মুরগি এই পার্টিতে নিয়ে হাজির করেছে, দেখব।'

কুঁকড়ো হেসে বললেন, 'আমাকে হাজির করে দেবে, চা-পার্টিতে, কোনও এক মুরগি!'

জিম্মা বললে, 'হাঁ মশায়, এমনি হাজির করা নয়, মাথার ঝুঁটিটি ধরে টানতে টানতে না হাজির করে।'

কুঁকড়ো একটু চটেই জিম্মাকে বললেন, 'এ সন্দেহটা তোমার করবার কারণটি কি।'

জিম্মা জবাব দিলে, 'কারণ নতুন মুরগির দেখা পেলে মশায়ের মাথা সহজেই ঘুরে যায় এখনও।'

চড়াই বলে উঠল, 'জিম্মা-দি ঠিক বলেছে, নতুন মুরগি যেমন দেখা, অমনি কুঁকড়ো-মশায় এমনি করে ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে 'কুক কুক' বলে নৃত্য করতে থাকেন, মুরগিটির চারিদিকে।' বলে চড়াইটা একবার কুঁকড়োর চলন-বলন হুবহু দেখিয়ে দিলে।

কুঁকড়ো হেসে বললেন, 'আচ্ছা বেকুফ পাখি যা হোক।'

চড়াইটা তখনও ডানা কাঁপিয়ে লেজ দুলিয়ে কুঁকড়োর মতো তালে তালে পা ফেলে মোরগ-মুরগির নকল দেখাচ্ছে, ঠিক সেই সময় ওদিকে দুম করে বন্দুকের আওয়াজ হল। চড়াই অমনি কাঠের পুতুলের মতো এক পা তুলেই দাঁড়িয়ে গেল। কুঁকড়ো গলা উঁচু করে, আর কুকুর কান খাড়া করে নাক ফুলিয়ে শুনতে লাগল। আর এক গুলির আওয়াজ। চড়াইটা গিয়ে মুরগি-গিন্নির ভাঙা পেঁটরার আড়ালে লুকিয়েছে, এমন সময় উহু উ উ উ বলতে বলতে সোনার টোপর সোনালিয়া বনমুরগি কুঞ্জলতার বেড়ার ওপার থেকে ঝপাং করে উড়ে এসে উঠোনের মধ্যে পড়ল।

কুঁকড়ো বলে উঠলেন, 'একী। এ কে! কে এ।'

সোনালিয়া কুঁকড়োর কাছে ছুটে গিয়ে বললে, 'পাহাড়তলির 'শা মোরগ', আপনি আমায় রক্ষে করুন।' আবার দুম করে আওয়াজ। সোনালিয়া চমকে উঠেই অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়লেন, পালাবার আর শক্তিই ছিল না। কুঁকড়ো অমনি একখানি ডানা বাড়িয়ে সোনালিয়াকে তুলে ধরে আর এক ডানার ঝাপটা দিয়ে গামলা থেকে জলের ছিটে আর বাতাস দিতে থাকলেন খুব আস্তে আস্তে। তাঁর ভয় হচ্ছিল পাছে পাতার সবুজ, ফুলের গোলাপি, সোনার জল আর সন্ধ্যাবেলার আলো দিয়ে গড়া বাসন্তী শাড়িপরা এই আশ্চর্য পাখিটি জল পেয়ে গলে

যায়, কি বাতাসে মিলিয়ে যায়। একটু চেতন পেয়ে সোনালিয়া আবার কুঁকড়োকে মিনতি করতে লাগল, 'ওগো একটু আমায় লুকোবার স্থান দাও, আমাকে পেলে তারা মেরেই ফেলবে।'

চড়াই সোনালিয়ার গায়ে টকটকে লাল সাটিনের কাঁচুলি দেখে বললে, 'এতখানি লালের উপর থেকে শিকারির বন্দুকের তাগ কেমন করে যে ফসকাল, তাই ভাবছি।'

সোনালিয়া বললে, 'সাধে কি গুলি ফসকেছে, চোখে যে তাদের ধাঁধাঁ লেগে গেল। তারা মনে করেছিল, ঝোপের মধ্যে থেকে ছাই রঙের একটা তিতির-মিতির কেউ বার হবে, কিন্তু আমি সোনালি যখন হঠাৎ বেরিয়ে গেলুম সামনে দিয়ে তখন শিকারী দেখলে খানিক সোনার ঝলকা, আর আমি দেখলেম একটা আগুনের হলকা। গুলি যে কোনদিকে বেরিয়ে গেল কে তা দেখবে। কিন্তু ডালকুত্তোটা আমায় ঠিক তাড়া করে এল। কুকুরগুলো কী বজ্জাত!' এমন সময় জিম্মাকে দেখে—'অন্য কুকুর নয়, ওই ডালকুত্তাগুলোর মতো বজ্জাত দেখিনি, বাপু।' এই বলে সোনালিয়া একটু লুকোবার স্থান দেখিয়ে দিতে কুঁকড়োকে বারবার বলতে লাগল। কুঁকড়ো একটু সমস্যায় পড়লেন। আগুনের ফুলকি এই সোনালিয়া পাখি, একে কোন ছাইগাদায় তিনি লুকোবেন। তিনি দু-একবার এ কোণ ও কোণ দেখে, এখানটা ওখানটা দেখে বললেন, 'না, এঁকে আর রামধনুককে লুকোতে পারা কঠিন।'

জিম্মা বললে, 'আমার ওই বাক্সটা মধ্যে লুকোতে পারা যেতে পারে, ইনি যদি রাজি হন।'

'ভালো কথা।' বলেই সোনালি গিয়ে বাক্সে সেঁধোলেন, কিন্তু অনেকখানি সোনালি আঁচল বাক্সের বাইরে ছড়িয়ে রইল, জিম্মা সেটুকু ঢেকে চেপে গম্ভীর হয়ে বসল।

জিম্মা বেশ বাগিয়ে বসেছে, এমন সময় বেড়ার ওধার থেকে ঝোলা কান গালফুলো ডালকুত্তা 'তম্মা' উঁকি দিলেন। জিম্মা যেন দেখতেই পায়নি এই ভাবে রুটিই চিবোচ্ছে। তম্মা বললে, 'উঃ কিসের খোসবো ছাড়ছে।' জিম্মা সামনের থালাখানা দেখিয়ে বললে, 'আজ একটু বনমুরগির ঝোল রাঁধা গেছে।'

ডালকুত্তা এবার পষ্ট করে শুধোলে, জিম্মা এদিকে একটা সোনালিয়া পাখিকে আসতে দেখেছে কিনা। কুঁকড়ো সে কথা চাপা দিয়ে বলে উঠলেন, 'তম্মার মুখটা কেমন গোমসা দেখাচ্ছে না, জিম্মা।'

জিম্মা ধীরে সুস্থে উত্তর করলে, 'একটা সোনালি টিয়ে মাঠের ওপর দিয়ে উড়ে গেল দেখেছি, ওই ওদিকে—।' তম্মাটা আকাশে নাক তুলে কেবলই শুঁকতে লেগেছে, বনমুরগির গন্ধটা সত্যিই জিম্মার থালা থেকে আসছে কি না। কুঁকড়োর বুকের ভিতরটা বেশ একটুখানি গুরগুর করছে, এমন সময় দূর থেকে শিকারি সিটি দিয়ে তম্মাকে ডাক দিলে। তম্মা চলল দেখে কুঁকড়ো আর জিম্মা 'রাম বলো' বলে হাঁফ ছাড়তেই চড়াইটা ডাক দিলে, 'বলি তম্মা।'

'করো কী।' বলে কুঁকড়ো তাকে এক ধমক দিলেন, কিন্তু চড়াইটা আরও চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'বলি, ও তম্মা।' তম্মার গোমসা মুখটা আবার বেড়ার ওপর দিয়ে উঁকি দিলে। কুঁকড়ো রেগে ফুলতে লাগলেন, চড়াই তম্মাকে বললে, 'খুঁজে খুঁজে নারি যে পায় তারি।'

তম্মা শুধোলে, 'কী খুঁজে দেখি, বলো তো ভাই?'

'চটপট তোমার ফোগলা গালের চির খাওয়া দাঁতটি।' বলেই চড়াই সট করে নিজের খাঁচায় ঢুকল; 'চোপরাও' বলে তম্মা সে তল্লাট ছেড়ে চোঁ চা চম্পট।

৩

ডালকুত্তোটা মাঠের ওপারে চলে গেছে। কুঁকড়ো সবাইকে অভয় দিয়ে ঘরের মটকা থেকে হাঁক দিলেন, 'ত-ত-তফাত গিয়া।' অমনি সে সোনালিয়া বাক্সের মধ্যে থেকে বেরিয়ে উঠোনময় নেচে বেড়াতে লাগল যেন আলোর চরকিবাজি। কুঁকড়ো তার সেই ঝকঝকে রূপ দেখে ভারি খুশি হয়ে মনে মনে বললেন, 'আহা, এমন পাখিকেও কেউ গুলি করে। এর দিকে বন্দুক করা, আর একটি মানিকের পিদুমে তাগ করা একই।' সোনালির কাছে আস্তে আস্তে এসে কুঁকড়ো শুধোলেন, 'সূর্যের আলোর মতো কোন পুব আকাশের সোনার পুরী থেকে তুমি এলে সোনালিয়া বনমুরগি।'

সোনালি মাখমের মতো নরম সুরে বললে, 'আমি ওই বনে আছি বটে কিন্তু ওটা তো আমার দেশ নয়।' কুঁকড়ো তাঁর সবচেয়ে মিষ্টি সুরে শুধোলেন, 'তবে কোথায় তোমার দেশ সোনালিয়া বিদেশিনি।' সোনালি

উত্তর করলে, 'তা তো মনে নেই। শুনেছি বরফের পাহাড়ের ওপারে যে দেশ, সেখানকার মাটি ফুলকাটা গালচেতে একেবারে ঢাকা, সেইখানের কোন অশোকবনের রানির মেয়ে আমি। আমার একটু একটু স্বপ্নের মতো মনে পড়ে—চমৎকার নীল আকাশের তলায় বড়ো বড়ো গাছের ছাওয়ায় সখীদের সঙ্গে খেলে বেড়াচ্ছি অশোকবনের দুলালী। আমাদের ঘরের চারিদিকে কত রঙের ফুল ফুটেছে, ভোমরা সব উড়ে উড়ে পদ্মের মধু খেয়ে যাচ্ছে। কেবল পাখি আর প্রজাপতি আর ফুল। একটাও শিকারি ডালকুত্তা নেই। মানুষরা পর্যন্ত সেখানে আমাদের মতো চমৎকার সব রঙিন সাজে সেজে রাজারানীর মতো বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। নন্দনকাননে আনন্দে ঘুরে বেড়াতেই আমি জন্মেছি, ডালকুত্তার তাড়া খেয়ে ছুটোছুটি করে মরতে তো নয়। আহা, সেখানকার সূর্যের লাল আভা রক্তচন্দন আর কুসুম ফুলের রঙে মিশিয়ে বুকে মেখে রেখেছি, এই দেখো।' বলে সোনালিয়া কুঁকড়োর গা ঘেঁষে দাঁড়াল। কুঁকড়ো আনন্দে ডগমগ হয়ে ঘাড় দুলিয়ে ডানা কাঁপিয়ে তালে তালে পা ফেলে সোনালিয়ার চারিদিকে খানিক নৃত্য করে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বললেন, 'মনো মোনালিয়া। শোনো সোনালিয়া বিদেশিনি বনের টিয়া—।' হঠাৎ সোনালি বলে উঠল, 'ইস।'

কুঁকড়ো একটু থতমত খেয়ে গেলেন। বুঝলেন সোনালিয়া সহজে ভোলবার পাত্রী নয়। যে কুঁকড়ো তাদের দিকে একটিবার ঘাড় হেলালে সাদি কালি গোলাপি গুলজারি সব মুরগিই আকাশের চাঁদ হাতে পায় মনে এমনি করে সেই জগৎবিখ্যাত কুঁকড়োকে সোনালি মুখের সামনে শুনিয়ে দিলে যে জগতের সবাই যাকে ভালোবাসে এমন কুঁকড়োয় তার দরকার নেই! সে বেছে বেছে সেই কুঁকড়োকে বিয়ে করবে যার নামযশ কিছুই থাকবে না; থাকবার মধ্যে থাকবে যার মনো মোনালিয়া বনের টিয়া একমাত্র মুরগি।

কুঁকড়ো খানিক চুপ করে থেকে বললেন, 'একবার গোলাবাড়ির চারদিক দেখে আসবেন চলুন।' বলে তিনি সোনালিয়াকে খুব খাতির করে সব দেখাতে লাগলেন। প্রথমেই, যেটা থেকে অজ্ঞান হয়ে পড়লে সোনালিয়ার মুখে চোখে জল ছিটিয়ে কুঁকড়ো তাকে বাঁচিয়েছিলেন সেই টিনের গামলাটা আর যে কাঠের বাক্সটায় সোনালিয়াকে লুকিয়ে রেখে তম্মার চোখে ধুলো দিয়েছিলেন সেই দুটো জিনিস দেখিয়ে বললেন, 'এগুলো নতুন কিনা, কাজেই কুচ্ছিত; কিন্তু পুরনো দেয়াল, ভাঙা বেড়া, ফাটা দরজা, পুরনো ওই মুরগির ঘরটি আর কতকালের ওই লাঙল, ধানের মরাই আর ওই শেওলায় সবুজ খিড়কির দুয়োর আর পানাপুকুর আর ওই কুঞ্জলতার থোকা থোকা ফুল, কী সুন্দর এগুলি!'

সোনালিয়া কোনওদিন তো ঘরকন্নার ব্যাপার দেখেনি, সে কেবলই কুঁকড়োকে শুধোতে লাগল, 'এ সব নতুন জিনিসের মধ্যে থাকায় কোনও ভয় নেই তো।' কুঁকড়ো তাকে বললেন, 'আমরা বেশ নির্ভয়ে আছি—মোরগ মুরগি হাঁস এবং মানুষ। কেননা, এ বাড়ির কর্তা—তিনি নিরামিষ খান, কাজেই আণ্ডা বাচ্ছা নিয়ে আমাদের সুখে থাকবার কোনও বাধা নেই। ওই দেখুন না, বেড়াল পাঁচিলের উপর ঘুমিয়ে আছে, আর ঠিক তার নিচেই আমার সব ছোট বাচ্ছাটা খেলে বেড়াচ্ছে গাঁদা গাছটার তলায়।' ইতিমধ্যে চড়াইটা চট করে কখন চিনে মুরগিকে সোনালিয়ার খবরটা দিয়ে ফুড়ুৎ করে উঠোনে এসে বসল। সোনালিয়া শুধোলেন, 'ইনি?' চড়াই অমনি উত্তর দিলে, 'ইনি এইমাত্র চিনে মুরগিকে আপনার শুভ আগমন জানিয়ে এলেন। তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলেন বলে।' কুঁকড়ো পরিচয় দিলেন, 'ইনি তাল-চটকমশায়, সর্বদা কাজে ব্যস্ত।' সোনালিয়া শুধোলে, 'কী কাজ।' চড়াই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলে, 'বড় কঠিন কাজ, নিজের ধান্ধায় ফিরছেন ইনি, পাছে কেউ উপর-চাল চেলে টেক্কা দেয়।'

সোনালিয়া বললে, 'হ্যাঁ কাজটা শক্ত বটে, কিন্তু অতি ছোটো।'

কুঁকড়ো অন্য কথা পেড়ে সোনালিয়াকে চুনখসা দেয়ালের ধারে পুরনো জাঁতাটা দেখিয়ে বললেন, 'ওই পাঁচিলটার উপরে দাঁড়িয়ে আমি যখন গান করি তখন সোনালি রঙের গিরগিটিগুলো দেয়ালের গায়ে চুপ করে বসে শোনে। মনে হয় যেন ওই জাঁতার মোটা পাথর দু'খানাও দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসে বসে আমার গান শুনছে। এইখানটিতে আমি গান গাই, এইখানের মাটি আমি পরিষ্কার করে আঁচড়ে রেখেছি। আর এই যে পুরনো লাল মাটির গামলা, গানের পূর্বে ও পরে প্রতিদিন এরই থেকে এক চুমুক জল না খেলে আমার তেষ্টাও ভাঙে না, গলাও খোলে না।' সোনালিয়া একটু হেসে বললে, 'তোমার গলা খোলা না খোলায় বুঝি খুব আসে যায় তোমার বিশ্বাস।'

'অনেকটা আসে যায় সোনালি।' গম্ভীরভাবে কুঁকড়ো বললে।

'কী আসে যায় শুনি।' সোনালিয়া নাক তুলে বললে।

কুঁকড়ো বললেন, 'ওই গোপন কথাটা কাউকে বলবার সাধ্য আমার নেই।'

'আমাকেও না?' কুঁকড়োর দিকে এগিয়ে এসে অভিমানের সুরে সোনালিয়া বললে, 'আমি যদি বলতে বলি, তবুও না?'

কুঁকড়ো কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে সোনালিকে এক বোঝা কাঠ দেখিয়ে বললেন, 'আমাদের প্রিয় বন্ধু, রান্নাঘরে শ্মশানে চ, ইনি চালা কাঠ।' 'এ যে আমার বন থেকে চুরি করা দেখছি।' বলে সোনালিয়া আবার শুধোলে, 'তবে তোমারও একটা গুপ্ত মন্তর আছে।'

'হ্যাঁ বনমুরগি।' এই কথাটা কুঁকড়ো এমনই সুরে বললেন যে সোনালিয়া বুঝলে গোপন কথাটা জানবার চেষ্টা এখন বৃথা।

কুঁকড়ো সোনালিকে নিয়ে গোলাবাড়ির বাইরের পাঁচিলে উঠলেন। সেখান থেকে তিনি দেখালেন দূরে পাহাড়ের গা বেয়ে জলের মতো সাদা একটা সরু সাপ কতদিন ধরে যে নামছে তার ঠিক নেই।

সব দেখে শুনে সোনালিয়া কুঁকড়োকে বললে, 'এইটুকু জায়গা, তাও আবার নেহাত কাজ-চলা গোছের জিনিসপত্তরে ভরা, এখানে একঘেয়ে দিনগুলো কেমন করে তোমরা কাটাও বুঝি না। আকাশ দিয়ে যখন পাখিরা উড়ে চলে তখন তোমার মন নতুন দেশ বড় পৃথিবীটা দেখবার জন্যে একটুও আনচান করে না?'

কুঁকড়ো বললেন, 'একটুও নয়। পৃথিবীতে একঘেয়ে দিনও নেই, পুরনোও কিছু হয় না। আমি এইটুকু জায়গাকেই প্রতিদিন নতুন নতুন ভাবে দেখতে পাই। কিসের গুণে তা জানো? আলোর গুণে।'

সোনালি অবাক হয়ে বললে, 'আলোর গুণে। সে আবার কী রকম।'

'দেখো সে।' বলে কুঁকড়ো একটি স্থলপদ্মের গাছ দেখিয়ে বললেন, 'দিনের আলোর সঙ্গে এই ফুলের রঙ ফিকে থেকে গাঢ় লাল হবে দেখবে। এই খড়ের কুটিগুলো আর এই লাঙলের ফলাটা আলো পেয়ে দেখো কত রকমই রঙ ধরছে। ওই কোণে মইখানার দিকে চেয়ে দেখো ঠিক মনে হচ্ছে নাকি এটা যেন দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে আর ধানখেতের স্বপ্ন দেখছে। আর মানুষ যেমন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, ঠিক তেমনি করে ওই পিঁপড়েগুলো দেখো এই চিনেমাটির জালাটার চারিদিক প্রদক্ষিণ করে আসছে আট পল এক বিপলের মধ্যে। পলকে পলকে এখানকার সব জিনিসই নতুন নতুন ভাব নিয়ে দেখা দিচ্ছে নতুন আলোতে। আর আমিও কুঁকড়ো ওই মইখানার মতো আপনার কোণটিতে দাঁড়িয়ে রোজ রোজ কত আশ্চর্য ব্যাপারই দেখছি। দেখে দেখে চোখ আর তৃপ্তি মানছে না; চোখের দৃষ্টি আমার নতুনের পর নতুন, ছোটো এই গোটাকতক জিনিসের অফুরন্ত শোভা, এই ক'টা সামান্য জিনিসের অসামান্য রূপ দেখতে দেখতে দিন দিন খুলেই যাচ্ছে, বেড়েই চলেছে, ডাগর হয়ে উঠছে মহা বিস্ময়ে। ওই কুঞ্জলতার কুঁড়িটি ফুটতে দেখে যে আনন্দ পাই, মুরগির ডিমগুলি যখন ফোটে বাচ্চাগুলির চোখ যখন ফোটে তখনও আমি তেমনি আনন্দ পেয়ে গেয়ে উঠি। এইটুকু জায়গা, এখানে কী যে সুন্দর নয় তা তো আমি জানি নে।'

কুঁকড়োর কথা শুনতে শুনতে সোনালিয়া ক্রমেই অবাক হচ্ছিল। ছোটোখাটো সব সামান্য জিনিসের উপরে আলো ধরে এমন চমৎকার করে তো কেউ তাকে দেখায়নি। আপনার ছোটো কোণটিতে চুপচাপ বসে থেকেও যে সবই খুব বড়ো করে দেখা যায় আজ সোনালি সেটি বুঝে অবাক হল।

কুঁকড়ো বললেন, 'সব জিনিসকে যদি তেমন করে দেখতে পারো তবে সুখদুঃখের বোঝা সহজ হবে; অজানা আর কিছু থাকবে না। ছোটো একটি পোকার জন্ম-মরণের মধ্যে পৃথিবীর জীবন আর মৃত্যু ধরা রয়েছে দেখো, একটুখানি নীল আকাশ ওরই মধ্যে কত কত পৃথিবী জ্বলছে নিভছে।'

মুরগি-গিন্নি অমনই পেঁটরার মধ্যে থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বললে, 'কুয়োর তলে পানি, আকাশকেই জানি।' পেঁটরার ডালা আবার বন্ধ হবার আগেই কুঁকড়ো সোনালিকে মায়ের সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন। মুরগি-গিন্নি চোখ মটকে চুপি চুপি বললেন, 'বড় জবরদস্ত কুঁকড়ো, না?'

সোনালি মিহি সুরে বললে, 'হুঁ, উনি খুব বিদ্বান বুদ্ধিমান।'

এদিকে কুঁকড়ো জিম্মাকে বলছিলেন, 'সোনালিয়ার সঙ্গে দু'দণ্ড কথা কয়ে আরাম পাওয়া যায়, সব বিষয়ে সে কেমন একটু উৎসাহ নিয়ে জানতে চেষ্টা করে দেখেছ।'

এমন সময় কিচমিচ চেঁচামেচি করতে করতে মাঠ থেকে দলে দলে হাঁস মুরগি ধাড়ি বাচ্ছা সবাইকে নিয়ে

চিনে-মুরগি উপস্থিত। এসেই সবাই সোনালিয়াকে ঘিরে 'আহা কী সুন্দর' 'ক্যা ব্যাৎ' 'বাহবা' 'বেহেতর' এমনই সব নানা কথা বলতে লাগল। কুঁকড়ো একটু দূরে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে এই ব্যাপার দেখছিলেন। কী সুন্দর দেখাচ্ছে সোনালিয়াকে। তার চলন বলন সবই বেশ কেমন একটু ভদ্দর রকমের। গোলাবাড়ির কোনও মুরগিই এমন নয়। চিনে-মুরগিরও সোনালি বউ করবার সাধ একটু যে না হয়েছিল তা নয়; সে তাড়াতাড়ি নিজের ছেলের সঙ্গে সোনালিয়ার ভাব করে দিতে দৌড়ল।

কুঁকড়ো এইবার তাঁর সব মুরগিদের ঘরে যেতে হুকুম দিলেন। সোনালিয়া আরও খানিক তাদের সঙ্গে গল্প করবার ইচ্ছে করায় কুঁকড়ো বললেন, 'ওদের সব সকাল সকাল ঘুমনো অভ্যেস।' মুরগিরা একটু বিরক্ত হয়ে সব শুতে চলল মই বেয়ে নিজের নিজের খোপে। সোনালিয়া শুধোলে, 'কোথায় যাচ্ছ ভাই।'

এক মুরগি বললে, 'বাড়ি চলেছি। এই যে আমাদের ঘরে যাবার সিঁড়ি।'

মই বেয়ে মুরগিদের উঠতে দেখে সোনালিয়া অবাক হয়ে গেল। বনের মধ্যে তো এ সব কিছুই নেই।

চিনে-মুরগি সোনালিয়ার সঙ্গে খুব আলাপ জমিয়ে বন্ধুত্ব করবার চেষ্টায় আছেন। সোনালিয়া তাকে বললে যে, এখনই তাকে আবার বনে ফিরে যেতে হবে, গোলাবাড়িতে সে কেবল দু'দণ্ডের জন্যে এসেছে বৈ তো নয়। ঠিক সেই সময় দূরে দুম করে আবার বন্দুকের আওয়াজ হল। এখনও শিকারিগুলো বন ছেড়ে যায়নি, কাজেই সোনালিকে কিছুতেই বনে একলা পাঠাতে কুঁকড়োর একটু ইচ্ছে নেই। গোলাবাড়ির সবাই তাকে আজকের রাতটা কোনওরকমে সেখানে কাটাতে অনুরোধ করতে লাগল। জিম্মা নিজের বাক্সটা রাতের মতো সোনালিকে ছেড়ে দিয়ে বাইরে শুতে রাজি হল। বন্ধ ঘরের মধ্যে সোনালি কোনওদিন শোয়নি; কিন্তু কি করে। প্রাণের দায়ে তাতেই সে রাজি হল। চিনে-মুরগির আহ্লাদ আর ধরে না, সে সোনালিকে তার সকালের মজলিসে যাবার জন্যে আবার ধরপাকড় করতে লাগল। এমন সময় অন্ধকার হয়ে আসছে দেখে কুঁকড়ো ডাক দিলেন, 'চুপ রহো। চুপ রহো।' তারপর মইটা বেয়ে মটকায় উঠে তিনি চারিদিকটা একবার বেশ করে দেখে নিলেন, হাঁস মোরগ মুরগি কাচ্চা বাচ্চা সবাই আপনার আপনার খোপে যে যার মায়ের কোলে ডানার নিচে সেঁধিয়েছে কি না। চিনে-মুরগি সোনালির কানে কানে বললে, 'মনে থাকবে তো ভাই, বকুলতলায় ভোর পাঁচটা থেকে ছ'টার সময়। ময়ূর নিশ্চয় আসবেন, কাছিম বুড়োও আসবেন বোধহয়, আর সুরকি দিদি বলেছে কুঁকড়োকেও নিয়ে যাবে।' কুঁকড়ো একবার সুরকির দিকে চেয়ে দেখলেন, সুরকি খোপ থেকে আস্তে আস্তে মুখটি বার করে গিন্নিপনা করে বললে, 'তুমিও যাবে তো। চিনি দিদির ভারি ইচ্ছে। আমারও ইচ্ছে তুমি পাঁচজনের সঙ্গে একটু মেশো, ছেলেমেয়ের তো বিয়ে দিতে হবে।'

কুঁকড়ো সাফ জবাব দিলেন, 'না।' সোনালি মইখানার নিচে থেকে কুঁকড়োর দিকে মুখ তুলে খুব মিষ্টি করে বললে, 'যেতেই হবে তোমায়।'

কুঁকড়ো মুখ নিচু করে বললেন, 'কেন বল তো।' সোনালিয়া বললে, 'সুরকি দিদির আবদারে তুমি অমন 'না' করলে যে।'

কুঁকড়ো একটু গললেন। 'আমি তা—' তারপর খুব শক্ত হয়ে বললেন, 'না, কিছুতেই যাব না। রাত হল,' বলে কুঁকড়ো অন্য দিকে চাইলেন। সোনালি একটু বিরক্ত হয়ে কুকুরের বাক্সতে গিয়ে সেঁধোলেন।

রাত্রির নীল অন্ধকার ক্রমে ঘনিয়ে এসেছে। একে একে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। জিম্মা ঘরের দাওয়ায় পা ছড়িয়ে শুয়েছে। চিনি দিদি ঘুমের ঘোরে এক একবার বকতে লেগেছে, '৫টা থেকে ৬টা।' তালচড়াইটা তার খাঁচার এককোণে গুটিসুটি হয়ে ঘুম দিচ্ছে। কুঁকড়ো তখনও মটকার উপরে খাড়া দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছেন আর চারিদিক চেয়ে দেখছেন। একটা দুষ্টু বাচ্চা রাতের বেলায় চুপি চুপি উঠোনে বার হয়েছে দেখে কুঁকড়ো তাকে এক ধমক দিয়ে তাড়িয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর আস্তে আস্তে সোনালির বাক্সটার কাছে গিয়ে কুঁকড়ো বললেন, 'মনো।' ঘুম ঘুম সুরে সোনালিয়া উত্তর দিলে, 'কী।' কুঁকড়ো একবার বললেন, 'না।' তারপর আবার নিশ্বেস ছেড়ে বললেন, 'নাঃ, কিছু নয়।' বলে কুঁকড়ো মই বেয়ে উপরে চলে গেলেন। উপরে গিয়ে কুঁকড়ো একবার ডাক দিলে, 'রাত, ভারি রাত।' তারপর কুঁকড়ো সে রাতের মতো চোখ বুজলেন খোপে ঢুকে।

চারিদিক নিশুতি হল আর অমনি কালো বেড়ালের সবুজ চোখদুটো অন্ধকারে ঝকঝক করে উঠল। অমনই ভোঁদড় বললে, 'আমিও তবে চোখ খুলি।' ভাম বললে, 'আমিও।' দু'জোড়া চোখ ছাদের আলসেতে জ্বলজ্বল করে ঘুরতে লাগল। ছুঁচো ইঁদুর আর বাদুড় তিনজনেই বললে, 'আমরাও তবে চোখ খুললেম।' কিন্তু এদের

চোখ এত ছোটো যে খুলল কি না বোঝা গেল না, কেবল তাদের চিক চিক আওয়াজ শোনা গেল। একটু পরেই অন্ধকার থেকে তিনটে পেঁচা আগুনের মতো তিন জোড়া চোখ খুলে সুট করে দেখা দিলে। তখন সবুজ হলদে লাল—সব চোখ এ ওর দিকে চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকল আর বলাবলি করতে লাগল, 'আছ তো? এসেছ? আছ তো, এ্যঁ এ্যঁ এ্যঁ।'' বেড়াল পেঁচাকে শুধোল, 'আছ তো।' পেঁচা ভোঁদড়কে, ভোঁদড় বাদুড়কে, এমনই সবাই সবাইকে শুধোলে, 'আছ তো। ঠিক আছ তো। ঠিক আজকে তো। আসছ তো ঠিক।' বেড়াল শুধোলে, 'আজই নাকি।' পেঁচা তিনটে জবাব দিলে, 'হাঁঃ হাঁঃ হাঁঃ।' চড়াই খাঁচার মধ্যে জেগে উঠে শুনলে এক পেঁচা আর এক পেঁচাকে শুধোচ্ছে, 'ঘোঁট কিসের।' অন্য পেঁচা বলছে, 'কুঁকড়োর সর্বনাশের ঘোঁট রে ঘোঁট।' ভোঁদড় অমনি শুধোলে, 'কো-ও-থায়।' পেঁচারা উত্তর দিলে, 'পাকুড়তলে, পাকুড়তলে, পাকুড় পাকুড় পাকুড়তলে।' ভাম শুধোলে, 'ক-খ-ন।' উত্তর হল, 'আটটায় ঘঁট। আটটায় ঘুঁট। আটটায় ঘুঁট। ঘুট ঘুটে রাতে। ঘুট ঘুটে রাতে।'

রাতের আঁধারে বাদুড়গুলো জাদুকরের হাতে তাসের মতো একবার দেখা দিচ্ছিল আবার কোথায় উড়ে যাচ্ছিল। বেড়াল পেঁচাকে শুধোলে, 'বাদুড় তো আমাদের দলে বটে।' পেঁচা বললে, 'হাঁ নিশ্চয়।' 'ছুঁচো ইঁদুর?' 'হাঁ তারাও।'

বেড়াল বাড়ির দরজা আঁচড়ে বললে, 'পিউ পিউ পিউ। দিয়ো পিউ আটটায় ঘড়ি দিয়ো দিয়ো ।' পেঁচা শুধোলে, 'ঘড়িটাও এ দলে নাকি।' বেড়াল উত্তর করলে, 'নি-শ-চয়। নিশাচর সবাই এ দলে; তাছাড়া দিনের বেলারও দু'চার জন আছেন।' পেরু আর দু'চার জন উঠোনের এককোণে লুকিয়ে ছিল, আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। পেরু শোধালে, 'ড্যেবা চোখ, চাকা মুখ। সব ঠিক তো।' উত্তর হল, অন্ধকার থেকে—'হাঁঃ হাঁঃ হাঁঃ। সব ঠিক, ঘুঁটটা ঠিক, এ পাড়া ঠিক, ও পাড়া ঠিক।' তালচড়াই মনে মনে বললে, 'সেও যাচ্ছে ঠিক।'

কুকুর এমন সময় গা ঝাড়া দিয়ে বলে উঠল, 'কে ও।' অমনি সব নিশাচরগুলো চমকে উঠে এদিক ওদিক চাইতে লাগল। বেড়াল তাদের সাহস দিয়ে বললে, 'ও কিছু নয়, বুড়িটা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বকছে।' কিন্তু এবার কুঁকড়ো যেমন একটু গা ঝাড়া দিয়ে সাড়া দিয়েছেন, 'কি-ই-ও।' অমনই সব নিশাচর—পেঁচা, বেড়াল, এমনকি, পেরু পর্যন্ত 'ওইগো' বলেই পালাই পালাই করতে লাগল। পেরু, তিনি পালানোই স্থির করলেন, তাঁর গলার থলি থেকে পা পর্যন্ত ভয়ে কাঁপছিল; বেড়ালের যেন জ্বর এসে পড়ল, পেঁচাগুলো চোখ বুজলেই অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে জানে, তারা অমনি খপ করে চোখের পাতা বন্ধ করে ফেললে। একসঙ্গে সব জ্বলন্ত চোখ নিভে গেল। রাত্রি যে অন্ধকার সেই অন্ধকার। কুঁকড়ো ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চড়াইকে শুধোলেন, 'কারা যেন ফুসফাস করছিল না।'

চড়াই বললে, 'শুনছিলেম বটে একটা ঘোঁট চলেছে।' ঘুটঘুটে অন্ধকারে সব ঘুঁটেগুলো এমন কাঁপতে লাগল যে রাত্রিটা দুলছে বোধ হল।

কুঁকড়ো বললেন, 'বটে, ঘোঁট চলেছে?'

চড়াই বললে, 'হাঁ তোমার সর্বনাশের, সাবধান।' 'বয়ে গেল।' বলে কুঁকড়ো আবার গিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

চড়াই আবার ভালোমানুষটির মতো গা ঝাড়া দিয়ে বসল। সে ঠিক ঠিক কথাই বলেছে কিন্তু কেমন দু'দিক বাঁচিয়ে বলেছে। যুধিষ্ঠিরের অশ্বত্থামা হত-ইতি-গজ গোছের। কথাটা চড়াইয়ের মুখে শুনে কিন্তু পেঁচাদের সন্দেহ বাড়ল। 'চড়াই সত্যিই তাদের দলে কি না।'—শুধোতে অন্ধকারের মধ্যে একটার পর একটা চোখ চড়াইয়ের দিকে চাইতে লাগল। চড়াই বললে, 'আমি বাপু কোনও দলে নেই; তবে ঘোঁটটা কেমন চলে দেখতে ইচ্ছে আছে।' পেঁচাতে চড়াই খায় না, কাজেই ঘোঁটে গেলে কোনও বিপদ তার নেই বলে পেঁচারা চড়াইকে মন্ত্রণাসভায় যাবার স্থানটি বাতলে দিয়ে বললে, 'চোরের মন পুঁই আঁদাড়ে, এই শোলোক বললেই সে দরজা খোলা পাবে।'

এ দিকে ঘরের মধ্যে থেকে সোনালিয়ার হাঁপ ধরছিল; সে একটু ভালো হাওয়া পেতে ঘর থেকে মুখ বার করেই সব নিশাচরকে দেখে 'একি!' বলে চমকে উঠল। অমনি সব চোখ একসঙ্গে ঝপ করে বন্ধ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ আর সাড়াশব্দ নেই। তখন অন্ধকারে একটির পর একটি চোখ খুলল আর বলাবলি শুরু হল। সোনালিয়া চুপ করে শুনছে কে একজন উঠোনের ও কোণ থেকে বললে, 'বেঁচে থাকো পেঁচা-পেঁচিরা।' পেঁচারা শুধোলে, 'আমরা তো ওর নামটি পর্যন্ত সইতে পারি নে তা জান, কিন্তু তোমরা তার উপর চটা কেন বলো তো।'

দিনের বেলায় যারা দুষ্টবুদ্ধি লুকিয়ে বেড়ায়, রাত্রে তাদের পেটের কথাটা আপনিই যেন প্রকাশ হয়ে পড়ে। বেড়াল খুব চাপা জন্তু কিন্তু আগেই তার কথা বেরিয়ে পড়ল, 'ওই কুকুরটার সঙ্গে অত তার ভাব বলেই কুঁকড়োটাকে দু'চক্ষে আমি দেখতে পারিনে।' পেরু বললেন, 'যাকে সেদিন জন্মাতে দেখলেম, সে আজ কর্তা হয়ে উঠল, এটা আমি কিছুতেই সইব না। এইজন্যে আমার রাগ ওটার উপর।' রাজহাঁস বললে, 'ওর পা দু'খানা বড়ো বিশ্রী, একেবারে হাঁসের মতো নয়। দেখলেই আমার মাথা গরম হয়ে ওঠে, গোড়ালির ছাপ তো নয়, চলবার বেলায় মাটির উপরে বাবু যেন তারাফুল কেটে চলে যান। কী দেমাক!' কেউ বললে, কুঁকড়োর চেহারাটা ভাল বলেই সে তাকে পছন্দ করে না। কেন সে নিজে কুচ্ছিত হল কুঁকড়োটা হল না!

আর কেউ কেউ বললে, 'সব ক'টা গির্জের চুড়োতে তার সোনার মূর্তি দেখলে কার না গা জ্বালা করে। নিশ্চয়ই ও পাখিটা কিস্টান। ওকে জাতে ঠেলাই ঠিক। মোচনমানের সঙ্গে এক ঘটিতে জল খেতে আমি ওকে স্বচক্ষে দেখেছি। ওর কি বাচবিচার আছে? ওর ছায়া মাড়াতে ভয় হয়।'

ঠিক সেই সময় ঘড়ি পড়ল আর ঘড়ির মধ্যে কলের পাখি বলে উঠল, 'পি-পি-পি-রা-আ-আ-লি।'

মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ অমনি উঁকি দিলেন। উঠোনের এককোণে খানিক আলো পড়ল। ছুঁচো আস্তে আস্তে মুখ বার করে পেঁচাকে বললে, 'আমার সে পাজিটার সঙ্গে কোনওদিন চোখাচোখিই নেই।''

ঘড়িকলের পাখিটাকে আর শুধোতে হল না; সে আপনিই বললে, 'একটুতে আমার দম ফুরিয়ে যায়, রোজ দম না দিলে মুশকিল, আর কুঁকড়োর দমের শেষ নেই।' বলেই গলা ঘড় ঘড় করে ঘড়িপাখি চুপ করলে। টং টং করে আটটা বাজল। পেঁচারা সব ডানা মেলে বললে, 'আর আমরা কুঁকড়োকে একটুও ভালবাসিনে, কেননা—কেননা ও কিনা—সে কিনা' বলতে বলতে অন্ধকারের মধ্যে পেঁচারা উড়ে পড়ল নীল রাত্রির মধ্যে। একলা সোনালিয়া উঠোনে দাঁড়িয়ে বললে, 'আর কুঁকড়োকে আমি এখন খুব ভালবাসি, কেননা—কেননা—সবাই তাঁর শত্রু।'

৪

খেত আর আবাদ যেখানে শেষ হয়েছে, সেইখানে পাহাড়ের একটা ঢল, সেইখানে পেঁচাদের ঘোঁটের মজলিস বসবে। অতি নোংরা ঢালু জমি; শেয়ালকাঁটা, বাবলাকাঁটায় ভরা; উপরে মস্ত পাকুড় গাছটা, সরু একটা পাকদণ্ডি বেয়ে সেখানে উঠতে হয়। রাত্রে জায়গাটাতে এলে ভয় করে কিন্তু দিনের বেলায় যখন সূর্য ওঠে, এখান থেকে ছায়ায় বসে পাহাড়ে ঘেরা গ্রাম, নদী সবই অতি চমৎকার দেখায়।

পাকুড় গাছে, লতাপাতায় ঝোপেঝাড়ে জায়গাটা এমনই ঢাকা যে একবিন্দুও চাঁদের আলো সেখানে পড়তে পায় না। সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে হুতুম পেঁচার চোখ টিপটিপ করে জ্বলছে, আর কিছু দেখাও যাচ্ছে না, শোনাও যাচ্ছে না, অথচ অনেক পাখিই আজ সেখানে জুটেছে ঘোঁট করতে। পেঁচার সর্দার হুতুম একে একে নাম ধরে ডাকতে লাগলেন, আর চারিদিকে একটার পর একটা লাল, নীল, হলদে, সবুজ, চোখ জ্বালিয়ে দেখা দিতে থাকল একে একে ধুঁধুল পেঁচা, কাল পেঁচা, কুটুরে পেঁচা, গুড়গুড়ে পেঁচা, দেউলে পেঁচা, দালানে পেঁচা, গেছো পেঁচা, জংলা পেঁচা, পাহাড়ি পেঁচা। হুথুমথুমো ডেকে চলেছে, 'ভুতো পেঁচা, খুদে পেঁচা, চিলে পেঁচা, গো পেঁচা, গোয়ালে পেঁচা, লক্ষ্মী পেঁচা...' লক্ষ্মী পেঁচার দেখা নেই, চোখও জ্বলছে না। হুতুম ঘাড় ফুলিয়ে রেগে ডাক দিলে, 'ল-ক্-খী-পেঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁ-চা-আ-আ।' লক্ষ্মী পেঁচা তাড়াতাড়ি এসে চোখ খুলে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'অনেক দূর থেকে আসতে হয়েছে, বিলম্ব হয়ে গেল।' চিলে পেঁচা চেঁচিয়ে বললে, 'সেইজন্যেই ত্বরা করা তার উচিত ছিল।'

সব পেঁচা একত্র হয়েছে, তখন হুতুম গম্ভীরভাবে বললেন, 'কাজ আরম্ভ হবার আগে এসো ভাই সব এককাট্টা হয়ে এক সুরে নিজের নিজের ঢাকের বাদ্যি বাজিয়ে দিই, 'হুতুম থুম, দুদুম দুম। লাগ লাগ ঘুঁট। লাগ লাগ ঘুঁট। দে ধুলো, দে ধুলো, দে ধুলো, চোরা-আ-আ গো-ফ-তা।' সমস্ত রাত্রিটার অন্ধকার বিকট শব্দে ভরে দিয়ে পেঁচাগুলো ডানা ঝাপটাতে লাগল, আর অন্ধকারের জয় দিতে থাকল,

ঘুটেঘুটে আঁধারে
আমরা খুলি চোখ,
—যত লাল চোখ।
বুকে বসাই নোখ,

রক্তে গিলি ঢোক।
হাড় ভাঙি আর ঘাড় ভাঙি
আর দিই কোপ
ঝোপ বুঝে কোপ।
আঁদাড়ে কোপ, পাঁদাড়ে কোপ।

'চোপ চোপ'—বলে হুতুম সবাইকে থামিয়ে গম্ভীর সুরে আঁধারের স্তুতি আওড়ালেন, 'নিঝুম রাত, দুপুর রাত, নিশুতি রাত। কেষ্টপক্ষের কষ্টিপাথর কালো আকাশের কালো রাত। বর্ষাকালের কাজল মাখা পিছল রাত। নিখুঁত রাত। কালোর পরে একটি খুঁত তারার টিপ। ভয়ংকরী নিশিথিনী, বিরূপা ঘোর, ছায়ার মায়া, থাকুন, তিনি রাখুন। নিশাচর নিশাচরী রক্তপাত করি, আচম্বিতে নিঝুম রাতে, দুপুর রাতে। নষ্টচন্দ্র, ভ্রষ্টতারা, ভিতর বার অন্ধকার রাত সারারাত। নিঝুম দুপুর, নিখুঁত দুপুর, অফুর রাত।'

হুতুম পেঁচা চুপ করলেন। খানিক চারিদিক যেন গমগম করতে লাগল, কারু সাড়াশব্দ নেই, অন্ধকারে কেবল ছুঁচোয় খুসখাস আর বেড়ালের গা চাটার চটচট শোনা যেতে লাগল। পাকুড়তলায় এত বড়ো গম্ভীর মজলিস কোনওদিন বসেনি।

এইবার বয়েসে সবার বড়ো চিলে পেঁচার পালা। সে চড়া গলায় চিৎকার করে শুরু করলে, 'ভাই সব।' সব জ্বলন্ত চোখগুলো অমনি চিলের দিকে ফিরল। 'ভাই সব, আমরা আজ এই কতকালের পুরনো মিশকালো পাকুড়তলায় ঘুটঘুটে আঁধারে কেন এসেছি জানো? খুন খুন খুন করতে, এ আমি চেঁচিয়ে বলব। কিসের ভয়। কাকে ভয়।' তারপর একেবারে নবমে গলা চড়িয়ে চিলে বললে, 'ভয় করব না, চেঁচিয়েই বলি, কুঁকড়োটা চো-ও-ও-র', বলেই বুড়ো চিলের গলা ভেঙে গেল, সে খক খক করে কাশতে লাগল, আর অন্য সব পেঁচা চেঁচাতে থাকল, 'চোর। ডাকাত। সিঁদেল। বদমাশ। আমাদের সর্বস্ব নিলে।'

চড়াই অমনি বলে উঠল, 'কী নিলে শুনি।'

'আমাদের আনন্দ, আমাদের তেজ সবই হরণ করছে জানো না?' বলে পেঁচাগুলো চড়াইয়ের দিকে কটমট করে চাইতে লাগল।

চড়াই একটু দূরে সরে একটা বাঁশঝাড়ে বসে শুধালে, 'তোমাদের তেজ কেমন করে হরণ করলে সে।'

'কেন, গান গেয়ে। তার সুর শুনলেই আমাদের দুকখু আসে, বেদনা বোধহয়; সব পেঁচারই মন খারাপ হয়ে যায়, কেননা তার সাড়া পেলেই মনে পড়ে।'

'আলো আসছে।' বলেই চড়াই সট করে বাঁশঝাড়ে লুকোল। হুতুম রেগে চড়াইকে বললে, 'চুপ। খবরদার, ও জিনিসের নাম আর কোরো না, ও নাম শুনলেই রাত্রির মন চঞ্চল হয়ে যেন পালাই পালাই করতে থাকে।'

চড়াই বেরিয়ে এসে বললে, 'আচ্ছা না হয় দিন আসছে বলা যাক।'

অমনই সব পেঁচা শিউরে উঠে চারিদিকে 'উঁ আঁ' করতে লাগল আর কানে ডানা ঢেকে বিকট মুখ করে বলতে লাগল, 'থামো, থামো, চুপ, চুপ।' চড়াই আবার লুকিয়ে পড়ল, পেঁচাদের বিকট চেহারা দেখে তার একটু ভয় হল। হুতুম খানিক ভেবে বললে, 'বলো না বাপু, যা আসবার তা আসছে।' চড়াই বললে, 'যাক ও কথা, যা আসবার তা তো আসবেই, কেউ তো ঠেকাতে পারবে না।'

হুতুম বললে, 'তা তো জানি, কিন্তু আসবার আগে তার নাম কেন সে কুঁকড়ো করে বলো তো? তার কাঁসির মতো গলা শুনলেই সেই শেষ রাতের কথাই যে মনে আসে।'

'ঠিক, ঠিক, সত্যি, সত্যি।' সব পেঁচাই বলে উঠল। দিনের কথা মনে করতেও তাদের বিষম কষ্ট হচ্ছিল।

হুতুম বললে, 'রাত যখন পোহাবার দিকেই যায়নি, তখন থেকেই পাজি কুঁকড়োটা গান শুরু করে...।'

সবাই অমনি বলে উঠল, 'ডাকু হ্যায়। চোট্টা হ্যায়।' হুতুম আবার বললে, 'বাকি রাতটুকু সে একেবারে কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে মাটি করে দেয়।' চারিদিক থেকে অমনি চেঁচানি উঠল, 'মাটি। মাটি। একেবারে মাটি। নেহাত মাটি।' তারপর একে একে সবাই আপনার আপনার দুকখু জানাতে লাগল। ধুঁধুল বললে, 'খরগোশের গর্তর কাছে খানিক বসতে না বসতে কুঁকড়োটা ডাক দেয় আর অমনি আমায় সরতে হয়।' কালপেঁচা বললে, 'পেটের খিদে ভাল করে মেটাবার জো নেই সেটার জ্বালায়।' কেউ বললে, 'তাঁর সাড়া কানে এলেই আর মাথা ঠিক রাখতে পারিনে, এটা করতে ওটা করে ফেলি। খুন করতে হয় মশায় তাড়াতাড়ি। যেন আমারই দায় পড়েছে। জখমগুলোও

যে একটু শক্ত করে বসাব তার সময় পাইনে মশায়। যতটুকু মাংস দরকার তার বেশি একটু কি সংগ্রহ করবার জো আছে ওটার জ্বালায়। ওর গলাটা শুনলেই দেখি যেন অন্ধকার দেখতে দেখতে ফিকে হচ্ছে, আর আমি ভয়ে একেবারে কেঁচো হয়ে যাই।'

চড়াই শুনে শুনে বললে, 'আচ্ছা সব দোষ কি কুঁকড়োর। এ পাড়া ও পাড়ায় আরও তো অনেক মোরগ আছে যারা ডেকে থাকে।'

হুতুম বললে, 'তাদের গানকে আমরা ভয় করিনে। ওই কুঁকড়োর ডাকটাই যত নষ্টের গোড়া, সেইটেই বন্ধ করা চাই।'

সবাই অমনি চেঁচিয়ে উঠল। 'বন্ধ হোক। বন্ধ হোক। চাই, বন্ধ করা চাই।' আর ডানা বাজাতে লাগল। গোলমাল একটু থামলে গো পেঁচা বললে, 'তা যাই বলো, চড়াই আমাদের জন্যে অনেক করেছেন।' চড়াই ভয় পেয়ে বললে, 'কি, কি, আমি আবার বললেম কী, ও আবার কেমন কথা?' খুদে পেঁচা বললে, 'কুঁকড়োর নিন্দে রটিয়ে তার নকল দেখিয়ে তামাশা করে।' অমনি দেউলে, দালানে, গুড়গুড়ে, গোয়ালে, গেছো, জংলা, পাহাড়ে সব পেঁচা হাসতে লাগল 'হুঃ হুঃ, ঠিক, ঠিক, বাঃ বাঃ, ঠিক ঠিক, হু হু হু হু, হু-উ-উ, খুব ঠিক খুব ঠিক। '

হুতুম রোঁয়া ফুলিয়ে পাখা ঝাপটালে, 'বস্-স্-স।' অমনই সব চুপ হয়ে গেল। চিলে পেঁচা গলা কাঁপিয়ে চিঁ চিঁ করে বললে, 'তার নিন্দেই রটাও আর নকলই দেখাও সে তো তাতে থোড়াই ডরায়। বেপরোয়া সে গান গেয়ে চলে, আর বেকার আমরা কেঁপেই মরি। এই দেখ না সাজগোজ হীরে জহরতের দিক দিয়ে দেখলে ময়ূরের সামনে কুঁকড়োটা দাঁড়াতেই পারে না, কিন্তু তবু তার গান, সে তো এখনও আমাদের জ্বালাতে ছাড়ছে না।' সব পেঁচা বিকট চিৎকার করতে থাকল, 'ধরো কুঁকড়োকে। মারো কুঁকাড়োকে, ধুমাধুম ধুমাধুম।'

হুতুম চটপট ডানা ঝেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সবাইকে বললে, 'থামো থামো শোনো শোনো, এ্যাটেন-সা-ন অ-ব-ধা-ন।' অমনই সব পেঁচা ডানা ছড়িয়ে গোল চোখগুলো পাকিয়ে স্থির হয়ে বসল, এমনই গম্ভীর হয়ে যে, রাতটাও মনে হতে লাগল যেন কত বড়ো, কত না গভীর। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে থেকে লক্ষ্মী পেঁচা আস্তে আস্তে বললে, 'তাকে মারা তো হয় না। যে সময়ে সে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায় সে সময় আমরা দেখতেই পাই নে, চোখে সব যে বোধহয় ধোঁয়া আর ধাঁধাঁ—ধাঁ ধাঁ ধাঁ।' বলেই লক্ষ্মী পেঁচা চুপ করলে, আর সব পেঁচা গুমরোতে থাকল।

তখন পাকুড়গাছের আগডালের উপর থেকে কুটুরে পেঁচা মিহি আওয়াজ দিলে, 'বোলুঙ্গা কুছ, সল্লা হ্যায় কুছ।' হুতুম উপর দিকে চেয়ে বললে, 'শুনি, তোমার মতলবটা কী।' কুটুরে সট করে নিচের ডালে নেমে বসে আরম্ভ করলে, 'পাহাড়ের ওদিকটায় একটা লোক অদ্ভুত সব পাখির চিড়িয়াখানা বানিয়েছে, নানা-দেশি-বিদেশি মোরগ, নানা জাতের নানা কেতার ধরা আছে। ময়ূর যিনি রাজ্যের অদ্ভুত পাখির খবর রাখেন, তিনি কুঁকড়োকে কিছুতে দেখতে পারেন না, কেননা, ময়ূরের একটিমাত্র বই দুটি সুর নেই, তাও আবার কর্ণকুহর ভেদ করা ছাড়া অর কিছু করতে পারে না। কিন্তু কুঁকড়োর ডাক, সে সোজা অন্ধকারের বুকে গিয়ে বেঁধে আর তারপর যে কাণ্ডটা ঘটে তা কারুর জানতে বাকি নেই। কাজেই ময়ূর স্থির করেছেন চিনে-মুরগির কুলতলার মজলিসে তিনি এইসব অদ্ভুত মোরগদের হাজির করবেন।' 'চিনে-মুরগির সঙ্গে আলাপ করে দিতে বুঝি?' বলেই সব পেঁচা হেঁ হেঁ করে হাসতে থাকল।

কুটুরে বললে, 'এইসব অদ্ভুত মোরগের কাছে কি কুঁকড়ো দাঁড়াতে পারবে। একেবারে খাড়া দাঁড়িয়ে মাটি হবে।' গোয়ালে পেঁচা বলে উঠল, 'হাজির তারা হবে কেমন করে। খাঁচা না খুলে দিলে তো সেইসব খাসা মোরগদের এক পা নড়বার সাধ্যি নেই।'

কুটুরে সবাইকে আশ্বাস দিয়ে বললে, 'তার উপায় করা গেছে। যে পাহাড়ি ছোঁড়াটা খাঁচা খুলে সকালে তাদের দানাপানি খাওয়ায় সে কাল যেমন খাঁচা খুলবে আর আমি অমনি তার মুখে গিয়ে ডানার এক ঝাপটা দেব। নিশ্চয়ই সে কাঁদতে কাঁদতে দৌড় দেবে খাঁচা খোলা রেখে। পেঁচার বাতাস গায়ে লাগলেই অসুখ, সেটা জানো তো। তারপর সব মোরগকে নিয়ে সরে পড়ো আর কি।'

চড়াই বললে, 'ওদিকে কুঁকড়ো বলছেন যে তিনি মজলিসে মোটেই যেতে রাজি নন।'

বেড়াল বললে, 'যাবে না কী। নিশ্চয়ই যাবে। দেখনি সোনালিয়া মুরগিটির সঙ্গে তার কত ভাব। আমি এই লিখে দিচ্ছি সোনালিয়া কুঁকড়োকে মজলিসে হাজির করবেই কাল।' চড়াই বুঝলে কালো বেড়ালটা সারাদিন

ঘুমোয় বটে, কিন্তু কোথা কি হয় সেটুকুও দেখে শোনে, গোলাবাড়ির সব খবরই সে রাখে চোখ বুজে বুজেই।

চড়াই বললে, 'হাজির যেন হলেন কুঁকড়ো, তারপর?'

'তারপর আর কী। কুঁকড়ো যখন দেখবেন পাড়ার সবাই অদ্ভুত সব মোরগদের খাতির করতেই ব্যস্ত, এমনকি, হয়তো সোনালি পর্যন্ত, জেনে রেখো তখন খুঁটিনাটি বাধবেই, আর তাহলেই—'

'কুঁকড়োর লড়াই না হয়ে যায় না।' বলেই হুতুম ঠোঁটে ঠোঁট বাজিয়ে দিলেন। কিন্তু বেড়াল বললে, 'ধর লড়ায়ে কুঁকড়োর হার না হয়ে জিতই হয়ে গেল ফস করে। তখন উপায়?'

কুটুরে অমনি বললে, 'সে ভাবনা নেই, ওইসব খাসা মোরগদের মধ্যে যে বাজখাঁই পালোয়ান মোরগ আছে তাকে পারে এমন কেউ দেখি নে। মানুষ তার পায়ে লোহার কাঁটা দেওয়া যে কাতান বেঁধে দিয়েছে তার এক ঘা খেলে কুঁকড়োকে আর দেখতে হবে না, একেবারে চিৎপটাং।' বলে কুটুরে হাসতে লাগল। সঙ্গে সব পেঁচাই ধাই ধাই করে নাচতে থাকল।

হুতুম বললে, 'আমি তো বাপু আগে গিয়ে তার মাথার মোরগ ফুলটা ছিঁড়ে খাব, কপা কপ্ কপা কপ্।'

চড়াই মনে মনে বললে, 'গতিক তো খারাপ দেখছি। কুঁকড়োকে খবর দেব নাকি।' কিন্তু চেঁচিয়ে সে সবাইকে বললে, 'বেশ হবে, খুব হবে, ভালোই হবে, কি বলো।'

কুটুরে বললে, 'মজা বলে মজা। খাসা মোরগগুলোও দু'চারটে মরবে নিশ্চয়। পেট ভরে খাও; সেগুলো কি নষ্ট করা ভালো।'

হুতুম চিলের কানে কানে বললে, 'কুঁকড়োর কাবারের পর দু'জনে মিলে, বুঝেছ কিনা, চড়াইভাতি...।' আর তারপরে ধুঁধুলে পেঁচা কি বলতে যাচ্ছে এমন সময় দূরে কুঁকড়োর সাড়া পড়ল, 'গা তোল তোল।' পেঁচারা শুনলে, 'পটল তোল।' অমনি ভয়ে সব চুপ। কুটুরে ক্রমেই মাথা হেঁট করতে লাগল। কে যেন তার ঘাড় ধরে মাটিতে মুখ ঘষে দিতে চাচ্ছে। এতক্ষণ পেঁচা সব রোঁয়া ফুলিয়ে বিকট চেহারা করে বসেছিল, দেখতে দেখতে ফুটো রবারের গোলার মতো চুপসে গেল, যেন কতদিন খায়নি। মুখে কারু কথা সরছে না, কেবল চোখ পিটপিট করে এ ওকে শোধাচ্ছে, 'হল কী। কী ব্যাপার।' তারপর ডানা মেলে একে একে সবাই পালায় দেখে চড়াই বললে, 'এরই মধ্যে চললে নাকি।' চড়ায়ের কথা কে-ই বা শোনে। চড়াই যত বলে, 'ভোর হতে এখনও দেরি, চলুক না ঘোঁট আরও খানিক।' সব পেঁচা চোখ পিটপিট করে বলে, 'না না না, আর না, আর না, আর না। ' হুতুম বললে, 'গেলুম,' ধুঁধুল বললে, 'মলুম।' 'বাঁচাও বাঁচাও'—বলছে আর সব পেঁচাগুলো। তাড়াতাড়িতে কোথায় যাবে, কী করবে ঠিক পাচ্ছে না, কানার মতো কখনও কাঁটা গাছে গিয়ে পড়ছে, কখনও পাথরে টক্কর খাচ্ছে। আর ডানা দিয়ে চোখ-মুখ ঘষছে আর বলছে, 'উঃ গেছি। উঃ গেছি।' 'লাগছে লাগছে।'—বলতে বলতে একে একে সব পেঁচা চম্পট দিলে। সব শেষ হুতুম পেঁচাটা 'গেলুম। গেলুম' বলতে বলতে উড়ে পালাল।

চড়াই দেখলে অন্ধকারের মধ্যে কালো কালো নৌকার মতো দলে দলে পেঁচা গ্রাম ছাড়িয়ে ক্রমে পাহাড়ের গায়ে মিলিয়ে গেল। আর কেউ কোথাও নেই, পাকুড়তলায় সে একা রয়েছে। 'ফজর তো হল এখন ছোটো হাজরির জন্যে একটা গঙ্গা ফড়িং পেলে হয় ভালো।' বলে চড়াই এদিক ওদিক করছে, এমন সময় একটা ঝোপের আড়াল থেকে ঝপ করে সোনালিয়া বেরিয়ে এল। চড়াই অবাক হয়ে বললে, 'একি। এত রাত্রে আপনি এখানে।'

সোনালিয়া একটু দূরে থেকে পেঁচাদের যুক্তি সমস্ত শুনেছিল, সে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'কী ভয়ানক ব্যাপার, চড়াই তো কুঁকড়োর বন্ধু, এখন বন্ধুকে বাঁচাতে চেষ্টা তো তার করা উচিত।' চড়াই আবার ফড়িং-এর সন্ধান করতে করতে বললে, 'পেঁচা ভাজা খেতে কি মজা তা পাখিজন্মে তারা কেউ জানলে না—।'

সোনালিয়া অবাক হল। চড়াইটার রকম দেখে সে রেগে বলসে, 'কথার জবাব দাও না।' 'কীঃ।' বলেই চড়াই ফিরে দাঁড়াল। সোনালি শুধোলে, 'ঘোঁটের খবর জানতে চাচ্ছি।' চড়াই ধীরে সুস্থে উত্তর করলে, 'ঘোঁটটা খুব চলেছিল, সব দিকেই ভাল।'

সোনালি চড়াই-এর হেঁয়ালির অর্থ বুঝলে না; সে পরিষ্কার জবাব চাইলে। চড়াই বললে, 'অন্ধকার বেশ ঘুটঘুটে আর পেঁচাগুলোও বেশ মোটাসোটা দেখলেম।'

'তারা তাঁকে মারবার যুক্তি করলে?' সোনালি শোধালে।

'নাঃ, মারবার নয় তাকে পরলোকে পাঠাবার যুক্তি।' বলে চড়াই সোনালিকে আশ্বাস দিয়ে বললে, 'তবু

কতকটা রক্ষে, কি বলো।' সোনালি কি বলতে যাচ্ছিল, চড়াই বললে, 'ভাবছ কেন, শেষ দাঁড়াবে যা তা ফক্কাঃ, বুঝলে।' সোনালি ভয়ে ভয়ে বললে, 'যাই বলো, কিন্তু পেঁচারা তো সহজ পাখি নয়,'

চড়াই হেসে বললে, 'কিন্তু তাদের যুক্তিটা মোটেই ভয়ানক নয়। আরও অনেক যুক্তি তারা এঁটেছে আঁটবেও। পেঁচাগুলো যদি সহজ পাখি হত তবে ঘুঁট না করে খাবার ঘুঁটেই তারা বেড়াত। কিন্তু তাদের ভুরু চোখের উপরে, নিচে, আশে পাশে, আর চোখগুলো দেখেছ তো? মনে হয় যেন পাহারাওলার লণ্ঠন, খোলো আর বন্ধ করো। আর ঠোঁট তো দেখেছ?' বলেই চড়াই 'ছিঃ ছিঃ।' বলে ডানা ঝাড়া দিয়ে বললে, 'তুমি কিছু ভেবো না সোনালি। সব ঠিক হবে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা চাই, বুঝলে কিনা।'

সোনালি চড়াই-এর হেঁয়ালি বড়ো একটা বুঝলে না কিন্তু কুঁকড়োর পুরনো বন্ধু হয়ে চড়াই এখনও যখন হাসিতামাশা করছে তখন ভয়ের কারণ খুবই কম এটা তার মনে হল। 'কিন্তু তবু কী জানি, কুঁকড়োকে সব কথা জানানো ভাল।' বলে সোনালি গোলবাড়ির দিকে যাবে, চড়াই তাকে তাড়াতাড়ি পথ আগলে বললে, 'অমন কাজটি কোরো না, যদি-বা কুঁকড়ো সেখানে না যান, এই ঘোঁটের কথা শুনলে নিশ্চয়ই যাবেন, আর তাহলে লড়াই বাধবেই।' সোনালি চড়াইয়ের কথা রাখলে। চড়াই যখন তাঁর পুরনো বন্ধু, তখন তারই পরামর্শমতো কাজ করাই ঠিক। সোনালি যাচ্ছিল, ফিরে এল।

ওদিক থেকে শব্দ এল, 'গা তো ল্।' চড়াই আর সোনালি ফিরে দেখলে কুঁকড়ো আসছেন। কুঁকড়ো হাঁক দিলেন, 'কো-উ-ন হ্যায়!'

সোনালি মিহিসুরে উত্তর দিলে, 'সো-না-লি-য়া', কুঁকড়ো শোধালেন, 'ওখানে আর কেউ আছে কি।' সোনালি চড়াইকে চোখ টিপে বললে, 'না মশায়।' ঘোঁটের কথা কুঁকড়োকে যেন বলা না হয় সোনালিকে সে বিষয়ে সাবধান করে দিয়ে, চড়াই আস্তে আস্তে বাবলা গাছের তলায় একটা খালি ফুলের টবের আড়ালে গিয়ে লুকোল।

৫

কুঁকড়ো নিজে যেমন, তেমনই কাউকে ভোরে উঠতে দেখলে ভারি খুশি। সোনালিয়াকে দেখে বললেন, 'বাঃ তুমি তো খুব সকালে উঠেছ। বেশ, বেশ।' কিন্তু সোনালিয়া চিনে-মুরগির চা পার্টিতে যাবার জন্যেই খালি আজ এত সকালে বিছানা ছেড়ে বেরিয়েছে শুনে কুঁকড়ো ভারি দমে গেলেন। কুঁকড়ো পষ্ট বললেন, তিনি ওই চিনে-মুরগিটাকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। কিন্তু সোনালিয়া ছাড়বার নয়, সে তবু কুঁকুড়োকে চিনে-মুরগির মজলিসে যেতে পেড়াপিড়ি করে বললে, 'দেখি তুমি আমার কথা রাখ কি না।'

কুঁকড়ো তবু যেতে রাজি নয়, তখন সোনালিয়া অভিমান করে বললে, 'তবে আমি এখনই বাড়ি চলে যাই।' কুঁকড়ো তাড়াতাড়ি বলে ফেললেন, 'না সোনালি, এখনই যেয়ো না।' সোনালি অমনি সুযোগ বুঝে বললে, 'তবে যাবে বলো চিনি-দিদির বাড়িতে।' কুঁকড়ো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আচ্ছা তাই, আমিও যাব।'কথাটা বলেই কুঁকড়ো মনে মনে নিজের উপর খুব চটলেন, মেয়েরা যা আবদার করবে, তাই কি মানতে হবে।

সোনালি কুঁকড়োর ভাব বুঝে মনে মনে হাসতে লাগল। কুঁকড়োকে চিনি-দিদির বাড়িতে নিয়ে যেতে সে খুব ব্যস্ত ছিল না; সে কুঁকড়োর কাছ ঘেঁষে বললে, 'তোমার সেই মন্তরের কথাটি বলোনা শুনিই-ই—।'

কুঁকড়ো একটু গম্ভীর হলেন, সোনালি বললে, 'বলো না, বলোবলো, বলো না।'

কুঁকড়ো এবারে গদগদস্বরে 'সোনালি আমার মনের কথাটি' বলে আবার চুপ করলেন। সোনালি বলে চলল, 'বনের মধ্যে বসন্তকালের চাঁদনিতে সারারাত কাটিয়ে একলাটি আমি বনের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি, সকালের আলো আকাশে ঝিলিক দিয়ে উঠল, আর অমনি শুনলেম, তোমার ডাক দূর থেকে আসছে, যেন দূরে কার বাঁশি বাজছে।'—বনের রানি সোনালিয়া পাখি সকালের সোনার আলোতে একলাটি দাঁড়িয়ে কান পেতে তাঁর গান শুনছে একমনে, এ খবর পেয়ে কোন গুণীর না মনটা নরম হয়। কুঁকড়ো ঘাড় হেলিয়ে ভাবতে লাগলেন, 'বলি কি না বলি।' সোনালিয়া মিঠে সুরে আরম্ভ করলে রূপকথা, 'এক যে ছিল কুঁকড়ো আর যে ছিল বনের টিয়া।' কুঁকড়ো ভুল ধরলেন, 'হল না তো হল না তো।' তারপর নিজেই রূপকথার খেই ধরলেন, 'কুঁকড়োর পিয়া ছিল সোনালিয়া, বনবাসিনী বনের টিয়া।' সোনালিয়া বলে উঠল, 'কুঁকড়ো টিয়াকে কখনও বললে না রূপকথার নিতিটুকু', বলতেই কুঁকড়ো সোনালিয়ার কাছে এসে বললেন, 'জানো, সে কথাটা কী? যেটা বনের টিয়েকে কুঁকড়ো বলতে সময় পেলে না? কথাটা হচ্ছে, তোমার সোনার আঁচল বসন্তের বাতাস দিয়ে গেল সোনালিয়া

বনের টিয়া।' সোনালি গম্ভীর হয়ে বললে, 'কী বকছেন আপনি। রূপকথা শোনাতে হয় তো আপনার চার বউকে শোনান গিয়ে, খুশি হবে', বলেই সোনালি অন্য দিকে চলে গেল।

কুঁকড়ো রেগে গজ গজ করে ঘুরে বেড়ান, অনেকক্ষণ পরে সোনালি আস্তে আস্তে কুঁকড়োর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে, 'একটা গান গাও না।' কুঁকড়ো ফোঁস করে উঠলেন, সোনালি বললে, 'বাসরে, একে বুঝি বলে গান!' তখন মিষ্টি সুরে কুঁকড়ো ডাকলেন, 'সো-ও-ও-ন', যেন শ্যামা পাখি সিটি দিলে, সোনালি অমনি আবদার ধরলেন, কুঁকড়োর গুপ্ত মন্তরটি শোনবার জন্যে। কুঁকড়ো খানিক এদিক ওদিক করে বললেন, 'সোনালি, তুমি বাইরে যেমন খাঁটি সোনার বুকের ভিতরটাও যদি তেমনই তোমার খাঁটি হয় তবে তোমায় আমার গোপন কথাটি শোনাতে পারি', বলে সোনালির মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে যেন শুনতে লাগলেন, সোনালির বুকের মধ্যে থেকে ডাক আসছে কি না, 'বলো বলো।' তারপর কুঁকড়ো আরম্ভ করলেন, 'সোনালি পাখি, বুঝে দেখো আমি কী, সোনার শিঙার মতো বাঁকা আমি বাজবার জন্যেই সৃষ্টি হয়নি কি জীবন্ত এক রৌশন চৌকি? জলের উপরে যেমন রাজহাঁস, তেমনই সুরের তরঙ্গে ভেসে বেড়াতেই আমার জন্ম, আমি চলেছি সুরের বোঝা শব্দের ভার বয়ে সোনার একটি মউরপঙখি, সকাল-বিকাল।'

সোনালিয়া বলে উঠল, 'নৌকোর মতো ভেসে বেড়াতে তো তোমায় কোনওদিন দেখিনি, মাটি আঁচড়াতে প্রায়ই দেখি বটে।'

কুঁকড়ো বললেন, 'মাটি আঁচড়াবার অর্থ আছে। তুমি কি মনে কর, আমি মাটি আঁচড়াই মাসকলাই সংগ্রহ করতে। সে করে মুরগিরা, আমি মাটি আঁচড়ে দেখি, কোন্ মাটি আমার উপযুক্ত দাঁড়াবার বেদি হতে পারে। আমি জানি, গান গাওয়া মিছে হবে যদি না ইঁট-পাটকেল ঘাস কুটো কাঁটা সব সরিয়ে এই পুরনো পৃথিবীর কালো মাটির পরশখানি নিতে ভুলি। পৃথিবীর বুকের খুব কাছে দাঁড়িয়ে মাটির সঙ্গে নিজেকে একেবারে মিলিয়ে তবে আমি গান করি। সোনালিয়া, প্রায় সবই তো শুনলে, আরও যদি জানতে চাও তো বলি, আমাকে সুর খুঁজে খুঁজে তো গান গাইতে হয় না, সুর আপনি ওঠে আমার মধ্যে, মাটি থেকে লতায় পাতায় রস যেমন করে উঠে আসে, গানও তেমনই করে আমার মধ্যে ছুটে আসে আপনি, জন্মভূমির বুকের রস। পুব আকাশের তীরে সকালটি ফুটি ফুটি করছে, ঠিক সেই সময় আমার মধ্যে উথলে উঠতে থাকে সুর আর গান, বুক আমার কাঁপতে থাকে তারই ধাক্কায়, আর আমি বুঝি, আমি নাহলে সরস মাটির এই সুন্দর পৃথিবীর বুকের কথা খুলে বলাই হবে না। সকালের সেই শুভ লগ্নটিতে মাটি আর আমি যেন এক হয়ে যাই, মাটির দিকে আমি আপনাকে নিয়ে যাই, আর পৃথিবী আমাকে সুন্দর শাঁখের মতো নিজের নিশ্বেসে পরিপূর্ণ করে বাজাতে থাকে, আমার মনে হয় তখন আমি যেন আর পাখি নই, আমি যেন একটি আশ্চর্য বাঁশি, যার মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর কান্না আকাশের বুকে গিয়ে বাজছে।

'অন্ধকারের মধ্যে থেকে ভোররাতের হিম মাটি এই যে কাঁদন জানাচ্ছে, আকাশের কাছে তার অর্থ কী সোনালিয়া, সে আলো ভিক্ষে করছে, একটুখানি সোনার আলোমাখা দিন তারই প্রার্থনা, ভোরবেলার সবাই কাঁদছে, দেখবে, আলো চেয়ে, গোলাপের কুঁড়ি সে অন্ধকারে কাঁদছে আর বলছে, আলো দিয়ে ফোটাও। ওই যে খেতের মাঝে একটা কাস্তে চাষারা ভুলে এসেছে, সে ভিজে মাটিতে পড়ে মরচে ধরে মরবার ভয়ে চাচ্ছে আলো, একটু আলো এসে যেন রামধনুকের রঙে চারিদিকের ধানের শীষ রাঙিয়ে দেয়।

'নদী কেঁদে বলছে, আলো আসুক, আমার বুকের তলা পর্যন্ত গিয়ে আলো পড়ুক। সব জিনিস চাচ্ছে যেন আলোয় তাদের রঙ ফিরে পায়, আপনার আপনার হারানো ছায়া ফিরে পায়, তারা সারারাত বলছে, আলো কেন পাচ্ছি নে, আলো কী দোষে হারালেম।

'আর আমি কুঁকড়ো তাদের কান্না শুনে কেঁদে মরি, আমি শুনতে পাই ধান খেত সব কাঁদছে, শরতের আলোয় সোনার ফসলে ভরে ওঠবার জন্যে, রাঙা মাটির পথ সব কাঁদছে, যারা চলাচল করবে তাদের ছায়ার পরশ বুকের উপর বুলিয়ে নিতে আলোয়। শীতে গাছের উপরের ফল আর গাছের তলার গোল গোল নুড়িগুলি পর্যন্ত আলো তাপ চেয়ে কাঁদছে, শুনি। বনে বনে সূর্যের আলোক কে না চাচ্ছে বেঁচে উঠতে জেগে উঠতে, কে না আলোর জন্যে সারারাত কাঁদছে। এই জগৎসুদ্ধ সবার কান্না আলোর প্রার্থনা এক হয়ে যখন আমার কাছে আসে তখন আমি আর ছোটো পাখিটি থাকি নে, বুক আমার বেড়ে যায়, সেখানে প্রকাণ্ড আলোর বাজনা বাজছে শুনি, আমার দুই পাঁজর কাঁপিয়ে তারপর আমার গান ফোটে, 'আ-লো-র ফুল।' আর তাই শুনে পুবের আকাশ গোলাপি কুঁড়িতে ভরে উঠতে থাকে, কাকসন্ধ্যার কা কা শব্দ দিয়ে রাত্রি আমার গানের সুর চেপে দিতে চায়, কিন্তু আমি গেয়ে চলি, আকাশে

কাগডিমে রঙ লাগে তবু আমি গেয়ে চলি আলোর ফুল, তারপর হঠাৎ চমকে দেখি আমার বুক সুরের রঙে রাঙা হয়ে গেছে আর আকাশে আলোর জবাফুলটি ফুটিয়ে তুলেছি আমি পাহাড়তলির কুঁকড়ো।'

সোনালি অবাক হয়ে বললে, 'এই বুঝি তোমার মন্তর।'

'হাঁ, সোনালি, মন্তরটা অত কিছু নয়, আমি না থাকলে পুব আকাশে সব আলো ঘুমিয়ে থাকত এই বিশ্বাসটা আমি করতে পেরেছি এইটুকুই আমার ক্ষমতা, তা একে মন্তরই বলো বা তন্তরই বলো কিংবা অন্তরই বলো'। বলে কুঁকড়ো এমনি ঘাড় উঁচু করে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালেন যে মনে হল যেন তিনি বলছেন—'ঘাড় হেঁট হয় এমন কাজ আমি করি নে, আমি নিজের গুণগান করে বেড়াই নে, আমি আলোর জয়জয়কারই দিই, আমি জোরে গাই নিজের গলায় রেশ নিজে শোনবার জন্যে নয়, আমি জোরে গাই আলোতে সব পরিষ্কার হয়ে ফুটবে বলে।' কুঁকড়ো যতক্ষণ বলে চলেছিলেন ততক্ষণ সোনালি সব ভুলে তাঁর কথাই শুনছিল, এখন কুঁকড়ো চুপ করতে তার চটকা ভেঙে গেল, কুঁকড়োর কথায় তার অবিশ্বাস হল; সে বলে উঠল, 'একি পাগলের কথা! তুমি, তুমি ফুটিয়ে দাও আকাশে...'

'সেই জিনিস যা চোখের পাতা মনের দুয়ারে এসে ঘুমের ঘোমটা খুলে দেয়। আকাশ যেদিন মেঘে ঢাকা, সেদিন জানব, আমি ভালো গাইনি।'

'আচ্ছা, তুমি যে দিনের বেলাও থেকে থেকে ডাক দাও, তার অর্থটা কী শুনি।' সোনালি শুধোল।

কুঁকড়ো বললেন, 'দিনের বেলায় এক একবার গলা সেধে নিই মাত্র। আর কখনোবা ওই লাঙলটাকে নয়তো কোদালটাকে ওই ঢেঁকি ও ওইখানে ওই কুড়ুল এই কাস্তেকে বলি, ভয় নেই, আলোকে জাগিয়ে দিতে ভু-ল-ব-না ভু-ল-ব-না।'

সোনালি বললে, 'ভালো, আলোকে যেন তুমি জাগালে, কিন্তু তোমাকে ঠিক সময়ে জাগিয়ে দেয় কে, শুনি?'

'পাছে ভুল হয়, সেই ভয়েই আমি জেগে উঠি।'

কুঁকড়োর জবাব শুনে সোনালির তকরার করবার ঝোঁক বাড়ল বই কমল না; সে বললে, 'আচ্ছা, তুমি কি মনে কর, সত্যি তোমায় গানে জগৎ জুড়ে আলোর বান ডাকে?'

কুঁকড়ো বললেন, 'জগৎ জুড়ে কি হচ্ছে তার খবর আমি রাখিনে, আমি কেবল এই পাহাড়তলিটির আলোর জন্য গেয়ে থাকি, আর আমার এই বিশ্বাস যে এ পাহাড়ে যেমন আমি ও পাহাড়ে তেমনই সে, এমনই এক এক পাহাড়তলিতে এক এক কুঁকড়ো রোজ রোজ আলোকে জাগিয়ে দিচ্ছে।' সোনালির সঙ্গে কথা কইতে রাত ফুরিয়ে এল। কুঁকড়ো দেখলেন, সকালের জানান দেবার সময় হয়েছে, তিনি সোনালিকে বললেন, 'সোনালি, আজ তোমার চোখের সামনে সূর্য ওঠাব, আমাকে পাগল ভেবো না, দেখো এবং বিশ্বাস করো। আজ যে গান আমার বুকের মধ্যে গুমরে উঠছে, তেমন গান আমি কোনওদিন গাইনি, গানের সময় আজ তুমি কাছে দাঁড়াবে, আমার মনে হচ্ছে, আজ সকালটি তাই এমন আলোময় হয়ে দেখা দেবে যে তেমন সকাল এই পাহাড়তলিতে কেউ কখনও দেখেনি সোনালিয়া।' বলে কুঁকড়ো ঢালুর উপরে গিয়ে দাঁড়ালেন। নীল আকাশের গায়ে যেন আঁকা সেই কুঁকড়োকে কী সুন্দরই দেখাতে লাগল। সোনালি মনে মনে বললে, 'এঁকে কি অবিশ্বাস করতে পারি।' এইবার কুঁকড়ো সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, গায়ের রঙিন পালক ঝাড়া দিয়ে। সোনালি দেখলে, তাঁর মাথার মোরগফুলটা যেন আগুনের শিখার মতো রগরগ করছে। পুব দিকে মুখ করে কুঁকড়ো ডাক দিলেন, 'ফ জী-ই-ই-র্ ফ-জী-র্'... সোনালি শুনলে কুঁকড়ো যেন পুব আকাশকে হুকুম দিলেন, 'কাজ শুরু করো', আর অমনি মাটির হুকুম কাজের সাড়া সকালের বাতাসে অনেক দূর পর্যন্ত ছুটে গেল, 'ভোর ভয়ি ভো-র ভ-য়ি' হাঁকতে হাঁকতে। তারপর সোনালি দেখলে কুঁকড়ো যেন সব কাদের সঙ্গে কথা কইছেন, 'বাদল বসন্তের চেয়ে দু'দণ্ড আগে তোমার আলো এনে দেব ভয় নেই।' সোনালি দেখলে তিনি একবার মাটির কাছে মুখ নামিয়ে একবার ও ঝোপ এ ঝোপের দিকে মুখ ফিরিয়ে কখনও ঘাসগুলির পিঠে ডানা বুলিয়ে কত কী বলছেন, যেন সবাইকে তিনি অভয় দিচ্ছেন আর বলছেন, 'দেব দেব, আলো দেব, রোদ দেব, হিম আঁধার ঘুচবে, ভয় কী ভয় কী।' অণুপরমাণু ধুলোবালি তারা—কুঁকড়োর কানে কানে কী বলে গেল, কুঁকড়ো ঘাড় নেড়ে বললেন, 'দোলনা চাই, আচ্ছা, দোলনা দিচ্ছি, সোনার সে দোলনা বাতাসে ঝুলবে, আর অণু পরমাণু মিলে লাগবে ঝুলোন দে দোল দোল, দে দোল দোল।' সোনালি দেখলে আকাশ আর মাটির মধ্যে ঝোলানো পাতলা নীল অন্ধকার একটু একটু দুলছে আর দেখতে দেখতে ভোরের শুকতারা যেন ক্রমে নিভে আসছে। সোনালি বললে, 'দিনের আলো দেবার

আগে সব তারাগুলোকে বড়ো যে নিভিয়ে দিচ্ছ, এককে নিভিয়ে অন্যকে আলো দেওয়া, এ কেমন?' কুঁকড়ো একটু হেসে বললেন, 'একটি তারাও আমি নিভিয়ে ফেলিনি সোনালি, আলো জ্বালাই আমার ব্রত, দেখো এইবার পৃথিবী আলোময় হচ্ছে, রাত্রি দূ-উ-উ-র হল দেখতে দেখতে।' সোনালির চোখের সামনে নীলের উপর হলদে আলো লেগে সমস্ত আকাশ ধানি রঙে সবুজ হয়ে উঠল, মেঘগুলোতে কমলা রঙ আর দূরের পাহাড়ে মাঠে সব জিনিসে কুসুম ফুলের গোলাপি আভা পড়ল। কুঁকড়ো ডাক দিয়ে চললেন, 'আলোর ফুল আলোর ফু-ল-কি-ই-ই গোলাপি হোক সোনালি, সোনালি সে রুপোলি, রুপোলি হোক সাদা আ-লো-আ-লো-র ফুল', কিন্তু তখনও দূরে খেতগুলোতে শোন ফুলের রঙ মেলায়নি, সব জিনিসে চমক দিচ্ছে, কুঁকড়ো ডাকলেন, 'আ-লো-ও ও', অমনি কাছের খেতের উপরে চট করে এক পোঁছ সোনালি পড়ল, পাহাড়ে ঝাউগাছের মাথায় সোনা ঝকমক করে উঠল। কুঁকড়ো পুব ধারের আকাশকে বললেন, 'খুলুক খুলুক।' অমনি আকাশ জুড়ে পুব দিকে আলোর ছড়া পড়তে থাকল। পাহাড়ের দিকে চেয়ে কুঁকড়ো ডাকলেন, 'খুলুক খুলুক', অমনি সব পাহাড়ে পাহাড়ে গোলাপি ফুলে ভরা পদম গাছ ছবির মতো খুলে গেল সোনালির চোখের সামনে। 'খুলুক খুলুক', দূরে ঝাপসা পাহাড় কুয়াশার চাদর খুলে যেন কাছে এসে দাঁড়াল। দূরের কাছের সব জিনিস ক্রমে পরিষ্কার হয়ে উঠছে, অন্ধকার থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে, নতুন করে আলো-ছায়া দিয়ে গড়া এক টুকরো পৃথিবী। শুকনো ছড়ি থেকে ফলন্ত আমগাছ গড়বার সময় ছেলেরা যেমন সেটার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে সোনালি তেমনই কুঁকড়োর এইসব কাণ্ডকারখানা অবাক হয়ে দেখছিল, আর ভাবছিল কুঁকড়োই বুঝি এ সবের ছিষ্টিকত্তা, এমন সময় কানের কাছে শুনলে, 'সোন, বলো ভালোবাস তো?'

সোনালি খানিক চুপ করে থেকে বললে, 'অন্ধকার থেকে এমন সকাল যে উঠিয়ে আনলে, তার সঙ্গে মনের কথা চালাচালি করতে কে না ভালোবাসে।'

কুঁকড়ো বললেন, 'সরে এসো সোনালি, বুক তুমি আনন্দে ভরে দিয়েছ, তোমাকে পেয়ে আজ কাজ মনে হচ্ছে কত সহজ' এই বলে কুঁকড়ো ডাকলেন, 'আলোর ফুলকি সোনালি', সোনালি অমনি কুঁকড়োর একেবারে খুব কাছে এসে বললে, 'ভালোবাসি গো ভা-লো-বা-সি।' কুঁকড়ো বললেন, 'সোনালিয়া, তোমার সোনালিয়া রূপটি সোনালি কাজলের মতো আমার চোখের কোলে লাগল, তোমার মধুর মতো মিষ্টি আর সোনালি কথা প্রাণের মধ্যেটা সোনায় সোনায় ভরে দিয়েছে। এত সোনা আজ পেয়েছি যে মনে হচ্ছে এখনই ওই সামনের উঁচু পাহাড়টা আমি আগাগোড়া সোনায় মুড়ে দিতে পারি।' সোনালিয়া আদর করে বললে, 'দাও না পাহাড়টা গিলটি করে, আমি তোমাকে রোজ রোজ ভালোবাসব।' কুঁকড়ো হাঁক দিলেন, 'সো-না-র জল সো-না-লি-য়া', অমনি পাহাড়ের চুড়োয় সোনা ঝকঝক করে উঠল, তারপর সোনা গলে ঢালু বেয়ে আস্তে আস্তে নিচের পাহাড়ের গোলাপিতে এসে মিশল, শেষে গোলাপি ছাপিয়ে একেবারে তলায় মাঠের উপর গড়িয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে দূর আর কাছের রাস্তা-ঘাট মাঠ-ময়দান ঘর-দুয়োর গ্রাম-নগর বন-উপবন সোনাময় হয়ে দেখা দিল। কিন্তু দূরে পাহাড়ের গায়ে এখানে ওখানে নদীর ধারে গাছগুলোর শিয়রে এখনও একটু একটু কুয়াশা মাকড়সার জালের মতো জড়িয়ে রয়েছে, ওগুলো তো থাকলে চলবে না, কুঁকড়ো প্রথম আস্তে বললেন, 'সাফাই', সোনালি ভাবলে, কুঁকড়ো বুঝি হাঁপিয়ে পড়েছেন আর বুঝি পারেন না গান করতে, কিন্তু একি যে সে কুঁকড়ো যে কাজ বাকি রেখে যেমন তেমন সকাল করেই ছেড়ে দেবে, 'আরও আলো চাই' বলে কুঁকড়ো আবার গা ঝাড়া দিয়ে এমন গলা চড়িয়ে ডাক দিলেন যে মনে হল বুঝি, তাঁর বুকটা ফেটে গেল, 'আলোর ফুল আলোর ফুল, ফু-উ-উ-উল-কি-ই-ই আলো-র-র-র-র'। দেখতে দেখতে আকাশের শেষ তারাটি সকালের আলোর মধ্যে একেবারে হারিয়ে গেল, তারপর দূরে দূরে গ্রামের কুটিরের উপর জ্বলন্ত আখার সাদা ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে সকালের আকাশের দিকে উঠে চলল আস্তে আস্তে। সোনালি তাকিয়ে দেখলে কুঁকড়ো কী সুন্দর। সে সকালের শিল্পী কুঁকড়োকে মাথা নিচু করে নমস্কার করলে। আর কুঁকড়ো দেখলেন, আলোর ঝিকিমিকি আঁচলের আড়ালে সোনালিয়ার সুন্দর মুখ। কুঁকড়ো মোহিত হলেন। আজ তাঁর সকালের আরতি সার্থক হল, তিনি এক আলোতে তাঁর জন্মভূমিকে আর তাঁর ভালোবাসার পাখিটিকে সোনায় সোনায় সাজিয়ে দিলেন। কুঁকড়ো আনন্দে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন, কিন্তু তখনও কেন মনে হচ্ছে, কোথায় যেন একটু অন্ধকার লুকিয়ে আছে। তিনি আবার ডাক দিতে যাবেন, এমনি সময় নিচের পাহাড় থেকে একটির পর একটি মোরগের ডাক শোনা যেতে লাগল; যে যেখানে সবাই সকালের আলো পেয়ে গান গাচ্ছে। আগে আলো হল, পরে এল

সব মোরগের গান, কুঁকড়ো কিন্তু সবার আগে যখন আলো বলে ডাক দিয়েছেন, তখনও রাত ছিল, তিনি যে সবার বড়ো, তাই অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি আলোর আশা সবাইকে শোনাতে পারেন। আলো জাগানো হল, এইবার সূর্যকে আনা চাই, কুঁকড়ো আবার শুরু করলেন, 'রাঙা ফুল আগুনের ফুলকি', অমনি দিকে দিকে সব মোরগ গেয়ে উঠল সেই সুরে, 'আলোর ফুলকি, আলোর ফুল।'

সোনালি বললে, 'দেখেছ ওদের আস্পর্ধা। তোমার সঙ্গে কিনা সুর ধরেছে, এতক্ষণ সবাই ছিলেন কোথা?'

কুঁকড়ো বললেন, 'তা হোক, সুর বেসুর সব এক হয়ে ডাক দিলে যা চাই তা পেতে বেশি দেরি হয় না, সূর্য দেখা দিলেন বলে।' কিন্তু তখনও কুঁকড়ো দেখলেন একটি কুটির ছায়ায় মিশিয়ে রয়েছে, তিনি হাঁক দিলেন অমনি কুটিরের চালে সোনার আলো লাগল। দূরে একটা সরষে খেত তখনও নীল দেখাচ্ছে, কুঁকড়ো ডাক দিলেন, আলো পড়ে খেতটা সবুজ হল, খেতে যাবার রাস্তাটি পরিষ্কার সাদা দেখা গেল, নদীটা কেমন ধোঁয়াটে দেখাচ্ছিল। কুঁকড়ো ডাকলেন, অমনি নদীর জলে পরিষ্কার নীল রঙ গিয়ে মিলল। হঠাৎ সোনালিয়া বলে উঠল, 'ওই যে সূর্য উঠেছেন।' কুঁকড়ো আস্তে আস্তে বললেন, 'দেখেছি, কিন্তু বনের ওপার থেকে এপারে টেনে আনতে হবে আমাকে ওই সূর্যের রথ, এসো তুমিও', বলেই কুঁকড়ো নানা ভঙ্গিতে যেন সূর্যের রথ টেনে ক্রমে পিছিয়ে চললেন, 'তফাত হো তফাত হো' বলতে বলতে। সোনালিয়া বলতে লাগল, 'আসছেন আসছেন', কুঁকড়ো হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'ওপার থেকে এল রথ।' ঠিক সেই সময়ে শালবনের ওপার থেকে সূর্য উদয় হলেন সিন্দুর বরন। কুঁকড়ো মাটিতে বুক ঠেকিয়ে সূর্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বললেন, 'আঃ, আজকের সূর্য কত বড়ো দেখেছ!' সোনালির ইচ্ছে, কুঁকড়ো সূর্যের জয় দিয়ে একবার গান করেন। কিন্তু গলার সব সুর খালি করে তিনি আজ সকালটি এনেছেন আর তাঁর সাধ্য নাই গাইতে। যেমন এই কথা সোনালিকে কুঁকড়ো বলেছেন, অমনি দূরে দূরে সব মোরগ ডেকে উঠল 'উরু-উরু-রু-রু-রু'। কুঁকড়ো শুকনো মুখে বললেন, 'আমি নাই বা জয় দিলেম, শুনছ দিকে দিকে ওরা সব তূরী বাজিয়ে তাঁর উদয় ঘোষণা করছে।' সোনালি শুধোলে, 'সূর্য উঠলে পর তুমি কি কোনওদিনই তাঁর জয়-জয়কার দাও না? তোমার নবতখানায় সোনার রৌশনচৌকি সূর্যের জয় দিয়ে কি কোনওদিন বাজাওনি।'

'একটি দিনও নয়' বলে কুঁকড়ো চুপ করলেন। সোনালি একটু ঠেস দিয়ে বললে, 'সূর্য তো তাহলে ভাবতে পারেন অন্য সব মোরগেরা তাঁকে উঠিয়ে আনে।' কুঁকড়ো বললেন, 'তাতেই বা কী এল গেল।' সোনালি আরও কি বলতে যাচ্ছে, কুঁকড়ো তাকে কাছে ডেকে বললেন, 'আমি তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি, তুমি আমার কাছে আজ না দাঁড়ালে সকালের ছবিটা কখনই এমন উতরাতো না।' সোনালি কুঁকড়োর কাছে এসে বললে, 'তুমি যে সকালটা করতে সূর্যের রথ বনের ওধার থেকে টেনে আনতে এত কষ্ট করলে তাতে তোমার লাভটা কি হল।' কুঁকড়ো বললেন, 'পাহাড়ের নিচে থেকে ঘুমের পরে জেগে ওঠার যে সাড়াগুলি আমার কাছে এসে পৌঁচচ্ছে, এইটেই আমার পরম লাভ।' সোনালি সত্যিই শুনলে, নিচে থেকে দূর থেকে কাছ থেকে কী সব শব্দ আসছে। সে পাহাড় থেকে মুখ ঝুঁকিয়ে চারিদিক চাইতে লাগল। কুঁকড়ো চুপটি করে চোখ বুজে বসে বললেন, 'কি শুনছ সোনালিয়া, বলো।'

সোনালিয়া বলে চলল, 'আকাশের গায়ে কে যেন কাঁসর পিটছে।'

কুঁকড়ো বললেন, 'দেবতার আরতি বাজছে।'

সোনালি বললে, 'এবার যেন শুনছি মানুষদের আরতির বাজনা টং টং।'

কুঁকড়ো বললেন, 'কামারের হাতুড়ি পড়ছে।'

সোনালি, 'এবার শুনছি গরু সব হামা দিয়ে ডাকছে আর মানুষে গান ছেড়েছে।'

কুঁকড়ো, 'হাল গরু নিয়ে চাষা চলেছে।'

সোনালি এবার বললে, 'কাদের বাসা থেকে বাচ্চাগুলো সব রাস্তার মাঝে চলকে পড়ে কিচমিচ করে ছুটছে।'

কুঁকড়ো বলে উঠলেন, 'পাঠশালার পোড়োরা চলল', বলে কুঁকড়ো সোজা হয়ে বসলেন। সোনালি আবার বললে, 'পিঁপড়ের মতো কারা সাদা হাত-পাওয়ালা কাদের সব ধরে ধরে আছাড় দিচ্ছে, খুব দূরে একটা জলের ধারে পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।'

কুঁকড়ো বললেন, 'কাপড় কাচা হচ্ছে। আর দেখছি'—সোনালিয়া বললে, 'এ কি, কালো কালো ফড়িংগুলো সব ইস্পাতের মতো চকচকে ডানা ঘষছে।' কুঁকড়ো দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'ওহো, কাস্তেতে যখন শান পড়ছে

তখন ধানকাটার দিন এল বলে।' তারপর পাহাড়তলির থেকে এদিক থেকে ওদিক থেকে চারিদিক থেকে কত কিসের সাড়া আসতে লাগল। ঘণ্টার ঢং ঢং, হাতুড়ির ঠং ঠং, কুড়ুলের খট খট, জলের ছপ ছপ, সেকরার টুকটাক, কামারের এক ঘা, হাসি বাঁশি বাজনা সব শুনতে লাগলেন কুঁকড়ো। কাজকর্ম চলেছে, কেউ কি আর ঘুমিয়ে নেই বসে নেই সত্যিই দিন এসেছে, কুঁকড়ো যেন স্বপন দেখার মতো চারিদিকে চেয়ে বললেন, 'সোনালি, দিন কি সত্যিই আনলেম, এইসব কারখানা একি আমার ছিষ্টি। দিন আমি যে আনলুম মনে করেছি আমি যে ভাবছি আকাশে আলো আমিই দিচ্ছি একি সত্যি, না এসব পাহাড়তলির পাগলা কুঁকড়োর খ্যাপামি আর খেয়াল? সোনালি, একটি কথা বলব কিন্তু বলো সে কথা প্রকাশ করবে না, আমার শত্রু হাসাবে না? সোনালি, তুমি আমাকে যাই ভাব না কেন, আমি জানি এই স্বর্গে মর্তে আলো দেবার ভার নেবার উপযুক্ত পাত্র আমি নই, এত পাখি থাকতে অতি তুচ্ছ সামান্য পাখি আমার উপর অন্ধকারকে দূর করবার ভার পড়ল? কত ছোটো, কত ছোটো আমি, আর এই জগৎজোড়া সকালের আলো সে কী আশ্চর্যরকম বড়ো, কী অপার তার বিস্তার। প্রতিদিন সকালে আলো বিলিয়ে যখন দাঁড়াই তখন মনে হয়, একেবারে ফকির হয়ে গেছি। আমি যে আবার কোনওদিন এতটুকুও আলো দিতে পারব তার আশাটুকুও থাকে না।' সোনালি শুনলে যেন কুঁকড়োর কথা চোখের জলে ভিজে ভিজে, সে তাঁর খুব কাছে গিয়ে বললে, 'মরি মরি।' কুঁকড়ো সোনালির মুখ চেয়ে বললেন, 'আঃ সোনাল, যে আশা-নিরাশার মধ্যে আমার বুক নিয়ত দুলছে তার যে কী জ্বালা কেমন করে বলি। গান গাইতে হবে, আলোও জ্বালাতে হবে, কিন্তু কাল যখন আবার এইখানে দাঁড়িয়ে দশ আঙুলে আশার রাগিণী খুঁজে খুঁজে কেবলই মাটির বুকের তারে তারে টান দিতে থাকব, তখন হারানো সুর কি আবার ফিরে পাব, না দেখব, গান নেই গলা নেই আলো নেই তুমি নেই আমি নেই কিছু নেই? হারাই কি পাই, এরই বেদনা মোচড় দিচ্ছে বুকের শিরে শিরে সোনালি। এই যে দোটানায় মন আমার দুলছে এর যন্ত্রণা কে বুঝবে। রাজহাঁস যখন রসাতলের দিকে গলাটি ডুবিয়ে দেয়, সে নিশ্চয় জানে, পদ্মের নাল তার জন্যে ঠিক করা রয়েছে জলের নিচে, বাজপাখি যখন মেঘের উপর থেকে আপনাকে ছুড়ে ফেলে মাটির দিকে তখন সেও জানে ঠিক গিয়ে সে যেটা চায় সেই শিকারের উপরেই পড়বে, আর সোনালি তুমিও জানো বনের মধ্যে উইপোকা আর পিঁপড়ের বাসার সন্ধান পেতে তোমায় এতটুকুও ভাবতে হয় না, কিন্তু আমার এ কী বিষম ডাক দেওয়া কাজ। কাল যে কী হবে সেই দুঃস্বপ্নই বয়ে বেড়াচ্ছি, আজকের ডাক আজকের সাড়া কাল আবার দেবে কি না প্রাণ, গান গাব কি না ফিরে আর একবার, তাই ভাবছি সোনালিয়া।'

সোনালি কুঁকড়োকে আপনার ডানার মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললে, 'নিশ্চয়ই কাল তুমি গান ফিরে পাবে গলা ফিরে পাবে, আলোর সুর মাটির ভালোবাসা আবার সাড়া দেবে তোমার বুকের মধ্যে।'

কুঁকড়ো সোনালিকে বললেন, 'কী আশার আলোই জ্বালালে সোনালি, বলো বলো আরও বলো—।'

সোনালি চুপি চুপি বললে, 'আহা মরি, কী সুন্দর তুমি।' 'ও কথা থাক সোনালি।' 'কী চমৎকারই গাইলে তুমি।' কুঁকড়ো বললেন, 'গান ভালো মন্দ যেমনই গাই আমি যে আনতে পেরেছি...।' সোনালি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'ঠিক, ঠিক, আমি তোমায় যতই দেখছি ততই অবাক হচ্ছি।' 'না সোনালি, আমার কথার উত্তর দাও, বলো, সত্যি কি—।' সোনালি আস্তে বললে, 'কী?' কুঁকড়ো বললেন, 'বলো, সত্যি কি আমি', সোনালি এবার তাড়াতাড়ি উত্তর দিলে, 'পাহাড়তলির কুঁকড়ো তুমি সত্যি আলো দিয়ে সূর্যকে ওঠালে আজ, এ আমি স্বচক্ষে দেখেছি।'

'ভ্যালারে ওস্তাদ'—বলেই তালচড়াইটা হঠাৎ উপস্থিত। কুঁকড়ো চমকে উঠে দেখলেন চড়াইটা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ভুরু তুলে শিস দিচ্ছে আর নমস্কার করছে। কুঁকড়ো ভাবছেন এ হরবোলাটা সব শুনেছে নাকি। ইতিমধ্যে সোনালিয়া আস্তে আস্তে অন্য দিকে চলেছে দেখে তিনি ডাকলেন, 'আমাদের একলা ফেলে কোথায় যাও সোনালি।' চড়াই যতই হাসুক কুঁকড়োর আজ কিছুই গায়ে লাগবে না, সোনালিকে কাছে পেয়ে তাঁর আনন্দ ধরছে না।

চড়াই বললে, 'বাহবা তারিফ। যা দেখলেম শুনলেম—।'

কুঁকড়ো বললেন, 'চটকরাজ, তুমি যে মাটি ফুঁড়ে উপস্থিত হলে দেখছি।'

চড়াই কুঁকড়োকে সেই পুরানো ময়লা খালি ফুলের টবটা দেখিয়ে বললে, 'আমি ওইটের ভিতরে বসে একটা কানকুটুরে পোকা কুট কুট করে খাচ্ছি এমন সময় আঃ, কী যে দেখলেম, কী যে শুনলেম তা কী বলি।'

কুঁকড়ো বললেন, 'তারপর।' চড়াই অমনি বলে উঠলে, 'তারপর যদি বলি ওই মাটির টবটা দিব্যি শুনতে পায় তবে কি তুমি অবাক হবে নাকি।'

কুঁকড়ো বললেন, 'গামলা থেকে লুকিয়ে শোনা বিদ্যেও তোমার আছে দেখছি।' চড়াই জবাব দিলে, 'শুধু শোনা নয় লুকিয়ে দেখার লুকি-বিদ্যেও আমি জানি, আমি এমনই অবাক হয়েছিলেম যে কখন যে গামলার তলার ফুটোটা দিয়ে উঁকি মেরে সব দেখেছি তা আমার মনে নেই। আহা, কী দেখলেম রে, কী দেখলেম রে, কী সুন্দর কী সুন্দর।'

কুঁকড়ো তাকে এক ধমক দিয়ে বললে, 'বটে, লুকিয়ে দেখা! তফাত যাও।' কুঁকড়ো যত বলেন, 'তফাত তফাত', চড়াই ততই লেজ নাচিয়ে বেড়ায় আর ঘাড় নেড়ে কুঁকড়োর নকল করে কিচ কিচ করে, 'বিদ্যে ফাঁস লুকি-বিদ্যে হল ফাঁস ফুস-মন্তর হল ফাঁস ক্যা বাৎ ক্যা বাৎ।' কুঁকড়ো তার রকম দেখে হেসে ফেললেন। সোনালিয়া বললে, 'চড়াই যখন সত্যিই তোমায় ভক্তি করে তখন ওর সাত খুন মাপ।'

চড়াই বললে, 'ভক্তি করব না? এমন আলেয়া বাজিগর বুজরুগ কেউ কি দেখেছে, কী সকালের রঙটাই ফলালে কী গানটাই গাইলে গা যেন তুবড়িবাজি ভুস।'

সোনালি বললে, 'এখন তোমরা দুই বন্ধুতে আলাপ-সালাপ করো, আমি চললুম।'

কুঁকড়ো বললে, 'কো-ক্-কো-ক্ কোথায়?'

সোনালি বললে, 'ওই যে সেই—।'

চড়াই অমনি বলে উঠল, 'তাই তো, কুঁকড়োর গানের গুণে চিনে-মুরগির ছোটো হাজিরিও জমতে চলল, সাধে বলি কুঁকড়োর গান গাওয়া, চিনে-মুরগির চা খাওয়া, একসঙ্গে আসা যাওয়া।'

কুঁকড়ো সোনালিকে চুপি চুপি শুধোলেন, সে একা যাবে, না তিনিও সঙ্গে যাবেন?

সোনালি বললে, না ওরকম মজলিসে তাঁর যাওয়াটা ভাল দেখায় না। কুঁকড়ো সোনালিকে বললেন, 'তবে তুমি যাচ্ছ যে।'

সোনালি বললে, 'আমি যাচ্ছি আজ তোমার আলোর ঝকমকানিটা কেমন তাই সেইসব হিংসুক পাখিকে দেখিয়ে আসব', বলে সোনালি একবার গা ঝাড়া দিলে তার সোনার পালকগুলো থেকে যেন আলো ঠিকরে পড়তে লাগল। সোনালি কুঁকড়োকে সেইখানে তার জন্যে থাকতে বলে চিনে-মুরগির মজলিসে চলল। চড়াই অমনি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'হাঁ, কুঁকড়োর আজ সেখানে না গেলেই ভালো।'

কুঁকড়ো শোধালেন, 'কেন।'

'সে তোমার শুনে কাজ নেই' বলে চড়াই মিটমিট করে চাইতে লাগল সোনালির দিকে।

সোনালি হেসে বললে, 'না, চড়াইকেও যে তুমি পাগলা করলে' বলে সোনালি পাখি সোনালি ডানা মেলে উড়ে গেল। কুঁকড়ো চড়াইয়ের দিকে চেয়ে ভাবছেন, জিম্মা একে দেখতে পারে না, কিন্তু চড়াইটা নেহাত মন্দ নয়, একটু বক্তার বটে, কিন্তু বদমাশ তো নয়।

চড়াই এবার লেজ নেড়ে বললে, 'বলিহারি তোমার বুদ্ধিকে, সব মুরগিগুলোকে বিশ্বাস করিয়েছ যে তুমিই সূর্যোদয় করে থাক, মেয়েদের চোখে ধুলো দিতে তোমার মতো দুটি নেই, এতদিনে বুঝলেম মুরগিরা কেন তোমার অত প্রশংসা করে। হয় কলম্বস যে ডিমটি নিয়ে রাজাকে ডিমের বাজি দেখিয়েছিলেন সেই ডিমটি থেকে তুমি বেরিয়েছ, নয়তো সিন্ধবাদ যে আজগুবি সামোরগের ডিমের গল্প লিখে গেছে, তারি তুমি বাচ্চা, এ নাহলে তুমি আলোর আবিষ্কর্তা হতে না আর মুরগিদের এমন আজগুবি কথা শুনিয়েও ভোলাতে পারতে না। অণু-পরমাণুদের জন্যে আলোর দোলনা, খড়ের চালে সোনার পোঁচ, এসব খেয়াল কি যে সে মাথা থেকে বার হয়, না আপনাকে অতি দীন অতি হীন বলে চালিয়ে যেমনি দিন এল বলে অমনি আলোর ফুল বলে চেঁচিয়ে উঠে ঝোপ বুঝে কোপ মেরে যাওয়া যার তার কর্ম।'

রাগে কুঁকড়োর দমবন্ধ হবার জোগাড় হচ্ছিল, তিনি অতি কষ্টে বললেন, 'থামো, চুপ।'

চড়াই দু-পা পিছিয়ে গিয়ে বললে, 'আচ্ছা, সত্যি কি তুমি জান না যে দিন-রাত যে আসে সেটা একটা প্রকৃতির নিয়ম ছাড়া আর কিছু নয়?'

কুঁকড়ো বললে, 'তুমি জানতে পার আমি জানি নে। আর যাই নিয়ে ঠাট্টা কর, করো, এ কথা নিয়ে আর কোনওদিন তামাশা কোরো না যদি আমার উপর তোমার একটুও মায়া থাকে।'

চড়াই মুখে বললে, খুব মায়া খুব শ্রদ্ধা সে কুঁকড়োকে করে কিন্তু তবু খোঁচা দিয়ে ঠেস দিয়ে কথা সে বলতে ছাড়ছে না, তর্কও করতে চায়।

কুঁকড়ো রেগে বললেন, 'কিন্তু যখন আমি ডাক দিতেই সূর্য উঠল আলো হল, সে আলো পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে গেল, আকাশে নানা রঙ ধরলে তখনও কি একবার তোমার মনে হয় না যে এসব কাণ্ড করলে কে।'

চড়াই বললে, 'গামলায় গর্তটা এমন ছোটো যে সেখান থেকে আমি কেবল একটুখানি মাটি আর তোমার ওই হলুদবরণ চরণ দু'খানি দেখেছিলেম, আকাশটা কোথায়, তা খবরেও আসেনি।'

কুঁকড়ো বললেন, 'তোমার জন্য আমার দুকখু হয়, আলোর মর্ম বুঝলে না, তুমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকো অত্যন্ত চালাক পাখি।'

চড়াই জবাব দিলে, 'বেশ কথা, অতি বিখ্যাত কুঁকড়ো।'

কুঁকড়ো বললেন, 'বেশ কথা, যে থাকবার থাক, আমি যেমন চলেছি সূর্যের দিকে মুখ রেখে তেমনই চলি দিনরাত এই পাখিজন্ম সার্থক করে নিয়ে। চড়াই জানো, বেঁচে সুখ কেন তা জানো?'

চড়াই ভয় পেয়ে বললে, 'তত্ত্বকথা এসে পড়ল শুনেই মনে হয় পিঁপড়ের পালক ওঠে মরিবার তরে', বলে চড়াই নিজের পালক খুঁটতে লাগল। কিন্তু কুঁকড়ো বলে চললেন, 'কিছুর জন্যে যদি চেষ্টা না করব তবে বেঁচেই থাকা বৃথা, বড়ো হবার চেষ্টাই হচ্ছে জীবনের মূল কথা, তুই চড়াই সবার সব চেষ্টাকে উড়িয়ে দিতে চাস, সেইজন্যে তোকে আমি ঘৃণা করি, এই যে এতটুকু গোলাপি পোকাটি একা মস্ত ওই গাছের গুঁড়িটাকে রুপোর জাল দিয়ে গিল্টি করতে চাচ্ছে, ওকে আমি বাস্তবিকই শ্রদ্ধা করি।' 'আর আমি ওকে টুপ করে গালে ভরি' বলেই চড়াই পোকাটিকে ভক্ষণ করলে। 'তোর কি দয়া মায়া নেই রে? যাঃ, তোর মুখ দেখব না' বলে কুঁকড়ো চললেন। চড়াই বললে, 'দয়া মায়া নেই কিন্তু ঘটে আমার বুদ্ধি আছে, যা হোক আমি আর তোমার কিছুতে নেই তোমার শত্রুরা যা ইচ্ছে করুক বাপু, আমার সে কথায় কাজ কি, তুমি জানো আর তারা জানে।'

কুঁকড়ো শোধালেন, 'শত্রু কারা শুনি?'

'কেন, পেঁচারা।' চড়াইটা বলে উঠল।

'শেষে এও ভাগ্যে ছিল, পেঁচা হলেন শত্রু আমার, হাঃ হাঃ হাঃ' বলে কুঁকড়ো হেসে উঠলেন।

চড়াই বললে, 'আলোর কাছে তারা এগোতে পারে না বটে, সেইজন্যে তারা এক বাজখাঁই গুণ্ডা জোগাড় করেছে, যে পাখি রোজই দিন গুনছে তাকে জবাই করতে।'

'কাকে তারা জোগাড় করেছে' কুঁকড়ো শোধালেন।

চড়াই বললে, 'তোমারই জাতভাই হায়দ্রাবাদি মোরগ, আঃ, সে যে কুস্তিগীর ভীম বললেই চলে, সে তোমার আসার পথ চেয়ে সেখানে আছে।' কুঁকড়ো শোধালেন, 'কোথায়।' 'ওই চিনে-মুরগির ওখানে' চড়াই বললে। কুঁকড়ো শোধালেন, 'তুমি তাকে দেখতে যাচ্ছ নাকি।' 'না বাবা, যে তার পায়ে লোহার কাঁটা বাঁধা কি জানি যদি লেগে যায় তবে' বলে চড়াইটা আড়চোখে কুঁকড়ো কী করেন দেখতে লাগল। কুঁকড়ো চট করে কুলতলার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। চড়াই যেন কত ভয় পেয়ে বললে, 'যাচ্ছ কোথায়।' 'কুলের কাঁটা যেখানে অনেক সেই কুলতলাতে যাচ্ছি' বলে কুঁকড়ো ঘাড় উঁচু করে পায়ে পায়ে চললেন। চড়াই যেন কুঁকড়োকে কিছুতেই যেতে দেবে না এমনই ভঙ্গি করে বললে, 'না তোমার যাওয়া সেখানে মোটেই উচিত হবে না, আমি বলছি যেয়ো না।' 'যাওয়া চাই' বলে কুঁকড়ো গম্ভীর মুখে পুরনো ফুলের খালি টবটা দেখে বললেন, 'এই ছোটো গামলাটির মধ্যে তুমি সেঁধোলে কেমন করে।' 'কেন এমনি করে' বলেই চড়াই লাফিয়ে সেটার মধ্যে গিয়ে বললে, 'কেন এই এমনি করে সেঁধিয়ে এই ফুটো দিয়ে আমি দেখলুম', 'কী দেখলে?' 'কেন মাটি', 'আর, এইবার আকাশ দেখে নাও।' বলেই কুঁকড়ো ডানার এক ঝাপটে টবটা উলটে চড়াইকে চাপা দিয়ে সোজা চলে গেলেন। চড়াইটা গামলার মধ্যে থেকে বেরবার জন্যে ঝটাপটি করতে থাকল 'গেছি গেছি' বলে।

৬

চিনি-দিদি ব্যস্ত হয়ে চারিদিকে ঘুরছেন—খাতির যত্ন করে; আর তাঁর ছেলেটিও মায়ের সঙ্গে ঘুরঘুর করছেন আর মাঝে মাঝে মায়ের দু'একটা ইংরিজি উচ্চারণের আর আদবকায়দার ভুল হলেই চমকে তাঁকে কানে কানে ধমকাচ্ছেন। ছেলেটি বিলেতে ভাষাতত্ত্ব পড়তে গিয়েছিলেন কিন্তু সাঁতার মোটেই না জানায় তিন তিনবার প্লাক্‌ট হয়ে এসেছেন।

সোনালি আঁচল উড়িয়ে বনমুরগি সোনালি যখন হেঁসেলবাড়ির খিড়কির কাছটায় পৌঁছল, তখন রাজ্যের পাখি

কুঁকড়ো রেগে বললেন, 'কিন্তু যখন আমি ডাক দিতেই সূর্য উঠল আলো হল, সে আলো পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে গেল, আকাশে নানা রঙ ধরলে তখনও কি একবার তোমার মনে হয় না যে এসব কাণ্ড করলে কে।'

চড়াই বললে, 'গামলায় গর্তটা এমন ছোটো যে সেখান থেকে আমি কেবল একটুখানি মাটি আর তোমার ওই হলুদবরণ চরণ দু'খানি দেখেছিলেম, আকাশটা কোথায়, তা খবরেও আসেনি।'

কুঁকড়ো বললেন, 'তোমার জন্য আমার দুকখু হয়, আলোর মর্ম বুঝলে না, তুমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকো অত্যন্ত চালাক পাখি।'

চড়াই জবাব দিলে, 'বেশ কথা, অতি বিখ্যাত কুঁকড়ো।'

কুঁকড়ো বললেন, 'বেশ কথা, যে থাকবার থাক, আমি যেমন চলেছি সূর্যের দিকে মুখ রেখে তেমনই চলি দিনরাত এই পাখিজন্ম সার্থক করে নিয়ে। চড়াই জানো, বেঁচে সুখ কেন তা জানো?'

চড়াই ভয় পেয়ে বললে, 'তত্ত্বকথা এসে পড়ল শুনেই মনে হয় পিঁপড়ের পালক ওঠে মরিবার তরে', বলে চড়াই নিজের পালক খুঁটতে লাগল। কিন্তু কুঁকড়ো বলে চললেন, 'কিছুর জন্যে যদি চেষ্টা না করব তবে বেঁচেই থাকা বৃথা, বড়ো হবার চেষ্টাই হচ্ছে জীবনের মূল কথা, তুই চড়াই সবার সব চেষ্টাকে উড়িয়ে দিতে চাস, সেইজন্যে তোকে আমি ঘৃণা করি, এই যে এতটুকু গোলাপি পোকাটি একা মস্ত ওই গাছের গুঁড়িটাকে রুপোর জাল দিয়ে গিল্টি করতে চাচ্ছে, ওকে আমি বাস্তবিকই শ্রদ্ধা করি।' 'আর আমি ওকে টুপ করে গালে ভরি' বলেই চড়াই পোকাটিকে ভক্ষণ করলে। 'তোর কি দয়া মায়া নেই রে? যাঃ, তোর মুখ দেখব না' বলে কুঁকড়ো চললেন। চড়াই বললে, 'দয়া মায়া নেই কিন্তু ঘটে আমার বুদ্ধি আছে, যা হোক আমি আর তোমার কিছুতে নেই তোমার শত্রুরা যা ইচ্ছে করুক বাপু, আমার সে কথায় কাজ কি, তুমি জানো আর তারা জানে।'

কুঁকড়ো শোধালেন, 'শত্রু কারা শুনি?'

'কেন, পেঁচারা।' চড়াইটা বলে উঠল।

'শেষে এও ভাগ্যে ছিল, পেঁচা হলেন শত্রু আমার, হাঃ হাঃ হাঃ' বলে কুঁকড়ো হেসে উঠলেন।

চড়াই বললে, 'আলোর কাছে তারা এগোতে পারে না বটে, সেইজন্যে তারা এক বাজখাঁই গুণ্ডা জোগাড় করেছে, যে পাখি রোজই দিন গুনছে তাকে জবাই করতে।'

'কাকে তারা জোগাড় করেছে' কুঁকড়ো শোধালেন।

চড়াই বললে, 'তোমারই জাতভাই হায়দ্রাবাদি মোরগ, আঃ, সে যে কুস্তিগীর ভীম বললেই চলে, সে তোমার আসার পথ চেয়ে সেখানে আছে।' কুঁকড়ো শোধালেন, 'কোথায়।' 'ওই চিনে-মুরগির ওখানে' চড়াই বললে। কুঁকড়ো শোধালেন, 'তুমি তাকে দেখতে যাচ্ছ নাকি।' 'না বাবা, যে তার পায়ে লোহার কাঁটা বাঁধা কি জানি যদি লেগে যায় তবে' বলে চড়াইটা আড়চোখে কুঁকড়ো কী করেন দেখতে লাগল। কুঁকড়ো চট করে কুলতলার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। চড়াই যেন কত ভয় পেয়ে বললে, 'যাচ্ছ কোথায়।' 'কুলের কাঁটা যেখানে অনেক সেই কুলতলাতে যাচ্ছি' বলে কুঁকড়ো ঘাড় উঁচু করে পায়ে পায়ে চললেন। চড়াই যেন কুঁকড়োকে কিছুতেই যেতে দেবে না এমনই ভঙ্গি করে বললে, 'না তোমার যাওয়া সেখানে মোটেই উচিত হবে না, আমি বলছি যেয়ো না।' 'যাওয়া চাই' বলে কুঁকড়ো গম্ভীর মুখে পুরনো ফুলের খালি টবটা দেখে বললেন, 'এই ছোটো গামলাটির মধ্যে তুমি সেঁধোলে কেমন করে।' 'কেন এমনি করে' বলেই চড়াই লাফিয়ে সেটার মধ্যে গিয়ে বললে, 'কেন এই এমনি করে সেঁধিয়ে এই ফুটো দিয়ে আমি দেখলুম', 'কী দেখলে?' 'কেন মাটি', 'আর, এইবার আকাশ দেখে নাও।' বলেই কুঁকড়ো ডানার এক ঝাপটে টবটা উলটে চড়াইকে চাপা দিয়ে সোজা চলে গেলেন। চড়াইটা গামলার মধ্যে থেকে বেরবার জন্যে ঝটাপটি করতে থাকল 'গেছি গেছি' বলে।

৬

চিনি-দিদি ব্যস্ত হয়ে চারিদিকে ঘুরছেন—খাতির যত্ন করে; আর তাঁর ছেলেটিও মায়ের সঙ্গে ঘুরঘুর করছেন আর মাঝে মাঝে মায়ের দু'একটা ইংরিজি উচ্চারণের আর আদবকায়দার ভুল হলেই চমকে তাঁকে কানে কানে ধমকাচ্ছেন। ছেলেটি বিলেতে ভাষাতত্ত্ব পড়তে গিয়েছিলেন কিন্তু সাঁতার মোটেই না জানায় তিন তিনবার প্লাক্ট হয়ে এসেছেন।

সোনালি আঁচল উড়িয়ে বনমুরগি সোনালি যখন হেঁসেলবাড়ির খিড়কির কাছটায় পৌঁছল, তখন রাজ্যের পাখি

সেখানে জুটে কিচমিচ লাগিয়েছে; চিনি-দিদির মজলিসটা খুঁজে নিতে সোনালির আর একটুও কষ্ট পেতে হল না।

সোনালিয়াকে দেখেই চিনি-দিদি খাতির ক'রে কুলতলায় ফাঁকায় নিয়ে বসিয়ে ওদিকে চলে গেলেন। সোনালি শুনতে লাগল বোলতারা সব ফলন্ত গাছকে ঘিরে ঘিরে মোচং বাজিয়ে গাইছে, সোনা-ফলের গান, হুল রাগে।

গান

মন ভুলে গুঞ্জরি—মুঞ্জরি মুঞ্জরি।
বাতাসে গুঞ্জরি, আকাশে মুঞ্জরি।
ফুলে বউল গোছা গোছা,
ফলে মউল গাছে গাছে,
আমরা বলি গুঞ্জরিয়া—
শেষ সবারই আছে আছে।
সবুজে পাতার কলি, সোনালি ফুলের মধু
বঁধু ওগো বঁধু—
ফুলের মঞ্জরি! আমরা গুঞ্জরি।
ফুল ঝরে, ফল ঝরে, কুঁড়ি ঝরে, কলি ঝরে,
মন ঝুরে গুঞ্জরি—মঞ্জরি মঞ্জরি।

শুধু যে বোলতারাই গাইছিল তা নয়; ভোমরা, মৌমাছি, গঙ্গাফড়িং সবাই দলে দলে বাদ্যি আর গান জুড়ে দিলে। চিনি-দিদি গড়ের মাঠের বাদ্যি যত দল, তা ছাড়া কালোয়াতি কীর্তন বাউল সবরকম জোগাড়ই করেছিলেন। কেবল চুনোগলির ব্যাঙটা তিনি জোগাড় করতে পারেননি। আর সেইজন্যে তিনি সবার কাছে বার বার দুঃখু জানাতে লাগলেন। কালো কোট সাদা কামিজে ফিটফাট কাক দরজায় দাঁড়িয়ে মোড়লি করে এর ওর তার আলাপ পরিচয় করে বেড়াচ্ছেন—ইনি রাজহংস, ইনি হংসেশ্বরী, তুরস্কের পেরু, ও পাড়ার চটসাঁই চড়াইমশায় ইনি আমাদের। সোনালি চড়াইকে ধুলোমাখা, কেমন হতভাগা গোছের চেহারায় আসছে দেখে শুধালেন, 'কোনও অসুখ হয়নি তো!' চড়াই সোনালিকে ফুলের টবের ইতিহাস বলতে সোনালি হেসেই অস্থির। সোনালি আর চড়াইয়ে কথা হচ্ছে, এমন সময় আরও পাখি আসতে লাগল। ভিড় দেখে সোনালি চড়াইকে নিয়ে একটা জলের বোমার আড়ালে সরে দাঁড়ালেন। সেই সময় জিম্মা কাছেই একটা ভাঙা ঠেলাগাড়িতে লাফিয়ে বসল, সোনালি তাকে দেখে একবার ঘাড় হেলিয়ে নমস্কার করলেন, দূর থেকেই।

জিম্মার চেহারাটা কেমন রাগি রাগি বোধ হল। ঘোঁটের খবর যেমন শোনা অমনি সে কুঁকড়োকে বিপদ থেকে বাঁচাতে শিকলিটা ছিঁড়ে টানতে টানতে এসে উপস্থিত কুলতলায়। চড়াইকে বোমার পিছনে দেখে জিম্মা রাগে গোঁ গোঁ করতে লাগল। ভয় পেয়ে চড়ায়ের লেজ কাঁপতে লেগেছে, এমন সময় ফড়িংদের স্ট্রিংব্যান্ড শুরু হল, সেই সঙ্গে গঙ্গা মৃত্তিকার অলকা-তিলকা দিয়ে ছাপমারা গঙ্গাফড়িং কীর্তন ধরলেন—তুড়ি রাগিণীতে খোল বাজিয়ে সূর্যের রূপবর্ণনা।—

কনক বরন, কিয়ে দরশন
নিছনি দিয়ে যে তার।
কপালে ললিত চাঁদ শোভিত
সিন্দুর অরুণ আর
আহা কিবা সে মধুর রূপ।

দু'একজন বিলেত ফেরত মোরগ, খোল শুনে দশা পেলেন।

তারপর মৌমাছি গাইতে লাগল দলে দলে 'মধু'র গান—

আলোতে চলি সবাই গুনগুনিয়ে,
আলোতে ফুল ফুটেছে তাই শুনিয়ে,
গুনগুনিয়ে
বাহিরে সোনার আলো,
ভিতরে সোনার রেণু,

বাহিরে বাজল বীণা,
ভিতরে বাজল বেণু,
সকালের আলো আলো গুনগুনিয়ে।

ফুলের সুবাস, সোনার রেণু, পদ্মের মধু রোদ-বাতাস সব যেন একসঙ্গে এসে উপস্থিত হল। মধুকরের দলে চারিদিকে সুরের মধু-বিষ্টি করে দিলে। বাহবা পড়ে গেল। চিনি-দিদি কিন্তু গানও বুঝছেন না, সুরও শুনছেন না। তিনি কেবল কারা কারা তাঁর পার্টিতে এসেছে তারই হিসেব সবাইকে দিচ্ছেন, 'বোঝা থেকে শাকের আঁটিটি পর্যন্ত কেউ আর আসতে বাকি নেই, দেখেছ ভাই?' একটা শ্যামা পাখি পেয়ারা গাছে বসে শিস দিলে, অমনি চিনি-দিদি বললেন, 'ওই শ্যামদাসী এলেন। ওই বুঝি কাছিমুদ্দি? না না কাছিম বুড়ো তো নয়। এ তবে কে। সবাইকে তো চিনি নে ভাই, তেনার সব পুরনো বন্ধু।' একটা ভীমরুল বোঁ বোঁ করে চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল, চিনি-দিদি তার পিছনে 'ভাল আছ? ভাল আছ?' বলতে বলতে ছুটলেন।

চড়াই সোনালিকে বললে, 'চিনি-দিদি একেবারে খেপে গেছেন।' সোনালি মজা দেখবার জন্যে আড়াল থেকে বেরিয়ে দাঁড়ালেন। চিনি-দিদি ভীমরুলের সঙ্গে খানিক ছুটে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে একটু কপি পাতা খাচ্ছেন এমন সময় হাওয়াতে টুপ টাপ করে পাতার শিশিরের সঙ্গে একটি শিউলি ফুল ঝরে পড়ল। চিনি-দিদি অমনি বলে উঠলেন, 'অ শিউলি, অ শিশির, এতক্ষণে বুঝি আসতে হয়?' এই সময় একটু হাওয়া উঠল আর টুপ করে একটি কুল চিনি-দিদির ঠিক নাকের উপরে পড়ে গেল, চিনি-দিদি চমকে উঠে বললেন, 'এই যে বাতাসি-দিদিও এসেছ। তবু ভালো যে মনে পড়েছে।' বলে কতকগুলো গিনিপিগ নিয়ে চিনি-দিদি খাওয়াতে চললেন। 'কে যে চিনি-দিদির চেনা নয়, তা জানি নে।' বলে চড়াই এদিক ওদিক ভালো করে দেখে পা টিপে টিপে বেড়াল যেখানে আতা গাছের ডালে গুঁড়ি মেরে বসে এদিক ওদিক দেখছিল, সেইখানে গিয়ে বললে, 'সব ঠিক তো বন্দোবস্ত?' বেড়াল একবার ওই ওদিকটায় ঘাড় তুলে দেখে বললে, 'সব ঠিক। আসছে তারা।' এদিকে চিনি-দিদি সোনালিকে নতুন বিলিতি কলে-দিয়ে-ফোটানো দুটি মুরগির ছানার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে, এমন সময় দূরে ময়ূর গলা খাঁকানি দিলেন, 'কে ও, চিনি নাকি।' ময়ূর এসে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালেন; মুরগি, হাঁস, তিতির, বটের সব অমনি তাঁকে ঘিরে যেন রথ দেখবার ভিড় করলে। ময়ূর সবাইকে জাঁকালো পোশাক আর হীরে জহরতের ভাউ বাতলাতে লাগলেন, খুব বুদ্ধিমানের মতো গম্ভীর মুখ করে। জিম্মা কুত্তানি কিন্তু ময়ূরকে দেখে মনে মনে বললে, 'এটার মতো দেমাকে অদ্ভুত জানোয়ার আর দুটি দেখা যায় না।' এমন সময় কাক দরজা থেকে ফোকরালেন, 'চাটগাঁই মোরগ।' চিনি-দিদি এ নাম কখনও শোনেননি; বুঝিবা ভুল করেছে কাকটা ভেবে সেদিকে যাবেন, এমন সময় সত্যিই সাদা জোব্বা-খাব্বা, কালো চাপদাড়ি মোড়সা মাথায় চাটগাঁই এসে সেলাম করলেন। চিনি-দিদির মুখে আর কথা সরল না। তারপর কাক একে একে সব অদ্ভুত মোরগের নাম ফোকরাতে থাকল, 'সিংগালি, বোগদাদি, জাপানি।' সবাই বলে উঠল, 'একি ব্যাপার।' চিনি-দিদি বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখলেন দলে দলে অদ্ভুত মোরগ সব আরও আসছে, 'সেলেম সাহি, খাঁ খানানি, তখ্‌তে তাউস, কান্দাহারি, কাবুলি, জবরদস্ত ঝোঁটনদার, চম্পাধাড়ি, কুলঝুটি, খুঞ্চেপোষ, ডেগচি, মোগলাই, জবরজঙ্গ, ইয়াহুদ্দি, চাল বাহাদুর, খেতাববক্স, মেজাজি, পরদুম্বা, মুলুকুচাঁদি, বাজখাঁই, শির-ই-ফরহাদ, গোলগুম্বজ, কাবাবি।'

চিনি-দিদি দেখে শুনে অবাক, কেবল লেজ দোলাচ্ছেন আর বলছেন, 'ওমা কোথায় যাব। ওলো দেখো, কী হবে গো, এমন তো কখনও দেখিনি।'

নবাবী আমলের মোরগ সব একে একে এলেন। এবার পাটনাই মোরগ সব আসছেন, 'তিলকধারী ভোজপুরি, রামদুলালী।'

'ওমা কোথায় যাব।' বলে চিনি-দিদি সবাইকে খাতির করতে ছুটলেন।

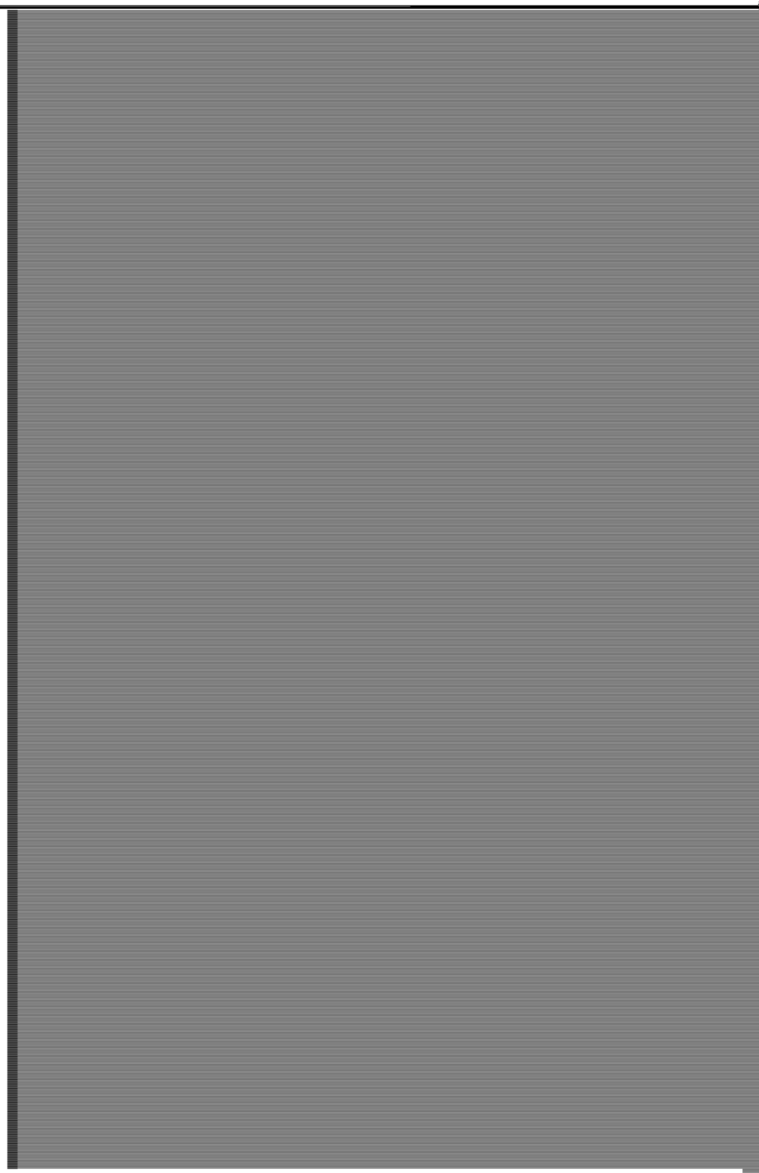
এবার গৌড়িয়া মোরগ সব আসছেন, 'গোবরগণেশ, চালপিটুলি, মোহনভোগ, বামুনমারি, কানাইচুড়ো, চৌগোপলা, ঢেঁকুচকুচ, ঢাক-পিটুনে, ফিকরে গোঁসাই, বেঁটেবঙ্কট, কয়লাধামা রাজকুমড়ো, থুতি নাতি।'

কুলতলাটা ঝুঁটিতে, পালকে, চাপদাড়ি, গোঁপ, টিকি আর পোষা-পালা বড়ো বড়ো খেতাব-জায়গীর-শিরপেঁচওয়ালা মোরগের ভিড়ে সরগরম হয়ে উঠল, যেন পালকের গদি। কারু লেজের পালক, মেপে সাতগজ। কারু গলায় যেন উলের গলাবন্ধ জড়ানো রয়েছে। একজনের ঝুঁটির কেতা যেন রামছাগলের শিং। কারু মাথায় জরির তাজ, কারু একচোখে চশমা, অন্য চোখটা টুপিতে ঢাকা; কারু বুকে ফুলের তোড়ার মতো খানিক পালক,

কারু আঙুল দস্তানায় মোড়া, কারুবা আঙুল এত লম্বা যে কিছুই ধরতে পারে না। কেউ ঝাঁকড়া চুলের উপরে আবার টিকি রেখেছে, আর কারুবা মাথায় চুলও নেই, টিকিও নেই, কিছুই নেই। ঘাড়ে গর্দানে সমান এই শেষের মোরগটা হচ্ছে সেই নামজাদা লড়ায়ে মোরগ, যে বিলেত পর্যন্ত মেরে এসেছে। এরই দুপায়ে ইস্পাতের কাঁটা মারা ভয়ংকর দুটো কাতান মানুষ শখ করে বেঁধে দিয়েছে, অন্য মোরগকে লড়ায়ে খুন করে বাজি জেতবার আর মজা দেখবার জন্যে। ঘোড়দৌড়ের খেলায় যেমন, তেমনই এই মোরগের লড়াই দেখতে আর বাজি লাগাতে লোকে টিকিট পায় না, এত ভিড় হয়।

বেড়াল চড়াইকে গাছের উপর থেকে এই মোরগটাকে দেখিয়ে বললে, 'এই সেই বাজখাঁই গুণ্ডা বা লড়ায়ে মোরগ বা নবাব বাজেখাঁর বাবুর্চিখানার শেষ পোষা পাখি। পুরুষানুক্রমে এদের ঘাড় এমন শক্ত যে মোটেই নোয় না, ইনি খালি দিল্লির লাড্ডু খেয়ে লড়েন।'

এইবার সব বিলেত-ফেরতা মোরগ এলেন, 'মিস্টার চচ্চড়ি, মিঃ ভাজি, মিঃ ঘণ্ট, আবার খাব, মিঃ চাপাটি, মিঃ বে-হোঁস।' চিনি-দিদি ভাবছেন এইসব মোরগের মুরগিদের নিয়ে আসছে বারে তিনি একটা পর্দাপার্টি দেবেন। দাঁড়কাক তখনও হাঁপাতে হাঁপাতে ফুকরোচ্ছে, 'রামধনুস, রঙবেরঙ, বুঁদেলা মল, রণছোড় ভাগি, ধান ভগতজিউ...' যত মাড়োয়ার দেশের মোরগ, সিন্দি কচ্ছি, আবোদা-ববোদা সবাই এলে পর দাঁড়কাক মুখ ফিরিয়ে দেখলে—



কোনও বিপদে পড়বে কি না সেটা মনে মনে বিচার করতে লাগল। ঠিক এই সময় দূর থেকে চিড়িয়াখানার মালিক ডাক দিলেন, 'আয়—আঃ—আয় আঃ!' অমনি সব পোশাকি মোরগ সেই দিকে দৌড় দিলে।

চিনি-দিদি বললেন, 'চললে নাকি। চললে নাকি।' বলে তাদের সঙ্গে ছুটলেন।

সোনালি কুঁকড়োকে বললে, 'আর কেন? চলো এইবার।' বলে কুঁকড়োকে নিয়ে বনের দিকে আস্তে আস্তে চলে গেল। জিম্মা ফ্যাল ফ্যাল করে সেইদিকে খানিক চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে গোলাবাড়িতে ফিরে গেল মাথা নাড়তে নাড়তে।

চিনি-দিদি ফিরে দেখলেন সবাই চলে গেছে। তিনি তবু যেন সবাইকে খাতির করে বেড়াতে লাগলেন আর কেবলই বলতে লাগলেন, 'আসছে সোমবারে আসবে তোঃ নমস্কার। মনে থাকে যেন আসছে সোমবার।'

খালি উঠোনময় চিনি-দিদি ঘুরে বেড়াচ্ছেন এইভাবে, এমন সময় কাক ফুকরোলে, 'কাছিম মিয়া, কাছিম মিয়া'...। চিনি-দিদি তার ছেলেকে বলছিলেন, 'আঃ, আজ মজলিস কেমন জমেছিল দেখিছিস!' গুটিগুটি কাছিম এসে কুলতলায় বসলেন।

৭

বনে বসন্তকাল এসেছে। চমৎকার দিনগুলি—আলোছায়ায় নিবিড় বনের সবুজে ঢাকা পথে পথে, আর নিস্তব্ধ রাতগুলি—রাঙা ফুলে ঢাকা অশোক গাছের দোলনায়, কুঁকড়ো আর সোনালিয়া দুটিতে আনন্দে কাটাচ্ছেন। এমন সবুজ, এমন ঠাণ্ডা ছায়ায় ছায়াময় সে বন, যেন মনে হয় মায়ের কোলে এসেছি। সেইখানে কুঁকড়ো আস্তে আস্তে সব কষ্ট ভুলতে লাগলেন। সকাল থেকে সন্ধে তিনি বেড়িয়ে বেড়ান, একলাটি। চারিদিকে বড়ো বড়ো দেবদারু আর ঝাউ, এত পুরনো যে তাদের বয়স কেউ জানে না। ডালে ডালে সব সবুজ শেওলা জটার মতো ঝুলে পড়েছে; শিকড়গুলো তাদের পাথর আঁকড়ে কোন্ পাতালে যে নেমে গেছে তার ঠিক নেই। কোথাও ঝুরঝুর করে পাতা ঝরছে, কোথাও ঝাউ ফলগুলোয় মাটি একেবারে বিছিয়ে গেছে। একটা নালার ধারে ঝরনা ঝরছে, তারই একপাশে ব্যাঙেরা ছতরি বেঁধে হাট বসিয়েছে।

কত রকমের পাখি গাছে গাছে। কাঠবেড়ালি সব বাদাম গাছের ডালে ডালে লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে; খরগোশ ঘাসের মধ্যে লুকোচুরি আর কপাটি খেলছে। বনে এসেই খরগোশগুলোর সঙ্গে কুঁকড়োর ভাব হয়ে গেল; কিন্তু তারা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে, সোনালিয়া সেটা সইতে পারে না; এক একদিন কুঁকড়োর আড়ালে ডানার ঝাপটা দিয়ে তাদের ভয় দেখাতে ছাড়ে না।

একটা কাঠঠোকরার সঙ্গে কুঁকড়োর খুব জমে গেল। অশোক গাছটার পাশেই একটা কাঁঠাল গাছে তার কোটর। দিনের মধ্যে দশবার সে কুঁকড়োর সঙ্গে গল্প করতে এসে হাজির হয়। সোনালিয়া কিন্তু এটা ভারি অপছন্দ করে; সময় নেই, অসময় নেই, এলেই হল? শেষে কাঠঠোকরার সঙ্গে বন্দোবস্ত হল, আসবার আগে সে তিনবার ঠুকঠুক আওয়াজ দিয়ে তবে আসবে।

কিন্তু কাঠঠোকরার গল্প শুনতে কুঁকড়ো সত্যি ভালবাসেন; সে যে কত কালের সব পাখিদের কথা জানে, তার ঠিক নেই।

একদিন সন্ধেবেলা কাঠঠোকরা কুঁকড়োকে সন্ধ্যা পাখির গান শোনালে। সে অতি চমৎকার। দুটি টুনটুনি সুর ধরলে আর বনের সব পাখি তাদের গানে আস্তে আস্তে যোগ দিলে। প্রথম পাখিটি গাইলে, 'ও আমাদের বন্ধু!' জুড়ি-টুনটুনি অমনই ধরলে, 'ও অনাথের নাথ!' হাজার হাজার পাখির মিষ্টি সুর অমনি গাছে গাছে সাড়া দিলে, 'ওগো বন্ধু। ওগো বন্ধু।' তারপরে বন্দনা শুরু হল—

'নমস্কার নমস্কার! আকাশে নমস্কার, আলোতে নমস্কার, আভাতে নমস্কার, বাতাসে নমস্কার, রাতে নমস্কার, দিনে নমস্কার—তোমাকে নমস্কার। তোমার দেওয়া চোখের আলো, তোমার দেওয়া মিষ্টি জল, তোমার এই ঘন বন, তোমার এই মধু ফল, তোমার এই কাঁটার বেড়া, তোমার এই সবুজ ঘাস। মিষ্টি সুর এও তোমার, তোমার এ নিশ্বাস। তোমার এই পাতার বাসা, তোমার এই ছোটো পাখি। আমার এই ছোটো সুরে তোমারেই আমি ডাকি।...ছোটো বাসার ছোটো পাখি—সন্ধ্যা হল তোমায় ডাকি, দিনের শেষে তোমায় ডাকি, বন্ধু এসো, তোমায় ডাকি।'

এ পাখি থেকে ও পাখি, এ গাছ থেকে ও গাছ, এমনি করে বনের শেষ পর্যন্ত 'বন্ধু এসো' বলে সবাই ডাক দিয়ে গেয়ে উঠল। কুঁকড়োও ডাক দিলেন, 'বন্ধু বন্ধু!' তারপর একটি একটি করে সব ছোটো পাখিরা পাতার

আড়ালে ঘুমিয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে চাঁদের আলো বনের ফাঁক দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ঝরনার মতো নেমে এল—লতাপাতার কিনারায়, পাথরের উপর, শেওলার গায়ে। কুঁকড়ো দেখলেন, একটুখানি মাকড়সার জালে হীরের মতো কী ঝলক দিচ্ছে। মনে হল, বুঝি একটা জোনাক পোকা জালে পড়েছে। কাছে গিয়ে দেখেন, বৃষ্টির একটি ফোঁটায় চাঁদের আলো এসে লেগেছে। এমনই সব নূতন নূতন কত কী দেখতে দেখতে সেই মহাবনে কুঁকড়োর দিন আর রাতগুলি আনন্দে কাটছে।

বনে ফিরে এসে কুঁকড়ো আবার তাঁর গান ফিরে পেয়েছেন। কিন্তু কেবল সকালের গানটি ছাড়া সোনালি তাঁকে আর একটি গানও গাইতে দেবে না—তাও আবার সকালটা যদি সোনালির গায়ের পালকের চেয়েও রঙিন আর জমকালো হয়ে দেখা দেয় তবেই। কুঁকড়ো সোনালিকে বলেন, 'এই আলোতেই আমাদের সেদিনের মিলন, সেটা ভুললে চলবে না সোনালি। আলোর জয় আমাকে দিতেই হবে সারাদিন।' সোনালি বলে, 'তুমি আমার চেয়ে আলোকে কেন ভালোবাসবে।'

ইতিমধ্যে একদিন চকচকে সবুজ এক সোনাল পাখির সঙ্গে সোনালির দেখাশুনো হয়েছে, আর গহন বনের একটা নির্জন পথে দু'টিতে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে এটা কুঁকড়োর চোখ এড়াল না। কিন্তু মনের দুঃখ মনেই রেখে কুঁকড়ো ভাবলেন, 'আমি কি বলতে পারি, কেন তুমি সোনালকে বেশি পছন্দ করবে আমার চেয়ে সোনালি? আকাশ কি কোনওদিন তাতে-পোড়া পৃথিবীকে বলতে পারে—তুমি বৃষ্টির ফোঁটাগুলিকে রোদের চেয়ে কেন ভালোবাসবে? না, মাটিই বলতে পারে আকাশকে—তুমি বৃষ্টিকেই বরণ করো, আলোকে চেয়ো না! সোনালিয়া, সে বনের দুলালী, অরণ্য তো তাকে আমার সঙ্গে বাইরে—দূরে পাঠাতে পারবে না; সে দূত পাঠিয়েছে ঘন বনের সবুজ সোনাল পাখিটি; ওরই সঙ্গে কোনদিন চলে যাবে ঝরাফুল ঝরাপাতার স্বপ্ন বিছানো গহন বনের অন্দরের পথে সোনার আঁচলে ঝিলিক দিয়ে সোনার পাখি। আর আমি'—বলে কুঁকড়ো নিশ্বাস ফেললেন।—'কাঠঠোকরা ঠিকই বলে, 'যেখানে যার বাসা, সেইখানেই তার ভালোবাসা।' আমার সবই সেই পাহাড়তলির আকাশের নিচে—আর সোনালির সবই এই বনের তলায় যেদিন দেখা দেবে, সেদিন তো কেউ কাউকে 'যেয়ো না' বলে রাখতে পারব না; কেবল এইটুকুই সেদিন বলবার থাকবে—ভুলো না বন্ধু, মনে রেখো।'

সে আর একদিন; দু'জনে অশোক তলাটিতে দাঁড়িয়ে; সূর্য অস্ত গেছে; সন্ধ্যার পাখিদের গান বন্ধ হয়েছে; দু'একটা কাঠবেড়াল তখনও পাতার মধ্যে উসখুস করছে; খরগোশগুলো তাদের গড়ের বাইরে বসে একটু সন্ধের বাতাসে জিরিয়ে নিচ্ছে; বন আস্তে আস্তে নিঝুম হয়ে আসছে। রাত্রির অন্ধকারে গাছ সব ক্রমে যেন মিলিয়ে গেল; সেই সময় ক্রমে ক্রমে চাঁদের আলো ঘুমন্ত বনে এসে পড়ল। সে রাতের মতো বিদায় নেবার জন্যে সোনালি কুঁকড়োকে 'আসি' বলতে গিয়েই দেখলে খরগোশগুলো চোখ প্যাঁটপ্যাঁট করে তাদের দিকে দেখছে। অমনি এক ডানার ঝাপটায় সোনালি তাদের তাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'আসি তবে।' কুঁকড়ো বললেন, 'দেখো, মনে রেখো।' সোনালি বিদায় নিয়ে অশোক ফুলের গাছে তার মনোমতো ডালটির উপরে উড়ে বসতে ফিরে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় পায়ে তার কী একটা ঠেকল। 'ইস' বলে সোনালি সরে দাঁড়িয়ে দেখলে কী, সে তো কিছু বুঝতে পারলে না। কুঁকড়ো কাছে এসে দেখে বললেন, 'সর্বনাশ, এ যে ফাঁদ পাতা রয়েছে। কে এখানে ফাঁদ পাতলে?' টুক টুক টুক তিনবার আওয়াজ দিয়ে সবুজ ফতুয়া লাল টুপিটি মাথায় কাঠঠোকরা কোটর থেকে বেরিয়ে বললেন, 'ফাঁদটা বাঁচিয়ে চোলো, ওই গোলাবাড়ির মানুষটিই ফাঁদ পেতেছে, সোনালিয়াকে ধরবে বলে।' 'আমাকে ধরা তার কর্ম নয়।'—বলে সোনালি মাথা ঝাড়া দিলে। কাঠঠোকরা বলল, 'শুনলুম সে তোমাকে ধরে পোষ মানাবে।' কুঁকড়ো বললেন, 'তিনি খুব ভালো লোক, যদি তুমি ধরা পড়তে, তবে তোমাকে তিনি কষ্ট দিতেন না, এটা আমি ঠিক বলতে পারি।' সোনালি বললে, 'কষ্ট না দিন, কিন্তু প্রাণ থাকতে সোনালি তার পোষ মানত না, সেটাও ঠিক।'

ফাঁদ পাতা হলে বনের সবাই সবাইকে সাবধান না করে নিশ্চিন্ত হতে পারে না, তাই খরগোশ এসে বললে, 'দেখো, খবরদার ওই কলটাতে যেন পা দিয়ো না; ছুঁয়েছ কি।—'

'বোকো না তুমি। ফাঁদে যে আটকায় কেমন করে তা আমি খুব জানি। এক কুকুর ছাড়া আর কাউকে আমি ডরাই নে। ঘরে যাও, ঠাণ্ডা লাগবে।'—বলে সোনালি আস্তে ডানার ঝাপটা দিয়ে খরগোশকে বিদায় ক'রে কুঁকড়োকে বললে, 'আমি একবার গোলাবাড়ির দিকে যাচ্ছি।'

কুঁকড়ো ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'কেন। কেন। সেখানে কেন।' 'ও দিককার কুকুরগুলোকে একটু দৌড় করিয়ে আসি। এই এক পা এখানে, এক পা ওখানে, যাব আর আসব, দেরি হবে না।'

সোনালি চলে গেল, কুঁকড়ো অনেকক্ষণ সেদিকে চেয়ে থেকে, গাছের উপর কাঠঠোকরাকে শুধালেন, 'সোনালিকে দেখতে পাচ্ছ কি।' কাঠঠোকরা উঁচ ডাল থেকে গলা বাড়িয়ে দেখে বললেন, 'না, তিনি গেছেন।' কুঁকড়ো বললেন, 'তুমি ভাই, একটু নজর রেখো তো, সে আসছে কি না। আমি একবার গোলাবাড়ির চড়াইটার সঙ্গে কথা কয়ে নিই।'

কাঠঠোকরা আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল, 'চড়াই না তোমার শত্রু?'

কুঁকড়ো বললেন, 'কিন্তু খবর দিতে আর তার মতো দুটি নেই। খবর যা চাও, তার কাছে পাবে।'

'চড়াই আসছেন নাকি।' কাঠঠোকরা শুধোলে।

কুঁকড়ো বললেন, 'না। এই দেখো না তাকে ফোঁ করি। এই যে নীল ধুঁতরো ফুলটা দেখছ, এর সঙ্গে মাটির মধ্যে দিয়ে তারের মতো সরু শিকড় দিয়ে গোলাবাড়ির পুকুরধারে শ্বেত ধুঁতরো ফুলের যোগ আছে। ফুলের ভাষা বলে কবিতার বইয়ে পড়েছ তো। একেই বলে ফুলে-ফুলে কানাকানি।'

বনের মধ্যে যে এমন কল আছে কাঠঠোকরা তা জানত না। ফোঁ কেমন, দেখতে সে ব্যস্ত হল। কুঁকড়ো ফুলের মধ্যে মুখ দিয়ে ডাকলেন, 'হ্যালো।' খানিক ঘর-ঘর শব্দ হল।—' হ্যালো চড়াই। গোলাবাড়ি।' কাঠঠোকরা বলে উঠল, 'কুঁকড়ো ভাই, তোমার তো সাহস কম নয়। বাসার একেবারে দরজায় দাঁড়িয়ে কথা-চালাচালি। সোনালি টের পেলে—।'

কুঁকড়ো বললেন, 'সেখান থেকে যখন কথা আসবে তখন এই ফুলের মধ্যে যে মৌমাছিটা আছে, সে জেগে উঠবে আর—।'

'বোঁ-ও-ও' শব্দ হল। অমনি কুঁকড়ো ফুলে কান দিয়ে 'চড়াই নাকি' বলে খানিক আবার শুনে বললেন, 'ওঃ তাই নাকি। আজ সকালে—।'

কাঠঠোকরা শুধোলে, 'কী বলছে? কী?'

কুঁকড়ো বললেন, 'দুকুড়ি দশটা মুরগির বাচ্ছা ফুটেছে?' তারপর আবার একটু শুনে বললেন, 'বলো কি। তম্মার ভারি ব্যায়রাম!'

কি একটা গোল বাধল। কুঁকড়ো বললেন, 'রোসো, রোসো। কী। ভালো শোনা যাচ্ছে না হে। আঃ, মশাগুলো জ্বালালে। চড়াই, আঃ, হাঁ হাঁ তারপর, জিম্মাকে নিয়ে তারা শিকারে বেরোবে। বল কি হে।' 'জিম্মা গোলাবাড়ির একজন।'—কাঠঠোকরাকে এই বলে কুঁকড়ো আবার ফোঁ ধরলেন, 'কি বললে? আমি চলে আসবার পর থেকে সব কাজে গোলমাল চলেছে? এ তো জানা কথা...এই সেদিন এসেছি এরই মধ্যে...যেতে হবে...তাই তো কি করা যায় হে...যাব নাকি। কী বলো।' কাঠঠোকরা চুপিচুপি বললেন, 'সোনালি আসছেন।' কিন্তু কুঁকড়ো তখন মন দিয়ে কানে ফুলটা চেপে ধরেছেন, কাঠঠোকরার কথা তাঁর কানেই গেল না। কথা চলল, 'কি বললে? হাঁসগুলো সারারাত লাঙলটার তলায় ঘুমিয়েছে? বল কি!' কাঠঠোকরা কুঁকড়োকে বলছে, 'থাক, দেখো, চুপ।' কিন্তু কিছু ফল হচ্ছে না। ওদিকে সোনালি এসে উপস্থিত। কাঠঠোকরাকে ইশারায় চুপ করতে বলে সোনালি কুঁকড়োর পিছনে লুকিয়ে দাঁড়াল।

ফোনে কুঁকড়ো বললেন, 'বল কি, সব কজনেই? ওঃ ময়ূরটা তা হলে মাটি হয়েছে বলো।'

কাঠঠোকরা আবার মুখ বার করতেই সোনালি তার দিকে এমনি চোখ রাঙিয়ে উঠল যে সে তাড়াতাড়ি কোটরে যেমন সেঁধোবে, অমনি দরজায় মাথা ঠুকে ফেললে। কুঁকড়ো ফোনে বললেন, 'মুরগিরা সব...আঃ, ভালো আছে শুনে খুশি হলেম...গান? ওঃ গান করি বৈকি। হাঁ রোজ। কিন্তু এখান থেকে একটু দূরে...ওই যে দিঘিটা আছে, তারই ধারে। হাঁ, নিত্যি নিত্যি, ঠিক আগেরই মতো।'

রাগে সোনালি লাল হয়ে উঠল; তাকে লুকিয়ে গান গাওয়া হয়। এত বারণ করলুম...।

কুঁকড়োর কথা চলল, 'সোনালি গাইতে মানা করে, তাই লুকিয়ে আমি আলো আনছি আজকাল।' সোনালি এক পা কুঁকড়োর দিকে এগিয়ে শুনলে, কুঁকড়ো বলছেন, 'যখন সোনালির কালো চোখদুটি ঘুমে ঢলে পড়ে, যখন তার সোনার দেহটি আলিসে লুটিয়ে চমৎকার দেখতে হয়', সোনালির মুখে এবার হাসি ফুটল। '...সেই সময় আমি পা টিপে টিপে শিশিরের উপর দিয়ে দূরে গিয়ে, আলোর জন্যে যে ক'টি গান সব ক'টি গেয়ে, যেমনি দেখি অন্ধকার ফিকে হচ্ছে, অমনি আস্তে আস্তে বাসায় ফিরি।...কী বলছ? শিশিরে পা ভিজে দেখে সে সন্দেহ করবে? তাই যদি হবে, তবে ডানার পালকগুলো আছে কী করতে। পা দুটো মুছে নিতে কতক্ষণ।

তারপর আস্তে আস্তে অশোকের ডালে বসে যে গান সে গাইতে মানা করেনি, সেইটে গেয়ে তার ঘুম ভাঙাই।'

সোনালি আর রাগ সামলাতে না পেরে ফোঁস করে উঠল। কুঁকড়ো ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখেই চটপট ফোনে বললেন, 'নাঃ কিছু না, আর একদিন হবে এখন।'

সোনালি বললে, 'আমাকে ঠকালে কেন।'

ফোনটা শব্দ করলে, 'ফুর্-র।'

কুঁকড়ো বললেন, 'আমি তোমাকে—'

'ফুর্-র', আবার ফুলের মধ্যে মাছিটা ডাকলে। কুঁকড়ো ফুলটার উপর ডানা চেপে দিলেন, কিন্তু সেটা ক্রমাগত 'ফুর্-র-র-র-র-র' বলেই চলল।

সোনালি খুব রেগে বললেন, 'কি নির্দয় তুমি ঠগ।...কেন শুধাচ্ছ। তুমি মুরগিদের খবর নিতে এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলে না? কে কোথায় ঘুমোয়, কে কি খায়, কার ক'টি ছানা হল? গোলবাড়ির বাইরেও যে ডালকুত্তাটা তার পর্যন্ত খবর নেওয়া হচ্ছে। এও না হয় সইলুম কিন্তু ভোরবেলায় ডানায় পা মুছে চুপি চুপি...ওঃ বুঝেছি, তুমি একলা এই সোনার পাখিটাকেই ভালোবাস, কেমন?'

কুঁকড়ো খানিক চুপ থেকে বললেন, 'সোনালি, ভেবে দেখো, এই হৃদয়ের মধ্যে আলোটি যদি না দেখতে পেতে তবে কি এখানে আসতে তোমার ইচ্ছে হত। হৃদয়ের মধ্যে কিছু না থাকার চেয়ে আলো থাকা কি ভালো নয়। রঙিন আলো দিয়ে গড়া সোনালিয়া। আমি আলোকে ভালবাসি তাই তোমাকেও ভালোবাসতে পেরেছি, আলোর দিকে হৃদয় পেতে যদি প্রতিদিন না দাঁড়াতেম, তবে ভালোবাসার ফোয়ারা যে এতদিনে শুকিয়ে যেত সে কি জানো না।'

কুঁকড়োর কথায় সোনালির অভিমান বাড়ল বই কমল না। সে ঝগড়া করতে লাগল। কান্নাকাটি করে পাড়া জাগিয়ে তোলবার জোগাড় করলে। কুঁকড়োও একটু যে চটেননি তা নয়। শেষ সোনালি বললে, 'আচ্ছা আমার যদি মান রাখতে চাও, তবে কাল সকালে একেবারে গাইবে না বলো।'

কুঁকড়ো বললেন, 'এ কী কথা। সমস্ত পাহাড়তলিটা যে অন্ধকার হয়ে থাকবে।' সোনালি ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, 'না হয় থাকলই। তোমারই বা কী, আমারই বা কী।' কুঁকড়ো ঘাড় নাড়লেন, 'তা হতে পারে না। একদিন আলো বন্ধ! সব যে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাকে গাইতেই হবে।'

সোনালি বললে, 'আচ্ছা, যদি প্রমাণ করে দিই, তুমি থাকলেও সকাল হতে কিছু বাধল না, তখন?'

কুঁকড়ো একটু হেসে বললেন, 'তখন সোনালি আমি সেখান থেকে তোমার সঙ্গে ঝগড়াও করতে আসব না, আর আলো হল কি না হল সে খবরও জানতে খুব উৎসাহ করব না। কেননা যেদিন আমি ছাড়া হয়ে আলো উঠবে, সেদিন আমি তো আর কুঁকড়ো নেই, আমি যে আলোর আলোয় গিয়ে মিশেছি।'

সোনালির চোখে জল ভরে উঠলে সে কেঁদে বললে, 'একটি দিন আমার কথা রাখো।'

কুঁকড়ো ঘাড় নাড়লেন, 'না, হতে পারে না।'

সোনালি বললে, 'ভুলেও কি একদিন আমার কথা রাখতে নেই গা।'

কুঁকড়ো বললেন, 'ভুল হবার জোটি নেই। অমনি অন্ধকার বুকে চেপে বলে, ডাক আলোকে।'

সোনালি বলে উঠল, 'অন্ধকার ওঁর বুকে চেপে ধরে? সব বাজে কথা। বলো না বাপু গান গাও—সবাই তোমার তারিফ করবে বলে। গানের তো ওই ছিরি, এর জন্যে মিছে কথা কেন বাপু। তোমার গান শুনে তো বনের সবাই মোহিত হল। এখানকার বাবুই পাখি, সেও তোমার চেয়ে গায় ভালো।'

কুঁকড়ো বললেন, 'হতে পারে বাবুই গায় চমৎকার, কিন্তু সেইজন্যে অভিমানে আমি গাওয়া বন্ধ করব, তেমন কুঁকড়ো আমায় ভাবলে নাকি।' সোনালি রেগেই বলে চলল, 'যেখানে নিচের বনে রোদের বেলা বসন্ত বাউরির গানটি মিনতি জানায়, আর উপরের বনে সা-বুলবুল গানের ফোয়ারা খুলে দেয়, সেই বনের মধ্যে কুঁকড়োর ডাক কেউ শুনতে চাইবে, এটা পাগল ছাড়া আর কেউ বিশ্বাস করতে পারে না।'

কুঁকড়ো কোনও কথা না কয়ে তফাতে সরে দাঁড়ালেন। সোনালি তবু বললে, 'শুনেছ কোনওদিন নিশুত রাতের স্বপনপাখির গান?' 'শুনিনি।' বলে কুঁকড়ো অশোকের ডালে উঠে বসলেন। সোনালি নিজে নিজেই বলে যেতে লাগল, 'স্বপনপাখির গান, সে এমন আশ্চর্য ব্যাপার যে প্রথমবার শুনতে শুনতে'...হঠাৎ সোনালির কী একটা বুদ্ধি মাথায় জোগাল; সে চুপ হয়ে ভাবতে লাগল।

কুঁকড়ো শুধোলেন, 'কী বলছিলে?' সোনালি চেঁচিয়ে বললে, 'নাঃ, কিছু নয়।' আর মনে মনে হেসে বললে, 'এইবার ঠিক হবে। উনি তো জানেন না যে স্বপনপাখির গান শুনতে শুনতে রাত কখন যে ভোর হয়ে যায়, কেউ বুঝতে পারে না।'

কুঁকড়ো গাছের উপর থেকে নেমে এসে সোনালিকে বললেন, 'কি বলছিলে।'

'কিছু না।' বলে সোনালি মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল।

৮

ঘাসের মধ্যে থেকে ব্যাঙ আওয়াজ দিলে, 'কর্তা, ঘরে আছেন? কর্তা।' সোনালি 'ও মাগো ব্যাঙ।' বলে একলাফে একটা গাছের কোটরে গিয়ে লুকোল। ছ' ছ'টা কোলাব্যাঙ এসে উপস্থিত। তার মধ্যে সব চেয়ে বড়ো ব্যাঙ এসে হাত নেড়ে কুঁকড়োকে বললে, 'বনে চিন্তাশীল যাঁরা, তাঁদের হয়ে আমরা এসেছি ধন্যবাদ জানাতে গানের ওস্তাদ আপনাকে...ওর নাম কি, অনেক গানের আবিষ্কর্তাকে', আর একজন থপ করে বললে, 'জলের মতো সহজ গানের', অমনি তৃতীয় ব্যাঙ থপ থপ করে বললে, 'যত সব ছোটো গানের', অমনই অন্যে বললে, 'মজার গানের।'

পঞ্চম, ষষ্ঠ, তারাও থপ থপ ছপ ছপ করে এগিয়ে এসে বললে, 'সব বড়ো বড়ো গানের সব পবিত্র গানের।'

ব্যাঙেদের কুঁকড়োর মোটেই ভালো লাগছিল না, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে তিনি তাদের বসতে বললেন। একটা মস্তো ব্যাঙের ছাতা টেবিলের মতো পাতা রয়েছে, তারই চারিদিকে সবাই বসলেন। সদালাপ চলল। ব্যাঙ বিনয় করে বললেন, তাঁরা কিছুই নয়, অতি হীন। কুঁকড়ো বললেন, 'কিন্তু বড়ো বড়ো চোখ দেখলেই বোঝা যায় তাঁরা খুবই বুদ্ধিজীবী।' কোলাব্যাঙ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'আমরা বনের মধ্যে একচ্ছত্রী সবাই, মোরগদের মধ্যে একমাত্র কুঁকড়োকে একদিন ভোজ দিতে মনস্থ করেছি। আপনার গান পৃথিবীকে আলোকিত, পুলকিত, চমকিত, সচকিত করেছে।' এক ব্যাঙ বললে, 'সত্য আপনার গান...।' অন্য ব্যাঙ আকাশে চোখ তুলে বললে, 'স্বর্গীয়।' 'অথচ এই পৃথিবীরই।'—অন্য ব্যাঙ মাটিতে চোখ নামিয়ে বলে উঠল। সোনাব্যাঙ বললে, 'স্বপনপাখির গান, সে কী তুচ্ছ আপনার গানের কাছে।'

কুঁকড়ো বলে উঠলেন, 'কি বললে। স্বপনপাখির গান...তুচ্ছ?....একি সত্যি? না, তোমরা নিশ্চয় বাড়িয়ে বলছ।' কোলাব্যাঙ গম্ভীর স্বরে বললে, 'স্বপনপাখির স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে, সত্যিকার গানে বনকে মাতিয়ে তুলে দেয়, এমন একজনের বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে। একটু অদল বদল না হলে আর পেরে ওঠা যাচ্ছে না।'

কুঁকড়ো দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'সে কাজটা যদি আমার দ্বারা সম্ভব হয়, তবে আমি রাজি আছি।' সব ব্যাঙ ডেকে উঠল, একসঙ্গে কুঁকড়োর জয় দিয়ে, 'কুঁক-ড়ো পাহাড়-ত-লির কুঁকড়ো-পা-হাড়—ত-লির।'

সোনাব্যাঙ গলা ভারি করে বললে, 'এইবার স্বপনের দফারফা হল।' কুঁকড়ো শুধালেন, 'দফারফা কি রকম।' কিন্তু কে তাঁর কথা শোনে। গলা ফুলিয়ে গান ধরলে সব ব্যাঙ-কটা করতাল বাজিয়ে—

মেঘ হাঁকে, 'গড় কর, গড় কর, গড় কর।'
বৃষ্টি বলে, 'টুপ টাপ, চুপ চাপ, ঝুপ ঝাপ।'
শিল বলে, 'তড় বড়, গড় কর, গড় কর।'
বাদল ঝরে গড় করি,
জলে ভাসে মাঠ, ঘাট আর বাট,
এল বাতাস এলোমেলো,
লাফ দিয়ে ঝড় এল
ঘাড় ধরে বলে গেল, 'কর গড় কর'...।

কোলাব্যাঙ ধুয়ো ধরলেন, 'কে তারে গড় করে। কে কারে গড় করে।' সোনাব্যাঙ চিতেন গাইলেন, 'বাতাস তারে গড় করে, সবাই তারে গড় করে।' ফেরতা গাইলে সব ব্যাঙ, 'গড় কর, গড় কর। কর কর গড় কর। গড় কর, গড় কর।' কুঁকড়ো ব্যাঙেদের শুধোলেন, 'স্বপনপাখির গান কেমন।'

ব্যাঙরা বললে, 'আমরা কেউ থাকি পাথর চাপা, কেউ থাকি কুয়োর তলায়, আমাদের কানে কেমন করে

সে গান আসবে। তবে স্বপন আমরা দেখি বটে, শীতের ক'মাস চব্বিশ ঘণ্টাই। গেছোব্যাঙকে শোধালে হয়, সে স্বপন আর পাখি দুই দেখেছে।'

কুঁকড়ো গেছোব্যাঙকে শুধালেন স্বপনপাখির গানের কথা।

গেছো তার কটকটে আওয়াজে পাখির গানের নকল দেখিয়ে দিলে, 'দম ফাট্ দম ফাট্। দুয়ো দুয়ো দুয়ো দুয়ো...।' নকলটা মোটেই আসলের মতো হল না, কিন্তু কুঁকড়ো ভাবলেন সত্যিই স্বপনপাখি এমনই গায়, তিনি ব্যাঙদের বললেন, 'আহা বেচারা পাখি যদি এই গান গেয়েই খুশি থাকে তো থাক না। তার উপর উৎপাত করে কী হবে। মশা মারতে কামান পাতবার কী দরকার।'

ব্যাঙরা বললে, 'না মশয়, আপনার গান যেদিন শুনেছি, সেইদিনই বুঝেছি, কি বিশ্রী স্বপনপাখিটার গান। আপনার সুর শুনলে আমাদের যেন ডানা গজিয়ে উঠে উড়তে ইচ্ছে হয়। আর তার গান, ছোঃ।' বলে সব ব্যাঙগুলো হাঁচতে লাগল। তাঁর গান শুনে ব্যাঙরা ডানা গজিয়ে সব উড়ে চলেছে এ ছবিটা মনে করে কুঁকড়ো বেশ একটু আমোদ পেলেন। ব্যাঙরা তাঁর হাসি দেখে আরও জোরে ছাতা পিটতে লাগল, 'জয় কুঁকড়ো, জয় কুঁকড়ো' বলে।

সোনালি বেরিয়ে এসে বললে, 'এত গোল কিসের।' কুঁকড়ো বললেন, 'ব্যাঙরা আমায় ভোজের নিমন্ত্রণ করছে।' সোনালি অবাক হয়ে শুধোলে, 'তুমি যাবে নাকি ওদের ভোজেতে।' কুঁকড়ো বললেন, 'আপত্তি কি। এরা সবাই বুদ্ধিজীবী। আমার গান এদের যদি ডানা গজাবার কাজে লাগে, তবে কেন আমি এদের সে সুখ থেকে বঞ্চিত রাখি। তোমার স্বপনপাখির গান তো সে কাজটা করতে পারলে না, উলটে বরং বেচারাদের দম ফাটিয়ে দেবারই জোগাড় করেছে। শোনো না স্বপনপাখি ওদের কী গানই শুনিয়েছে।' কুঁকড়ো ব্যাঙদের ইশারা করলেন, আর অমনি তারা সোনালিকে স্বপনপাখির গানের নকল দেখিয়ে দিলে, 'দম ফাট্, দম ফাট্, দুয়ো দুয়ো দুয়ো। দম ফাট্ ফাট্ দম, দুয়ো দুয়ো।'

'শুনলে তো।' কুঁকড়ো সোনালিকে বললেন। ঠিক সেই সময় বনের শিয়রে নিশুত রাতের আঁধার কাঁপিয়ে একটি সুর এসে পৌঁছল, 'পিয়ো।' কুঁকড়ো সেই মিষ্টি সুর শুনে চমকে বললেন, 'ও কে ডাকে?' কোলাব্যাঙ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'কেউ নয়, ওই সেই পাখিটা।'

এবার আবার সেই স্বপনপাখির মিষ্টি সুর কুঁকড়োর কানে এল, যেন একটি একটি আলোর ফোঁটা—'পিয়ো, পিয়ো। পিয়ো।' কুঁকড়ো শুনতে লাগলেন। একি পাখির ডাক। না এ স্বপ্নের বীণায় ঘা পড়ছে! সোনাব্যাঙ কি বলতে আসছিল, কুঁকড়ো তাদের এক ধমক দিয়ে সরিয়ে দিলেন। এইবার স্বপনপাখি গান ধরলে,

পিয়া।
আঁধার রাতের পিয়া, একলা রাতের পিয়া।
পিয়ো, ওগো পিয়ো। দিয়ো, দেখা দিয়ো।
আমায় দেখা দিয়ো, একলা দেখা দিয়ো।
আঁধার করা ঘরে, জাগছি তোমার তরে,
অন্ধকারে পিয়ো, দিয়ো দেখা দিয়ো।

দেখতে দেখতে চাঁদের আলো জলে স্থলে এসে পড়ল। নীল আলোর সাজে সেজে অন্ধকারের পিয়া যেন বনের আঁধার করা বাসরঘরে এসে দাঁড়ালেন। স্বপনপাখি আনন্দে গেয়ে উঠল, 'পিয়ো, সুধা পিয়ো, সুধা পিয়ো পিয়ো পিয়ো।'

কুঁকড়ো বলে উঠলেন, 'ছি ছি, ব্যাঙগুলোকে বিশ্বাস করে কী ভুলই করেছি। হায়, এ লজ্জা রাখব কোথায়, ওগো স্বপনপাখি।' মধুর সুরে স্বপনপাখির উত্তর এল, 'দিনের পাখি তুমি নির্ভীক, সতেজ ডাক দাও, রাতের পাখি আমি আঁধারে ডাকি, ভয়ে ভয়ে মিনতি করে। কিন্তু বন্ধু, তুমিও যাকে ডাক, আমিও তাকে ডাকি। ওরা যা বলে বলুক, তুমি আমি এক আলোরই দূত।'

কুঁকড়ো বনের শিয়রে চেয়ে বললেন, 'গেয়ে চলো, গেয়ে চলো রাত্রির স্বপন। আলোর দূত।'

আবার সুর উঠল আকাশ ছাপিয়ে তারার মধ্যে গিয়ে ঝংকার দিয়ে। বনের সবাই চাঁদের আলোয় বেরিয়ে দাঁড়াল সে সুর শুনে। গাছের তলায় আলোছায়া বিছানো, তারই উপরে হরিণ দাঁড়িয়ে শুনছে; কোটরের মধ্যে চাঁদের আলো পড়েছে, সেখান থেকে মুখ বাড়িয়ে বাচ্ছারা সব শুনছে; বনের পোকামাকড় পশুপাখি সবার মনের

কথা এক করে নিয়ে স্বপনপাখি বনের শিয়রে গাইছে; জোনাকির ফুলকি, তারার প্রদীপ, চাঁদের আলোর মাঝে—নীল আকাশের চাঁদোয়ার তলায়। ব্যাঙের কড়া সুর থেকে আরম্ভ করে ঝিঁঝির ঝিমে সুরটি পর্যন্ত সবই গান হয়ে এক তানে বাজছে যেন এই স্বপনপাখির মিষ্টি গলায়। কুঁকড়ো অবাক হয়ে বলে উঠলেন, 'এ যে জগৎজোড়া গান, এর তো জুড়ি নেই। স্বপনপাখি কার কানে তুমি কি কথা বলে যাচ্ছ কে তা জানে।' অমনই কাঠবেড়ালি বললে, 'অমনি শুনছি 'ছুটি হল, খেলা করো'।' খরগোশ বললে,'আমি শুনছি 'শিশিরে ভেজা সবুজ মাঠে চলো'।' বনবেড়াল বললে,'শুনছি 'চাঁদের আলো এল'।' মাটি বললে, 'বিষ্টির ফোঁটা পড়ছে যেন।' জোনাক বললে, 'তারা আর তারা।' কুঁকড়ো তারার দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমরা কি শুনছ আকাশের তারা।' তারা সব উত্তর করলে, 'আমরা নয়নতারার নয়নতারা।'

কাছে সোনাল পাখি দাঁড়িয়েছিল, কুঁকড়ো তাকে শুধোলেন, 'আর তুমি কী শুনছ।' সে এক মনে শুনছিল, কোনও কথা কইলে না, কেবল 'ওঃ!' বলে নিশ্বাস ফেললে।

কুঁকড়ো সোনালিকে বললেন, 'যে যা ভালোবাসে স্বপনপাখি তাকে সেই গানই শুনিয়ে যায়। আমি কি শুনলেম জানো?—'দিন এল, গান গাও। ভোর ভয়ি, ভোর ভয়ি...'।'

সোনালি মুখ টিপে হেসে মনে মনে বললে, 'ভোরের বড়ো দেরি নেই, তুমি না গাইলেও ভোর আজ আসে কি না দেখাব তোমায়।'

কুঁকড়ো একেবারে মোহিত হয়ে গান শুনছিলেন; ভোর হচ্ছে, কিন্তু সেটা আজ তাঁর খেয়ালই হল না; তিনি বলে উঠলেন, 'ওগো স্বপনপাখি, তোমার এ গানের পরে আর কোন লজ্জায় আমি গাইব?' স্বপনপাখি বললে, 'গান বন্ধ তো করতে পার না তুমি।' কুঁকড়ো বললেন, 'কিন্তু এর পরে সেই রগরগে আগুনের মতো রাঙা সুর কি কারও গাইতে ইচ্ছে হয়।' স্বপন উত্তর দিলে, 'আমার গান আমারই মনে হয় যে, সময়ে সময়ে বড়ো বেশি নীল। আসল কথাটা কি জানো? যে সুরের স্বপ্ন তোমারও মনে, আমারও মনে জাগছে, সেটিকে সুরে বসাতে তোমারও সাধ্য হল না, আমারও ক্ষমতায় কুলোল না কোনওদিন, গানের পরে মন সে বলবেই, হল না হল না, তেমনটি হল না, এ কিছুই হল না।'

কুঁকড়ো বললেন, 'সুরের পরশে ঘুম আসবে, তাকেই বলি গান।' স্বপন বললে, 'গানের ডাকে জেগে উঠল, কাজে লাগল—তন্দ্রা ছেড়ে, তাকেই বলি গান।'

কুঁকড়ো বললেন, 'আমার গান কি কোনওদিন কারু চোখে এক ফোঁটা জল আনতে পারবে।'

স্বপনপাখির উত্তর হল, 'আর আমার গান কি কোনওদিন কিছু জাগিয়ে তুলবে। বন্ধু, দুকখু নেই গেয়ে চলো, যেমন সুর পেয়েছি, ভালো হোক, মন্দ হোক, গেয়ে যাই যতক্ষণ—।'

'দুম' করে বন্দুকের শব্দ হল। একটা আগুনের হলকা বিদ্যুতের মতো বনের শিয়রে চমকে উঠল। একটি ছোটো পাখি গাছের শিয়র থেকে কুঁকড়োর পায়ের কাছে ঝরা পাতার মতো ঝরে পড়ল।

সোনালি চিৎকার করে উঠল, 'স্বপনপাখি রে, স্বপনপাখি।' কুঁকড়ো ঘাড় হেঁট করে বলে উঠলেন, 'ওরে মানুষ কী নিষ্ঠুর। কী নির্দয়।' স্বপনপাখি তাঁর দিকে কালো চোখ মেলে একটিবার চেয়ে দেখলে, তারপর একবার তার ডানা দুটি কেঁপে উঠে স্থির হল। সকালের হাওয়া আগুনে ঝলসানো রক্তমাখা একটি ছেঁড়া পালক আস্তে আস্তে উড়িয়ে নিয়ে চলল, বনের পথে পথে হু হু করে কেঁদে।

হঠাৎ ওদিকের ঝোপঝাপগুলো মাড়িয়ে হোঁস ফোঁস করে হাঁপাতে হাঁপাতে জিম্মা হাজির। কুঁকড়ো তাকে দেখে বললেন, 'জিম্মা, তুমি এখানে যে। শিকার পৌঁছে দিতে না কি।'

জিম্মা ঘাড় হেঁট করে বললে, 'এরা যে জোর করে আমায় শিকারে নিয়ে এল...।'

কুঁকড়ো এতক্ষণ স্বপনপাখিটিকে আড়াল করে আগলে ছিলেন, এবার সরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চেয়ে দেখো কাকে তারা মেরেছে।'

জিম্মা ঘাড় নেড়ে বললে, 'আহা যে গাছটি সুরে ভরা দেখবে, সেই গাছেই কি আগে গুলি চালাবে রাক্ষসগুলো। আমি আবার এদের হুকুম মানব!'—বলে জিম্মা ঘুরে বসল। তারপর, মাটির মধ্যে সব কারা চলাফেরা করতে লাগল, আর দেখতে দেখতে স্বপনপাখিকে পৃথিবী যেন কোলের মধ্যে আস্তে আস্তে টেনে নিতে লাগলেন।

দূরে শিকারিদের সিটি পড়ল। জিম্মা কুঁকড়োকে চটপট গোলাবাড়িতে ফিরে যেতে বলে দৌড়ে চলে গেল

শিকারিদের দিকে। এদিকে সোনালি কেবল দেখছিল কখন সকাল হয়। তার ভয় হচ্ছিল বুঝি কুঁকড়ো এইবার আকাশে চেয়ে দেখেন। কিন্তু কুঁকড়ো যেমন মাথা হেঁট করে স্বপনপাখির জন্যে কাঁদছিলেন, সেই ভাবেই রইলেন। সোনালি আস্তে আস্তে তাঁর কাছে গিয়ে বললে, 'এসো, আমার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদো।' কুঁকড়ো নিশ্বাস ফেলে সোনালির কাছে সরে গেলেন, সে ডানায় তাকে ঢেকে নিলে। তারপর সেই সোনার ডানার মধ্যে ঢেকে সোনালি কত ভালোবাসাই জানাতে লাগল, কত মিষ্টি কথা, কত মিনতি, কত ছল। আর ও দিকে সকাল হতে থাকল, অন্ধকার ফিকে হয়ে এল, সব জিনিস স্পষ্ট হতে থাকল। কিন্তু তখনও সোনালি বলছে, 'দেখেছো আমি তোমায় কী ভালোবাসি।' তারপর হঠাৎ এক সময় ডানা সরিয়ে নিয়ে সোনালি বলে উঠল পালক ঝাড়া দিয়ে, 'দেখেছো, কেমন সকাল এসেছে, তুমি না ডাকতেই।'

কুঁকড়ো চমকে আকাশে চাইলেন। তারপর বুকে তাঁর এমন সুর উঠল যে তেমন কান্না কোনওদিন কেউ শোনেনি। তিনি যেন পাষাণের মতো স্থির হয়ে গেলেন; আর চোখের সামনে তাঁর সকালের আলো মেঘে আকাশে গাছে ছড়িয়ে পড়তে থাকল।

সোনালি নিষ্ঠুরের মতো বললে, 'শেওলাগুলো রাঙা হয়ে উঠল বলে!' 'না, কখনও না!' বলে সেদিকে কুঁকড়ো ছুটে যাবেন, দেখতে দেখতে পাথরের গায়ে শেওলার উপরে সকালের আভা পড়ল আর সেগুলো আগুনের মতো লাল হয়ে গেল। সোনালি বললে, 'ওই দেখো পূর্বদিকে।' কুঁকড়ো 'না' বলে যেমন সেদিকে চাইলেন, অমনি সোনায় আকাশ ভরে উঠল। 'এ কী। এ কী।'—বলে কুঁকড়ো চোখ ঢাকলেন। সোনালি বললে, 'পুবদিক কারু হুকুম মানে না, দেখলে তো?'

কুঁকড়ো ঘাড় হেঁট করে বললেন, 'সত্যিই বলেছ। মন সেও হুকুম মানে, কিন্তু পুবদিক, সে কারু নয়। আজ আমি বুঝেছি কেউ কারু নয়।'

এই সময় জিম্মা ছুটতে ছুটতে এসে বললে, 'গোলাবাড়িতে সবাই চাচ্ছে তোমাকে। পাহাড়তলি আর অন্ধকার করে রেখো না।' কুঁকড়ো জিম্মাকে বললেন, 'হায়, এখনও তারা আমাকে আলোর জন্যে চাচ্ছে? আলো দেব আমি, এ কথা এখনও তারা বিশ্বাস করছে।' জিম্মা অবাক হয়ে রইল। কুঁকড়ো এ কি বলছেন। তার চোখে জল এল। সোনালি এবার সব অভিমান ছেড়ে ছুটে কুঁকড়োর কাছে গিয়ে বললে, 'আকাশ আর আলো দুটোই কি আমার এই বুকের ভালোবাসার চেয়ে বড়ো? দেখো ওরা তো তোমায় চায় না, আর আমার বুক তোমায় চাচ্ছে।'

কুঁকড়ো ভাঙা গলায় বললেন, 'হাঁ, ঠিক।' সোনালি বলে চলল, 'আর অন্ধকার, সে কি আর অন্ধকার থাকে, যদি দুটি প্রাণের ভালোবাসার আলো সেখানে—।' কুঁকড়ো তাড়াতাড়ি 'হাঁ' বলে সোনালির কাছ থেকে সরে দাঁড়িয়ে সপ্তম সুরে চড়িয়ে ডাক দিলেন, 'আলোর ফুল।'

সোনালি অবাক হয়ে বললে, 'গাইলে যে।'

কুঁকড়ো বললেন, 'এবার আমি নিজেকে নিজে ধমকে নিলেম। বারবার তিনবার আমি যা ভালোবাসি, তা করতে ভুলেছি।' সোনালি শুধোলে, 'কী ভালোবাস শুনি।'

কুঁকড়ো গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কাজ, আমার যা কাজ তাই।' বলে কুঁকড়ো জিম্মাকে বললেন, 'চলো, এগোও।' 'গিয়ে করবে কি।' সোনালি শুধোলে। 'আমার কাজ সোনালি।' 'কিন্তু রাত্রি তো আর নেই।'

কুঁকড়ো বললেন, 'আছে, সব ঘুমন্ত চোখের পাতায়।'

সোনালি হেসে বললে, 'আজ থেকে ঘুম ভাঙানোই বুঝি ব্রত হল তোমার। কিন্তু যাই বলো, সকাল তো হল তোমাকে ছেড়ে, তেমনই ঘুমও ভাঙবে তুমি না গেলেও।'

কুঁকড়ো বললেন, 'দিনের চেয়েও বড়ো আলোর হুকুমে আমায় চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সোনালি...।'

সোনালি গাছের তলায় মরা স্বপনপাখিটি দেখিয়ে বললে, 'এও যেমন আর গাইবে না, তেমনই তোমার মনের সুরটি কোনওদিন আর ফিরে আসবে না।' ঠিক এই সময় সবাইকে অবাক করে দিয়ে বনের শিয়রে স্বপনপাখি ডাক দিলে, 'পিয়ো পিয়ো।' ঠিক সেই গাছটির উপর থেকে যার তলায় রাতের স্বপন এখনও পড়ে আছে ধুলোয়। কুঁকড়ো উপর দিকে চেয়ে শুনলেন যেন আকাশবাণী হল, 'শেষ নেই, শেষ নেই, বনের স্বপন অফুর।'

কুঁকড়ো আনন্দে বলে উঠলেন, 'অফুর সুর, অশেষ স্বপন।' সোনালি বললে, 'তোমার বিশ্বাস কি এখনও অটল থাকবে। দেখছ না সূর্য উঠছেন।' কুঁকড়ো বললেন, 'কাল যে গান গেয়েছি তারই রেশ আকাশে এতক্ষণ বাজছিল সোনালি।'

এমন সময় পেঁচাগুলো চেঁচিয়ে গেল, 'আজ কুঁকড়ো গায়নি, কী মজা।' 'ওই শোনো, সোনালি, পেঁচারা স্পষ্টই জানিয়ে গেল যে, আলো আজ দেওয়া হয়নি। তাই আনন্দ করছে তারা।' বলে কুঁকড়ো সোনালির কাছে গিয়ে বললেন, 'সকাল আমিই আনি। শুধু তাই নয়, বাদলে যখন পাহাড়তলিতে দিনরাত ঘন কুয়াশা চেপে এসেছে, দিন এল কি না বোঝা যাচ্ছে না, সেইসব দিন আমার সাড়া সূর্যের জায়গাটি নিয়ে সবাইকে জানায় 'দিন এল, দিন এল রে, দিন এল'।'

সোনালি কি বলতে যাচ্ছিল, কুঁকড়ো তাকে বললেন, 'শোনো।' সোনালি দেখলে, কুঁকড়ো যেন কতদূরে চেয়ে রয়েছেন, চোখে তাঁর এক আশ্চর্য আলো খেলছে। কুঁকড়ো আস্তে আস্তে বললেন, যেন মনে মনে, 'দূর সূর্যলোকের পাখি আমি। তাই না আমি ডাক দিলে নীল আকাশ ছেয়ে জ্বলে ওঠে সন্ধ্যার অন্ধকারে রাত্রির গভীরে আলোর ফুলকি। আমার দেওয়া আলো কোনওদিন কি নিভতে পারে। না আমার গান বন্ধ হতে পারে? কতদিন গাচ্ছি, কতদিন যে গাইব তার কি ঠিকানা আছে। যুগ যুগ ধরে এমনই চলবে...। আমার পর সে, তারপর সে গেয়ে চলবে—আমারই মতো অটল বিশ্বাসে। শেষে একদিন দেখা যাবে আকাশের নীল, তারায় তারায় এমনই ভরে উঠছে যে রাত আর কোথাও নেই, সব দিন হয়ে গেছে—আলোয় আলোময়।' সোনালি অমনি শুধোলে, 'কবে সেটা হবে শুনি।' 'কোনও এক শুভদিনে।' বলে কুঁকড়ো চুপ করলেন।

সোনালি বললে, 'আমাদের এই বনটিকে ভুলো না যেন সেদিন।'

কুঁকড়ো বললেন, 'কোনওদিন ভুলব না। এইখানেই জানলেম যে, এক স্বপন ভেঙে যায়, আর এক স্বপন এসে দেখা দেয়, স্বপনের সঙ্গে নিজেও ভেঙে পড়া নয় কিন্তু জেগে ওঠা, নতুন আলোয় নতুন আশা নিয়ে।' সোনালি বুঝলে কুঁকড়ো আর থাকেন না, সে হতাশ হয়ে অভিমানে বলে উঠল, 'যাও যাও, সেই খোপের মধ্যে রোজ সন্ধ্যেবেলা ঘুম দিয়ো, নিজের অন্দরমহলে মই বেয়ে উঠে।'

কুঁকড়ো উত্তর দিলেন, 'ডানা খুলে উড়তে বনের পাখিরা শিখিয়েছে যে।'

'যাও, সেই ঝুড়ির মধ্যে মুরগি-গিন্নি এতক্ষণ কাঁদছে।'

কুঁকড়ো বললেন, 'মা আমায় দেখে কী খুশিই হবেন।'

জিম্মা বললে, 'আর বলবেন পুরোনো চাল ভাতে বেড়েছে রে।' বলে কুকুর ঠিক মুরগি-গিন্নির আওয়াজটা নকল করলে। কুঁকড়ো জিম্মাকে বললেন, 'চলো যাওয়া যাক। আর কেন?'

সোনালি যেন সে কথা শুনেও শুনলে না। সে দেখাতে চায় কুঁকড়ো গেলে তার একটুও কষ্ট হবে না। কিন্তু আপনা হতেই তার চোখদুটি জলে ভরে এল। কুঁকড়ো তা দেখলেন, তাঁরও মন একটু উদাস হল। শেষে কুঁকড়ো জিম্মাকে সোনালির কাছে দু'একদিন থাকতে বললেন। জিম্মা অনেক দুঃখু সয়েছে, সে সোনালিকে বোঝাবার জন্যে কিছুদিন বনে থাকাই স্থির করলে। কুঁকড়ো বিদায় নিয়ে এবার সত্যিই চললেন, সোনালি আর থাকতে পারলে না, ছুটে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে বললে, 'আমাকেও সঙ্গে নাও।' কুঁকড়ো তার মুখে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, 'আলোর ছোটো বোন হয়ে থাকতে পারবে কি।' 'কখনও না।' বলে সোনালি সরে দাঁড়াল। 'তবে আসি।' বলে কুঁকড়ো এগোলেন। সোনালি রেগে বললে, 'আমি তোমায় একটুও ভালোবাসি নে।' কুঁকড়ো তখন মাঝ পথে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কিন্তু আমি তোমায় সত্যিই ভালোবাসি, কেবল ভাবছি আমার দিনগুলির সঙ্গে যদি তুমি মিলতে পারতে।' বলতে বলতে কুঁকড়ো বনের আড়ালে বেরিয়ে গেলেন। সোনালি রাগ-ভরে বলে উঠল, 'যেমন আমাকে ঠেলে গেলেন, তেমনই পড়েন পাখমারের পাল্লায় তো ডানাদুটি কেটে ছেড়ে দেয়।'

জিম্মা চুপটি করে বসে সোনালির রকমসকম দেখছে, এমন সময় কাঠঠোকরা নিজের কোটর থেকে মুখ ঝুঁকিয়ে বলে উঠল, 'পাখমারটা কুঁকড়োকে তাগ করছে যে। কী বিপদ।' পেঁচারা অমনি গাছের উপর থেকে দুয়ো দিয়ে বললে, 'বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে, কুঁকড়োর এবারে কর্ম কাবার।' খরগোশগুলো গড় থেকে ছুটে বেরিয়ে এল, একটা বাচ্চা কান খাড়া করে দেখে বললে, 'পাখমার বন্দুকটা মুচড়ে ভাঙলে যে।' আর একজন অমনি বলে উঠল, 'না রে, গুলি ভরছে, দেখছিস না?'

জিম্মার দিকে সোনালি, সোনালির দিকে জিম্মা অবাক হয়ে চেয়ে রইল। জিম্মা, বললে, 'ওরা কি কুঁকড়োর ওপরেও গুলি চালাবে।'

সোনালি বললে, 'না। সোনালির দেখা যদি পায়, তবে সেইদিকেই বন্দুক ওঠাবে।' বলে সোনালি চলল। জিম্মা পথ আগলে বললে, 'কোথায় যাও সোনালি।'

'আমার যেটুকু করবার সেই কাজটুকু করতে।' বলে বন্দুকের মুখে সোনালি উড়ে পড়তে চলল।

কাঠঠোকরা চেঁচিয়ে উঠল, 'ফাঁদ। ফাঁদ। ফাঁদটা বাঁচিয়ে সোনালি।' কিন্তু তার আগেই সোনালিকে দড়ির ফাঁদ নাগপাশের মতো জড়িয়ে ফেলেছে। 'তারা তাঁকে প্রাণ মারবে।' বলে সোনালি ধুলোর উপরে সোনার পাখা লুটিয়ে কাঁদতে লাগল। তার সব অভিমান চুর হয়ে গিয়ে কান্নার সুরে মিনতি করতে লাগল কেবলই সকালের কাছে, 'হিমে সব ভিজিয়ে দাও, বারুদ না জ্বলুক, ভিজে ঘাসে শিকারির পা পিছলে যাক অন্য দিকে। ওগো সকালের আলো, তুমি তোমার পাখিকে রক্ষে করো, যে পাখি আঁধার দূর করে, আকাশের বাজকে ফিরিয়ে দেয়, সবার উপর থেকে। ওগো স্বপনপাখি, তুমি গেয়ে ওঠো, ঢুলে পড়ুক দুরন্ত মানুষের চোখের পাতা, স্বপ্নের রাজ্যে সে ঘুমিয়ে থাক তার মৃত্যুবাণের পাশাপাশি।'

স্বপনপাখি গেয়ে উঠল বন মাতিয়ে করুণ সুরে, 'পিয়ো-পিয়ো, ও গোলাপের পিয়ো, ও আমাদের পিয়ো।' সোনালি দু'খানি ডানা ধুলোর উপরে রেখে বললে, 'আলো। তোমার পাখিকে বাঁচাও, তার সঙ্গে সেই গোলাবাড়িতেই আমি চিরদিন থাকব, আর কোনওদিন অভিমান করব না তার উপরে।' অমনি সোনালি দেখলে আলো হতে আরম্ভ হল, চারিদিকে পাখিরা গেয়ে উঠল, আকাশ ক্রমে নীল হতে থাকল, বনের ঘুম আস্তে আস্তে ভাঙতে লাগল।

সোনালি মাটিতে মাথা নুইয়ে বললে, 'আলোর অপমান, আলোর দূতের অপমান আর আমি করব না। হে আলোর আলো, আমায় ক্ষমা করো, তাঁকে বাঁচাও।' 'দুম' করে ওধারে বন্দুক ছুটল, বনের সমস্তটা যেন রি-রি করে শিউরে উঠল, তারপর কুঁকড়োর সাড়া এল, 'আলোর ফুলকি।'

'তাগ ফসকেছে। গুলি ফসকেছে।'—পেঁচাটা কেঁদে উঠল। আর অমনি দিকে দিকে পাখি সব 'জয় জীব। জয় জীব।' বলে কুঁকড়োর জয় দিয়ে উঠল। কোকিল উলু উলু দিয়ে বলতে লাগল, 'শুভদিন এল—শুভদিন।' দেখতে দেখতে চারিদিক আলোময় হয়ে উঠল। সেই সময় বনের মধ্যে পায়ের শব্দ উঠল। সোনালি চোখ বুজে চুপ করে শুনতে লাগল, পায়ের ধ্বনি আস্তে আস্তে তালে তালে পড়ছে এক, দুই, তিন। কার ঠাণ্ডা হাতের যেন পরশ পেয়ে সোনালি চোখ খুলে দেখলে, পলাতকা কুঁকড়োকে বুকের কাছে ধরে কুঁকড়োর মনিব। সোনালি পালাবার চেষ্টাও করলে না; কুঁকড়োর পাশে গেরেপ্তার হয়ে গোলাবাড়িতে চলল। বসন্ত বাউরি পাহাড়তলি মাতিয়ে সুর ধরলে, 'কথা কও, বউ কথা কও, কোথা যাও। বউ কোথা যাও। কথা কও, বউ কথা কও।'

শকুন্তলা



শকুন্তলা

এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল বড় বড় বট, সারি সারি তাল তমাল, পাহাড় পর্বত, আর ছিল—ছোট নদী মালিনী।

মালিনীর জল বড় স্থির—আয়নার মতো। তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া—সকলই দেখা যেত। আর দেখা যেত গাছের তলায় কতগুলি কুটিরের ছায়া।

নদীতীরে যে নিবিড় বন ছিল তাতে অনেক জীবজন্তু ছিল। কত হাঁস, কত বক, সারাদিন খালের ধারে, বিলের জলে ঘুরে বেড়াত। কত ছোট ছোট পাখি, কত টিয়াপাখির ঝাঁক গাছের ডালে ডালে গান গাইত, কোটরে কোটরে বাসা বাঁধত। দলে দলে হরিণ, ছোট ছোট হরিণশিশু, কুশের বনে, ধানের খেতে, কচি ঘাসের মাঠে খেলা করত। বসন্তে কোকিল গাইত, বর্ষায় ময়ূর নাচত।

এই বনে তিন হাজার বছরের এক প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় মহর্ষি কন্বদেবের আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমে



জটাধারী তপস্বী কন্ব আর মা গৌতমী ছিলেন, তাঁদের পাতার কুটির ছিল, পরনে বাকল ছিল, গোয়ালভরা গাই ছিল, চঞ্চল বাছুর ছিল, আর ছিল বাকল পরা কতগুলি ঋষিকুমার।

তারা কন্বদেবের কাছে বেদ পড়ত, মালিনীর জলে তর্পণ করত, গাছের ফলে অতিথি-সেবা করত, বনের ফুলে দেবতার অঞ্জলি দিত।

আর কি করত?

বনে বনে হোমের কাঠ কুড়িয়ে বেড়াত, কালো গাই ধলো গাই মাঠে চরাতে যেত। সবুজ মাঠ ছিল তাতে গাইবাছুর চরে বেড়াত, বনে ছায়া ছিল তাতে রাখাল-ঋষিরা খেলে বেড়াত। তাদের ঘর গড়বার বালি ছিল, ময়ূর গড়বার মাটি ছিল, বেণুবাঁশের বাঁশি ছিল, বটপাতার ভেলা ছিল; আর ছিল—খেলবার সাথী বনের হরিণ, গাছের ময়ূর; আর ছিল—মা গৌতমীর মুখে দেবদানবের যুদ্ধকথা, তাত কন্বের মুখে মধুর সামবেদ গান।

সকলই ছিল, ছিল না কেবল—আঁধার ঘরের মানিক ছোট মেয়ে—শকুন্তলা। একদিন নিশুতি রাতে অপ্সরী মেনকা তার রূপের ডালি—দুধের বাছা—শকুন্তলা মেয়েকে সেই তপোবনে ফেলে রেখে গেল। বনের পাখিরা

তাকে ডানায় ঢেকে বুকে নিয়ে সারারাত বসে রইল। বনের পাখিদেরও দয়ামায়া আছে, কিন্তু সেই মেনকা পাষাণীর কী কিছু দয়া হল!

খুব ভোরবেলায় তপোবনের যত ঋষিকুমার বনে বনে ফল ফুল কুড়তে গিয়েছিল। তারা আমলকী বনে আমলকী, হরীতকী বনে হরীতকী, ইংলী ফলের বনে ইংলী কুড়িয়ে নিলে; তারপরে ফুলের বনে পূজার ফুল তুলতে তুলতে পাখিদের মাঝে ফুলের মতো সুন্দর শকুন্তলা মেয়েকে কুড়িয়ে পেলে। সবাই মিলে তাকে কোলে করে তাত কন্বের কাছে নিয়ে এল। তখন সেই সঙ্গে বনের কত পাখি, কত হরিণ, সেই তপোবনে এসে বাসা বাঁধলে।

শকুন্তলা সেই তপোবনে, সেই বটের ছায়ায় পাতার কুটিরে, মা গৌতমীর কোলে-পিঠে মানুষ হতে লাগল।

তারপর শকুন্তলার যখন বয়স হল তখন তাত কন্ব পৃথিবী খুঁজে শকুন্তলার বর আনতে চলে গেলেন। শকুন্তলার হাতে তপোবনের ভার দিয়ে গেলেন।

শকুন্তলার আপনার মা-বাপ তাকে পর করলে, কিন্তু যারা পর ছিল তারা তার আপনার হল। তাত কন্ব তার আপনার, মা গৌতমী তার আপনার, ঋষিবালকেরা তার আপনার ভাইয়ের মতো। গোয়ালের গাইবাছুর—সে-ও তার আপনার, এমন কি—বনের লতাপাতা তারাও তার আপনার ছিল। আর ছিল—তার বড়ই আপনার দুই প্রিয়সখী অনুসূয়া, প্রিয়ংবদা; আর ছিল একটি মা হারা হরিণশিশু—বড়ই ছোট—বড়ই চঞ্চল। তিন সখীর আজকাল অনেক কাজ—ঘরের কাজ, অতিথি-সেবার কাজ, সকালে সন্ধ্যায় গাছে জল দেবার কাজ, সহকারে মল্লিকালতার বিয়ে দেবার কাজ; আর শকুন্তলার দুই সখীর আর একটি কাজ ছিল—তারা প্রতিদিন মাধবীলতায় জল দিত আর ভাবত, কবে ওই মাধবীলতায় ফুল ফুটবে, সেই দিন সখী শকুন্তলার বর আসবে।

এ ছাড়া আর কী কাজ ছিল?—হরিণশিশুর মতো নির্ভয়ে এ বনে সে বনে খেলা করা, ভ্রমরের মতো লতাবিতানে গুনগুন গল্প করা, নয়তো মরালীর মতো মালিনীর হিম জলে গা ভাসানো; আর প্রতিদিন সন্ধ্যার আঁধারে বনপথে বনদেবীর মতো তিন সখীতে ঘরে ফিরে আসা—এই কাজ।

একদিন—দক্ষিণ বাতাসে সেই কুসুমবনে দেখতে দেখতে প্রিয় মাধবীলতার সর্বাঙ্গ ফুলে ভরে উঠল। আজ সখীর বর আসবে বলে চঞ্চল হরিণীর মতো চঞ্চল অনুসূয়া প্রিয়ংবদা আরও চঞ্চল হয়ে উঠল।

দুষ্মন্ত

যে দেশে ঋষির তপোবন ছিল, সেই দেশের রাজার নাম ছিল—দুষ্মন্ত।

সে কালে এত বড় রাজা কেউ ছিল না। তিনি পুবদেশের রাজা, পশ্চিমদেশের রাজা, উত্তরদেশের রাজা, দক্ষিণদেশের রাজা, সব রাজার রাজা ছিলেন। সাত সমুদ্র তের নদী—সব তাঁর রাজ্য। পৃথিবীর এক রাজা—রাজা দুষ্মন্ত। তাঁর কত সৈন্যসামন্ত ছিল, হাতিশালে কত হাতি ছিল, ঘোড়াশালে কত ঘোড়া ছিল, গাড়িখানায় কত সোনা রুপোর রথ ছিল, রাজমহলে কত দাসদাসী ছিল; দেশ জুড়ে তাঁর সুনাম ছিল, ক্রোশ জুড়ে সোনার রাজপুরী ছিল, আর ব্রাহ্মণকুমার মাধব্য সেই রাজার প্রিয় সখা ছিল।

যে দিন তপোবনে মল্লিকার ফুল ফুটল, সেই দিন সাত সমুদ্র তের নদীর রাজা, রাজা দুষ্মন্ত, প্রিয়সখা মাধব্যকে বললেন—'চল বন্ধু, আজ মৃগয়ায় যাই।'

মৃগয়ার নামে মাধব্যের যেন জ্বর এল। গরিব ব্রাহ্মণ রাজবাড়িতে রাজার হালে থাকে, দু'বেলা থাল থাল লুচি মণ্ডা, ভার ভার ক্ষীর দই দিয়ে মোটা পেট ঠাণ্ডা রাখে, মৃগয়ার নামে বেচারার মুখ এতটুকু হয়ে গেল, বাঘ ভালুকের ভয়ে প্রাণ কেঁপে উঠল।

'না' বলবার যো কী, রাজার আজ্ঞা!

অমনই হাতিশালে হাতি সাজল, ঘোড়াশালে ঘোড়া সাজল, কোমর বেঁধে পালোয়ান এল, বর্শা হাতে শিকারি এল, ধনুক হাতে ব্যাধ এল, জাল ঘাড়ে জেলে এল। তারপর সারথি রাজার সোনার রথ নিয়ে এল, সিংহদ্বারে সোনার কপাট ঝনঝনা দিয়ে খুলে গেল।

রাজা সোনার রথে শিকারে চললেন।

দু'পাশে দুই রাজহস্তী চামর ঢোলাতে ঢোলাতে চলল, ছত্রধর রাজছত্র ধরে চলল, জয়ঢাক বাজতে বাজতে চলল, আর সর্বশেষে প্রিয়সখা মাধব্য এক খোঁড়া ঘোড়ায় হটহট করে চললেন।

ক্রমে রাজা এ বন সে বন ঘুরে শেষে মহাবনে এসে পড়লেন। গাছে গাছে ব্যাধ ফাঁদ পাততে লাগল, খালে বিলে জেলে জাল ফেলতে লাগল, সৈন্যসামন্ত বন ঘিরতে লাগল—বনে সাড়া পড়ে গেল।

গাছে গাছে কত পাখি, কত পাখির ছানা পাতার ফাঁকে ফাঁকে কচি পাতার মতো ছোট ডানা নাড়ছিল, রাঙা ফলের মতো ডালে দুলছিল, আকাশে উড়ে যাচ্ছিল, কোটরে ফিরে আসছিল, কিচমিচ করছিল। ব্যাধের সাড়া পেয়ে, বাসা ফেলে, কোটর ছেড়ে, কে কোথায় পালাতে লাগল।



মোষ গরমের দিনে ভিজে কাদায় পড়ে ঠাণ্ডা হচ্ছিল, তাড়া পেয়ে—শিং উঁচিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে গহন বনে পালাতে লাগল। হাতি শুঁড়ে করে জল ছিটিয়ে গা ধুচ্ছিল, শালগাছে গা ঘষছিল, গাছের ডাল ঘুরিয়ে মশা তাড়াচ্ছিল, ভয় পেয়ে—শুঁড় তুলে, পদ্মবন দলে, ব্যাধের জাল ছিঁড়ে পালাতে আরম্ভ করলে। বনে বাঘ হাঁকার দিয়ে উঠল, পর্বতে সিংহ গর্জন করে উঠল, সারা বন কেঁপে উঠল।

কত পাখি, কত বরা, কত বাঘ, কত ভালুক , কেউ জালে ধরা পড়ল, কেউ ফাঁদে বাঁধা পড়ল, কেউ বা তলোয়ারে কাটা গেল; বনে হাহাকার পড়ে গেল। বনের বাঘ বন দিয়ে, জলের কুমির জল দিয়ে, আকাশের পাখি আকাশ ছেয়ে পালাতে আরম্ভ করলে।

ফাঁদ নিয়ে ব্যাধ পাখির সঙ্গে ছুটল, তীর নিয়ে বীর বাঘের সঙ্গে গেল, জাল ঘাড়ে জেলে মাছের সঙ্গে চলল, রাজা সোনার রথে এক হরিণের সঙ্গে ছুটলেন। হরিণ প্রাণভয়ে হাওয়ার মতো রথের আগে দৌড়িয়েছে, সোনার রথ তার পিছনে বিদ্যুতের বেগে চলেছে। রাজার সৈন্যসামন্ত, হাতি, ঘোড়া, প্রিয়সখা মাধব্য, কতদূর কোথায় পড়ে রইল। কেবল রাজার রথ আর বনের হরিণ নদীর ধার দিয়ে, বনের ভিতরে দিয়ে, মাঠের উপর দিয়ে ছুটে চলল।

যখন গহন বনে এই শিকার চলছিল, তখন সেই তপোবনে সকলে নির্ভয়ে ছিল। গাছের ডালে টিয়াপাখি লাল ঠোঁটে ধান খুঁটছিল, নদীর জলে মনের সুখে হাঁস ভাসছিল, কুশবনে পোষা হরিণ নির্ভয়ে খেলা করছিল; আর শকুন্তলা, অনুসূয়া, প্রিয়ংবদা—তিন সখী কুঞ্জবনে গুনগুন গল্প করছিল।

এই তপোবনে সকলে নির্ভয়, কেউ কারও হিংসা করে না। মহাযোগী কন্বের তপোবনে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। হরিণশিশু ও সিংহশাবক এক বনে খেলা করে। এ বনে রাজাদেরও শিকার করা নিষেধ। রাজার

শিকার—সেই হরিণ—উর্ধ্বশ্বাসে এই তপোবনের ভিতর চলে গেল। রাজাও অমনই ধনুঃশর ফেলে ঋষিদর্শনে চললেন।

সেই তপোবনে সোনার রথে পৃথিবীর রাজা, আর মাধবীকুঞ্জে রূপসী শকুন্তলা—দু'জনে দেখা হল।

এদিকে মাধব্য কী বিপদেই পড়েছে! আর সে পারে না! রাজভোগ না হলে তার চলে না, নরম বিছানা ছাড়া ঘুম হয় না, পালকি ছাড়া সে এক পা চলে না, তার কি সারাদিন ঘোড়ার পিঠে চড়ে 'ওই বরা যায়, ওই বাঘ পালায়' করে এ বন সে বন ঘুরে বেড়ানো পোষায়? পল্বলের পাতা-পচা কষা জলে কি তার তৃষ্ণা ভাঙে? ঠিক



সময় রাজভোগ না পেলে সে অন্ধকার দেখে, তার কি সারাদিনের পর একটু আধপোড়া মাংসে পেট ভরে? পাতার বিছানায় মশার কামড়ে তার কি ঘুম হয়? বনে এসে ব্রাহ্মণ মহা মুশকিলে পড়েছে। সমস্ত দিন ঘোড়ার পিঠে ফিরে সর্বাঙ্গে দারুণ ব্যথা, মশার জ্বালায় রাত্রে নিদ্রা নেই, মনে সর্বদা ভয়—ওই ভালুক এল, ওই বুঝি বাঘে ধরলে! ভয়ে ভয়ে বেচারা আধখানা হয়ে গেছে।

রাজাকে কত বোঝাচ্ছে—'মহারাজ, রাজ্য ছারখারে যায়, শরীর মাটি হল, আর কেন? রাজ্যে চলুন।'

রাজা তবু শুনলেন না, শকুন্তলাকে দেখে অবধি রাজকার্য ছেড়ে, মৃগয়া ছেড়ে, তপস্বীর মতো সেই তপোবনে রইলেন। রাজ্যে রাজার মা ব্রত করেছেন, রাজাকে ডেকে পাঠালেন, তবু রাজ্যে ফিরলেন না, কত ওজর-আপত্তি করে মাধব্যকে সব সৈন্যসামন্ত সঙ্গে মা-র কাছে পাঠিয়ে দিয়ে একলা সেই তপোবনে রইলেন।

মাধব্য রাজবাড়িতে মনের আনন্দে রাজার হালে আছে, আর এদিকে পৃথিবীর রাজা বনবাসীর মতো বনে বনে 'হা শকুন্তলা! যো শকুন্তলা!' বলে ফিরছে। হাতের ধনুক, তূণের বাণ কোন বনে পড়ে আছে! রাজবেশ নদীর জলে ভেসে গেছে, সোনার অঙ্গ কালি হয়েছে, দেশের রাজা বনে ফিরছে।

আর শকুন্তলা কি করছে?—

নিকুঞ্জবনে পদ্মের বিছানায় বসে পদ্মপাতায় মহারাজাকে মনের কথা লিখছে। রাজাকে দেখে কে জানে তার মন কেমন হল। একদণ্ড না দেখলে প্রাণ কাঁদে, চোখের জলে বুক ভেসে যায়। দুই সখী তাকে পদ্মফুলে বাতাস করছে, গলা ধরে কত আদর করছে, আঁচলে চোখ মোছাচ্ছে আর ভাবছে—এইবার ভোর হল, বুঝি সখীর রাজা ফিরে এল।

তারপর কি হল?

দুঃখের নিশি প্রভাত হল, মাধবীর পাতায় পাতায় ফুল ফুটল, নিকুঞ্জের গাছে গাছে পাখি ডাকল, সখীদের পোষা হরিণ কাছে এল।

আর কী হল?

বনপথে রাজা-বর কুঞ্জে এল।

আর কী হল?

পৃথিবীর রাজা আর বনের শকুন্তলা—দু'জনে মালাবদল হল। দুই সখীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

তারপর কী হল?

তারপর কতদিন পরে সোনার সাঁঝে সোনার রথ রাজাকে নিয়ে রাজ্যে গেল, আর আঁধার বনপথে দুই প্রিয়সখী শকুন্তলাকে নিয়ে ঘরে গেল।

তপোবনে

রাজা রাজ্যে চলে গেলেন, আর শকুন্তলা সেই বনে দিন গুনতে লাগল।

যাবার সময় রাজা নিজের মোহর আংটি শকুন্তলাকে দিয়ে গেলেন, বলে গেলেন—'সুন্দরী, তুমি প্রতিদিন আমার নামের একটি করে অক্ষর পড়বে, নামও শেষ হবে আর বনপথে সোনার রথ তোমাকে নিতে আসবে।'

কিন্তু হায়, সোনার রথ কই এল?

কত দিন গেল, কত রাত গেল; দুষ্মন্ত নাম কতবার পড়া হয়ে গেল, তবু সোনার রথ কই এল? হায় হায়, সোনার সাঁঝে সোনার রথ সেই যে গেল আর ফিরল না! পৃথিবীর রাজা সোনার সিংহাসনে, আর বনের রানী কুটির-দুয়ারে—দু'জনে দুইখানে।

রাজার শোকে শকুন্তলার মন ভেঙে পড়ল। কোথা রইল অতিথি-সেবা, কোথা রইল পোষা হরিণ, কোথা রইল সাধের নিকুঞ্জবনে প্রাণের দুই প্রিয়সখী! শকুন্তলার মুখে হাসি নেই, চোখে ঘুম নেই! রাজার ভাবনা নিয়ে কুটির দুয়ারে পাষাণ-প্রতিমা বসে রইল।

রাজার রথ কেন এল না?

কেন রাজা ভুলে রইলেন?

রাজা রাজ্যে গেলে একদিন শকুন্তলা কুটির-দুয়ারে গালে হাত দিয়ে বসে বসে রাজার কথা ভাবছে—ভাবছে আর কাঁদছে, এমন সময় মহর্ষি দুর্বাসা দুয়ারে অতিথি এলেন, শকুন্তলা জানতেও পারলে না, ফিরেও দেখলে না। একে দুর্বাসা মহা অভিমানী, একটুতেই মহা রাগ হয়, কথায় কথায় যাকে তাকে ভস্ম করে ফেলেন, তার উপর শকুন্তলার এই অনাদর—তাঁকে প্রণাম করলে না, বসতে আসন দিলে না, পা ধোবার জল দিলে না!

দুর্বাসার সর্বাঙ্গে যেন আগুন ছুটল, রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—'কী! অতিথির অপমান? পাপীয়সী, এই অভিসম্পাত করছি—যার জন্যে আমার অপমান করলি সে যেন তোকে কিছুতে না চিনতে পারে!'

হা শকুন্তলার কি তখন জ্ঞান ছিল—যে দেখবে, কে এল, কে গেল! দুর্বাসার একটি কথাও তার কানে গেল না।

মহামানী মহর্ষি দুর্বাসা ঘোর অভিসম্পাত করে চলে গেলেন—সে কিছুই জানতে পারলে না, কুটির-দুয়ারে আনমনে যেমন ছিল তেমনই রইল।

অনুসূয়া প্রিয়ংবদা দুই সখী উপবনে ফুল তুলছিল, ছুটে এসে দুর্বাসার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। কত সাধ্যসাধনা করে, কত কাকুতি মিনতি করে, কত হাতে পায়ে ধরে দুর্বাসাকে শান্ত করলে!

শেষে এই শাপান্ত হল—'রাজা যাবার সময় শকুন্তলাকে যে আংটি দিয়ে গেছেন সেই আংটি যদি রাজাকে দেখাতে পারে তবেই রাজা শকুন্তলাকে চিনবেন; যতদিন সেই আংটি রাজার হাতে না পড়বে ততদিন রাজা সব ভুলে থাকবেন।'

দুর্বাসার অভিশাপে তাই পৃথিবীর রাজা সব ভুলে রইলেন!

বনপথে সোনার রথ আর ফিরে এল না!

এদিকে দুর্বাসাও চলে গেলেন আর তাত কন্বও তপোবনে ফিরে এলেন। সারা পৃথিবী খুঁজে শকুন্তলার বর মেলেনি। তিনি ফিরে এসে শুনলেন সারা পৃথিবীর রাজা বনে এসে তার গলায় মালা দিয়েছেন। তাত কন্বের আনন্দের সীমা রইল না, তখনই শকুন্তলাকে রাজার কাছে পাঠাবার উদ্যোগ করতে লাগলেন। দুঃখে অভিমানে শকুন্তলা মাটিতে মিশে ছিল, তাকে কত আদর করলেন, কত আশীর্বাদ করলেন।

উপবনে দুই সখী যখন শুনলে শকুন্তলা শ্বশুরবাড়ি চলল, তখন তাদের আর আহ্লাদের সীমা রইল না। প্রিয়ংবদা কেশর ফুলের হার নিলে, অনুসূয়া গন্ধ ফুলের তেল নিলে; দুই সখীতে শকুন্তলাকে সাজাতে বসল।



তার মাথায় তেল দিলে, খোঁপায় ফুল দিলে, কপালে সিঁদুর দিলে, পায়ে আলতা দিলে, নতুন বাকল দিলে; তবু তো মন উঠল না! সখীর একী বেশ করে দিলে? প্রিয়সখী শকুন্তলা পৃথিবীর রানি, তার কী এই সাজ?—হাতে মৃণালের বালা, গলার কেশরের মালা, খোঁপায় মল্লিকার ফুল, পরনে বাকল?—হায়, হায়, মতির মালা কোথায়? হীরের বালা কোথায়? সোনার মল কোথায়? পরনে শাড়ি কোথায়?

বনের দেবতারা সখীদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন।

বনের গাছ থেকে সোনার শাড়ি উড়ে পড়ল, পায়ের মল বেজে পড়ল। বনদেবতারা পলকে বনবাসিনী শকুন্তলাকে রাজ্যেশ্বরী মহারানীর সাজে সাজিয়ে দিলেন।

তারপর যাবার সময় হল। হায়, যেতে কি পা সরে, মন কি চায়?

শকুন্তলা কোনদিকে যাবে—সোনার পুরীতে রানির মতো রাজার কাছে চলে যাবে?—না তিন সখীতে বনপথে আজন্মকালের তপোবনে ফিরে যাবে?

এদিকে শুভলগ্ন বয়ে যায়, ওদিকে বিদায় আর শেষ হয় না। কুঞ্জবনে মল্লিকা মাধবী কচি কচি পাতা নেড়ে

ফিরে ডাকছে, মা-হারা হরিণশিশু সোনার আঁচল ধরে বনের দিকে টানছে, প্রাণের দুই প্রিয়সখী গলা ধরে কাঁদছে। একদণ্ডে এত মায়া এত ভালবাসা কাটানো কি সহজ?

মা-হারা হরিণশিশুকে তাত কন্বের হাতে, প্রিয় তরুলতাদের প্রিয়সখীদের হাতে সঁপে দিতে কত বেলাই হয়ে গেল।

তপোবনের শেষে বটগাছ, সেইখান থেকে তাত কন্ব ফিরলেন!

দুই সখী কেঁদে ফিরে এল। আসবার সময় শকুন্তলার আঁচলে রাজার সেই আংটি বেঁধে দিলে, বলে দিলে—'দেখিস, ভাই, যত্ন করে রাখিস।'

তারপর বনের দেবতাদের প্রণাম করে শকুন্তলা রাজপুরীর দিকে চলে গেল।

পরের মেয়ে পর হয়ে পরের দেশে চলে গেল—বনখানা আঁধার করে গেল!

ঋষির অভিশাপ কখনও মিথ্যে হয় না। রাজপুরে যাবার পথে শকুন্তলা একদিন শচীতীর্থের জলে গা ধুতে গেল। সাঁতার জলে গা ভাসিয়ে, নদীর জলে ঢেউ নাচিয়ে শকুন্তলা গা ধুলে। রঙ্গভরে অঙ্গের শাড়ি জলের উপর বিছিয়ে দিলে; জলের মতো চিকণ আঁচল জলের সঙ্গে মিশে গেল, ঢেউয়ের সঙ্গে গড়িয়ে গেল। সেই সময়ে দুর্বাসার শাপে রাজার সেই আংটি শকুন্তলার চিকণ আঁচলের এককোণ থেকে অগাধ জলে পড়ে গেল, শকুন্তলা জানতেও পারলে না।

তারপর ভিজে কাপড়ে তীরে উঠে, কালো চুল এলো করে, হাসিমুখে শকুন্তলা বনের ভিতর দিয়ে রাজার কথা ভাবতে ভাবতে শূন্য আঁচল নিয়ে রাজপুরে চলে গেল, আংটির কথা মনেই পড়ল না।

রাজপুরে

দুর্বাসার শাপে রাজা শকুন্তলাকে একেবারে ভুলে বেশ সুখে আছেন। সাত ক্রোশ জুড়ে রাজার সাতমহল বাড়ি। তার এক এক মহলে এক এক রকম কাজ চলছে।

প্রথম মহলে রাজসভা—সেখানে সোনার থামে সোনার ছাদ, তার তলায় সোনার সিংহাসন; সেখানে দোষী-নির্দোষের বিচার চলছে।

তারপর, দেবমন্দির—সেখানে সোনার দেওয়ালে মানিকের পাখি, মুক্তোর ফল, পান্নার পাতা। মাঝখানে প্রকাণ্ড হোমকুণ্ড, সেখানে দিবারাত্রি হোম হচ্ছে। তারপর অতিথিশালা—সেখানে সোনার থালায় দু'সন্ধ্যা লক্ষ লক্ষ অতিথি খাচ্ছে।

তারপর নৃত্যশালা—সেখানে নাচ চলেছে, শানের উপর সোনার নূপুর রুনুঝুনু বাজছে, স্ফটিকের দেয়ালে অঙ্গের ছায়া তালে তালে নাচছে।

সঙ্গীতশালায় গান চলছে, সোনার পালঙ্কে পৃথিবীর রাজা রাজা দুষ্মন্ত বসে আছেন, দক্ষিণ দুয়ারি ঘরে দক্ষিণের বাতাস আসছে; শকুন্তলার কথা তাঁর মনেই নেই। হায়, দুর্বাসার শাপে, সুখের অন্তঃপুরে সোনার পালঙ্কে রাজা সব ভুলে রইলেন।

আর শকুন্তলা কত ঝড়-বৃষ্টিতে, কত পথ চলে, রাজার কাছে এল, রাজা চিনতেও পারলেন না; বললেন—'কন্যে, তুমি কেন এসেছ? কি চাও? টাকাকড়ি চাও, না, ঘরবাড়ি চাও? কি চাও?'

শকুন্তলা বললে—'মহারাজ, আমি টাকা চাই না, কড়িও চাই না, ঘর-বাড়ি কিছুই চাই না, আমি চাই তোমায়। তুমি আমার রাজা, আমার গলায় মালা দিয়েছ, আমি তোমায় চাই।'

রাজা বললেন—'ছি ছি, কন্যে, এ কি কথা! তুমি হলে বনবাসিনী তপস্বিনী, আমি হলেম রাজ্যেশ্বর মহারাজা, আমি তোমায় কেন মালা দেব? টাকা চাও টাকা নাও, ঘরবাড়ি চাও তাই নাও, গায়ের গহনা চাও তাও নাও। রাজ্যেশ্বরী হতে চাও—এ কেমন কথা?'

রাজার কথায় শকুন্তলার প্রাণ কেঁপে উঠল, কাঁদতে কাঁদতে বললে—'মহারাজ সে কি কথা! আমি যে সেই শকুন্তলা—আমায় ভুলে গেল? মনে নেই, মহারাজ, সেই মাধবীর বনে একদিন আমরা তিন সখীতে গুনগুন গল্প করছিলুম, এমন সময় তুমি অতিথি এলে; সখীরা তোমায় পা ধোবার জল দিলে, আমি আঁচলে ফল এনে দিলেম, তুমি হাসিমুখে তাই খেলে। তারপর একটা পদ্মপাতায় জল নিয়ে আমার হরিণশিশুকে খাওয়াতে গেলে, সে ছুটে

পালাল, তুমি কত ডাকলে, কত মিষ্টি কথা বললে কিছুতে এল না। তারপর আমি ডাকতেই আমার কাছে এল আমার হাতে জল খেল, তুমি আদর করে বললে—দুইজনেই বনের প্রাণী কিনা তাই এত ভাব!—শুনে সখীরা হেসে উঠল, আমি লজ্জায় মরে গেলাম। তারপর, মহারাজ, তুমি কতদিন তপস্বীর মতো সে বনে রইলে। বনের ফল খেয়ে, নদীর জল খেয়ে কতদিন কাটালে। তারপর একদিন পূর্ণিমা রাতে মালিনীর তীরে নিকুঞ্জবনে আমার কাছে এলে, আমার গলায় মালা দিলে—মহারাজ, সে কথা কি ভুলে গেলে?

'যাবার সময় তুমি মহারাজ, আমার হাতে তোমার আংটি পরিয়ে দিলে; প্রতিদিন তোমার নামের একটি করে অক্ষর পড়তে বলে দিলে, বলে গেলে—নামও শেষ হবে আর আমায় নিতে সোনার রথ পাঠাবে। কিন্তু মহারাজ, সোনার রথ কই পাঠালে, সব ভুলে রইলে? মহারাজ, এমনই করে কি কথা রাখলে?'

বনবাসিনী শকুন্তলা রাজার কাছে কত অভিমান করলে, রাজাকে কত অনুযোগ করলে, সেই কুঞ্জবনের কথা, সেই দুই সখীর কথা, সেই হরিণশিশুর কথা—কত কথাই মনে করিয়ে দিলে, তবু রাজার মনে পড়ল না। শেষে রাজা বললেন—'কই, কন্যা, দেখি তোমার সেই আংটি? তুমি যে বললে আমি তোমায় আংটি দিয়েছি, কই দেখাও দেখি কেমন আংটি?'

শকুন্তলা তাড়াতাড়ি আঁচল খুলে আংটি দেখাতে গেল, কিন্তু হায়, আঁচল শূন্য!

রাজার সেই সাতরাজার ধন এক মানিকের বরণ আংটি কোথায় গেল!

এতদিনে দুর্বাসার শাপ ফলল। হায়, রাজাও তার পর হলেন, পৃথিবীতে আপনার লোক কেউ রইল না!

'মা গো!'—বলে শকুন্তলা রাজসভায় শানের উপর ঘুরে পড়ল; তার কপাল ফুটে রক্ত ছুটল, রাজসভায় হাহাকার পড়ে গেল।

সেই সময় শকুন্তলার সেই পাষাণী মা মেনকা স্বর্গপুরে ইন্দ্রসভায় বীণা বাজিয়ে গান গাইছিল। হঠাৎ তার বীণার তার ছিঁড়ে গেল, গানের সুর হারিয়ে গেল, শকুন্তলার জন্য প্রাণ কেঁদে উঠল। অমনই সে বিদ্যুতের মতো মেঘের রথে এসে রাজার সভা থেকে শকুন্তলাকে কোলে তুলে একেবারে হেমকূট পর্বতে নিয়ে গেল।

সেই হেমকূট পর্বতে কশ্যপের আশ্রমে স্বর্গের অপ্সরাদের মাঝে কতদিনে শকুন্তলার একটি রাজচক্রবর্তী রাজকুমার হল।

সেই কোলভরা ছেলে পেয়ে শকুন্তলার বুক জুড়ল।

শকুন্তলা তো চলে গেল। এদিকে রাজবাড়ির জেলেরা একদিন শচীতীর্থের জলে জাল ফেলতে আরম্ভ করলে। রুপোলি রঙের সরলপুঁটি, চাঁদের মতো পায়রাচাঁদা, সাপের মতো বাণমাছ, দাড়াওয়ালা চিংড়ি, কাঁটাভরা বাটা, কত কি জালে পড়ল। সোনালি রুপোলি মাছে নদীর পাড় মাছের ঝুড়ি যেন সোনায় রুপোয় ভরে গেল। সারাদিন জেলেদের জালে কত রকমের কত যে মাছ পড়ল তার আর ঠিকানা নেই। শেষে ক্রমে বেলা পড়ে এল; নীল আকাশ, নদীর জল, নগরের পথ আঁধার হয়ে এল; জাল গুটিয়ে জেলেরা ঘরে চলল।

এমন সময় এক জেলে জাল ঘাড়ে নদীতীরে দেখা দিল। প্রকাণ্ড জালখানা মাথার উপর ঘুরিয়ে নদীর উপর উড়িয়ে দিলে; মেঘের মতো কালো জাল আকাশে ঘুরে, নদীর এ পার ও পার দু'পার জুড়ে জলে পড়ল। সেই সময় মাছের সর্দার, নদীর রাজা, বুড়ো মাছ রুই অন্ধকারে সন্ধ্যার সময় সেই নদী-ঘেরা কালো জালে ধরা পড়ল। জেলেপাড়ায় রব উঠল—জাল কাটবার গুরু, মাছের সর্দার, বুড়ো রুই এতদিনে জালে পড়েছে। যে যেখানে ছিল নদীতীরে ছুটে এল। তারপর অনেক কষ্টে মাছ ডাঙায় উঠল। এত বড় মাছ কেউ কখনও দেখেনি। আবার যখন সেই মাছের পেট চিরতে সাতরাজার ধন এক মানিকের আংটি জ্বলন্ত আগুনের মতো ঠিকরে পড়ল তখন সবাই অবাক হয়ে রইল। যার মাছ তার আনন্দের সীমা রইল না।

গরীব জেলে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলে। মাছের ঝুড়ি, ছেঁড়া জাল জলে ফেলে মানিকের আংটি সেকরার দোকানে বেচতে চলল। রাজা শকুন্তলাকে যে আংটি দিয়েছিলেন—এ সেই আংটি। শচীতীর্থে গা ধোবার সময় তাঁর আঁচল থেকে যখন জলে পড়ে যায় তখন রুইমাছটা খাবার ভেবে গিলে ফেলেছিল।

জেলের হাতে রাজার মোহর আংটি দেখে স্যাকরা কোটালকে খবর দিলে। কোটাল জেলেকে মারতে মারতে রাজসভায় হাজির করলে। বেচারা জেলে রাজদরবারে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে কেমন করে মাছের পেটে আংটি পেয়েছে নিবেদন করলে।

রাজমন্ত্রী দেখলেন সত্যিই আংটিতে মাছের গন্ধ। জেলে ছাড়া পেয়ে মোহরের তোড়া বখশিশ নিয়ে নাচতে নাচতে বাড়ি গেল।

এদিকে আংটি হাতে পড়তেই রাজার তপোবনের কথা সব মনে পড়ে গেল।

শকুন্তলার শোকে রাজা যেন পাগল হয়ে উঠলেন। বিনা দোষে তাকে দূর করে দিয়ে প্রাণ যেন তুষের আগুনে পুড়তে লাগল। মুখে অন্য কথা নেই, কেবল—'হা শকুন্তলা! হা শকুন্তলা!'

আহারে বিহারে, শয়নে, স্বপনে, কিছুতে সুখ নেই; রাজকার্যে সুখ নেই, অন্তঃপুরে সুখ নেই, উপবনে সুখ নেই—কোথাও সুখ নেই।

সঙ্গীতশালায় গান বন্ধ হল, নৃত্যশালায় নাচ বন্ধ হল, উপবনে উৎসব বন্ধ হল।

রাজার দুঃখের সীমা রইল না।

একদিকে বনবাসিনী শকুন্তলা কোলভরা ছেলে নিয়ে হেমকূটের সোনার শিখরে বসে রইল, আর একদিকে জগতের রাজা, রাজা দুষ্মন্ত জগৎজোড়া শোক নিয়ে ধূলায় ধূসর পড়ে রইলেন।

কতদিন পরে দেবতার কৃপা হল।

স্বর্গ থেকে ইন্দ্রদেবের রথ এসে রাজাকে দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে স্বর্গপুরে নিয়ে গেল। সেখানে নন্দনবনে কতদিন কাটিয়ে, দৈত্যদের সঙ্গে কত যুদ্ধ করে, মন্দারের মালা গলায় পরে, রাজা রাজ্যে ফিরলেন—এমন সময় দেখলেন, পথে হেমকূট পর্বত, মহর্ষি কশ্যপের আশ্রম। রাজা মহর্ষিকে প্রণাম করবার জন্য সেই আশ্রমে চললেন।



এই আশ্রমে অনেক তাপস, অনেক তপস্বিনী থাকতেন, অনেক অপ্সর, অনেক অপ্সরা থাকত। আর থাকত—শকুন্তলা আর তার পুত্র রাজপুত্র সর্বদমন।

রাজা দুষ্মন্ত যেমন দেশের রাজা ছিলেন, তাঁর সেই রাজপুত্র তেমনই বনের রাজা ছিল। বনের যত জীবজন্তু তাকে বড়ই ভালবাসত।

সেই বনে সাত ক্রোশ জুড়ে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল, তার তলায় একটা প্রকাণ্ড অজগর দিনরাত্রি পড়ে থাকত। এই গাছতলায় সর্বদমনের রাজসভা বসত।

হাতিরা তাকে মাথায় করে নদীতে নিয়ে যেত, শুঁড়ে করে জল ছিটিয়ে গা ধুইয়ে দিত, তারপর তাকে সেই সাপের পিঠে বসিয়ে দিত—এই তার রাজসিংহাসন। দু'দিকে দুই হাতি পদ্মফুলের চামর দোলাত, অজগর ফণা মেলে মাথায় ছাতা ধরত। ভালুক ছিল মন্ত্রী, সিংহ ছিল সেনাপতি, বাঘ চৌকিদার, শেয়াল ছিল কোটাল; আর ছিল—শুকপাখি তার প্রিয়সখা, কত মজার মজার কথা বলত, দেশ-বিদেশের গল্প করত। সে পাখির বাসায় পাখির ছানা নিয়ে খেলা করত, বাঘের বাসায় বাঘের কাছে বসে থাকত—কেউ তাকে কিছু বলত না। সবাই তাকে ভয়ও করত, ভালও বাসত।

রাজা যখন সেই বনে এলেন তখন রাজপুত্র একটা সিংহশিশুকে নিয়ে খেলা করছিল, তার মুখে হাত পুরে দাঁত গুনছিল, তাকে কোলে পিঠে করছিল, তার জটা ধরে টানছিল। বনের তপস্বিনীরা কত ছেড়ে দিতে বলছিলেন, কত মাটির ময়ূরের লোভ দেখাচ্ছিলেন, শিশু কিছুতেই শুনছিল না।

এমন সময় রাজা সেখানে এলেন, সিংহশিশুকে ছাড়িয়ে সেই রাজশিশুকে কোলে নিলেন; দুষ্ট শিশু রাজার কোলে শান্ত হল।

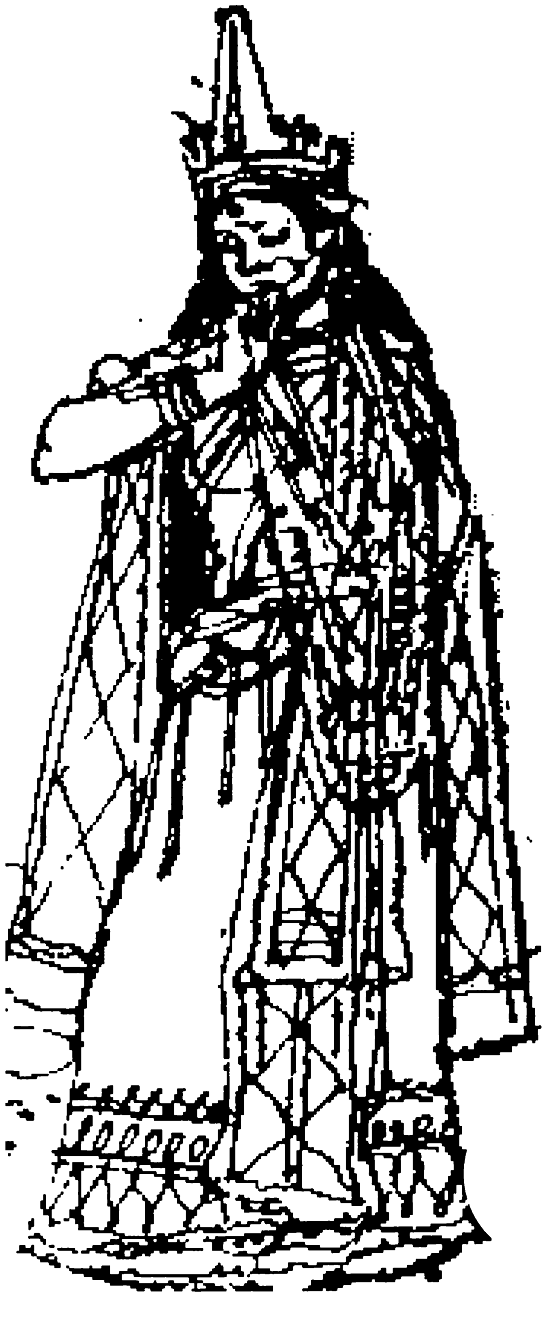
সেই রাজশিশুকে কোলে করে রাজার বুক যেন জুড়িয়ে গেল। রাজা তো জানেন না যে এ শিশু তাঁরই পুত্র। ভাবছেন—পরের ছেলেকে কোলে করে মন কেন এমন হল, এর উপর কেন এত মায়া হল?

এমন সময় শকুন্তলা অঞ্চলের নিধি কোলের বাছাকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে এলেন।

রাজারানিতে দেখা হল, রাজা আবার শকুন্তলাকে আদর করলেন, তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেন। দেবতার কৃপায় এতদিনে আবার মিলন হল, দুর্বাসার শাপান্ত হল। কশ্যপ অদিতিকে প্রণাম করে রাজারানি রাজপুত্র কোলে রাজ্যে ফিরলেন।

তারপর কতদিন সুখে রাজত্ব করে, রাজপুত্রকে রাজ্য দিয়ে, রাজারানি সেই তপোবনে তাত কণ্বের কাছে, সেই দুই সখীর কাছে, সেই হরিণশিশুর কাছে, সেই সহকার এবং মাধবীলতার কাছে ফিরে গেলেন এবং তাপস-তাপসীদের সঙ্গে সুখে জীবন কাটিয়ে দিলেন।

ক্ষীরের পুতুল



ক্ষীরের পুতুল

এক রাজার দুই রানি, দুয়ো আর সুয়ো। রাজবাড়িতে সুয়োরানির বড় আদর, বড় যত্ন। সুয়োরানি সাতমহল বাড়িতে থাকেন। সাতশো দাসী তাঁর সেবা করে, পা ধোয়ায়, আলতা পরায়, চুল বাঁধে। সাত মালঞ্চের সাত সাজি ফুল, সেই ফুলে সুয়োরানি মালা গাঁথেন। সাত সিন্দুক ভরা সাত রাজার ধন মানিকের গহনা, সেই গহনা অঙ্গে পরেন। সুয়োরানি রাজার প্রাণ।

আর দুয়োরানি—বড়োরানি, তাঁর বড় অনাদর, বড় অযত্ন। রাজা বিষ নয়নে দেখেন। একখানি ঘর দিয়েছেন—ভাঙাচোরা, এক দাসী দিয়েছেন—বোবা-কালা। পরতে দিয়েছেন জীর্ণ শাড়ি, শুতে দিয়েছেন—ছেঁড়া কাঁথা। দুয়োরানির ঘরে রাজা একটি দিন আসেন, একবার বসেন, একটি কথা কয়ে উঠে যান।

সুয়োরানি—ছোটোরানি, তাঁরই ঘরে রাজা বারমাস থাকেন।

একদিন রাজা রাজমন্ত্রীকে ডেকে বললেন—মন্ত্রী, দেশ-বিদেশ বেড়াতে যাব, তুমি জাহাজ সাজাও।

রাজার আজ্ঞায় রাজমন্ত্রী জাহাজ সাজাতে গেলেন। সাতখানা জাহাজ সাজাতে সাতমাস গেল। ছ'খানা জাহাজে রাজার চাকরবাকর যাবে, আর সোনার চাঁদোয়া ঢাকা সোনার জাহাজে রাজা নিজে যাবেন।

মন্ত্রী এসে খবর দিলেন—মহারাজ, জাহাজ প্রস্তুত।

রাজা বললেন—কাল যাব।

মন্ত্রী ঘরে গেলেন।

ছোটোরানি—সুয়োরানি রাজ-অন্তঃপুরে সোনার পালঙ্কে শুয়েছিলেন, সাতসখী সেবা করছিল, রাজা সেখানে গেলেন। সোনার পালঙ্কে মাথার শিয়রে বসে আদরের ছোটোরানিকে বললেন—রানি, দেশ-বিদেশ বেড়াতে যাব, তোমার জন্য কি আনব?

রানি ননীর হাতে হিরের চুড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বললেন—হিরের রঙ বড় সাদা হাত যেন শুধু দেখায়। রক্তের মতো রাঙা আট-আটগাছা মানিকের চুড়ি পাই তো পরি।

রাজা বললেন—আচ্ছা রানি, মানিকের দেশ থেকে মানিকের চুড়ি আনব।

রানি রাঙা পা নাচিয়ে নাচিয়ে, পায়ের নূপুর বাজিয়ে বাজিয়ে বললেন—এ নূপুর ভাল বাজে না। আগুনের বরণ নিরেট সোনার দশগাছা মল পাই তো পরি।

রাজা বললেন—সোনার দেশ থেকে তোমার পায়ের সোনার মল আনব।

রানি গলার গজমতি হার দেখিয়ে বললেন—দেখ রাজা, এ মুক্তো বড় ছোটো, শুনেছি কোন দেশে পায়রার ডিমের মতো মুক্তো আছে, তারই একছড়া হার এনো।

রাজা বললেন—সাগরের মাঝে মুক্তোর রাজ্য, সেখান থেকে গলার হার আনব। আর কি আনব রানি?

তখন আদরিনী সুয়োরানি সোনার অঙ্গে সোনার আঁচল টেনে বললেন—মা গো, শাড়ি নয়তো বোঝা! আকাশের মতো নীল, বাতাসের মতো ফুরফুরে, জলের মতো চিকন শাড়ি পাই তো পরে বাঁচি।

রাজা বললেন—আহা, আহা, তাই তো রানি, সোনার আঁচলে সোনার অঙ্গে ছড় লেগেছে, ননীর দেহে ব্যথা বেজেছে। রানি, হাসিমুখে বিদায় দাও, আকাশের মতো নীল, বাতাসের মতো ফুরেফুরে, জলের মতো চিকন শাড়ি আনিগে।

ছোটোরানি হাসিমুখে রাজাকে বিদায় করলেন।

রাজা বিদায় হয়ে জাহাজে চড়বেন—মনে পড়ল দুখিনী বড়োরানিকে।

দুয়োরানি—বড়োরানি, ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে কাঁদছেন, রাজা সেখানে এলেন।

ভাঙা ঘরের ভাঙা দুয়ারে দাঁড়িয়ে বললেন—বড়োরানি, আমি বিদেশ যাব। ছোটোরানির জন্যে হাতের বালা, গলার মালা, পায়ের মল, পরনের শাড়ি আনব। তোমার জন্যে কি আনব? বলে দাও যদি কিছু সাধ থাকে।

রানি বললেন—মহারাজ, ভালয় ভালয় তুমি ঘরে এলেই আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়। তুমি যখন আমার ছিলে তখন আমার সোহাগও অনেক ছিল, সাধও অনেক ছিল। সোনার শাড়ি অঙ্গে পরে সাতমহল বাড়িতে হাজার হাজার

আলো জ্বালিয়ে সাতশো সখীর মাঝে রানি হয়ে বসবার সাধ ছিল, সোনার পিঞ্জরে শুকশারির পায়ে সোনার নূপুর পরিয়ে দেবার সাধ ছিল। মহারাজ, অনেক সাধ ছিল, অনেক সাধ মিটেছে। এখন আর সোনার গহনায় সোনার শাড়িতে কী কাজ? মহারাজ, আমি কার সোহাগে হিরের বালা হাতে পরব? মোতির মালা গলায় দেব? মানিকের সিঁথি মাথায় বাঁধব? মহারাজ, সে দিন কি আর আছে! তুমি সোনার গহনা দেবে, সে সোহাগ তো ফিরে দেবে না! আমার সে সাতশো দাসী সাতমহল বাড়ি তো ফিরে দেবে না! বনের পাখি এনে দেবে, কিন্তু, মহারাজ, সোনার খাঁচা তো দেবে না! ভাঙা ঘরে সোনার গহনা চোর-ডাকাতে লুটে নেবে, ভাঙা খাঁচায় বনের পাখি কেন ধরা দেবে? মহারাজ, তুমি যাও, যাকে সোহাগ দিয়েছ তার সাধ মেটাও গে, ছাই সাধে আমার কাজ নেই।

রাজা বললেন—না রানি, তা হবে না, লোকে শুনলে নিন্দে করবে। বল তোমার কি সাধ?

রানি বললেন—কোন লাজে গহনার কথা মুখে আনব? মহারাজ, আমার জন্যে পোড়ারমুখ একটা বাঁদর এনো।

রাজা বললেন—আচ্ছা রানি, বিদায় দাও।

তখন বড়োরানি—দুয়োরানি ছেঁড়া কাঁথায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে রাজাকে বিদায় দিলেন। রাজা গিয়ে জাহাজে চড়লেন।

সন্ধ্যাবেলা সোনার জাহাজ সোনার পাল মেলে অগাধ সাগরের নীলজল কেটে সোনার মেঘের মতো পশ্চিম মুখে ভেসে গেল।

ভাঙাঘরে দুয়োরানি নীল সাগরের পারে চেয়ে, ছেঁড়া কাঁথায় পড়ে রইলেন। আর আদরিনী সুয়োরানি সাতমহল অন্তঃপুরে, সাতশো সখীর মাঝে, গহনার কথা ভাবতে ভাবতে, সোনার পিঞ্জরে সোনার পাখির গান শুনতে শুনতে সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাজাও জাহাজে চড়ে দুঃখিনী বড়োরানিকে ভুলে গেলেন। বিদায়ের দিনে ছোটোরানির সেই হাসিহাসি মুখ মনে পড়ে আর ভাবেন—এখন রানি কি করছেন? বোধহয় চুল বাঁধছেন। এবার রানি কি করছেন? বুঝি রাঙা পায়ে আলতা পরছেন। এবার রানি সাতমালঞ্চে ফুল তুলছেন, এবার বুঝি সাতমালঞ্চের সাতসাজি ফুলে রানি মালা গাঁথছেন আর আমার কথা ভাবছেন। ভাবতে ভাবতে বুঝি দুই চক্ষে জল এল, মালা আর গাঁথা হল না। সোনার সুতো, ফুলের সাজি পায়ের কাছে পড়ে রইল; বসে বসে সারারাত কেটে গেল, রানির চোখে ঘুম এল না।

সুয়োরানি—ছোটোরানি রাজার আদরিনী, রাজা তারই কথা ভাবেন। আর বড়োরানি রাজার জন্যে পাগল, তাঁর কথা একবার মনেও পড়ে না।

এমনি করে জাহাজে দেশ-বিদেশে রাজার বারোমাস কেটে গেল।

তেরোমাসে রাজার জাহাজ মানিকের দেশে এল।

মানিকের দেশে সকলই মানিক। ঘরের দেওয়াল মানিক, ঘাটের শান মানিক, পথের কাঁকর মানিক। রাজা সেই মানিকের দেশে সুয়োরানির চুড়ি গড়ালেন। আটহাজার মানিকের আটগাছি চুড়ি, পরলে মনে হয় গায়ের রক্ত ফুটে পড়ছে।

রাজা সেই মানিকের চুড়ি নিয়ে, সোনার দেশে এলেন। সেই সোনার দেশে স্যাকরার দোকানে নিরেট সোনার দশগাছা মল গড়ালেন। মল জ্বলতে লাগল যেন আগুনের ফিনকি, বাজতে লাগল যেন বীণার ঝঙ্কার—মন্দিরার রিনি-রিনি।

রাজা মানিকের দেশে মানিকের চুড়ি নিয়ে, সোনার দেশে সোনার মল গড়িয়ে, মুক্তোর রাজ্যে এলেন।

সে দেশে রাজার বাগানে দু'টি পায়রা। তাদের মুক্তোর পা, মানিকের ঠোঁট; পান্নার গাছে মুক্তোর ফল খেয়ে মুক্তোর ডিম পাড়ে। দেশের রানি সন্ধ্যাবেলা সেই মুক্তোর মালা গাঁথেন, রাতের বেলায় খোঁপায় পরেন, সকাল বেলায় ফেলে দেন।

দাসীরা সেই বাসি মুক্তোর হার এক জাহাজ রুপো নিয়ে বাজারে বেচে আসে।

রাজা এক জাহাজ রুপো দিয়ে সুয়োরানির গলায় দিতে সেই মুক্তোর একছড়া হার কিনলেন।

তারপর মানিকের চুড়ি নিয়ে, সোনার দেশে সোনার মল গড়িয়ে, মুক্তোর রাজ্যে মুক্তোর হার গাঁথিয়ে, ছ'মাস পরে রাজা এক দেশে এলেন। সে দেশে রাজকন্যের উপবনে নীল মানিকের গাছে নীল গুটিপোকা নীলকান্ত মণির পাতা খেয়ে, জলের মতো চিকন, বাতাসের মতো ফুরফুরে, আকাশের মতো নীল রেশমের গুটি বাঁধে। রাজার মেয়ে সারারাত ছাদে বসে, আকাশের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে, সেই নীল রেশমে শাড়ি বোনেন। একখানি শাড়ি বুনতে ছ'মাস

যায়। রাজকন্যে একটি দিন সেই আকাশের মতো নীল, বাতাসের মতো ফুরফুরে, জলের মতো চিকন শাড়ি পরে শিবের মন্দির মহাদেব নীলকণ্ঠের পূজা করেন। ঘরে এসে শাড়ি ছেড়ে দেন, দাসীরা যার কাছে সাত জাহাজ সোনা পায় তার কাছে শাড়ি বেচে। রাজা সাত জাহাজ সোনা দিয়ে আদরিনী সুয়োরানির শখের শাড়ি কিনলেন।

তারপর আর ছ'মাসে রাজার সাতখানা জাহাজ সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে ছোটোরানির মানিকের চুড়ি, সোনার মল, মুক্তোর মালা, সাধের শাড়ি নিয়ে দেশে এল। তখন রাজার মনে পড়ল বড়োরানি বাঁদর চেয়েছেন।

রাজা মন্ত্রীকে বললেন—মন্ত্রীবর, বড় ভুল হয়েছে। বড়োরানির বাঁদর আনা হয়নি, তুমি একটা বাঁদরের সন্ধানে যাও।

রাজমন্ত্রী একটা বাঁদরের সন্ধানে চলে গেলেন। আর রাজা শ্বেতহস্তী চড়ে লোকারণ্য রাজপথ দিয়ে, ছোটোরানির সাধের গহনা শখের শাড়ি নিয়ে অন্তঃপুরে চলে গেলেন।

ছোটোরানি সাতমহল বাড়ির সাততলার উপরে সোনার আয়না সামনে রেখে, সোনার কাঁকুইয়ে চুল চিরে, সোনার কাঁটা সোনার দড়ি দিয়ে খোঁপা বেঁধে সোনার চেয়াড়িতে সিঁদুর নিয়ে ভুরুর মাঝে টিপ পরছেন, কাজললতায় কাজল পেড়ে চোখের পাতায় কাজল পরছেন, রাঙা পায়ে আলতা দিচ্ছেন, সখীরা ফুলের থালা নিয়ে, পানের বাটা নিয়ে রাজরানি ছোটোরানির সেবা করছে—রাজা সেখানে এলেন।

স্ফটিকের সিংহাসনে রানির পাশে বসে বললেন—এই নাও, রানি! মানিকের দেশে মানিকের ঘাট, মানিকের বাট—সেখান থেকে হাতের চুড়ি এনেছি। সোনার দেশে সোনার ধুলো, সোনার বালি—সেখান থেকে পায়ের মল এনেছি। মুক্তোর রাজ্যে মুক্তোর পা, মানিকের ঠোঁট, দু'টি পাখি মুক্তোর ডিম পাড়ে। দেশের রানি সেই মুক্তোর হার গাঁথেন, রাতের বেলায় খোঁপায় পরেন, ভোরের বেলায় ফেলে দেন। রানি, তোমার জন্যে সেই মুক্তোর হার এনেছি। রানি, এক দেশে রাজার মেয়ে, এক-খী রেশমে সাত-খী সুতো কেটে নিশুতি রাতে ছাদে বসে ছ'টি মাসে



একখানি শাড়ি বোনেন, একদিন পরে পুজো করেন, ঘরে এসে ছেড়ে দেন। রানি, আমি সেই রাজার মেয়ের দেশ থেকে সাত জাহাজ সোনা দিয়ে রাজকন্যার হাতে বোনা শাড়ি এনেছি। তুমি একবার চেয়ে দেখ! পৃথিবী খুঁজে গায়ের গহনা, পরনের শাড়ি আনলুম, একবার পরে দেখ!

রানি তখন দু'হাতে আটগাছা চুড়ি পরলেন; মানিকের চুড়ি রানির হাতে ঢিলে হল, হাতের চুড়ি কাঁধে উঠল।

রানি তখন দু'পায়ে দশগাছা মল পরলেন; রাঙা পায়ে সোনার মল আলগা হল। দু'পা যেতে দশগাছা মল শানের উপর খসে পড়ল। রানি মুখ ভার করে মুক্তোর হার গলায় পরলেন; মুক্তোর দেশের মুক্তোর হার রানির গলায় খাটো হল, হার পরতে গলার মাস কেটে গেল। রানি ব্যথা পেলেন।

সাতপুরু করে শখের শাড়ি অঙ্গে পরলেন; নীল রেশমের নীল শাড়ি হাতে-বহরে কম পড়ল। রানির চোখে জল এল।

তখন মানিনী ছোটোরানি আট হাজার মানিকের আটগাছা চুড়ি খুলে ফেলে, নিরেট সোনার দশগাছা মল পায়ে ঠেলে, মুক্তোর মালা শখের শাড়ি ধুলোয় ফেলে বললেন—ছাই গহনা! ছাই এ শাড়ি! কোন পথের কাঁকর কুড়িয়ে এ চুড়ি গড়ালে? মহারাজ, কোন দেশের ধুলো বালিতে এ মল গড়ালে? ছি ছি, এ কার বাসি মুক্তোর বাসি হার! এ কোন রাজকন্যার পরা শাড়ি! দেখলে যে ঘৃণা আসে, পরতে যে লজ্জা হয়। নিয়ে যাও মহারাজ, এ পরা শাড়ি পরা গহনায় আমার কাজ নেই।

রানি অভিমানে গোসাঘরে খিল দিলেন। আর রাজা মলিনমুখে সাত জাহাজ সোনা দিয়ে কেনা সেই সাধের গহনা, শখের শাড়ি নিয়ে রাজসভায় এলেন।

রাজমন্ত্রী রাজসিংহাসনের একপাশে, রাজ্যের মাঠঘাট দোকানপাট সন্ধান করে, যাদুকরের দেশের এক বণিকের জাহাজ থেকে, কানাকড়ি দিয়ে একটি বাঁদরছানা কিনে বসে আছেন।

রাজা এসে বললেন—মন্ত্রীবর, আশ্চর্য হলুম! মাপ দিয়ে ছোটোরানির গায়ের গহনা, পরনের শাড়ি আনলুম, সে শাড়ি, সে গহনা, রানির গায়ে হল না!

তখন সেই বনের বানর রাজার পায়ে প্রণাম করে বলল—বড় ভাগ্যবতী পুণ্যবতী না হলে দেবকন্যের হাতে বোনা, নাগকন্যের হাতে গাঁথা, মায়ারাজ্যের এ মায়াগহনা, মায়াশাড়ি, পরতে পায় না। মহারাজ, রাজভাণ্ডারে তুলে রাখো, যাকে বউ করবে তাকে পরতে দিও।

বানরের কথায় রাজা অবাক হলেন। হাসতে হাসতে মন্ত্রীকে বললেন—মন্ত্রী, বানরটা বলে কি? ছেলেই হল না, বউ আনব কেমন করে? মন্ত্রী, স্যাকরার দোকানে ছোটোরানির নতুন গহনা গড়তে দাওগে, তাঁতির তাঁতে রানির শাড়ি বুনতে দাওগে। এ গহনা, এ শাড়ি, রাজভাণ্ডারে তুলে রাখ; যদি বউ ঘরে আনি তাকে পরতে দেব।

রাজমন্ত্রী স্যাকরার দোকানে ছোটোরানির নতুন গহনা গড়াতে গেলেন। আর রাজা সেই বাঁদর-কোলে বড়োরানির কাছে গেলেন।

দুঃখিনী বড়োরানি, জীর্ণ আঁচলে পা মুছিয়ে, ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় রাজাকে বসতে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—মহারাজ, বোসো। আমার এই ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় বোসো। আমার আর কী আছে তোমায় বসতে দেব? হায়, মহারাজ, কতদিন পরে তুমি ফিরে এলে, আমি এমনই অভাগিনী তোমার জন্যে ছেঁড়া কাঁথা পেতে দিলুম।

রানির কথায় রাজার চোখে জল এল। ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় বসে বড়োরানির কোলে বাঁদর ছানা দিয়ে বললেন—মহারানি, তোমার এ ছেঁড়া কাঁথা ভাঙা ঘর, ছোটোরানির সোনার সিংহাসন, সোনার ঘরের চেয়ে লক্ষগুণে ভাল। তোমার এ ভাঙা ঘরে আদর আছে, যত্ন আছে, দু'টো মিষ্টি কথা আছে; সেখানে তা তো নেই। রানি, সাত জাহাজ সোনা দিয়ে গায়ের গহনা, পরনের শাড়ি দিয়েছি, ছোটোরানি পায়ে ঠেলেছে; আর কানাকড়ি দিয়ে তোমার বাঁদর এনেছি, তুমি আদর করে কোলে নিয়েছ। রানি, আমি আর তোমায় দুঃখ দেব না। এখন বিদায় দাও, আমি আবার আসব রানি। কিন্তু দেখো, ছোটোরানি যেন জানতে না পারে। তোমার কাছে এসেছি শুনলে আর রক্ষে থাকবে না! হয় তোমায়, নয়তো আমায় বিষ খাওয়াবে।

রাজা বড়োরানিকে প্রবোধ দিয়ে গেলেন। আর বড়োরানি সেই ভাঙা ঘরে দুধকলা দিয়ে সেই বাঁদরের ছানা মানুষ করতে লাগলেন।

এমনি করে দিন যায়। ছোটোরানির সাতমহলে সাতশো দাসীর মাঝে দিন যায়; আর বড়োরানির ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় বাঁদর কোলে দিন যায়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চলে গেল। বড়োরানির যে দুঃখ সেই দুঃখই রইল, মোটা চালের ভাত, মোটা সুতোর শাড়ি আর ঘুচল না। বড়োরানি সেই ভাঙা ঘরে দুঃখের দুঃখী, সাথের সাথী বানর বানরকে কোলে নিয়ে, ছোটোরানির সাতমহল বাড়ি, সাতখানা ফুলের বাগানের দিকে চেয়ে চেয়ে কাঁদেন। বানর বড়োরানিকে যখন দেখে তখনই রানির চোখে জল, একটি দিন হাসতে দেখে না।

একদিন বানর বললে—হ্যাঁ মা, তুই কাঁদিস কেন? তোর কিসের দুঃখ? রাজবাড়ির দিকে চেয়ে চেয়ে কেন কাঁদিস, মা? ওখানে তোর কে আছে?

রানি বললেন—ওরে বাছা, ওখানে আমার সব আছে। আমার সাতমহল বাড়ি আছে, সাতশো দাসী আছে,

সাত সিন্দুক গহনা আছে, সাতখানা মালঞ্চ আছে। আর বাছা, ওই সাতমহল বাড়িতে রাজার ছোটোরানি আমার এক সতীন আছে। সেই রাক্ষসী আমার রাজাকে যাদু করে আমার সাতমহল বাড়ি, সাতশো দাসী, সাত সিন্দুক গহনা কেড়ে নিয়ে ওই ফুলের মালঞ্চে সোনার মন্দিরে সুখে আছে; আমার সর্বস্বধন রাজাকে নিয়ে আমায় পথের কাঙালিনী করেছে। ওরে বাছা, আমার কিসের দুঃখ! আমি রাজার মেয়ে ছিলুম, রাজার বউ হলুম। সাতশো দাসী পেলুম, সাতমহল বাড়ি পেলুম, মনের মতো রাজস্বামী পেলুম। সব পেলুম, তবু কে জানে কার অভিশাপে, চিরদিনে পেলুম না কেবল রাজার কোলে দিতে সোনারচাঁদ রাজপুত্র! হায়, কত জন্মে কত পাপ করেছি, কত লোকের কত সাধে বাদ সেধেছি, কত মায়ের প্রাণে ব্যথা দিয়েছি, তাই এ জন্মে সোনার সংসার সতীনকে দিয়ে, রানির গরবে, স্বামীর সোহাগে, রাজপুত্রের আশায় ছাই দিয়ে পথের কাঙালিনি হয়েছি! বাছারে, বড় পাষাণী তাই এতদিন এত অপমান, এত যন্ত্রণা বুকে সয়ে বেঁচে আছি!

দুঃখের কথা বলতে বলতে রানির চক্ষের জলে বুক ভেসে গেল। তখন সেই বনের বানর রানির কোলে উঠে বসে চোখের জল মুছে দিয়ে রানিকে বললে—মা, তুই কাঁদিসনে। আমি তোর দুঃখ ঘোচাব, তোর সাতমহল বাড়ি দেব, সাতখানা মালঞ্চ দেব, সাতশ দাসী ফিরে দেব, তোকে সোনার মন্দিরে রাজার পাশে রানি করে কোলে নিতে সোনার চাঁদ ছেলে দেব তবে আমার নাম বাঁদর। আমি যা বলি যদি তা করতে পারিস তবে তোর রাজবাড়িতে যেমন ঐশ্বর্য যেমন আদর ছিল তেমনই হবে।

বানরের কথায় রানির চোখের কোণে জল, ঠোঁটের কোণে হাসি এল। রানি কেঁদে কেঁদে হেসে বললেন—ওরে বাছা, দেবতার মন্দিরে কত বলি দিয়েছি, তীর্থে তীর্থে কত না পুজো দিয়েছি, তবু একটি রাজপুত্র কোলে পাইনি। তুই কি তপস্যা করে, কোন দেবতার বরে, বনের বানর হয়ে আমাকে রাজরানি করে রাজপুত্র কোলে এনে দিবি? বাছা থাক, আমার রাজা সুখে থাক, আমার সতীন সুখে থাক,—আমার যে দুঃখ সেই দুঃখই থাক, তোর এ অসাধ্য সাধনে কাজ নেই। রাত হল তুই ঘুম যা।

বানর বললে—না মা, আমার কথা না শুনলে ঘুম যাব না।

রানি বললেন—ওরে তুই ঘুমো, রাত যে অনেক হল! পুব-পশ্চিমে মেঘ উঠল, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এল, রাজ্যজুড়ে ঘুম এল, তুই আমার ঘুমো। কাল যা বলবি তাই শুনব, আজ তুই ঘুম যা। ভাঙা ঘরে দ্বার দিয়েছি—ঝড় উঠেছে, ঘরের মাঝে কাঁথা পেতেছি—শীত লেগেছে, তুই দুধের বাছা, আমার কোলে, বুকের কাছে, ঘুম যা।

বানর রানির বুকে মাথা রেখে ঘুম গেল। রানি ছেঁড়া কাঁথায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন।

এমনি করে রাত কাটল। ছোটোরানির সোনার পালঙ্কে, ফুলের বিছানায়, রাজার পাশে রাত কাটল; আর বড়োরানির জলে ঝড়ে, ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় রাত কাটল।

সকাল হল। রাজবাড়িতে প্রহরীখানায় প্রহর বাজল, নাকরাখানায় নবৎ বাজল, রাজারানির ঘুম ভাঙল।

রাজা সোনার ভৃঙ্গারে স্ফটিকজলে মুখ ধুয়ে, রাজবেশ অঙ্গে পরে, রাজ দরবারে নেবে গেলেন। আর ছোটোরানি সোনার পালঙ্কে, ফুলের বিছানায়, ফুলের পাখায় হাওয়া খেতে খেতে পাশ ফিরে ঘুম গেলেন।

আর বড়োরানি কি করলেন?

ভাঙাঘরে সোনার রোদ মুখে পড়ল, রানি উঠে বসলেন। এ দিক দেখলেন ও দিক দেখলেন, এ পাশ দেখলেন, ও পাশ দেখলেন—বানর নেই! রানি এ ঘর খুঁজলেন ও ঘর খুঁজলেন, ঘরের চাল খুঁজলেন, গাছের ডাল খুঁজলেন—বানর নেই! বড়োরানি কাঁদতে লাগলেন।

বানর কোথা গেল?

বানর ভাঙা ঘরে ঘুমন্ত রানিকে একলা রেখে রাত না পোহাতে রাজ দরবারে চলে গেল।

রাজা বার দিয়ে দরবারে বসেছেন। চারদিকে সভাসদ মন্ত্রী, দুয়ারে সিপাই-সান্ত্রী, আশেপাশে লোকের ভিড়। রানির বানর সেই লোকের ভিড় ঠেলে সিপাই-সান্ত্রীর হাত এড়িয়ে, রাজার পায়ে প্রণাম করে বললে—মহারাজ, বড় সুখবর এনেছি, মায়ের আমার ছেলে হবে।

রাজা বললেন—ওরে বানর বলিস কি? এ কথা কি সত্যি? বড়োরানি দুয়োরানি তার ছেলে হবে? দেখিস, এ কথা যদি মিথ্যা হয় তো তোকেও কাটব আর তোর মা দুয়োরানিকেও কাটব।

বানর বললে—মহারাজ, সে ভাবনা আমার, এখন আমার খুশি কর, আমি বিদায় হই।

রাজা গলার গজমোতি হার খুলে দিয়ে বানরকে বিদায় করলেন।

সাত সিন্দুক গহনা আছে, সাতখানা মালঞ্চ আছে। আর বাছা, ওই সাতমহল বাড়িতে রাজার ছোটোরানি আমার এক সতীন আছে। সেই রাক্ষসী আমার রাজাকে যাদু করে আমার সাতমহল বাড়ি, সাতশো দাসী, সাত সিন্দুক গহনা কেড়ে নিয়ে ওই ফুলের মালঞ্চে সোনার মন্দিরে সুখে আছে; আমার সর্বস্বধন রাজাকে নিয়ে আমায় পথের কাঙালিনী করেছে। ওরে বাছা, আমার কিসের দুঃখ! আমি রাজার মেয়ে ছিলুম, রাজার বউ হলুম। সাতশো দাসী পেলুম, সাতমহল বাড়ি পেলুম, মনের মতো রাজস্বামী পেলুম। সব পেলুম, তবু কে জানে কার অভিশাপে, চিরদিনে পেলুম না কেবল রাজার কোলে দিতে সোনারচাঁদ রাজপুত্র! হায়, কত জন্মে কত পাপ করেছি, কত লোকের কত সাধে বাদ সেধেছি, কত মায়ের প্রাণে ব্যথা দিয়েছি, তাই এ জন্মে সোনার সংসার সতীনকে দিয়ে, রানির গরবে, স্বামীর সোহাগে, রাজপুত্রের আশায় ছাই দিয়ে পথের কাঙালিনি হয়েছি! বাছারে, বড় পাষাণী তাই এতদিন এত অপমান, এত যন্ত্রণা বুকে সয়ে বেঁচে আছি!

দুঃখের কথা বলতে বলতে রানির চক্ষের জলে বুক ভেসে গেল। তখন সেই বনের বানর রানির কোলে উঠে বসে চোখের জল মুছে দিয়ে রানিকে বললে—মা, তুই কাঁদিসনে। আমি তোর দুঃখ ঘোচাব, তোর সাতমহল বাড়ি দেব, সাতখানা মালঞ্চ দেব, সাতশ দাসী ফিরে দেব, তোকে সোনার মন্দিরে রাজার পাশে রানি করে কোলে নিতে সোনার চাঁদ ছেলে দেব তবে আমার নাম বাঁদর। আমি যা বলি যদি তা করতে পারিস তবে তোর রাজবাড়িতে যেমন ঐশ্বর্য যেমন আদর ছিল তেমনই হবে।

বানরের কথায় রানির চোখের কোণে জল, ঠোঁটের কোণে হাসি এল। রানি কেঁদে কেঁদে হেসে বললেন—ওরে বাছা, দেবতার মন্দিরে কত বলি দিয়েছি, তীর্থে তীর্থে কত না পুজো দিয়েছি, তবু একটি রাজপুত্র কোলে পাইনি। তুই কি তপস্যা করে, কোন দেবতার বরে, বনের বানর হয়ে আমাকে রাজরানি করে রাজপুত্র কোলে এনে দিবি? বাছা থাক, আমার রাজা সুখে থাক, আমার সতীন সুখে থাক,—আমার যে দুঃখ সেই দুঃখই থাক, তোর এ অসাধ্য সাধনে কাজ নেই। রাত হল তুই ঘুম যা।

বানর বললে—না মা, আমার কথা না শুনলে ঘুম যাব না।

রানি বললেন—ওরে তুই ঘুমো, রাত যে অনেক হল! পুব-পশ্চিমে মেঘ উঠল, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এল, রাজ্যজুড়ে ঘুম এল, তুই আমার ঘুমো। কাল যা বলবি তাই শুনব, আজ তুই ঘুম যা। ভাঙা ঘরে দ্বার দিয়েছি—ঝড় উঠেছে, ঘরের মাঝে কাঁথা পেতেছি—শীত লেগেছে, তুই দুধের বাছা, আমার কোলে, বুকের কাছে, ঘুম যা।

বানর রানির বুকে মাথা রেখে ঘুম গেল। রানি ছেঁড়া কাঁথায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন।

এমনি করে রাত কাটল। ছোটোরানির সোনার পালঙ্কে, ফুলের বিছানায়, রাজার পাশে রাত কাটল; আর বড়োরানির জলে ঝড়ে, ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় রাত কাটল।

সকাল হল। রাজবাড়িতে প্রহরীখানায় প্রহর বাজল, নাকরাখানায় নবৎ বাজল, রাজারানির ঘুম ভাঙল।

রাজা সোনার ভৃঙ্গারে স্ফটিকজলে মুখ ধুয়ে, রাজবেশ অঙ্গে পরে, রাজ দরবারে নেবে গেলেন। আর ছোটোরানি সোনার পালঙ্কে, ফুলের বিছানায়, ফুলের পাখায় হাওয়া খেতে খেতে পাশ ফিরে ঘুম গেলেন।

আর বড়োরানি কি করলেন?

ভাঙাঘরে সোনার রোদ মুখে পড়ল, রানি উঠে বসলেন। এ দিক দেখলেন ও দিক দেখলেন, এ পাশ দেখলেন, ও পাশ দেখলেন—বানর নেই! রানি এ ঘর খুঁজলেন ও ঘর খুঁজলেন, ঘরের চাল খুঁজলেন, গাছের ডাল খুঁজলেন—বানর নেই! বড়োরানি কাঁদতে লাগলেন।

বানর কোথা গেল?

বানর ভাঙা ঘরে ঘুমন্ত রানিকে একলা রেখে রাত না পোহাতে রাজ দরবারে চলে গেল।

রাজা বার দিয়ে দরবারে বসেছেন। চারদিকে সভাসদ মন্ত্রী, দুয়ারে সিপাই-সান্ত্রী, আশেপাশে লোকের ভিড়। রানির বানর সেই লোকের ভিড় ঠেলে সিপাই-সান্ত্রীর হাত এড়িয়ে, রাজার পায়ে প্রণাম করে বললে—মহারাজ, বড় সুখবর এনেছি, মায়ের আমার ছেলে হবে।

রাজা বললেন—ওরে বানর বলিস কি? এ কথা কি সত্যি? বড়োরানি দুয়োরানি তার ছেলে হবে? দেখিস, এ কথা যদি মিথ্যা হয় তো তোকেও কাটব আর তোর মা দুয়োরানিকেও কাটব।

বানর বললে—মহারাজ, সে ভাবনা আমার, এখন আমার খুশি কর, আমি বিদায় হই।

রাজা গলার গজমোতি হার খুলে দিয়ে বানরকে বিদায় করলেন।

বানর নাচতে নাচতে ভাঙা ঘরে দুয়োরানি পড়ে পড়ে কাঁদছেন—সেখানে গেল।

দুয়োরানির চোখের জল, গায়ের ধুলো মুছিয়ে বানর বললে—এই দেখ মা, তোর জন্যে কি এনেছি! তুই রাজার রানি, গলায় দিতে হার পাসনে, কাঠের মালা কিনে পরিস, এই মুক্তোর মালা পর!

রানি বানরের হাতে গজমোতি হার দেখে বললেন—এই হার তুই কোথা পেলি? এ যে রাজার গলার গজমোতি হার! যখন রানি ছিলুম রাজার জন্যে গেঁথেছিলুম, তুই এ হার কোথা পেলি? বল বানর, রাজা কি এ হার ফেলে দিয়েছেন, রাজপথে কি কুড়িয়ে পেলি?

বানর বললে—না মা, কুড়িয়ে পাইনি। তোর হাতে গাঁথা রাজার গলার গজমোতি হার কুড়িয়ে কি পাওয়া যায়?

রানি বললেন—তবে কি রাজার ঘরে চুরি করলি?

বানর বললে—ছি ছি মা, চুরি কি করতে আছে! আজ রাজাকে সুখবর দিয়েছি তাই রাজা হার দিয়ে খুশি করেছেন।



রানি বললেন—ওরে বাছা, তুই যে দুঃখীর সন্তান, বনের বানর! ভাঙা ঘরে দুঃখিনির কোলে শুয়ে, রাজাকে দিতে কি সুখের সন্ধান পেলি যে রাত না পোহাতে রাজবাড়িতে ছুটে গেলি?

বানর বললে—মা আমি স্বপ্ন পেয়েছি আমার যেন ভাই হয়েছে, তোর কোলে খোকা হয়েছে; সেই খোকা যেন রাজসিংহাসনে রাজা হয়েছে। তাই ছুটে রাজাকে খবর দিলুম—রাজামশায়, মায়ের খোকা হবে। তাইতে রাজা খুশি হয়ে গলার হার খুলে দিলেন।

রানি বললেন—ওরে রাজা আজ শুনলেন ছেলে হবে, কাল শুনবেন মিছে কথা! আজ রাজা গলায় দিতে হার দিলেন, কাল যে মাথা নিতে হুকুম দেবেন! হায় হায়, কী করলি? একমুঠো খেতে পাই, একপাশে পড়ে থাকি, তবু বছর গেলে রাজার দেখা পাই, তুই আমার তাও ঘোচালি? ওরে তুই কি সর্বনাশ করলি? মিছে খবর কেন রটালি? এ জঞ্জাল কেন ঘটালি?

বানর বললে—মা তোর ভয় কি, ভাবিস কেন? এ দশমাস চুপ করে থাক। সবাই জানুক—বড়োরানির ছেলে হবে। তারপর রাজা যখন ছেলে দেখবেন তখন তোর কোলে সোনারচাঁদ ছেলে দেব, তুই রাজাকে দেখাস। এখন চল, বেলা হল, খিদে পেয়েছে।

রানি বললেন—চল বাছা চল। বাটি পুরে জল রেখেছি, গাছের ফল এনেছি, খাবি চল।

রানি ভাঙা পিঁড়েয় বানরকে খাওয়াতে বসলেন।

আর রাজা ছোটোরানির ঘরে গেলেন।

ছোটোরানি কুস্বপ্ন দেখে জেগে উঠে সোনার পালঙ্কে বসে বসে ভাবছেন, এমন সময় রাজা এসে খবর দিলেন—আরে শুনেছ ছোটোরানি, বড়োরানির ছেলে হবে! বড় ভাবনা ছিল রাজসিংহাসন কাকে দেব, এতদিনে সে ভাবনা ঘুচল। যদি ছেলে হয় তাকে রাজা করব, আর যদি মেয়ে হয়, তবে তার বিয়ে দিয়ে জামাইকে রাজ্য দেব। রানি, বড় ভাবনা ছিল, এতদিনে নিশ্চিন্ত হলুম।

রানি বললেন—পারিনে বাপু, আপনার জ্বালায় বাঁচিনে, পরের ভাবনা!

রাজা বললেন—সে কি রানি? এমন সুখের দিনে এমন কথা বলতে হয়? রাজপুত্র কোলে পাব, রাজসিংহাসনে রাজা করব, এ কথা শুনে মুখভার করে? রানি, রাজবাড়িতে সবার মুখে হাসি, তুমি কেন অকল্যাণ কর?

রানি বললেন—আর পারিনে! কার ছেলে রাজা হবে, কার মেয়ে রাজ্য পাবে, কে রাজসিংহাসনে বসবে, এত ভাবনা ভাবতে পারিনে। নিজের জ্বালায় মরি, পরের ছেলে মোলো বাঁচল তার খবর রাখিনে। বাবারে, সকালবেলা বকে বকে ঘুম হল না, মাথা ধরল; যাই নেয়ে আসি।

রাগভরে ছোটোরানি আটগাছা চুড়ি, দশগাছা মল ঝমঝমিয়ে একদিকে চলে গেলেন।

রাজার বড় রাগ হল, রাজকুমারকে ছোটোরানি মর বললে। রাজা মুখ আঁধার করে বারমহলে চলে এলেন। রাজা-রানিতে ঝগড়া হল। রাজা আর ছোটোরানির মুখ দেখলেন না, বড়োরানির ঘরেও গেলেন না—ছোটোরানি শুনে যদি বিষ খাওয়ায়, বড়োরানিকে প্রাণে মারে! রাজা বারমহলে একলা রইলেন।

একমাস গেল, দু'মাস গেল, দু'মাস গিয়ে তিনমাস গেল, রাজা-রানির ভাব হল না। ঝগড়ায় ঝগড়ায় চার মাস কাটল। পাঁচ মাসে দুয়োরানির পোষা বানর রাজার সঙ্গে দেখা করলে। রাজা বললেন—কি হে বানর, খবর কি?

বানর বললে—মহারাজ, মায়ের বড় দুঃখ! মোটা চালের ভাত মুখে রোচে না, মা আমার না খেয়ে কাহিল হলেন।

রাজা বললেন—এ কথা তো আমি জানিনে। মন্ত্রীবর, যাও এখনই সরু চালের ভাত, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন, সোনার থালে সোনার বাটিতে বড়োরানিকে পাঠিয়ে দাও। আজ থেকে আমি যা খাই বড়োরানিও তাই খাবেন। যাও মন্ত্রী, বানরকে হাজার মোহর দিয়ে বিদায় কর।

মন্ত্রী বানরকে বিদায় করে রান্নাঘরে এলেন। আর রানির বানর মোহরের তোড়া নিয়ে রানির কাছে এল।

রানি বললেন—আজ আবার কোথা ছিলি? এতখানি বেলা হল নাইতে পেলুম না, রাঁধব কখন, খাব কখন?

বানর বললে—মা আর তোকে রাঁধতে হবে না। রাজবাড়ি থেকে সোনার থালায় সোনার বাটিতে সরু চালের ভাত, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন আসবে, তাড়াতাড়ি নেয়ে আয়।

রানি নাইতে গেলেন। বানর একমুঠো মোহর নিয়ে বাজারে গেল। ষোল থান মোহরে ষোল ঘরামি নিলে, ষোল গাড়ি খড় নিলে, ষোলশ বাঁশ নিলে। সেই ষোলশ বাঁশ দিয়ে, ষোল গাড়ি খড় দিয়ে, ষোলজন ঘরামি খাটিয়ে, চক্ষের নিমেষে দুওরানির বানর ভাঙাঘর নতুন করলে। শোবার ঘরে নতুন কাঁথা পাতলে, খাবার ঘরে নতুন পিঁড়ি পাতলে, রাজবাড়ির ষোল বামুনে রানির ভাত নিয়ে এল; ষোল মোহর বিদায় পেলে।

দুয়োরানি নেয়ে এলেন। এসে দেখলেন—ঘর নতুন! ঘরের চাল নতুন! চালের খড় নতুন! মেঝেয় নতুন কাঁথা! আলনায় নতুন শাড়ি! রানি অবাক হলেন। বানরকে বললেন—বাছা, ভাঙা ঘর দেখে ঘাটে গেলুম, এসে দেখি নতুন ঘর! কেমন করে হল?

বানর বললে—মা, রাজামশায় মোহর দিয়েছেন। সেই মোহরে ভাঙা ঘর নতুন করেছি, ছেঁড়া কাঁথা নতুন করেছি, নতুন পিঁড়ে পেতেছি, তুই সোনার থালে গরম ভাত, সোনার বাটিতে তপ্ত দুধ খাবি চল।

রানি খেতে বসলেন। কত দিন পরে সোনার থালায় ভাত খেলেন, সোনার ঘটিতে মুখ ধুলেন, সোনার বাটায় পান খেলেন, তবু মনে সুখ পেলেন না। রানি রাজভোগ খান আর ভাবেন—আজ রাজা সোনার থালে ভাত পাঠালেন, কাল হয়তো মশানে নিয়ে মাথা কাটবেন।

এমনি করে ভয়ে ভয়ে একমাস, দু'মাস, তিনমাস গেল। বড়োরানির নতুন ঘর পুরনো হল, ঘরের চাল ফুটো হল, চালের খড় উড়ে গেল। বানর রাজার সঙ্গে দেখা করলে।

রাজা বললেন—কি বানর, কি মনে করে?

বানর বললে—মহারাজ, ভয়ে কব না নির্ভয়ে কব?

রাজা বললেন—নির্ভয়ে কও।

বানর বললে—মহারাজ, ভাঙা ঘরে মা আমার বড় দুঃখ পান। ঘরের দুয়োর ফাটা, চালে খড় নেই, শীতে হিম ঘরে আসে। মা আমার গায়ে দিতে লেপ পান না, আগুন জ্বালতে কাঠ পান না, সারা রাত শীতে কাঁপেন।

রাজা বললেন—তাইতো! তাইতো! এ কথা বলতে হয়, বানর তোর মাকে রাজবাড়িতে নিয়ে আয়, আমি মহল সাজাতে বলি।

বানর বললে—মহারাজ, মাকে আনতে ভয় হয়, ছোটোরানি বিষ খাওয়াবে।

রাজা বললেন—সে ভয় নেই। নতুন মহলে রানিকে রাখব, মহল ঘিরে গড় কাটাব, গড়ের দুয়ারে পাহারা বসাব, ছোটোরানি আসতে পাবে না। সে মহলে বড়োরানি থাকবেন, বড়োরানির বোবাকালা দাই থাকবে, আর বড়োরানির পোষা ছেলে তুই থাকবি।

বানর বললে—মহারাজ, যাই তবে মাকে আনি।

রাজা বললেন—যাও মন্ত্রী, মহল সাজাও গে।

মন্ত্রী লক্ষ লক্ষ লোক লাগিয়ে একদিনে বড়োরানির নতুন মহল সাজালেন।

দুয়োরানি ভাঙা ঘর ছেড়ে, ছেঁড়া কাঁথা ছেড়ে, সোনার শাড়ি পরে নতুন মহলে এলেন। সোনার পালঙ্কে বসলেন, সোনার থালে ভাত খেলেন, দীনদুঃখীকে দান দিলেন, রাজ্যে জয় জয় হল; রাগে ছোটোরানির সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল।

ডাকিনী ব্রাহ্মণী—ছোটোরানির 'মনের কথা', প্রাণের বন্ধু। ছোটোরানি বলে পাঠালেন—মনের কথাকে আসতে বল, কথা আছে।

রানি ডেকেছেন—ডাকিনী বুড়ি তাড়াতাড়ি চলে এল।

রানি বললেন—এসো ভাই, মনের কথা, কেমন আছ? কাছে বোসো।

ডাকিনী ব্রাহ্মণী ছোটোরানির পাশে বসে বললে—কেন ভাই, ডেকেছ কেন? মুখখানি ভার ভার, চোখের কোণে জল, হয়েছে কি?

রানি বললেন—হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু! সতীন আবার ঘরে ঢুকেছে, সে সোনার শাড়ি পরেছে, নতুন



মহল পেয়েছে, রাজার প্রেয়সী রানি হয়েছে! ভিখারিনি দুয়োরানি এতদিনে সুয়োরানির রানি হয়ে রাজমহল জুড়ে বসেছে! বামুন সই, দেখে অঙ্গ জ্বলে গেল, আমায় বিষ দে খেয়ে মরি, সতীনের এ আদর প্রাণে সয় না!

ব্রাহ্মণী বললে—ছি! ছি! সই। ও কথা কি মুখে আনে? কোন দুঃখে বিষ খাবে? দুয়োরানি আজ রানি হয়েছে, কাল ভিখারিনী হবে তুমি যেমন সুয়োরানি তেমনই থাকবে।

সুয়োরানি বললে—না ভাই বাঁচতে আর সাধ নেই। আজ বাদে কাল দুয়োরানির ছেলে হবে, সে ছেলে রাজ্য

পাবে! লোকে বলবে আহা, দুয়োরানি রত্নগর্ভা, রাজার মা হল! আর দেখ না, পোড়ামুখী সুয়োরানি মহারাজার সুয়োরানি হল, তবু রাজার কোলে দিতে ছেলে পেলে না! ছি! ছি! অমন অভাগীর মুখ দেখে না, নাম করলে সারা দিন উপোস যায়! ভাই, এ গঞ্জনা প্রাণে সবে না। তুই বিষ দে, হয় আমি খাই, নয়তো সতীনকে খাওয়াই।

ব্রাহ্মণী বললে—চুপ কর রানি, কে কোন দিকে শুনতে পাবে। ভাবনা কি? চুপি চুপি বিষ এনে দেব, দুয়োরানিকে খেতে দিও। এখন বিদায় দাও, বিষের সন্ধানে যাই।

রানি বললেন—যাও ভাই। কিন্তু দেখো, বিষ যেন আসল হয়, খেতে না খেতে বড়োরানি ঘুরে পড়বে।

ডাকিনী বললে—ভয় নেই গো, ভয় নেই! আজ বাদে কাল বড়োরানিকে বিষ খাওয়াব, জন্মের মতো মা হবার সাধ ঘোচাব, তুমি নির্ভয়ে থাক।

ডাকিনী বিষের সন্ধানে গেল। বনে বনে খুঁজে খুঁজে ভর সন্ধ্যাবেলা ঝোপের আড়ালে ঘুমন্ত সাপকে মন্ত্রে বশ করে, তার মুখ থেকে কালকূট বিষ এনে দিল।

ছোটোরানি সেই বিষে মুগের নাড়ু, ক্ষীরের ছাঁচ, মতিচুর মেঠাই গড়ালেন। একখানা থালা সাজিয়ে ডাকিনী ব্রাহ্মণীকে বললেন—ভাই এক কাজ কর, এই বিষের নাড়ু বড়োরানিকে বেচে আয়।

ব্রাহ্মণী থালা হাতে বড়োরানির নতুন মহলে গেল।

বড়োরানি বললেন—আয় লো আয়, এতদিন কোথায় ছিলি? দুয়োরানি বলে কি ভুলে থাকতে হয়?

ডাকিনী বললে—সে কি গো! তোমাদের খাই, তোমাদের পরি, তোমাদের কি ভুলতে পারি? এই দেখ, তোমার জন্যে যতন করে মুগের নাড়ু, ক্ষীরের ছাঁচ, মতিচুর মেঠাই এনেছি।

রানি দেখলেন, বুড়ি ব্রাহ্মণী বড় যত্ন করে, থালা সাজিয়ে সামগ্রী এনেছে। খুশি হয়ে তার দু'হাতে দু'মুঠো মোহর দিয়ে বিদায় করলেন, ব্রাহ্মণী হাসতে হাসতে চলে গেল।

রানি ক্ষীরের ছাঁচ ভেঙে খেলেন, জিবের স্বাদ গেল। মুগের নাড়ু মুখে দিলেন, গলা কাঠ হল। মতিচুর মেঠাই খেলেন, বুক যেন জ্বলে গেল। বানরকে ডেকে বললেন—ব্রাহ্মণী আমায় কি খাওয়ালে! গা কেমন করছে, বুঝি আর বাঁচব না।

বানর বললে—চল মা, খাটে শুবি, অসুখ সারবে।

রানি উঠে দাঁড়ালেন, সাপের বিষ মাথায় উঠল। রানি চোখে আঁধার দেখলেন, মাথা টলে গেল, সোনার প্রতিমা শানের উপর ঘুরে পড়লেন।

বানর রানির মাথা কোলে নিলে, হাত ধরে নাড়ি দেখলে, চোখের পাতা খুলে চোখ দেখলে—রানি অজ্ঞান, অসাড়!

বানর সোনার প্রতিমা বড়োরানিকে সোনার খাটে শুইয়ে দিয়ে ওষুধের সন্ধানে বনে ছুটে গেল। বন থেকে কে জানে কি লতাপাতা, কোন গাছের কি শিকড় এনে নতুন শিলে বেটে বড়োরানিকে খাওয়াতে লাগল।

রাজবাড়িতে খবর গেল—বড়োরানি বিষ খেয়েছেন। রাজা উঠতে-পড়তে রানির মহলে এলেন। রাজমন্ত্রী ছুটতে ছুটতে সঙ্গে এলেন। রাজবৈদ্য মন্তর আওড়াতে আওড়াতে তারপর এলেন। তারপর রাজার লোকলস্কর, দাসীবাঁদী যে যেখানে ছিল হাজির হল।

বানর বললে—মহারাজ, এত লোক কেন এনেছ? আমি মাকে ওষুধ দিয়েছি, মা আমার ভাল আছেন, একটু ঘুমোতে দাও। এত লোককে যেতে বল।

রাজা বিষের নাড়ু পরখ করিয়ে রাজবৈদ্যকে বিদায় করলেন। রাজ্যের ভার দিয়ে রাজমন্ত্রীকে বিদায় করলেন। বড়োরানির মহলে নিজে রইলেন।

তিনদিন, তিনরাত বড়োরানি অজ্ঞান। চারদিনে জ্ঞান হল, বড়োরানি চোখ মেলে চাইলেন।

বানর রাজাকে এসে খবর দিলে—মহারাজ, বড়োরানি সেরে উঠেছেন, তোমার একটি রাজচক্রবর্তী ছেলে হয়েছে।

রাজা বানরকে হীরের হার খুলে দিয়ে বললেন—চল বানর, বড়োরানিকে আর বড়োরানির ছেলেকে দেখে আসি।

বানর বললে—মহারাজ, গণনা করেছি ছেলের মুখ এখন দেখলে তোমার চক্ষু অন্ধ হবে। ছেলের বিয়ে হলে মুখ দেখো, এখন বড়োরানিকে দেখে এসো ছোটোরানি কী দুর্দশা করেছে।

রাজা দেখলেন—বিষের জ্বালায় বড়োরানির সোনার অঙ্গ কালি হয়ে গেছে, রানি পাতাখানার মতো পড়ে আছেন, রানিকে আর চেনা যায় না!

রাজা রাজবাড়িতে এসে ছোটোরানিকে প্রহরীখানায় বন্ধ করলেন, আর ডাকিনী বুড়িকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে, উল্টো গাধায় চড়িয়ে দেশের বার করে দিলেন।

তারপর হুকুম দিলেন—মন্ত্রীবর, আজ বড় শুভদিন, এতদিন পরে রাজচক্রবর্তী ছেলে পেয়েছি। তুমি পথে পথে আলো জ্বালাও, ঘরে ঘরে বাজি পোড়াও, দীনদুঃখী ডেকে রাজভাণ্ডার লুটিয়ে দাও, রাজ্যে যেন একটিও ভিখারি না থাকে।

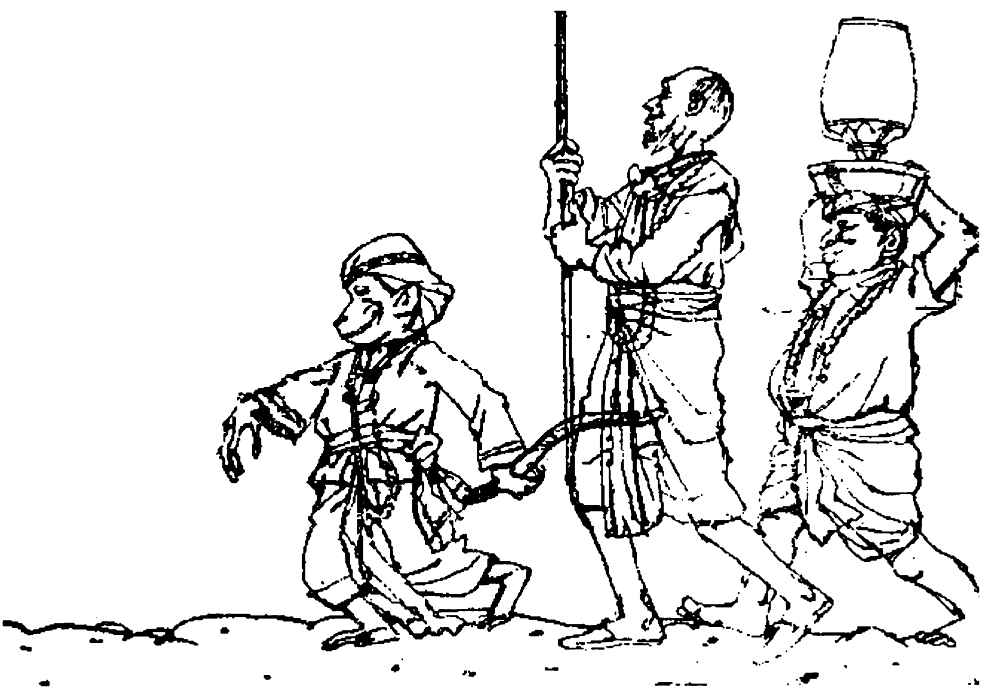
মন্ত্রী রাজার আজ্ঞায় নগরের পথে পথে আলো দিলেন, ঘরে ঘরে বাজি পোড়ালেন, দীনদুঃখীকে রাজভাণ্ডার লুটিয়ে দিলেন, রাজ্যে জয়-জয়কার হল।

এমনি করে নিত্য নতুন আমোদে, দেবতার মন্দিরে পূজা দিয়ে, মা কালীর পায়ে বলি দিয়ে দেখতে দেখতে দশ বৎসর কেটে গেল।

রাজা বানরকে ডেকে বললেন—দশ বৎসর তো পূর্ণ হল এখন ছেলে দেখাও।

বানর বললে—মহারাজ, আগে ছেলের বউ ঠিক কর, তারপর তার বিয়ে দাও, তারপর মুখ দেখো! এখন ছেলে দেখলে অন্ধ হবে।

রাজা বানরের কথায় দেশ-বিদেশে ভাট পাঠালেন। কত দেশের কত রাজকন্যার সন্ধান এল, একটিও রাজার মনে ধরল না। শেষে পাটলি দেশের রাজার ভাট সোনার কৌটায় সোনার প্রতিমা রাজকন্যার ছবি নিয়ে এল! কন্যার অঙ্গের বরণ কাঁচা সোনা, জোড়া ভুরু—বাঁকা ধনু, দু'টি চোখ টানা-টানা, দু'টি ঠোঁট হাসি-হাসি, এলিয়ে দিলে মাথার কেশ পায়ে পড়ে। রাজার সেই কন্যা পছন্দ হল।



বানরকে ডেকে বললেন—ছেলের বউ ঠিক করেছি, কাল শুভদিনে শুভলগ্নে বিয়ে দিতে যাব।

বানর বললে—মহারাজ, কাল সন্ধ্যাবেলা, বেহারা দিয়ে বরের পালকি মায়ের দুয়ারে পাঠিয়ে দিও, বরকে নিয়ে বিয়ে দিতে যাব।

রাজা বললেন—দেখ বাপু, দশ বৎসর তোমার কথা শুনেছি, কাল ছেলে না দেখালে অনর্থ করব।

বানর বললে—মহারাজ, সে ভাবনা নেই। তুমি বেহাই বাড়ি চলে যাও, আমরা কাল বর নিয়ে যাব।

রাজা পাছে রানির ছেলেকে দেখে ফেলেন, পাছে চক্ষু অন্ধ হয়, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি বেহাই বাড়ি চলে গেলেন।

আর বানর নতুন মহলে বড়োরানির কাছে গেল।

বড়োরানি ছেলের বিয়ে শুনে অবধি পড়ে পড়ে কাঁদছেন আর ভাবছেন—ছেলে কোথা পাব, এবার রাজাকে কি ছলে ভোলাব!

বানর এসে বললে—মা গো মা, ওঠ। চেলির জোড় আন, মাথার টোপর আন, ক্ষীরের ছেলে গড়ে দে, বড় সাজিয়ে বিয়ে দিয়ে আনি।

রানি বললেন—বাছারে, প্রাণে কি তোর ভয় নেই? কোন সাহসে ক্ষীরের পুতুল বর সাজিয়ে বিয়ে দিতে যাবি? রাজাকে কি ছলে ভোলাবি? বাছা কাজ নেই, ছল করে রাজার প্রেয়সী হলুম, সেই পাপে সতীন বিষ খাওয়ালে, ভাগ্যে ভাগ্যে বেঁচে উঠেছি, আবার কোন সাহসে রাজার সঙ্গে ছল করব? বাছা ক্ষান্ত দে, কেন আর পাপের বোঝা বাড়াস! তুই রাজাকে ডেকে আন, আমি সব কথা খুলে বলি।

বানর বললে—রাজাকে পাব কোথা? দু'দিনের পথ কনের বাড়ি, রাজা সেখানে গেছেন। তুই কথা রাখ, ক্ষীরের বর গড়ে দে, রাজা পথ চেয়ে আছেন কখন বর আসবে, বর না এলে বড় অপমান। মা তুই ভাবিসনে, ক্ষীরের পুতুল বিয়ে দিতে পাঠালি, যদি ষষ্ঠীর কৃপা হয় তবে ষষ্ঠীদাস যেঠের বাছা কোলে পাবি।

রানি বানরের ভরসায় বুক বেঁধে মনের মতো ক্ষীরের ছেলে গড়লেন। তাকে চেলির জোড় পরালেন, সোনার টোপর পরালেন জরির জুতো পায়ে দিলেন।

বানর চুপি চুপি ক্ষীরের বর পালকিতে তুলে রঙিন ঢাকা নামিয়ে দিলে, বরের কেবল দু'খানি ছোট পা, দু'পাটি জরির জুতো দেখা যেতে লাগল।

ষোলজন কাহার বরের পালকি কাঁধে তুললে। বানর মাথায় পাগড়ি, কোমরে চাদর বেঁধে, নিশেন উড়িয়ে,



ঢাক বাজিয়ে, আলো জ্বালিয়ে, ক্ষীরের পুতুলের বিয়ে দিতে গেল। রানি আঁধার পুরে একলা বসে বিপদভঞ্জন বিঘ্নহরণকে ডাকতে লাগলেন।

এদিকে বর নিয়ে ষোলো কাহার, মশাল নিয়ে মশালধারী, ঢাকঢোল নিয়ে ঢাকি ঢুলি, ঘোড়ায় চড়ে বরযাত্রী—সারারাত বাঁশি বাজিয়ে, আলো জ্বালিয়ে, ঘোড়া হাঁকিয়ে দিগ্‌নগরে এসে পড়ল।

দিগ্‌নগরে দিঘির ধারে ভোর হল। মশাল পুড়ে পুড়ে নিবে গেল, ঘোড়া ছুটে ছুটে বেদম হল, কাহার পালকি বয়ে হয়রান হল, ঢাক পিটে পিটে ঢাকির হাতে খিল ধরল।

বানর দিঘির ধারে তাঁবু ফেলতে হুকুম দিলে। দিঘির ধারে ষষ্ঠীতলায় বরের পালকি নামিয়ে কাহারদের ছুটি দিলে, মন্ত্রীকে ডেকে বলে দিলে—মন্ত্রীমশায়, রাজার হুকুম বরকে যেন কেউ না দেখে, আজকের দিনে বর দেখলে বড় অমঙ্গল।

মন্ত্রী রাজার হুকুম জারি করলেন। রাজার লোকজন দিঘির জলে নেয়ে, রেঁধেবেড়ে খেয়ে তাঁবুর ভিতর শুয়ে রইল, বটগাছের দিকে এল না। গাঁয়ে বউ-ঝি ষষ্ঠীঠাকরুণের পুজো দিতে এল, রাজার পাহারা হাঁকিয়ে দিলে।

সে দিন বটতলায় ষষ্ঠীঠাকরুণের পুজো হল না। ষষ্ঠীঠাকরুণ খিদের জ্বালায় অস্থির হলেন, তেষ্টায় শুকিয়ে কাঠ হল। বানর মনে মনে হাসতে লাগল।

এমনি বেলা অনেক হল। ষষ্ঠীঠাকরুণের মুখে জলবিন্দু পড়ল না, ঠাকরুণ কাঠামোর ভিতর ছটফট করতে লাগলেন, ঠাকরুণের কালো বেড়াল মিউ মিউ করে কাঁদতে লাগল। বানর তখন মনে মনে ফন্দি এঁটে পালকির দরজা খুলে রেখে আড়ালে গেল।

ষষ্ঠীঠাকরুণ ভাবলেন—আঃ আপদ গেল! কাঠফাটা রোদে কাঠামো থেকে বার হয়ে নৈবেদ্যের ছোলাটা কলাটা সন্ধান করতে লাগলেন। খুঁজতে খুঁজতে দেখেন, পালকির ভিতর ক্ষীরের পুতুল। ঠাকরুণ আর লোভ সামলাতে পারলেন না, মনে মনে ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসিকে স্মরণ করলেন।

দিগনগরে যখন দিন, ঘুমের দেশে তখন রাত। ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি সারারাত দিগনগরে ষষ্ঠীর দাস ষেঠের বাছা ছেলেদের চোখে ঘুম দিয়ে, সকালবেলা ঘুমের দেশে রাজার মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে, অনেক বেলায় একটুখানি চোখ বুজেছেন, এমন সময় ষষ্ঠীঠাকরুণের ডাক পড়ল। ঘুমের দেশে ঘুমপাড়ানি মাসি জেগে উঠলেন, ঘুমপাড়ানি পিসি উঠে বসলেন, দুই বোনে ঘুমের দেশ ছেড়ে দিগ্‌নগরে এলেন। ষষ্ঠীর পায়ে প্রণাম করে বললেন—ঠাকরুণ, দিনেদুপুরে ডেকেছেন কেন?

ঠাকরুণ বললেন—বাছারা, এতখানি বেলা হল এখনও ভোগ পাইনি। তোরা একটি কাজ কর, দেশের যে যেখানে আছে ঘুম পাড়িয়ে দে, আমি ডুলির ভিতর ক্ষীরের পুতুলটি খেয়ে আসি।

ষষ্ঠীঠাকরুণের কথায় মাসি-পিসি মায়া করলেন, দেশের লোক ঘুমিয়ে পড়ল। মাঠের মাঝে রাখাল, ঘরের মাঝে খোকা, খোকার পাশে খোকার মা, খেলাঘরে খোকার দিদি ঘুমিয়ে পড়ল। ষষ্ঠীতলায় রাজার লোকজন, পাঠশালায় গাঁয়ের ছেলেপিলে ঘুমিয়ে পড়ল। রাজার মন্ত্রী হুঁকোর নল মুখে ঘুমিয়ে পড়লেন, গাঁয়ের গুরু বেত হাতে ঢুলে পড়লেন। দিগ্‌নগরে দিনেদুপুরে রাত এল। মাসি-পিসি সবার চোখে ঘুম দিলেন—জেগে রইল গাঁয়ের মাঝে রাস্তার শেয়াল-কুকুর, দিঘির ধারে রাজার হাতি-ঘোড়া, বনের মাঝে বনের পাখি, গাছের ডালে রানির বানর। আর জেগে রইল, ষষ্ঠীর দাস বনের বেড়াল, জলের বেড়াল, গাছের বেড়াল, ঘরের বেড়াল। ষষ্ঠীঠাকরুণ তখন ডুলি খুলে ক্ষীরের ছেলে হাতে নিলেন। ক্ষীরের গন্ধে গাছ থেকে কাঠবেড়াল নেমে এল, বন থেকে বনবেড়াল ছুটে এল, জল থেকে উদবেড়াল উঠে এল, কুনোবেড়াল কোণ ছেড়ে ষষ্ঠীতলায় চলে এল।

ষষ্ঠীঠাকরুণ ক্ষীরের ছেলের দশটি আঙুল বেড়ালদের খেতে দিলেন। নিজে ক্ষীরের হাত, ক্ষীরের পা, ক্ষীরের বুক পিঠ মাথা খেয়ে, ক্ষীরের দুটি কান মাসি-পিসির হাতে দিয়ে বিদায় করলেন।

মাসি-পিসি ঘুমের দেশে চলে গেলেন, দিগনগরে দিঘির ঘাটে বরযাত্রীর ঘুম ভাঙল, গাঁয়ের ভিতর ঘরে ঘরে গ্রামবাসীর ঘুম ভাঙল। ষষ্ঠীঠাকরুণ তাড়াতাড়ি মুখ মুছে কাঠামোয় ঢুকতে যাবেন, এমন সময় বানর গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে বললে—ঠাকরুণ, পালাও কোথা, আগে ক্ষীরের ছেলে দিয়ে যাও! চুরি করে ক্ষীর খাওয়া ধরা পড়েছে, দেশ-বিদেশে কলঙ্ক রটাব।

ঠাকরুণ ভয় পেয়ে বললেন—আঃ মর! এ মুখপোড়া বলে কি! সর সর, আমি পালাই, লোকে আমায় দেখতে পাবে!

বানর বললে—তা হবে না, আগে ছেলে দাও তবে ছেড়ে দেব। নয়তো কাঠামোসুদ্ধ আজ তোমায় জলে ডুবিয়ে যাব, দেবতা হয়ে ক্ষীর চুরির শাস্তি হবে।

ঠাকরুণ লজ্জায় মরে গেলেন, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—বাছা চুপ কর, কে কোনদিকে শুনতে পাবে? তোর ক্ষীরের ছেলে খেয়ে ফেলেছি ফিরে পাব কোথা? ওই বটতলায় আমার ছেলেরা খেলা করছে, তোর যেটিকে

পছন্দ সেটিকে নিয়ে বিয়ে দিগে যা, আমার বরে দুয়োরানি তাকে আপনার ছেলের মতো দেখবে, এখন আমায় ছেড়ে দে।

বানর বললে—কই ঠাকরুণ, বটতলায় তো ছেলেরা নেই! আমায় দিব্যচক্ষু দাও তবে তো ষষ্ঠীর দাস ষেঠের বাছাদের দেখতে পাব। ষষ্ঠীঠাকরুণ বানরের চোখে হাত বোলালেন, বানর দিব্যচক্ষু হল।



বানর দেখলে—ষষ্ঠীতলা ছেলের রাজ্য, সেখানে কেবল ছেলে—ঘরে ছেলে, বাইরে ছেলে, জলেস্থলে, পথে-ঘাটে, গাছের ডালে, সবুজ ঘাসে যেদিকে দেখে সেই দিকেই ছেলের পাল, মেয়ের দল। কেউ কালো, কেউ সুন্দর, কেউ শ্যামলা, কারও পায়ে নূপুর, কারও কাঁকালে ছেলে, কারও গলায় সোনার দানা। কেউ বাঁশি বাজাচ্ছে, কেউ ঝুমঝুমি ঝুমঝুম করছে, কেউবা পায়ের নূপুর বাজিয়ে কচি হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। কারও পায়ে লাল জুতুয়া, কারও মাথায় রাঙা টুপি, কারও গায়ে ফুলদার লক্কটাকার মলমলি চাদর। কোনও ছেলে রোগা রোগা, কোনও ছেলে মোটাসোটা, কেউ দস্যি, কেউ লক্ষ্মী। একদল কাঠের ঘোড়া টকবক হাঁকাচ্ছে, একদল দিঘির জলে মাছ ধরছে, একদল বাঁধের জলে নাইতে নেমেছে, একদল গাছের তলায় ফুল কুড়োচ্ছে, একদল গাছের ডালে ফল পাড়ছে, চারিদিকে খেলাধুলো, মারামারি, হাসিকান্না। সে এক নতুন দেশ, স্বপ্নের রাজ্য! সেখানে কেবল ছুটোছুটি, কেবল খেলাধুলো; সেখানে পাঠশালা নেই, পাঠশালের গুরু নেই, গুরুর হাতে বেত নেই। সেখানে আছে দিঘির কালোজল, তার ধারে শরবন, তেপান্তর মাঠ তারপরে আম-কাঁঠালের বাগান, গাছে গাছে ন্যাজঝোলা টিয়েপাখি, নদীর জলে গোল চোখ বোয়াল মাছ, কচু বনে মশার ঝাঁক। আর আছেন বনের ধারে বনগাঁবাসী মাসি-পিসি, তিনি খইয়ের মোয়া গড়েন, ঘরের ধারে ডালিম গাছটি তাতে প্রভু নাচেন। নদীর পারে জন্তী গাছটি তাতে জন্তী ফল ফলে, সেখানে নীল ঘোড়া মাঠে মাঠে চরে বেড়াচ্ছে, গৌড়দেশের সোনার ময়ূর পথেঘাটে গড়াগড়ি যাচ্ছে। ছেলেরা সেই নীলঘোড়া নিয়ে, সেই সোনার ময়ূর দিয়ে ঘোড়া সাজিয়ে, ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজিয়ে, ডুলি চাপিয়ে, কমলাপুলির দেশে পুঁটুরানির বিয়ে দিতে যাচ্ছে। বানর কমলাপুলির দেশে গেল। সে টিয়েপাখির দেশ, সেখানে কেবল ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়েপাখি, তারা দাঁড়ে বসে ধান খোঁটে, গাছে বসে কেঁচমেচ করে, আর সে দেশের ছেলেদের নিয়ে খেলা করে। সেখানে লোকেরা গাই-বলদে চাষ করে, হিরে দিয়ে দাঁত ঘষে! সে এক নতুন দেশ—সেখানে নিমেষে সকাল,

পলকে সন্ধ্যা হয়, সে দেশের কাণ্ডই এক! ঝুরঝুরে বালির মাঝে চিকচিকে জল, তারই ধারে একপাল ছেলে দোলায় চেপে ছ'পণ কড়ি গুনতে গুনতে মাছ ধরতে এসেছে; কারও পায়ে মাছের কাঁটা ফুটেছে, কারও চাঁদমুখে রোদ পড়েছে। জেলেদের ছেলে জাল মুড়ি দিয়ে ঘুম দিচ্ছে—এমন সময় টাপুরটুপুর বৃষ্টি এল, নদীতে বান এল; অমনি সেই ছেলের পাল, সেই কাঠের দোলা, সেই ছ'পণ কড়ি ফেলে, কোন পাড়ায় কোন ঘরের কোণে ফিরে গেল। পথের মাঝে তাদের মাছগুলো চিলে কেড়ে নিলে, কোলা ব্যাঙে ছিপগুলো টেনে নিলে, খোকাবাবুরা ক্ষিপ্ত হয়ে ঘরে এলেন, মা তপ্ত দুধ জুড়িয়ে খেতে দিলেন। আর সেই চিকচিকে জলের ধারে ঝুরঝুরে বালির চরে শিবঠাকুর এসে নৌকা বাঁধলেন, তাঁর সঙ্গে তিনকন্যে—এককন্যে রাঁধলেন বাড়লেন, এককন্যে খেলেন আর এককন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি গেলেন। বানর তার সঙ্গে বাপের বাড়ির দেশে গেল। সেখানে জলের ঘাটে মেয়েগুলি নাইতে এসেছে, কালো কালো চুলগুলি ঝাড়তে লেগেছে। ঘাটের দু'পাশে দুই রুই কাতলা ভেসে উঠল, তার একটি গুরুঠাকুর নিলেন, আর একটি নায়ে ভরা দিয়ে টিয়ে আসছিল সে নিলে। তাই দেখে ভোঁদড় টিয়েকে একহাতে নিয়ে আর মাছকে একহাতে নিয়ে নাচতে আরম্ভ করলে, ঘরের দুয়োরে খোকার মা খোকাবাবুকে নাচিয়ে নাচিয়ে বললেন—ওরে ভোঁদড় ফিরে চা, খোকার নাচন দেখে যা।

বানর দেখলে—ছেলেটি বড় সুন্দর, যেন সোনার চাঁদ, তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে কেড়ে নিলে! অমনি ষষ্ঠীতলার সেই স্বপ্নের দেশ কোথায় মিলিয়ে গেল, ন্যাজঝোলা টিয়েপাখি আকাশ সবুজ করে কোনদেশে উড়ে গেল, শিবঠাকুরের নৌকা কোনদেশে ভেসে গেল। ঘাটের মেয়েরা ডুবে শাড়ি ঘুরিয়ে পরে চলে গেল। ষষ্ঠীর দেশে কুনোবেড়াল কোমর বেঁধে, শাশুড়ি ভোলাতে উড়কি ধানের মুড়কি নিয়ে, চার মিনসে কাহার নিয়ে, চার মাগী দাসী সঙ্গে, আম-কাঁঠালের বাগান দিয়ে পুঁটুরানিকে শ্বশুড়বাড়ি নিয়ে যেতে যেতে আমতলার অন্ধকারে মিশে গেল। তেঁতুল গাছের ভোঁদড়গুলো নাচতে নাচতে পাতার সঙ্গে মিলিয়ে গেল—দেশটা যেন মাটির নিচে ডুবে গেল!

বানর দেখলে—কোথায় ষষ্ঠীঠাকরুণ, কোথায় কে! বটতলায় দিঘির ধারে ছেলে কোলে একলা দাঁড়িয়ে আছে! তখন বানর লোকজন ডেকে সেই সোনার চাঁদ ছেলেটিকে পালকি চড়িয়ে, আলো জ্বালিয়ে বাদ্যি বাজিয়ে সন্ধ্যেবেলা দিগনগর ছেড়ে গেল।

এ দিকে পাটলি দেশে বেয়াইবাড়ি বসে বসে রাজা ভাবছেন—বানর এখনও এল না? আমার সঙ্গে ছল করলে? রাজ্যে গিয়ে মাথা কাটব। বিয়ের কনেটি ভাবছে—না জানি বর দেখতে কেমন? কনের মা-বাপ ভাবছে—আহা, বুকের বাছা পর হয়ে কার ঘরে চলে যাবে! রাজবাড়ির চাকর-দাসীরা ভাবছে—কাজ কখন সারা হবে, ছাদে উঠে বর দেখব। এমন সময় গুরু গুরু ঢোল বাজিয়ে, পোঁ পোঁ বাঁশি বাজিয়ে, টকবক ঘোড়া হাঁকিয়ে, ঝকমক আলো জ্বালিয়ে বানর বর নিয়ে এল। রাজা ছেলেকে হাত ধরে সভায় বসালেন, কনের বাপ বিয়ের সভায় মেয়ের হাত জামাইয়ের হাতে সঁপে দিলেন, পাড়া-পড়শি বরকে বরণ করলে, দাস-দাসী শাঁখ বাজালে, হুলু দিলে—বর কনের বিয়ে হল।

রাজা ছেলের বিয়ে দিয়ে তার পরদিন বউ নিয়ে, ছেলে নিয়ে, বাঁশি বাজিয়ে, ঘোড়া হাঁকিয়ে বানরের সঙ্গে দেশে ফিরলেন। পাটলি দেশের রাজার বাড়ি এক রাত্তিরে শূন্য হয়ে গেল, মা-বাপের কোলের মেয়ে পরের ঘরে চলে গেল।

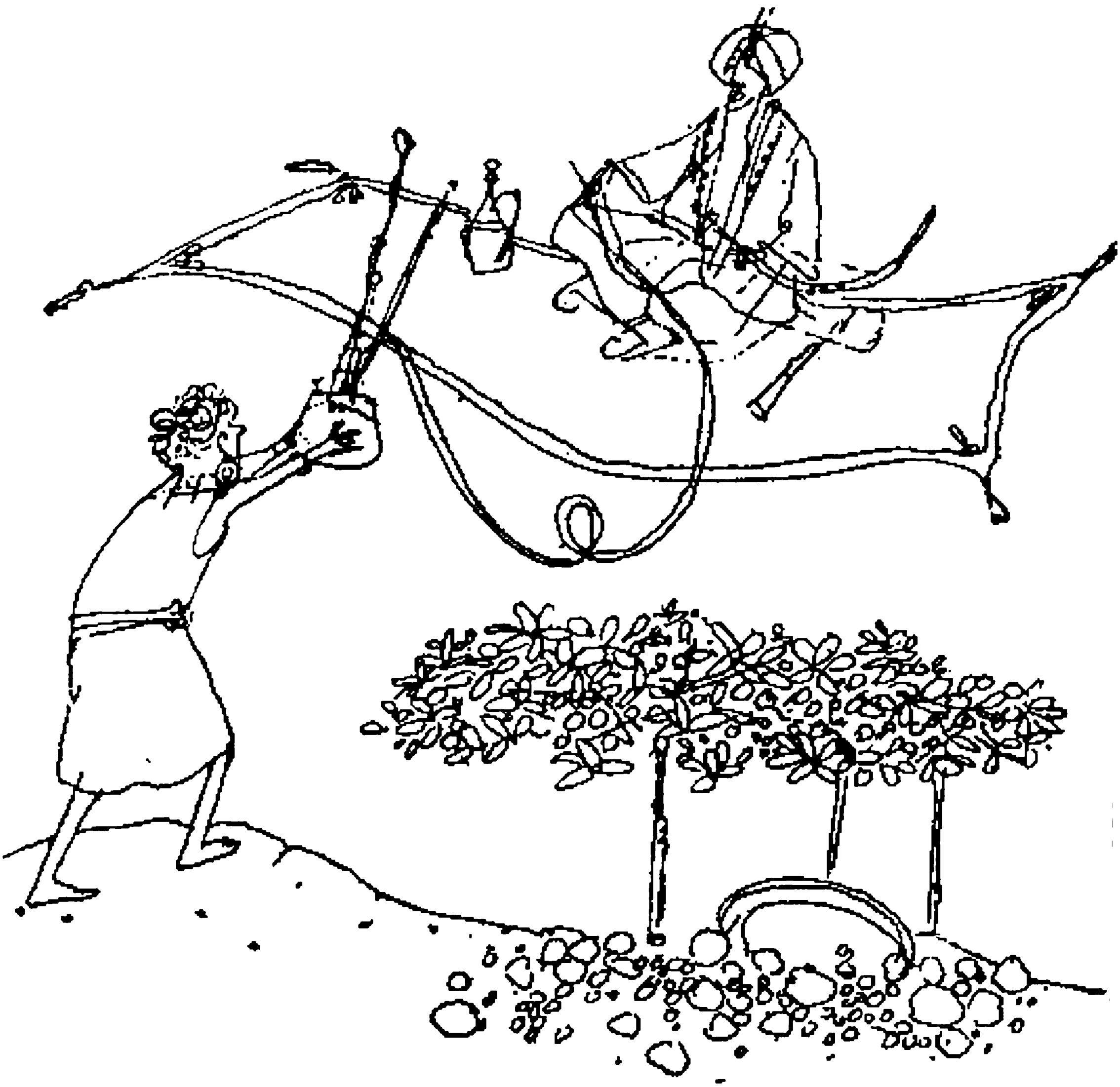
এ দিকে রাজার দেশে বড়োরানি দু'দিন দু'রাত কেঁদে, ভেবে ভেবে, ভোরবেলা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন—ষষ্ঠীঠাকরুণ বলছেন, রানি, ওঠ। চেয়ে দেখ তোর কোলের বাছা ঘরে এল। রানি ঘুম ভেঙে উঠে বসলেন, দুয়ারে শুনলেন দাসীরা ডাকছে—ওঠো গো রানি ওঠো, পাটের শাড়ি পরো, বউ-বেটা বরণ করোগে!

রানি পাটের শাড়ি পরে বাইরে এলেন। এসে দেখলেন সত্যিই রাজা বউ-বেটা এনেছেন! হাসিমুখে বর-কনেকে কোলে নিলেন, ষষ্ঠীর বরে দুঃখের দিনের ক্ষীরের ছেলের কথা মনে রইল না, ভাবলেন ছেলের জন্য ভেবে ভেবে ক্ষীরের ছেলে স্বপ্ন দেখেছি।

রাজা এসে ছেলেকে রাজ্য যৌতুক দিলেন, সেই রাজ্যে বানরকে মন্ত্রী করে দিলেন, আর ছেলের বউকে মায়ারাজ্যের সেই আট হাজার মানিকের আটগাছি চুড়ি, দশশো ভরি সোনার সেই দশগাছা মল পরিয়ে দিলেন। কন্যের হাতে মানিকের চুড়ি যেন রক্ত ফুটে পড়ল, পায়ে মল রিনিঝিনি বাজতে লাগল, ঝিকিমিকি জ্বলতে লাগল।

হিংসেয় ছোটোরানি বুক ফেটে মরে গেল।

ভূতপত্‌রীর দেশ



ভূতপত্‌রীর দেশ

'মাসি পিসি বনগাঁ-বাসী বনের ধারে ঘর
কখনও মাসি বলেন না যে খইমোয়াটা ধর'।

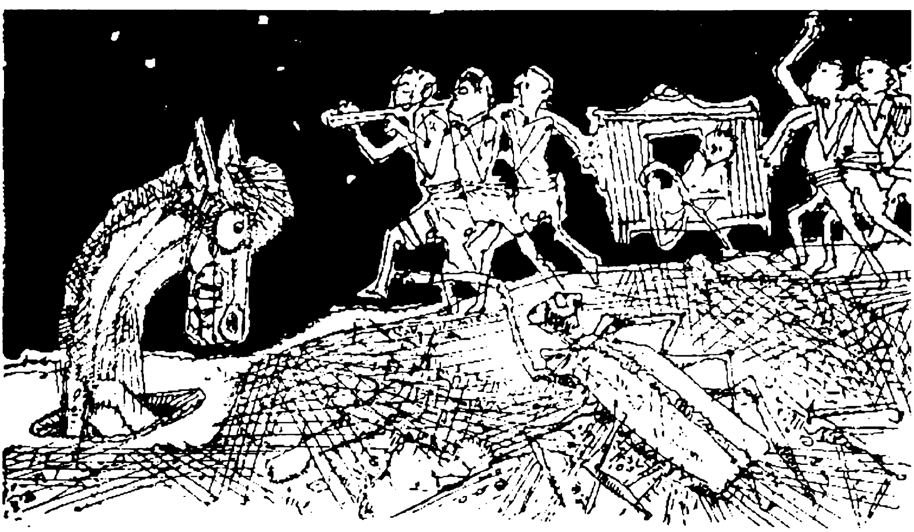
কিন্তু এবারে মাসি পিসি দুজনেই ডেকেছেন। আগে মাসির বাড়ি এসেছি পালকি চড়ে। সেখানে মোয়া খেয়ে পেট ধামা করেছি। এখন পালকিতে শুয়ে পিসির বাড়ি চলেছি। মাসি চাদরের খুঁটে খই বেঁধে দিয়েছেন—পথে জল খেতে; হাতে একগাছা ভূতপত্‌রী লাঠি দিয়েছেন—ভূত তাড়াতে; এক লণ্ঠন দিয়েছেন—আলোয় আলোয় যেতে।

হুম্পাহুমা পালকি চলেছে বনগাঁ পেরিয়ে; ধপড়ধাঁই পালকি চলেছে বনের ধার দিয়ে, মাসির ঘর ছাড়িয়ে, ভূতপত্‌রীর মাঠ ভেঙে, পিসির বাড়িতে।

পিসির দেশে কখনও যাইনি। শুনেছি পিসি থাকেন তেপান্তর মাঠের ওপারে সমুদ্দুরের ধারে, বালির ঘরে। শুনেছি পিসি কাঁকড়া খেতে ভালবাসেন, কচি কচি কুমড়ো দিয়ে কাঁকড়ার ঝোল রেঁধে লোককে খাওয়াতেও ভালবাসেন। কিন্তু লোক তো পিসির বাড়ি যায় কত! যে ভূত্‌পতরীর মাঠ! দেখেই ভয় হয়! এই মাঠ ভেঙে দুপুর রাতে পিসির বাড়ি চলেছি। চলেছি তো চলেইছি : 'হুঁইয়া মারি খপরদারি!' 'বড়া ভারি খবরদারি!'

মাঠের মাঝে একটা শেওড়াগাছের ঝোপ, অন্ধকারে কালো বেড়ালের মতো গুঁড়ি মেরে বসে আছে। তারই কাছে ঘোড়ার গোর, তার পরেই তেপান্তরের মাঠ! হাটের বাট ওই শেওড়াতলা পর্যন্ত; তারপরে আর হাটও নেই, বাটও নেই; কেবল মাঠ ধু ধু করছে।

এই শেওড়াতলায় পালকি এসেছে কি আর যত ঝিঁঝিপোকা তারা বলে উঠেছে—'চললে বাঁচি! চললে বাঁচি!' কেনরে বাপু, একটু না হয় বসেছি, তাতে তোমাদের এত গায়ের জ্বালা কেন? 'চললে বাঁচি!' চলতে



কি আর পারি রে বাপু? অমনি ঝিঁঝিপোকার সর্দার দুই লম্বা লম্বা ঠ্যাং নেড়ে বলছে, 'ওই আসছে চিঁচি ঘোড়া চিঁচি!' ফিরে দেখি গোরের ভিতর থেকে ঘোড়া-ভূত মুখ বার করে পালকির দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে! ওঠা রে পালকি, পালা রে পালা! আর পালা! ঘোড়া-ভূত তাড়া করেছে—ঘাড় বেঁকিয়ে, নাক ফুলিয়ে আগুনের মতো দুই চোখ পাকিয়ে!

ভয়ে তখন ভূতপত্‌রীর লাঠির কথা ভুলে গেছি। কেবল ডাকছি—জগবন্ধু, রক্ষে কর, মাসিকে বলে তোমায় খইয়ের মোয়া ভোগ দেব। বলতেই আমার খুঁটে বাঁধা খইগুলি রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে। মাসির বাড়ির

খই—জুঁইফুলের মতো ফুটন্ত ধবধব করছে খই—রাস্তা যেন আলো করে। ঘোড়া-ভূত কি সে লোভ সামলাতে পারে? খই খেতে অমনি দাঁড়িয়ে গেছে। বেচারা ঘোড়া-ভূত খই খেতে মুখটি নামিয়েছে কি, অমনি তার ভুতুড়ে নিশ্বাসে খইগুলি উড়ে পালাচ্ছে! যেমন খইয়ের কাছে মুখ নেওয়া অমনি খই উড়ে পালায়। খইও ধরা দেয় না, ঘোড়াও ছাড়তে চায় না। ঘোড়া-ভূত চায় খই খায়, খই কিন্তু উড়ে উড়ে পালায়।

ঘোড়া চলেছে খইয়ের পিছে, খই উড়েছে বাতাসের আগে, আমি চলেছি পালকিতে বসে ঘোড়া-ভূতের ঘোড়দৌড় দেখতে মুখ বাড়িয়ে। কখন যে মাঠে এসে পড়েছি মনেই নেই। সেখানটায় বড় অন্ধকার, বড় হাওয়া—যেন ঝড় বইছে। মাসির দেওয়া একটি লণ্ঠনের মিটমিটে আলো অনেকক্ষণ নিভে গেছে। অন্ধকারে আর ঘোড়াও দেখা যায় না, খইও চেনা যায় না। বেহারাদের বলি—আলো জ্বাল; কিন্তু হাওয়ায় কথা উড়ে যায়; কে শোনে কার কথা! এমন হাওয়া তো দেখিনি! আমার ভূতপত্‌রীর লাঠিটা পর্যন্ত উড়ে পালাবার যোগাড়। লণ্ঠনটি তো গেছে, শেষে লাঠিটাও যাবে? আচ্ছা করে লাঠি ধরে বসে আছি। বাতাসের জোর ক্রমেই বাড়ছে।

সর্বনাশ! এ যে দেখছি বীর-বাতাস! এ বাতাসের মুখে পড়লে তো রক্ষে থাকবে না—পালকি সুদ্ধ আমি, আমার লাঠি, আমার ছাতা, ধুতি-চাদর, পোঁটলা-পুঁটলি, বিছানা-বালিশ কাগজের টুকরোর মতন কোথায় উড়ে যাবে তার ঠিকানা নেই! পথে জল খেতে দুমুঠো খই ছিল, তা তো ঘোড়া-ভূতের সঙ্গে কোথায় উড়ে গেছে। শেষে বীর-বাতাসে আমিও উড়ে যাব নাকি? শীতেও কাঁপছি, ভয়েও কাঁপছি। পালকি ধরে বীর-বাতাস এক একবার ঝাঁকানি দিচ্ছে, আর হাঁক দিচ্ছি 'সামাল, সামাল!' ভয়ে জগবন্ধুর নাম ভুলে গেছি। পালকিখানা ছাতার মতো বেহারাদের কাঁধ থেকে উড়ে আমাকে সুদ্ধ নিয়ে গড়াতে গড়াতে চলেছে। পিছনে 'ধর! ধর!' করে পালকি-বেহারাগুলো ছুটে আসছে।

একটা বুড়ো মনসা গাছ, মাথায় তার হলদে চুল, বড় বড় কাঁটার বঁড়শি ফেলে বালির উপর মাছ ধরছিল। মনসাবুড়োর ছিপে মাছ তো পড়ছিল কত! কেবল রাজ্যের খড়কুটো আর পাখির পালক হাওয়ায় ভেসে এসে বুড়োর বঁড়শিতে আটকা পড়ছিল। এমন সময় আমার চাদরখানা গেল বঁড়শিতে গেঁথে। আর যাব কোথা? পালকিসুদ্ধ বালির উপর উল্টে পড়েছি। বেহারাগুলো একবার আমাকে ছাড়াবার জন্যে পালকির ডাণ্ডা ধরে আমার চাদরটা ধরে টানাটানি করলে, কিন্তু বাতাসের চোটে কোথায় উড়ে গেল আমার সেই উড়ে বেহারা ছ'টা, তাদের আর টিকিও দেখা গেল না!

মনসাবুড়োর হাসি দেখে কে! ভাবলে, মস্ত মাছ পেয়েছি। কিন্তু আমার হাতে ভূতপত্‌রী লাঠি আছে তা তো বুড়ো জানে না! লাঠি দিয়ে যেমন বুড়োর গায়ে খোঁচা দেওয়া অমনি ভয়ে বুড়োর রক্ত দুধ হয়ে গেছে—সে তাড়াতাড়ি আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। পালকিটা ঠেলে তুলে, বিছানা-পত্তর পোঁটলা-পুঁটলি যা যেখানে পড়েছিল গুছিয়ে নিয়ে, চুপটি করে বসে আছি—কখন বেহারাগুলো ফিরে আসে। মনসাবুড়োর গা বেয়ে দরদর করে সাদা দুধের মতো রক্ত পড়ছে; সেও কোনও কথা বলছে না, আমিও সাদা রক্ত দেখে অবাক হয়ে চেয়ে আছি।

বুড়ো খুব রেগেছে; তার গায়ের সব রোঁয়াগুলো কাঁটার মতো সোজা হয়ে উঠেছে। অনেকক্ষণ গোঁ হয়ে বসে থেকে মনসাবুড়ো আমার দিকে চেয়ে বলছে, 'দেখছ কি? বড় আমোদ হচ্ছে; না? বুড়োমানুষের গায়ে খোঁচা দিয়ে রক্তপাত করে আবার বসে বসে তামাসা দেখছ, লজ্জা নেই! যাও না, ছাড়া পেয়েছ তো নিজের কাজে যাও না!'

আমি বললুম, 'যেতে পারলে তো। পালকি-বেহারা নেই যে! তারা আসুক তবে যাব।'

শুনে বুড়ো হো হো করে হেসে বললে, 'কেন পা নেই নাকি? হেঁটে যেতে পার না? নবাব হয়েছ?'

আমার ভারি রাগ হল। বুড়োর বঁড়শির আঁচড়ে দুই পা ছিঁড়ে তখনও আমার ঝরঝর রক্ত পড়ছে। আমি রেগে বললাম, 'পা দুটো কি আর রেখেছ! আঁচড়ের চোটে দফা শেষ করেছ যে!'

'লেগেছে নাকি?' বলে বুড়ো খানিক চুপ করে বললে, 'একটু দই দাও, সেরে যাবে।'

আমি বললুম, 'এই মাঠের মধ্যে দই! তামাশা করছ নাকি?'

'আচ্ছা তবে খানিক তেঁতুল-বাটা হলেও চলতে পারে।'

আমার হাসি পেল। নিশ্চয় বুড়োটা ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে। বলি, 'ও দাদা! এখানে তুমি ছাড়া তো গাছ দেখছি নে, আরেকবার লাঠির খোঁচা দিয়ে তোমার গা থেকে দুধ বার করে নিয়ে দই পাতব নাকি?' বলেই ভূতপত্‌রী লাঠিটা যেমন একটু বাগিয়ে ধরেছি, অমনি বুড়ো বলছে, 'রও রও, করো কি, দাদা! বুড়োমানুষ কখন

কি বলি, রাগ কোরো না। আমরা মনসাদেবীর বরে চিরকাল নানারকম স্বপন দেখি। এইখানটিতে কতকাল যে বসে আছি তার ঠিক নেই। ছিপ নিয়ে মাছ ধরছিলুম জলের ধারে—আজ সে কত কালের কথা; সে নদী শুকিয়ে জল সরে চড়া পড়ে গেছে, কিন্তু এখনও ঝোঁক কাটেনি; মনে হচ্ছে নদীর ধারেই বসে মাছ ধরছি! আমার বেশ মনে পড়ছে এইখানেই একঘর গয়লা থাকত আর ঠিক তাদের ঘরের কোণে একটা মস্ত তেঁতুলগাছ ছিল, এখন তবে সেগুলো গেছে?' বলেই বুড়ো ঝিমিয়ে পড়ে দেখে আমি তাকে জাগিয়ে দিয়ে বললুম, 'আচ্ছা দাদা, ওই যে ঘোড়া-ভূত আর ঝিঁঝিপোকা দেখে এলুম ওদের কথা তুমি কিছু জান কি?'

'জানি বইকি! ওরা তো সেদিনের ছেলে!' বলেই বুড়ো গল্প শুরু করলে :

'দেখ, এই পৃথিবী তখন সবে তৈরি হয়েছে, আমাদের মতো দু'চারটি গাছ ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ নেই;—নদী নেই, পাহাড় নেই, এমন কি বাতাসে শব্দটি পর্যন্ত নেই;—কেবল বালি ধু ধু করছে—ঠিক এই জায়গাটির মতো। আমার তখন সবেমাত্র কচি কচি দুটি কাঁটা বেরিয়েছে—ছোট ছেলের কচি কচি দুটি দাঁতের মতো। সেই সময় তারা গান বড় ভালবাসে, তারা দেখতে অনেকটা মানুষের মতো, কিন্তু ফড়িংগুলোর মতো তাদের ডানা আছে, পাখিগুলোর মতো পা, ঝাঁক বেঁধে তারা আমাদের কাছে উড়ে এসে বসল আর গান গাইতে আরম্ভ করলে। আকাশ-বাতাস তাদের গানের সুরে যেন বেজে উঠল। সে যে কী চমৎকার তা তোমাকে আর কি বলব! আমরা তার আগে শব্দ শুনিনি, গানও শুনিনি—আনন্দে যেন শিউরে উঠলুম। বালি ঠেলে যত গাছ, যত ঘাস মাথা তুলে কান পেতে সেই গান শুনতে বেরিয়ে এল, পৃথিবীর ভিতর থেকে পাহাড়গুলো গা ঝাড়া দিয়ে উঠে এল, পাহাড়ের ভিতর থেকে নদীগুলো ছুটে ছুটে বেরিয়ে এল। গান শুনতে শুনতে দেখতে দেখতে আমরা বড় হয়ে উঠলুম। কিন্তু যারা গান গাইতে এল, কি খেয়ে তারা বাঁচে? পৃথিবীতে তো তখন ফুলও ছিল না, ফলও ছিল না; ছিল কেবল আমাদের মতো বড় বড় গাছ; কাঁটা আর লতা আর পাতা। নদীতে মাছও ছিল না, আকাশে পাখিও ছিল না যে তারা ধরে খায়! তবু তারা অনেক দিন বেঁচে ছিল কেবল গান গেয়ে। একদিন হঠাৎ শুনি যে গান বন্ধ হয়ে গেছে—তারা সবাই মরে গেছে—শুকনো পাতার মতো তাদের সোনার ডানা বাতাসে উড়ে এসে আমাদের গায়ে বিঁধতে লাগল, কিন্তু তাদের গানের সুর আর শোনা গেল না। তারপর পৃথিবীতে অনেক দিন আর কোনও সাড়াশব্দ নেই; কেবল দেখছি, একদল কারা জানি না, দেখতে অনেকটা মানুষ আর ঘোড়ার মতো, এদিকে ওদিকে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদেরই খুঁজে খুঁজে যারা গান গাইতে এসেছিল। ক্রমে দেখি তারাও মরে গেছে। পৃথিবীতে আর তখন কিছু চলে বেড়াচ্ছে না, গান গাইছে না,—কেবল গাছের দল আমরা চুপ করে বসে আছি। আমাদের বয়স ক্রমে বাড়ছে আর আমরা বুড়ো হচ্ছি। তখন জলে মাছ দু-একটি দেখা দিয়েছে; আমি কাঁটা আর বঁড়শি ফেলে এক রাত্তিরে মাছ ধরছি এমন সময়—'

বলেই মনসাবুড়ো ঝিমিয়ে পড়ল। আমি যত বলি, 'এমন সময় কি হল দাদা? আবার বুঝি সেই ফড়িংদের মতো মানুষগুলো ঝিঁঝিপোকা হয়ে ফিরে এসে গান গাইছে দেখলে? দেখলে বুঝি সেই মানুষের মতো ঘোড়াগুলো ভূত হয়ে অন্ধকার থেকে মুখ বাড়িয়ে তাদের গান শুনতে এল?' বুড়োর আর কথা নেই; কেবল একবার হুঁ বলেই চুপ করলে।

আমি ভাবছি দিই আর এক ঘা লাঠি বুড়োয় মাথায় বসিয়ে, এমন সময় দেখি দূর থেকে একটা আলো আসছে—যেন কে লণ্ঠন হাতে আমার দিকে চলে আসছে। একবার ভাবছি বুঝি বেহারা কজন আলো নিয়ে আমাকে নিতে এল। একবার ভাবছি, কি জানি মাঠের মাঝে আলেয়া দেখা দেয়, তাও তো হতে পারে। কিন্তু দেখলুম আলোটা এসে পালকির খানিক দূরে থামল; আর চারটে জোয়ান উড়ে আমার পালকিটা কাঁধে নিলে। উড়েদের একেই একটু ভুতুড়ে চেহারা, কাজেই ঠিক আন্দাজ করতে পারলুম না যে তারা ভূত না মানুষ। একবার তাদের পায়ের দিকে চেয়ে দেখলুম, ভূতের মতো তাদের পায়ের গোড়ালি উল্টো কিনা। কিন্তু অন্ধকারে কিছু ঠিক করতে পারা গেল না। মনসাবুড়োকে ডেকে বললুম, 'দাদা, তবে যাচ্ছি।'

দাদা আমার তখন ঝিমোচ্ছেন; চমকে উঠে বললেন, 'যাবে নাকি? গল্পটা তো শেষ হল না?'

পালকি তখন চলেছে, মুখ বাড়িয়ে বললুম, 'দাদা, একরকম গল্পটা শেষই করেছিলে, কেবল তোমার মাথার চুল হলদে আর তোমার রক্ত সাদা কেন, সেইটে বলতে বাকি রয়ে গেল।'

'মাস্টারমশায়ের কাছে জেনে নিও—' বলেই দাদা আবার ঝিমিয়ে পড়লেন। হু হু করে পালকি আমার মাঠের দিকে বেরিয়ে গেল।

একটু ভয় ভয় করছে; বেহারাগুলো মানুষ না ভূত বুঝতে পাচ্ছিনে। পালকির দরজা বন্ধ করে চুপ করে বসে আছি, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল—মানুষ-উড়ে পালকি কাঁধে হুম্মাহুমা ডাক ছাড়ে, এরা তো হাঁক দিচ্ছে না। পড়েছি ভূতের হাতেই! পড়েছি, আর কোনও ভুল নেই। আচ্ছা দেখা যাক, ভূতপত্‌রী লাঠি তো আছে। তেমন তেমন দেখি তো দুহাতে লাঠি চালাব।

ভূতপত্‌রী লাঠির কথা মনে করেছি কি অমনি ধপাস করে পালকিটা তারা মাটিতে ফেলেছে; কোমরটা আমার খচ করে উঠেছে। 'তবে রে ভূত-উড়ে, আমাকে এই মাঠে নামিয়ে দিয়ে পালাবে ভেবেছ! তোল পালকি, ওঠা সোয়ারি'—বলেই লাঠি নিয়ে যেমন তেড়ে যাব, কোমরটা আমার বেঁকে পড়ল! ভূতগুলো দেখেই খিলখিল করে হেসে অন্ধকারে মাঠে কোথায় মিলিয়ে গেল। মহা বিপদ! এই রাত্তিরে মাঠের মাঝে ভূতের ভয়, বাঘের ভয়, সাপের ভয়, তার ওপর কোমর ভেঙে গেল! লাঠি ধরে যে গুড়িগুড়ি পালাব তারও জো নেই। মনসা কাঁটায় পা ছিঁড়ে গেছে। 'দূর কর আর ভাবতে পারিনে, যা হয় হবে!' বলে পালকির ভেতরে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম। খিদেও পেয়েছে, তেষ্টাও পেয়েছে।

একলা থাকতে থাকতে ক্রমে ঘুম এসেছে। একটু চোখ বুজেছি কি না অমনি খস করে একটা শব্দ হল। চোখ চেয়ে দেখি, বালির ওপরে গোটাকতক তালগাছ উঠেছে, তাদের মাথা যেন আকাশে ঠেকেছে, আর একটা আলো ঘুরে ঘুরে সেই তালগাছে ঠেকেছে, আবার সড়সড় করে নেমে আসছে! আমি আর না রাম না গঙ্গা! কাঠ হয়ে পড়ে আছি কেবল দুটি চোখ চাদরের একটি কোণ দিয়ে বের করে।

দেখছি আলোটা ক্রমে এ গাছ সে গাছ করে ঘুরে বেড়াতে লাগল; তারপর আস্তে আস্তে মাটিতে নেমে এল। সেই সময় দেখি পূর্ণিমার চাঁদের মতো প্রকাণ্ড একটা কাচের গোলা মাঠের ওপর দিয়ে বোঁ বোঁ করে গড়িয়ে আসছে—যেন একটা মস্ত আলোর ফুটবল! তালগাছের তলায় যে আলোটা টিপ টিপ করছিল সেটা জোনাকি পোকার মতো উড়ে গিয়ে সেই গোলাটার ওপর বসল। বসেই গোলাটাকে আমার দিকে গড়িয়ে আনতে লাগল!

গেছি, পালকিসুদ্ধ গোলাটার ভেতরে ঢুকে গেছি। হাঁড়ির ভেতরে মাছের মতো আর পালাবার জো নেই। একেবারে গড়িয়ে চলেছি—বনবন করে লাঠিমের মতো ঘুরতে ঘুরতে। সে কি ঘুরুনি! মনে হল, আকাশ ঘুরছে, তারা ঘুরছে, পৃথিবী ঘুরছে, পেটের ভেতর আমার মাসির মোয়াগুলোও যেন ঘুরতে লেগেছে! কখনও মাঠের ওপর দিয়ে, কখনও গাছের মাথা ডিঙিয়ে, গোলাটা সাদা খরগোশের মতো লাফিয়ে, গড়িয়ে, কখনও জোরে, কখনও আস্তে আমাকে নিয়ে ছুটে চলেছে!

ভয়ে দুই হাতে চোখ ঢেকে চলেছি। ক্যাঁ কোঁ চরকা কাটার শব্দ শুনে চোখ খুলে দেখি এক বুড়ি সুতো কাটছে আর একটা খরগোশ তার চরকা ঘুরোচ্চে। বুড়িকে দেখেই চিনেছি, সেই আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি, যে চাঁদের ভেতরে বসে থাকে! আর ওই তার চরকা, ওই খরগোশ! আঃ বাঁচা গেল, এটা তবে গোলাভূত নয়! ইনিই আমাদের চাঁদমামা, আর বুড়ি তো আমাদের মামি! আর এ খরগোশ তো আমাদের সেই খাঁচার খরগোশটি, বিলিতি ইঁদুরের আর গিনিপিগগুলির বড়মামা!

'বলি মামি এমন করে কি ভয় দেখাতে হয়!' বলেই আমি খরগোশটাকে খপ করে কোলে তুলে নিয়েছি।

'ওরে ছাড়, ছাড়! আমার চরকা কাটা বন্ধ করিস নে, দেখছিস নে এই চরকার জোরেই চাঁদমামার সংসার চলছে!'

সত্যিই দেখি চরকা বন্ধ হতেই চাঁদমামা গড়াতে গড়াতে থেমে গিয়ে লাঠিমের মতো মাটির ওপর কাত হয়ে পড়েছেন! আমি খরগোশটি মামির হাতে দিয়ে বললুম, 'কই মামি চালাও দেখি মামাকে।'

খরগোশ চরকায় যেমন এক পাক দিয়েছে অমনি চাঁদমামা গা ঝাড়া দিয়ে ঘুরতে লেগেছেন। বুড়ি ডাকছে, 'দে পাক, দে পাক!' খরগোশ ততই পাক দিচ্ছে আর চাঁদমামাও তত ঘুরপাক দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে রবারের বলের মতো নাচতে নাচতে চলেছেন। যত বলি, 'মামি আর পাক দিও না, মামাকে আমার অত ঘুরিও না, মামা হাঁপিয়ে দম আটকে কোনদিন মারা পড়বেন যে! একটু রয়ে বসে চালাও, শেষে বুড়ো বয়সে মামার কি মাথা ঘুরুনির রোগ ধরিয়ে দেবে?' জানি কি যে মামি আমার কালা! আমার একটি কথাও বুড়ির কানে যায়নি। সে কেবল বলছে, 'দে পাক, দে পাক!' আমি যত ইশারা করে বলি, 'আস্তে, আস্তে!'—বুড়ি ভাবে জোরে চালাতে বলছি, ততই ডাকে, 'দে পাক, দে পাক!'

মামা রেলের গাড়ির মতো হু হু করে ছুটে চলেছেন। 'ওরে থামা, থামা! মাথা ঘুরে গেল, আর যে পারিনে'—বলেই লাঠি তুলেছি খরগোশটাকে মারতে। যেমনি লাঠি তোলা অমনি খরগোশটা খ্যাঁক করে তেড়ে এসেছে, ক্যাঁচ করে চরকাটা বন্ধ হয়ে গেছে আর পটাং করে মামির হাতের সুতো কেটে গেছে। যেমন সুতো কাটা আর ঝপাং করে চাঁদমামা গিয়ে একটা নদীর জলে পড়েছেন, পড়েই ফেটে চৌচির!

'কি করলে গো মামি!' বলেই চমকে দেখি নদীর ওপারে পালকিসুদ্ধ আমি ঠিকরে পড়েছি! কোথায় বুড়ি, কোথায় চরকা, কোথায় বা সে খরগোশ! নদীর জলে দেখি একরাশ কাচের টুকরোর মতো চাঁদমামার ভাঙা আলো, খানিক চকচক করেই নিভে গেল। আকাশের দিকে চেয়ে দেখি সত্যিই চাঁদমামার আধখানা কোথায় উড়ে গেছে।

ভাগ্যি নদীতে তেমন জল ছিল না, নইলে সবাই আজ ডুবেছিলাম আর কি! বড় তেষ্টা পেয়েছিল। নদী থেকে এক ঘটি জল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে তবে বাঁচি!

নদীর ধারেই একটা গাঁ রয়েছে। দেখে সাহস হল; ভাবলুম—আজ রাত্তিরে ওই গায়ে কারু গোয়াল ঘরে শুয়ে থাকি; কাল সকালে এখান থেকেই ফিরে পালাব, পিসির বাড়ি যাওয়ার আর কাজ নেই বাবা! এই মনে করে গাঁয়ের ভেতরে গিয়ে দেখি, সেখানে জনমানব নেই! ডাক-হাঁক করে কারও সাড়াও পাইনে! যাই হোক, গাঁ ছেড়ে আর এক পাও নড়া নয়। চাদর মুড়ি দিয়ে একটা ঘরের দাওয়ায় শুয়ে পড়লুম। যেমন শোয়া, আর ঘুম—অকাতরে ঘুম।

খানিক পরে জেগে দেখি, সেই মনসতলার লণ্ঠন-ভূতটা আর তার চার বন্ধু আলো নিয়ে আমার মুখের কাছে বসে আছে। 'তবে রে!' বলেই যেমন উঠতে যাব অমনি তারা বলে উঠেছে, 'দেখ বাবু, ফের যদি লাঠি দেখাও কি মারতে আস, তবে আবার আমরা তোমাকে ফেলে পালাব। আর যদি চুপ করে ভালমানুষটি হয়ে পালকিতে বসে থাক, তবে ওই কি-বলে-ও-কি-তলা পর্যন্ত তোমাকে আমরা পৌঁছে দেব।' বুঝলুম, ভূতগুলো ভয়ে রামনাম মুখে আনতে পারছে না, তাই পিসির বাড়ি যেতে যে রামচণ্ডীতলার কথা শুনেছি তাকে বলছে—কি-বলে-ও-কি -তলা।

ভূতগুলো ভয় পেয়েছে দেখে সাহস হল; পালকিতে আবার উঠে বসলুম।

এবার আর ভয় করছে না—ভোর হবার এখনও দেরি আছে কিন্তু এরই মধ্যে ভূতগুলো যেন একটু ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে; মাঠে আর ঘনঘন আলেয়া দেখা দিচ্ছে না, পথের ধারে তালগাছ তো দেখাই দিচ্ছে না, কোথাও মনসাগাছের ছায়াটি পর্যন্ত আর দেখা যায় না। পুবদিক থেকে ভোরের বাতাস একটু একটু আসছে; ভূতগুলো হাওয়া পেয়েই যেন জড়োসড়ো। আমি কিন্তু বেশ আরামে পালকিতে দরজা খুলে ঘুম দিতে দিতে চলেছি।

ভোর হয় দেখে ভূত-বেহারা চারটে ভয় পেয়েছে। কিন্তু রামচণ্ডীতলায় আমাকে পৌঁছে দিলেই তাদের ছুটি এই ভেবে তাদের একটু আহ্লাদও হয়েছে। চার ভূত চার সুরে চিঁচিঁ, পিঁপিঁ, খিটখিট, টিকটিক করে গান গাইতে গাইতে চলেছে—ঠিক যেন কত দূর থেকে চিল ডাকছে, আর কোলাব্যাঙ কটমট করছে। ঘুমের ঘোরে শুনছি যেন 'কুহু কেকা'র ঠিক সেই পালকির গানটা। কিন্তু কথাগুলো সব উল্টোপাল্টা আর সুরটাও বেখাপ্পা বেয়াড়া—বেজায় ভুতুড়ে। কেবল হাড় খটখট, দাঁত কিটমিট, গোঙানি আর কাতরানি শুনে যে গায়ে জ্বর এল! ঘুমিয়ে আছি কিন্তু তবু শুনছি :

চলে চলে
হুমকিতালে
পংখী গালে
মাসিপিসি
বাঘবেড়ালে।

ভূতপেরেতে
চলেছে রেতে
হনহনিয়ে
ভূতপেরেতে।

পালকি দোলে
উঠতি আলে
নালকি দোলে
নামতি খালে।

আলো-আঁধারে
শেওড়াগাছ
কালোয় সাদায়
বেড়াল নাচ।

মরানদী
বালির ঘাট
মনসতলায়
মাছের হাট।

ভূতের জমি
ভূতের জমি
ভূতপেরেতের
নাইকো কমি।

উড়ছে কতক
ভনভনিয়ে
চলছে কতক
হনহনিয়ে

চলছে কতক
গাছতলাতে
দুলছে কতক
তালপাতাতে।

দিনদুপুরে
বাদুড় ঘুমোয়
রাতদুপুরে
হুতুম থুমোয়।

ভোঁদড় ভাম
ব্যাঙ-ব্যাঙাচি
টিকটিকি আর
কানামাচি।

গঙ্গাফড়িং
জোনাকপোকা
আরসোল্লা
ন্যাংটা খোকা।

ছুঁচো ইঁদুর
খ্যাঁকশেয়াল
শুকনো পাতা
গাছের ডাল।

সব ভুতুড়ে
সব ভুতুড়ে
ঘূর্ণি হাওয়ায়
চলছে ঘুরে।

জগৎ জুড়ে
ঘুরছে ধুলো
বাতাস দিয়ে
দুলছে কুলো!

সব ভুতুড়ে
সব ভুতুড়ে
আলো-আলেয়া
জ্বলছে দূরে।

সব ভুতুড়ে
ভূতের খেলা
খেজুরতলায়
ইটের ঢেলা...

গানটা শুনছি একবার—'ছুঁচো, ইঁদুর, কানামাছি, ভোঁদড়, প্যাঁচা, টিকটিকি, খ্যাঁকশেয়াল।' গানটা শুনছি দু'বার—'গঙ্গাফড়িং, জোনাকপোকা, আরসোলা, বাদুড়!' গানটা শুনছি তিনবার—'আলো-আলেয়া, ঘূর্ণি হাওয়া, খেজুরগাছ, ইটের ঢেলা।' একবার, দু'বার, তিনবার, বারবার তিনবার ইটের ঢেলা পড়েছে কি আর পালকিসুদ্ধ আমাকে ভূতগুলো ঝপাং করে মাটিতে ফেলে খেজুরগাছের তলায় একটা মরা গরু পড়েছিল সেটাকে নিয়ে লুফতে লুফতে দৌড় মেরেছে! ওদিকে অমনি রামচণ্ডী থেকে রাত তিনটের আরতি বেজেছে—টংটং, টং-আ-টং, টংটং-আ-টং।

এই খেজুরতলা পর্যন্ত ভূত আসতে পারে, তার ওদিকে রামচণ্ডীতলা, সেখানে রাম-সীতা বসে আছেন, হনুমান, জাম্ববান পাহারা দিচ্ছে, ভূতের আর সেখানে এগোবার জো নেই। ভূতপত্রীর লাঠিরও জোর সেখানে খাটবে না। কাজেই পোঁটলা-পুঁটলি, লাঠি ছাতা সমস্ত পালকিতে রেখে, কোমর ধরে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে বালি ভেঙে রামচণ্ডীতলায় রামসীতা দেখতে তিনটে রাতে অন্ধকার দিয়ে একলা চলেছি। সঙ্গে একটি আলো নেই, হাতে লাঠিটি পর্যন্ত নেবার জো নেই। কি জানি লাঠি দেখে যদি হনুমান মন্দিরে ঢুকতে না দেয়! তখন যাই কোথা?

'রাম রাম' বলতে বলতে বালি ভেঙে চলেছি। বালি তো বালি একেবারে বালির পাহাড়! এক একবার



পিছন ফিরে দেখছি ভূতগুলো আসছে কিনা। যদিও এখানকার বালিতে পা দিলেই তাদের মাথার খুলি ফটাস করে ফেটে যাবে তবুও খেজুরগাছটার ওপর থেকে তারা ভয় দেখাতে ছাড়ে না; টুপ করে হয়তো একটা খেজুর আঁটি এসে গায়ে পড়ল, হয়তো দেখছি খেজুরতলায় যেন একটা কচি ছেলে ওমা ওমা করে কাঁদছে, শুনে ইচ্ছে হয় দৌড়ে গিয়ে দেখি—বুঝি কাদের ছেলে পথ হারিয়ে কেঁদে বেড়াচ্ছে; হয়তো আমার নাম ধরেই পেছন থেকে কে একবার ডাকলে, গলাটা যেন চেনা চেনা, ফিরে দেখি কেউ কোথাও নেই! অন্ধকারে হয়তো দেখলুম মাঠের মাঝে একটা জায়গায় খানিকটা জ্বলন্ত বালি তুবড়ি বাজির মতো ফস করে জ্বলে উঠল, ইচ্ছে হয় গিয়ে দেখি কিন্তু গেলেই বিপদ—একেবারে ভূতে ধরে জরিমানা করে তবে ছাড়বে, নয়তো মট করে ঘাড় মটকে দেবে।

আমি আর এদিক-ওদিক কোনওদিক না দেখে 'সীতারাম সীতারাম', বলতে বলতে চলেছি। ওই দেখা যাচ্ছে বালির পাহাড়ের ওপর পঞ্চবটীর বন, বনের মাথায় রামসীতা মন্দিরের চুড়ো। মনে হচ্ছে এই কাছেই, আর একটু গেলেই পৌঁছে যাব, কিন্তু যতই এগিয়ে যাচ্ছি ততই যেন সব দূরে সরে যাচ্ছে—আমার কাছ থেকে দৌড়ে পালাচ্ছে। আমিও দৌড়েছি খোঁড়া পা নিয়ে, দৌড়েছি হাঁপাতে হাঁপাতে, দৌড়েছি উঠি-তো-পড়ি বালির ওপর দিয়ে।

এইবার শুনতে পাচ্ছি মন্দিরের খোল-করতাল বাজছে, দেখতে পাচ্ছি জাম্ববানের দল আগুন জ্বালিয়ে গাছতলায় বসে আছে; হনুমানের ল্যাজ বটের ঝুরির মতো পাতার ফাঁক দিয়ে ঝুলে পড়েছে। আর ভয় কি! বলে যেমন রামচণ্ডীতলায় ছুটে যাব আর নাকটা গেল ঠুকে। একি, নাক ঠুকল কিসে? এই তো সামনে সোজা রাস্তা—গাছের তলা দিয়ে মন্দিরে উঠেছে; তবে নাক ঠোকে কিসে?

নাকে হাত দিয়ে দেখি নাকটা বিলিতি বেগুনের মতো ফুলে উঠেছে। সামনে হাতড়ে দেখি প্রকাণ্ড কাচ, তার ভেতর থেকে ফ্রেমেবাঁধা ছবির মতো রামচণ্ডীর মন্দির, পঞ্চবটী বন, হনুমানের ল্যাজ, সবই দেখা যাচ্ছে; কেবল তার ভেতরে যাওয়া যাচ্ছে না। ফড়িংগুলো যেমন লণ্ঠনের চারদিকে মাথা ঠুকে মরে, আমিও তেমনি ঘুরে বেড়াচ্ছি চারদিকে কেবল নাক ঠুকে ঠুকে। নাকটা বেগুনের মতো গোল হয়ে ফুলে উঠেছিল, কাচে লেগে লেগে ক্রমে চ্যাপটা হয়ে গেল, তবু ভেতরে ঢোকবার রাস্তা কিন্তু পেলুম না।

হাঁপিয়ে গেছি, বালির ওপরে বসে পড়েছি, হনুমানের গোটাকতক ছানা আমাকে দেখে দাঁত বের করে

হাসছে। ভারি রাগ হল, রাগে বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল। 'জয় রাম!' বলে দিয়েছি এক লাফ সেই কাচের ওপরে।

লাফ দিয়েই ভাবলুম—গেছি! হাত পা কেটে, সকল গায়ে কাচ ফুটে রক্তারক্তি হল দেখছি! কিন্তু আশ্চর্য! রামনামের গুণে জলের মতো কাচ কেটে একেবারে ভেতরে গিয়ে পড়েছি—হনুমানের জাম্ববানের দলের মাঝখানে! আর অমনি চারদিকে রব উঠেছে—'জয় রাম! জয় জয় রাম, সীতারাম!' সমুদ্দুরের ডাক শুনছি 'জয় জয় রাম!' বাতাসে শব্দ শুনছি—'জয় রাম!' চারদিকে 'জয় রাম সীতারাম!'

কেউ আমাকে একটি কথাও বললে না, আমার দিকে ফিরেও চাইলে না। আমি রামসীতা দর্শন করে একটা কাঁটাবন পেরিয়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে পড়েছি। সেখানে দেখি, ছটা বেহারা আমার পালকিটি নিয়ে বসে আছে—দেখতে কালো কিচকিন্দে।

'কে হে বাপু তোমরা আমার পালকিটি নিয়ে?'

'বাবুজি, আমরা তোমার পিসির চাকর—কিচকিন্দে, কাসুন্দে, বাসুন্দে, ঝালুন্দে, মালুন্দে, হারুন্দে।'

'আচ্ছা বাপু, চল তো পিসির বাড়ি'—বলেই আমি পালকি চেপে বসেছি।

এবার চলেছি আরামে, কোনও ভয় নেই; পা ছড়িয়ে বসে, পালকির দুই দরজা খুলে, মনের আনন্দে চারদিক দেখতে দেখতে চলেছি। কেমন তালে তালে এবার পালকি চলেছে—কালকাসুন্দি, ঝালকাসুন্দি! ঝাঁকুনি নেই, পালকি চলেছে—আমকাসুন্দি, জামকাসুন্দি! যেন জলের ওপর দুলতে দুলতে নেচে চলেছে। পিসির পালকি চলেছে—ধর কাসুন্দে, চল বাসুন্দে, বড়া ঝালুন্দে, খোঁড়া মালুন্দে। পালকির এক দরজা ধরে চলেছে হারুন্দে, আর এক দরজা ধরে চলেছে উড়েদের সর্দার কালো কিচকিন্দে।

হারুন্দের মাথায় কালো চুলের উঁচু ঝুটি আর কিচকিন্দের মাথায় পাকা চুলের শণের নুটি। হারুন্দে ফরসা, কিচকিন্দে কালো মিশ—যেন বাংলা কালি! হারুন্দের চুল যেন বালির ওপরে মনসাগাছ—খাড়া খাড়া, খোঁচা খোঁচা, আর কিচকিন্দের চুল যেন সমুদ্দুরের সাদা ঢেউ—হাওয়ায় লটপট করছে। কিচকিন্দের মাঠটাও দেখছি খানিক সাদা, খানিক কালো, খানিক আলো, খানিক অন্ধকার—একদিকে ধপধপ করছে শুকনো বালি আর দিকে টলমল করছে কালো জল—নুনে গোলা। মাঠ দিয়ে চলেছি, না সাদা-কালো মস্ত একখানা সতরঞ্চির ওপর দিয়েই চলেছি!

আমার বাঁদিকে কেবল বালি—সাদা ধপধপ করছে বালি; আর আমার ডানদিকে রয়েছে কালি গোলা সমুদ্দুর—কালো—কাজলের মতো, বাঁয়ে চলেছে হারুন্দে—ডাঙার খবর দিতে দিতে, ডাইনে চলেছে কিচকিন্দে—জলের আদি অন্ত কইতে কইতে। আমি চলেছি পালকিতে শুয়ে মনে মনে দুজনের দুটো গল্প সাদা একটা শেলেটের ওপর কালো পেনসিল দিয়ে লিখে নিতে নিতে। কিচকিন্দের গল্পটা জলের কিনা তাই সেটা লিখে নিতে নিতেই ধুয়ে মুছে গেছে, একটুও আর পড়া যাচ্ছে না। কিন্তু হারুন্দের গল্পটা বালির আঁচড়ের মতো একেবারে শেলেটে কেটে বসে গেছে—ধুলেও যায় না, মুছলেও যায় না—বেশ পষ্ট পষ্ট পড়া যাচ্ছে।

হারুন্দের কথা

'আমার নাম হারুন্দে নয়—হারুন-অল-রসিদ, বোগদাদের নবাব খাঞ্জা খাঁ জাহান্দর শা বাদশা। এখন হয়েছি হারুন্দা।'

বোগদাদের হারুন-অল-রসিদের কথা আরব্য উপন্যাসে পড়েছি, আবু হোসেনের থিয়েটারেও তাকে দেখেছি—কখনও সদাগর সেজে বেড়াচ্ছে, কখনও ফকির, কখনও বা কাফ্রি চাকর। এখন আবার তিনি উড়ে বেহারা সেজে এলেন দেখছি!

অবাক হয়ে হারুন্দের মুখের দিকে চেয়ে আছি—কখন আবার সে ফকির হয়, কি বাদশা হয়! আমাকে হাঁ করে থাকতে দেখে বলছে, 'আমার কথায় বিশ্বাস হল না বুঝি? আচ্ছা দেখ!' বলেই একবার হারুন্দে দাড়িতে গোঁফে মোচড় দিয়েছে। আর অমনি দেখি, সে হারুন্দে আর নেই! ইয়া দাড়ি, ইয়া গোঁফ, মাথার বকের পালক গোঁজা পাগড়ি, গায়ে চিনেপোতের জোব্বা-কাব্বা পায়ে ঢিলে ইজের আর দিল্লির লপেটা পরে হাতে বাঁকা এক তলোয়ার নিয়ে দেখা দিয়েছে—হারুন বাদশা! ফিক করে হেসে আমাকে সে যেমন সেলাম করেছে আর অমনি আমি ফস করে দেশলাই জ্বেলে ফেলেছি। বাদশার হাতে গলায় মাথায় হীরে মানিকের গহনাগুলো এমন ঝকঝক

করে উঠেছে যে চোখে ধাঁধা লেগে গেছে। কিচকিন্দে ছিল পাশে; সে অমনি ফুঃ করে আলোটা নিভিয়ে দিয়েছে! আর কোথায় বাদশা?—যে হারুন্দে সেই হারুন্দে!

আলো জ্বালতে হারুন্দে ভারী রেগে গেছে, কিছুতে আর গল্প বলতে চায় না। অনেক হাতে পায়ে ধরে তাকে ঠাণ্ডা করেছি তবে সে আবার গল্প বলছে, 'দেখলে তো আমিই ছিলুম বোগদাদের নবাব খাঞ্জা খাঁ জাহান্দর শা বাদশা হারুন-অল-রসিদ! আর ওই যে কালো কিচকিন্দে উড়েটা তোমার ওপাশে চলেছে, ও ছিল মসুর—আমার কাফ্রি চাকর। তুমি ফস করে যেমন আলো জ্বেলেছিলে ও তেমনি খপ করে তোমার মাথা কেটে ফেলতে পারে যদি আমি হুকুম দিই। দেখবে? মসুর—'

'না! না!' বলেই আমি হারুন্দের মুখ চেপে ধরেছি, পাছে হুকুম বেরিয়ে পড়ে। কিচকিন্দে আমার গা টিপে বলছে, 'শোনো কেন! ওটা একটা পাগল, আমি কোনও পুরুষে ওর চাকর নই।'

একটা ভারী মজা দেখছি—কিচকিন্দে আমার গাটি ছুঁয়েছে আর তার মনের কথা পষ্ট পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, কিচকিন্দেকে মুখ দিয়ে একটি কথাও বলতে হচ্ছে না।

কিচকিন্দের কথায় সাহস পেয়ে হারুন্দের মুখ ছেড়ে দিলুম। ছাড়তেই শুনলুম, হারুন্দের মুখের হুকুমটা গোঁ করে তার বুকের ভেতর নেমে গেল; হারুন্দেও আর রাগ-টাগ করলে না।

'দেখলে তো!' বলেই সে আবার গল্প শুরু করল : 'একদিন আমি আমার বসরাই গোলাপবাগ বলে যে বাগান সেখানে বসে গুড়গুড়িতে তামাক খাচ্ছি, আর গোলাপ জলের ফোয়ারার ধারে বসে ওই মসুর আমার পোষা বুলবুল বোস্তাঁর সোনার খাঁচাটা ধুয়ে মেজে সাফ করছে, এমন সময় সিন্ধবাদ নাকি সাত সুমুদ্দুরের জলে সাতখানা জাহাজডুবি করে এসে হাজির—ভিজে কাপড়ে দুহাতে আমাকে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে। মসুরকে বলেছি আনতে একখানা চৌকি, না, মসুরটা এমন গাধা যে এনেছে একটা টুল। আমি রেগে মসুরের মাথা কাটতে যাব আর অমনি সিন্ধবাদ আমার দু'পা জড়িয়ে ধরে বলছে, হুজুর মসুরকে মাপ করুন—অনেক দিনের পুরনো চাকর। শুনুন, এবার কি আশ্চর্য কাণ্ড দেখে এসেছি। এবার আমি জাহাজ নিয়ে হিন্দুস্তানের দিকে বাণিজ্য করতে গিয়েছিলুম, কাচের বাসনের বদলে অনেক হীরে-জহরত হিন্দুস্তানের বোকা লোকগুলোর কাছ থেকে ঠকিয়ে নিয়ে দেশে ফিরে আসছি, এমন সময় জাহাজ আমাদের ঝড়ে পড়ল। অমন ঝড়ও কখনও দেখিনি, সমুদ্দুরে এমন ঢেউও কখনও পাইনি! পাল, দড়ি, হাল, দাঁড় ভেঙেচুরে ছিড়ে খুঁড়ে কোথায় উড়ে গেল তার ঠিক নেই! সাতদিন সাতরাত আমাদের জাহাজ মোচার খোলার মতো জলে ভাসতে ভাসতে শেষে এসে কালাপানিতে পড়ল; সেখানে সমুদ্দুরের জল, হুজুর, ওই মসুরের মতো কালো, আর যেন রেগে টগবগ করে ফুটছে! যেমন কালাপানিতে জাহাজ পড়েছে আর মাঝিমাল্লা সবাই আল্লা আল্লা করে কেঁদে উঠেছে। যত বলি—কাঁদিস কেন? কি হয়েছে বল?—কেউ আর কথায় উত্তরই দেয় না, কেবল ডাঙার দিকে একটা কাফেরদের মন্দির দেখায় আর ভেউ ভেউ করে কাঁদে। এমন সময় জাহাজের কাপ্তেন আমার কাছে এসে বললে—কর্তা আর দ্যাহেন কি? আল্লার নাম ল্যান! ওই যে কাফেরদের মন্দির, ওর মাথায় একটা জাঁতার মতো চুম্বক-পাথর আছে, তারি টানে জাহাজের যত লোহার পেরেক সব একটি একটি করে খুলে ওই মন্দিরের গায়ে যেয়ে লাগবে আর জাহাজের কাঠগুলি ভুস করে আলগা হয়ে মাঝিমাল্লা মালমাত্তা সব জলে যাবে! কত্তা সব জলে যাবে! বলতে বলতে দেখি জাহাজ থেকে পেরেকগুলো খুলে খুলে বৃষ্টির মতো গিয়ে সেই মন্দিরের চুড়োয় চুম্বক পাথরটায় লাগছে। দেখতে দেখতে আমাদের মুরগি রাঁধবার লোহার হাঁড়ি আর রুটি সেঁকবার তাওয়াখানা গেল উড়ে। আমার হাতে আমার হীরে-জহরতের লোহার সিন্দুকের চাবিটা ছিল, সেটাও দেখি পালাই পালাই কচ্ছে। আমি—না আল্লা, না খোদা—চাবিটাকে মুখে পুরে আমার লোহার সিন্দুকটা জাপটে ধরেছি। এদিকে ভুস করে জাহাজটি ডুবে গেছে। আমি কিন্তু ঠিক ভেসে আছি; চুম্বকের টানে লোহার সিন্দুক আমার ঠিক ভাসতে ভাসতে গিয়ে ডাঙায় ঠেকেছে। আমি টপাস করে বালিতে লাফিয়ে পড়েছি আর অমনি হুজুর—আমার সেই লোহার সিন্দুক, আমার অনেক টাকার সিন্দুক হুজুর, অনেক কষ্টে ঠকিয়ে নেওয়া হীরে-জহরতে ভরা সিন্দুক হুজুর, বোঁ করে উড়ে পালিয়েছে—উড়ে-মেড়াদের সেই মন্দিরের চুড়োয়!' —বলেই সিন্ধবাদ মাটিতে লুটোপুটি খেয়ে কাঁদতে লাগল।

আমি সিন্ধবাদের হাত ধরে উঠিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করে টুলে বসিয়ে বললেম, 'সিন্ধবাদ, শোন। জান আমি হারুন-অল-রসিদ, আমার সামনে মিথ্যা কথা বললে তোমার মাথা কাটা যাবে জান!'

সিন্ধবাদ বললে, 'জানি হুজুর, সেইজন্যেই তো আমার দুঃখু! সব সত্যি বলতে হল হুজুর, একটি মিথ্যা কথা দিয়ে এবারকার গল্পটা সাজাতে পারলুম না। ওরে আমার লোহার সিন্দুক!'—বলেই সিন্ধবাদ টুল থেকে ঘুরে পড়েছে। একেবারে অজ্ঞান অচৈতন্য। মসুর অমনি তাড়াতাড়ি তার মুখে জল দিতে এসেছে। আমার ভারী রাগ হল, মসুরকে এক লাথি মেরে বললুম, 'গাধা! আগে ওর মুখ থেকে সিন্দুকের চাবিটা এইবেলা বার করে নে। জেগে উঠলে কি আর দেবে?'

মসুর অমনি সিন্ধবাদের মুখে আঙুল দিয়ে বলছে, 'কই কত্তা চাবি তো পাইনে!'

'পাসনে কি রে, দেখ জিবের নিচে!'

'পাইনে তো কত্তা!'

'দেখ, দেখ, গলায় আটকেছে!'

'চাবি তো নেই কত্তা।'

'খেয়ে ফেলেছে রে গাধা, খেয়ে ফেলেছে, পেট চিড়ে দেখ পাজি!'

মসুর অমনি ঝট করে তার পেট চিড়ে ফেলেছে আর দেখি পেটের ভেতর বজ্জাত সওদাগর তার লোহার সিন্দুকের চাবিটা লুকিয়ে রেখেছে! নিশ্চয় আমার কাছে মিথ্যা কথা বলত—'যেমন আল্লা বলে কেঁদেছি হুজুর, অমনি চাবিটাও উড়ে পালিয়েছে।'

মসুর চাবিটা গোলাপ জলে ধুয়ে আমার হাতে এনে দিলে। আমি মসুরকে হুকুম করলুম, আমার সেই উড়ো সতরঞ্চি আর মুড়ো দূরবীনটা আনতে—যাতে পাখির মতো উড়ে উড়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াই আর সগ্‌গ-মত্ত-পাতালের জিনিস ঘরে বসে দেখি।

সতরঞ্চি আসতেই আমি তার উপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে দূরবীন হাতে উঠে বসেছি, মসুরও আমার পায়ের কাছে বসেছে—পা টেপবার জন্যে। যেমন হুকুম দেওয়া—চলো কালাপানি! অমনি সতরঞ্চি আকাশ দিয়ে উড়ে চলেছে। তামাক খেতে গিয়ে হাতের কাছে নল পাইনে! মসুরটা এমনি গাধা যে গুড়গুড়িটা তুলে নিতে ভুলে গেছে! ভাগ্যি পকেটে কটা সিগারেট ছিল, তাই রক্ষে! মসুরও বেঁচে গেল, আমিও তামাক খেয়ে আরাম পেলুম।

বোগদাদ থেকে বেরিয়ে ঘণ্টাখানেক এসেছি কি না, এমন সময় মসুর বলছে, হুজুর, একটা কালো মন্দিরের চুড়ো দেখা যাচ্ছে, ঠিক ওই ডানদিকে।'

তাড়াতাড়ি দূরবীন কষে দেখি সেটা মক্কার মসজিদ। মসুর এত বড় মসজিদ কখনও চক্ষেও দেখেনি। সে তো অবাক।

আবার খানিক পরে কাফ্রিস্তানের ওপর দিয়ে আমরা উড়ে চলেছি। তখন মসুরের হাসি দেখে কে। সে বলছে, 'ওই দেখা যাচ্ছে সাহারা, হুজুর! ওটা একটা সমুদ্দুর শুকিয়ে গিয়ে চড়া পড়ে গেছে। ওরই ওদিকে দেখুন একটুখানি নোনা জল, তারই ওপারে ফিরিঙ্গি মুলুক আর আমাদের রূমের বাদশার কস্তন্‌তুনিয়ার কেল্লা দেখা যাচ্ছে। ওই দেখুন হুজুর, বালির ওপর দিয়ে সার বেঁধে উটের কাফিলা চলেছে; ওই খেজুরতলায় ফালহানি জল তুলছে, ওই মিসির শহর আর ওই দেখুন সেকেন্দ্রিয়ার কুতুবখানা, হুজুর! ওখানে দুনিয়ার কেতাব জমা আছে। হুজুর ওই যে দেখেন দুটো পব্বতের মতো, ও দুটো হচ্ছে কাফ্রিস্তানের বাদশার কবর। এত বড় কবর আর জগতে নেই। কেবল সোনা-রুপো-হিরে-জহরতে ঠাসা আর তারই মাঝে সব মরা মানুষ শুয়ে আছে—হাজার বরষ ধরে, তবু তাদের দেখে মনে হয় যেন এই মরেছে, নয়তো ঘুমিয়ে আছে। রিমিয়াবিদ্যার জোরে এখনও হাজার হাজার বরষের মরা মানুষগুলো টাটকা রয়েছে হুজুর! যদি দেখতে চান তো নেমে চলুন।'

আমি মসুরকে ধমকে বললুম, 'ওসব জিনের কারখানা আমি দেখতে চাইনে। ওদিকে ওটা কি দেখা যাচ্ছে?'

'হুজুর ওটা নীল নদী, ওখানে নীলপদ্ম পাওয়া যায়। হিন্দুদের যমুনা—আর কাফ্রিদের ওই নীল নদী। হুজুর, ওর ওপর একবার নৌকোয় করে হাওয়া খেয়ে দেখুন, দিল খুশ হয়ে যাবে। ওই নদীর ধারে আমার বাড়ি দেখা যায়, ওই আকের খেতের ধারে হুজুর, ওই আমাদের বুড়ো গাধাটি আমার দিকে মুখ তুলে চেয়ে আছে হুজুর! আমি হিন্দুস্তানে হিরে-জহরতের খোঁজে যেতে চাইনে, আমাকে আমার দেশের এই আকের খেতে ছেড়ে দিয়ে যান হুজুর!'

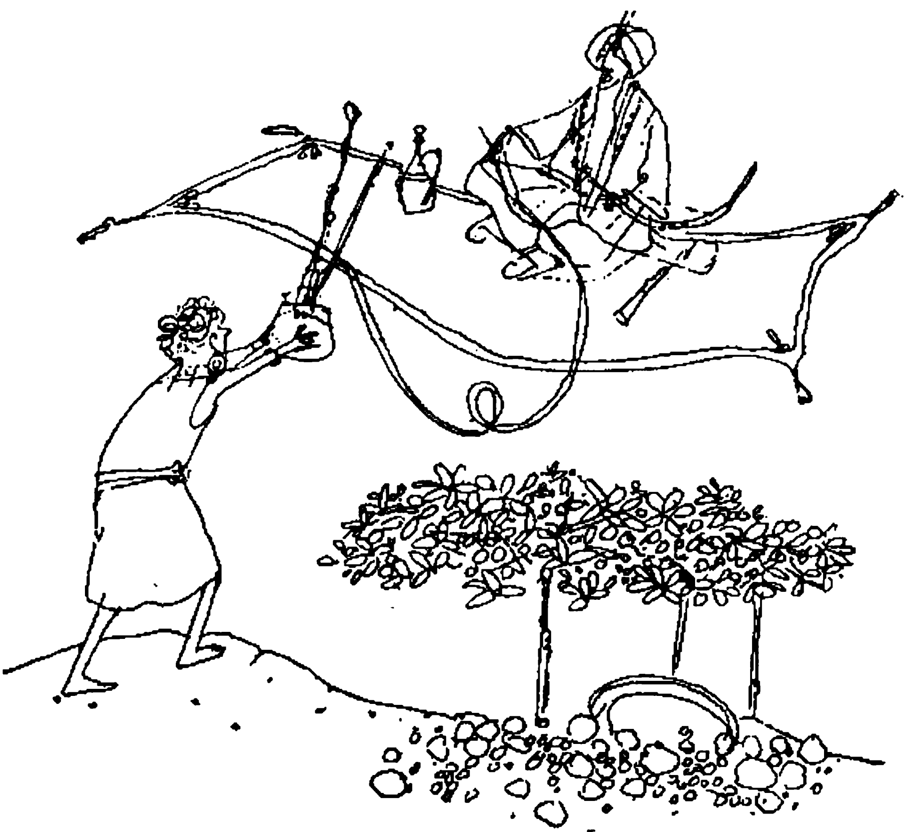
আমি দেখলেম বিপদ। মসুরকে ছাড়লে আমার তো একদণ্ড চলবে না। তামাক দেয় কে? পা টেপে কে? হিন্দুস্তানে একলাই বা যাই কি করে—সিন্ধবাদের জহরত লুঠ করতে?

আমি মসুরকে কিছু না বলে সতরঞ্চির ওপরে পুব-মুখো হয়ে ঘুরে বসেছি—হিন্দু রাজাদের মতো। এতক্ষণ আমি মোছলমানি কেতা মতো পশ্চিমমুখো বসেছিলুম, সতরঞ্চিও তাই পশ্চিমমুখো চলছিল; পুবমুখো বসতেই সতরঞ্চি পুবে ঘুরেছে আর হু হু করে নীল নদী পেরিয়ে একেবারে সিস্তান ঘুরে ইস্পাহানে হাজির। সেখানে বুলবুল বোস্তাঁর ঝাঁক, হাফেজের গান গাইতে গাইতে আমাদের সঙ্গে সব উড়ে চলেছে; মাটি থেকে সিরাজি সরবত আর ইস্তাম্বুল আতরের খোসবো আসছে। আমারও তেষ্টা পেয়েছে—মসুরেরও খিদে লেগেছে; দুজনে একটা মেওয়ার বাগানের ধারে আকাশ থেকে নেমে এসেছি। মসুরকে দুটো মোহর ফেলে দিয়েছি—দু বোতল সিরাজি সরবত আনতে। মসুরটা এমনি গাধা! দেখি, খানিক পরে দু মোহর দিয়ে এক ঝাঁকা বেদানা আর আঙুর এনে হাজির!

'সিরাজ কই রে? কতকগুলো শুকনো বেদানা নিয়ে এলি যে!'

'হুজুর, খোদাবন্দ, জাঁহাপনা! সিরাজি আর পাওয়া যাবে না। দোকানে যে কটা ছিল, একা মসুর—হুজুরের পেয়ারের গোলাম এই মসুর—তা শেষ করেছে!'

ভারি রাগ হল, ধাঁ করে মসুরের নাকে এক ঘুঁষি বসিয়ে দিলুম। মসুরটা সিরাজি খেয়ে একেই টলছিল, ঘুঁষি খেতে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। মেওয়ার ঝাঁকাটা রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে, আর দেখি তার ভেতরে একটা সিরাজির বোতল। আমি সেটা কুড়িয়ে মসুরকে বললুম, 'মসুর, যেমন আমার সঙ্গে চালাকি তেমনি থাক তুমি



এইখানে পড়ে, আমি চললুম!' বলেই যেমন আকাশে উড়তে যাব আর মসুর ধরেছে আমার গুড়গুড়িটা চেপে, আর বলছে, 'হুজুর, আমি মসুর হুজুর, কসুর মাপ করুন হুজুর, আমি আপনার পুরনো চাকর হুজুর, গুড়গুড়ি হুজুর, পায়ের জুতো হুজুর, গোলামের গোস্তাখি মাপ হোক হুজুর।'

গুড়গুড়ি যায় দেখে মসুরকে সেবারের মতো সঙ্গে তুলে নিলুম। তখন আকাশের ওপর দিয়ে সতরঞ্চি হু

হু করে উড়ে চলেছে। দেখতে দেখতে কাবুল ছাড়িয়ে কান্দাহারে পৌঁচেছে। মসুর বলছে, 'হুজুর মেওয়াগুলো ফেলে আসা হল—অমন বেদানা!'

আমি অমনি কান্দাহারের একটা মেওয়ার বাগানে সতরঞ্চি নামিয়েছি; সেখানে মানুষের মাথার মতো এক একটা বেদানা ফলে আছে। মসুর তো দেখেই অবাক।

'কেমন মসুর, এমন বেদানা কখনও দেখেচিস?'

'হুজুর না!' বলেই মসুর একটা বেদানা ভেঙেছে আর অমনি চারদিক থেকে কাবুলিওয়ালা মোটা লাঠি হাতে তেড়ে এসেছে। আমি অমনি মসুরকে টেনে নিয়ে সোঁ করে আকাশে উঠেছি; মসুর তো রেগেই লাল। বলে, হুজুর কেন পালিয়ে এলেন? কাবুলিদের আচ্ছা করে ঘা-কতক দিয়ে আসতুম!'

আমি মসুরকে সাবধান করে দিয়ে বললুম, 'মসুর, খবরদার আর এমন কাজ কোরো না। মসুর, ওরা যদি আজ তোমাকে ধরতে পারত তবে মমিয়াই করে ছেড়ে দিত। জান। মমিয়াই দেখেছ মসুর?'

'হ্যাঁ হুজুর, হাকিমসাহেবের কাছে যে কালো মলম তাকেই তো বলে মমিয়াই!'

'হ্যাঁ, ঠিক তোমার মতনই কালো। মমিয়াই হয় কিসে জান?—কালো মানুষের চর্বিতে।'

'সে কি হুজুর!'

'হ্যাঁ, শোনো তবে—কাফ্রিদের ছেলে কিম্বা যে কোনও কালো ছেলে কিম্বা দুষ্টু যদি সুন্দর ছেলে হয় তাদের ওই কাবুলিওয়ালারা ভুলিয়ে ভুলিয়ে ঝুলির ভেতর পুরে এনে একটা মেওয়ার বাগানে ছেড়ে দেয়। সেখানে মনের আনন্দে ছেলেগুলো বেদানা কিসমিস খোবানি আঙুর খেয়ে বেড়ায় আর মোটা হতে থাকে; শেষে মোটা হতে হতে তাদের গা থেকে চর্বি গড়াতে থাকে, তখন সেই কাবুলিওয়ালাদের হাকিম একটা আগুনের কুণ্ডুর ওপর গরম জল চাপিয়ে সেই মোটা ছেলেগুলোর পায়ে দড়ি বেঁধে মুরগির মতো নিচে মুখ ওপরে পা করে ঝুলিয়ে রাখে; আগুনের তাতে তাদের সেই চর্বি গলে টপটপ করে সেই কড়ায় পড়তে থাকে। যতক্ষণ একফোঁটা চর্বি থাকবে ততক্ষণ কিছুতে তাদের ছেড়ে দেবে না—তাতে তারা মরুক আর বাঁচুক। এমনি করে মমিয়াই তৈরি হয় মসুর। তোমার মতো মিশকালো ওরা কটা পায়? ধরতে পারলে আজ আর তোমার রক্ষা ছিল না; নিশ্চয়ই মমিয়াই করে ছেড়ে দিত।' ভয়ে দেখলুম মসুরের ঠোঁট সাদা হয়ে গেছে, ঘুরে পড়ে আর কি! আমি তাকে একটু সিরাজি খাইয়ে ঠাণ্ডা করলুম।

বলতে বলতে পেশোয়ারে এসে পড়েছি। সেখানে সন্ধে হয়েছে কিন্তু কাবুলিওয়ালার ভিড় দেখে মসুর কিছুতে সেখানে রাত কাটাতে চাইলে না। আমি কত বোঝালুম যে এখানে ইংরেজের রাজ্য—কাবুলিদের কিছু উৎপাত করার জো নেই, কিন্তু মসুর কিছুতে বুঝলে না। কাজেই আরও এগিয়ে উড়ে চলতে হল; একেবারে দিল্লির কুতুব মিনারে এসে সতরঞ্চি নামালুম। মসুরটা এমনি ভয় পেয়েছে যে দিল্লির চাঁদনি চকে গিয়ে দুটো দিল্লির লাড্ডু কিনে আনতেও তার সাহস হল না। কি করি, আমরা কুতুবমিনারের চুড়োয় সতরঞ্চি বিছিয়ে শুয়ে পড়লুম। চাঁদ না উঠলে অন্ধকারে আর ওড়া যাবে না।

রাত ন'টার সময় চাঁদ উঠল। অত বড় চাঁদ—এমন পরিষ্কার চাঁদ হিন্দুস্তান ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। এই চাঁদনিতে দিল্লির চাঁদনি চক আলো হয়ে গেছে; রাস্তার সব লোক বেরিয়ে হাওয়া খাচ্ছে, গান-বাজনা করছে। মসুর দেখি দিল্লির জুম্মা মসজিদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে!

'দেখছ কি মসুর?'

'হুজুর, এমন মসজিদ কোথাও দেখিনি।'

'তবু মসুর, ওর আধখানা রেল কোম্পানি ভেঙে উড়িয়ে দিয়েছে!'

'ওটা কি হুজুর?'

'ওটা শাজাহান বাদশার কেল্লা। ওখানে একটা দরবার ঘর আছে, সে দেখলে চোখ ঠিকরে যেত—এত হিরে-মানিক দিয়ে সেটা সাজানো ছিল। সেইখানে ময়ূর সিংহাসনে বাদশারা বসে দরবার করতেন।'

'ছিল বলছেন কেন হুজুর? এখন কি সেসব নেই?'

'না মসুর, শুনেছি ময়ূর সিংহাসন নাদির শা কেড়ে নিয়ে কাবুলে চলে গেছে, আর দেয়ালে যেসব হিরে-পান্না ছিল তা মোগল বাদশারা বাড়ি ছাড়বার পর কাচ হয়ে গেছে। আসল কথাটা কি জানো মসুর, ও দেয়ালে কাচই লাগানো ছিল কিন্তু মোগল বাদশার ভয়ে লোকে বলত সেগুলো হিরে-মানিক! নইলে অত টাকা গরিব

হিন্দুস্তানের বাদশা শাজাহান কি করে পাবে? একি বোগদাদের বাদশা হারুন-অল-রসিদ যে ঘরখানা হিরে দিয়ে মুড়ে ফেললে? আমি বেশ জানি মসুর, বুড়ো শাজাহান এক তাজমহল আর ময়ূর সিংহাসন তৈরি করতে সব টাকা, যা কিছু তার বাপ দাদা জমিয়ে গিয়েছিল, ফুঁকে দেয়। সেই রাগে তার ছেলে ঔরঙ্গজেব তাকে কয়েদ করে সিংহাসন কেড়ে নেয়—এ আমার উজির জামায়ের নিজের মুখে শোনা, নিজের কানে শোনা, জান মসুর—'

মসুর দেখি ঘুমিয়ে পড়েছে; আমার কিন্তু ঘুম আসছে না, দিল্লির হাওয়া বড় গরম লাগছে। আমি আস্তে আস্তে কুতুব মিনারের ওপর থেকে নেমে বাদশাদের একটা তহ্‌খানার ভেতরে গিয়ে ঢুকেছি। মাটির নিচে তহ্‌খানা, তার চারদিকে জলের ফোয়ারা। এখন আর ফোয়ারার জল উঠছে না, কিন্তু তবু ঘরখানি বেশ ঠাণ্ডা।

খানিক বসে থাকতে থাকতে শুনছি ঢং ঢং করে রাত বারটা বাজল। অমনি দেখি সব ফোয়ারাগুলো খুলে গেছে—আর ফরফর করে গোলাপজলের ছিটে আমার গায়ে পড়ছে। তহ্‌খানার মাঝখানে একটা মখমলের বিছানা ছিল, আমি তারই ওপর শুয়ে একটু চোখ বুজেছি আর দেখি বুড়ো ঔরঙ্গজেব একটা লাঠি ধরে ঠকটক করে এসে হাজির! এসেই আমাকে লাঠির খোঁচা দিয়ে বলছে, 'কৌন হ্যায় রে?' আমিও অমনি তার মুখের ওপর শুনিয়ে দিয়েছি, 'তুম কৌন হ্যায় রে?'

'হাম হিন্দুস্তানকি মালিক ঔরঙ্গজেব বাদশা হ্যায়।'

'ম্যায়নে তুর্কিস্তানকে পাশা হারুন-অল-রসিদ নবাব খাঞ্জা খাঁ খাঁজাহান-ই-জাহান্দার শা বাদশা বোগদাদি হুঁ!'

'আও লড়েঙ্গে!'

'আও লাড়ো!'

বলেই আমরা দুজনে তাল ঠুকতে ঠুকতে পাঞ্জা কষতে কষতে একেবারে কুতুব মিনারের ওপরে এসে হাজির। সেখানে এসে বুড়ো ঔরঙ্গজেবটা আমাকে এমনি জাপটে ধরেছে যে ফেলে আর কি ঠেলে ওপর থেকে নিচে! এমন সময় মসুর ছুটে এসে মেরেছে তার মাথায় এক কিল। যেমন কিল মারা অমনি তার পাগড়িটা পড়েছে ঠিকরে লাহোরের কেল্লায়। সেখানে রণজিৎ সিং খাটিয়া পেতে ছাতে ঘুমুচ্ছিল; পাগড়িটা পরবি তো পড়ো একেবারে তার মুখের ওপরে, আর পাগড়ির কোহিনুর হিরেটা গেছে তার একটা চোখে বিঁধে!

এদিকে ঔরঙ্গজেবটা তার খালি মাথায় হাত বুলুচ্ছে, ওদিকে রণজিৎ সিং একগাল হাসতে হাসতে কোহিনুর হিরেটার দিকে একচোখে চেয়ে আছে আর আমরা সতরঞ্চি চালিয়ে একেবারে আগ্রায় এসে হাজির হয়েছি। দেখি তাজবিবির কবরটার চারদিকে বুড়ো শাজাহানটা কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়াচ্ছে! সেখান থেকে সোজা ফতেপুর সিক্রির দিকে সতরঞ্চি চালিয়ে দিলুম। আমার ছেলেবেলার বন্ধু আকবর সেখানে পঞ্চমহলের ওপরে বসে চতুরং খেলায় মত্ত ছিল। আমাকে দেখে ভারি খুশি। 'এস ভাই বোগদাদি!' বলে আমায় পাশে বসালে। তার সঙ্গে এক পাঠশালায় পড়া, তাই সে আমাকে বলে বোগদাদি, আমি বলি তাকে আগারাওয়ালা। অনেক দিনের পর দুজনের দেখা। দেখি আকবর কেমন বুড়িয়ে গেছে। চুল সব সাদা হয়ে গেছে। গোঁফ-দাড়ি সব ফেলে দিয়ে লোকটা কেমন যেন কাটখোট্টা রকমের দেখতে হয়ে গেছে। তার আর সে চেহারা নেই।

দুজনে অনেকক্ষণ ছেলেবেলার গল্প করে আমি বললুম, 'তবে এখন আসি ভাই, অনেক দূর যেতে হবে।'

'আঃ বসো না। মসুর কিছু খেয়ে নিক। ওরে, মসুরকে ভাল করে খাইয়ে দাইয়ে নিয়ে আয়। আর ভাই, বুড়ো বয়সে মনের সুখ নেই। বড় ছেলে জাহাঙ্গিরটা হয়েছে বেজায় মাতাল, কাজকর্ম কিছুই দেখে না, সেই এলাহাবাদের কেল্লায় বসে কেবল টাকা ওড়াচ্ছে। ভেবেছিলুম নাতি শাজাহানটা একটা মানুষের মতো মানুষ হয়ে বংশের নাম রাখবে, কিন্তু ভাই আমার কপালের দোষে নাতবৌ মরে ইস্তক স্ত্রীর শোকে সেও গেল পাগল হয়ে। ঔরঙ্গজেবটা এদিকে চালাকচতুর, কিন্তু হিঁদুদের ওপর তার বিষদৃষ্টি। হিঁদু প্রজা নিয়েই আমার কারবার, অথচ তাদেরই সে চটাতে চায়। এমন কল্লে কি রাজত্ব থাকে দাদা? আমি সেই ষোল বছর থেকে আজ পর্যন্ত যা কিছু জমিজমা টাকাকড়ি করেছি সব আমার কটা নাতিপুতি মিলে বরবাদ কল্লে দেখছি। কি যে করব ভেবে পাইনে। এখন ভালয় ভালয় মানে মানে মরতে পারলে বাঁচি ভাই বোগদাদি।'

আমি বললেম, 'দেখ জাহাঙ্গির যতই মাতাল হোক, ও তোমার রাজ্য একরকম চালিয়ে নেবে; শাজাহানও যতই পাগলামি করুক কিন্তু দেখ একদিন তোমার নাম রাখবে; ছেলেটি বেশ ধীর, শান্ত, বুদ্ধিমান! কিন্তু ওই

যে তোমার শাজাহানের ছেলে ঔরঙ্গজেবটি, ওটি ভাই, তোমার গোলাপবাগে কাঁটাগাছ। ও তোমার ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে ছাড়বে। আমার সঙ্গে পথে আসতে তার দেখা হয়েছিল, একেবারে গোঁয়ার! আমি বেশ করে তাকে শিক্ষা দিয়ে এসেছি।'

'বেশ করেছ ভাই বোগদাদি! তুমি শিক্ষা না দিলে আর দেবে কে! দেখ তুমি তো এলাহাবাদ হয়ে যাবে, পার তো জাহাঙ্গিরটাকে একটু বুঝিয়ে-সুজিয়ে মদ খাওয়াটা ছেড়ে যাতে সে এখানে এসে একটু কাজকর্ম দেখে সেইটে কর ভাই।'

'আচ্ছা তাই হবে।' বলে মসুরকে নিয়ে আবার সতরঞ্চি উড়িয়ে চললুম, যমুনার কিনারা দিয়ে। যাবার আগে আগারাওয়ালা ছেলেদের জন্য একরাশ পাথরের খেলনা সতরঞ্চিতে তুলে দিলে।

তখন রাত প্রায় দুটো। এলাহাবাদে পৌঁচেছি। ভেবেছিলুম জাহাঙ্গির ওরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু গঙ্গাযমুনার ওপরে নৌকোর পুলের কাছে এসে দেখি কেল্লাটা একেবারে আলোয় আলোময়; এক ক্রোশ থেকে মদের গন্ধ, গানবাজনার আওয়াজ আর আতর-গোলাপের খোসবো পাওয়া যাচ্ছে। কেল্লায় একটা জলসা দেখে আমাকেও একটু সেজেগুজে ফিটফাট হয়ে নিতে হল। তারপর একেবারে গিয়ে জাহাঙ্গিরের খাস মজলিসে হাজির।

জাহাঙ্গির আমাকে দেখেই থতমত খেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরে একেবারে নূরজাহানের কাছে নিয়ে বললে, 'অনেক পথ এসেছেন, এইখানে বিশ্রাম করুন; আমার বন্ধুবান্ধবদের বিদায় করে আমি এলেম বলে।'—বলেই জাহাঙ্গির সরে পড়ল।

আমি নূরজাহানকে বললেম, 'দেখ, আমায় এখুনি আবার রওনা হতে হবে, জাহাঙ্গিরের সঙ্গে আজ রাতে আর দেখা হবার সম্ভাবনা নেই, কালও হয় কিনা সন্দেহ। তোমায় একটি কথা বলে যাই—জাহাঙ্গিরকে একটু সাবধান হয়ে সমঝে চলতে বল, নইলে তোমার শ্বশুর তাকে ত্যাজ্যপুত্তুর করবেন বলেছেন। তোমার শ্বশুর আমাকে এই পাথরের খেলনাগুলো দিয়েছেন; এগুলো তুমি নিয়ে খেলা কর। আমি এসব নিয়ে কি করব? এখন তবে আসি।'—বলে আমি আবার সতরঞ্চি চালিয়ে দিলুম।

মসুরটাকে আমি গাধা বলি, কিন্তু সে একেবারে নির্বুদ্ধি নয়। এরই মধ্যে সে জাহাঙ্গিরের ভিণ্ডিখানা থেকে পোয়াটাক খাস অম্বুরী তামাক যোগাড় করেছে। মরসুরটাকে বাহাদুরি দিতে হবে। কিসে আমার কষ্ট না হয় সেদিকে তার খুব নজর আছে।

ভোর নাগাদ একটু চোখ বুজেছি কি না অমনি মসুর 'হুজুর, দেখুন! দেখুন!' বলে ঠেলে তুলেছে। দেখছি ডানা উঠলে পিঁপড়েগুলো যেমন মাটি ছেড়ে ঘুরে ঘুরে আকাশের দিকে ওঠে, তেমনি দলে দলে ষাঁড় হু হু করে উত্তর দিকে উড়ে চলেছে; আর দক্ষিণ দিকে কেবল গাধা টঙ্গস টঙ্গস করে লাফাতে লাফাতে চলেছে।

এ কি আশ্চর্য ব্যাপার! এত গরু, এত গাধা আসে কোথা থেকে? দূরবিনটা চোখে লাগিয়ে দেখছি একটা নদী আধখানা চাঁদের মতো বেঁকে চলেছে তারই দুই পারে দুই শহর; একটি শহরে কেবল হিঁদুদের মঠ আর মন্দির, পূজারি পাণ্ডা গুণ্ডা আর সন্ন্যাসীর আড্ডা, আর একদিকে কেবল যত মোটা মোটা লক্ষপতি ক্রোড়পতি—তাদের বড় বড় মোটা মোটা থাম দেওয়া বাড়ি আর যত টিকিধারী সভাপণ্ডিতের বাসা! এই দুই শহরের মাঝে দুটো বড় বড় চিতা জ্বালানো রয়েছে, আর শহরের যত লোক দিনরাত কাঠের বোঝা, তেলের কুপো এনে সেই চিতায় ঢালছে। যেমন এক-একবার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে আর অমনি লোকগুলো তাতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আর অমনি একদল গরু হয়ে বেরোচ্ছে, আর অন্য দল গাধা হয়ে দৌড় দিচ্ছে! এমন সময় দেখি দু'পার থেকে দুটো হিঁদুদের বুজরুগ আমাদের হাত নেড়ে ডাকাডাকি করছে—'গোলকে যাবে গো? গন্ধর্বলোকে যাবে গো?'

জাফরের মুখে শুনেছিলুম এরা নতুন মানুষ পেলেই ভেড়া বানিয়ে দেয়। আমি আর তাদের দিকে না দেখে বোঁ করে সতরঞ্চি চালিয়ে দিয়েছি! একেবারে গঙ্গা-পার হাবড়ার পুল কলকেত্তা হাজির! মসুরটা তো আজব শহর কলকেত্তা দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, কিন্তু আমি মসুরকে বললুম, 'এখানে বুজরুগি বড় কম চলে না—মানুষ ধরে এরা পাঁঠা করে রাখে, আর সময়মতো সেগুলোকে বলি দিয়ে বাজারে তাদের মাংস বিক্রি করে, নিজেরাও পাঁঠার ঝোল রেঁধে খায়।' বলতে বলতে দেখি দলে দলে ছেলে বুড়ো যত বাঙালি—কেউ কানে কলম গুজে, কেউ কেতাব বগলে—'ওই দেখা যায় বরানগর, সামনে কাশীপুর, কলকাতা কদ্দূর।'—বলতে

বলতে ছুটে এক একটা বড় বড় কেতাবখানা দপ্তরখানায় গিয়ে ঢুকছে বেশ মনের ফূর্তিতে, কিন্তু বেরিয়ে আসছে দেখি এক একটা বোকা ছাগল!

'মসুর, জানো একে বলে কামরূপ কামিখ্যের ভেল্কিবাজি। আর এই শহরে বাঙলার যত বড় বড় বুজরুগের আসল আড্ডা! ওই দেখ গড়ের মাঠে একটা যাদুঘর, আর ওই আলিপুরে একটা চিড়িয়াখানা, আর ওই পুবদিকে দিঘির ধারে একটা গোলামখানা। আলিপুরে মানুষ-পাঁঠা জিয়োনো থাকে, ওই গোলামখানায় তাদের পোষ মানায়, আর মরবার পরে ওই যাদুঘরে তাদের হাড়গুলো আর ছালগুলো জমা রাখে। এখানে পা দিয়েছ কি বোকা বনেছ!'—বলেই আমি একদণ্ড আর সেখানে না থেকে একেবারে কালাপানির দিকে সতরঞ্চি চালিয়ে দিলুম।

আকাশের ওপর দিয়ে পাখির মতো শোঁ শোঁ উড়ে চলেছি, দেখি বাঙলাদেশের বুজরুগ তাদের দূরবিনগুলো উঠিয়ে আমাদের দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে।

'কাজটা ভাল হল না, মসুর! সবাই আমাদের দেখে ফেললে, এতক্ষণে কালাপানিতে টেলিগ্রাম গেছে যে আমরা ওই মুখেই চলেছি। সেখানে গেলেই পুলিশ লাগবে পিছনে, তখন সিন্ধবাদি হিরেটাই দখল করা শক্ত হবে। মসুর এসো, এইখানেই নেমে পড়া যাক। এইখান থেকে বেশ বদলে, রেলে করে উড়েদের সেই মন্দির পর্যন্ত যাওয়াই ভাল।'

বলে আমরা রূপনারায়ণ নদীর ধারে নেমে তল্পিতল্পা বেঁধে হেঁটে গিয়ে রেলে চড়লুম। আমি হলুম হিরানন্দ বাবাজি আর মসুর হল কিচকিন্দা—আমার উড়ে চেলা। গাড়িতে দেখি কেবল মাড়োয়ারি, মাদ্রাজি আর বাঙালি। বাবাজি দেখে তারা আমাকে আদর করে বসালে, কত কথা পুছতে লাগল। জবাব দিতে পারিনে; কাজেই আমি সাজলুম বোবা আর মসুর হল কালা। আর কোনও গোল রইল না।

ছ'মাস পুরীতে আছি, রোজ মন্দিরের চারদিকে ঘুরে বেড়াই, কিন্তু চুড়োর ওপর কোথায় যে সিন্ধবাদের সিন্দুকটা গিয়ে আটকে আছে তার আর সন্ধান পাইনে। শেষে একদিন একটা ফন্দি মাথায় এল। মসুরকে বললুম, 'দেখ্ মসুর, প্রায়ই দেখি এক একটা লোক ওই মন্দিরের চুড়োয় নিশেন বাঁধতে ওঠে, তুই ওদের দলে ভিড়ে যদি একদিন মন্দিরের চুড়োয় গিয়ে বেশ করে সিন্দুকটা কোথায় আছে দেখতে পারিস তবে তোকে একখানা হিরে বকশিশ দেব।'

মসুর প্রথমে কিছুতেই রাজি হয় না, বলে, 'পড়ে মরব কত্তা।' কিন্তু শেষে দেখি একদিন গেছে! বেশ করে চুড়োটা দেখে মসুর এসে বলছে, 'কত্তা! সিন্দুক এখেনে নেই। ওই চুড়োর ওপর থেকে বিশ ক্রোশ তফাতে আর একটা মন্দির দেখা যায়, সেইখানে আমি স্পষ্ট দেখলুম সিন্দুকটা যেন পাথরের গায়ে ঝুলচে। কিন্তু অনেক দূরে কত্তা! এইখান থেকে বালির ওপর নিয়ে ঠিক সোজা একেবারে পুব মুখা যেতে হবে কত্তা।'

মসুরের কথাই ঠিক। আজ ছ'মাস দেখছি এই কালাপানি দিয়ে কত জাহাজ এল, গেল; কিন্তু একটি পেরেকও দেখলুম না যে এই মন্দিরে এসে লাগল। সেইদিনই রাত্তিরে সতরঞ্চি উড়িয়ে একেবারে মসুরের সেই মন্দিরে হাজির। গিয়ে দেখি মন্দিরের সব আছে কেবল চুড়োটি নেই।

'যাঃ! সর্বনাশ হয়েছে মসুর! সিন্দুক সরিয়ে ফেলেছে মসুর! এত কষ্ট করে আসা সব বৃথা হল মসুর!' বলেই আমি অজ্ঞান।

'কত্তাগো, কি হল!' বলেই মসুরও অচৈতন্য।

যখন আবার চোখ খুলেছি দেখি একটা ছোট ঘরে কে আমাদের বন্ধ করে গেছে—একটি পিদিম আর এক ঘড়া জল দিয়ে। দেখি পিদিমের কাছে একটা বাক্স রয়েছে। বাক্সটা লোহার, আর তার ওপরে পেতল দিয়ে লেখা রয়েছে 'সিন্ধবাদ'। তাড়াতাড়ি বাক্সটা টেনে নিয়ে খুলতে যাব, দেখি পকেটে চাবিটা ছিল সেটা কে চুরি করেছে!

'মসুর, চাবি নিলে কে? নিশ্চয় তোর কাজ!'

'না কত্তা, চাবি তো আমি নিইনি!'

'মিথ্যেবাদি, পাজি!' বলেই সেই লোহার বাক্সটা ছুঁড়ে মেরেছি। যেমন মারা আর অমনি মসুর—'বাপরে!' বলে ঘুরে পড়া; আর বাক্সটা ঘটাং করে খুলে একটা এক-বেগ্‌দা মানুষ বেরিয়ে এসে আমার সুমুখে দাঁড়াল।

একী, সিন্ধবাদ যে! হাতে তার সেই চাবিকাঠিটি। সিন্ধবাদ সামনে এসেই বলছে, 'কি হারুন-অল-রসিদ!—হিরানন্দ বাবাজি! সিন্ধবাদের হিরে পেলে কি? চাবিটা তো তার পেট থেকে খুঁজে বার করলে! এখন হিরেগুলোও বার কর।'

বলতে ছুটে এক একটা বড় বড় কেতাবখানা দপ্তরখানায় গিয়ে ঢুকছে বেশ মনের ফূর্তিতে, কিন্তু বেরিয়ে আসছে দেখি এক একটা বোকা ছাগল!

'মসুর, জানো একে বলে কামরূপ কামিখ্যের ভেল্কিবাজি। আর এই শহরে বাঙলার যত বড় বড় বুজরুগের আসল আড্ডা! ওই দেখ গড়ের মাঠে একটা যাদুঘর, আর ওই আলিপুরে একটা চিড়িয়াখানা, আর ওই পুবদিকে দিঘির ধারে একটা গোলামখানা। আলিপুরে মানুষ-পাঁঠা জিয়োনো থাকে, ওই গোলামখানায় তাদের পোষ মানায়, আর মরবার পরে ওই যাদুঘরে তাদের হাড়গুলো আর ছালগুলো জমা রাখে। এখানে পা দিয়েছ কি বোকা বনেছ!'—বলেই আমি একদণ্ড আর সেখানে না থেকে একেবারে কালাপানির দিকে সতরঞ্চি চালিয়ে দিলুম।

আকাশের ওপর দিয়ে পাখির মতো শোঁ শোঁ উড়ে চলেছি, দেখি বাঙলাদেশের বুজরুগ তাদের দূরবিনগুলো উঠিয়ে আমাদের দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে।

'কাজটা ভাল হল না, মসুর! সবাই আমাদের দেখে ফেললে, এতক্ষণে কালাপানিতে টেলিগ্রাম গেছে যে আমরা ওই মুখেই চলেছি। সেখানে গেলেই পুলিশ লাগবে পিছনে, তখন সিন্ধবাদি হিরেটাই দখল করা শক্ত হবে। মসুর এসো, এইখানেই নেমে পড়া যাক। এইখান থেকে বেশ বদলে, রেলে করে উড়েদের সেই মন্দির পর্যন্ত যাওয়াই ভাল।'

বলে আমরা রূপনারায়ণ নদীর ধারে নেমে তল্পিতল্পা বেঁধে হেঁটে গিয়ে রেলে চড়লুম। আমি হলুম হিরানন্দ বাবাজি আর মসুর হল কিচকিন্দা—আমার উড়ে চেলা। গাড়িতে দেখি কেবল মাড়োয়ারি, মাদ্রাজি আর বাঙালি। বাবাজি দেখে তারা আমাকে আদর করে বসালে, কত কথা পুছতে লাগল। জবাব দিতে পারিনে; কাজেই আমি সাজলুম বোবা আর মসুর হল কালা। আর কোনও গোল রইল না।

ছ'মাস পুরীতে আছি, রোজ মন্দিরের চারদিকে ঘুরে বেড়াই, কিন্তু চুড়োর ওপর কোথায় যে সিন্ধবাদের সিন্দুকটা গিয়ে আটকে আছে তার আর সন্ধান পাইনে। শেষে একদিন একটা ফন্দি মাথায় এল। মসুরকে বললুম, 'দেখ্ মসুর, প্রায়ই দেখি এক একটা লোক ওই মন্দিরের চুড়োয় নিশেন বাঁধতে ওঠে, তুই ওদের দলে ভিড়ে যদি একদিন মন্দিরের চুড়োয় গিয়ে বেশ করে সিন্দুকটা কোথায় আছে দেখতে পারিস তবে তোকে একখানা হিরে বকশিশ দেব।'

মসুর প্রথমে কিছুতেই রাজি হয় না, বলে, 'পড়ে মরব কত্তা।' কিন্তু শেষে দেখি একদিন গেছে! বেশ করে চুড়োটা দেখে মসুর এসে বলছে, 'কত্তা! সিন্দুক এখেনে নেই। ওই চুড়োর ওপর থেকে বিশ ক্রোশ তফাতে আর একটা মন্দির দেখা যায়, সেইখানে আমি স্পষ্ট দেখলুম সিন্দুকটা যেন পাথরের গায়ে ঝুলচে। কিন্তু অনেক দূরে কত্তা! এইখান থেকে বালির ওপর নিয়ে ঠিক সোজা একেবারে পুব মুখা যেতে হবে কত্তা।'

মসুরের কথাই ঠিক। আজ ছ'মাস দেখছি এই কালাপানি দিয়ে কত জাহাজ এল, গেল; কিন্তু একটি পেরেকও দেখলুম না যে এই মন্দিরে এসে লাগল। সেইদিনই রাত্তিরে সতরঞ্চি উড়িয়ে একেবারে মসুরের সেই মন্দিরে হাজির। গিয়ে দেখি মন্দিরের সব আছে কেবল চুড়োটি নেই।

'যাঃ! সর্বনাশ হয়েছে মসুর! সিন্দুক সরিয়ে ফেলেছে মসুর! এত কষ্ট করে আসা সব বৃথা হল মসুর!' বলেই আমি অজ্ঞান।

'কত্তাগো, কি হল!' বলেই মসুরও অচৈতন্য।

যখন আবার চোখ খুলেছি দেখি একটা ছোট ঘরে কে আমাদের বন্ধ করে গেছে—একটি পিদিম আর এক ঘড়া জল দিয়ে। দেখি পিদিমের কাছে একটা বাক্স রয়েছে। বাক্সটা লোহার, আর তার ওপরে পেতল দিয়ে লেখা রয়েছে 'সিন্ধবাদ'। তাড়াতাড়ি বাক্সটা টেনে নিয়ে খুলতে যাব, দেখি পকেটে চাবিটা ছিল সেটা কে চুরি করেছে!

'মসুর, চাবি নিলে কে? নিশ্চয় তোর কাজ!'

'না কত্তা, চাবি তো আমি নিইনি!'

'মিথ্যেবাদি, পাজি!' বলেই সেই লোহার বাক্সটা ছুঁড়ে মেরেছি। যেমন মারা আর অমনি মসুর—'বাপরে!' বলে ঘুরে পড়া; আর বাক্সটা ঘটাং করে খুলে একটা এক-বেগ্‌দা মানুষ বেরিয়ে এসে আমার সুমুখে দাঁড়াল।

একী, সিন্ধবাদ যে! হাতে তার সেই চাবিকাঠিটি। সিন্ধবাদ সামনে এসেই বলছে, 'কি হারুন-অল-রসিদ!—হিরানন্দ বাবাজি! সিন্ধবাদের হিরে পেলে কি? চাবিটা তো তার পেট থেকে খুঁজে বার করলে! এখন হিরেগুলোও বার কর।'

'আমার সঙ্গে তামাশা?'—বলেই যেমন সিন্ধবাদকে ধরতে গেছি আর সে একেবারে চম্পট! যেন নিভে গেল! আমার বড় ভয় হল; এত বুজরুগি কাটিয়ে এসে শেষে কি উড়ে বুজরুগের পাল্লায় পড়লুম। 'মসুর! কথা কোসনে যে মো-সু-উ-র?'



মাথার ওপরে চামচিকে কিচ্‌মিচ্‌ করে বলছে, 'মঁসুঁর কি আর আঁছে সেঁ কালো কিঁচকিন্দে মঁরে ভূঁত হয়ে গেঁছে, এই অঁন্ধকারে তোমাকেও ভূত হয়ে থাকতে হঁবে। হিঁঃ-হিঁঃ-হিঁ।'—বলেই চিক্‌চিক্‌ করে আমার চারদিকে অন্ধকারে উড়ে বেড়াতে লাগল।

মসুরটা হঠাৎ মরে গিয়ে আমায় ভারি বিপদে ফেলে গেল! তার মতন এমন নেমকহারাম চাকর আমি দেখিনি!

রাগে দুঃখে আমি গোঁ হয়ে বসে আছি; চামচিকেটা ঘুরতে ঘুরতে যেমন আমার হাতের কাছে এসেছে আর অমনি আমি খপ করে তাকে ধরে ফেলেছি। ধরেই দেখি সেটা সেই এক-বেগ্‌দা সিন্ধবাদ!

'তবে রে পাজি! এখন তোকে কে রাখে! বল্‌ কোথায় হিরেগুলো রেখেছিস? নইলে তোকে ওই সিন্দুকে বন্ধ করে কালাপানির জলে ফেলে দেব!' বলেই আমি তার হাত থেকে বাক্সের চাবিটা কেড়ে নিলুম।

তখন সিন্ধবাদ আর কি করেন? চুপি চুপি আমাকে যেখানে তার হিরে-জহরতগুলো পোঁতা আছে সেই জায়গাটার নাম বলে দিল।

'জায়গাটা কোথায় জানো?'

'চামচিকেটা যদি আমায় আগে সেটা বলত তবে আমাকে এত কষ্ট পেতে হত না। জায়গাটা হচ্ছে ওই—সে কি বলে কি—সেই যেখানে জগন্নাথের যত যাত্রী ঘুরপাক দেয়!'

'অক্ষয় বট?'

'আরে না বাবু, গাছটাছ সেখানে কোথা!'

'তবে দোলমঞ্চ হবে।'

'সেখানে তো দুলতে হয়। ঘুরতে হয় কোথায়?'

'তবে 'চানবেদী'!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরই কাছাকাছি, ঠিক মনে হচ্ছে না এখন, খানিক বাদে মনে হবে।'—বলেই হারুন্দে চুরুট ফুঁকতে লাগল!

খানিক পরে জিজ্ঞাসা করি, 'হারুন্দে, নামটা মনে পড়ল কি? আমার যে ভারি শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে কোথায় হিরেগুলো লুকনো আছে।'

কথা নেই!

'বলি ও হারুন্দে, মনে পড়ল কি?'

'একটু একটু পড়ছে।'

'বলে ফেল।'

'রোসো বলছি—'ল' না না, 'র' আর 'ন'; 'র' হল না তো! 'র' আর 'ন'র মাঝে কি হয় বাবু?'

'কি হয় হারুন্দে?'

'মনে পড়ছে না। মসুর 'র' আর 'ন'র মাঝে কি হয়? ওহো তুই কেমন করে জানবি? তোকে তো আমি সেই লোহার বাক্সতে পুরে জলে ভাসিয়ে দিলুম। 'র' আর 'ন' তার মাঝে হল—'

'তোমার মাথা আর মুণ্ডু! শোন কেন বাবু, ও পাগলের কথা। ও চিরকালই হারুন্দে, কোনওকালে হারুন-অল-রসিদ নয়। ওর বাপ ওকে লেখাপড়া শেখাতে কলকাতায় পাঠিয়েছিল। সেখানে পৃথিবীর ইতিহাস, পারস্য উপন্যাস আর ডিটেক্‌টিভ গল্প পড়ে পড়ে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কখনও এক টুকরো ইতিহাস, কখনও উপন্যাস, দু'ছত্তর বা কবিতা, দুটো বা সত্যি কথা, দশটা বা মিছে কথা। কখনও হাততালি দিচ্ছে, কখনও গালাগালি। মাথাটা যেন বাংলা খবরের কাগজ—মূল্য দুই পয়সা মাত্র! আমি কিচকিন্দে এই কিচকিন্দায় থেকে বুড়ো হয়ে গেলুম, সিন্ধবাদকে তো কখনও এ তল্লাটে দেখিনি। একটা কথা বললেই হল—সিন্ধবাদ এল, চুম্বকে তার সিন্দুক টেনে নিলে! জাহাজ টেনে নেয় এত বড় চুম্বক পাথর—সে পাথর গেল কোথায়?'

হারুন্দের কথা নেই।

'দেখলে বাবু, গল্পের খেই ধরতে জানে না, গল্প বলতে আসে। ও তো সেদিনের ছেলে। গল্পের ও জানে কি? বোগদাদ-ফোগদাদ তো সেদিনের কথা; সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চার যুগের গল্প আমি জানি। গল্প শুনতে চাও তো শোনো—'

কিচ্‌কিন্দের গল্প

সত্যযুগের মানুষ যজ্ঞডুমুরের গাছের সমান লম্বা ছিল, ত্রেতাযুগে লঙ্কা গাছ, দ্বাপরে ভাণ্ডীর, আর কলিতে লজ্জাবতী। এরপর মানুষ ক্রমে এত ছোট হয়ে যাবে যে শেষে আঁকশি দিয়ে তবে তাদের বিলিতি বেগুনের গাছ থেকে বেগুন পাড়তে হবে।

সেই ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র অবতীর্ণ হলেন—রাক্ষস বংশ ধ্বংস করতে অর্থাৎ যেখানে বাঁশবন ছিল সেখানে লঙ্কাচারা আর বোম্বাই আম বসাতে; যাতে মানুষ বোশেখ-জোষ্টি মাসে আমকাসুন্দি, ঝালকাসুন্দি খেয়ে বাঁচতে পারে। বিশ্বাস না হয়, কাসুন্দে আর ঝালুন্দেকে প্রশ্ন কর।

এখন রামচন্দ্র জন্মালেন, কিন্তু লঙ্কার ধোঁয়া দিয়ে রাক্ষস তাড়ানো তো তাঁর কম্ম নয়। এক লম্ফে সমুদ্রই পার হয় কে? কাজেই হনুমান এই কিষ্কিন্ধ্যায়—ওই যে মনসাতলার ঘাটে কাঁটাবন ওইখানে—জন্ম নিলেন। এদিকে হনুমানও জন্মেচেন আর ওদিকে রথে চড়ে সুয্যিমামা দেখা দিয়েছেন। মামার মুখটি যেন পাকা আমের মতো। দেখেই হনুমানের লোভ হয়েছে, এক লাফে মামার কোলে ঝাঁপিয়ে উঠেছেন। মামা—'হনু! হনু!'—বলে আদর করে যেমন ভাগ্নেকে চুমু খেতে গেছেন আর হনু দিয়েছেন মামার গালে এক কামড়!—'ওরে গেলুম, গেলুম! ছাড়, ছাড়!'—আর ছাড়!

এমন সময় ইন্দ্রদ্যুম্ন যাচ্ছিলেন আকাশ দিয়ে। মামা-ভাগ্নের ঝগড়া দেখে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন বজ্জর। যেমন বাজ পড়া আর হনু 'রাম! রাম!' করতে করতে ঠিকরে গিয়ে পড়েছেন ওই রামচণ্ডীতলায়; আর সূয্যিমামা রথসুদ্ধ পড়েছেন ওই চন্দ্রভাগার কাছে কালিদয়ে বালির পাঁকে। মামার রথের চুড়োটা মচাৎ করে ভেঙে পড়ল, ঘোড়া কটা কন্দকাটা হয়ে বালির পাঁকে আটকা পড়ে গেল—মায় সহিস কোচম্যান লোকলস্কর দাসী চাকর! যে যেখানে ছিল সবাই আড়ষ্ট যেন পাথর!

সূয্যিমামা কালিদয়ে দইকাদা মেখে গড়াতে গড়াতে ডাঙায় গিয়ে উঠলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন তাড়াতাড়ি ঐরাবত

হাতি নিয়ে মামাকে তুলতে যেমন এসেছেন অমনি গেল ঐরাবতও দয়ে পড়ে। কি করেন? তখন হনুমানকে ডাকাডাকি। হনুমান এসে দু'বগলে দু'জনকে নিয়ে তবে স্বগ্‌গে পৌঁছে দেন। সেইদিন থেকে সূয্যিমামা আর রথে চড়ে বেড়াতে গেলেন না, পায়ে হেঁটেই আনাগোনা করেন। সিন্ধুঘোটকটা ভাগ্যি ছিল, তাই চড়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন হাওয়া খেয়ে বেড়ান।

একদিন ইন্দ্রদ্যুম্ন ঘোড়ায় চড়ে এই সমুদ্দুরের ধারে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় সিন্ধুঘোটকের একটা পা গেছে বালিতে বসে। আর ঘোড়া নড়ে না। ইন্দ্রদ্যুম্ন ঘোড়ার পা ধরে টানাটানি করতে ঘোড়ার পা-টা গেল ছিঁড়ে। তিনি আর কি করেন, সেই খোঁড়া ঘোড়ায় ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে ছিষ্টিকত্তা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে হাজির। গিয়েই ব্রহ্মাকে বলছেন, 'আমার আর একটা ঐরাবত হাতি আর উঁচু ঘোড়া না হলে চলছে না। দেবতাদের রাজা হয়ে শেষে কি পায়ে হেঁটে বেড়াব? আমার মান থাকে কেমন করে?'

ব্রহ্মা বললেন, 'আমি বারে বারে তোমাদের জন্যে ছিষ্টি করতে পারিনে, যাও নারদের ঢেঁকিটা চেয়ে নিয়ে চড়ে বেড়াও। হাতি-ঘোড়া পেয়ে যে যত্ন করে রাখতে পারে না তার ঢেঁকি চড়ে বেড়ানোই ঠিক।'

ছিষ্টিকত্তার কাছে তাড়া খেয়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন নারদের কাছে হাজির। নারদ বুদ্ধি দিলেন : 'দেখ ইন্দ্রদ্যুম্ন, তুমি হলে রাজা, ঢেঁকি চড়া তোমার শোভা পাবে না, লোকে হাততালি দেবে, তার চেয়ে যাও তপস্যা করগে, ছিষ্টিকত্তা খুশি হয়ে তোমাকে দুটো কেন দশটা হাতি ঘোড়া ছিষ্টি করে দেবেন।'

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার ছেলে, তপস্যার নাম শুনেই ভয়ে তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। তখন নারদ বুদ্ধি দিলেন, 'যাও ইন্দ্রদ্যুম্ন! রামচন্দ্রের কাছ থেকে রাবণের পুষ্পক রথটা চেয়ে নাও।'

ইন্দ্রদ্যুম্ন এসে রামচন্দ্রকে ধরে বসলেন। রাম বললেন, 'রাবণের রথ কেড়ে নেওয়া তো সহজ নয়, তোমরা যদি আমার সঙ্গে যাও তো হতে পারে। কিন্তু রাবণ যদি চিনতে পারে যে তোমরা দেবতা, তা হলে তোমার বিপদ।'

ইন্দ্রদ্যুম্ন বললেন, 'আজ্ঞে, আমরা বাঁদর সেজে রাবণের সঙ্গে লড়ব।'

রামচন্দ্র বললেন, 'তথাস্তু।'

তারপর রাম-রাবণের যুদ্ধ। হনুমান হলেন যত বাঁদরমুখো দেবতাদের সেনাপতি; আর আমি কিচ্‌কিন্দে হলুম—কিচ্‌কিন্দের দলে যত উড়ে, তাদের সেনাপতি। এই দুই দল নর-বানর—এদেরই কিত্তি কিত্তিবাসি রামায়ণে লেখা আছে। সে তো তুমিও জানো?

তারপর বলি শোনো—রাবণের কাছ থেকে পুষ্পক রথ তো কেড়ে নিয়ে রামচন্দ্র অযোধ্যায় এসেছেন, ইন্দ্রদ্যুম্ন রথটি নিয়ে যান আর কি, এমন সময় সূয্যিমামা এসে বলছেন, 'বাপু রাম, ইন্দ্র বজ্জর ফেলে আমার রথটি গুঁড়ো করেছেন, এখন পুষ্পক রথটি উনি নিলে আমি দু বেলা আপিস করি কেমন করে! উনি রাজার ছেলে ঘরে বসে থাকলে চলে, কিন্তু সকাল-সন্ধে আমাকে যে এই সারা পৃথিবী ঘুরে আলো দিয়ে বেড়াতে হয়, আপিস গাড়ি নইলে আমার চলবে কেন?'

হনুমান ছিলেন বসে রামের কাছে, তিনি অমনি বলচেন, 'ইন্দ্র আমাকেও বজ্জর মেরে দফারফা করেছিল আর কি। কেবল রাম নামের জোরে বেঁচে আছি!'

'কি, রামদাসকে মারা! ইন্দ্রদ্যুম্ন, যাও রথ তোমায় দেব না!' বলেই রাম সূয্যিমামাকে রথটা দিয়ে দিলেন।

ইন্দ্র মুখ চুন করে ফিরে যান দেখে রামচন্দ্রের দয়া হল, তিনি হনুমানকে ডেকে বললেন, 'হনু, তুমি ইন্দ্রদ্যুম্নকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে যাও, সেখান ইন্দ্রের সিন্ধুঘোটকের ছেঁড়া পাখানি উদ্ধার করে গন্ধমাদন থেকে বিশল্যকরণীর পাতার আঠা দিয়ে ইন্দ্রদ্যুম্নের খোঁড়া ঘোড়া জোড়া দিয়ে দাওগে।'

তখন হনুমানকে নিয়ে সমুদ্দুরের ধারে ইন্দ্রদ্যুম্ন হাজির। সেখানে তখনও সিন্ধুঘোটকের ছেঁড়া পাখানা বালির ওপরে লটপট করছিল—হনুমান সেই পা ধরে দিয়েছেন এক টান, আর অমনি বালির নিচ থেকে হড়হড় করে একটা মন্দির বেরিয়ে এল।

হনুমান তো ঘোড়ার পাখানা ইন্দ্রদ্যুম্নর কাছে রেখে বিশল্যকরণীর পাতা আনতে যান, এদিকে ইন্দ্রদ্যুম্ন মাসির বাড়ি থেকে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাকে এনে সেই মন্দিরে পুজো লাগিয়ে দিয়েচেন। হনুমান এসে দেখেন মন্দির দখল। তখন হনু রেগেই লাল! বলে, 'আমি বিশল্যকরণীর পাতা দেব না। আমার মন্দির, আমি রামচন্দ্রকে এখানে বসাব মনে ছিল। তুমি কেন জগন্নাথকে বসালে?'

বড়ো গোলযোগ দেখে ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মাকে আনতে ছুটলেন। ব্রহ্মা এসে বললেন, 'হনুমান, যিনি জগন্নাথ, তিনি রঘুনাথ। তুমি গোল কোরো না, আমি সব ব্যবস্থা করছি।'

সেই দিন থেকে প্রতি বছর রামনবমীর দিন জগন্নাথের রঘুনাথ-বেশ করে পুজোর ব্যবস্থা হল।

ইন্দ্রদ্যুম্ন বললেন, 'ছিষ্টিকর্ত্তা, আমার ঠাকুরের কি বেশ হবে তার ব্যবস্থা করুন।'

ব্রহ্মা ব্যবস্থা করলেন—পাবন্ধি বেশ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন তো ঘোড়ায় চড়ে স্বগ্‌গে যান আর হনুমান রাবণের মধুবন থেকে যে আমের আঁঠিটি সীতাদেবীর হাত থেকে পেয়েছিলেন, সেটিকে একটা বাগানে বসিয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে সেই বাগান এক আমবন হয়ে উঠল আর হনুমান সেই বনের ভেতর দলবল নিয়ে মধুরেণ সমাপয়েৎ করে আরামে রইলেন।

এই তো গেল ত্রেতাযুগে—মানুষ যখন লঙ্কাগাছের মতো, তখনকার কথা। এখন সত্যিযুগের কথা বলতে বল তো বলি—কিন্তু সেটা ভয়ানক সত্যি, গল্পের মজা তাতে নেই, যেন বাঙলার ইতিহাস পড়ার মতো সব ঠিক ঠিক একেবারে ঠিক।

বলেই কিচকিন্দে সত্যিযুগের কথা আরম্ভ করেছে—

'সত্যে ব্রহ্মাঙ্ক কর যাত-অ-অ,
সত্য স্ব-রূ-প তু অনন্ত।
সত্যে তোহার আত্মা যাত-অ-অ
আন্তে জ-নি-লু তোর সত্য,
তোর সঞ্চিলা সেয়ল-অ-অ-অ
অসুর মারি সাধু পাল-অ-অ-অঃ
জগত তোর দেহুঁ যাত-অ-অ,
থিতি পালন করুঁ অন্ত।
তোহ মায়ারে মূরু-খ জন-অ-অ,
আত্মাকু দেখন্তি সে ভিন্ন।
পণ্ডিতে জনান্তি সে এক-অ-অ
মায়ারে দিশই অনেক
তু এ সংসারে দুঃখ সুখে-এ-এ
শরীর বহু নানা রূপে
সাধুকু দিশই নি-র-ম-ল-অ-অ
খল-লোচনে যম কাল-অ-অ-অঃ।'

'ও কিচকিন্দে, থাক! তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলুম না। আর কোনও কথা থাকে তো বল।'

সত্যিযুগের সব কথাগুলোই ওই রকম দাড়িওয়ালা মুনি-গোঁসাইগুলোর মতো গোমসামুখো। আচ্ছা শোনো। দ্বাপরযুগে রাখাল ছেলে ভাণ্ডীরগাছের তলায় দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাচ্ছে আর গরু-বাছুর তার চারদিকে নেচে নেচে গান গাইছে :

'কি সুন্দর মুরলী পা-নী রে সজনী।
তাঙ্কু কে দিব অন্তা আ-নি-রে-এ সজনী।
দিনে যমুনাকু মু যেতে গলি গাধোই
বাটরে দেখিলি মু প্রাণ মাধো-ই রে সজনী।
বাঙ্ক-বাঙ্ক করি মো তে দেলে অনাই
তরকী-তরকী মু অইলি প-লা-ই রে সজনী।
ধাঁই-ধাঁই সে যে মো ধইল লাঙ্গলে-এ
মু ভেঁই পড়িলি যাই যমুনা জলে-এ রে সজনী।'

বলেই কিচকিন্দে ফুঁ-ফুঁ করে একটা বাঁশি বাজাতে আরম্ভ করে দিলে।

'বলি ও কিচকিন্দে, গানের চেয়ে তোমার বাঁশিটি কিন্তু মিষ্টি।'

যেমন এই কথা বলা অমনি কিচ্‌কিন্দে বাঁশি রেখে বলে উঠেছে :

'Thank you Baboo, I earnestly hope and trust that the noble example of this most enlightened and public spirited Kumar Krishna Kich Kinda of Orissa will be followed by all Maharajas, Rajas, Jamindars and other wealthy people—not only in India but throughout the length and breadth of Bengal, Behar & Orissa—for the amelioration of self and friends and all the poor gentlemen at large like হারুন্দে, কাসুন্দে, বাসুন্দে, ঝালুন্দে, অ্যাণ্ড মালুন্দে।'

'ও কি বলচ কিচ্‌কিন্দে?'

'কলির কথা।—ধন্যবাদ তোমাকে বাবু, আমি ব্যগ্রভাবে ভরসা ও প্রত্যয় করিতেছি যে ঐ কুলীন উদাহরণ এই আলোকসম্পন্ন সাধারণ ভূতবান উড়িষ্যার কুমার কৃষ্ণ কিচকিন্দার হইবে অনুগমিত সকল রাজা মহারাজা জমিদার ও যোত্রসম্পন্ন ব্যক্তিগণের দ্বারাই নিজের বন্ধুর এবং হারুন্দে ইত্যাদির মতো বেচারা গরিব এবং ছাড়া-পাওয়া ভদ্রগণের অপেক্ষাকৃত ভাল করিবার নিমিত্তে।'

'এ কথার তো কিছু মানে-মাথা নেই কিচকিন্দে।'

'আচ্ছা শোনো দেখি, এটার কিছু মানে পাও কিনা—বঙ্গ-বিদর্ভনগর লৌবর্ত্ম সমিতি। এটা আরও শক্ত? আচ্ছা দেখ দেখি এটা সহজ কিনা—পূর্ণপরব্রহ্মজ্যোতিস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাতে পূর্ণরূপে নিষ্ঠাবিহীন জীব বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ দেখিয়া বহির্মুখী মনোবৃত্তির দ্বারা বাসনায় আবদ্ধ হইয়া সত্য হইতে বিমুখ হয় ও মিথ্যায় আসক্তি করতঃ কলির ব্রাহ্মণ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে—'

'এটা তো একেবারে সমস্‌কৃত, একটুও বোঝবার জো নেই।'

'তবেই তো বাবু, কলিকালের কথার নমুনা দেখেই ভড়কে গেলে। গল্পটা আগাগোড়া শোনা তোমার কম্ম নয়। ভাণ্ডীরবনে রাখাল ছেলের বাঁশির গানটুকুই তোমার অদেষ্টে লেখা ছিল।'

বলেই আবার কিচকিন্দে বাঁশি বাজাতে লাগল ঃ

'মু ভেঁই পড়িলি যাই যমুনা জলে-এ রে সজনী।'

বাঁশি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছি। ইতিমধ্যে কখন পালকিসুদ্ধ কিচকিন্দে আমাকে সমুদ্দুরের জলে নামিয়ে নিয়ে গেছে তা জানিনে। ঝপাং করে যেমন এক ঢেউ এসে পালকিতে লেগেছে আর ঘুম ভেঙে গেছে।

'ও কিচকিন্দে, কোথায় নিয়ে চললে? পিসির বাড়িতে চল না—এদিকে কেন।'

'বাবু, পিসির বাড়ি কি এখানে? সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে যেতে হবে।'

'জাহাজ কই কিচকিন্দে? পার হব কেমন করে?'

'জাহাজ কি করবে বাবু? জন্ম জন্ম ধরে জাহাজ চালিয়ে গেলেও পিসির বাড়িতে যেতে পারবে না। জলের ওপর দিয়ে পিসির বাড়ি যাবার রাস্তা নেই, যেতে হবে জলের নিচে দিয়ে—ডুব সাঁতার মেরে, সাত ঘাটের জল খেতে খেতে। পিসির বাড়ি যাওয়া কি সহজ বাবু!'

'তাই তো কিচকিন্দে, ডুব সাঁতার তো আমি জানিনে, কেমন করে তবে পিসির বাড়ি যাই!'

'পিসি তো তাই আমাদের পাঠিয়েছেন। ভয় কি? গট্ হয়ে পালকিতে বসে থাকো; এইখান থেকে এক ডুব মারব আর ঠেলে তুলব পালকি এক্কেবারে পিসির বাড়ি। কিন্তু দেখ বাবু, রাস্তার মধ্যে অনেক আশ্চয্যি দেখতে পাবে, দেখো যেন ভয় খেও না। প্রথমে আসবেন কালা-কানা-আংলা-টানা, তারপর আছেন গামলাচালা ফোঁপরা জালা, তার পরে ঘণ্টাকর্ণ রক্তশোষা মাথায়-ছাতা, তারপরে শাঁখচুর্ণি মুক্তোকলাই, তারপর আছেন শুঁড়-দুল-দুল কাঁচুমাচু কল-কবজা দাড়া-বাঁধা, আর রাঘববোয়াল পায়রা চাঁদা।'

'কিচকিন্দে এরা যদি আমায় ধরে?'

'কিছু ভয় নেই। আমরা আছি। ভয় পেলে আমায় ডেকো।' বলেই—'হো রে রে দাদা রে' বলে পালকিসুদ্ধু আমাকে নিয়ে তারা ডুব মেরেছে জলের ভেতর।

প্রথমটা অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাইনে। খানিক পরে দেখি ফুঁকো শিশির মতো ছোট ছোট আলো জলের ভেতর দুধারে সারি সারি ঝুলছে। এক একবার জলের তোড়ে আলোগুলো হুড়হুড় করে গড়িয়ে ডাঙার দিকে

যাচ্ছে আবার গড়গড় করে গড়িয়ে যেখানে ছিল সেখানে ফিরে আসছে। এমন সময় দেখি, এক কড়া তেল জলের ওপর যেমন ভাসতে ভাসতে চলে তেমনি কি একটা আমাদের দিকে পিছলে পিছলে আসছে! অমনি কিচকিন্দে ডেকেছে, 'সামাল! সামাল! বাঁয়ে ধর ভাই!'

সাঁ করে আমরা বাঁ দিকে একটা ডোবার ভেতর নেমে গেছি। সেখান থেকে দেখি—তেলটা ভাসতে ভাসতে আমাদের ঠিক মাথার ওপরে এসে চারদিকে চারটে লম্বা লম্বা আঙুল বার করে জল খুঁটতে লাগল। তারপর আবার আস্তে আস্তে আঙুল কটা গুটিয়ে নিয়ে একদিকে ভেসে চলে গেল।

কিচকিন্দে বললে, 'দেখলে বাবু, উনিই হচ্ছেন কালা-কানা-আংলা-টানা। ওঁর না আছে মাথা মুখ, না আছে



কান, না আছে চোখ; থাকবার মধ্যে আছে কেবল এক আঙুল আর একরাশ তেল চুকচুকে পেট। আঙুলটি গিয়ে কারও গায়ে ঠেকেছে কি আর অমনি সমস্ত পেটটি তেলের মতো গড়িয়ে গিয়ে তার ওপর পড়েছে—যেমন পড়া আর অমনি হজম করে ফেলা! জানোয়ার যদি ওঁর চেয়ে তিন-চার ডবল বড় হয় তবে ঐ পেটটিও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে তেলের মতো ছড়িয়ে গিয়ে জানোয়ারটিকে বেশ করে ঘিরে নেয়!'

'ছুরি দিয়ে পেটটা চিরে দেওয়া যায় না কিচকিন্দে?'

'হবার জো নেই। ওঁকে দু টুকরো কর, দশ টুকরো কর, একশ হাজার টুকরো কর, দেখবে সব টুকরোগুলো একটা একটা নতুন কালা-কানা-আংলা-টানা হয়ে আঙুল বার করে ভেসে বেড়াচ্ছে। সমুদ্দুরের ভেতর এঁর মতো জবরদস্ত আর কেউ নেই বাবু। চল এই আংলা-টানার হাতে পড়লে আর রক্ষে নেই।'—বলেই আমরা চুপি চুপি পালিয়ে চলেছি। এমন সময় দেখি একরাশ চিনেমাটির মার্বেল জলের ভেতর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে। কাছে আসতে দেখি—সেগুলি এক একটি গোল খাঁচা আর ভেতরে একটি করে খুদে আংলা বসে আছে।

'ও কিচকিন্দে, আমাকে চাট্টিখানি ওই মার্বেল ধরে দাও না।'

'দেখ না একবার ধরে!'—বলেই খপ করে দুটো মার্বেল ধরেই কিচ্‌কিন্দে আমার দু'হাতে দিয়েছে। যেমন মুঠো করে ধরা আর শুঁয়োপোকার কাঁটার মতো হাতময় ছুঁচ বিঁধে গেছে!

মার্বেল দুটো ফেলে দিয়ে দু'হাত চুলকোতে চুলকোতে চলেছি, এমন সময় কিচ্‌কিন্দে বলছে, 'গামছা-চালা ফোঁপরা-জালার দেশে এলুম বাবু!'

চেয়ে দেখি চারদিকে কেবল গামলা আর জালা! কোনওটা বড়, কোনওটা ছোট, কোনওটা লম্বা, কোনওটা বেঁটে, কেউ ধানের মরাইটার মতো, কেউ ঢাকাই জালাটার মতো, কেউ চুমকি ঘটিটির মতো। কোনও গামলা ফুলের টবের মতো দাঁড়িয়ে আছে, কোনওটা বা গরুর জাব দেবার ফুটো গামলাটার মতো উল্টোনো রয়েছে!

'এ সব গামলা আর কুপো কেন কিচকিন্দে?'

'জান না? এখানে তোমার পিসির ঘি তেল মজুদ থাকে। দেখ না'—বলেই ছোট একটি ঘিয়ের মটকি কিচকিন্দে আমার হাতে তুলে দিয়েছে।

'ও কিচকিন্দে, ভাঁড়টার মুখ কোন দিকে? ঘি বার করি কেমন করে?'

'দাও, দেখিয়ে দিই।' বলে মট্‌কিটা আমার হাত থেকে নিয়ে কিচকিন্দে দুহাতে নিংড়োতেই দেখি গল গল করে এক সের ঘি বেরিয়ে পড়ল!

'এ তো বেশ মজা!' বলেই আমি পালকি থেকে নেমে সেই জালা আর গামলাগুলো টিপতে লাগলুম আর অমনি পিচকিরি দিয়ে ফোয়ারার মতো কোনওটা থেকে তেল কোনওটা থেকে ঘি বেরোতে লাগল। দেখতে দেখতে চারদিক তেল আর ঘিয়ে ভেসে গেল। তখন কিচ্‌কিন্দে বলছে, 'বাবু, আর খেলা নয়। এত তেল ঘি ঢেলে ফেলেছ দেখলে পিসি রাগ করবেন। চল, চুপি চুপি পালাই।'

পালকি করে আবার চলেছি। কিন্তু মনে ভয় হচ্ছে—পিসির এত তেল ঘি ঢেলে নষ্ট করলুম, পিসি যদি টের পান তো রক্ষে রাখবেন না।

'ও কিচকিন্দে, পিসিকে বোলো না যে অত তেল ঘি নষ্ট করেছি!'

'একটুও নষ্ট হবে না বাবু, পিসির তোমার তেমন জালা, তেমন গামলা নয়! কুপোগুলো সব তেল ঘি আবার শুষে নিয়ে যেমন ছিল তেমনি ফুলে উঠছে! চল এখন পিসির বাড়ির তেতলায় আমরা নেমে যাই। সেখানে ঘণ্টাকর্ণ রক্তশোষা মাথায় ছাতা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন!' বলেই কিচ্‌কিন্দে পালকি নিয়ে ধাপে ধাপে সমুদ্দুরের নিচে নেমে চলল। সেখানটা এমন অন্ধকার যে কিছু দেখা যায় না।

'ও কিচ্‌কিন্দে, তেতলায় তো সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে হয়, এ যে তুমি আমাকে নিয়ে নেমে চললে।'

'ঠিক যাচ্ছি বাবু! জলের ওপরে যে তেতলা বাড়ি তাতে উঠতে হলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে যেতে হয়, আর জলের নিচে যে বাড়ি তার তেতলায় যেতে হলে নিচেবাগে নেমে যেতে হবে। জলের ভেতরে যে বাড়ি কি বাগানের গাছ দেখ, সেগুলোর মাথা ওপরে থাকে, না নিচেতে থাকে?'

'নিচেবাগে।'

'জলের ওপরে যে বাড়ি থাকে তার মাথা কোন দিকে থাকে?'

'ওপর দিকে।'

'তবে? জলের ওপরে তোমার মাসির বাড়িতে যা করতে নিচে পিসির বাড়িতে এসে ঠিক তার উল্টোটা না করলে মুশকিলে পড়বে, এইটে মনে রেখো।' বলেই কিচকিন্দে ক্রমে আরও নিচে নেমে চলল।

'ও কিচকিন্দে, চোখে যে কিছুই দেখতে পাইনে, বড় অন্ধকার!'

'আলো বেশ আছে, কেবল তুমি চোখটি খুলে রেখেছ বলে কিছুই দেখতে পাচ্ছ না। চোখ বন্ধ কর, সব পষ্ট দেখতে পাবে।'

কিচকিন্দের কথায় চোখ বন্ধ করেছি। সবাই চোখ চেয়ে দেখে, আমি দেখছি চোখ বুজে—নীল জল! এত নীল যেন নীল কালি! তারই মাঝে গোনা যায় না—এত ঘণ্টা দুলছে! ঘণ্টার গায়ে ছোটছোট গোল গোল কত যে চোখ জ্বলছে তার ঠিক নেই—কোনওটা লাল কোনওটা হলদে! গোলাপি সবুজ সাদা বেগুনি—কত রঙেরই চোখ! ঘণ্টাগুলোর দুদিক দিয়ে দুটো করে লম্বা শুঁড়ের মতো কান ঝুলছে! যেমন এক একবার সেই কানগুলোতে ঢেউ লাগছে আর অমনি সব ঘণ্টাগুলো হেলে দুলে টুং-টাং ক্লিং-ক্লাং টুং-টাং করে বাজছে—ঠিক যেন গোঁসাই এসে কানের কাছে মন্তর দিচ্ছে!

পালকির কাছ দিয়ে যখন এক একবার ঘণ্টাকর্ণ এক একটা হেলতে দুলতে চলে যাচ্ছে তখন ইচ্ছে

হচ্ছে—দিই একবার দুই কান ধরে টেনে। কিন্তু তখনই আবার মনে পড়ে যাচ্ছে এখন সব উল্টো কাজ করতে হবে; যখন ইচ্ছে হবে চোখ বুজে ঘুমোই তখন থাকতে হবে চোখ চেয়ে; যখন ইচ্ছে হবে শুই তখন দাঁড়াতে হবে; যখন কান মলতে হাত এগিয়ে যাচ্ছে তখন হাতকে জোর করে পিছিয়ে আনতে হবে। কাজেই আমি ভাল মানুষটি হয়ে চুপ করে হাত পা গুটিয়ে চোখ বুজে বসে রয়েছি। এমন সময় দেখি আমাদের মেজ পুঁটির মতো একটি মাঝারি গোছের পুঁটিমাছ ঝাঁ করে গিয়ে ঘণ্টাকর্ণের কানে দিয়েছে ঠোকর। যেমন কান ছোঁয়া আর কান অমনি জড়িয়ে ধরেছেন হাতির শুঁড়ের মতো পুঁটিমাছটিকে! যেমন ধরা আর অমনি ঘণ্টার ভেতর পোরা! কাচের হাঁড়িতে পোষা মাছ যেমন ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, তেমনি দেখছি ঘণ্টার ভেতর পুঁটিমাছটি ঘুরে বেড়াচ্ছে—পালাবার পথ নেই! আমি মাছটার কি হয় দেখবার জন্যে চেয়ে আছি।

'আর দেখছ কি বাবু? হজম হয়ে গেল বলে। যাও না ঘণ্টার কানটা ধরে টেনে দেখ না মজাটা।'

'কিচকিন্দে, তুমি কেমন করে জানলে যে কান মলবার জন্যে আমার হাত নিশপিশ করছিল, আমি তো তোমাকে কিছু বলিনি।'

'বলনি বলেই জানতে পারলুম। বললে কিছু শুনতেও পেতুম না, জানতেও পারতুম না। এখানে সব উল্টো নিয়ম তা তো তোমাকে বলেই দিয়েছি।'

এই কথা হচ্ছে এমন সময় দেখি পাঁচ দিক থেকে পাঁচটা শুড় নাড়তে নাড়তে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে—রক্তশোষা। তার সবটাই অগুনতি ঠোঁট আর গাল আর জিভ—লাল টকটকে, সাদা ফ্যাকফ্যাকে। এক ক্রোশ থেকে তার ঠোঁট নাড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে—পট্-পট্-পট্, চক্-চক্-চক্!

কিচকিন্দে ডাকছে, 'ডাইনে ধর ভাই, ডাইনে!'

বলতে বলতে দেখি পালকি ডাইনে ঘুরেছে আর দেখি রক্তশোষা বাঁদিকে সরে গেছে। 'বাঁয়ে ধর ভাই, বাঁয়ে ধর!'

পালকি যেমন বাঁদিকে ঘুরছে আর দেখি রক্তশোষা ডাইনে চলে গেছে। এমনি ডাইনে বাঁয়ে করতে করতে আমরা রক্তশোষার ঠোঁট এড়িয়ে ছাতা-মাথার ঘরে এসে পড়েছি। সেখানে দেখি কেবল ছাতা আর তার নিচে এক একটা মুণ্ডু—গুটিসুতোর মতো সোঁটা সোঁটা চুল আর মুলোর পাতার মতো গোছা গোছা দাড়ি। দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন বিটপালং, গাজর, ওলকপি আর বিলিতি মুলোর ঝাঁকা সব উল্টে পড়ে ভেসে যাচ্ছে।

'ও কিচকিন্দে! এরা কারা?'

'এর মালী। তোমার পিসির সবজি বাগানে কাজ করছে।'

'এত তরকারি কি পিসি একাই খান?'

'তিনি ছাড়া আর কে খাবে? এ তরকারি কারও ছোঁবার জো আছে! ছুঁলেই হাত চুলকে অস্থির হবে। যতক্ষণ না পিসি এগুলিকে নিজের হাতে রেঁধে বেড়ে দেবেন ততক্ষণ কারও মুখে দেবার জো নেই। মুখে দিয়েছে কি আর গাল ফুলে গোবিন্দর মা হয়েছে!'

'গালফুলো গোবিন্দর মা কে কিচকিন্দে?'

'তিনি আগে গোবিন্দর মা ছিলেন, পিসির এই সবজি খেতে ওলকপি তুলতে এসে একটি বিলিতি মুলো চুরি করে খেয়েছিলেন, সেই থেকে তাঁর গাল ফুলে গেছে। গোবিন্দ আর তাঁর মায়ের মুখ দেখেন না।'

'আচ্ছা কিচকিন্দে, ওই যে টোকা মাথায় দিয়ে মালীরা সব এই সবজি খেতে কাজ করছে ওদের গা কই চুলকোয় না কেন?'

'ওদের গা থাকলে তো! চুলকে চুলকে সব ক্ষয়ে গেছে। এদিকে দেখ বাবু, তোমার পিসির ধানের খেত। এখানে কেবল মুক্তোকলাই, দশবছরে একবার ফলে, আর তোমার পিসি সেই কলাইয়ের ডাল দিয়ে পান্তাভাত দশ বছর অন্তর একদিন খান।'

'পান্তাভাত কি কিচকিন্দে?'

'ভিজে ভাত বাবু। তোমায় তো বলেছি এখানে সব উল্টো, ডাঙার ওপর মাসির বাড়িতে খাও তোমরা শুকনো ভাত আর জলের নিচে পিসির বাড়িতে সবাই খায় ভিজে ভাত। তোমাদের কলাইয়ের ডাল পাতলা—যেন জল, আর এখানকার কলাইয়ের ডাল যেন মুক্তোর মতো ঝুরঝুরে।'

এই কথা হচ্ছে এমন সময় শুনি খেতের ভেতর থেকে ভোঁ ভোঁ করে শাঁখ বেজে উঠল।

'এত শাঁখ বাজে কেন কিচকিন্দে?'

'শাঁখচূর্ণিরা সব শাঁখ বাজিয়ে কলাই খেত থেকে পাখি তাড়াচ্ছে বাবু।'

দেখি, শাঁখচূর্ণিরা সব শাঁখ বাজিয়ে খেতময় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের আর কিছু নেই—কেবল দুপাটি করে দাঁত আর একটা মস্ত কান, তাতে একটি ফুটো। জাঁতি কলের মতো দুপাটি দাঁত তারা খুলছে আর বন্ধ করছে, আর তাদের সেই কানের ফুটোগুলো দিয়ে ভোঁ ভোঁ করে শাঁখের শব্দ বার হচ্ছে। কতদূর থেকে যে সে শব্দ শোনা যাচ্ছে তার ঠিক নেই!

শুঁড়-দুল-দুল কাঁচুমাচুর দেশ পেরিয়ে চলেছি, তখনও শুনছি সেই শাঁখের আওয়াজ! যেমন এক একবার শাঁখের শব্দ আসছে আর অমনি দেখছি শুঁড়-দুল-দুলের যত শুঁড় সব ভয়ে কেঁচো হয়ে ল্যাজ গুটিয়ে মুখ কাঁচুমাচু করে গর্তে লুকোচ্ছে।

'ও কিচকিন্দে, পিসি এত কেঁচো নিয়ে করেন কি?'

'তিনি ওই কেঁচোর টোপ দিয়ে ছিপ ফেলে কাঁকড়া ধরেন।'

'একটা ছিপ পাই তো গোটাকতক কাঁকড়া ধরি।'

অমনি দেখি মস্ত মস্ত কাঁকড়া দাড়া নেড়ে নেড়ে বলছে, 'ধর না দেখি! আঙুলটি কাটব নাকি?—কট-কট-কট!'

'যাঃ যাঃ, দূর হ!'

যত বলি 'দূর হ' ততই দেখি কাঁকড়াগুলো এগিয়ে আসে।

'ও কিচকিন্দে এরা এগিয়ে আসে যে!'

'আসতে বলছ তো আসবে না! যাঃ যাঃ বললে এগিয়ে আসবে না তো কি পিছিয়ে যাবে? এখানে সব উল্টো, মনে নেই? বল—আয় আয়।'

যেমন 'আয় আয়' করে ডাকা আর অমনি সব কাঁকড়া দেখি পালিয়েছে। আমি যত ডাকি 'আয়' তত তারা দূরে পালায়। আবার যেমন একবার বলেছি 'যাঃ যাঃ' অমনি সব কাঁকড়া কট্‌কট্‌ করে আমার দিকে ছুটে এসেছে!

'আচ্ছা কিচকিন্দে, পিসি অত কষ্ট করে কেঁচোর টোপ ফেলে কাঁকড়া ধরেন কেন? জলের ধারে বসে যাঃ যাঃ বললেই তো তারা আপনি পিসির হাতে উঠে আসত?'

'আহা, পিসির তোমার মায়ার শরীর, কাউকে কি তিনি যাঃ বলতে পারেন! পিসির মুখে যাঃ কথাটি কখনও শুনিনি। যদি বললুম—পিসি বাড়ি যাই, অমনি পিসি বলবেন—আয় বাছা! কোনওদিন বলবেন না—যা বাছা! তোমাদের মুখে যেমন যাঃ যাঃ দূর দূর লেগেই আছে, পিসি তো আর তেমন নয়, পিসি সবাইকে বলেন—এসো বাছা, বসো বাছা! সাধে কি আমরা পিসির চাকর হয়ে আছি? ওই দেখ তোমার পিসির ছিপে একটা কল-কবজা-দাড়া-বাঁধা ধরা পড়েছে। ওই আর একটা! উঃ, তোমার জন্যে পিসি খুব কাঁকড়া আর গলদা চিংড়ি ধরছেন দেখছি, কাল খাওয়া খুব হবে বাবু!'

দেখি পিসির ছিপে দুটো প্রকাণ্ড কাঁকড়া আর গলদা চিংড়ি ধরা পড়েছে। কাঁকড়ার এক একটা দাড়া আমার হাতের মতো লম্বা; আর চিংড়ি দুটো যেন এক একটা তেলেঙ্গি সেপাই—ঢাল খাঁড়া নিয়ে তিড়িং তিড়িং লাফাচ্ছে। আমাদের চোখ, মুখের সঙ্গে চ্যাপ্টানো, এদের চোখগুলো যেন দূরবীনের চোঙার মতো মুখ থেকে ঠেলে বেরিয়েছে আর কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে আছে! দেখলে ভয়ে গা শিউরে ওঠে। কাঁকড়া আর গলদা চিংড়ি দেখে, পিসির রাঁধা কচি কুমড়ো দিয়ে কাঁকড়ার ঝোল, লাউ-চিংড়ি আর গুড়-অম্বল খেতে নোলা সকসক করে উঠল।

'ও কিচকিন্দে, পিসির বাড়ি আর কতদূর?'

'এই তো এসেছি বাবু তোমার পিসির খিড়কি পুকুরে। ওই দেখ কত রাঘব বোয়াল আর পায়রা চাঁদা মাছ পুকুরে ঠাসা রয়েছে।'

বাপরে! এমন সব মাছ তো কখনও দেখিনি! যেন এক একটা জাহাজ ভেসে বেড়াচ্ছে। কারও ভাটার মতো চোখ, কারও গাময় চাকা চাকা আঁশ, কারও মাথায় শিং, কারও গালে গোঁফ, কারও থোঁতা মুখ, কারু মুখ বা

ছুঁচলো, কেউ লম্বা কাঠি, কেউ গোল একটি বেলুনের মতো! লাল নীল সবুজ কত রঙের কত রকমের যে মাছ পিসির পুকুরে ছাড়া রয়েছে—তা আর কি বলব! গল্প শুনতে শুনতে যেমন ঘুম পায় তেমনি পিসির বাড়ির সাতঘাটের কাণ্ড-কারখানা দেখতে দেখতে আমার ঘুম পেয়ে এল।

'ও কিচকিন্দে, বড় ঘুম আসছে, আর যে চোখ বুজে থাকতে পাচ্ছিনে।'

'বেশ তো বাবু, ঘুমোও চোখ খুলে, আর তো দেখবার কিছু নেই, রাত পোহালেই এই পুকুরের ওপারে তোমার পিসির বাড়ি পৌঁছে দেব।'

আমি অকাতরে ঘুম দিচ্ছি এমন সময় শুনছি পিসি ডাকছেন, 'অবু, ও অবু, ওঠ রাত হয়েছে, আর কত ঘুমোবি? সূয্যি যে অনেকক্ষণ নেমেছেন।'

কিচকিন্দে বলছে, 'পিসিমা, দাদাবাবু সারাদিন পালকিতে ঘুমোননি, একটু ঘুমোতে দাও, এই তো সবে সূয্যি নেমেছেন, এখনো তো রাত বেশি হয়নি।'

কিচকিন্দের গলা পেয়েই আমার ঘুম ভেঙে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসে দেখি—পিসির বাড়ির ছাদে শুয়ে আছি আর আকাশে একটা কালো সূর্যি উঠেছে। আমাকে উঠে বসতে দেখে কিচকিন্দে তাড়াতাড়ি বলছে, 'বাবু ঘুমোও, এখনও রাত হবার দেরি আছে, আর একটু রাত হোক তো জেগো।'

'রাত হলে তো ঘুমোব, তখন আবার জাগব কি?'

পিসি বলছেন, 'ও কপাল! রাতে বুঝি ঘুমোতে হয় আর দিনে জাগতে হয়? খবরদার রাতে ঘুমোসনে—অম্বল হবে, বাত হবে! যাই, রান্নাবান্না হল কিনা দেখে আসি'—বলে পিসি তো গেলেন। কিচকিন্দে তখন আমায় বলছে, 'বাবু ভুলে গেলে? তোমাকে তো বলেছি পিসির দেশে রাতে সূর্যি ওঠে, দিনে চাঁদ। যা মাসির বাড়ি করতে এখানে ঠিক তার উল্টোটি করা চাই, মাসির বাড়ি যদি ঘুমোই রাতে তো এখানে ঘুমোব দিনে, সেখানে যদি চান করি জলে, এখানে করতে হবে বালিতে। খাবার সময় সেখানে যদি বলতে মাসি খিদে পেয়েছে ভাত দাও, এখানে বলতে হবে পিসি খিদে নেই, পেট আইঢাই করছে, ভাত আজ দিও না, খাব না। সেখানে বই পড়তে চোখ খুলে বইখানা সামনে রেখে, এখানে পড়তে হবে চোখ বন্ধ করে বইখানা পিছনে লুকিয়ে রেখে।'

'কিচকিন্দে এসব শিখতে তো আমার অনেকদিন লাগবে।'

'তা লাগবে বই কি বাবু! আজ দিনটা একটু পিসির বাড়ি আরাম কর, কাল রাতেই তোমাকে পাঠশালায় ভর্তি করে দিব; সেখানে লেখাপড়া খুব ভুলতে পারবে।'

এমন সময় পিসি এসে ডাকছেন, 'ভাত আজ আর খেও না।'

কিচকিন্দে তাড়াতাড়ি এক ঘটি বালি এনে দিলে, আমি তাই একটু মুখে দিয়ে পিসির রান্নাতলায় হাজির। এদেশে রান্নাঘর নেই, খোলামাঠে উনুন পাতা আছে, তারই কাছে দেখি খাবার জায়গা। সেখানে একখানা মস্ত কলাপাতা পাতা রয়েছে, আসন-টাসন কিছুই নেই! আমি যেমন কলাপাতার সামনে মাটিতে বসতে গেছি আর পিসি বলছেন, 'ওরে ওখানে না, ওই পাতাখানায় বস।'

'পিসি, পাতায় আমি বসব তো ভাত দেবে কিসে?'

'এই যে পিঁড়িতে ভাত বেড়ে রেখেছি'—বলে একটা পিঁড়ের ওপরে ডাল ভাত তরকারি সাজিয়ে পিসি আমাকে এনে দিলেন। আমি তখন বুঝলাম, এখানে লোকে পাতায় বসে আর পিঁড়েয় ভাত খায়! পিসির হাতের কলাইয়ের ডাল আর কাঁকড়ার ঝোল দিয়ে একপেট ভাত খেয়ে জলের ঘটিতে চুমুক দিয়ে দেখি এক ঘটি বালি—বেশ পরিষ্কার, তাতে আবার গোলাপের গন্ধ ছাড়ছে, আর বেশ মিষ্টি। ঢক্‌ঢক্ করে এক ঘটি বালি খেয়ে ধুলোয় হাত মুখ ধুয়ে উঠলুম। পিসি একটি পান দিলেন—শুকনো যেন তালপাতা। আমরা খাই কাঁচা পানের পাতা, এরা খায় শুকনো তালের পাতা! একপেট খেয়ে ঘুম পাচ্ছিল। কিচকিন্দেকে বললুম, 'কিচকিন্দে শোবার ঘরটা কোথায়? একটু দুপুরবেলা ঘুমোতে হবে। বিকেলে তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাব।'

'আচ্ছা বাবু'—বলেই কিচকিন্দে একটা ছাদে খাটিয়া পাতা রয়েছে সেইখানে আমাকে এনে বললে, 'এই খাটিয়াতে একটু গড়াগড়ি দাও, আমি ঠিক সকাল পাঁচটার সময় তোমায় নিয়ে বেড়াতে যাব।' বলেই কিচ্‌কিন্দে চলে গেল। বিছানায় শুতে গিয়ে দেখি, খানকতক ইট পাতা রয়েছে! তখন বুঝলুম এদের বালিস তোশক নরম নয়; শক্ত ইট; আর ছাদ হচ্ছে এদের ঘর, ঘর হচ্ছে ছাদ! ইটের বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে কিছুতে ঘুম আসে



না, তখন মনে হল দেখি উপুড় হয়ে শুয়ে। যেমন উপুড় হওয়া আর অমনি ঘুম—টিকটিকির মতো ইটের দেয়ালে হাত-পা ছড়িয়ে আরামে ঘুম! এমন ঘুম কখনও হয়নি। যখন বেলা পড়ে এসেছে তখন কিচকিন্দে এসে বললে, 'বাবু চল একটু রথতলায় বেড়িয়ে আসি।'

'চল'—বলে কিচকিন্দের সঙ্গে এপাড়া-ওপাড়া ঘুরে রথতলায় চলেছি, এমন সময় দেখি গোবিন্দর মা একটি ভোঁদড় ছানা নিয়ে তাকে ঘুম পাড়াচ্ছে আর সুর করে ছড়া কাটছে—

'ধেই ধেই চাঁদের নাচন
বেলা গেল চাঁদ নাচবি কখন।'

তখন পিসির দেশের কালাচাঁদ নাচতে নাচতে পুবদিকে অস্ত যাচ্ছেন আর সোনার চাঁদ নাচতে নাচতে পশ্চিম দিকে উদয় হচ্ছেন। এই দুই চাঁদের আলোয় সমস্ত পৃথিবীটা গোবিন্দর মায়ের ফুলো গালের মতো খানিক আলো খানিক কালো দেখা যাচ্ছে। আকাশ দেখতে হয়েছে যেন হলদে আর কালো ডুরেশাড়িখানি। হাওয়া বইছে আধেক গরম অধেক ঠাণ্ড। আমাকে দেখে গোবিন্দর মা বলছে, 'ও কিচকিন্দে, এ কাদের ছেলে গা?'

'আমাদের দাদাবাবু গো। মামার বাড়ির লোক। এনাকে একবার রথতলাটা দেখিয়ে আনি।'

'চল, আমিও যাই একবার রথতলায়'—বলেই গোবিন্দর মা ভোঁদড় ছানাটি কোলে আমাদের সঙ্গে চলল।

সমুদ্দুরের ধারেই রথতলা। বেশ জায়গাটি। চারদিকে ঝাউবন, মাঝে অনেকখানি বালি—পরিষ্কার তকতক করছে। তারই মাঝে মুড়ো রথখানা—তার চাল নেই, চুড়ো নেই। সেইখানে দেখি হারুন্দে হয়েছে সদ্দার আর কাসুন্দে বাসুন্দে ঝালুন্দে মালুন্দে হয়েছে চিতাবাড়ি আর ধাঁইকিড়ি। চিতাবাড়ির দল ধরেছে দুই লাঠি, ধাঁইকিড়ির দল ধরেছে দুই লাঠি। হারুন্দে এক একবার হাঁক দিচ্ছে—

'ইকড়ি-মিকড়ি চামচিকড়ি
চাম্ কৌটো মজুমদার
ধেয়ে এসো দামুদার'—

আর অমনি দুই দলে ঠকাঠক লাঠি ঠুকছে। দেখতে দেখতে দেখি আর মানুষ চেনা যায় না! কোথায় কাসুন্দে কোথায় বাসুন্দে কোথা বা ঝালুন্দে কোথা বা মালুন্দে। কেবল একরাশ কাঁকড়া আর মাকড়সা বালির ওপর ইকড়ি-মিকড়ি কচ্ছে। আর তাদের মাথার ওপরে একরাশ কালো কালো চামচিকে চামচিকড়ি ডানাগুলো ঝেড়ে

ঝেড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে! লড়াই হতে হতে যেমন একটা চামচিকে চিক্ করে মাটিতে পড়েছে আর অমনি সব ইকড়ি-মিকড়ি গিয়ে তাকে ধরে ফেলেছে! অমনি হারুন্দে ডাকছে—

'দামুদার ছুতারের পো
হিঙুল গাছে বেঁধে থো।'

যেমন এই কথা বলা অমনি সবাই মিলে চামচিকের মতো রোগা পটকা ছুতোরের পো-কে হিংচে গাছে চুলের দড়ি দিয়ে বেঁধেছে! তখন হিংচে গাছ কচ্ছে কড়মড়! তখন ইকড়ি-মিকড়ি দল হিংচে গাছের চারদিকে হাততালি দিয়ে গান গেয়ে গেয়ে ঘুরতে লেগেছে—

'চাঁদ-চাঁদ-চাঁদ গগনচাঁদ
হিংচে বনে শশী!
ওই এক চাঁদ এই এক চাঁদ—
চাঁদে মেশামেশি।'

'ও কিচকিন্দে এ সব হচ্ছে কি?'

'একে বলে চিকড়ি-মিকড়ি খেলা'—বলেই কিচকিন্দে একটা বাঁশি বাজাতে লেগেছে। আর অমনি দেখি ইকড়ি-মিকড়ি হয়ে গেছে চিতাবাড়ির দল আর চামচিকড়ি হয়ে গেছে ধাঁইকিড়ির দল! যেমন কাসুন্দে বাসুন্দে ঝালুন্দে মালুন্দে ছিল সবাই তেমনি হয়ে গেছে! আর নাচতে নাচতে তারা এসে আমাদের বলছে—

'ধিনতা নাচন মধুর বচন তোমরা কর কি?'

অমনি গোবিন্দের মা গাল ফুলিয়ে বলছেন—

'মনের আনন্দে মোরা খোকন নাচাচ্ছি।'

'ও গোবিন্দর মা, দেখি তোমার খোকা'—বলেই হারুন্দে ভোঁদড়ছানাকে নিয়ে যেমন তার পেটে ফুঁ দিয়েছে আর অমনি সে একটা লক্ষ্মীপ্যাঁচা হয়ে উড়ে পালিয়েছে—একেবারে মুড়ো রথের চুড়োয়। সেখানে থেকে প্যাঁচাটা আমায় ডাকছে; 'ঘু-ঘু-ঘু মেতি—সু পেটে—ফুঁ।'

'ও কিচকিন্দে প্যাঁচাটা বলে কি?'

'যাও না, তোমায় খেলতে ডাকছে।'

'ও কিচকিন্দে, আমি তো উড়তে পারিনে, তবে ওর কাছে যাই কেমন করে?'

'উড়বে নাকি?' বলেই হারুন্দে যেমন আমার পেটে এক ফুঁ দিয়েছে আর আমি হয়ে গেছি একটা হুমো পাখি হুতুম থুমো। গোবিন্দের মা যেমন আমাকে ধরতে এসেছে আর আমি উড়ে গিয়ে একেবারে মুড়ো রথের চালে গিয়ে বসেছি। প্যাঁচাটা আমাকে হঠাৎ দেখেই একটু ভয় খেয়ে গেছে, তারপর যখন দেখছে আমি তারই বড়দাদা হুতুম প্যাঁচা তখন সে আস্তে আস্তে কানের কাছে এসে বলছে—

একটি কথা।—কি কথা?
ব্যাঙের মাথা।—কি ব্যাঙ?
সরু ব্যাঙ।—কি সরু?
বামুন গরু।—কি বামুন?
ভাট বামুন।—কি ভাট?
গো ভাট।—কি গো?
চিতি গো।—কি চিতি?
সোনা চিতি।—কি সোনা?
গিনি শোনা!—কি গিনি?
মানুষের গিনি!—কি মানুষ?
বনমানুষ।—কি বন?
খেজুরবন।—কি খেজুর?
ঠিক মজুর।—কি ঠিক?
বেঠিক।

'ঠিক-ঠিক!' বলে উড়তে উড়তে আমরা গিয়ে খেজুর গাছে বসেছি। সেই খেজুর গাছের তলায় কতকালের পোড়ো একটা আখবাড়ি রয়েছে, তাতে একখানা মরচে ধরা আখমাড়ার কল, একটা ভুঁড়োশেয়ালি সেই আখমাড়া কলটা ধরে ঘোরাচ্ছে—ক্যাঁচকোঁচ। প্যাঁচা দেখেই বলছে—

'আখবাড়ির পাশে
ভুঁড়োশেয়ালি নাচে।'

আমি বলছি, 'তারপর?'

'তারপর শুনবে গল্পটা? তবে শোনো'—বলেই প্যাঁচা বলছে—

'এক যে ছিল শেয়াল
তার বাপ দিচ্ছে দেয়াল।'

'বুঝেছ ভাই—সে ভারি কাণ্ড! বুঝেছ কিনা—'শেয়াল তার বাপ দিচ্ছে দেয়াল।' শেয়াল দেয়াল দিচ্ছে না, দিচ্ছে তার বাপ—বুঝেছ? সে ভারি কাণ্ড! শেয়ালের বাপের নাম কি জান?'—

'তার বাপের নাম রতা।'

'সে রতা শেয়াল, বুঝেছ কিনা—দেয়াল যে দিচ্ছে সে রতা শেয়াল;—শেয়ালের বাপ শেয়াল, বুঝেছ?'

'এক যে শেয়াল।
তার বাপ দিচ্ছে দেয়াল।।
তার বাপের নাম রতা।
ফুরোল আমার কথা।।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি?'

'এই বুঝি তোমার গল্প হল? দেখ ভাই প্যাঁচা, একটা যদি বড় গল্প না বল, তবে তোমার সঙ্গে এই আড়ি দিলুম বলে!'

'রোসো রোসো আড়ি দিও না! মনে পড়েছে একটা মস্ত ব্যাঙের গল্প; বলি শোনো'—বলেই প্যাঁচা আরম্ভ করেছে —'তাঁতির ঘরে ব্যাঙের বাসা! তাঁতঘর দেখেছ তো? সেই যেখানে খট্ খট্ করে তাঁতি-বুড়ো মাকু চালায় আর সর্ সর্ করে কাপড় বার হয়—দশ হাতি, বার হাতি, চোদ্দ হাতি, খ্যাপা হাতি, পোষা হাতি!'

'না ভাই, তাঁতশালা কখনও দেখিনি, কিন্তু কাপড়ের হাতি আমি অনেক দেখেছি, আসল হাতির মতোই সেগুলো মোটাসোটা!'

'আচ্ছা গোল কোরো না, শোনো ফের বলছি—

'তাঁতি ঘরে ব্যাঙের বাসা, তিনটে পেড়েছে ছানা।
খায় দায় নিদ্রা যায়, তাঁতঘরে তার থানা।।'

'বুঝেছ?'

'বুঝেছি, তাঁতির ঘরে তিনটে ব্যাঙের ছানা হল। কিন্তু তারপর কি হল তো বুঝতে পাচ্ছিনে।'

'এঃ, তুমি ভারি বোকা! তাঁতির ঘরে ব্যাঙের তিনটে ছানা হল, বাড়ির সবাই যখন খেয়ে দেয়ে ঘুমোতে গেল, তখন তাঁতি-বুড়ো গিয়ে থানায় খবর দিচ্ছে—দারোগাসাহেব, তিনটে ব্যাঙের ছানা আমার সব সুতো খেলে—সর্বনাশ করলে!'

'কী, আমি থাকতে ডাকাতি? রামসিং আমায় এক ছিলিম তামাক দাও আর তাঁতির সঙ্গে গিয়ে বেঁধে আনো সেই ব্যাঙ তিনটেকে!'—বলেই দারোগাসাহেব গুড়গুড়ি টানতে টানতে খাটিয়াতে শুলেন। যেমন শোয়া আর অমনি ঘুম! এখন তো—'খায় দায় ঘুম যায়, তাঁতঘরে তার থানা'—এটার মানে বুঝলে? তারপর শোনো—

'সুবুদ্ধি তাঁতির ব্যাটা কুবুদ্ধি ধরিল।
তার একটি ছানারে পায়ে চেপে মেল।।

'সুবুদ্ধি তাঁতি ঠিক কাজ করেছিল—রামসিং এসে তিনটি ছানাকেই পুলিসে নিয়ে জরিমানা করে দিত—কিন্তু সুবুদ্ধির ছেলে কুবুদ্ধি করেছে কি, আস্তে আস্তে একটি ব্যাঙকে ধরেছে, ধরেই পা দিয়ে এক টিপ্‌নি! আর অমনি

ফটাস করে ভুঁইপটকার মতো ফেটে গেছে ব্যাঙের পেট, যেমন ফটাস করে শব্দ হওয়া অমনি দুটো ব্যাঙ পগার পার—একটা গিয়ে মাঠের ধারে গাছে চড়েছে, আর একটা করেছে কি, বলি তবে শোনো—

'আর একটি ব্যাঙ ছিল বড়ই সিয়ানা।
লিখন পাঠায়ে দিল পরগনা পরগনা।।
আজিপুর গাজিপুর মধুপুর ডাঙা।
লক্ষ ব্যাঙ এল তথা চক্ষু করে রাঙা।।

'এসেই কুবুদ্ধির মুখে লাথি! লক্ষ ব্যাঙের রাঙা চোখ দেখেই তাঁতির পো-র প্রাণ উড়ে গিয়েছিল, তার ওপর ব্যাঙের লাথি খেয়ে সে তো আধ-মরা হয়ে থাক। এদিকে সুবুদ্ধি আর রামসিং দোবে আসছেন রাজহাটের মাঠ দিয়ে—এমন সময় হল কি? না—

'সুতোনাতা নিয়ে তাঁতি যাচ্ছে রাজার হাট।
লক্ষ ব্যাঙে তাড়াতাড়ি আগুলিল ঘাট।।

'যেমন ব্যাঙগুলোকে দেখা আমনি রামসিং তালপাতার সেপাই—বাপরে! বলে মেরেছে এক দৌড়। তাঁতি তখন আর করেন কি, না—

'তরাসে-মরাসে তাঁতি গাছেতে উঠিল

'একটা ছিল মুড়ো খেজুর গাছ, যেমন তাড়াতাড়ি ওঠা আর অমনি—

'কোথা ছিল কোলাব্যাঙ মুখে লাথি মেল।।

'লাথির ওপর লাথি! কোলাব্যাঙের লাথি খেয়ে তাঁতি তো মরো মরো; ধপাস করে পড়েছে খেজুরতলায় আর অমনি সব ব্যাঙ তাকে এসে ধরেছে! তখন সেই সিয়ানা ব্যাঙ বলছে—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—

'মেরো না, ধরো না, ভাই তাঁতিরে গোঁসাই।

'এখনই দারোগা এসে হাতে হাতকড়ি দেবে। পায়ে বেড়ি পড়লে তখন পালানো দায়। সরে পড় এইবেলা!—বলতেই যত ব্যাঙ আজিপুরে গাজিপুরে চম্পট! এদিকে তো—

'মেরো না ধরো না, ভাই তাঁতিরে গোঁসাই।

'ওদিকে রামসিং এসে তার হাতে দিয়েছে হাতকড়ি।'

'কেন, তাঁতির হাতে দড়ি পড়ল কেন?'

'তার ছেলে কুবুদ্ধি ব্যাঙ মেরেছে বলে।'

'কুবুদ্ধির কি হল?'

'কুবুদ্ধির পায়ে বেড়ি পড়ল। আর কি হবে?'

'পরে সেই রামসিং দোবের কিছু হল না?'

'হল বৈকি। ব্যাঙের দৃষ্টিতে তার মুখ পুড়ে গেল, মুখে আর তার কিছু রোচে না—

'নিম লাগে মিষ্টি!
সন্দেশ লাগে তেতো!
মুড়কি বলে ঝাল!

'সে কেবল ঘুষ খেয়ে খেয়ে ছিষ্টি ব্যাঙের গালাগালি খেয়ে খেয়ে বেড়াতে লাগল।'

'আর সেই দারোগা কি করলে?'

'সে আর করবে কি? ব্যাঙেরা তার গায়ে যত ধুলো দিলে সে তা ফুঁয়ে উড়িয়ে মনের আনন্দে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াতে লাগল।'

বলেই যেমন প্যাঁচা ফুঃ করে ফুঁ দিয়েছে আর অমনি সেই ফুঁ এসে আমার গায়ে লেগেছে। যেমন গায়ে লাগা আর আমি মানুষ হয়ে যাওয়া, যেমন মানুষ হওয়া আর ধুপুস করে ভাদ্দর মাসের তালের মতো মাটিতে পড়া আর ভুঁড়োশেয়ালি খপ করে আমাকে তুলে দে ছুট! এক ছুটে শেয়ালটা আমাকে তালতলাতে এনে হাজির করেছে। সেখানে একজোড়া ছেঁড়া তালতলার চটি পড়েছিল, সেইটে মুখে করে এনে শেয়াল আমাকে বলছে, 'খাবে?'

আমি বলছি, 'দূর! আমি কেন জুতো খেতে গেলুম! তুই খা!'

অমনি শেয়ালটা কসমস করে চটি জুতোটা গিলে ফেলেছে, তারপর আমার দিকে চেয়ে বলছে—

'বাপ ভনরি!
কি খাইতে সাধ করেছ?—চালদা মসুরি?

আমি শেয়ালকে বলছি, 'দেখ শেয়াল, আমার নাম ভনরি নয় আর আমি তোমার বাপও নয়। আমাকে ভুল করে এখানে এনেছ। আমি চালদা পেলে খাই কিন্তু মসুরি খাটিয়ে তার ভেতর আমরা ঘুমোই, মসুরি আমি কিছুতে খাব না!'

শেয়ালটা বোধহয় আমার কথা বুঝলে না, সে আবার বললে—

'বাপ নন্দলাল!
কি খাইতে সাধ করেছ?—পাকা তাল?'

'ওরে বাপু, আমি নন্দলালও নই, ভনরিও নই, তোর বাপও নই! তোর বাপের নাম হল রতা আর আমার নাম হল অবু। দুটো তাল পেড়ে দাও তো খাই, নয়তো বল ঘরে যাই। তালের বড়া কিম্বা তালফুলুরি, না হয় গাছপাকা তাল, এই তিনটের একটা যদি দিতে পার তো থাকি, নয়তো আমাকে বাপু পিসির বাড়ি রেখে এসো।
'

'এই তো তুমি অন্যায় কইলে। তাল তোমাকে দিই কেমন করে? তালগাছে কে থাকে জান?' বলেই শেয়ালটা বলছে—

'এক যে আছে একা-নোড়ে,
সে থাকে তালগাছে চড়ে।
দাঁত দুটো তার মুলোর মতো,
পিঠখানা তার কুলোর মতো!
কান দুটো তার নোটা নোটা,
চোখ দুটো আগুনের ভাঁটা!
কোমরে বিচুলি দড়ি
বেড়ায় লোকের বাড়ি বাড়ি।
তাল খেতে যে কাঁদে—
তারে ঝুলির ভেতর বাঁধে।
গাছের ওপর চড়ে
আর তুলে আছাড় মারে।'

'ওইরে একা-নোড়ে!'—বলে শেয়ালটা যেমন আমায় ভয় দেখিয়েছে অমনি আমি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলেছি, আর অমনি কি একটা তালগাছে উড়ে এসে বসেছে আর মাথা নেড়ে নেড়ে বলছে—

'কান-কাটাটা বলে আমি
এই গাছেতে আছি।
যে ছেলেটা কাঁদে তার
কানে ধরে নাচি।।'

আমার তখন আরও ভয় হয়েছে, আমি দুই হাতে কান চেপে ধরে ফোঁস ফোঁস করে ফুঁপিয়ে একেবারে চিৎকার করে কেঁদে উঠেছি। অমনি শেয়াল বলে উঠেছে, 'কেয়া হুয়া কেয়া হুয়া!' আর সেখানে যত শিয়াল ছিল সব ছুটে এসে ডাকতে লেগেছে, 'ক্যাহুয়া-ক্যাহুয়া-ক্যাহুয়ারে ক্যাহুয়া?'

বুড়ি খ্যাঁকশেয়ালি ছিল গর্তের ভেতর, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বলছে, 'তোরা কি গোল লাগিয়েচিস। ভাল করে দেখ দিকিন কে?'

যত ভুঁড়োশেয়াল আমার মুখের কাছে এসে আলেয়া ধরে ধরে দেখছে আর খ্যাঁ খ্যাঁ করে হেসে পালাচ্ছে। এমন সময় অন্ধকার থেকে হাতি আমার পিঠে শুঁড় বুলিয়ে বলছে—

'ওরে বাপ নয় রে মানুষ
উড়ে পড়ল ফাঁনুশ!'

মানুষের নাম শুনেই শেয়ালদের ভয় হয়েছে। তখন তারা সব ল্যাজ গুটিয়ে হাতজোড় করে বলছে—

'বাপধন রাজার নাতি
চড়ে কে গো মস্ত হাতি!'

যেমন শেয়ালরা এই কথা বলা আর অমনি হাতি শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে আমাকে পিঠে উঠিয়েছে! হাতিতে চড়ে আমার ভারি আহ্লাদ হয়েছে, আমি হাততালি দিয়ে বলছি—

'তাই তাই তাই মামার বাড়ি যাই।'

অমনি হাতি বলছে, 'তোমার মামার বাড়ি কোথায় বল তো?'

'আমার মামার বাড়ি যশোর দক্ষিণডিহি চেঙুঠে পরগনা।'

'আচ্ছা চল সেখানেই যাচ্ছি'—বলেই হাতি চলতে আরম্ভ করলে—হুস-হাস থপাস থপাস! দেখতে দেখতে মামাদের কলাবাগানে এসে পড়েছি। সেখানে দেখি হনুমান হুপ-হাপ করে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। যেমন আমি বলেছি

'ও হনুমান, কলা খাবি?
জয়জগন্নাথ দেখতে যাবি?'

অমনি হনুমান দাঁত-খামাটি দিয়ে মুখ ভেংচে বলছে, 'রাম রাম! রোস তো আদুরে ছেলে! তোর মামার বাড়ি যাওয়া বার করছি!' বলেই হনুমান একটি কলা নিয়ে যেমন ডেকেছে—

'আদুরের কলাগুলি বাদুড়ে খায়,
ধর ধর খোকামণি মামার বাড়ি যায়।'

আর অমনি দুটো বাদুড় এসে ছোঁ মেরে হাতির পিঠ থেকে আমাকে তুলে নিয়ে দৌড়—একেবারে পিসির তেঁতুলতলায়! সেখানে আমাকে এনে ফেলেই বাদুড় দুটো হয়ে গেছে হারুন্দে আর কিচকিন্দে! তাদের দেখে আমার ভারি রাগ হয়েছে, কেমন মামার বাড়ি যাচ্ছিলুম, কেবল যেতে দিলে না আমাকে এই দুটো বাদুড়! যেমন এই কথা মনে করেছি আর অমনি কিচ্‌কিন্দে বলছে, 'মামার বাড়ি যাচ্ছিলে তো যাচ্ছিলে, কলাবাগানে হনুমানজিকে বলতে গিয়েছিলে কেন—

'ও হনুমান, কলা খাবি?
জয়জগন্নাথ দেখতে যাবি?

'জয় সীতারাম দেখতে যাবি—বলতে পারনি? হনু রেগে তোমার ইস্কুলের ছুটি কেটে দিয়েছে, এখন আর তুমি পিসির বাড়ি থাকতে পারবে না, এখন তোমায় গুরুমহাশয়ের পাঠশালে পড়তে হবে আর জোড়া বেত খেতে হবে। চল'—বলেই আমাকে পালকিতে ভরে হারুন্দে আর কিচকিন্দে পাঠশালায় নিয়ে চলল।

'ওরে আমাকে তোরা ছেড়ে দে, আমি এমন কাজ আর কখনও করব না। ও কিচকিন্দে, তোর পায়ে পড়ি, আমাকে গুরুমশায়ের কাছে দিসনে, আমি পড়ব না, আমি ছবি লিখব, আমি যাব না পাঠশালে যাব না—আ—আ' বলে পালকির ভেতর আমি হাত-পা আছড়ে কাঁদতে লেগেছি। জোড়া বেতের নাম শুনে ভারি ভয় হয়েছে। হারুন্দে কিচকিন্দে পালকির দুই দরজা চেপে ধরে আমাকে গুরুর পাঠশালে হাজির করে বলছে—

'গুরুমশাই গুরুমশাই
তোমার পোড়ো হাজির।
চড়চড়িয়ে পড়ুক বেত
হোক বিচার কাজির।।'

শুনছি গুরুমশায় ঘরের ভেতর থেকে মন্তর পড়ছেন—

'আয় ধুগ্‌ড়ি যায় ধুগ্‌ড়ি
ধুগ্‌ড়ি মন্তর গায়।
চড়চড়িয়ে পড়ুক বেত
পড়পড়িয়ে যায়।।'

যেমন এই মন্তর পড়া আর দেখি জোড়া বেত নাচতে নাচতে গুরুমশায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে মাছরাঙা গুরু নাকের ওপরে চশমা লাগিয়ে এসে বলছেন, 'পড়—

'লিখিবে পড়িবে মরিবে দুখে।
মৎস্য ধরিবে খাইবে সুখে।।'

আমার তখন ভয়ে কি পড়া আসে! আমি বলে ফেলেছি—

'লিখিবে পড়িবে থাকিবে সুখে।
মৎস্য ধরিবে মরিবে দুখে।।'

অমনি গুরু এক বেতের খোঁচা দিয়ে বলছেন, 'ভুল হল! লেখাপড়া করলে কি হয়? সুখে থাকে? না দুঃখে থাকে?'

আমার তখন মনে পড়েছে পিসির বাড়িতে সব উলটো। আমি অমনি ফস করে বলেছি, 'দুঃখে থাকে মশাই, দুঃখে থাকে!'

'ভাল রে ভাল! আচ্ছা তোর নাম তো অবু? লেখ দেখি—

'অবু তবু গিরি সুতা।
মায়ে বলে পড় পুতা।।
পড়লে শুনলে দুধি ভাতি।
না পড়লে ঠ্যাঙার গুঁতি।।'

আমি জানি সব উলটো লিখতে হবে, না হলে বেত, কাজেই আমি মাটিতে খড়ি দিয়ে একটা চৌকো ঘর কেটে লিখছি—প্যাঁচা-পেঁচি দুই ভূতা। কিন্তু যেমন লিখছি—মায়ে বলে পড় পুতা—অমনি আমার মাকে মনে পড়ে গেছে, আমি খড়ি ফেলে দিয়ে একেবারে পাঠশালা থেকে দৌড়! এক-দৌড়ে ষষ্ঠীতলায় হাজির। সেখান থেকে দেখছি—গঙ্গার ওপারে তুলসীগাছের পাতা ঝুর ঝুর করছে, তারই তলায় মা আমার দুগ্‌গো-পিদিম জ্বালছেন! ওদিকে দেখছি গুরুমশায় ঠ্যাঙার গুঁতি হাতে, সঙ্গে হারুন্দে, কিচকিন্দে আর সেই মনসা বুড়ো আর আংলা-কাংলা-বাংলা যত ভূত-পেরেত! যেমন গুরুকে দেখা আর 'মা!' বলে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়েছি, অমনি দেখি আমাদের বাড়িতে হাজির। সেখানে দেখি ঝড় হচ্ছে, শিল পড়ছে, আর আমবাগানে আমার ছোট ছোট দাদা-দিদিরা আম কুড়োতে লেগেছে। আমিও মায়ের বাড়িতে আঁচল ভরে শিল আর আম কুড়োতে লেগে গেছি। ভূত-পেরেত কেউ সেখানে আসবার জো নেই। এসেছে কেবল আমার সঙ্গে উড়তে উড়তে গোবিন্দর মায়ের ভোঁদড় ছেলে, আর আমার বন্ধু সেই লক্ষ্মী প্যাঁচাটি। তাকে একটা আমগাছের কোটরে বাসা বেঁধে দিয়েছি, রোজ রাত্তিরে সে আমার গায়ে ফুঁ দেয় আর আমি মাসির বাড়ি পিসির বাড়ি উড়ে বেড়াই। আমার ভূতপত্‌রী লাঠিটি কিন্তু গোবিন্দর মা চুরি করে রেখে দিয়েছে। লাঠি নইলে তো চলতে পারি না। তোমরা সবাই চাঁদা করে যদি আমাকে একটা আঁকাবাঁকা লাঠি কেনবার পয়সা দাও তবে সেইটে নিয়ে আমি একবার মামার বাড়ি যাই, তোমাদের জন্যে বাঁকানদীর ধার থেকে অনেক আঁকাবাঁকা ছবি যোগাড় করে আনতে পারি।

নালক

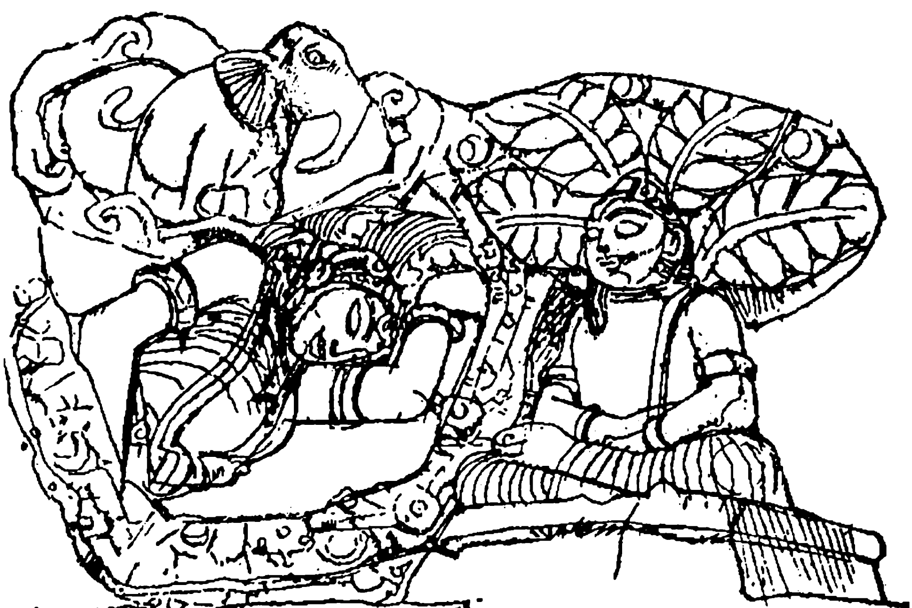


নালক

দেবল ঋষি যোগে বসেছিলেন। নালক—সে একটি ছোট ছেলে—ঋষির সেবা করছিল। অন্ধকার বর্ধনের বন, অন্ধকার বটগাছতলা, অন্ধকার এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা। নিশুতি রাতে কালো আকাশে তারা ফুটেছে, বাতাস ঘুমিয়ে আছে, জলে ঢেউ উঠছে না, গাছে পাতা নড়ছে না। এমন সময় অন্ধকারে আলো ফুটল—ফুল যেমন করে ফোটে, চাঁদ যেমন করে ওঠে—একটু, একটু, আরও একটু। সমস্ত পৃথিবী দুলে উঠল—পদ্মপাতার জল যেমন দুলতে থাকে—এ দিক সে দিক, এ ধার ও ধার সে ধার! ঋষি চোখ মেলে চাইলেন, দেখলেন আকাশে এক আশ্চর্য আলো! চাঁদের আলো নয়, সূর্যের আলো নয়, সমস্ত আলো মিশিয়ে এক আলোর আলো! এমন আলো কেউ কখনও দেখেনি! আকাশ জুড়ে কে যেন সাতরঙের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে। কোনও দেবতা পৃথিবীতে নেমে আসবেন তাই কে যেন শূন্যের উপরে আলোর একটি একটি ধাপ গেঁথে গিয়েছে!

সন্ন্যাসী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, নালককে বললেন—'কপিলবাস্তুতে বুদ্ধদেব জন্ম নেবেন, আমি তাঁর দর্শন করতে চললেম, তুমি সাবধানে থেকো।'

বনের মাঝ দিয়ে আঁকাবাঁকা সরু পথ, সন্ন্যাসী সেই পথে উত্তরমুখে চলে গেলেন। নালক চুপটি করে বটতলায় ধ্যানে বসে দেখতে লাগল—একটির পর একটি ছবি।



কপিলবাস্তুর রাজবাড়ি। রাজরানি মায়াদেবী সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছেন। ঘরের সামনে খোলা ছাদ, তার ও ধারে বাগান, শহর, মন্দির, মঠ। আরও ও ধারে—অনেক দূরে হিমালয় পর্বত—সাদা বরফে ঢাকা। আর সেই পাহাড়ের ওধারে আকাশ জুড়ে আশ্চর্য এক সাদা আলো; তার মাঝে সিঁদুরের টিপের মতো সূর্য উঠছেন! রাজা শুদ্ধোদন এই আশ্চর্য আলোর দিকে চেয়ে আছেন, এমন সময় মায়াদেবী জেগে উঠে বলছেন, 'মহারাজ, কী চমৎকার স্বপ্নই দেখলেম! এতটুকু একটি শ্বেতহস্তী, দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো বাঁকা বাঁকা কচি দুটি দাঁত, সে যেন হিমালয়ের ওপার থেকে মেঘের উপর দিয়ে আমার কোলে নেমে এল, তারপর যে কোথায় গেল আর দেখতে পেলেম না! আহা, কপালে তার সিঁদুরের টিপের মতো একটি টিপ ছিল।'

রাজা-রানি স্বপ্নের কথা বলাবলি করছেন, ইতিমধ্যে সকাল হয়েছে, রাজবাড়ির নবৎখানার বাঁশি বাজছে,

রাস্তা দিয়ে লোকজন চলাফেরা করছে, মন্দির থেকে শাঁখ-ঘণ্টার শব্দ আসছে, অন্দরমহলে রাজদাসীরা সোনার কলসিতে মায়াদেবীর চানের জল তুলে আনছে, মালিনীরা সোনার থালায় পুজোর ফুল গুছিয়ে রাখছে। রানির পোষা ময়ূর ছাদে এসে উড়ে বসল, সোনার খাঁচায় শুকশারী খাবারের জন্য দাসীদের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিলে, ভিখিরি এসে 'জয় রানিমা!' বলে দরজায় দাঁড়াল। দেখতে দেখতে বেলা হল, রাজবাড়িতে রানির স্বপ্নের কথা নিয়ে সকলে বলাবলি করতে লাগল।

কপালে রক্তচন্দনের তিলক, মাথায় মানিকের মুকুট, পরনে লাল চেলি, সকালে সূর্যের মতো রাজা শুদ্ধোদন রাজসিংহাসন আলো করে বসেছেন। পাশে মন্ত্রীবর, তাঁর পাশে দণ্ডধর—সোনার ছড়ি হাতে, ওপাশে ছত্রধর—শ্বেতছত্তর খুলে, তার ওপাশে নগরপাল—ঢাল-খাঁড়া নিয়ে।

রাজার দুইদিকে দুই দালান; একদিকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর একদিকে দেশ বিদেশের রাজা আর রাজপুত্তুর। রাজসভা ঘিরে দেশের প্রজা, তাদের ঘিরে যত দুয়ারী—মোটা রায়বাঁশের লাঠি আর কেবল লাল পাগড়ির ভিড়।

রাজসভার ঠিক মাঝখানে লাল চাঁদোয়ার ঠিক নিচে আটখানি রক্তকম্বলের আসন, তারই উপরে আট গণৎকার খড়ি হাতে, পুঁথি খুলে, রানির স্বপ্নের কথা গণনা করতে বসেছেন। তাঁদের কারও মাথায় পাকা চুল, কারও মাথায় টাক, কারও বা ঝুঁটি বাঁধা, কারও বা ঝাঁটা গোঁফ! সকলের হাতে এক এক শামুক নস্যি। আট পণ্ডিত কেউ কলমে লিখে, কেউ খড়িতে দেগে রানির স্বপ্নের ফল শুনে বলছেন :

'সূর্যস্বপ্নে রাজচক্রবর্তী পুত্র মহাতেজস্বী। চন্দ্রে তথা রূপবান গুণবান রাজাধিরাজ দীর্ঘজীবী। শ্বেতহস্তীর স্বপ্নে শান্ত গম্ভীর জগৎ-দুর্লভ এবং জীবের দুঃখহারী মহাধার্মিক ও মহাবুদ্ধ পুত্রলাভ। এবার নিশ্চয় মহারাজ, এক মহাপুরুষ এই শাক্যবংশে অবতীর্ণ হবেন। শাস্ত্রের বচন মিথ্যা হয় না। আনন্দ কর।'

চারিদিকে অমনি রব উঠল—'আনন্দ কর, আনন্দ কর! অন্নদান কর, বস্ত্রদান কর, দীপদান, ধূপদান, ভূমিদান কর।' কপিলবাস্তুতে রাজার ঘরে, প্রজার ঘরে, হাটে-মাঠে-ঘাটে আনন্দের বাজনা বেজে উঠল, আকাশ আনন্দে হাসতে লাগল, বাতাস আনন্দে বইতে লাগল। রাজমুকুটের মানিকের দুল, রাজছত্তরের মুক্তোর ঝালর, মন্ত্রীর গলায় রাজার দেওয়া কণ্ঠমালা, পণ্ডিতদের গায়ে রানির দেওয়া ভোটকম্বল, দাসদাসী দীনদুঃখী ছেলেবুড়োর মাথায় রাজবাড়ির লাল চেলি আনন্দে দুলতে থাকল।

প্রকাণ্ড বাগান; বাগানের শেষ দেখা যায় না, কেবলই গাছ, গাছের পর গাছ, আর সবুজ ঘাস; জলের হাওয়া, ঠাণ্ডা ছাওয়া, পাখিদের গান আর ফুলের গন্ধ। বাগানের মাঝে এক প্রকাণ্ড পদ্মপুকুর। পদ্মপুকুরের ধারে আকাশ-প্রমাণ এক শালগাছ, তার ডালে ডালে পাতায় পাতায় ফুল ধরেছে; দখিনে বাতাসে সেই ফুল, গাছতলায় একটি শ্বেতপাথরের চৌকির উপরে উড়ে পড়ছে।

সন্ধ্যে হয়ে এল। সুরূপা যত পাড়ার মেয়ে পদ্মপুকুরে গা ধুয়ে উঠে গেল। উবু ঝুঁটি, গলায় কাঁটি, দুই কানে সোনার মাকড়ি একদল মালি-মালিনী শুকনো পাতা ঝাঁট দিতে দিতে, ফুলের গাছে জল দিতে দিতে, বেলা শেষে বাগানের কাজ সেরে চলে গেল। সবুজ ঘাসে, পুকুর পাড়ে, গাছের তলায়—কোনওখানে কোনও কোণে একটু ধুলো, একটি কুটোও রেখে গেল না।

রাত আসছে—বসন্তকালের পূর্ণিমার রাত। পশ্চিমে সূর্য ডুবছেন, পুবে চাঁদ উঠি উঠি করছেন। পৃথিবীর এক পারে সোনার শিখা, আর এক পারে রুপোর রেখা দেখা যাচ্ছে। মাথার উপর নীল আকাশ, লক্ষকোটি তারায় আর সন্ধিপুজোর শাঁখ-ঘণ্টায় ভরে উঠছে। এমন সময় মায়াদেবী রুপোর জালে ঘেরা সোনার পালকিতে সহচরী সঙ্গে বাগান-বেড়াতে এলেন; রানিকে ঘিরে রাজদাসী যত ফুলের পাখা, পানের বাটা নিয়ে। প্রিয় সখীর হাতে হাত রেখে, ছায়ায় ছায়ায় চলে ফিরে, রানি এসে বাগানের মাঝে প্রকাণ্ড সেই শালগাছের তলায় দাঁড়ালেন—বাঁ হাতখানি ফুলে ফুলে ভরা শালগাছের ডালে, আর ডান হাতখানি কোমরে রেখে।

অমনি দিন শেষ হল, পাখিরা একবার কলরব করে উঠল, বাতাসে অনেক ফুলের গন্ধ, আকাশে অনেক তারার আলো ছড়িয়ে পড়ল। পুবে পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হলেন—শালগাছটির উপরে যেন একটি সোনার ছাতা! ঠিক সেই সময় বুদ্ধদেব জন্ম নিলেন—যেন একটি সোনার পুতুল, চাঁপাফুলে ঘেরা পৃথিবীতে যেন আর এক চাঁদ। চারিদিক আলোয় আলো হয়ে গেল—কোনওখানে আর অন্ধকার রইল না। মায়া মায়ের কোলে বুদ্ধদেব দেখা দিলেন, পৃথিবীর বুক জুড়িয়ে বুদ্ধদেব দেখা দিলেন—যেন পদ্মফুলের উপর একফোঁটা শিশির—নির্মল, সুন্দর,

এতটুকু। দেখতে দেখতে লুম্বিনী বাগান লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠল, পাত্র-মিত্র-অনুচর-সভাসদ সঙ্গে রাজা শুদ্ধোদন রাজপুত্রকে দেখতে এলেন। দাসদাসীরা মিলে শাঁখ বাজাতে লাগল, উলু দিতে থাকল। স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে, আকাশে মেঘে মেঘে দেবতার দুন্দুভি বাজছে, মর্তের ঘরে ঘরে শাঁখ-ঘণ্টা, পাতালের তলে তলে, জগঝম্প, জয়ডঙ্কা বেজে উঠছে। বুদ্ধদেব তিনলোক-জোড়া তুমুল আনন্দের মাঝখানে জন্ম নিয়ে পৃথিবীর উপর প্রথম সাত পা চলে যাচ্ছেন! সুন্দর পা দু'খানি যেখানে যেখানে পড়ল সেখানে সেখানে অতল, সুতল, রসাতল ভেদ করে একটি একটি সোনার পদ্ম, আগুনের চরকার মতো, মাটির উপরে ফুটে উঠল; আর স্বর্গ থেকে সাতখানি মেঘ এসে সাত সমুদ্রের জল এনে সেই সেই সাতটি পদ্মের উপরে ঝিরঝির করে ঢালতে লাগল!

নালক আশ্চর্য হয়ে দেখছে, দেব-দানব-মানব মিলে সেই সাতপদ্মের মাঝখানে বুদ্ধদেবকে অভিষেক করছেন! এমন সময় নালকের মা এসে ডাকলেন—'দস্যি ছেলে! ঋষি এখানে নেই আর তুমি একা এই বনে বসে রয়েছ! না ঘুম, না খাওয়া, না লেখাপড়া—কেবল চোখ বুজে ধ্যান করা হচ্ছে! এই বয়সে উনি আবার সন্ন্যাসী হয়েছেন! চল্, বাড়ি চল্!'

মা নালকের হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন, নালক মাটিতে লুটোপুটি খেয়ে বলতে লাগল—'ছেড়ে দাও মা, তারপর কি হল দেখি। একটিবার ছাড়। মাগো, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে!'

সমস্ত বন নালকের দুঃখে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল—ছেড়ে দে, ছেড়ে দে! আর ছেড়ে দে! একেবারে ঘরে এনে তালাবন্ধ!

নালককে তারা জোর করে গুরুমশায়ের পাঠশালায় দিয়েছে। সেখানে গুরু বলছেন—'ওকাস অহং ভন্তে।' নালক পড়ে যাচ্ছে—ভন্তে। গুরু বলছেন—'লেখ্, অনুগ্ গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।' নালক বড় বড় করে তালপাতায় লিখে যাচ্ছে—'সীলং দেথ মে ভন্তে।' কিন্তু তার লেখাতেও মন নেই, পড়াতেও মন নেই! তার প্রাণ বর্ধনের বনে সেই বটতলায় আর সেই কপিলবাস্তুর রাজধানীতে পড়ে আছে।

পাঠশালের খোড়ো ঘরের জানলা দিয়ে একটি তিন্তিড়ী গাছ, খানিকটা কাশ আর কাঁটাবন, একটা বাঁশঝাড় আর একটি পুকুর দেখা যায়। দুপুরবেলা একটুখানি রোদ সেখানটা এসে পড়ে, একটা লাল ঝুঁটি কুবোপাখি ঝুপ করে ডালে এসে বসে আর কুব কুব করে ডাকতে থাকে, কাঁটাগাছের ফুলের উপরে একটা কালো ভোমরা ভন্-ভন করে উড়ে বেড়ায়—একবার জানলার কাছে আসে আবার উড়ে যায়। নালক সেই দিকে চেয়ে থাকে আর ভাবে—আহা, ওদের মতো যদি ডানা পেতাম তবে কি আর মা আমায় ঘরে বন্ধ করে রাখতে পারতেন? এক দৌড়ে বনে চলে যেতাম। এমন সময়ে গুরু বলে ওঠেন—'লেখ্রে লেখ্!' অমনি বনের পাখি উড়ে পালায়, তালপাতার উপরে আবার খসখস করে ছেলেদের কলম চলতে থাকে। নালক যে কী কষ্টে আছে তা সেই জানে! হাত চলছে না, তবু পাতাড়ি-লেখা বন্ধ করবার জো নেই, কান্না আসুক তবু পড়ে যেতে হবে— য র ল, শ ষ স—বাদলের দিনেও, গরমের দিনেও, সকালেও, দুপুরেও।

নালক পাঠশালা থেকে মায়ের হাত ধরে যখন বাড়ি ফেরে, হয়তো শালগাছের উপরে তালগাছগুলোর মাথা দুলিয়ে পুবে হাওয়া বইতে থাকে, বাঁশঝাড়ে কাকগুলো ভয়ে কা কা করে ডেকে ওঠে। নালক মনে মনে ভাবে আজ যদি এমন একটা ঝড় ওঠে যে আমাদের গ্রামখানা ওই পাঠশালার খোড়ো চালটাসুদ্ধ একেবারে ভেঙে চুরে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তবে বনে গিয়ে আমাদের থাকতেই হয়, তখন আর আমাকে ঘরে বন্ধ করবার উপায় থাকে না। রাতের বেলায় ঘরে বাইরে বাতাস শনশন বইতে থাকে, বিদ্যুতের আলো যতই ঝিকমিক চমকাতে থাকে, নালক ততই মনে মনে ডাকতে থাকে—ঝড় আসুক, আসুক বৃষ্টি! মাটির দেয়াল গলে যাক, কপাটের খিল ভেঙে যাক! ঝড়ও আসে, বৃষ্টিও নামে, চারিদিক জলে জলময় হয়ে যায়; কিন্তু হায়! কোনওদিন কপাটও খোলে না, দেয়ালও পড়ে না—যে বন্ধ সেই বন্ধ! খোলা মাঠ, খোলা আকাশে ঘেরা বর্ধনের সেই তপোবনে নালক আর কেমন করে ফিরে যাবে? যেখানে পাখিরা আনন্দে উড়ে বেড়ায়, হরিণ আনন্দে খেলে বেড়ায়, গাছের তলায় মাঠের বাতাসে যেখানে ধরে রাখবার কেউ নেই—সবাই ইচ্ছামত খেলে বেড়াচ্ছে, উড়ে বেড়াচ্ছে।

ঋষির আসাপথ চেয়ে নালক দিন গুনছে, ও দিকে দেবল ঋষি কপিলবাস্তু থেকে বুদ্ধদেবের পদধূলি সর্বাঙ্গে মেখে, আনন্দে দুই হাত তুলে নাচতে নাচতে পথে আসছেন আর গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে চলেছেন—'নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায়। নমো নমো গৌতমচন্দ্রিমায়। নমো অনন্তগুণার্ণবায়; নমো শাক্যনন্দনায়।'

শরৎকাল। আকাশে সোনার আলো। পথের দুইধারে মাঠে মাঠে সোনার ধান। লোকের মন আর ঘরে থাকতে চায় না। রাজারা ঘোড়া সাজিয়ে দিগ্বিজয়ে চলেছেন, প্রজারা দলে দলে ঘর ছেড়ে হাটে মাঠে ঘাটে কেউ পসরা মাথায়, কেউ ধানখেত নিড়োতে, কেউবা সাতসমুদ্র তেরোনদী পারে বাণিজ্য করতে চলেছে। যাদের কোনও কাজ নেই তারাও দল বেঁধে ঋষির সঙ্গে সঙ্গে গান গেয়ে চলেছে—'নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায়।'

সন্ধ্যাবেলা। নীল আকাশে কোনওখানে একটু মেঘের লেশ নেই, চাঁদের আলো আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত নেমে এসেছে, মাথার উপর আকাশগঙ্গা এক টুকরো আলোর জালের মতো উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত দেখা দিয়েছে। দেবল ঋষি গ্রামের পথ দিয়ে গেয়ে চলেছেন—'নমো নমো গৌতমচন্দ্রিমায়।' মায়ের কোলে ছেলে শুনছে—'নমো নমো গৌতমচন্দ্রিমায়।' ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মা শুনছেন—'নমো নমো'; বুড়ি দিদিমা ঘরের ভিতর থেকে শুনছেন—'নমো'; অমনি তিনি সবাইকে ডেকে বলছেন—'ওরে নমো কর, নমো কর।' গ্রামের ঠাকুরবাড়ির শাঁখ-ঘণ্টা ঋষির গানের সঙ্গে একতানে বেজে উঠছে—নমো নমো নমো। রাত যখন ভোর হয়ে এসেছে, শিশিরে নুয়ে পদ্ম যখন বলছে—নমো, চাঁদ পশ্চিমে হেলে বলছেন—নমো, সেই সময়ে নালক ঘুম থেকে উঠে বসেছে আর অমনি ঋষি এসে দেখা দিয়েছেন! আগল খুলে গেছে। খোলা দরজায় সোনার রোদ একেবারে ঘরের ভিতর পর্যন্ত এসে নালকের মাথার উপরে পড়েছে। নালক উঠে ঋষিকে প্রণাম করেছে আর ঋষি নালককে আশীর্বাদ করছেন—'সুখী হও, মুক্ত হও।'

ঋষির হাত ধরে নালক পথে এসে দাঁড়িয়েছে, নালকের মা দুই চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঋষিকে বলছেন—'নালক ছাড়া আমার কেউ নেই, ওকে নিয়ে যাবেন না।'

ঋষি বলছেন—'দুঃখ কোরো না, আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে নালককে ফিরে পাবে। ভয় কোরো না; এসো, তোমার নালককে বুদ্ধদেবের পায়ে সঁপে দাও।' ঋষি মন্ত্র পড়তে থাকলেন আর নালকের মা ছেলের দুই হাত ধরে বলতে লাগলেন—

'কুসুমং ফুল্লিতং এতং পগ্ গহেত্বান অঞ্জলিং
বুদ্ধ সেষ্ঠং সবিত্বান আকাসেমপিপূজয়ে।'

নির্মল আকাশের নিচে বুদ্ধদেবের পূজা করি; সুন্দর আমার (নালক) ফুল তাঁকে দিয়ে পূজা করি।

ঋষি নালকের হাত ধরে বনের দিকে চলে গেলেন।

আবার সেই বর্ধনের বন, সেই বটগাছের তলা। গাছের নিচে দেবল ঋষি আর সন্ন্যাসীর দল আগুনের চারিদিক ঘিরে বসেছেন, আগুনের তেজে সন্ন্যাসীদের হাতের ত্রিশূল ঝকঝক করছে।

নিবিড় বন। চারিদিকে কাজল অন্ধকার, কিছু আর দেখা যায় না, কেবল গোছা গোছা অশ্বত্থ পাতায়, মোটা মোটা গাছের শিকড়ে আর সন্ন্যাসীদের জটায়, তপ্ত সোনার মতো রাঙা আলো ঝিকঝিক করছে—যেন বাদলের বিদ্যুৎ!

এই অন্ধকারে নালক চুপটি করে আবার ধ্যান করছে। মাথার উপরে নীলাম্বরী আকাশ, বনের তলায় স্থির অন্ধকার। কোনও দিকে কোনও সাড়া নেই, কারও মুখে কোনও কথা নেই কেবল এক একবার দেবল ঋষি বলছেন—'তারপরে?' আর নালকের চোখের সামনে ছবি আসছে আর সে বলে যাচ্ছে:

'রাজা শুদ্ধোদন বুদ্ধদেবকে কোলে নিয়ে হরিণের ছালঢাকা গজদন্তের সিংহাসনে বসেছেন, রাজার দুইপাশে চার চার গণৎকার, রাজার ঠিক সামনে হোমের আগুন, ওদিকে গৌতমী মা, তাঁর চারিদিকে ধান-দূর্বা, শাঁখ-ঘণ্টা, ফুল-চন্দন, ধূপ-ধুনো।

'পূজা শেষ হয়েছে। রাজা ব্রাহ্মণদের বলছেন—রাজপুত্রের নাম হল কি?

'ব্রাহ্মণেরা বলছেন—এই রাজকুমার হতে পৃথিবীর লোক যত অর্থ, যত সিদ্ধি লাভ করবে—সেইজন্য এঁর নাম রইল সিদ্ধার্থ; রাজা হলে এই রাজকুমার জীবনে সকল অর্থ আর রাজা না হলে বুদ্ধত্ব লাভ করে জগৎকে কৃতার্থ করবেন। আর মরণের পরে নির্বাণ পেয়ে নিজেও চরিতার্থ হবেন—সেইজন্য এঁর নাম হল সিদ্ধার্থ।

'রাজা বলছেন—কুমার সিদ্ধার্থ রাজা হয়ে রাজত্ব করবেন, কি রাজ্য ছেড়ে বনে গিয়ে বুদ্ধত্ব পাবার জন্যে তপস্যা করবেন? সেই কথা আপনারা স্থির করে বলুন।

'রাজার আট গণৎকার খড়ি পেতে গণনা করে বলছেন! প্রথম শ্রীরাম আচার্য, তিনি রাজাকে দুই আঙুল দেখিয়ে বলছেন—মহারাজ, ইনি রাজাও হতে পারেন, সন্ন্যাসীও হতে পারেন, ঠিক বলা কঠিন, দুইদিকেই সমান

টান দেখছি। রামের ভাই লক্ষ্মণ অমনি দুইচোখ বুজে বলছেন—দাদা যা বলেছেন তাই ঠিক। জয়ধ্বজ দুইহাত ঘুরিয়ে বলছেন—হ্যাঁও বটে, নাও বটে। শ্রীমন্তিন দুইদিকেই ঘাড় নেড়ে বলছেন—আমারও ওই কথা। ভোজ দুই চোখ পাক্‌ল করে বলছেন—এটাও দেখছি, ওটাও দেখছি। সুদত্ত বলছেন, ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় নেড়ে—এ দিকও দেখলেম, ও দিকেও দেখলেম। সুদত্তের ভাই সুবাম দুই নাকে নস্যি টেনে বলছেন—দাদার দিকটাই ঠিক দেখছি। কেবল সবার ছোট অথচ বিদ্যায় সকলের বড় কৌণ্ডিন্য এক আঙুল রাজার দিকে দেখিয়ে বলছেন—মহারাজ, এদিক কি ওদিক, এটা কি ওটা নয়—এই রাজকুমার বুদ্ধ হওয়া ছাড়া আর কোনওদিকেই যাবেন না স্থিরনিশ্চয়। ইনি কিছুতেই ঘরে থাকবেন না। যে দিন এঁর চোখে এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ মানুষ, রোগশীর্ণ দুঃখী মানুষ, একটি মরা মানুষ আর এক সন্ন্যাসী ভিখারি পড়বে, সে দিন আপনার সোনার সংসার অন্ধকার করে কুমার সিদ্ধার্থ চলে যাবেন—সোনার শিকল কেটে পাখি যেমন উড়ে যায়।'

সন্ন্যাসীর দল হুঙ্কার দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। নালক চেয়ে দেখল সকাল হয়েছে।

আর কিছু দেখা যায় না। সে দিন থেকে নালক যখনই ধ্যান করে তখনই দেখে সূর্যের আলোয় আগুনের মতো ঝকঝক করছে—আকাশের নীল ঢেকে, বাতাসের চলা বন্ধ করে—সোনার ইটে বাঁধানো প্রচণ্ড প্রকাণ্ড এক সোনার দেয়াল। তার শেষ নেই, আরম্ভও দেখা যায় না। নালকের মন-পাখি উড়ে উড়ে চলে আর সেই দেয়ালে বাধা পেয়ে ফিরে ফিরে আসে। এমনি করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাটছে। সোনার দেয়ালের ওপারে রয়েছেন সিদ্ধার্থ আর এ পারে রয়েছে নালক—যেন খাঁচার পাখি আর বনের পাখি।

ছেলে পাছে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যায় সেই ভয়ে রাজা শুদ্ধোদন সোনার স্বপন দিয়ে, হাসি আর বাঁশি, আমোদ আর আহ্লাদের মায়া দিয়ে সিদ্ধার্থকে বন্ধ রেখেছেন—সোনার খাঁচায় পাখিটির মতো। যখন গরমের দিনে রোদের তেজ বাড়ে, জল শুকিয়ে যায়, তপ্ত বাতাসে চারিদিক যেন জ্বলতে থাকে; বর্ষায় যখন নতুন মেঘ দেখা দেয় জলের ধারায় পৃথিবী ভেসে যায়, নদীতে স্রোত বাড়ে; শরতের আকাশ যখন নীল হয়ে ওঠে, সাদা মেঘ পাতলা হাওয়ায় উড়ে চলে, নদীর জল সরে গিয়ে বালির চড়া জেগে ওঠে; শীতে যখন বরফে আর কুয়াশায় চারিদিক ঢাকা পড়ে, পাতা খসে যায়, ফুল ঝরে যায়; আবার বসন্তে যখন ফুলেফলে পৃথিবী ছেয়ে যায়, গন্ধে আকাশ ভরে ওঠে দখিনে বাতাসে চাঁদের আলোয়, পাখির গানে আনন্দ ফুটে ফুটে পড়তে থাকে—তখন খাঁচার পাখির মন যেমন করে, সোনার দেয়ালে ঘেরা রাজমন্দিরে বুদ্ধদেবেরও মন তেমনই করে—এই সোনার খাঁচা ভেঙে বাইরে আসতে। তিনি যেন শোনেন—সমস্ত জগৎ, সারা পৃথিবী গরমের দিনে, বাদলা রাতে, শরতের সন্ধ্যায়, শীতের সকালে, বসন্তের পহরে পহরে—কখনও কোকিলের কুহু, কখনও বাতাসের হুহু, কখনও বা বিষ্টির ঝরঝর, শীতের থর থর, পাতার মর্মর দিয়ে কেঁদে কেঁদে মিনতি করে তাঁকে ডাকছে—বাহিরে এসো, বাহিরে এসো, নিস্তার কর, নিস্তার কর! ত্রিভুবনে দুঃখের আগুন জ্বলছে, মরণের আগুন জ্বলছে, শোকে তাপে জীবন শুকিয়ে যাচ্ছে। দেখ, চোখের জলে বুক ভেসে গেল, দুঃখের বান মনের বাঁধ ধসিয়ে গেল। আনন্দ—সে তো আকাশের বিদ্যুতের মতো—এই আছে এই নেই; সুখ—সে তো শরতের মেঘের মতো, ভেসে যায়, থাকে না; জীবন—সে তো শীতের শিশিরে শিউলি ফুলের মতো ঝরে পড়ে; বসন্তকাল সুখের কাল—সে তো চিরদিন থাকে না। হায় রে সারা পৃথিবীতে দুঃখের আগুন মরণের চিতা দিনরাত্রি জ্বলছে, সে আগুন কে নেবায়? পৃথিবী থেকে ভয়কে দূর করে এমন আর কে আছে—তুমি ছাড়া? মায়ায় আর ভুলে থেকো না, ফুলের ফাঁস ছিঁড়ে ফেল, বাহিরে এসো—নিস্তার কর! জীবকে অভয় দাও!

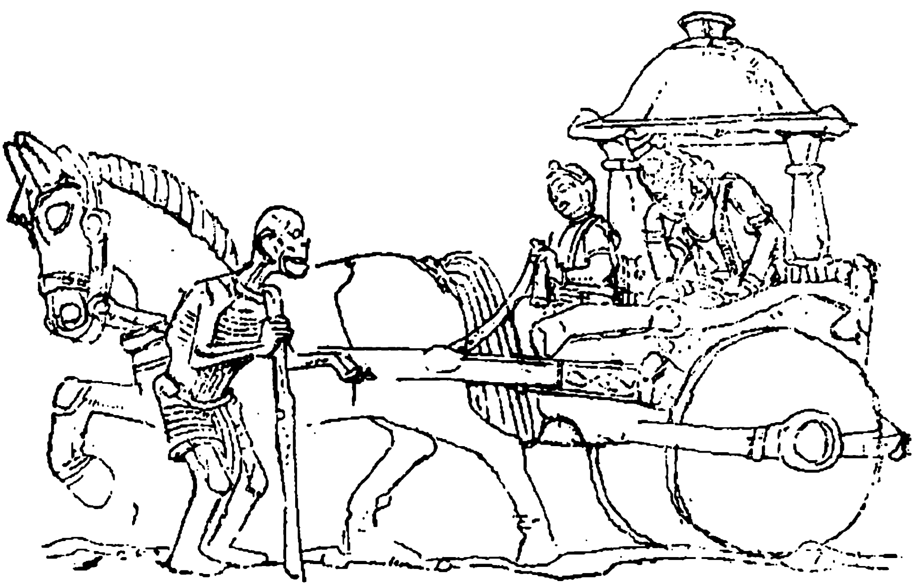
নালকের প্রাণ, সারা পৃথিবীর লোকের প্রাণ, আকাশের প্রাণ, বাতাসের প্রাণ বুদ্ধদেবকে দেখবার জন্য আকুলি-বিকুলি করছে। তাদের মনের দুঃখু কখনও বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে, কখনও ঝড়ের মতো এসে সোনার দেয়ালে ধাক্কা দিচ্ছে; আলো হয়ে ডাকছে—এসো! অন্ধকার হয়ে বলছে—নিস্তার কর! রাঙা ফুল হয়ে ফুটে উঠছে, আবার শুকনো পাতা হয়ে ঝরে পড়ছে—সিদ্ধার্থের চারিদিকে চোখের সামনে—জগৎ সংসারে হাসি-কান্না, জীবন-মরণ—রাতে-দিনে মাসে মাসে বছরে বছরে নানাভাবে নানাদিকে।

একদিন তিনি দেখছেন নীল আকাশের গায়ে পারিজাত ফুলের মালার মতো একদল হাঁস সারি বেঁধে উড়ে চলেছে—কী তাদের আনন্দ! হাজার হাজার ডানা একসঙ্গে তালে তালে উঠছে পড়ছে, এক সুরে হাজার হাঁস ডেকে চলেছে—চল, চল, চলরে চল! আকাশ তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে; মেঘ চলেছে সাদা পাল তুলে, বাতাস

চলেছে মেঘের পর মেঘ ঠেলে, পৃথিবী তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছে। নদী চলেছে সমুদ্রের দিকে, সমুদ্র আসছে নদীর দিকে—পাহাড় ভেঙে বালি ঠেলে। আনন্দে এত চলা এত বলা এত খেলার মাঝে কার হাতের তীর বিদ্যুতের মতো গিয়ে একটি হাঁসের ডানায় বিঁধল, অমনি যন্ত্রণার চিৎকারে দশদিক শিউরে উঠল। রক্তের ছিটেয় সকল গা ভাসিয়ে দিয়ে ছেঁড়া মালার ফুলের মতো তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল—তীরে বেঁধা রাজহাঁস। কোথায় গেল তার এত আনন্দ—সেই বাতাস দিয়ে ভেসে চলা, নীল আকাশে ডেকে চলা! এক নিমেষে ফুরিয়ে গেল পৃথিবীর সব আনন্দ, সব প্রাণ! আকাশ খালি হয়ে গেল, বাতাসের চলা বন্ধ হয়ে গেল; সব বলা, সব চলা, সব খেলা শেষ হয়ে গেল একটি তীরের ঘা পেয়ে! কেবল দূর থেকে—সিদ্ধার্থের কানের কাছে, প্রাণের কাছে বাজতে লাগল—কান্না আর কান্না! বুক ফেটে কান্না! দিনে রাতে, যেতে আসতে, চলতে ফিরতে, সুখের মাঝে, শান্তির মাঝে, কাজে কর্মে, আমোদে আহ্লাদে তিনি শুনতে থাকলেন—কান্না আর কান্না! জগৎজোড়া কান্না। ছোটর ছোট তার কান্না, বড়র বড় তাদেরও কান্না।

দিবারাত্রি ক্রমাগত ঝড়বৃষ্টি, অন্ধকারের পরে সে দিন মেঘ কেটে গিয়ে সকালের আলো পুবদিকে দেখা দিয়েছে, আকাশ আজ আনন্দে হাসছে, বাতাস আনন্দে বইছে, মেঘের গায়ে গায়ে মধুপিঙ্গল আলো পড়েছে; বনে বনে পাখিরা, গ্রামে গ্রামে চাষীরা, ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েরা আজ মধুমঙ্গল গান গাইছে। পুবের দরজায় দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ দেখছেন—আজ যেন কোথাও দুঃখ নেই, কান্না নেই! যতদূর দেখা যায়, যতখানি শোনা যায়—সকলই আনন্দ। মাঠের মাঝে আনন্দ সবুজ হয়ে দেখা দিয়েছে; বনে-উপবনে আনন্দ ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে; ঘরে ঘরে আনন্দ ছেলেমেয়ের হাসিমুখে, রঙিন কাপড়ে, নতুন খেলনায় ঝিকঝিক করছে, ঝুমঝুম বাজছে; আনন্দ—পুষ্পবৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ছে—লতা থেকে পাতা থেকে; আনন্দ—সে সোনার ধুলো হয়ে উড়ে চলেছে পথে পথে—যেন আবির খেলে।

সিদ্ধার্থের মনোরথ—সিদ্ধার্থের সোনার রথ আজ আনন্দের মাঝ দিয়ে পুবের পথ ধরে সকালের আলোর দিকে অন্ধকারের শেষের দিকে এগিয়ে চলেছে—আস্তে আস্তে। মনে হচ্ছে—পৃথিবীতে আজ দুঃখ নেই, রয়েছে কেবল আনন্দ—ঘুমের পরে জেগে ওঠার আনন্দ, অন্ধকারের পরে আলো পাওয়ার আনন্দ, ফুলের মতো ফুটে ওঠা, মালার মতো দুলে ওঠা, গানে গানে বাঁশির তানে জেগে ওঠার আনন্দ। পৃথিবীতে কিছু যেন আজ ঝরে পড়ছে না, ঝুরে মরছে না!



এমন সময় সকালের এত আলো, এত আনন্দ, ঝড়ের মুখে যেন প্রদীপের মতো নিবিয়ে দিয়ে সিদ্ধার্থের রথের আগে কে জানে কোথা থেকে এসে দাঁড়াল—অন্তহীন দন্তহীন একটা বুড়ো মানুষ লাঠিতে ভর দিয়ে। তার

গায়ে একটু মাংস নেই, কেবল ক'খানা হাড়। বয়সের ভারে সে কুঁজো হয়ে পড়েছে, তার হাত কাঁপছে, পা কাঁপছে, ঘাড় কাঁপছে; কথা বলতে কথাও তার কেঁপে যাচ্ছে। চোখে সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, কানে সে কিছু শুনতে পাচ্ছে না—কেবল দু'খানা পোড়া কাঠের মতো রোগা হাত সামনে বাড়িয়ে সে আলোর দিক থেকে অন্ধকারের দিকে চলে যাচ্ছে—গুটি গুটি, একা! তার শক্তি নেই, সামর্থ নেই, নেই তার একটি আপনার লোক, নেই তার সংসারে ছেলেমেয়ে বন্ধুবান্ধব; সব মরে গেছে, সব ঝরে গেছে—জীবনের সব রঙ্গরস শুকিয়ে গেছে—সব খেলা শেষ করে! আলো তার চোখে এখন দুঃখ দেয়, সুর তার কানে বেসুরো বাজে, আনন্দ তার কাছে নিরানন্দ ঠেকে। সে নিজের চারিদিকে অনেকখানি অন্ধকার, অনেক দুঃখশোক, অনেক জ্বালাযন্ত্রণা শতকুটি কাঁথার মতো জড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে—একা, একদিকে—আনন্দ থেকে দূরে, আলো থেকে দূরে। প্রাণ তার কাছ থেকে সরে পালাচ্ছে, গান তার সাড়া পেয়ে চুপ হয়ে যাচ্ছে, সুখ তার ত্রিসীমানায় আসছে না, সুন্দর তাকে দেখে ভয়ে মরছে! সকালের আলোর উপরে কালোছায়া ফেলে অদন্তের বিকট হাসি হেসে পিশাচের মতো সেই মূর্তি সিদ্ধার্থের সামনে পথ আগলে বললে—'আমাকে দেখ, আমি জরা, আমার হাতে কারও নিস্তার নেই—আমি সব শুকিয়ে দিই, সব ঝরিয়ে দিই, সব শুষে নিই, সব লুটে নিই! আমাকে চিনে রাখ হে রাজকুমার! তোমাকেও আমার হাতে একদিন পড়তে হবে—রাজপুত্র বলে তুমি জরার হাত থেকে নিস্তার পাবে না!' দশদিকে সে একবার বিকট হাসি হেসে চেয়ে দেখলে অমনি আকাশের আলো, পৃথিবীর সবুজ তার দৃষ্টিতে এক নিমেষে মুছে গেল, খেত জ্বলে গেল, নদী শুকিয়ে গেল—নতুন যা কিছু পুরনো হয়ে গেল, টাটকা যা কিছু বাসি হয়ে গেল। সিদ্ধার্থ দেখলেন—পাহাড় ধসে পড়ছে, গাছ ভেঙে পড়ছে, সব ধুলো হয়ে যাচ্ছে, সব গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে—তার মাঝ দিয়ে চলে যাচ্ছে সাদা চুল বাতাসে উড়িয়ে ছেঁড়া কাঁথা মাটিতে লুটিয়ে পায়ে পায়ে গুটি গুটি—অন্তহীন দন্তহীন বিকটমূর্তি জরা—সংসারের সব আলো নিবিয়ে দিয়ে সব আনন্দ ঘুচিয়ে দিয়ে সব শুষে নিয়ে সব লুটে নিয়ে একলা হাড়ে হাড়ে করতাল বাজিয়ে।

আর একদিন সিদ্ধার্থের সে মনোরথ—সিদ্ধার্থের সোনার রথ মৃদুমন্দ বাতাসে ধ্বজাপতাকা উড়িয়ে দিয়ে কপিলবাস্তুর দক্ষিণ দুয়ার দিয়ে আস্তে আস্তে বার হয়েছে। মলয় বাতাস কত ফুলের গন্ধ, কত চন্দনবনের শীতল পরশে ঠাণ্ডা হয়ে গায়ে লাগছে—সব তাপ, সব জ্বালা জুড়িয়ে দিয়ে। ফুল ফোটানো মধুর বাতাস, প্রাণ জুড়ানো দখিন বাতাস! কত দূরের মাঠে মাঠে রাখালছেলের বাঁশির সুর, কত দূরের বনে বনে পাপিয়ার পিউগান সেই বাতাসে ভেসে আসছে—কানের কাছে, প্রাণের কাছে! সবাই বার হয়েছে, সবাই গেয়ে চলেছে—খোলা হাওয়ার মাঝে, তারার আলোর নিচে—দুয়ার খুলে, ঘর ছেড়ে! আকাশের উপরে ঠাণ্ডা নীল আলো, পৃথিবীর উপরে ঠাণ্ডা আলে-ছায়া, তার মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে মৃদুমন্দ মলয় বাতাস—ফুরফুরে দখিন বাতাস—জলে-স্থলে বনে-উপবনে ঘরে-বাহিরে—সুখের পরশ দিয়ে, আনন্দের বাঁশি বাজিয়ে। সে বাতাসে আনন্দে বুক দুলে উঠছে, মনের পাল ভরে উঠছে। মনোরথ আজ ভেসে চলেছে নেচে চলেছে—সারি গানের তালে তালে সুখসাগরের থির জলে। স্বপ্নের ফুলের মতো শুকতারাটি আকাশ থেকে চেয়ে রয়েছে—পৃথিবীর দিকে। সুখের আলো ঝরে পড়েছে, সুখের বাতাস ধীরে বইছে—পুবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে। মনে হচ্ছে—আজ অসুখ যেন দূরে পালিয়েছে, অসোয়াস্তি যেন কোথাও নেই, জগৎসংসার সবই যেন, সবাই যেন আরামে রয়েছে সুখে রয়েছে শান্তিতে রয়েছে।

এমন সময় পর্দা সরিয়ে দিয়ে সুখের স্বপন ভেঙে দিয়ে সিদ্ধার্থের চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা পাঙাশ মূর্তি—জ্বরে জর্জর, রোগে কাতর। সে দাঁড়াতে পারছে না—ঘুরে পড়ছে। সে চলতে পারছে না—ধুলোর উপরে, কাদার উপরে শুয়ে রয়েছে। কখনও সে শীতে কাঁপছে, কখনও বা গায়ের জ্বালায় সে জল জল করে চিৎকার করছে। তার সমস্ত গায়ের রক্ত তার চোখ দুটো দিয়ে ঠিকরে পড়ছে। সেই চোখের দৃষ্টিতে আকাশ আগুনের মতো রাঙা হয়ে উঠেছে। সমস্ত গায়ের রক্ত জল হয়ে তার কাগজের মতো পাঙাশ, হিম অঙ্গ বেয়ে ঝরে পড়ছে। তাকে ছুঁয়ে বাতাস বরফের মতো হিম হয়ে যাচ্ছে। সে নিশ্বাস টানছে যেন সমস্ত পৃথিবীর প্রাণকে শুষে নিতে চাচ্ছে। সে নিশ্বাস ছাড়ছে যেন নিজের প্রাণ, নিজের জ্বালাযন্ত্রণা সারা সংসারে ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সিদ্ধার্থ দেখলেন, সংসারের আলো নিবে গেছে, বাতাস মরে গেছে, সব কথা সব গান চুপ হয়ে গেছে। কেবল ধুলো কাদা মাখা জ্বরের সেই পাঙাশ মূর্তির বুকের ভিতর থেকে একটা শব্দ আসছে—কে যেন পাথরের দেয়ালে হাতুড়ি পিটছে—ধ্বক, ধ্বক! তারই তালে তালে আকাশের সব তারা একবার নিবছে একবার জ্বলছে, বাতাস একবার আসছে একবার যাচ্ছে।

জ্বরের সেই ভীষণ মূর্তি দেখে সিদ্ধার্থ ঘরে এসেছেন, রাজ-ঐশ্বর্যের মাঝে ফিরে এসেছেন, সুখসাগরের ঘাটে ফিরে এসেছেন, কিন্তু তখনও তিনি শুনছেন যেন তাঁর বুকের ভিতরে পাঁজরায় পাঁজরায় ধাক্কা দিয়ে শব্দ উঠছে—ধ্বক, ধ্বক!

এবার পশ্চিমের দুয়ার দিয়ে—অস্তাচলের পথ দিয়ে পশ্চিমমুখে মনোরথ চলেছে—সোনার রথ চলেছে—যে দিকে দিন শেষ হচ্ছে, যে দিকে সূর্যের আলো অস্ত যাচ্ছে। সে দিক থেকে সবাই মুখ ফিরিয়ে চলে আসছে নিজের নিজের ঘরের দিকে। পাখিরা ফিরে আসছে কলরব করে নিজের বাসায়—গাছের ডালে, পাতার আড়ালে। গাইবাছুর সব ফিরে আসছে মাঠের ধার দিয়ে নদীর পার দিয়ে নিজের গোঠে, গোধূলির সোনার ধুলো মেখে। রাখালছেলেরা ফিরে আসছে গাঁয়ের পথে বেণু বাজিয়ে মাটির ঘরে মায়ের কোলে। সবাই ফিরে আসছে ভিন গাঁয়ের হাট সেরে দূর পাটনে বিকিকিনির পরে। সবাই ঘরে আসছে—যারা দূরে ছিল তারা, যারা কাছে ছিল তারাও। ঘরের মাথায় আকাশ পিদিম, যাদের ঘর নেই দুয়োর নেই তাদের আলো ধরেছে। তুলসীতলায় দুগ্‌গো-পিদিম—যারা কাজে ছিল, কর্মে ছিল, যারা পড়া পড়ছিল, খেলা খেলছিল, তাদের জন্যে আলো ধরেছে। সবাই আজ মায়ের দুই চোখের মতো অনিমেষ দুটি আলোর দিকে চেয়ে চেয়ে ফিরে আসছে মায়ের কোলে, ভাইবোনেদের পাশে, বন্ধুবান্ধবের মাঝখানে। ভিখারি যে সেও আজ মনের আনন্দে একতারায় আগমনী বাজিয়ে গেয়ে চলেছে 'এল মা উমা ঘরে এল মা।' মিলনের শাঁখ ঘরে ঘরে বেজে উঠেছে। আগমনীর সুর, ফিরে আসার সুর, বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুর, কোলে এসে গলাধরার সুর, আকাশ দিয়ে ছুটে আসছে, বাতাস দিয়ে ছুটে আসছে, খোলা দুয়ারে উঁকি মারছে, খালি ঘরে সাড়া দিচ্ছে। শূন্যপ্রাণ, খালিবুক ভরে উঠছে আজ ফিরে পাওয়া সুরে, বুকে পাওয়া সুরে, হারানিধি খুঁজে পাওয়া সুরে।

সিদ্ধার্থ দেখছেন, সুখের আজ কোথাও অভাব নেই, আনন্দের মাঝে এমন একটু ফাঁক নেই যেখান দিয়ে দুঃখ আজ আসতে পারে। ভরা নদীর মতো ভরপুর আনন্দ, পূর্ণিমার চাঁদের মতো পরিপূর্ণ আনন্দ জগৎসংসার আলোয় ভাসিয়ে, রসে ভরে দিয়েছে। আনন্দের বান এসেছে। আর কোথাও কিছু শুকনো নেই কোনও ঠাঁই খালি নেই। সিদ্ধার্থ দেখতে দেখতে চলেছেন মিলনের আনন্দ। ঝাঁকে ঝাঁকে দলে দলে আনন্দ আজ জোর করে দোর ঠেলে বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, গলা জড়িয়ে ধরছে। কেউ আজ কাউকে ভুলে থাকছে না, ছেড়ে থাকছে না, ছেড়ে যাচ্ছে না, ছেড়ে দিচ্ছে না! আনন্দ কার নেই? আনন্দ নেই কোনখানে? কে আজ দুঃখে আছে, চোখের জল কে ফেলছে, মুখ শুকিয়ে কে বেড়াচ্ছে? যেন তাঁর কথার উত্তর দিয়ে কোনও এক ভাঙা মন্দিরের কাঁসরে খনখন করে তিনবার ঘা পড়ল—আছে, আছে, দুঃখ আছে! অমনি সমস্ত সংসারের ঘুম যেন ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে একটা বুকফাটা কান্না উঠল—হায় হায় হা হা! আকাশ ফাটিয়ে সে কান্না, বাতাস চিরে সে কান্না! বুকের ভিতরে বত্রিশ নাড়ি ধরে যেন টান দিতে থাকল—সে কান্না। সিদ্ধার্থ সুখের স্বপ্ন থেকে যেন হঠাৎ জেগে উঠলেন। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন, সব ক'টি তারার আলো যেন মরা মানুষের চোখের মতো ঘোলা হয়ে গেছে। পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখলেন, রাত আড়াই পহরে জলেস্থলে পাঙাশ কুয়াশার জাল পড়ে আসছে—কে যেন সাদা একখানা চাদর পৃথিবীর মুখ ঢেকে আস্তে আস্তে টেনে দিচ্ছে। ঘরে ঘরে যত পিদিম জ্বলছিল সবগুলো জ্বলতে নিবতে, নিবতে জ্বলতে, হঠাৎ এক সময় দপ করে নিবে গেল, আর জ্বলল না—কোথাও আর আলো রইল না। কিছু আর সাড়া দিচ্ছে না, শব্দ করছে না; আকাশের আধখানা জুড়ে জলেভরা কালো মেঘ, কাঁদো কাঁদো দু'খানি চোখের পাতার মতো নুয়ে পড়েছে চোখের জলের মতো। বৃষ্টির এক একটি ফোঁটা ঝরে পড়ছে—আকাশ থেকে পৃথিবীর উপর! তারই মাঝ দিয়ে বুদ্ধদেব দেখছেন দলে দলে লোক চলেছে—সাদা চাদরে ঢাকা হাজার হাজার মরা মানুষ কাঁধে নিয়ে কোলে করে বুকে ধরে। তাদের পা মাটিতে পড়ছে কিন্তু কোনও শব্দ করছে না, তাদের বুক ফুলে ফুলে উঠছে বুকফাটা কান্নায়, কিন্তু কোনও কথা তাদের মুখ দিয়ে বার হচ্ছে না। নদীর পারে—যে দিকে সূর্য ডোবে, যে দিকে আলো নেবে, দিন ফুরিয়ে যায়—সেইদিকে দুই উদাস চোখ রেখে হনহন করে তারা এগিয়ে চলেছে মহাশ্মশানের ঘাটের মুখে মুখে, দূরে দূরে, অনেক দূরে—ঘরে থেকে অনেক দূরে, বুকের কাছ থেকে কোলের কাছ থেকে অনেক দূরে—ঘরে আসা, ফিরে আসা, বুকে আসা, কোলে আসার পথ থেকে অনেক দূরে—চলে যাবার পথে, ছেড়ে যাবার পথে, ফেলে যাবার কাঁদিয়ে যাবার পথে।

এপারে ওপারে মরণের কান্না আর চিতার আগুন, মাঝ দিয়ে চলে যাবার পথ—কেঁদে চলে যাবার পথ, কাঁদিয়ে চলে যাবার পথ। থেকে থেকে গরম নিশ্বাসের মতো এক একটা দমকা বাতাসে রাশি রাশি ছাই উড়ে

এসে সেই মরণ পথের যত যাত্রীর মুখে লাগছে, চোখে লাগছে! সিদ্ধার্থ দেখছেন ছাই উড়ে এসে মাথার চুল সাদা করে দিচ্ছে, গায়ের বরণ পাঙাশ করে দিচ্ছে! ছাই উড়ছে—সব জ্বালানো, সব পোড়ানো গরম ছাই! আগুন নিবে ছাই হয়ে উড়ে চলেছে, জীবন ছাই হয়ে উড়ে চলেছে, মরণ—সেও ছাই হয়ে উড়ে চলেছে। সুখ ছাই হয়ে উড়ে যাচ্ছে, দুঃখ ছাই হয়ে উড়ে যাচ্ছে, সংসারের যা কিছু যত কিছু সব ছাইভস্ম হয়ে উড়ে চলেছে দূরে দূরে, মাথার উপরে খোলা আকাশ দিয়ে পাঙাশ একখানা মেঘের মতো। তারই তলায় বুদ্ধদেব দেখলেন—মরা ছেলেকে দুই হাতে তুলে ধরে এক মা একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন—বাতাস চারিদিকে কেঁদে বেড়াচ্ছে—হায় হায় হায়রে হায়! সে দিন ঘরে এসে সিদ্ধার্থ দেখলেন, তাঁর সোনার পুষ্পপাত্রে ফুটন্ত পদ্ম ফুলটির জায়গায় রয়েছে একমুঠো ছাই, আর মরা মানুষের আধপোড়া একখানা বুকের হাড়।

আজ সে বরফের হাওয়া ছুরির মতো বুকে লাগছিল। শীতের কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেছে—পৃথিবীর উপরে আর সূর্যের আলোও পড়ছে না, তারার আলোও আসছে না—দিনরাত্রি সমান বোধ হচ্ছে। ঝাপসা আলোতে সব রঙ বোধ হচ্ছে যেন কালো আর সাদা, সব জিনিস বোধ হচ্ছে যেন কতদূর থেকে দেখছি—অস্পষ্ট ধোঁয়া দিয়ে ঢাকা, শিশির দিয়ে মোছা!

উত্তরমুখে খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ দেখছিলেন, পৃথিবীর সব সবুজ, সব পাতা, সব ফুল বরফে আর কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে; বরফের চাপনে পথঘাট উঁচুনিচু ছোট বড় সব সমান হয়ে গেছে! আকাশ দিয়ে আর একটা পাখি উড়ে চলছে না, গেয়ে যাচ্ছে না; বাতাস দিয়ে আজ একটিও ফুলের গন্ধ, একটুখানি সুখের পরশ, কি আনন্দের সুর ভেসে আসছে না; সাদা বরফে, হিম কুয়াশায়, নিঝুম শীতে, সব চুপ হয়ে গেছে, স্থির হয়ে গেছে, পাষাণ হয়ে গেছে—পৃথিবী যেন মূর্ছা গেছে। সিদ্ধার্থ দিনের পর দিন উত্তরের হিম কুয়াশায় সাদা বরফের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন—কুয়াশার জাল সরিয়ে দিয়ে আলো কি আর আসবে না? বরফ গলিয়ে ফুল ফুটিয়ে পৃথিবীকে রঙে রঙে ভরে দিয়ে সাজিয়ে দিয়ে আনন্দ কি আর দেখা দেবে না? চারিদিক নিরুত্তর ছিল। সিদ্ধার্থ কান পেতে মন দিয়ে শুনছিলেন, কোনও দিক থেকে কোনও শব্দ আসছিল না। সেই না রাত্রি না দিন, না আলো না অন্ধকারের মাঝে কোনও সাড়া মিলছিল না। তিনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। যতদূর দেখা যায় ততদূর তিনি দেখছিলেন বরফের দেয়াল আর কুয়াশার পর্দা; তারই ভিতর দিয়ে জরা উঁকি মারছে—সাদা চুল নিয়ে; জ্বর কাঁপছে—পাঙাশ মুখে শূন্যে চেয়ে; মরণ দেখা যাচ্ছে—বরফের মতো হিম সাদা চাদরে ঢাকা! আয়নায় নিজের ছায়া দেখার মতো, সাদা কাগজের উপরে নানা রকমের ছবি দেখার মতো, সেই ঘন কুয়াশার উপরে সেই জমাট বরফের দেয়ালে সিদ্ধার্থ নিজেকে আর জগৎসংসারের সবাইকে দেখতে পাচ্ছেন—জন্মাতে, বুড়ো হতে, মরে যেতে; মহাভয় তাদের সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে রক্তমাখা ত্রিশূল হাতে! জ্বর, জরা আর মরা—তিনটে শিকারি কুকুরের মতো ছুটে চলছে মহাভয়ের সঙ্গে সঙ্গে, দাঁতে নখে যা কিছু সব চিরে ফেলে, ছিঁড়ে ফেলে, টুকরো টুকরো করে। কিছু তাদের আগে দাঁড়াতে পারছে না, কেউ তাদের কাছে নিস্তার পাচ্ছে না! নদীতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ভয়ে নদী শুকিয়ে যাচ্ছে, পর্বতে এসে তারা ধাক্কা দিচ্ছে, পাথর চূর্ণ হয়ে মাটিতে মিশে যাচ্ছে। তারা মায়ের কোল থেকে ছেলেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে—আগড় ভেঙে, শিকড় ছিঁড়ে। মহাভয়ের আগে রাজা-প্রজা ছোট বড় সব উড়ে চলেছে, ধুলোর উপর দিয়ে শুকনো পাতার মতো। সবাই কাঁপছে ভয়ে, সব নুয়ে পড়ছে ভয়ে। সব মরে যাচ্ছে, সব নিবে যাচ্ছে—ঝড়ের আগে বাতাসের মুখে আলোর মতো। এক দণ্ড কিছু স্থির থাকতে পারছে না! আকাশ দিয়ে হাহাকার করে ছুটে আসছে ভয়, বাতাস দিয়ে মার মার করে ছুটে আসছে ভয়, জলেস্থলে ঘরেবাইরে হানা দিচ্ছে ভয়—জ্বরের ভয়, জরার ভয়, মরণের ভয়! কোথায় সুখ? কোথায় শান্তি? কোথায় আরাম? সিদ্ধার্থ মনের ভিতর দেখছেন ভয়, চোখের উপর দেখছেন ভয়, মাথার উপর বজ্রাঘাতের মতো ডেকে চলেছে ভয়, পায়ের তলায় ভূমিকম্পের মতো পৃথিবী ধরে নাড়া দিচ্ছে ভয়, প্রকাণ্ড জালের মতো চারিদিক ঘিরে নিয়েছে ভয়। সারা সংসার তার ভিতরে আকুলি বিকুলি করছে। হাজার হাজার হাত ভয়ে আকাশ আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করছে, বাতাসে কেবলি শব্দ উঠছে রক্ষা কর! নিস্তার কর! কিন্তু কে রক্ষা করবে? কে নিস্তার করবে? ভয়ের জাল যে সারা সংসারকে ঘিরে নিয়েছে। এমন কে আছে যার ভয় নেই, কে এমন যার দুঃখ নেই, শোক নেই, এত শক্তি কার যে মহাভয়ের হাত থেকে জগৎ সংসারকে উদ্ধার করে—এই অটুট মায়াজাল ছিঁড়ে? সিদ্ধার্থের কথার যেন উত্তর দিয়ে আকাশে-বাতাসে, জলে-স্থলে, পুবে-পশ্চিমে, উত্তরে-দক্ষিণে শব্দ উঠল—বিদ্ধা মহিদ্ধিকা—মহাশক্তি বুদ্ধগণ! সদেবকস্স লোকস্স সব্বে এতে পরায়ণা।

দীপা, নাথা, পতিষ্ঠা, চ তাণা লেণা চ পাণীনং।
গতি, বন্ধু, মহাস্সাসা, সরণা চ হিতেসিনো।।
মহাপ্পভা, মহাতেজা মহাপঞ্ঞা, মহাব্বলা।
মহা কারুণিকা ধীরা সব্বেসানং সুখাবহা।।

বুদ্ধগণই ত্রিলোকের লোককে পরম পথে নিয়ে চলেন। মহাপ্রভ, মহাতেজ, মহাজ্ঞানী, মহাবল, ধীর করুণাময় বুদ্ধগণ সকলকেই সুখ দেন। জগতের হিতৈষী তাঁরা অকূলের কূল, অনাথের নাথ, সকলের নির্ভর, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির গতি, যার কেউ নেই তার বন্ধু, যে হতাশ তার আশা, অশরণ যে তার শরণ।

দেখতে দেখতে সিদ্ধার্থের চোখের সামনে থেকে—মনের উপর থেকে জগৎজোড়া মহাভয়ের ছবি আলোর আগে অন্ধকারের মতো মিলিয়ে গলে। তিনি দেখলেন, আকাশের কুয়াশা আলো হয়ে পৃথিবীর উপর এসে পড়েছে। সেই আলোয় বরফ গলে চলেছে—পৃথিবীকে সবুজে সবুজে পাতায় পাতায় ফুলে ফুলে ভরে দিয়ে। সেই আলোতে আনন্দ আবার জেগে উঠেছে। পাখিদের গানে গানে বনে উপবনে সেই আলো। বাইরে বাঁশি হয়ে বেজে উঠছে, অন্তরে সুখ হয়ে উথলে পড়েছে, শান্তি হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে—সেই আলো। ত্রিভুবনে—স্বর্গ মর্ত পাতালে—সেই আলো আনন্দের পথ খুলে দিয়েছে, শান্তির সাতরঙের ধ্বজা উড়িয়ে দিয়েছে। সেই আলোর পথ দিয়ে সিদ্ধার্থ দেখলেন, চলেছেন—সে তিনি নিজেই! তাঁর খালি পা, খোলা মাথা। তাঁর ভয় নেই, দুঃখ নেই, শোক নেই। সদানন্দ তিনি বরফের উপর দিয়ে কুয়াশার ভিতর দিয়ে আনন্দে চলেছেন, নির্ভয়ে চলেছেন—সবাইকে অভয় দিয়ে, আনন্দ বিলিয়ে। মহাভয় তাঁর পায়ের কাছে কাঁপছে একটুখানি ছায়ার মতো! মায়াজাল ছিঁড়ে পড়েছে তাঁর পায়ের তলায়—যেন খণ্ড খণ্ড মেঘ!

যেমন আর দিন, সে দিনও তেমনি—রথ ফিরিয়ে সিদ্ধার্থ ঘরে এলেন বটে, কিন্তু সেইদিন থেকে মন তাঁর সে রাজমন্দিরে, সেই মায়াজালে ঘেরা সোনার স্বপনমোড়া ঘরখানিতে আর বাঁধা রইল না। সে উদাসী হয়ে চলে গেল—ঘর ছেড়ে চলে গেল—কত অনামা নদীর ধারে ধারে কত আজানা দেশের পথে পথে—একা নির্ভয়।

সন্ধ্যাতারার সঙ্গে সঙ্গে ফুটন্ত ফুলের মতো নতুন ছেলের কচি মুখ, নতুন মা হয়েছেন সিদ্ধার্থের রানী যশোধরা—তাঁর সুন্দর মুখের মধুর হাসি, সহচরীদের আনন্দ গান, কপিলবাস্তুর ঘরে ঘরে সাতরঙের আলোর মালা—কিছুতেই আর সিদ্ধার্থের মনকে সংসারের দিকে ফিরিয়ে আনতে পারলে না—সে রইল না, সে রইল না।

ছেলে হয়েছে; এবার সিদ্ধার্থ সংসার পেতে ঘরে রইলেন—এই ভেবে শুদ্ধোদন নতুন ছেলের নাম রাখলেন রাহুল। কিন্তু সিদ্ধার্থের মন সংসারে রইল কই? রাহুল রইল, রইল রাহুলের মা যশোধরা, পড়ে রইল ঘরবাড়ি, বন্ধুবান্ধব। আর সব আঁকড়ে পড়ে রইলেন রাজা শুদ্ধোদন, কেবল চলে গেলেন সিদ্ধার্থ—তাঁর মন যে দিকে গেছে।

সে দিন আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা। রাত তখন গভীর। রাজপুরে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আলো নিবিয়ে গান থামিয়ে সিদ্ধার্থ ডাকলেন—'ছন্দক, আমার ঘোড়া নিয়ে এসো।' সিদ্ধার্থের চরণের দাস ছন্দক, কণ্ঠক ঘোড়াকে সোনার সাজ পরিয়ে অর্ধেক রাতে রাজপুরে নিয়ে এল। সিদ্ধার্থ সেই ঘোড়ায় চড়ে চলে গেলেন— অনামা নদীর পারে। পিছনে অন্ধকারে ক্রমে মিলিয়ে গেল—কপিলবাস্তুর রাজপুরী, সামনে দেখা গেল—পূর্ণিমার আলোয় আলোময় পথ!

ছন্দক চলেছে, কপিলবাস্তুর দিকে, সিদ্ধার্থের মাথার মুকুট, হাতের বালা, গলার মালা, কানের কুণ্ডল আর সেই কণ্ঠক ঘোড়া নিয়ে; আর সিদ্ধার্থ চলেছেন পায়ে হেঁটে, নদী পার হয়ে, বনের দিকে তপস্যা করতে—দুঃখের কোথা শেষ তাই জানতে।

ছোট নদী—দেখতে এতটুকু, নামটিও তার নমা; কেউ বলে অনামা, কেউ বলে অনোমা, কেউ বা ডাকে অনমা। সিদ্ধার্থ নদীর যে পার থেকে নামলেন সে পারে ভাঙন জমি—সেখানে ঘাট নেই, কেবল পাথর আর কাঁটা। আর যে পারে সিদ্ধার্থ উঠলেন সে পারে ঘাটের পথ ঢালু হয়ে একেবারে জলের ধারে নেমে এসেছে; গাছে গাছে ছায়া করা পথ। সবুজ ঘাস, বনের ফুল দিয়ে সাজানো বনপথ। এই দুই পারের মাঝে নমা নদীর জল—বালি ধুয়ে ঝিরঝির করে বহে চলেছে। একটা জেলে ছোট একখানি জাল নিয়ে মাছ ধরছে। সিদ্ধার্থ নিজের গায়ের সোনার চাদর সেই জেলেকে দিয়ে তার ছেঁড়া কাঁথাখানি নিজে পরে চলেছেন।



নদী—সে ঘুরে ঘুরে চলেছে আম কাঁঠালের বনের ধার দিয়ে, ছোট ছোট পাহাড়ের গা ঘেঁষে—কখনও পুব মুখে, কখনও দক্ষিণ মুখে। সিদ্ধার্থ চলেছেন সেই নদীর ধারে ধারে ছাওয়ায় ছাওয়ায়, মনের আনন্দে। এমন সে সবুজ ছাওয়া, এমন সে জলের বাতাস যে মনে হয় এইখানেই থাকি। ফলে ভরা, পাতায় ঢাকা জামগাছ, একেবারে নদীর উপর ঝুঁকে পড়েছে; তারই তলায় ঋষিদের আশ্রম। সেখানে সাতদিন, সাতরাত্রি কাটিয়ে সিদ্ধার্থ বৈশালী নগরে এলেন। সেখানে জটাধারী মহাপণ্ডিত আরাড় কালাম, নগরের বাইরে তিনশ চেলা নিয়ে, আস্তানা পেতে বসেছেন। সিদ্ধার্থ তাঁর কাছে শাস্ত্র পড়লেন, ধ্যান, আসন, যোগ-যাগ, মন্তর-তন্তর শিখলেন কিন্তু দুঃখকে কিসে জয় করা যায় তার সন্ধান পেলেন না।

তিনি আবার চললেন। চারিদিকে বিন্ধ্যাচল পাহাড়; তার মাঝে রাজগেহ নগর। মগধের রাজা বিম্বিসার সেখানে রাজত্ব করেন। সিদ্ধার্থ সেই নগরের ধারে রত্নগিরি পাহাড়ের একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। তখন ভোর হয়ে আসছে, সিদ্ধার্থ পাহাড় থেকে নেমে নগরের পথে 'ভিক্ষা দাও' বলে এসে দাঁড়ালেন; ঘুমন্ত নগর তখন সবে জেগেছে, চোখ মেলেই দেখছে—নবীন সন্ন্যাসী! এত রূপ, এমন করুণামাখা হাসিমুখ, এমন আনন্দ দিয়ে গড়া সোনার শরীর, এমন শান্ত দুটি চোখ নিয়ে, এমন আনন্দ দিয়ে গড়া সোনার শরীর, এমন শান্ত দুটি চোখ নিয়ে, এমন করে এক হস্তে অভয় দিয়ে, অন্য হাতে ভিক্ষে চেয়ে; চরণের ধুলোয় রাজপথ পবিত্র করে কেউ তো কোনওদিনে সে নগরে আসেনি! যারা চলেছিল তাঁকে দেখে তারা ফিরে আসছে; ছেলে খেলা ফেলে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে আছে; মেয়েরা ঘোমটা খুলে তাঁর দিকে চেয়ে আছে! তাঁকে দেখে কারও ভয় হচ্ছে না, লজ্জা করছে না। রাজা বিম্বিসার রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছেন—তাঁকে দেখতে। কত সন্ন্যাসী ভিক্ষা করতে আসে কিন্তু এমনটি তো কেউ আসে না। রাজপথের এপার থেকে ওপার লোক দাঁড়িয়েছে—তাঁকে দেখতে, তাঁর হাতে ভিক্ষে দিতে, দোকানি চাচ্ছে দোকান লুটিয়ে দিয়ে তাঁকে ভিক্ষে দিতে, পসারি চাচ্ছে পসরা খালি করে দিয়ে তাঁকে ভিক্ষে দিতে! যে নিজে ভিখারি সেও তার ভিক্ষার ঝুলি শূন্য করে তাঁকে বলছে—ভিক্ষে নাও গো, ভিক্ষে নাও! ভিক্ষেয় সিদ্ধার্থের দুই হাত ভরে গেছে কিন্তু ভিক্ষে দিয়ে তখনও লোকের মন ভরেনি! তারা মণিমুক্তো সোনারুপো ফুলফল চালডাল স্তূপাকারে এনে সিদ্ধার্থের পায়ের কাছে রাখছে, তারা নিষেধ মানবে না, মানা শুনবে না।

রাজা-প্রজা ছোট বড় সকলের মনের সাধ পুরিয়ে সিদ্ধার্থ সে দিন রাজগৃহের দ্বারে দ্বারে পথে পথে এমন করে ভিক্ষে নিলেন যে তেমন ভিক্ষে কেউ কোনওদিন দেবেও না পাবেও না। এত মণিমুক্তো সোনারুপো বসন-

ভূষণ সিদ্ধার্থের দুই হাত ছাপিয়ে রাজগৃহের রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছিল যে তত ঐশ্বর্য কোনও রাজা কোনও দিন চোখেও দেখেনি। সিদ্ধার্থ নিজের জন্য কেবল এক মুঠো শুকনো ভাত রেখে সেই অতুল ঐশ্বর্য মগধের যত দীনদুঃখীকে বিতরণ করে গেলেন।

উদরক পণ্ডিত সাতশ চেলা নিয়ে গয়ালীপাড়ায় চৌপাটি খুলে বসেছেন। সিদ্ধার্থ সেখানে এসে পণ্ডিতদের কাছে শাস্তর শিখতে লাগলেন। উদরকের মতো পণ্ডিত তখন ভূভারতে কেউ ছিল না। লোকে বলত ব্যাসদেবের মাথা আর গণেশের পেট—এই দুইটি এক হয়ে অবতার হয়েছেন উদরক শাস্ত্রী। সিদ্ধার্থ কিছুদিনের মধ্যে সকল শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হয়ে উঠলেন, কোনও ধর্ম কোনও শাস্ত্র জানতে আর বাকি রইল না। শেষে একদিন, তিনি গুরুকে প্রশ্ন করলেন—'দুঃখ যায় কিসে?'

উদরক সিদ্ধার্থকে বললেন—'এসো, তুমি আমি দু'জনে একটা বড়গোছের চৌপাটি খুলে চারিদিকে সংবাদ পাঠাই, দেশবিদেশ থেকে ছাত্র এসে জুটুক, বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটবে। এই পেটই হচ্ছে দুঃখের মূল, একে শান্ত রাখ, দেখবে দুঃখ তোমার ত্রিসীমানায় আসবে না।'

উদরক শাস্ত্রীকে দূর থেকে নমস্কার করে সিদ্ধার্থ চৌপাটি থেকে বিদায় হলেন। দেখলেন, গ্রামের পথ দিয়ে উদরকের সাতশ চেলা ভারে ভারে মণ্ডা নিয়ে আসছে—গুরুর পেটটি শান্ত রাখতে।

সিদ্ধার্থ গ্রামের পথ ছেড়ে, বনের ভিতর দিয়ে চললেন। এই বনের ভিতর কৌণ্ডিন্যের সঙ্গে সিদ্ধার্থের দেখা। ইনিই একদিন শুদ্ধোদন রাজার সভায় গুনে বলেছিলেন, সিদ্ধার্থ নিশ্চয়ই সংসার ছেড়ে বুদ্ধ হবেন। কৌণ্ডিন্যের সঙ্গে আর চারজন ব্রাহ্মণের ছেলে ছিল। তাঁরা সবাই সিদ্ধার্থের শিষ্য হয়ে তাঁর সেবা করবার জন্য সন্ন্যাসী হয়ে কপিলবাস্তু থেকে চলে এসেছেন।

অঞ্জনা নদীর তীরে উরাইল বন। সেইখানেই সিদ্ধার্থ তপস্যায় বসলেন—দুঃখের শেষ কোথায় তাই জানতে। শাস্ত্রে যেমন লিখেছে, গুরুরা যেমন বলেছেন, তেমনই করে বছরের পর বছর ধরে সিদ্ধার্থ তপস্যা করছেন।

কঠোর তপস্যা—ঘোরতর তপস্যা—শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায় বাদলে অনশনে একাসনে এমন তপস্যা কেউ কখনও করেনি! কঠোর তপস্যায় তাঁর শরীর শুকিয়ে কাঠের মতো হয়ে গেল, গায়ে আর একবিন্দু রক্ত রইল না—দেখে আর বোঝা যায় না তিনি বেঁচে আছেন কিনা!

সিদ্ধার্থের কত শক্তি ছিল, কত রূপ ছিল, কত আনন্দ কত তেজ ছিল, ঘোরতর তপস্যায় সব একে একে নষ্ট হয়ে গেল। তাঁকে দেখলে মানুষ বলে আর চেনা যায় না—যেন একটা শুকনো গাছের মতো দাঁড়িয়ে আছেন।

এমনি করে অনেকদিন কেটে গেছে। সে দিন নতুন বছর, বৈশাখ মাস, গাছে গাছে নতুন পাতা, নতুন ফল, নতুন ফুল। উরাইল বনে যত পাখি, যত প্রজাপতি, যত হরিণ, যত ময়ূর সব যেন আজ কিসের আনন্দে জেগে উঠেছে, ছুটে বেড়াচ্ছে, উড়ে উড়ে গেয়ে গেয়ে খেলে বেড়াচ্ছে। সিদ্ধার্থের পাঁচ শিষ্য শুনতে পাচ্ছেন খুব গভীর বনের ভিতরে যেন কে একজন একতারা বাজিয়ে গান গাইছে। সারাবেলা ধরে আজ অনেকদিন পরে শিষ্যেরা দেখছেন সিদ্ধার্থের স্থির দু'টি চোখের পাতা একটু একটু কাঁপছে—বাতাসে যেন শুকনো ফুলের পাপড়ি। বেলা পড়ে এসেছে; গাছের ফাঁক দিয়ে শেষ বেলার সিঁদুর আলো নদীর ঘাট থেকে বনের পথ পর্যন্ত বিছিয়ে গেছে—গেরুয়া বসনের মতো।

একদল হরিণ বালির চড়ায় জল খেতে নেমেছে, গাছের তলায় একটা ময়ূর ঠাণ্ডা বাতাসে আপনার সব পালক ছড়িয়ে দিয়ে সন্ধ্যার আগে প্রাণভরে একবার নেচে নিচ্ছে। সেই সময় সিদ্ধার্থ চোখ মেলে চাইলেন—এতদিন পরে আজ প্রথম তিনি যোগাসন ছেড়ে নদীর দিকে চললেন। শিষ্যেরা দেখলেন, তাঁর শরীর এমন দুর্বল যে তিনি চলতে পারছেন না। নদীর পারে একটা আমলকী গাছ জলের উপর ঝুঁকে পড়েছিল, সিদ্ধার্থ তারই একটা ডাল ধরে আস্তে আস্তে জলে নামলেন। তারপর অতি কষ্টে জল থেকে উঠে গোটা কয়েক আমলকী ভেঙে নিয়ে বনের দিকে চললেন আর অচেতন হয়ে নদীর ধারে পড়ে গেলেন। শিষ্যেরা ছুটে এসে তাঁকে ধরাধরি করে আশ্রমে নিয়ে এল। অনেক যত্নে সিদ্ধার্থ সুস্থ হয়ে উঠলেন। কৌণ্ডিন্য প্রশ্ন করলেন—'প্রভু, দুঃখের শেষ হয় কিসে জানতে পারলেন কি?' সিদ্ধার্থ ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না—এখনও না।' অন্য চার শিষ্য, তাঁরা বললেন—'প্রভু, তবে আর একবার যোগাসনে বসুন, জানতে চেষ্টা করুন—দুঃখের শেষ আছে কিনা।'

সিদ্ধার্থ চুপ করে রইলেন। কিন্তু শিষ্যদের কথার উত্তর দিয়েই যেন একটা পাগলা বনের ভিতর থেকে একতারা বাজিয়ে গেয়ে উঠল—'নারে! নারে! নাইরে নাই!'

কৌণ্ডিন্য বললেন—'জানবার কি কোনও পথ নেই প্রভু?' সিদ্ধার্থ বললেন—'পথের সন্ধান এখনও পাইনি, কিন্তু দেখ তার আগেই এই শরীর দুর্বল হয়ে পড়ল, বৃথা যোগেযাগে নষ্ট হবার মতো হল। এখন এই শরীরে আবার বল ফিরিয়ে আনতে হবে, তবে যদি পথের সন্ধান করে ওঠা যায়। নিস্তেজ মন, দুর্বল শরীর নিয়ে কোনও কাজ অসম্ভব। শরীরকে সবল রাখো, মনকে সতেজ রাখো। বিলাসীও হবে না, উদাসীও হবে না। শরীর মনকে বেশি আরামও দেবে না, বেশি কষ্টও সহাবে না, তবেই সে সবল থাকবে, কাজে লাগবে, পথের সন্ধানে চলতে পারবে। একতারার তার যেমন জোরে টানলে ছিঁড়ে যায়, তেমনি বেশি কষ্ট দিলে শরীর মন ভেঙে পড়ে। যেমন তারকে একবার ঢিলে দিলে তাতে কোনও সুরই বাজে না, তেমনি শরীর মনকে আরামে আলস্যে ঢিলে করে রাখলে সে নিষ্কর্মা হয়ে থাকে। বৃথা যোগেযাগে শরীর মনকে নিস্তেজ করেও লাভ নেই, বৃথা আলস্য বিলাসে তাকে নিষ্কর্মা বসিয়ে রেখেও লাভ নেই—মাঝের পথ ধরে চলাই ঠিক।'

সে দিন থেকে শিষ্যরা দেখলেন, সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসীদের মতো ছাইমাখা, আসন বেঁধে বসা, ন্যাস কুম্ভক তপজপ ধুনি ধুনচি সব ছেড়ে দিয়ে আগেকার মতো গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে দিন কাটাতে লাগলেন। কেউ নূতন কাপড় দিলে তিনি তাই পরেন, কেউ ভাল খাবার দিলে তিনি তাও খান। শিষ্যদের সেটা মনোমতো হল না।

তাদের বিশ্বাস যোগী হতে হলেই গরমের দিনে চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে, শীতের দিনে সারারাত জলে পড়ে—কখনও ঊর্ধ্ববাহু হয়ে দুই হাত আকাশে তুলে, কখনও হেঁটমুণ্ড হয়ে দুই পা গাছের ডালে বেঁধে থাকতে হয়। প্রথমে দিনের মধ্যে একটি কুল, তারপর সারাদিনে একটি বেলপাতা, ক্রমে এক‌ফোঁটা জল, তারপর তাও নয়—এমনি করে যোগসাধন না করলে কোনও ফল পাওয়া যায় না। কাজেই সিদ্ধার্থকে একলা রেখে একদিন রাত্রে তারা কাশীর ঋষিপত্তনের দিকে চলে গেল—সিদ্ধার্থের চেয়ে বড় ঋষির সন্ধানে।

শিষ্যরা যেখানে সিদ্ধার্থকে একা ফেলে চলে গেছে—উরাইল বনের সে দিকটা ভারি নির্জন। ঘনঘন শালবন সেখানটা দিনরাত্রি ছায়া করে রেখেছে। মানুষ সে দিকে বড় একটা আসে না; দু'একটা হরিণ আর দু'দশটা কাঠবিড়ালি শুকনো শালপাতা মাড়িয়ে খুসখাস চলে বেড়ায় মাত্র।

এই নিঃসাড়া নিরালা বনটির গা দিয়েই গাঁয়ে যাবার ছোট রাস্তাটি অঞ্জনার ধারে এসে পড়েছে। নদীর ধারেই একটি প্রকাণ্ড বটগাছ—সে যে কতকালের তার ঠিক নেই। তার মোটা মোটা শিকড়গুলো উঁচু পাহাড় বেয়ে অজগর সাপের মতো সটান জলের উপর ঝুলে পড়েছে। গাছের গোড়াটি কালো পাথর দিয়ে চমৎকার করে বাঁধানো। লোকে দেবতার স্থান বলে সেই গাছকে পূজা দেয়। ফুলফলের নৈবেদ্য সাজিয়ে নদীর ওপারে গ্রাম থেকে মেয়েরা যখন খুব ভোরে নদী পার হয়ে এ দিকে আসে, তখন কোনও কোনও দিন তারা যেন দেখতে পায় গেরুয়া কাপড় পরা কে একজন গাছতলায় বসেছিলেন, তাদের দেখেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন! কাঠুরেরা কোনও কোনওদিন কাঠ কেটে বন থেকে ফিরে আসতে দেখে, গাছতলা আলো করে সোনার কাপড় পরা দেবতার মতো এক পুরুষ! সবাই বলত, নিশ্চয় ওখানে দেবতা থাকেন! কিন্তু দেবতাকে স্পষ্ট করে কেউ কোনওদিন দেখেনি—পুন্না ছাড়া! মোড়লের মেয়ে সুজাতা বিয়ের পরে একদিন ওই বটগাছের তলায় পূজা দিতে গিয়ে পুন্নাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। সেই থেকে সে মোড়লের ঘরে আর একটি মেয়ের সমান মানুষ হয়েছে। এখন তার বয়স দশ বছর। সুজাতার ছেলে হয়নি, তাই তিনি পুন্নাকে মেয়ের মতো যত্ন করে মানুষ করেছেন। আর মানত করেছেন যদি ছেলে হয় তবে একবছর বটতলায় রোজ একটি ঘিয়ের পিদিম দিয়ে নতুন বছরের পূর্ণিমায় ভাল করে বটেশ্বরকে পুজো দেবেন।

সুজাতার ঠাকুর সুজাতাকে একটি সোনার চাঁদ ছেলে দিয়েছিলেন, তাই পুন্না রোজ সন্ধ্যাবেলা একটি ঘিয়ের পিদিম দিতে এই বটতলায় আসে। আজ একবছর সে আসছে, কোনও দেবতাকে কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পায়নি। কখনও সে আসবার আগেই ছায়ার মতো দেবতার মূর্তি মিলিয়ে যেত, কখনও বা সে গাছের তলায় পিদিমটি রেখে যখন একলা, পায়ে হেঁটে নদী পার হয়ে ফিরে চলেছে, তখন দেখত যেন দেবতা এসে সেই পাথরের বেদীর উপরে বসেছেন!

আজ শীতের ক'মাস ধরে পুন্না ছায়ার মতো যেন পাতলা কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেবতাকে দেখেছে। এ কথা সে সুজাতাকে বলেছিল—আর কাউকে না। সুজাতা সেই দিন থেকে পুন্নাকে দেবতার জন্যে আঁচলে বেঁধে দু'টি করে ফল নিয়ে যেতে বলে দিয়েছেন। আর বলে দিয়েছিলেন, যদি দেবতা কোনওদিন স্পষ্ট করে দেখা দেন, কি

কথা কন তবে যেন পুন্না বলে—দেবতা! আমার সুজাতা-মাকে আমার বাবাকে আমার ছোট ভাইটিকে আর আমার মোড়লদাদাকে ভাল রেখো। বড় হলে আমি যেন একটি সুন্দর বর পাই।

এমনি করে পুন্নার হাত দিয়ে সুজাতা দু'টি করে ফল সেই বটতলায় পাঠিয়ে দিতেন। তিনিও জানতেন না, পুন্নাও জানত না যে সিদ্ধার্থ রোজ সন্ধ্যাবেলা সেই বটতলায় ঠাণ্ডা পাথরের বেদীর উপরে এসে বসেন।

আজ বছরের শেষ; কাল নতুন বছরের পূর্ণিমা। পুন্না আজ সকাল করে পাঁচটি পিদিম, পাঁচটি ফল থালায় সাজিয়ে একটি নিজের নামে, একটি ভায়ের নামে, একটি মায়ের নামে, একটি বাপের নামে, একটি মোড়লদাদার নামে সেই বটগাছের তলায় সাজিয়ে রাখছে। বিকেলবেলার সোনার আলো বটগাছটির তলাটিতে এসে লেগেছে। রোদে পোড়া বালির চড়ায় জলের দাগ টেনে বয়ে চলেছে অঞ্জনা নদীটি। ও পারে দেখা যাচ্ছে অনেক দূর পর্যন্ত ধানের খেত, আর মাঝে মাঝে আম-কাঁঠালের বাগানঘেরা ছোট ছোট গ্রামগুলি। মাটির ঘর, খড়ের চাল, একটা পাহাড়—সে কত দূরে দেখা যাচ্ছে মেঘের মতো। নদীর ওপারেই মেঠো রাস্তা—সবুজ শাড়ির সাদা পাড়ের মতো সরু, সোজা। সেই রাস্তায় চাষার মেয়েরা চলেছে ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে। তাদের পরনে রাঙা শাড়ি, হাতে রুপোর চুড়ি, পিঠের ওপর ঝুলি বাঁধা কচি ছেলেটি ঘুমিয়ে আছে হাতদুটি মুঠো করে। একটুখানি ঠাণ্ডা বাতাস নদীর দিক থেকে মুখে এসে লাগল। একটা চিল অনেক উঁচু থেকে ঘুরতে ঘুরতে আস্তে আস্তে একটা গাছের ঝোপে নেমে গেল।

পুন্না দেখছে, বেলা পড়ে এসেছে। বালির উপর দিয়ে চলে আসছে অনেকগুলো কালো মোষ—একটার পিঠে মস্ত একগাছ লাঠি হাতে বসে রয়েছে গোয়ালাদের ছেলেটা। সে রোজ সন্ধ্যাবেলা মোষের পিঠে চড়িয়ে পুন্নাকে মোড়লদের বাড়ি পৌঁছে দেয়। আজও তাই আসছে। অনেক দূর থেকে সে ডাক দিচ্ছে 'আরে রে পুন্না রে!' ছেলেটার নাম সোয়াস্তি। পুন্না তার গলা পেয়েই তাড়াতাড়ি পিদিম পাঁচটা জ্বালিয়ে দিয়েই যে দিক দিয়ে সোয়াস্তি আসছিল সেইদিকে চলে গেল।

তখন একখানি সোনার থালার মতো পুবদিকে চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছে। পুন্না আর সোয়াস্তি মোষের পিঠে চড়ে বালির চড়া দিয়ে চলেছে। উঁচু পাড়ের পর বটতলাতে ঝিকঝিক করছে পুন্নার দেওয়া পিদিমের আলো। সেই আলোয় সোয়াস্তি, পুন্না দুজনেই আজ স্পষ্ট দেখলে গেরুয়া বসন পরা দেবতা এসে গাছের তলায় বসেছেন—পাথরের বেদিটিতে।

পুন্নাকে তাদের বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিয়ে সোয়াস্তি চলে গেল। সুজাতা তখন গরুবাছুর গোয়ালে বেঁধে ছেলেটিকে ঘুম পাড়িয়ে সকালের জন্যে পুজোর বাসন গুছিয়ে রাখছেন। পুন্না এসে বললে—'মা, আজ সত্যি দেবতাকে দেখেছি। কাল খুব ভোরে উঠে যদি তুমি সেখানে যেতে পার তো তুমিও দেখতে পাবে। সোয়াস্তি আমি দু'জনেই দেখেছি। কিন্তু ঠাকুরের কাছে কিছু চেয়ে নিতে ভুলে গেলুম মা।'

সুজাতা বললেন—'যদি মনে পড়ত তবে কী চাইতিস পুন্না? সোয়াস্তির সঙ্গে তোর বিয়ে হোক—এই বুঝি?'

পুন্না তখন পালিয়েছে। সুজাতা পুজোর সমস্ত গুছিয়ে রেখে যখন ঘরে গেলেন, পুন্না তখন ছোট ভাইটির পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুজাতার চোখে আজ ঘুম নেই। রাত থাকতে তিনি পুন্নাকে ডেকে তুলেছেন। পুন্না গোয়ালের দরজা খুলে এককোণে একটি পিদিম জ্বালিয়ে গরুগুলিকে দুইতে বসেছে। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় গরুগুলির শীত লেগেছে, তারা একটু ভয় খেয়েছে, চঞ্চল হয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখছে—এত রাত্রে কে দুধ নিতে এল? কিন্তু পুন্না যেমন তাদের পিঠে বাঁ হাতটি বুলিয়ে নাম ধরে ডাকছে অমনি তারা স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সুজাতা উঠোনের এককোণে একটি উনুন জ্বালিয়ে দিয়ে কুয়োর জলে স্নান করতে গেলেন। পুন্না দুধটুকু দুয়ে একটি ধোয়া কড়ায় সেই উনুনের উপরে চাপিয়ে দিলে—দুধ টগবগ করে ফুটতে লাগল। সুজাতা ধোয়া কাপড় পরে পুন্নাকে এসে বললেন—'তুই গোটা কতক ফুল তুলে আন, আমি দুধ জ্বাল দিচ্ছি।'

মোড়লদের বাড়ির ধারেই বাগান; সেখানে গাঁদা ফুল অনেক! পুন্না সেই ফুলে একটা মালা গেঁথে বটের পাতায় একটু তেল-সিঁদুর পুজোর থালায় সাজিয়ে রেখে সুজাতাকে ডাকছে—'মা, চল, আর দেরি করলে সকাল হয়ে যাবে; দেবতাকে দেখতে পাবে না।'

সুজাতা জ্বাল দেওয়া টাটকা দুধটুকু একটি নতুন ভাঁড়ে ঢেলে পুন্নার হাতে দিয়ে বললেন—'তুই এইটে নিয়ে চল, আমি পুজোর থালা আর মনুয়াকে সঙ্গে নিয়ে যাই।' সুজাতার ছেলের নাম মনুয়া।

ভোরের অন্ধকারে গাঁয়ের পথ একটু একটু দেখা যাচ্ছে। পুন্না চলেছে আগে দুধের ভাঁড় নিয়ে ঝুমুর ঝুমুর মল বাজিয়ে, সুজাতা চলেছেন পিছনে পিছনে ছেলে কোলে পুজোর থালাটি ডান হাতে নিয়ে। পুন্নার সঙ্গে একলা যেতে সুজাতার একটু একটু ভয় করছিল। সোয়াস্তিদের বাড়ির কাছে এসে সুজাতা বললেন—'ওরে সোয়াস্তিকে ডেকে নে না!' সোয়াস্তিকে আর ডাকতে হল না, সে পুন্নার পায়ের শব্দ পেয়েই একটা লাঠি আর একটা আলো নিয়ে বেরিয়ে এল।

তিনজনে মাঠ ভেঙে চলেছেন। তখনও আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে—রাত পোহাতে অনেক দেরি কিন্তু এর মধ্যে সকালের বাতাস পেয়ে গাঁয়ের উপর থেকে সারারাতের জমা ঘুঁটের ধোঁয়া সাদা একখানি চাঁদোয়ার মতো ক্রমে ক্রমে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। উলুবনের ভিতর দু'একটা তিতির, বকুলগাছে দু'একটা শালিক এরই মধ্যে একটু একটু ডাকতে লেগেছে। একটা ফটিং পাখি শিস দিতে দিতে মাঠের ওপারে চলে গেল। ছাতারেগুলো কিচমিচ ঝুপঝুপ করে কাঁঠালগাছের তলায় নেমে পড়ল! আলো নিবিয়ে সুজাতা আর পুন্নাকে নিয়ে সোয়াস্তি নদীর ধারে এসে দাঁড়াল। তখন দূরের গাছপালা একটু একটু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; নদীর পারে দাঁড়িয়ে সুজাতা দেখছেন—বটগাছের নিচে যিনি বসে রয়েছেন—তাঁর গেরুয়া কাপড়ের আভা বনের মাথার আধখানা আকাশ আলো করে দিয়েছে সকালের রঙে।

সুজাতা, পুন্না মনের মতো করে পুজো দিয়ে সিদ্ধার্থের আশীর্বাদ নিয়ে চলে গেছে। সোয়াস্তি তাঁকে কিছু দিতে পারেনি, তাই সে সারাদিন নদীর ধারে একলা বসে অনেক যত্নে কুশিঘাসের একটি আসন বুনে নদীর জলে সেখানি ঠাণ্ডা করে সিদ্ধার্থকে দেবার জন্য এসেছে। সিদ্ধার্থ তখনও বটতলাতে আসেননি। সোয়াস্তি কুশাসনখানি বেদির উপরে বিছিয়ে দিয়ে মনে মনে সিদ্ধার্থকে প্রণাম করে নদীপারে চলে গেল।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়; সিদ্ধার্থ অঞ্জনায় স্নান করে সোয়াস্তির দেওয়া কুশাসনে এসে বসলেন। জলে ধোয়া কুশঘাসের মিষ্টি গন্ধে তাঁর মন যেন আজ আরাম পেয়েছে। পূর্ণিমার আলোয় আলোয় পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত আজ যেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন—স্পষ্ট, পরিষ্কার।

পাথরের বেদীতে কুশাসনে বসে সিদ্ধার্থ আজ প্রতিজ্ঞা করলেন, এ শরীর থাক আর যাক, দুঃখের শেষ দেখবই দেখব—সিদ্ধ না হয়ে, বুদ্ধ না হয়ে এ আসন ছেড়ে উঠছি না। বজ্রাসনে অটল হয়ে সিদ্ধার্থ আজ যখন ধ্যানে বসে বললেন—

'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।'

তখন 'মার'—যার ভয়ে সংসার কম্পমান, যে লোককে কুবুদ্ধি দেয়, কুকথা বলায়, কুকর্ম করায়—সেই 'মার'-এর সিংহাসন টলমল করে উঠল। রাগে মুখ অন্ধকার করে 'মার' আজ নিজে আসছে মার মার শব্দে বুদ্ধের দিকে।

চারিদিকে আজ 'মার'-এর দলবল জেগে উঠেছে! তারা ছুটে আসছে, যত পাপ, যত দুঃখ, যত কালি, যত কলঙ্ক, যত জ্বালা-যন্ত্রণা, মলা আর ধূলা—জল-স্থল-আকাশের দিকে-বিদিকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে! পূর্ণিমার আলোর উপরে কালোর পর্দা টেনে দিয়েছে—'মার'! সেই কালোর ভিতর থেকে পূর্ণিমার চাঁদ চেয়ে রয়েছে—যেন একটা লাল চোখ! তা থেকে ঝরে পড়ছে পৃথিবীর উপর আলোর বদলে রক্তবৃষ্টি! সেই রক্তের ছিটে লেগে তারাগুলো নিবে নিবে যাচ্ছে।

আকাশকে একহাতে মুঠিয়ে ধরে, পাতালকে এক পায়ে চেপে রেখে, 'মার' আজ নিজমূর্তিতে সিদ্ধার্থের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার গায়ে উড়ছে রাঙা চাদর—যেন মানুষের রক্তে ছোপানো! তার কোমরে ঝুলছে বিদ্যুতের তলোয়ার, মাথার মুকুটে দুলছে 'মার'-এর প্রকাণ্ড একটা রক্তমণির দুল, তার কানে দুলছে মোহন কুণ্ডল, তার বুকের উপরে জ্বলছে অনলমালা—আগুনের সুতোয় গাঁথা।

বুক ফুলিয়ে 'মার' সিদ্ধার্থকে বলছে—'বৃথাই তোমার বুদ্ধ হতে তপস্যা! উত্তিষ্ঠ—ওঠো! কামেশ্বরোহস্মি—আমি 'মার'। ত্রিভুবনে আমাকে জয় করে এমন কেউ নেই! উত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ মহ্যবিষয়স্থং বচং কুরুষ্ব—ওঠো চলে

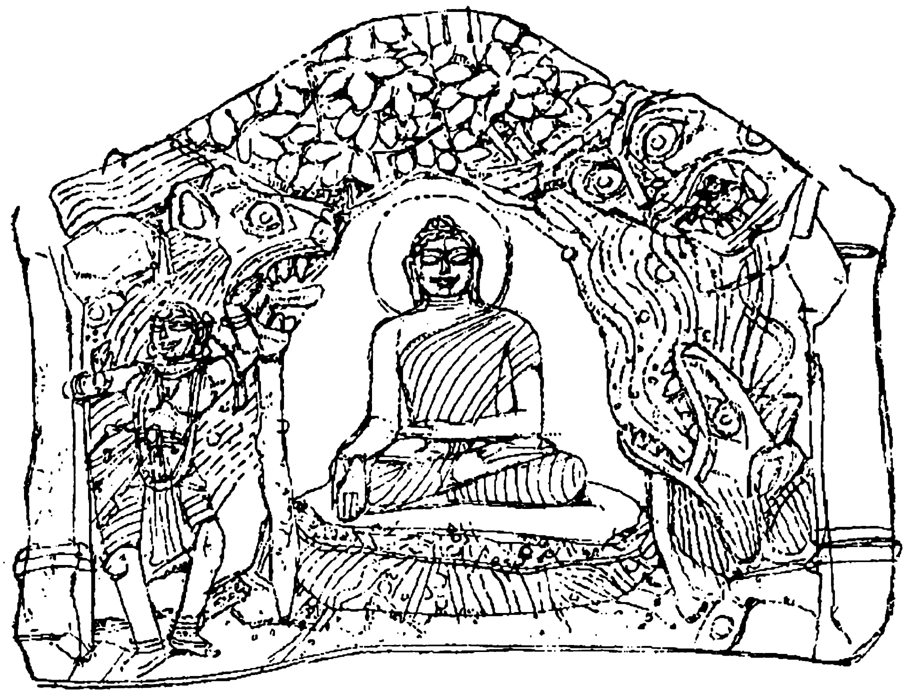
যাও, আমাকে জয় করতে চেষ্টা করো না। আমার আজ্ঞাবাহী হয়ে থাক, ইন্দ্রের ঐশ্বর্য তোমায় দিচ্ছি, পৃথিবীর রাজা হয়ে সুখভোগ কর; তপস্যায় শরীর ক্ষয় করে কী লাভ? আমাকে জয় করে বুদ্ধ হওয়া কারও সাধ্যে নেই।'

সিদ্ধার্থ 'মার'কে বললেন—'হে 'মার'! আমি জন্ম জন্ম ধরে বুদ্ধ হতে চেষ্টা করছি—তপস্যা করছি, এবার বুদ্ধ হব তবে এ আসন ছেড়ে উঠব, এ শরীর থাক বা যাক এই প্রতিজ্ঞা—

'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।'

তিনবার 'মার' বললে—'উত্তিষ্ঠ—ওঠো, চলে যাও, তপস্যা রাখ!' তিনবারই সিদ্ধার্থ বললেন, 'না! না! না! নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।'

রাগে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করে বিকট হুঙ্কার দিয়ে তখন আকাশ ধরে টান দিলে 'মার'! তার নখের আঁচড়ে অমন যে চাঁদ-তারায় সাজানো নীল আকাশ সেও ছিঁড়ে পড়ল শত টুকরো হয়ে একখানি নীলাম্বরী শাড়ির মতো। মাথার উপরে আর চাঁদ নেই, তারা নেই; রয়েছে কেবল মহাশূন্য, মহা অন্ধকার! মুখ মেলে কে যেন পৃথিবীকে গিলতে আসছে। বোধহয় তার কালো জিব বেয়ে পৃথিবীর উপর পড়ছে জমাট রক্তের মতো কালো নাল! 'মার' সেই অন্ধকার মুখটার দিকে ফিরে দেখেছে কি আর বিদ্যুতের মতো দু'পাটি সাদা দাঁত শূন্যে ঝিলিক দিয়ে কড়মড় করে উঠেছে, আর হুঙ্কার দিয়ে বেরিয়ে এসেছে সেই সর্বগ্রাসী মুখের ভিতর থেকে 'মার'-এর দল; চন্দ্র সূর্য ঘুরছে



তাদের হাতে দু'টো যেন আগুনের চরকা! দশদিক অন্ধকার করে ঘুরতে ঘুরতে আসছে—'মার'-এর দল ঘূর্ণি বাতাসে ভর দিয়ে, পৃথিবী জুড়ে ধূলার ধ্বজা উড়িয়ে। তারা শূন্য থেকে ধূমকেতুগুলোকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেলছে আগুনের ঝাঁটার মতো। পৃথিবী থেকে গাছগুলোকে উপড়ে, পাহাড়গুলোকে মুচড়ে নিয়ে বনবন শব্দে ঘুরিয়ে ফেলছে তারা চারিদিক থেকে অনবরত শিলাবৃষ্টির মতো; লক্ষ লক্ষ ক্ষ্যাপা ঘোড়া যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে 'মার'-সৈন্য বুদ্ধদেবের চারিদিকে। তাদের খুর থেকে বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ছে, তাদের মুখ থেকে রক্তের জ্বলন্ত ফেনা

আঁজলা আঁজলা ছড়িয়ে পড়ছে—সেই বোধিবটের চারিদিকে, সেই পাথরের বেদির আশেপাশে। উরাইল বনের প্রত্যেক গাছটি পাতাটি ফুলটি এমন কি ঘাসগুলিও আজ জ্বলে উঠেছে, জ্বলন্ত রক্তে অঞ্জনার জল ঘুরে ঘুরে চলেছে আগুন মাখা। বিদ্যুতের শিখায় তলোয়ার শাণিয়ে মশাল জ্বালিয়ে দলের পর দল যত রক্তবীজ, তারা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে পড়ছে বুদ্ধদেবের উপরে। তাদের আগুন নিশ্বাসে আকাশ গলে যাচ্ছে, বাতাস জ্বলে যাচ্ছে, পৃথিবী দেখা যাচ্ছে যেন একখানা জ্বলন্ত কয়লা, ঘূর্ণিবাতাসে ঘুরে ঘুরে চলেছে আগুনের ফুলকি ছড়াতে ছড়াতে; তার মাঝে জ্বলন্ত একটা তালগাছ ঘুরিয়ে 'মার' ডাকছে—'হান! হান।'

পায়ের নখে রসাতল চিরে জেগে উঠেছে মহামারী। আজ 'মার'-এর ডাকে রসাতলের কাজল অন্ধকার কাঁথার মতো সর্বাঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে আর্তনাদ করে ছুটে আসছে—সে 'মারী'। তার ধুলোমাখা কটা চুল বাতাসে উড়ছে—আকাশ জোড়া ধূমকেতুর মতো! দিকে দিকে শোকের কান্না উঠেছে, ত্রিভুবন থরথর কাঁপছে। মহামারীর গায়ের বাতাস যে দিকে লাগল সে দিকে পাহাড় চূর্ণ হয়ে গেল, পাথর ধুলো হয়ে গেল, বন উপবন জ্বলে গেল, নদী-সমুদ্র শুকিয়ে উঠল। আর কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না! সব মরুভূমি হয়ে গেছে, সব শুয়ে পড়েছে, নুয়ে পড়েছে, জ্বলে গেছে, পুড়ে গেছে, ধুলো হয়ে ছাই হয়ে উড়ে গেছে! জগৎ জুড়ে উঠেছে 'মারী'র আর্তনাদ, 'মার'-এর সিংহনাদ, আর শ্মশানের মাংস-পোড়া বিকট গন্ধ!

তখন রাত এক প্রহর। 'মার'-এর দল, 'মারী'-র দল উল্কামুখী শিয়ালের মতো, রক্তআঁখি বাদুড়ের মতো মুখ থেকে আগুনের হলকা ছড়িয়ে চারিদিকে হাহা হুহু করে ডেকে বেড়াচ্ছে, কেঁদে বেড়াচ্ছে! আকাশ ঘুরছে মাথার উপর, পৃথিবী ঘুরছে পায়ের তলায় ঘর্ঘর শব্দে যেন দু'খানা প্রকাণ্ড জাঁতার পাথর বুদ্ধদেবকে পিষে ফেলতে চেষ্টা করছে! 'মার' দু'হাতে দু'টো বিদ্যুতের মশাল নিয়ে বুদ্ধদেবকে ডেকে বলছে—'পালাও, পালাও, এখনও বলছি তপস্যা রাখ!' বুদ্ধদেব 'মার'-এর দিকে চেয়েও দেখছেন না, তার কথায় কর্ণপাতও করছেন না! 'মার'-এর মেয়ে 'কামনা' তার ছোট দুই বোন 'ছলাকলা'কে নিয়ে বুদ্ধদেবের যোগভঙ্গ করতে কত চেষ্টা করছে—কখনও গৌতমী মায়ের রূপ ধরে, কখনও যশোধরার মতো হয়ে বুদ্ধদেবের কাছে হাতজোড় করে কেঁদে কেঁদে লুটিয়ে পড়ে! তাঁর মন গলাবার ধ্যান ভাঙাবার চেষ্টায় কখনও তারা স্বর্গের বিদ্যাধরী সেজে গান গায়, নাচে, কিন্তু কিছুতেই বুদ্ধদেবকে ভোলাতে আর পারে না। বজ্রাসনে আজ তিনি অটল হয়ে বসেছেন, তাঁর ধ্যান ভাঙে কার সাধ্য! যে 'মার'-এর তেজে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল কম্পমান, যার পায়ের তলায় ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ, জল-স্থল-আকাশ—সেই 'মার'-এর দর্পচূর্ণ হয়ে গেল আজ বুদ্ধের শক্তিতে! 'মার' আজ বুদ্ধের একগাছি মাথার চুলও কাঁপাতে পারলে না, সেই অক্ষয়বটের একটি পাতা, সেই পাথরের বেদীর একটি কোণও খসাতে পারলে না! বুদ্ধের আগে 'মার' একদণ্ডও কি দাঁড়াতে পারে! বুদ্ধের দিকে ফিরে দেখবারও আর তার সাহস নেই! দুই হাতের মশাল নিবিয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে 'মার' আস্তে আস্তে পালিয়ে গেছে—নরকের নিচে, ঘোর অন্ধকারে, চারিদিক কালো করে দিয়ে! বুদ্ধদেব সেই কাজল অন্ধকারের মাঝে নির্ভয়ে একা বসে রয়েছেন ধ্যান ধরে প্রহরের পর প্রহর।

রাত শেষ হয়ে আসছে। কিন্তু 'মার'-এর ভয়ে তখনও পৃথিবী এক একবার কেঁপে উঠছে—চাঁদও উঠতে পারছে না, সকালও আসতে পারছে না। সেই সময় ধ্যান ভেঙে 'মার'কে জয় করে সংসার থেকে ভয় ঘুচিয়ে বুদ্ধদেব দাঁড়ালেন। তিনি আজ সিদ্ধ হয়েছেন, বুদ্ধ হয়েছেন, দুঃখের শেষ পেয়েছেন। ডান হাতে তিনি পৃথিবীকে অভয় দিচ্ছেন, বাঁ হাতে তিনি আকাশের দেবতাদের আশ্বাস দিচ্ছেন। তাঁর সোনার অঙ্গ ঘিরে সাতরঙের আলো। সেই আলোতে জগৎ সংসার আনন্দে জয় জয় দিয়ে জেগে উঠেছে, নতুন প্রাণ পেয়ে, নতুন সাজে সেজে। তাঁর পায়ের তলায় গড়িয়ে চলেছে নৈরঞ্জন নদীটি দুইকূলে শান্তিজল ছিটিয়ে।

যেখানে কাশী, সেখানে গঙ্গা একখানি ধারাল খাঁড়ার মতো বেঁকে চলেছে। আর ঋষিপত্তনের নিচেই বরুণা নদীর পাড় পাহাড়ের মতো শক্ত। তার গায়ে বড় বড় সব গুহা গর্তে যত জটাধারী বক-বেড়ালি-ব্রহ্মচারী ধুনি জ্বালিয়ে ছাইভস্ম মেখে বসে রয়েছে। পাহাড়ের উপরে সারনাথের মন্দির। মন্দিরের পরই গাছে গাছে ছায়া করা তপোবন। সেইখানে সত্যি যাঁরা ঋষি তপস্বী তাঁরা রয়েছেন। হরিণ তাঁদের দেখে ভয় পায় না, পাখি তাঁদের দেখে উড়ে পালায় না। তাঁরা কাউকে কষ্ট দেন না। কারু ঘুম ভাঙবার আগেই তাঁরা একটিবার বন থেকে বেরিয়ে নদীতে স্নান করে যান, দিনরাতের মধ্যে তপোবন ছেড়ে তাঁরা আর বার হন না। দেবল ঋষি নালককে নিয়ে এই তপোবনের একটি বটগাছের তলায় আজ ক'মাস ধরে রয়েছেন।

তখন আষাঢ় মাস। বেলা শেষ হয়েও যেন হয় না, রোদ পড়েও যেন পড়তে চায় না! সারনাথের মন্দিরে সন্ধ্যার শাঁখ-ঘণ্টা বাজছে, কিন্তু তখনও আষাঢ়স্ত বেলার সোনার রোদ গাছের মাথায় চিকচিক করছে, হরিণগুলো তখনও আস্তে আস্তে চরে বেড়াচ্ছে, ছোট ছোট সবুজ পাখিগুলি এখনও যেখানটিতে একটুখানি রোদ সেইখানটিতে কিচমিচ করে খেলে বেড়াচ্ছে। একলাটি বসে নালক বর্ষাকালের ভরা নদীর দিকে চুপ করে চেয়ে রয়েছে। একটা সাদা বক তার চোখের সামনে দিয়ে কেবলই নদীর এপার-ওপার আনাগোনা করছে—সে যেন ঠিক করতে পারছে না কোন পারে বাসা বাঁধবে।

বর্ষাকালের একটানা নদী আজ সারাদিন ধরে নালকের মনটিকে টানছে—সেই বর্ধনের বনের ধারে, তাদের সেই গাঁয়ের দিকে! সেই তেঁতুলগাছে ছায়া করা মাটির ঘরে তার মায়ের কাছে নালকের মন একবার ছুটে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। মন তার যেতে চাচ্ছে মায়ের কাছে, কিন্তু ঋষিকে একলা রেখে আবার যেতেও মন সরছে না। সে ওই বকটার মতো কেবলি যাচ্ছে আর আসছে, আসছে আর যাচ্ছে!

দেবল ঋষি নালককে ছুটি দিয়েছেন তার মায়ের কাছে যেতে। এ দিকে আবার ঋষির মুখে নালক শুনেছে বুদ্ধদেব আসছেন এই ঋষিপত্তনের দিকে! আজ সে কত বছর নালক ঘর ছেড়ে এসেছে; মাকে সে কতদিন দেখেনি! অথচ বুদ্ধদেবকে দেখবার সাধটুকু সে ছাড়তে পারছে না। সে একলাটি নদীর ধারে বসে ভাবছে—যায়



কি না-যায়। সকাল থেকে একটি পর একটি কত নৌকো কত লোককে যার-যার দেশে নামিয়ে দিতে দিতে চলে গেল। কত মাঝি নালককে 'যাবে গো! যাবে গো!' বলে ডেকে গেল! সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আর একখানি মাত্র ছোট নৌকো নালকের দিকে পাল তুলে আসছে—অনেকদূর থেকে। তার আলোটি দেখা যাচ্ছে—নদীর জলে একটি ছোট পিদিম ঝিকঝিক করে ভেসে চলেছে। এইখানি চলে গেলে এ দিকে আর নৌকো আসবে না। নালক মনে মনে দেবল ঋষিকে প্রণাম করে বলছে—'ঠাকুর, যেন বুদ্ধদেবের দর্শন পাই।'

দেখতে দেখতে নৌকো এসে তপোবনের ঘাটে লাগল। সেই ছোট নৌকোয় নালক তার মাকে দেখতে দেশের দিকে চলে গেল। আজ কত বছর সে তার মাকে দেখেনি। ঠিক সে সময় বরুণার খেয়াঘাট পার হয়ে বুদ্ধদেব সারনাথের তপোবনে এসে নামলেন। আর একটি দিন যদি নালক সেখানে থেকে যেত!

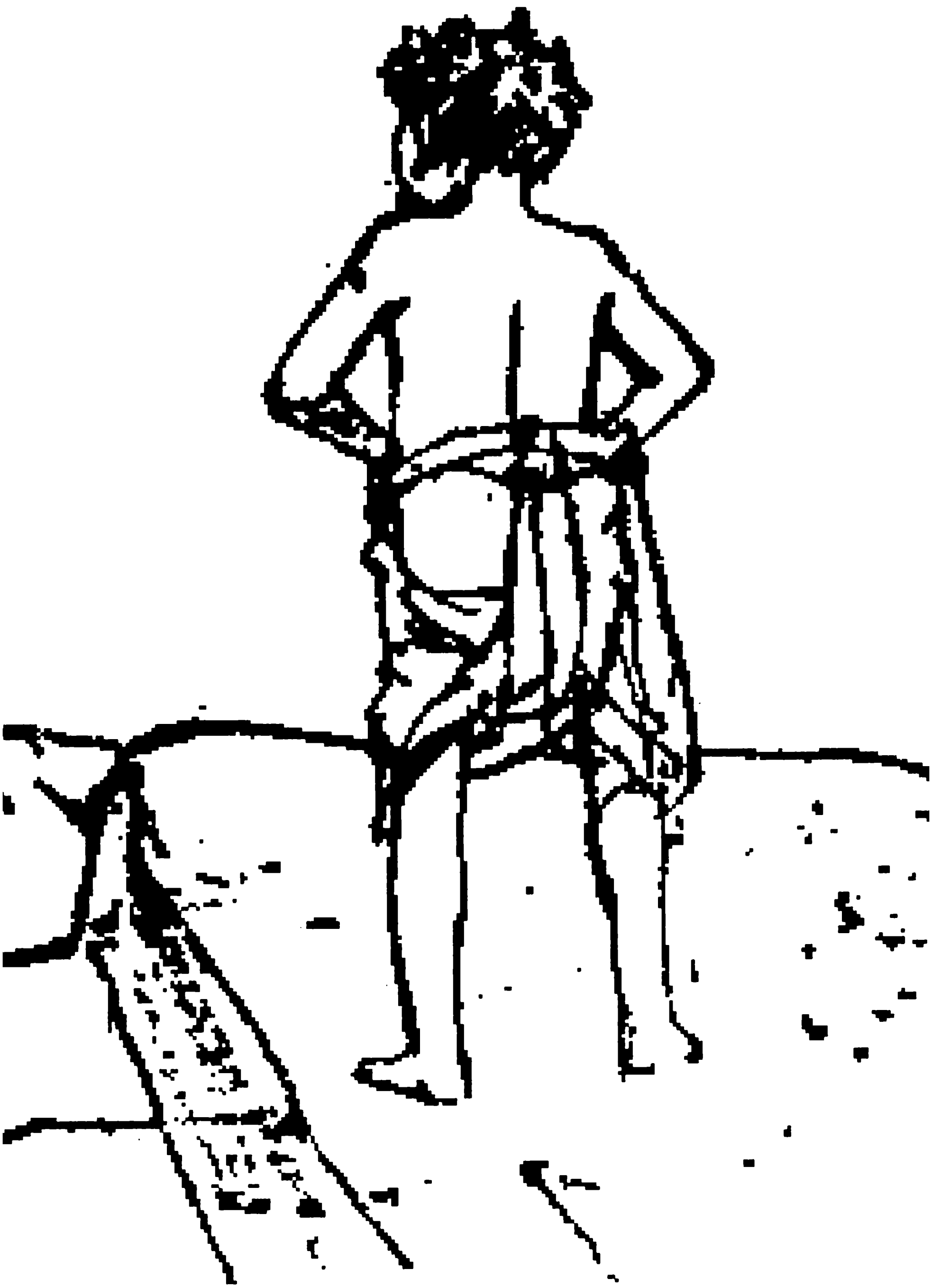
কত দেশ-বিদেশ ঘুরে, কত নদীর চরে খালের ধারে নিত্য সন্ধ্যাবেলায় ভিড়তে ভিড়তে নালকদের নৌকোখানি চলেছে—যে গাঁয়ের যে লোক তাকে সেই গাঁয়ে রেখে। পুরানো যাত্রী যেমন নিজের গাঁয়ে নেমে যাচ্ছে অমনি তার জায়গায় ঘাট থেকে নূতন যাত্রী এসে নৌকোয় উঠছে। এমনি করে নালকদের নৌকো কখনও চলেছে সকালের বাতাসে পাল তুলে দিয়ে তীরের মতো জল কেটে, কখনও বা চলেছে রাতের অন্ধকারের ভিতর দিয়ে কালো জলে পিদিমের একটু আলোর দাগ টেনে—এমন আস্তে যে মনেই হয় না যাচ্ছি। দিনে দিনে বর্ষাকালে নদী জলে ভরে উঠছে। আগে কেবল নদীর উঁচু পাড়ই দেখা যাচ্ছিল, এখন উপরের খেতগুলো, তার ওধারে গাঁয়ের গাছগুলো ঘরগুলো, এমন কি অনেক দূরের মন্দিরটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। জল উঁচু হয়ে উঠে বালির চর সব ডুবিয়ে দিয়েছে।

নৌকো যখন নালককে দেশের ঘাটে নামিয়ে দিয়েছে তখন ভরা শ্রাবণ মাস; ঝুপঝুপ বৃষ্টি পড়ছে, নদীর ধারে ধারে বাঁশ ঝাড়ের গোড়া পর্যন্ত জল উঠেছে। থই থই করছে জল! খালবিল খানাখন্দ ভরে গেছে, ঘাটের ধাপ সব ডুবে গেছে—স্রোতের জলে বর্ষাকালের নূতন জলে। নালক ঘাটে দাঁড়িয়ে দেখছে কতদূর থেকে কার হাতের একটি ফুল ভাসতে ভাসতে এসে ঘাটের এককোণে লেগেছে; নদীর ঢেউ সেটিকে একবার ডাঙার দিকে, একবার জলের দিকে ফেলে দিচ্ছে আর টেনে নিচ্ছে। নালক জল থেকে ফুলটিকে তুলে নিয়ে, মনে মনে বুদ্ধদেবকে পুজো করে মাঝ নদীতে আবার ভাসিয়ে দিলে। তারপর আস্তে আস্তে সে ঘরের দিকে চলে গেল—বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে। এই ফুলটির মতো নালক—সে মনে পড়ে না কতদিন আগে—ঋষির সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে, মাকে ফেলে সংসারের বাইরে ভেসে গিয়েছিল। আজ এতকাল পরে সে আবার ওই ফুলটির মতোই ভাসতে ভাসতে তার দেশের ঘাটে, মায়ের কোলের কাছে ফিরে এসে আটকা পড়ল। আবার সে দিন কবে আসবে, যে দিন বুদ্ধদেব এই দেশে এসে ঘাটের ধারে আটকা পড়া ফুলটির মতো তাকে তুলে নিয়ে আনন্দের মাঝ-গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে যাবেন!

নালক তাদের ঘরখানি দেখতে পাচ্ছে, আর দেখতে পাচ্ছে ঘরের দাওয়ায় তার মা বসে রয়েছেন, আর উঠোনের মাঝে একটি ভিখারি দাঁড়িয়ে গাইছে—

'এরে ভিখারি সাজায়ে তুমি কি রঙ্গ করিলে!'

বুড়ো আংলা



আমতলি

রিদয় বলে ছেলেটা নামেই হৃদয়, দয়ামায়া একটুও ছিল না। পাখির বাসায় ইঁদুর, গরুর গোয়ালে বোলতা, ইঁদুরের গর্তে জল, বোলতার বাসায় ছুঁচোবাজি, কাকের ছানা ধরে তার নাকে তার দিয়ে নথ পরিয়ে দেওয়া, কুকুর ছানা বেড়াল ছানার ল্যাজে কাঁকড়া ধরিয়ে দেওয়া, ঘুমন্ত গুরুমহাশয়ের টিকিতে বিচুটি লাগিয়ে আসা, বাবার চাদরে চোরকাঁটা বিঁধিয়ে রাখা, মায়ের ভাঁড়ার ঘরে আমসির হাঁড়িতে আরশোলা ভরে দেওয়া—এমনি নানা উৎপাতে সে মানুষ, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, সবাইকে এমন জ্বালাতন করেছিল যে কেউ তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না।

রিদয়ের মা-বাপ ছিল আমতলি গাঁয়ের প্রজা। দু'জনেই বুড়ো হয়েছে। রিদয় তাঁদের এক ছেলে, বয়স হল প্রায় বার বছর; অথচ ছেলেটা না শিখলে লেখাপড়া, না শিখলে চাষবাসের কাজ; কেবল নষ্টামি করেই বেড়াতে লাগল। শেষে এমন হল যে তার বাপ-মা বাইরে হাটে-মাঠে যাবার সময় রিদয়কে ঘরে তালা বন্ধ কয়েদ করে রেখে যেত।

তখন শীত গিয়ে গরম পড়তে আরম্ভ হয়েছে। গাছে গাছে আমের বোল আর কাঁচা আমের গুটি ধরেছে, পানাপুকুরের চারধার আমরুলী শাকের সবুজ পাতায় ছেয়ে গিয়েছে; আলের ধারে ধারে নতুন দুর্বো, আকন্দ ফুল সবে দেখা দিয়েছে; দূরে শাল-পিয়ালের তেঁতুল-তমালের বনে নতুন পাতা লেগেছে, আর দেখতে দেখতে সমস্ত বন যেন পুরন্ত বাড়ন্ত হয়ে উঠছে; রোদ পাতায় পাতায় কাঁচা সোনার রঙ ধরিয়ে দিয়েছে; কুয়াশা আর মেঘ সরে গিয়ে মনে হচ্ছে যেন নীল আকাশের কপাট হঠাৎ খুলে গেছে আর আলো আর বাতাস ছুটে বেরিয়ে এসেছে—বাইরে। রিদয়ের কুলুপ দেওয়া ঘরেও আজ দরমার ঝাঁপগুলোর ফাঁক দিয়ে রোদ উঁকি দিচ্ছে, বাতাস সরু সুরে বাঁশি দিয়ে ঢুকছে। রিদয় কিন্তু এসব দেখছে না, শুনছেও না। সে চুপটি করে বসে নষ্টামির ফন্দি আঁটছে। কিন্তু গর্ত ফেলে ইঁদুর যে আজ নতুন বসন্তে শুকনো পাতায় ছাওয়া বাদাম তলায় রোদ পোহাতে বেরিয়ে গেছে, বেড়াল ছানাটা কাঁঠালতলায় কাঠবেড়ালির সঙ্গে ভাব করতে দৌড়েছে, গোয়াল ঘরের কপ্‌লে গাই তার নেয়াল বাছুরটাকে নিয়ে ল্যাজ তুলে ঢেঁকির মতো লাফাতে লাফাতে মাঠের দিকে দৌড় দিলে, ঘুলঘুলি দিয়ে সেটা হৃদয় স্পষ্ট দেখলে।

ঘুলঘুলিটার বাইরে একটা ডালিম গাছ। ডালিমের উপরে ময়ূরের মতো রঙ একটা ছোট কি পাখি এসে শিস দিতে লাগল—রিদয়ের নাগালের ঠিক বাইরেটিতে বসে—'ও হিরিদয়! ও হিরিদয়!' রিদয় ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে কাঁধ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েও মাঝের আঙুলের ডগাটি দিয়ে ডালিমটিকে ছোঁয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারলে না। পাখি ডালিমের আর এক ডালে সরে বসে এমন খিটখিট খিটখিট করে হেসে উঠল যে রিদয় একেবারে লজ্জায় মাটি!

সে পাখিটাকে ছুড়ে মারবার জন্যে একটা কিছু খুঁজতে চারদিকে চাইছে, এমন সময় ঘরের কোণে মস্ত দুটো মরচে পড়া তালা আঁটা সুঁদরি কাঠের উপরে পিতলের পাত আর পেরেকের নকশা কাটা বহুকালের সিন্দুকটার দিকে তার নজর পড়ল। যে কুলুঙ্গিতে ইঁদুরে-চড়া লাল মাটির গণেশ ছোট ঢোলক বাজাচ্ছেন, ঠিক তারই নিচে, ঘরের একদিকের দেয়াল জুড়ে সিন্দুকটা রয়েছে। এত বড় যে মনে হচ্ছে যেন একটা রত্নবেদী!

এই সিন্দুকে কি যে আছে, তা রিদয় এ পর্যন্ত দেখেনি; কিন্তু সে জানে তার ঠাকুরদাদা, তার দাদা, তার দাদা, তার আবার দাদার দাদা—এমনি কত পুরুষের বাসন, গয়না আর যা কিছু ভাল দামি আশ্চর্য সামগ্রী ওই সিন্দুকটায় জমা আছে। লক্ষ্মীপুজোর দিন রিদয়ের মা এই সিন্দুককে সিঁদুরের ফোঁটা, ধানের শীষ দিয়ে সাজিয়ে পুজো করে, টিপটিপ প্রণাম করে কতবার রিদয়কে বলেছেন—'দেখিস, সিন্দুকে পা ঠেকাসনে, ওতে লক্ষ্মী আছেন!'

সিন্দুকটা রিদয়ের বাপ-মা এক একদিন ভাদ্দর মাসে ঠেলাঠেলি করে খুলে, তার থেকে ভারি ভারি রুপোর গয়না, বেনারসী শাড়ি, কাঁসার বাসন বার করে, ঝেড়ে পুঁছে, যেখানকার যা গুছিয়ে রাখতেন; কিন্তু সিন্দুকের মধ্যেটায় যে কি, রিদয় এ পর্যন্ত একদিনও দেখতে পেলে না। সে দু'পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে খুব চেষ্টা করে মরচে ধরা তালা দু'টোর ফুটোয় চোখ দিতে পারত; তার উপর তার মাথা উঠত না। তালার ফুটোর মধ্যে অন্ধকারে একটা কি চকচক করছে দেখা যায়, কিন্তু সেটাকে আঙুল দিয়ে টেনে বার করবার অনেক চেষ্টা করেও

রিদয় পেরে ওঠেনি। তালা দু'টোকে যদি ভেঙে ফেলা যেত, তবে তালার মধ্যের জিনিস, সেই সঙ্গে সিন্দুকের মধ্যেটাও সে দেখে নিতে পারত। তালাটা কি করে ভাঙা যায় ভাবতে ভাবতে রিদয়ের হাই উঠতে লাগল, আর চোখও ঢুলে এল।

সেই সময় কুলুঙ্গি থেকে গণেশের ইঁদুরটা জ্যান্ত হয়ে ঝুপ করে সিন্দুকের ডালায় লাফিয়ে পড়ে ল্যাজ উঠিয়ে ছুটোছুটি আরম্ভ করলে। রিদয় পষ্ট দেখতে পেলে গণেশ মোটা পেটটি নিয়ে শুঁড় দোলাতে দোলাতে সিংহাসন থেকে নেমে কুলুঙ্গির ধারে পা ঝুলিয়ে বসে ঢোল বাজাতে লাগলেন আর ইঁদুরটা তালে তালে ল্যাজ নেড়ে গলার ঘুঙুরের ঝুমঝুম শব্দ করে নাচতে থাকল।

রিদয় ইঁদুর অনেক দেখেছে, গণেশের গল্পও অনেক শুনেছে, কিন্তু জ্যান্ত গণেশ সে কখনও দেখেনি! এই বুড়ো আঙুল যতটুকু, গণেশটি ঠিক ততটুকু! পেটটি বিলিতি বেগুনের মতো রাঙা চিকচিকে, মাথাটি সাদা, শুঁড়টি ছোট একটা কেঁচোর মতো পেটের উপর গুটিয়ে রয়েছে; কান দুটি যেন ছোট দু'খানি কুলো, তাতে সোনার মাকড়ি দুলছে; গলায় একগাছি রুপোর তারের পৈতে ঝোলানো; পরনে লাল-পেড়ে পাঁচ আঙুল একটি হলদে ধুতি, গলায় তার চেয়ে ছোট একখানি কোঁচানো চাদর; মোটাসোটা এতটুকু দু'টি পায়ে আংটির মতো ছোট ছোট ঘুঙুর, গোল গোল চারটি হাতে বালা, বাজু, তাড়; গলা থেকে লাল সুতোয় বাঁধা ছিটমোড়া ছোট্ট ঢোলকটি ঝুলছে। কথকঠাকুর সম্‌সকৃতে গণেশ বন্দনা করতেন :

> গণেশায় নমঃ নমঃ আদিব্রহ্ম নিরুপম পরম পুরুষ পরাৎপর।
> খর্ব স্থুলকলেবর গজমুখ লম্বোদর মহাযোগী পরমসুন্দর।।
> হেলে শুণ্ড বাড়াইয়া সংসার সমুদ্র পিয়া খেলাছলে করহ প্রলয়।
> ফুৎকারে করিয়া বৃষ্টি পুনঃ কর বিশ্বসৃষ্টি ভাল খেলা খেল দয়াময়।।

এই বন্দনা শুনে সে গণেশকে মনে করেছিল না জানি কতই বড়! একেবারে পদভরে মেদিনী কম্পমানা! মেঘ গর্জনের মতো ঢোল বাজিয়ে—তালগাছের গুঁড়ির মতো মোটা শুঁড় দোলাতে দোলাতে, কানের বাতাসে ঝড় বইয়ে গণেশ নেচে বেড়াচ্ছেন! আসলে গণেশ যে গণেশদাদা পেটটি নাদা, গলায় একটি ঢোলক বাঁধা—পিটুলির পুতুলটির মতো একেবারে ছোট, ঢোলকটি মাদুলির চেয়ে বড় নয়, আর তিনি নিজে তাঁর ইঁদুরটির চেয়ে একটু ছোট, এই রিদয় এই প্রথম দেখলে।

রিদয়ের এক খাঁচা বিলিতি ইঁদুর ছিল। না খেতে পেয়ে সেগুলো মরেছে! এখন গণেশের সঙ্গে ইঁদুরটিকে ধরবার ফন্দি সে মনে মনে আঁটতে লাগল। ঘরের মধ্যে নানা জিনিস ছিল, কোনটা গণেশ ধরার কাজে লাগে, তাই রিদয় দেখতে লাগল। তার এমন সাহস ছিল না যে গণেশকে গিয়ে চেপে ধরে—যদি দাঁত ফুটিয়ে দেয়! বাটনা বাটা নোড়াটা হাতের কাছে পড়েছিল কিন্তু সেটা ছুড়ে মারলে গণেশ এত ছোট যে চেপ্টে যাবার ভয় আছে; পিতলের বোকনোটা চাপা দেওয়া যায়, কিন্তু গণেশকে তা থেকে বার করে খাঁচায় পোরা মুশকিল—আটাকাঠিটা পেলে ঠিক হত কিন্তু রিদয়ের বাবা সেটা চালের মটকায় তুলে রেখেছেন; লক্ষ্মীর ঝাঁপিটা কাজে লাগতে পারে কিন্তু গণেশ তো তার মধ্যে ইচ্ছে করে না সেঁধোলে জোর করে ঢোকানো যায় না! চারদিক দেখতে দেখতে কোণে ঠেসানো চিংড়ি মাছ ধরা কুঁড়োজালিটার দিকে রিদয়ের চোখ পড়ল।

তখন গণেশ সিন্দুকের উপরে নেমে, উপরের দু'হাতে তুড়ি দিয়ে, নিচের দু'হাতে ঢোলে চাঁটি মেরে, ইঁদুরের সঙ্গে সঙ্গে ঢোল বাজিয়ে নৃত্য করছেন। রিদয় সাঁ করে কুড়োজালি যেমন চাপা দেওয়া অমনি গণেশ তার মধ্যে আটকা পড়ে যাওয়া!

ইঁদুরটা টপ করে লাফিয়ে কুলুঙ্গির উপরে একেবারে সিংহাসনের তলায় যেমন ঢুকেছে, অমনি মাটির সিংহাসন দুম করে উলটে চুরমার হয়ে গেল। ইঁদুর ভয় পেয়ে ল্যাজ তুলে কোথায় যে দৌড় দিলে তার ঠিক নেই!

গণেশ জালের মধ্যে মাথা নিচু করে দু'পা আকাশে ছুড়তে লাগলেন আর বলতে থাকলেন—'ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বলছি!' কিন্তু দাঁতে শুঁড়ে ঢোলকে জালে এমনি জড়িয়ে গেছেন যে গণেশের নড়বার সাধ্যি নেই। তালের নুটির মতো জালের মধ্যে আটকা পড়ে গণেশ হাঁপাতে হাঁপাতে মা দুর্গাকে স্মরণ করতে লাগলেন; সেই সময় ইঁদুর অন্ধকারে আস্তে আস্তে এসে কটাস করে রিদয়ের পায়ে এমনি দাঁত বসিয়ে দিলে যে যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে লাগল।

রিদয় জাল ফেলে পায়ে হাত বুলোচ্ছে, এমন সময় গণেশ শুঁড়ে দাঁতে জাল কেটে বেরিয়ে নিজমূর্তি ধরলেন :

মার মার ঘের ঘার হান হান হাঁকিছে,
হুপ হাপ দুপ দাপ আশ পাশ ঝাঁকিছে!
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস লাগিছে,
হুম হাম খুম খাম ভীম শব্দ ভাষিছে!
ঊর্ধ্ব বাহু যেমন রাহু চন্দ্র সূর্য পাড়িছে,
লম্ফ ঝম্ফ ভূমিকম্প নাগদন্ত লাড়িছে!
পাদ ঘায় ঠায় ঠায় জোড়া লাথি ছুটিছে,
খণ্ড খণ্ড লণ্ডভণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ উঠিছে!
হুল থুল কুল কুল ব্রহ্মডিম্ব ফুটিছে,
ভস্মশেষ হৈল দেশ রেণু রেণু উড়িছে!

দেখতে দেখতে চালে গিয়ে গণেশের মাথা ঠেকল। তিনি দাঁত কড়মড় করে বললেন, 'এত বড় আস্পর্ধা!—ব্রাহ্মণ আমি, আমার গায়ে চিংড়িমাছের জাল ছোঁয়ানো! যেমন ছোটলোক তুই, তেমনই ছোট বুড়ো আংলা যক হয়ে থাক!' বলেই গণেশ শুঁড়ের ঝাপটায় রিদয়কে সাতহাত দূরে ঠেলে ফেলে, ভুস করে চণ্ডীমণ্ডপের চাল ফুঁড়ে অন্তর্ধান হলেন।

রিদয় একদিকের দেয়ালে মাথা ঠুকে ঘুরে পড়ল আর দেখতে দেখতে তার কপাল ফুলে বেল হল। সে বিষম ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে উঠে দেখলে—কেউ কোথাও নেই, মেঝেতে ভাঙা গণেশের একরাশ রাঙা মাটি ছড়ানো রয়েছে! গণেশ ভেঙেছে দেখলে বাবা আর তাকে আস্ত রাখবেন না ভেবে রিদয় মাটিগুলো কুড়িয়ে সিন্দুকের পাশে লুকিয়ে রাখতে গিয়ে দেখে, সিন্দুকটা এত বড় হয়ে গেছে আর সে এত ছোট হয়ে গেছে যে অনায়াসে সিন্দুকের তলায় সে গলে গেল! মাথার উপর কড়িকাঠের মতো সিন্দুকের তলাকার তক্তাগুলো, তার থেকে আরশোলা ঝুলছে। একটা আরশোলা শুঁড় উঁচিয়ে তাকে তেড়ে এল। রিদয় ভাবছে তখনও সে বড়ই আছে; যেমন আরশোলাকে মারতে যাবে, অমনি সেটা উড়ে এসে এক ডানার ঝাপটায় তাকে উলটে ফেলে বললে,—'ফের চালাকি করবি তো কামড়ে দেব! এখন তুই ছোট হয়ে গেছিস মনে নেই? আগের মতো আর বাহাদুরি চলবে না বলছি!'

রিদয় ভয়ে তাড়াতাড়ি সিন্দুকের তলা থেকে বেরিয়ে নিজের তক্তায় উঠতে গিয়ে দেখে তক্তার খুরোটা তার মাথার থেকে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। তখন রিদয় বুঝলে গণেশের শাপে সে বুড়ো আঙুলের মতো ভয়ানক ছোট হয়ে একেবারে বুড়ো আংলা হয়ে পড়েছে! রিদয় প্রথমটা ভাবলে সে স্বপন দেখছে, কিন্তু তিন চারবার চোখ বুজে, খুলে, নিজের গায়ে চিমটি কেটে যখন সে বুঝলে সব সত্যি—একটিও স্বপ্ন নয়, তখন রিদয় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে ভাবতে লাগল—কি করা যায় এখন?

গনেশ তো শাপ দিয়ে গেলেন—যক হয়ে থাক! কিন্তু যক বলে কাকে? এই বুড়ো আঙুলটির মতো ছোট থাকা? না, আর কিছু ভয়ানক হবে?

অন্য ছেলে হলে ভয়ে ভাবনায় একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে বসে থাকত, কিন্তু রিদয় ছিল নির্ভয়। সে যক কাকে বলে কারও কাছে জানবার জন্যে এদিক-ওদিক চাইতে লাগল।

ছোট হবার সঙ্গে রিদয়ের দুষ্টুবুদ্ধিও ছোট হয়ে গেছে, কাজেই সে মাটিতে মাথা ঠুকে গণেশকে মনে মনে প্রণাম করতে লাগল আর বলতে থাকল—'ঠাকুর, এবারকার মতো মাফ কর। আর আমি এমন কাজ করব না। ঘাট হয়েছে। যক কাকে বলে বলে দাও।' কিন্তু গণেশ কোনও সাড়াশব্দ দিলেন না।

গণেশের ইঁদুর রিদয়ের উপর ভারি চটেছিল, এতক্ষণ তার ভয়ে সে মটকা থেকে নামতে পারেনি, রিদয় ছোট আর ভালমানুষ হয়ে গেছে দেখে সে গোঁফ ফুলিয়ে কাছে এসে বললে—'কেমন! যেমন কর্ম তেমনি ফল! এখন থাকোগে পাতালে যক হয়ে অন্ধকারে বসে! আর আলোতেও আসতে পাবে না, বাপ-মাকেও দেখা হবে না!'

বাপ-মায়ের উপর রিদয়ের বড় একটা টান ছিল না, কিন্তু পাতালে চুপটি করে থাকা কিছুতেই সে পারবে না। সে ইঁদুরকে শুধোলে—'ভাই, যক কি রকম?'

ইঁদুর উত্তর করলে—'সেকালে লোকে ছেলেপিলে না হলে বুড়ো হয়ে মরবার সময় যক বসাত—জোঁক

বসানো নয় যক বসানো! আগে সব বাড়িতে একটা করে চোর-কুটরি ছিল, ডাকাত পড়লে সেই ঘরে মেয়ে-ছেলেদের নিয়ে গেরস্তরা গিয়ে লুকিয়ে থাকত। এই চোর-কুটরির নিচে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নেমে পাতালের মধ্যে একটা কুয়োর মতো অন্ধকার জায়গায় লোকে কখনও কখনও যক বসাত। ছেলেধরা দিয়ে খুঁজে খুঁজে তোমার মতো নিডর দুষ্টু ছেলে তারা ধরে এনে, তাকে ভাল কাপড়, সিঁদুরের টিপ দিয়ে বলির পাঁঠা যেমন করে সাজায় তেমনি করে সেই অন্ধকার পাতালপুরীতে একথালা খাবার, এক ভাঁড় জল দিয়ে, নিজে না খেয়ে, দানধ্যান না করে যেসব ধনদৌলত জমা করেছে তারই কাছে বসিয়ে দিয়ে, একটি পিদিম জ্বালিয়ে তারই নিচে একটা গোখরো সাপের হাঁড়ি রেখে বলত—'এই যকের ধন তুমি আগলে থাক। যে এখানে ঢুকবে, তাকে যেন সাপে খায়।' হ্রিং টিং ফট এই মন্তর বলে বুড়ো গর্তের মুখে একটা মস্ত পাথর চাপা দিয়ে বেরিয়ে আসত।'

রিদয় বিষম ভয় পেয়ে বলে উঠল—'তারপর?'

'তারপর আর কি? দু'চার দিনে থালার খাবার, ভাঁড়ের জল ফুরিয়ে গেলে ছেলেটা রোগা হয়ে শুকিয়ে-শুকিয়ে মরে যেত! পিদিমটাও তেল ফুরিয়ে নিভে গেলে, অন্ধকার ডাঁশ পোকা সব বেরিয়ে তার গায়ের মাংস ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত। সেই সময় গোখরো সাপ ডাঁশের লোভে হাঁড়ি ভেঙে বেরিয়ে এসে মরা ছেলের ফাঁপা মাথার খুলিটার মধ্যে বাসা বেঁধে ধনদৌলত আগলাত। আর ছেলেটা যক হয়ে সেই অন্ধকারে খিদের জ্বালায় কেবলই কাঁদত আর...'

এই পর্যন্ত শুনেই রিদয়ের এমন ভয় হল যে সে ভাবলে যেন তার চারদিকে অন্ধকারে ডাঁশ পোকাগুলো বেরিয়েছে, আর যেন লক্ষ্মীর ঝাঁপিটার মধ্যে থেকে গোখরো সাপ ফোঁসলাচ্ছে!

ইঁদুর রিদয়কে ভয় দেখিয়ে বললে—'শুনলে তো? এখন ছেলেধরা তোমাকে দেখেছে কি ধরে যকে বসিয়েছে! পালাও এই বেলা, মানুষের কাছে আর এগিও না, ধরা পড়লে মুশকিল!' বলেই ইঁদুর কুলুঙ্গিতে উঠে বসল।

রিদয় কেঁদে বললে—'আর কি আমি মানুষ হব না?'

ইঁদুর হেসে বললে—'গণেশ ঠাকুরের দয়া না হলে আর মানুষ হওয়া হচ্ছে না।'

রিদয় আরও ভয় পেয়ে শোধালে— 'গণেশ গেলেন কোথা? তাঁর দেখা পেলে যে আমি পায়ে ধরে মাফ চাই। এবার যদি তিনি আমায় মানুষ করে দেন, তবে নিশ্চয় বলছি কোনওদিন সন্দেশ চুরি করে খাব না, খেয়ে আর মিছে কথা বলব না, পড়বার সময় আর মিছিমিছি মাথা ধরবে না, তেষ্টাও পাবে না, গুরুমশায়কে দেখে আর হাসব না, বাপ-মায়ের কথা শুনব; রোজ তোমার চন্নামেত্তো খাব, একশ দুর্গানাম লিখব। এবার থেকে বামুনের দোকানের পাঁউরুটি আর হাঁসের ডিম ছাড়া অন্য কিছু ছুঁই তো গঙ্গাস্নান করব।'

এমনি ভালমানুষ হবার যত কিছু প্রতিজ্ঞা কোনওটা করতে রিদয় বাকি রাখলে না! কিন্তু এতেও গণেশ খুশি হয়ে তাকে মানুষ করে দিতে ঘরে এলেন না দেখে, বাইরেটায় সে একবার গণেশকে খুঁজে দেখবার মতলবে দরজার ফাঁক দিয়ে গলে বেরুল।

পাড়াগাঁয়ের সব বাড়ি যেমন, রিদয়ের বাড়িও তেমনি ছিল—'পুবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ, উত্তর বেড়ে, দক্ষিণ ছেড়ে।' ঘরে দাওয়া থেকে নেমেই একহাত অন্তর একখানা চৌকো টালি পাতা রয়েছে। এমনি নানা দিকে সোজা-বাঁকা, ভাঙা-আস্ত টালিগুলো মাটির উপরে পেতে রাস্তা হয়েছে—পুকুর পাড়ে যাবার, গোয়ালে যাবার, হেঁসেলে ঢোকবার। বর্ষার সময় যখন সব জলে ডুবে যায়, তখন এই টালির উপর পা ফেলে চলে যাও, একটুও পায়ে জল লাগবে না। আবার যেখানে জল যাবার নালা, তার উপরে এপার-ওপার করবার জন্যে দু'টুকরো নারকোল গাছের গুঁড়ি পাটাতন করে পাতা, পুলের মতো তার উপর দিয়ে সোজা চলে যাও।

রিদয় এখনও থেকে থেকে ভুলে যাচ্ছে যে সে আর বড় নেই, ঘরের দাওয়া থেকে আগেকার মতো লাফিয়ে নামতে গেছে, আর অমনি চিৎপাত! মনে হল যেন একতলার উপর থেকে পড়েছে! ভাগ্যি এক আঁটি খড়ের উপরে পড়েছিল, না হলে রিদয় সেদিন টের পেত বেড়ালছানাকে দাওয়া থেকে হঠাৎ ঠেলে ফেললে, কতটা তার লাগে।

গোটাকতক ছাতারে পাখি বাঁশঝাড়ের তলায় শুকনো পাতা উল্টে উল্টে ফড়িং খেয়ে বেড়াচ্ছিল, বুড়ো আংলা ডিগবাজি খেয়ে পড়ে যেতে দেখে বলে উঠল—'ছি-ছি! ও হিরিদয় হল কি? ছি-ছি।' অমনি কুবোপাখি বাঁশের ডগা থেকে বলে উঠল—'দুয়ো, বেশ হয়েছে, দুয়ো!' আর অমনি চারদিক থেকে হাঁস, হাঁসের ছানা, মুরগি, মুরগির ছানা, কাদাখোঁচা, পানকৌড়ি এমনি সব ঘরের আশেপাশের পোষাপাখি, বুনোপাখি, মজা দেখতে ছুটে এসে রিদয়কে ঘিরে চেঁচাতে লাগল, হাসতে থাকল—'ছি ছি, ছ্যা ছ্যা, দেখ দেখ! ঠিক হয়েছে! বেশ হয়েছে!

বুড়ো বুড়ো বুড়ো বুড়ো আংলা। ও হিরিদয় হল কি?' কুঁকড়ো ঘাড় ফুলিয়ে বললে—'কি হল?' চড়াই ল্যাজ নেড়ে বললে—'এ কি, যক নাকি?'

রিদয় যখন মানুষ ছিল, তখন পাখিদের কিম্বা জানোয়ারদের কথা একটুও বুঝত না, কিন্তু যক হয়ে পরিষ্কার বুঝতে পারছে!

কুঁকড়ো বলছে—'কেমন, আর আমার ঝুঁটি ধরে টানবে?'

মুরগি অমনি বললে—'যেমন দুষ্টুমি, তেমনি শাস্তি হয়েছে! চুরি কর আমার ছানা! এইবারে এক ঠোকরে মাথা ফুটো করে দেব।' বলে মুরগিটা রিদয়কে ঠোঁট বাড়িয়ে তেড়ে গেল।

পাতিহাঁস অমনি বলে উঠল—'থাক, থাক, এবার মাপ কর!'

কুঁকড়ো মাথা নেড়ে বললে—'তোর এমন দশা করলে কে?'

রাজহাঁস অমনি নাক তুলে শুধোলে—'অ্যাঁ?'

রিদয় পাখিদের কথা বুঝতে পারছে জেনে মনে মনে খুশি হল বটে, কিন্তু মুরগি, হাঁস—যারা একদিন তাকে দেখলে ভয়ে দৌড় দিত, এখন তারা মুখের সামনে দাঁড়িয়ে হাসবে, এটা রিদয় সইতে না পেরে, এক ঢিল ছুড়ে ধমকে উঠল—'প্যাঁক প্যাঁক করিসনে বলছি—পালা!'

রিদয় যে এখন এতটুকু হয়ে গেছে! পাখিরা তাকে ভয় করবে কেন? সব পাখি একসঙ্গে খ্যাঁক খ্যাঁক করে তেড়ে উঠল—'দূর হ, দূর হ! পালা!' ধাড়ি বাচ্চা সব পাখি চারদিকে ঘিরে এমনি চেঁচামেচি করতে থাকল যে রিদয়ের কানে তালা ধরবার যোগাড়! বেচারা কোথায় পালাবে ঠিক পাচ্ছে না, এমন সময় আঁস্তাকুড় থেকে ছাই-পাঁশ মেখে বাঘের মতো ডোরাটানা এক বেড়াল, চান সেরে সেইদিকে আসতে লাগল—'কিও কিও' বলতে বলতে! বেড়ালের সাড়া পেয়েই পাখিরা যেন কত ভালমানুষের মতো, মাটিতে যেন পোকাই খুঁজছে, এইভাবে পায়ে পায়ে রিদয়ের কাছ থেকে সরে পড়ল।

বেড়াল, ষষ্ঠীর বাহন, ইঁদুরের সঙ্গে গণেশ কোথায় লুকিয়ে আছেন নিশ্চয় সে জানে, ভেবে, রিদয় দৌড়ে গিয়ে বেড়ালকে গণেশের কথা শুধোলে। বেরাল অমনি ল্যাজ গুড়িয়ে, সামনে দুই থাবা রেখে, গম্ভীর হয়ে বসে চোখ পিটপিট করতে করতে যেন রিদয়ের কথা শুনেও শুনলে না—এইভাবে পায়ের আঙুল থেকে ল্যাজের ডগাটি পর্যন্ত রোদে বসে চেটে চেটে সাফ করতে লাগল। রিদয় একবার পাখিদের রাগিয়ে জব্দ হয়েছে; সে বেড়ালকে খুব মিষ্টি করে আবার শুধোলে—'বল না মেনি, গণেশঠাকুর কোনদিকে গেলেন?'

মেনি বললে—'গণেশঠাকুর কাছেই এক জায়গায় আছেন, কিন্তু তোমাকে বলছিনে বাপু!'

রিদয় আরো নরম হয়ে বললে—'লক্ষ্মীটি, বল, কোথায়? তিনি আমার কি দশা করেছেন দেখছ!'

বেড়াল যেন অবাক হয়ে সবুজ চোখ দু'টো বড় করে রিদয়ের দিকে চাইলে; তারপর গোঁফ ফুলিয়ে ফ্যাঁচ করে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললে—'তোমায় দেখে দুঃখু হবে না? আমার ল্যাজে কত কাঁকড়া ধরিয়েছ তুমি! তোমাকে গণেশের খবর দেব না তো দেব কাকে? হুঁ!' বলে বেড়াল একবার গা ঝাড়া দিলে।

রিদয় আর রাগ সামলাতে না পেরে 'দেখবি ল্যাজ ধরে টানি কিনা?' বলে যেমন বেড়ালের দিকে এগিয়ে গেছে অমনি বেড়াল বাঘের মতো ফুলে উঠল! তার রোঁয়াগুলো সজারুর কাঁটার মতো সোজা হয়ে উঠেছে, পিঠ ধনুকের মতো বেঁকেছে। ল্যাজ ফুলিয়ে কান দু'টো সটান করে কটমট করে চেয়ে বেড়াল নখে মাটি আঁচড়াতে লাগল।

রিদয় বেড়াল দেখে ভয় পাবার ছেলে নয়। যেমন সে তেড়ে বেড়ালকে ধরতে গেছে, অমনি বেড়াল ফ্যাঁচ করে হেঁচে এক থাপ্পড়ে রিদয়কে উল্টে ফেলে তার বুকে দুই পা দিয়ে চেপে বসে দাঁত খিচিয়ে বললে—'আবার বজ্জাতি! এখনও বুঝি শিক্ষা হয়নি? বুড়ো আংলা কোথাকার! জানিস, এখন নেংটি ইঁদুরের মতো তোকে ঘাড় মটকে খেয়ে ফেলতে পারি!'

বেড়াল যে ইচ্ছা করলে এখনই নখ দিয়ে তার বুকটা চিরে, দাঁত দিয়ে তার কান দু'টি কেটে নিতে পারে, তা বাঘের মতো বেড়ালের নিজমূর্তি দেখে রিদয় আজ বেশ বুঝলে। সে নিজে যে আজ কত ছোট হয়ে গেছে, তাই ভেবে রিদয়ের চোখে জল এল। চোখে জল দেখে বেড়াল রিদয়কে ছেড়ে দিয়ে বললে—'ব্যস! আজ এইটুকু শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দিলুম—তোর মায়ের অনেক নিমক খেয়েছি! আজ দেখিয়ে দিলুম তোর জোর বেশি, না আমার জোর বেশি— আর কখনও পশুপাখির সঙ্গে লাগতে যাসনে—যাঃ!' বাঘের মাসি বেড়াল চারপায়ে দাঁড়িয়ে একবার গা ঝাড়া দিয়ে ল্যাজটা বুড়ো আঙুলের মতো দু'বার রিদয়ের মুখের সামনে নেড়ে আবার ভালমানুষটির

মতো আস্তে আস্তে হেঁসেলের দিকে চলে গেল। রিদয় লজ্জায় মাথা হেঁট করে আস্তে আস্তে গোয়ালবাড়িতে গণেশকে খুঁজতে চলল।

ধলা গাই, কপ্‌লে গাই, কালো গাই—তিন গাই গোয়ালে বাঁধা। রিদয় কাছে আসতেই এই তিন গাই এমনি দাপাদাপি হামাহামি শুরু করে দিলে যে মনে হল তিরিশটা ষাঁড় সেখানে হুটোপাটি লাগিয়েছে! রিদয় শুনলে ধলা বলছে—'হবে না? মাথার উপর ধর্ম আছেন। হুঁ হুঁ!'

কপ্‌লে গাই বললে—'আমার কানে বোলতা ছাড়া? হুঁ হুঁ!'

এই সময় রিদয়কে গোয়ালের দুয়ারে দেখে কালো গাই লাথি ছুড়ে বললে—'খবরদার! দেখেছ, এক লাথিতে মাথার খুলি ফাটিয়ে দেব।'

ধলা বললে—'আয় না, এইবার একবার শিং ধরে নাড়া দিবি!'

কপ্‌লে বললে—''একবার বোলতা নিয়ে কাছে এস না, মজাটা টের পাইয়ে দিচ্ছি!''

কালো—সে সবচেয়ে বুড়ি, সবচেয়ে জোরালো গাই, সে বললে—'বড় যে আমায় ঢিল মারা হত। আবার সে দিন আমাকে জুতো ছুড়ে মারা হয়েছিল! আয়, একবার আমার খুরের ঘা খেয়ে যা! রোজ দুধ দুইবার সময় দুধের কেঁড়ে উল্টে দিয়ে মাকে নাস্তানাবুদ করে তবে ছাড়তিস। আহা, এমন দিন নেই যে তিনি তোর জন্যে না কেঁদেছেন। আয়, আজ একবার তোর শোধ তুলব। বাপরে বাপ, কি দুষ্টু ছেলে গো! গণেশঠাকুর—তাঁর সঙ্গে লাগা!'

রিদয় গরুদের সঙ্গে ভাব করে বলতে চাইছিল—যদি তারা গণেশঠাকুরকে দেখিয়ে দেয়, তবে কোনওদিন আর সে কারও কাছে কোনও অপরাধ করবে না, কিন্তু গাই তিনটে এমনি ঝাঁপাঝাঁপি আরম্ভ করলে যে রিদয়ের ভয় হল যদি দড়ি ছিঁড়ে এরা বেরোয়, তবে আর রক্ষে রাখবে না। সে আস্তে আস্তে গোয়াল ছেড়ে সরে পড়ল।

পশুপাখি কেউ তাকে তো দয়া করলে না! গণেশের দেখা যদিও বা পাওয়া যায়, তবে তিনিও যে এদেরই মতো তাকে খেদিয়ে দেবেন না, তারই বা ঠিক কি! সবার কাছে তাড়া খেয়ে বেচারা রিদয় বেড়ার ধারে মুখ চুন করে এসে বসল। এ জন্মে আর সে মানুষ হবে, এমন আশা নেই। মা-বাপ হাট থেকে যখন এসে দেখবেন ছেলেটি যক হয়ে গেছে, তখন তাঁদের দুঃখের আর সীমা থাকবে না! সে তো জানা কথা। কিন্তু পাড়ার লোক, এমন কি ভিন গাঁ থেকে ছেলে-বুড়ো সবাই বুড়ো আংলা দেখতে দলে দলে এসে তাকে ঘেরাও করবে। হয়তো কাগজওয়ালারা তার ছবি তুলে ছাপিয়ে দেবে নিচে বড় বড় করে লিখে—'আমতলিতে এই অবতারটি নষ্টামির ফল পেয়েছেন—ইনি দ্বিতীয় কালাপাহাড়, হিন্দুকুলকলঙ্ক!' হয়তো বা কোনওদিন আলিপুরের চিড়িয়াখানায় নতুন জানোয়ার বলে টিকিট মারা খাঁচায়, নয়তো তেলে ভেজে যাদুঘরের কাচের সিন্দুকে চাবি দেওয়া হবে! রিদয় আর ভাবতে পারলে না, দুইহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল! আর সে মানুষের ছেলেদের সঙ্গে খেলতে পাবে না, সবাই তাকে দেখলে যক বলে সরে যাবে, কেউ তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে না, আর এই ঘরবাড়ি—রিদয় তাদের বাড়ির দিকে চেয়ে দেখলে। খড়ের চাল ছোট ছোট তিনখানি থাকবার ঘর; তার চেয়ে ছোট রান্নাঘরখানি; তার চেয়ে ছোট গোয়াল-ঘর; ঢেঁকিশাল, ধানের মরাই, আর এতটুকু সেই পুকুর; তার চারদিকে চারটিখানি শাক সবজি। রিদয়ের বাড়ি নেহাত সামান্য রকমের, কিন্তু তা হলেও এই সামান্য জমিটুকু—ক'খানি ঘর, হাঁসপুকুর, বাঁশঝাড়, তেঁতুল-গাছটি নিয়ে, কি সুন্দরই ঠেকল! যেন একখানি ছবি! অথচ এই বাড়ি ছেড়ে কতবার রিদয় মনে করেছে পালাবে; আজ কিন্তু সেই বাড়ির দিক থেকে তার চোখ আর ফিরতে চায় না!

দিনটি আজ আমতলি গ্রামখানির উপর, তাদের এই ঘর ক'খানির উপর কী আলোই ফেলেছে! চারদিক ঝকঝক করছে, ঝুরঝুর করছে! পাখি গাইছে, ভোমরা উড়ছে, বাতাস ছুটেছে, নদী চলেছে—কলকল, কুলকুল, ফুরফুর! চারদিক আজ উলসে উঠেছে, কেবল মাঝে বসে রয়েছে রিদয়—একলাটি মুখ চুন করে। সে ভাবছে, কোথায় যাবে—কী করবে? সে যক হয়েছে, মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক উঠে গেছে। গণেশের অভিশাপে এখন অন্ধকার পাতালপুরীতে সাপের সঙ্গে যক হয়ে থাকা ছাড়া আর কি উপায় আছে? গণেশের সন্ধান করে শিবের বাড়ি কৈলাস পর্বত পর্যন্ত যদি তাকে হেঁটে যেতে হয়, তাও স্বীকার, কিন্তু পাতালপুরীতে সে কিছুতে যেতে পারবে না। এই প্রতিজ্ঞা করে রিদয় কোমর বেঁধে উঠে দাঁড়াল! এই সময় শেওলার পিছল রাস্তা দিয়ে গুগলি আস্তে আস্তে চলেছে। রিদয়কে গুগলি শুধোলে—'কোথায় যাওয়া হচ্ছে এত তাড়াতাড়ি?'

রিদয় পাখিদের কাছে, পশুদের কাছে, দাবড়ি খেয়ে ঢিট হয়ে গিয়েছিল, এবারে সে খুব ভদ্রতা করে উত্তর

দিলে—'আজ্ঞে, আমি কৈলাস পর্বতে শ্রীশ্রীগণেশ ঠাকুরের ছিচরণে কিছু নিবেদন করতে যাচ্ছি। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

গুগলি উত্তর করলে—'আমি গঙ্গাসাগরে ছান কত্তি যেতেছি।'

রিদয় মুচকে হেসে শুধোলে—'কতদিনে সেখানে পৌঁছবেন?'

'যে কয়দিনে পারি।' বলে গুগলি রিদয়কে শুধোলে—''কৈলাস পর্বতে তুমি কহন পৌছাবে?'

'বোধহয় দু'চার দিনে।' বলে রিদয় আস্তে আস্তে গুগলির সঙ্গে চলল।

গুগলি খানিক চুপ করে থেকে বললে—'আমি বোধকরি দ্যেড় দিন ট্যেকের মধ্যেই গঙ্গাসাগরে পৌঁচে যাব, কি বল?'

রিদয় এবার ঘাড় নেড়ে বললে—'তা কেমন করে হবে? যে গুটি গুটি আপনি চলেছেন, তাতে ওই হাঁসপুকুরে পৌঁছতেই তো আপনার একদিন লাগবে।'

গুগলি বললে—'ওহান থিকে না হয় বড় জোর একটা দিন লাগুক। পুকুরের ওপারটাতেই তো সুমুদ্দুর।'

রিদয় হেসে বললে—'তবেই হয়েছে! পুকুরের ওধারে পুকুরের পাড়, তারপরে সবজি খেত, তার ওধারে তেপান্তর মাঠ, মাঠের ওধারে সব গ্রাম গ্রামের পর বন, বনের পর নদী, নদীর ওপারে নগর, নগরের পরে উপনগর, তারপরে উপবন, উপবনের পরে উপদ্বীপ, তারপর উপসাগরের উপকূল, তারপর উপসাগর—যেখানে গঙ্গার স্রোত গিয়ে পড়েছে। দেড় দিন কি, দেড় বছরে সেখানে পৌঁছতে পারেন কিনা সন্দেহ। কেন মিছে হাঁটছেন? নিজের ঘরে ফিরে যান!'

গুগলি ভাবলে রিদয় তার সঙ্গে মস্করা করছে। সে আকাশে নাক তুলে বললে—'আর তুমি ভাবছ দিন চারেকে কৈলাস পর্বতে যাবা—এই পিঁপড়ার মতো সরু সরু ঠ্যাং চালিয়ে? যদি দিনরাত চলে যাতি পার, তথাপি চার বছরে তুমি সেহানে পৌঁছতি পার কিনা সন্দেহ। এই আমতলি, ইহার পর জামতলি, তেঁতুলতলি, বটতলি—অমনি পরপর কত সে গ্রাম তার ঠিকানা মেলে না। তারপর নদীর ধারে এ নগর, সে নগর; উপনদীর ধারে সকল উপনগর; তৎপরে এ ঘাট, ও ঘাট, সে ঘাট; এ মাঠ, ও মাঠ, সে মাঠ; এ বন, ও বন, সে বন; তাহার পর উপত্যকা, উপত্যকা বাদ পাহাড়তলি, তৎপরে চিত্রকূট, ত্রিকূট, পরেশনাথ, চন্দ্রনাথের পাহাড়-পর্বত; তাহার পর বিন্ধ্যাচল, তাহার পর সীমাচল তবে হিমাচল! তৎপরে রামগিরি, তাহার পরে ধবলাগিরি, তৎপরে মানস সরোবর, উহার ওধারে তিব্বত, আরও ওধারে কৈলাস পর্বত। এই নদ-নদী পাহাড়-জঙ্গল ভাংতি ভাংতি সেহানে যাওয়া গঙ্গাফড়িংটির-প্রায় তোমার কর্ম! পক্ষিরাজ ঘোড়া যে, সেও সেহানে যাতি পারে না চারি হপ্তায়, তুমি তো তুমি! ঘরের ছেলে ঘরে গিয়া বৈসা থাহ; কৈলাসের আশা ছাড়ি দ্যেও।'

রিদয় বললে—'আমি যেখানে যাব বলে বেরিয়েছি সেখানে যাবই!'

গুগলিও বললে—'আমিও যেহ্যানে যাত্রা করি বাইরেচি, এই বেদ্ধোকালে, সেহ্যেনে গঙ্গাসাগরে না যাইয়া আমি ছাড়মুনি।'

ঠিক সেই সময় খোঁড়া হাঁস পুকুর থেকে ছপছপ করে এসে টুপ করে গুগলিটিকে খেয়ে মাঠের দিকে চলল। রিদয় তাকে শুধোলে—'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

'মানস সরোবরে!' বলে হাঁস হেলতে দুলতে আগুয়ান হল।

রিদয় দেখলে বড় সুবিধে, মানস-সরোবর পর্যন্ত হাঁসের সঙ্গে যাওয়া যাবে; তারপর তিব্বত, তারপরেই কৈলাস। সে আর কোনও কথা না বলে তার মা সুবচনী ব্রত করতে যে খোঁড়া হাঁস পুষেছিলেন, তার সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল!

চলন বিল

মানুষ যেমন, গুগলিও তেমনি হাঁটাপথে চলে, কাজেই কৈলাস যাবার হাঁটাপথের খবরই গুগলি রাখত। কিন্তু মাটির উপর দিয়ে হাঁটাপথ যেমন, তেমনই আকাশের উপর দিয়ে জলের নিচে দিয়ে সব পথ আছে, সেই রাস্তায় পাখিরা মাছেরা দূর দূর দেশে যাতায়াত করে। মানুষ, গরু, গুগলি, শামুক—এরা সব পাহাড়-জঙ্গল ভেঙে, নদী পেরিয়ে চলে, কাজেই কোথাও যেতে এদের অনেকদিন লাগে। মাছেরা এঁকেবেঁকে এ নদী সে নদী করে যায়, তাদের ডাঙায় উঠতে হয় না, কাজেই তারা আরও অল্পদিনে ঠিকানায় পৌঁছয়। আর পাখিরা নদী-

ডাঙা দুয়েরই উপর দিয়ে সহজে উড়ে চলে—সব চেয়ে আগে চলে তারা! কিন্তু তাই বলে পাখিরাও যে পথের কষ্ট একেবারেই পায় না, এমন নয়। আকাশের নানাদিকে নানারকম নরম-গরম হাওয়া নদীর স্রোতের মতো বইছে—এই সব স্রোত বুঝে পাখিদের যাতায়াত করতে হয়, এ ছাড়া বড় পাখিরা যে রাস্তায় চলে, ছোট পাখিরা সেসব রাস্তায় গেলে তাদের বিপদে পড়তে হয়—হয়তো ঝোড়ো হাওয়াতে কোথায় যেতে কোথায় গিয়ে পড়ল তার ঠিক নেই!

আবার বড় পাখিদের যে পথে কম বাতাস, সে পথে গেলে ওড়াই মুশকিল—ডানা নাড়তে নাড়তে কাঁধ ব্যথা হয়ে যায়! বাতাসের এক একটা পথ এমন ঠাণ্ডা যে সেখানে খুব শক্ত পাখিরা ছাড়া কেউ যেতে পারে না—শীতে জমে যাবে। কোনও রাস্তায় এমন গরম বাতাসের স্রোত চলেছে যে সেখানে আগুনের ঝলকে পাখা পুড়ে যায়। এ ছাড়া জোয়ার-ভাটার মতো অনুকূল-প্রতিকূল দু'রকম হাওয়া বইছে—সেটা বুঝেও পাখিদের যাওয়া-আসা করতে হয়। সব পাখি আবার রাতে উড়তে পারে না, সে জন্য যেদিক দিয়ে গেলে বন পাবে, নদী পাবে, আকাশ থেকে নেমে দু'দণ্ড বসে জিরোতে পাবে—এমন সব যাবার রাস্তা তারা বেছে নেয়। এর উপরে আকাশ দিয়ে মেঘ চলাচল করছে; জলে-ধোঁয়ায় ঝাপসা এই সব মেঘের রাস্তা কাটিয়ে পাখিদের চলতে হয়; না হলে ডানা ভিজে ভারি হয়ে, কুয়াশায়, ধোঁয়ায় দিক ভুল হয়ে একদিকে যেতে আর একদিকে গিয়ে পড়বে। এমনি সব নানা ঝঞ্ঝাট বাতাসের পথে আছে; কাজেই পাখিদের মধ্যে পাকা মাঝির মতো সব দলপতি পাখি থাকে। পাণ্ডারা যেমন দলে দলে যাত্রী নিয়ে তীর্থ করাতে চলে, তেমনই এরাও ভাল ভাল রাস্তার খবর নিয়ে দলে দলে নানা পাখি নিয়ে আনাগোনা করে—উত্তর থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে পুবে, সমুদ্র থেকে পাহাড়ের দিকে, পাহাড় থেকে সমুদ্রের দিকে, পৃথিবীর একধার থেকে আর একধারে নানাদেশে নানাস্থানে।

মানুষ যখন একদেশ থেকে আর একদেশে চলে, সে নিজের সঙ্গে খাবার, জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিয়ে চলে। খুব যে গরিব, এমন কি সন্ন্যাসী, সেও এক লোটা, এক কম্বল, খানিক ছাতু, ছোলা, আটা, দু'টো মোয়া, নয়তো দু'মুঠো মুড়িও সঙ্গে নেয়; কিন্তু পাখিদের এখান থেকে কিছু খেয়ে নিয়ে, সেখানে নেমে, সেখানে কিছু খেয়ে নিয়ে—এমনি খানিক পথ উড়ে, খানিক আবার ডাঙায় কিম্বা জলায়, কোথাও বা চরে, ঘাটে ঘাটে জিরিয়ে খেয়ে-দেয়ে না নিলে চলবার উপায় নেই। বাচ্চাদের জন্যে দূর থেকে পাখিরা মুখে করে, গলার থলিতে ভরে খাবার আনে; আর টিয়ে পাখি ঠোঁটে ধানের শীষ, হাঁস পদ্মফুলের ডাঁটা নিয়ে সময় সময় এদিকে ওদিকে উড়ে চলে বটে, কিন্তু দল বেঁধে যখন তারা পাণ্ডার সঙ্গে দূর দূর দেশে যাত্রা করে বেরোয়, তখন কুটোটি পর্যন্ত সঙ্গে রাখে না—একেবারে ঝাড়া-ঝাপটা হাল্কা হয়ে উড়ে যায়। রেলগাড়ি যেমন দেশ-বিদেশের মধ্য দিয়ে বাঁশি দিতে দিতে স্টেশনে স্টেশনে নতুন নতুন লোক ওঠাতে ওঠাতে চলে, এই পাখির দলও তেমনই আকাশ দিয়ে ডাক দিতে-দিতে চলে; আর এ গ্রাম সে গ্রাম, এ দেশ সে দেশ, এ বন ও বন থেকে যাত্রী-পাখি সব উড়ে গিয়ে ঝাঁকে মিশে আনন্দে মস্ত এক দল বেঁধে চলতে থাকে। আকাশ দিয়ে একটার পর একটা ডাকগাড়ির মতো সারাদিন এমনি দলে দলে যাতায়াত করে ডাকহাঁক দিতে দিতে—হাঁস, বক, সারস, পায়রা, টিয়া, শালিক, ময়না, ডাহুক-ডাহুকী—ছোটোবড়ো নানা পাখি।

খোঁড়া হাঁসের সঙ্গে মানস সরোবরে যাবার জন্যে রিদয় ঘর ছেড়ে মাঠে এসে দেখলে নীল আকাশ দিয়ে দলে দলে বক, সারস, বুনোহাঁস, পাতিহাঁস, বালুহাঁস, রাজহাঁস সারি দিয়ে চলেছে। এই সব পাখির দল পূবে সনদ্বীপ থেকে ছেড়ে আমতলির উপর দিয়ে দু'ভাগ হয়ে এক ভাগ চলেছে—গঙ্গাসাগরের মোহানা ধরে গঙ্গা- যমুনার ধারে ধারে হরিদ্বারের পথ দিয়ে হিমাচল পেরিয়ে মানস সরোবর, আর একদল চলেছে—মেঘনা নদীর মোহানা হয়ে আমতলি, হরিংঘাটা, গঙ্গাসাগর বাঁয়ে ফেলে আসামের জঙ্গল, গারো পাহাড় খাসিয়া পাহাড় ডাইনে রেখে, ব্রহ্মপুত্র নদের বাঁকে বাঁকে ঘুরতে ঘুরতে হিমালয় পেরিয়ে, তিব্বতের উপর দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা ধবলাগিরির উত্তর গা ঘেঁষে, সিধে পশ্চিম মুখে মানস সরোবরে। সমুদ্রের দিক থেকে গঙ্গাসাগরের পথ পশ্চিম-উত্তর হয়ে হিমালয় পেরিয়ে পুবে ঘুরে পড়েছে মানস সরোবরে; আর ব্রহ্মপুত্রের পথ উত্তর-পুব হয়ে পশ্চিম ঘুরে শেষ হয়েছে মানস সরোবরে—যেন বেড়ির দুই মুখ একটি জায়গায় গিয়ে মিলেছে। এই বেড়ির মিলের কাছে রয়েছে সুন্দরবন আর আমতলি, মাঝখানে অন্নপূর্ণার অন্নপাত্র সুজলা সুফলা সোনার বাংলা দেশ; ডাইনে আসাম; বাঁয়ে বিহার অঞ্চল।

সুবচনীর খোঁড়া হাঁস রিদয়ের সঙ্গে মাঠে বেরিয়ে প্যাঁক প্যাঁক করে আপনার মনেই বকতে বকতে চলল—

'উঃ বাবারে! আর যে চলতে পারিনে! পা ছিঁড়ে পড়ছে! কেন এলুম গো, মরতে ঘর থেকে বেরিয়েছিলুম! এতদূরে মানস সরোবর কে জানে গো—এঁঃ!' খোঁড়া হাঁস হাঁপাচ্ছে আর চলছে আর বকছে। বাতে বেচারার পা-টি পঙ্গু। সে অনেক কষ্টে খাল-ধারে—যেখানে গোটাকতক বক, গোটাকতক পাতিহাঁস চরছিল, সেই পর্যন্ত এসে উলুঘাসের উপরে খোঁড়া পা রেখে জিরোতে বসল।

রিদয় কি করে? একটু কচু পাতার নিচে বসে আকাশের দিকে চেয়ে দেখতে লাগল—দলে দলে হাঁস উত্তর মুখে উড়ে চলেছে—নানা কথা বলাবলি করতে করতে। রিদয় শুনলে হাঁসেরা বাজে বকছে না; কাজের কথাই বলতে বলতে পথ চলেছে।

সেথো হাঁসেরা বললে—'থাকে থাকে ফুলের গন্ধ লাগছে নাকে!'

অমনি পাণ্ডা হাঁস যে সব আগে চলেছে, জবাব দিলে—'ছুটলে খোসবো বাদলা রাখে।'

সেথোরা বললে—'নিচে বাগে নামল তাল-চড়াই!'

পাণ্ডা উত্তর করলে—'উপরে বড়ই ঠাণ্ডা ভাই!'

সেথোরা বললে—'জাল টেনে মাকড় দিল চম্পট!'

পাণ্ডার জবাব হল—'এল বলে বৃষ্টি—চল চটপট!'

সেথোরা বললে—'ফুল সব দিল ঘোমটা টেনে।'

পাণ্ডা বললেন—'এল বিষ্টি এল হেনে!'

'ছুঁচোয় গড়েছে মাটির ঢিপি।'

'বিষ্টি পড়বে টিপিটিপি।'

'সাগরের পাখি ডাঙায় গেল।'

'ঝড়জল বুঝি এবার এল।'

'কাক যে বাসায় একলা বড়ো!'

'গতিক খারাপ; নেমে পড়, নেমে পড়ো।'

অমনি সব হাঁস ঝুপঝুপ করে খালেবিলে নেমে পড়ে আপনার আপনার পিঠের পালকগুলো জল দিয়ে বেশ করে ভিজিয়ে নিলে, পাছে পালকগুলো শুকনো থাকলে বিষ্টির জল বেশি করে চুষে নেয়। দেখতে দেখতে ঝড়ো বাতাস ধুলোয় ধুলোয় চারদিক অন্ধকার করে দিয়ে, বড় বড় গাছের আগ দুলিয়ে শুকনো ডালপাতা উড়িয়ে হু হু করে বেরিয়ে গেল। তারপরই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল—খাল-বিল ভর্তি করে দিয়ে। একটু পরে বিষ্টি থেমে আবার রোদ উঠল; তখন দলে দলে হাঁস, বক, সারস আবার চলল—আকাশপথে আগের মতো বলাবলি করতে করতে—

'মাকড় আবার জাল পেতেছে।'

'আর ভয় নেই—রোদ এসেছে।'

'মৌচাক ছেড়ে মাছিরা ছোটে।'

'বাদলের ভয় নাইকো মোটে।'

'বনে বনে ওঠে পাখির সুর।'

'উড়ে চল, পার যতদূর।'

'আকাশ জুড়িল রামধনুকে!'

'চল—গেয়ে চল মনেরই সুখে।'

আগে আগে পাণ্ডা হাঁস চলেছে, পিছে পিছে, তীরের ফলার মতো দু'সারি হাঁস ডাক দিতে দিতে উড়ে যাচ্ছে। অনেক উপর দিয়ে একদল ডাক দিয়ে গেল—'পাহাড়তলি কে যাবে? পাহাড়তলি!' বুনো হাঁসের ডাক শুনে পোষা-পালা খালের বিলের হাঁস, তারা ঘাড় তুলে যে যেখানে ছিল জবাব দিলে—'যে যায় যাক, আমরা নয়।' মাটির উপরে যারা, তারা মুখে বলছে—'যাব না' কিন্তু আকাশ এমনই নীল, বাতাস এমনই পরিষ্কার যে মন তাদের চাচ্ছে উড়ে চলি—ওই আলো মাখা হাওয়ায় ডানা ছড়িয়ে হু হু করে! যেমন এক একদল বুনো হাঁস মাথার উপর দিয়ে ডাক দিয়ে যাচ্ছে, আর অমনি যত পালা হাঁস তারা চঞ্চল হয়ে পালাই পালাই করছে। দু'চারটে

বা ডানা ঝটপট করে এক একবার উড়ে পড়তে চেষ্টা করলে, অমনি খুড়ি হাঁস ঘাড় নেড়ে বলে উঠল—'এমন কাজ করো না, আকাশপথে চলার কষ্ট ভারি, পাহাড় দেশে শীত বিষম, কিছু মেলে না গো, কিছু মেলে না!'

বুনোহাঁসের ডাক শুনে সুবচনীর খোঁড়া হাঁস উড়ে পড়তে আনচান করতে লাগল। সে বকতে লাগল—'এইবার একদল হাঁস এলে হয়, ঝপ করে উড়ে পড়ব! আর পারিনে বাপু মাটিতে খুঁড়িয়ে চলতে!'

সনদ্বীপ থেকে বালু হাঁসের দল হিমালয় পেরিয়ে একেবারে মানস সরোবর পর্যন্ত যাবার জন্য তৈরি হয়ে বেরিয়েছে— এবারে সেই দূর দূরের যাত্রীরা, আমতলির ঠিক উপর দিয়ে চলতে চলতে ডাক দিতে থাকল টানা সুরে—'মানস সরোবর! ধৌলাগিরি।'

খোঁড়া হাঁস অমনি উলুঘাসের ঝোপ ছেড়ে গলা তুলে ডাক দিলে—'আসছি, একটু রও, একটু রয়ে ভাই একটু রয়ে চল!' তারপর সে তার সাদা দু'খানা ডানা মেলে বাতাসে গা ভাসিয়ে দু'চার হাত গিয়ে আবার ঝুপ করে মাটিতে পড়ল—বেচারা কতদিন ওড়েনি, ওড়া প্রায় ভুলে গেছে! খোঁড়া হাঁসের ডাক বালু হাঁসেরা শুনেছিল বোধহয়, তাই মাথার উপরে ঘুরে ঘুরে তারা দেখতে লাগল যাত্রী আসছে কি না!' সুবচনীর হাঁস আবার চেঁচিয়ে বললে—'রও ভাই, একটু রয়ে!' তারপর যেমন সে উড়তে যাবে, অমনি রিদয় লাফ দিয়ে তার গলা জড়িয়ে—'আমিও যাব' বলে ঝুলে পড়ল!

খোঁড়া হাঁস তখন বাতাসে ডানা ছড়িয়ে উড়তে ব্যস্ত, রিদয়কে নামিয়ে দেবার সময় হল না, দু'জনেই মাটি ছেড়ে আকাশে উঠল। রিদয়কে নিয়ে খোঁড়া হাঁস বাতাস কেটে উপরে উঠছে—এমনই বেগে যে, মনে হল ডগায় ঝোলানো একটা টিকটিকি নিয়ে হাউই চলেছে। হঠাৎ সেই খোঁড়া হাঁস এমন তেজে মাটি ছেড়ে উপরে উঠে পড়বে, এটা হাঁসটা নিজেও ভাবেনি; রিদয় তো মনেই আনতে পারেনি—এমনটা হবে! এখন আর নামবার উপায় নেই—পায়ের তলায় মাটি কতদূরে পড়ে আছে তার ঠিক নেই, ডানার বাতাস ক্রমাগত তাকে ঝাপটা দিচ্ছে! রিদয় হাঁপাতে হাঁপাতে অতি কষ্টে গাছে চড়ার মতো হাঁসের গলা ধরে আস্তে আস্তে তার পিঠে চেপে বসল। কিন্তু এমনই গড়ানো হাঁসের পিঠ যে সেখানেও ঠিক বসে থাকা দায়—রিদয় ক্রমেই পিছনে পড়তে যাচ্ছে! দুখানা সাদা ডানার ওঠাপড়ার মধ্যে বসে তার মনে হতে লাগল যেন সাদা দু'টো সমুদ্রের ঢেউয়ের মাঝে সে দুলতে দুলতে চলেছে। প্রাণপণে খোঁড়া হাঁসের পিঠের পালক দুই মুঠোয় ধরে, দু'পায়ে গলা জড়িয়ে রিদয় স্থির হয়ে বসবার চেষ্টা করতে লাগল।

মাটির উপর দিয়ে খোঁড়া হাঁসের সঙ্গে পায়ে হেঁটে যাওয়া এক, আর এক কুড়ি একটা উড়ন্ত হাঁসের হাঁক-ডাক, চলন্ত ডানার ঝাপটার মধ্যে বসে ঝড়ের মতো শূন্যে উড়ে চলা আর এক! বাতাস তোলপাড় করে চলেছে হাঁসের দল! কুড়ি জোড়া দাঁড়ের মতো ঝপাঝপ উঠছে পড়ছে জোরাল ডানা! রিদয় দেখছে কেবল হাঁস আর পালক বিজবিজ করছে! শুনছে কেবল বাতাসের ঝপঝপ, সোঁ সোঁ, আর থেকে থেকে হাঁসেদের হাঁকডাক! উপর আকাশ দিয়ে যাচ্ছে, না মেঘের মধ্যে দিয়ে চলেছে, কি মাটির কাছ দিয়ে উড়ছে, রিদয় কিছুই বুঝতে পারছে না!

উপর আকাশে এমন পাতলা বাতাস যে হঠাৎ সেখানে উঠে গেলে দম নিতে কষ্ট বোধ হয়, কাজেই নতুন সেথো—খোঁড়া হাঁসকে একটু সামলে নেবার জন্যে বালুহাঁসের দল নিচেকার ঘন হাওয়ার মধ্যে দিয়ে বরং আস্তেই চলেছে, এতেই রিদয়ের মনে হচ্ছে যেন পাশাপাশি দুটো রেলগাড়ি পুরোদমে ছুটছে আর তারই মাঝে এতটুকু সে দুলতে দুলতে চলেছে! ওড়ার প্রথম চোটটা কমে এলে রিদয়ের হাঁস ক্রমে টাল সামলে সোজা তালে তালে ডানা ফেলে চলতে শুরু করলে। তখন রিদয় মাটির দিকে চেয়ে দেখবার সময় পেলে। হাঁসের দল তখন সুন্দরবন ছাড়িয়ে বাংলা দেশের বুকের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে। রিদয় আকাশে থেকে দেখছে যেন সবুজ-হলদে-রাঙা-মেটে-নীল এমনি পাঁচ রঙের ছককাটা চমৎকার একখানি কাঁথা রোদে পাতা রয়েছে। রিদয় ভাবছে এ কোনখানে এলেম? সেই সময় বাখরগঞ্জের ধানক্ষেতের উপর দিয়ে হাঁসেরা চলল। রিদয় দেশটা দেখে ভাবলে প্রকাণ্ড একটা যেন শতরঞ্জ খেলার ছক নিচের জমিতে পাতা রয়েছে।

রিদয় ভাবছে—'বাস রে? এত বড় খেলার ছক, রাবণে দাবা খেলে নাকি?' অমনি যেন তার কথার উত্তর দিয়ে হাঁসেরা হাঁক দিলে—' ক্ষেত আর মাঠ, ক্ষেত আর মাঠ—বাখরগনজো!' তখন রিদয়ের চোখ ফুটল। সে বুঝলে সবুজ ছকগুলো ধান ক্ষেত—নতুন শীষে ভরে রয়েছে! হলদে ছকগুলো সরষে ক্ষেত—সোনার ফুলে ভরে গিয়েছে! মেটে ছকগুলো খালি জমি—এখনও সেখানে ফসল গজায়নি। রাঙা ছকগুলো শোন আর পাট।



সবুজ পাড় দেওয়া মেটে মেটে ছকগুলো খালি জমির ধারে ধারে গাছের সার। মাঝে মাঝে বড় বড় সবুজ দাগগুলো সব বন। কোথাও সোনালি, কোথাও লাল, কোথাও ফিকে নীলের ধারে ঘন সবুজ ছককাটা ডোরা টানা জায়গাগুলো নদীর ধারে গ্রামগুলি—ঘর ঘর পাড়া পাড়া ভাগ করা রয়েছে। কতকগুলো ছকের মাঝে ঘন সবুজ, ধারে ধারে খয়েরি রঙ—সেগুলো হচ্ছে আম-কাঁঠালের বাগান—মাটির পাঁচিল ঘেরা। নদী, নালা, খালগুলো রিদয় দেখলে যেন রুপোলি ডোরার নক্সা—আলোতে ঝিকঝিক করছে। নতুন ফল, নতুন পাতা যেন সবুজ মখমলের উপরে এখানে ওখানে কারচোপের কাজ!—যতদূর চোখ চলে এমনি! আকাশ থেকে মাটি যেন শতরঞ্জি হয়ে গেছে দেখে রিদয় মজা পেয়েছে; সে হাততালি দিয়ে যেমন বলছে—'বাঃ, কি তামাশা।' অমনি হাঁসেরা যেন তাকে ধমকে বলে উঠল—'সেরা দেশ—সোনার দেশ—সবুজ দেশ—ফলন্ত-ফুলন্ত বাংলা দেশ!'

রিদয় একবার গণেশকে নিয়ে হাসি-তামাশা করতে গিয়ে বিপদে পড়েছে, হাঁসের ধমক শুনে মুখ বুজে গম্ভীর ভালমানুষটির মতো পিটপিট করে চারদিকে চাইতে লাগল আর মিটমিট করে একটু আধটু হাসতেও থাকল—খুব ঠোঁট চেপে। দলে দলে কত পাখি—কেউ চলেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে, কেউ উত্তর থেকে দক্ষিণে, পুব থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে পুবে; আর পথের মাঝে দেখা হলেই এ দল ও দলকে শুধোচ্ছে—এদিকের খবর, ওদিকের খবর—খবর কি ভাই, খবর কি? অমনি বলাবলি চলল 'ও ধারে জল হচ্ছে।' 'এ ধারে রোদে পুড়ছে।' 'সে ধারে ফল ফলেছে।' 'এ ধারে বউল ধরেছে।' রিদয়কে নিয়ে চলতি হাঁসেরা পাহাড় থেকে একদল ফিরতি হাঁসকে শুধিয়ে জানলে—ও ধারে এখনও কুয়াশা কাটেনি; শিল পড়ছে; জল হিম; গাছে এখনও ফল ধরেনি! অমনি তারা ঢিমে চালে চলতে আরম্ভ করলে। তাড়াতাড়ি পাহাড় অঞ্চলে গিয়ে লাভ কি, বলে তারা এ গ্রাম-সে গ্রাম, নদীর এপার-ওপার করতে করতে ধীরেসুস্থে এগোতে থাকল।

গ্রামে গ্রামে ঘরের মটকায় কুঁকড়ো সব পাহারা দিচ্ছে। ঘাটিতে ঘাটিতে চলন্ত পাখিরা তাদের কাছে খবর পাচ্ছে। 'কোন গ্রাম?' 'তেঁতলিয়া, সাবেক তেঁতুলিয়া হাল তেঁতুলিয়া।' 'কোন শহর?' 'নোয়াখালি—খটখটে।' 'কোন মাঠ?' 'তিরপুরণীর মাঠ—জলে থইথই।' 'কোন ঘাট?' 'সাঁকের ঘাট—গুগলি ভরা।' 'কোন হাট?' 'উলোর হাট—খড়ের ধুম।' 'কোন নদী?' 'বিষনদী—ঘোলা জল।' কোন নগর?' 'গোপাল নগর—গয়লা ঢের।' 'কোন আবাদ?' 'নসিরাবাদ—তামুক ভাল।' 'কোন গঞ্জ?' 'বামুনগঞ্জ—মাছ মেলা দায়।' 'কোন বাজার?' 'হালতার বাজার—পলতা মেলে।' 'কোন বন্দর?' 'বাগা বন্দর—হুক্কাহুয়া।' 'কোন জেলা?' 'রুরুলী জেলা—সিঁদুরে মাটি।' 'কোন বিল?' 'চলন বিল—জল নেই।' 'কোন পুকুর?' 'বাঁধা পুকুর—কেবল কাদা।' 'কোন দিঘি?' 'রায় দিঘি—পানায় ঢাকা।' 'কোন খাল?' 'বালির খাল—কেবল চড়া।' 'কোন ঝিল?' 'হীরা

ঝিল—তীরে জেলে।' 'কোন পরগনা?' 'পাতলে দ—পাতলা হ।' 'কোন ডিহি?' 'রাজসাই—খাসা ভাই!' 'কোন পুর?' 'সোদপুর—পিঁপড়ে কাঁদে।' 'কার বাড়ি?' 'ঠাকুর বাড়ি।' 'কোন ঠাকুর?' 'ওবিন ঠাকুর—ছবি লেখে।' 'কার কাচারি?' 'নাম করো না, ফাটবে হাঁড়ি!'

এমনি দেশের নাম, লোকের নাম, বাড়ির নাম, আর নামের সঙ্গে একটা করে বিশেষণ দিয়ে কুঁকড়ো, সব যেমন যেমন প্রশ্ন হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। যাত্রীরাও বুঝে নিচ্ছে কোন জায়গায় কি পাওয়া যায়, কোথায় নামলে বিপদ, কোথায় নিরাপদ—কোথায় কি খাওয়া পাওয়া যায় তা পর্যন্ত! মানুষে হয়তো দিয়েছে গ্রামের নাম 'ভরপুর' কিন্তু সেখানে না আছে ফলের বাগান, চরবার খাল, বিল, মাঠ; লোকগুলোও চোয়াড়; পাখির ভাষায় সে গ্রামের নাম হল—'নরককুণ্ড'। কোনও দুঁদে জমিদার প্রজার সর্বনাশ করে তেতলা বাড়ি ফেঁদে তার নাম দিয়েছে 'অলকাপুরী'; কিন্তু সেখানে কোনওদিন কারু পাত পড়ে না; শেয়াল-কুকুর কেঁদে যায়; পাখিরা মিলে সে বাড়ির নাম দিলে 'পোড়াবাড়ি'। হয়তো একটা পাড়া—সেখানে ভণ্ড বৈরাগীর আড্ডা; তারা দিনে মালা জপে, রাতে বাড়ি বাড়ি সিঁদ দিয়ে আসে; সে জায়গাটার নাম মানুষ দিলে 'বৈরিগি-পাড়া', কিন্তু পাখিরা তাদের বললে 'নিগিরিটিং'—ভাবটা যে কেবল এদের খঞ্জনিই সার! হয়তো এক ভাল পরগনার জমিদার কিন্তু পরগনার নাম মানুষে বলছে 'খোলামুচি'; কিন্তু পাখিরা দেখছে সেখানে ধান খুব, ফল ভাল, ভাল জমিদার; বন্দুক হাতে শিকারে বেরোয় না; অমনি সে পরগনার নাম তারা হাঁকলে—'রাজভোগ—সাবেক রাজভোগ—হাল রাজভোগ।' হয়তো 'রাজভোগ' যেমন, তেমনই কোনও ভাল পরগনা নষ্ট জমিদারের হাতে পড়ে উচ্ছন্ন গেল—সেখানে না মেলে ঘাস, না আছে ভাল জল, না আছে বাগান, থাকবার মধ্যে মাতাল জমিদারের বন্দুকের গুলি, দুঁদে নায়েবের লাঠিসোটা; মানুষ সে পরগনার নাম 'লক্ষ্মীপুর' দিলেও পাখিরা তাকে বললে 'মশাল-চুলি'।

কোনও কোনও জায়গায় সাতপুরুষ ধরে ভাল মানুষ, ভাল আবহাওয়া, ভাল খাওয়া-দাওয়া, খালবিল হাটবাজার গুলজার; সেখানকার কুঁকড়ো বুক ফুলিয়ে হাঁকলে—'মনোহর নগর—সাবেক মনোহর নগর—হালে মনোহর।' এমনই যেখানে পাখিদের সুখ, সে সব জায়গায় নাম এক এক কুঁকড়ো হেঁকে দিচ্ছে—যেমন হাঁসের দল, সারসের দল, মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে—'সোহাগদার, দৌলতপুর, সুনামগঞ্জ!' যেখানে ফুলফুলুরি ফসল ঢের, সে সব জায়গার কুঁকড়োরা হাঁকছে—'দানাসিরি, লাঙলবাঁধ, উলুর হাট, আমতাজুড়ি, জাঙ্গিপুর!' হাঁস—পদ্মনাল এমনই সব খেতে পছন্দ করে, যেখানে খালে-বিলে এ সব জন্মেছে, সেখানকার কুঁকড়ো হাঁকছে—'সাতনল, নলচিটে, পাটের হাট, বেতগাঁ, বেতাজী, সোলাভাঙা, শাকের হাট।' যেখানে খাবার নেই, তার কুঁকড়ো হাঁকলে—'ঝালকাটি, কাটিপাড়া, আশাশূন্যি, সন্ন্যাসীহাট।' যেখানে ছায়াকরা বন অনেক, সেখানকার নাম হাঁকলে কুঁকড়ো—'কমলাবাড়ি, ফুলঝুরি, ডাকেটিয়া, শিরিশদিয়া, কোকিলামুখ।' যেখানে ছোট-বড় নদী, ছোট-বড় মাছ, কুঁকড়ো হাঁকলে—'চাঁদপুর, ইলশেঘাট, ব্যাঙধুই, বোয়ালিয়া, বোয়ালমারি।'

রিদয় দেখলে হাঁসেরা সোজা যে উত্তরমুখো চলেছে, তা নয়। তারা এ গ্রাম সে গ্রাম, এ ক্ষেত ও ক্ষেত, এ বিল ও বিল করে হরিংঘাটা, মেঘনা—এই দুই নদীর মাঝে যা কিছু আছে সব যেন দেখতে দেখতে চলেছে—বাংলা দেশের সুন্দরবন, ধানক্ষেত, পদ্মদিঘি, বালুচর, খালবিল ছাড়তে যেন তাদের মন উঠছে না। বাখরগঞ্জ, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর হয়ে ধলেশ্বরী নদী পেরিয়ে ক্রমে হাঁসের দল চাঁদপুরের দিকে চলল—পুবমুখে।

হাঁসের মধ্যে ঘেংরাল আর সরাল দু'জাতের হাঁস—এরা কোনওদিন কোথাও যেতেও চায় না, নড়তেও চায় না—ভারি কুনো! বুনোহাঁস এদের দেখলেই তামাশা করতে ছাড়চে না। তারা উত্তর আকাশ থেকে একের পর একে ডেকে চলল—'পাহাড়তলি, কামরূপ, ধৌলাগিরি, মানস সরোবর—চলেছি, চলেছি!' অমনি সরাল, ঘেংরাল এরা উত্তর দিচ্ছে—'যেও না যেও না, বড় শীত। যেও পরে, যেও পরে।'

বুনো হাঁসের দল আরও নিচে নেমে একসঙ্গে বলে উঠল—'ভারী মজা, উড়তে মজা—শীতে মজা—পাহাড়ে মজা। উড়তে শেখাব; চলে এস না!'

সরাল, ঘেংরাল কোথাও উড়ে যাবে না; যেখানকার সেখানে থাকবে, অথচ উড়তে পারে না বললে তারা ভারী চটবে; এবারে বুনোহাঁসের কথায় তারা জবাবই দিলে না। তখন বালু হাঁসের দল একেবারে মাটির কাছে নেমে এসে বলে উঠল—'ওরে হাঁস নয় রে—ভেড়া!' তারপর হাঃ হাঃ করে হাসতে হাসতে ডানায় তালি দিতে

দিতে আবার আকাশে উঠল। নিচে থেকে ঘোরো হাঁস তারা গলা চিরে গালাগালি শুরু করলে—'মর, মর! গুলি খেয়ে মর, শিল পড়ে মর, বাতে ধরে মর, বাজ পড়ে মর, বিদেশে মর, বিভুঁয়ে মর!'

এমন হাসি-তামাশার মধ্যে রিদয় আনন্দে চলেছে। কিন্তু তবু নিজের দুরবস্থা ভেবে—সে যে মা-বাপ ঘর-বাড়ি ছেড়ে কোথায় নির্বাসনে চলেছে, সে কথা মনে করে—এক একবার তার চোখে জলও আসছে। কিন্তু তবু এই আকাশ দিয়ে একেবারে হু হু করে উড়ে চলায় কি মজা কত আনন্দ! বাতাসে কোথাও ভিজে মাটির গন্ধ, কোথাও ফোটা ফুলের খোশবো, কোথাও পাকা ফলের কি মিঠে বাসই আসছে! পৃথিবীর গায়ের বাতাস যে এমন সুগন্ধে ভরা রিদয় আগে তো জানেনি! মেঘের উপর দিয়ে, জলের চেয়ে পরিষ্কার বাতাসের উপর দিয়ে, ভেসে চলতে চলতে রিদয়ের মনে হতে লাগল যেন সব দুঃখ, সব কষ্ট, পৃথিবীর যত কিছু জ্বালাযন্ত্রণা ছেড়ে সে সত্যি উঠে এসেছে সেইখানে, যেখানে ধুলো নেই, বালি নেই, ভয় নেই, ভাবনা নেই, রোগ নেই, শোক নেই—কেবলি আনন্দে উড়ে চলা দিনরাত!

চকা নিকোবর

সুবচনীর খোঁড়া হাঁস এই সব বুনোহাঁসদের দলে ভিড়ে উড়তে, আর এ গ্রামের সে গ্রামের সব সরাল, ঘেংরালদের দেখে হাসি-মস্করা করতে পেয়ে, ভারি খুশি হয়েছে। সে ভুলে গেছে যে নিজেই সে এতকাল পালাহাঁসই ছিল—ওই সরাল-ঘেংরালের মতো ঘর আর পুকুর করে কাটিয়েছে। তার উপর সে আজন্ম খোঁড়া, সবে আজ নূতন উড়ছে। বুনোহাঁসের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে চলা তার কর্ম নয়! খোঁড়ার ডানার তেজ ক্রমেই কমছে আর দমও ক্রমে ফুরিয়ে আসছে, সে হাঁপাতে হাঁপাতে তাড়াতাড়ি ডানা ঝাপটেও আর পেরে উঠছে না, মধ্যে থেকে এক এক করে প্রায় আট হাঁস পিছিয়ে পড়েছে। সেথো হাঁসরা যখন দেখলে খোঁড়া পিছিয়ে পড়ে, আর পারে না, তখন পাণ্ডা হাঁসকে ডাক দিয়ে জানালে—'চকা-নিকোবর, চকা-নিকোবর!'

চকা উড়তে উড়তেই শুধোলে—'ক্যোঁন্ ক্যোঁন্, কও ক্যোঁন্?'

সেথোরা বললে—'পিছিয়ে পোলো খোঁড়া ঠ্যাং!'

আগের মতো সোঁ সোঁ করে চলতে চলতেই চকা বলে উঠল—

'জোরে চলার নাই কোনও দায়,
আস্তে গেলেই হাঁপ লেগে যায়!'

অমনি সব হাঁস একসঙ্গে বলে উঠল—'চলে চল, চলে চল, ভাই, চলে চল।'

চকার কথা মাফিক খোঁড়া হাঁস জোরে চলতে চেষ্টা করতে দু'গুণ হাঁপিয়ে পড়ল; আর সে আস্তে আস্তে ক্রমে মাঠের ধারে ধারে নারকোল গাছের প্রায় মাথা পর্যন্ত নেমে পড়বার মতো হল। তখন সেথো হাঁসরা আবার ডাক দিলে—'চকা নিকোবর—চকা চকা চকা!'

এবার চকা গরম হয়ে বললে—'ক্যোঁন্ কর ভ্যোন্ ভ্যোন্?'

সেথোরা বলে উঠল—'খোঁড়া হাঁস তলিয়ে যায়!'

চকা একবার চেয়েও দেখলে না, যেমন বেগে চলেছিল তেমনই পুরো দমে যেতে যেতে বললে—'বল ওকে হাল্কা হাওয়ায় উঠে আসতে!'

নিচের বাতাস ঠেলা মুশকিল,
ডানা নেড়ে নেড়ে লাগে ঘাড়ে খিল।
উপর বাতাস পাতলা ভারি,
এক ঝাপটে বিশ হাত মারি।

খোঁড়া হাঁস চকার কথায় উপরে উঠবার চেষ্টা করতে লাগল; কিন্তু এবার বাতাস ঠেলে উঠতে বেচারার দম নিকলে যাবার যোগাড় হল।

আবার সেথোরা ডাক দিলে—'চকা! চকা!'

'কেনে? চলতে দিবে না নাকি!'—বলে চকা গোঁ হয়ে উড়ে চলল।

সেথোরা বললে—'খোঁড়া বেচারার প্রাণসংশয়!'

চকা রেগে উত্তর দিলে—

'উড়তে না পারে ঘরে যাক,
খাক-দাক বসে থাক।
কে বলেছে উড়তে ওরে,
ভিড়তে দলে রঙ্গ করে?'

খোঁড়া হাঁসের জানতে বাকি রইল না যে বুনোহাঁসরা কেবল তামাশা দেখবার জন্যে তাকে এতটা সঙ্গে এনেছে—মানস সরোবরে নিয়ে যেতে নয়। আঃ কি আপশোস! ডানা যে তার আর চলছে না। না হলে খোঁড়া হাঁসও যে উড়তে পারে, সেটা একবার বুনো হাঁসদের সে দেখিয়ে দিত। তা ছাড়া এই চকা নিকোবর—এমন হাঁস নেই যে একে জানে না; এই একশ বছরের বুড়ো হাঁস, যার সঙ্গে পয়লা নম্বর হাঁসও উড়ে পেরে ওঠে না, পড়বি তো পড় তারই পাল্লায়! যে চকা পোষা হাঁসকে হাঁসের মধ্যেই ধরে না, লজ্জা পেতে হল কিনা তারই সামনে! এ দুঃখু সে রাখবে কোথায়!

খোঁড়া সবার পিছনে ভাবতে ভাবতে চলল—বাড়ি ফিরবে কি, প্রাণ যায় তবু সমানে বুনো হাঁসের সঙ্গে চলে সে দেখিয়ে দেবে যে সেও জানে উড়তে! রিদয় এই সময় খোঁড়াকে বললে—'সুবচনীর কৃপায় এতদূর এসেছ, আর কেন? এইবার ফের। এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে গিয়ে শেষে দম ফেটে মরবে নাকি! আমি তো ওদের মতলব ভাল বুঝছিনে!'

রিদয় কিছু না বললে, হয়তো খোঁড়া আপনা হতেই বাড়িমুখো হত; কিন্তু এই বুড়ো আংলা, এও ভাবছে তাকে কমজোর! খোঁড়া বিষম রেগে ধমকে উঠল—'ফের কথা কইলে মাটিতে ঝেড়ে ফেলে চলে যাব।' বলেই রেগে ডানা আপসে খোঁড়া এমনি তেড়ে উড়ে চলল যে বুনোহাঁসরাও একেবারে অবাক হয়ে গেল। রাগের মুখে গোঁ-ভরে যেমন তেজে খোঁড়া চলেছিল, রাগ পড়লে সে তেজ থাকত কিনা সন্দেহ। কিন্তু ঠিক সেই সময় সূর্য পাটে বসতে চললেন। দেখতে দেখতে বেলা পড়ে এল। অমনি হাঁসরা সবাই জমিমুখো হয়ে ঝুপঝাপ আকাশ থেকে চাঁদপুরের সামনে মেঘনার মাঝে বাগদি চরে নেমে পড়ল। চরে উড়ে বসতেই রিদয় হাঁসের পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ল।

তখন চরের উপর থেকে সবেমাত্র জল সরে গেছে, ভিজে কাদা তখনও কালো প্যাচ প্যাচ করছে—মাঝে মাঝে ডোবায় এখনও জল বেধে আছে। এবড়ো খেবড়ো ভাঙাচোরা পিছল চর; খানা, ডোবা, নালা, এখানে-ওখানে, এরই উপরে সন্ধ্যের হিম হাওয়া বইছে। রিদয়ের গা কাঁটা দিয়ে উঠল শীতে। নদীর কিনারায় যেদিকে হাঁসরা নেমেছে, সে দিকে খানিক জঙ্গল অন্ধকারে কালো দেখাচ্ছে। জঙ্গল ছাড়িয়ে খোলা মাঠ, সে দিকে মানুষ কি গরু কিছুই নেই। চারদিক সুনসান! মেঘনার মাঝে লাল ফানুসের মতো রাঙা সূয্যি পশ্চিম আকাশে রামধনুকের রঙ টেনে দিয়ে আস্তে আস্তে জলে ডুবছে।

রিদয়ের মনে হল যেন কোথায় কতদূরে মানুষের বসতি ছেড়ে পৃথিবীর শেষে এসে পড়েছে! বেচারা সমস্ত দিন খেতে পায়নি। তার কেবলই কান্না আসতে লাগল। এই একলা চরে কেউ কোথাও নেই—কোথায় খায়, কোথায় যায়? আর যদি বাঘ আসে, কে তাকে বাঁচায়? আর যদি বিষ্টি আসে, কোথায় যে মাথা গুঁজবে? কোথা রইলেন বাপ-মা, কোথা রইল ঘর-বাড়ি! সূর্য লুকিয়ে গেছেন; জল থেকে উঠছে কুয়াশা; আকাশ থেকে নামছে অন্ধকার; চারদিকে ঘনিয়ে আসছে ভয়! ও ধারে বনের তলাটা যেন নিঝুম হয়ে আসছে। ঝিমঝিম সেখানে ঝিঁঝি ডাকছে, আর লতায়-পাতায় খুসখুস শব্দ উঠছে।

রিদয়ের মনে আকাশে উঠে যে ফুর্তিটা হয়েছিল, এখানে নেমে সেটুকু একেবারে নিভে গেল। এখন এই হাঁসগুলো ছাড়া সঙ্গী আর কেউ নেই। রিদয় দেখলে সুবচনীর হাঁস একেবারে কাবু হয়ে পড়েছে। বেচারা মাটিতে পা দিয়েই শুয়ে পড়েছে! কাদার উপর গলা বাড়িয়ে দুই চোখ বুজে সে কেবলই জোরে জোরে শ্বাস টানছে—যেন আধমরা!

রিদয় তার সঙ্গের সাথী খোঁড়া হাঁসকে বললে—'একটু জল খেয়ে নাও—এই তো দু'পা গেলেই নদী!' কিন্তু খোঁড়া সাড়াশব্দ দিলে না। রিদয় আর এখন দুষ্টু নেই। এই খোঁড়া হাস এখন আর শুধু হাঁস নয়—তার বন্ধু, সাথী সবই। সে আস্তে আস্তে তার গলাটি ধরে উড়িয়ে জলের ধারে নিয়ে চলল। রিদয় ছোট, হাঁস বড়; প্রাণপণে সে হাঁসকে টেনে নিয়ে জলের কাছে নামিয়ে দিলে। হাঁস জলে-কাদায় খানিক মুখ ডুবিয়ে চুক চুক করে জল খেয়ে নিয়ে গা-ঝাড়া দিয়ে জলে নেমে শর-বেণার ঝাড় ঠেলে সাঁতরে সাঁতরে খাবারের সন্ধান করতে লাগল।

বুনোহাঁসগুলো নেমেই জলে গিয়ে পড়েছিল; খোঁড়া হাঁসের কোনও খবরই নেয়নি; দিব্যি চান করে ডানা

ঝেড়ে গুগলি-শামুক শাকপাতা খেয়ে বেড়াচ্ছে। রিদয়ের হাঁস জলে নেমেই সুবচনীর কৃপায় একটা পাঁকাল মাছ পেয়ে গেল। সে সেইটে মুখে নিয়ে ডাঙায় এসে রিদয়ের কাছে ফেলে দিয়ে বললে—'এই নাও, মাছটা তোমায় দিলুম। আমার যে উপকার করেছ, তা চিরদিন মনে থাকবে। খেয়ে নাও মাছটা!'

হাঁসের কাছে দু'টো মিষ্টি কথা পেয়ে রিদয় একেবারে গলে গেল। তার মনে হল সেই খোঁড়া হাঁসের গলা ধরে তার দু'ঠোঁটে দু'টো চুমু খায়। রিদয় কাদা থেকে মাছটি তুলে একবার ভাবলে—রাঁধি কিসে? অমনি মনে পড়ল—সে যে এখন আর মানুষ নেই, যক হয়েছে; হয়তো কাঁচা মাছ খেতে পারবে। রিদয়ের ট্যাঁকে এটা-ওটা কাটতে একটা ছুরি থাকত; সে সেইটে টেনে বার করে মাছটা কুটতে বসল। ছুরিটা এখন একটা খড়কে কাঠির মতো ছোট হয়ে গেছে, কিন্তু তাতেই কাজ চলে গেল। মাছটা ছোট ছোট করে বানিয়ে কতক কতক হাঁসকে খাইয়ে দিয়ে নিজে খেতে বসল। তার যকের মুখে কাঁচা মাছ নেহাত মন্দ লাগল না। রিদয়ের খাওয়া হলে খোঁড়া তাকে চুপি চুপি বললে যে চকা নিকোবরের দল পোষা হাঁসকে হাঁসের মধ্যে গণ্য করে না। রিদয় চুপি চুপি বললে—'তা তো দেখতে পাচ্ছি।'

খোঁড়া হাঁস গলা ফুলিয়ে বললে—'মজা হয় যদি একবার এদের সঙ্গে সমানে আমিও মানস সরোবর পর্যন্ত উড়ে যেতে পারি। পোষা হাঁস কি করতে পারে তবে ওরা টের পায়।'

'তা তো বটেই!' বলে রিদয় চুপ করলে।

খোঁড়া বলে চলল—'আমার মনে হয় একলা আমি অতটা যেতে পারি কি না! কিন্তু তুমি যদি সঙ্গে চল, তবে আমি সাহস করি।'

রিদয় ভেবেছিল এখান থেকেই সে বাড়ি ফিরবে। কিন্তু হাঁসের ইচ্ছে শুনে সে একটু তা-না-না করে বললে—'দ্যাখো, আমার সঙ্গে তোমার বনবে কি? আমি তোমাকে আগে কত জ্বালাতন করেছি।' কিন্তু রিদয় দেখলে হাঁস আগের কথা ভুলে গেছে, রিদয় যে তার প্রাণ বাঁচিয়েছে—জল খাইয়ে যত্ন করে, সেই কথাই সে খোঁড়া হাঁস মনে রেখেছে। একবার বাপ-মায়ের কথা তুলে রিদয় হাঁসকে বাড়ি ফেরাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু হাঁস বললে—'কোনও ভাবনা নেই, আসছে শীতে তোমায় আমি ঠিক বাড়িতে পৌঁছে দেব। তোমাকে ঘরের দরজায় নামিয়ে দিয়ে তবে আমার ছুটি। তার মধ্যে তোমায় একলা ছেড়ে আমি কোথাও নড়ব না—প্রতিজ্ঞা করছি!'

রিদয় ভাবছে—মন্দ না! এই যক হয়ে মা-বাপের কাছে এখন না যাওয়াই ভাল! কি জানি, মানস সরোবর থেকে হয়তো কৈলাসেও গণেশের সন্ধান করা যেতে পারবে। এই ভেবে রিদয় খোঁড়া হাঁসকে জবাব দেবে এমন সময় পিছনে অনেকগুলো ডানার ঝটাপট শোনা গেল! এক কুড়ি বুনোহাঁস একসঙ্গে জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে গায়ের জল ঝাড়ছে। তারপর মাঝে চকা নিকোবরকে রেখে সারিবন্দী সব হাঁস তাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। খোঁড়া হাঁস বুনোহাঁসদের চেহারা দেখে একটু ভয় খেলে। সে ভেবেছিল হাঁস মাত্রে পোষা হাঁসের মতো দেখতে; আর ধরন-ধারণও সেই রকম। কিন্তু এখন দেখলে বুনোহাঁসগুলো বেঁটে-খাটো গাঁট্টা-গোট্টা কাঠখোট্টা গোছের। এদের রঙ তার মতো সাদা নয়, কিন্তু ধুলোবালির মতো ময়লা, পালক এখানে খয়েরি, ওখানে খাকির ছাপ। আর তাদের চোখ দেখলে ভয় হয়—হলুদ বর্ণ—যেন গুলের আগুন জ্বলছে! খোঁড়া বরাবর দেখে এসেছে হাঁস চলে হেলতে-দুলতে—পায়ে পায়ে; কিন্তু এরা চলেছে খটমট চটপট—যেন ছুটে বেড়াচ্ছে। আর এদের পাগুলো বিশ্রী—চ্যাটালো, কেঠো কেঠো, ফাটা-চটা—হতকুৎসিত! দেখলেই বোঝা যায় যেখানে-সেখানে শুধু পায়ে এরা ছুটে বেড়ায়—জল কাদা কিছুই বাছে না। তাদের ডানার পালক, গায়ের পালক, ল্যাজের পালকগুলো পরিষ্কার ঝকঝক করছে বটে কিন্তু ধরন-ধারণ দেখলে বোঝা যায় এগুলো একেবারে বুনো আর জংলি! খোঁড়া তাড়াতাড়ি রিদয়কে সাবধান করে দিলে—যেন সে কে, কি বৃত্তান্ত, এ সব কথা বুনোহাঁসদের না বলে। তারপর সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে গেল। চকা নিকোবর, খোঁড়া হাঁস আর বুনোহাঁসদের মধ্যে খানিকক্ষণ ঘাড় নেড়ে নমস্কার প্রতি নমস্কার চলল। তারপর চকা শুধোলে—'এখন বল তো তোমরা? কোন জাতের পাখি?''

খোঁড়া আস্তে আস্তে বললে—'কি আর পরিচয় দেব? গেল বছর ফাল্গুন মাসে হরিংঘাটায় আমি ডিম ভেঙে বার হই। জন্মাবধি পা-টা খোঁড়া। এই শীতে আমতলির হাটে আমি বিকোতে আসি; সেখান থেকে রিদয়ের বাপ আমায় সাত সিকেতে কিনে আনে; তারপর তোমাদের দলে ভিড়েছি।'

চকা নিকোবর নাক তুলে বললে—'তুমি তবে নেহাৎ সাধারণ হাঁস দেখছি! খেতাব, মানসম্ভ্রম, বোলবোলা—কিছুই নেই! কোন সাহসে আমাদের দলে আসতে চাও শুনি?'

খোঁড়া হাঁস খোঁড়া পা-টা নাচিয়ে বললে—'আমি দেখাতে চাই যে সাধারণ হাঁসও কাজের হতে পারে।'

চকা হেসে বললে—'সত্যি নাকি? কই, দেখাও দেখি কেমন কাজের কাজি তুমি?'

এক হাঁস অমনি বললে—'ওড়ার কাজে কেমন যে মজবুত তা তো দেখিয়েচ!'

অন্যে বললে—'হয়তো তুমি সাঁতারে পাকা।'

খোঁড়া ঘাড় নেড়ে বললে—'না, আমি সাঁতারু মোটেই নয়। আমি বর্ষার সময় নালাগুলো এপার-ওপার করতে পারি, তার বেশি নয়।' খোঁড়া হাঁস ভাবছিল, চকা তো তাকে আমতলিতে ফিরে পাঠাবেই স্থির করেছে, তবে কেন মিছে-কথা বলা? পষ্ট জবাব দেওয়াই ভাল—যা থাকে কপালে!

চকা শুধোলে—'সাঁতার জান না, তবে দৌড়তে মজবুত বোধহয়?' বলেই চকা একবার তার খোঁড়া পায়ের দিকে চেয়ে চোখ মটকালে।

খোঁড়া হাঁস গম্ভীর হয়ে বললে—'রাজহাঁস কোনও দিন ছুটে চলে না, তাই ছোটা আমার অভ্যেসই হয়নি।' বলে সে খোঁড়া পা আরও খুঁড়িয়ে রাজহাঁস কেমন চলে একবার দেখিয়ে দিলে। তার মনে হচ্ছিল এইবার চকা বললে বুঝি—'তোমায় আমাদের দরকার নেই, ঘরে যাও।' কিন্তু ঠিক তার উল্টোটা হল। চকা নিকোবর দু'চারবার ঘাড় নেড়ে বলল—'তুমি তো বেশ সাফ সাফ জবাব দিলে—একটু ভয় না করে! ভাল, ভাল, তোমার সাহস আছে—সময়ে লায়েক হতে পারবে—'বুকের পাটা শক্ত, সকল কাজে পোক্ত'। দু'দিন এ দলে থাকো, দেখি তোমার হিম্মত কতটা, তারপর যা হয় বিবেচনা করা যাবে। কি বল?'

খোঁড়া হাঁস মাথা নেড়ে বললে—'আমি তো তাই চাই। এতেই আমি খুশি!'

এইবার চকা-নিকোবর বুড়ো আংলা রিদয়ের দিকে ঠোঁট বাড়িয়ে বললে—'একি, এ কোন জানোয়ার? ভারী তো অদ্ভুত!'

খোঁড়া হাঁস তাড়াতাড়ি বললে—'এটি আমার দেশের লোক, হাঁস চরাবার কাজ করে, সঙ্গে থাকলে কাজে লাগতে পারে।'

চকা নাক তুলে উত্তর করলে—'বুনোহাঁসের কোন কাজে লাগবে না—পোষা হাঁসের কাজে লাগবে বটে! ওর নাম কি?'

মানুষের নাম বললে পাছে বুনোহাঁসরা ভয় খায়, সেইজন্যে খোঁড়া হাঁস অনেক ভেবে বললে—'এর নাম অনেকগুলো! আমরা ওকে ডাকি বুড়ো আংলা বলে। আঃ বড় ঘুম পাচ্ছে।' বলেই খোঁড়া দু'বার হাই তুলে চোখ বুজলে; পাছে চকা আর কিছু প্রশ্ন করে তাই খোঁড়া আগে থাকতেই সাবধান হচ্ছে—'মাগো, চোখ আপনা হতেই ঢুলে আসছে! চলরে বুড়ো আংলা ঘুমোবি চল।'

চকা নিকোবর বড় পাকা হাঁস; বুড়ো হয়ে তার মাথা থেকে ল্যাজের পালক পর্যন্ত রূপোর মতো সাদা হয়ে গেছে; মাথাটা যেন চুনের হাঁড়ি; পা দু'টো যেন চ্যালা কাঠ—বাঁকা, ফাটা-চটা; ডানা দু'টো যেন দু'খানা ঝরঝরে বাঁশের কুলো; ঠোঁট ভোতা; গলা ছিনেপড়া; কিন্তু চোখ এখনও জোয়ান হাঁসের চেয়েও ঝকঝকে—যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে! চকা দেখলে খোঁড়া পাশ কাটাবার চেষ্টায় আছে, সে এগিয়ে এসে বুক ফুলিয়ে খোঁড়াকে বললে—'আমি কে, জান তো? আমার নাম—চকা নিকোবর! আর এই আমার ডাইনের হাঁস দেখছ, ইনি আমার ডান হাত বললেও চলে, এঁর নাম পাঁপড়া নানকৌড়ি! আর এই আমার বাঁ হাত, এঁর নাম নেড়োল কাটচাল। তারপর ডাইনে হলেন লালসেরা আণ্ডামানি; বাঁয়ে হলেন—চোকধলা ডানকানি। তারপরে পাটাবুকো হামস্ত্রি, মারগুই চাপড়া, তিরশুলী আকায়ব, সনদ্বীপের বাঙাল, ধন মানিকের কাওয়াজি, রাবণাবাদের রাজহাঁস, রায় মঙ্গলার ঘেংরাল, চব্বিশ পরগনার সরাল। আরও ডাইনে-বাঁয়ে দেখ—লুসাই, তিব্বতি, তাতারি—এমনি সব বড় বড় খেতাবি হাঁস—কেতাবে যাদের নাম উঠেছে! আমরা কি যার তার সঙ্গে আলাপ করি, না যাকে তাকে দলে ভিড়তে দিই? আমাদের সঙ্গে যদি ওঠাবসা করতে চাও তো স্পষ্ট করে ওই বুড়ো আংলাটির গাঁইগোত্তর পদবি উপাধি বল, নয়তো নিজের পথ দেখ।'

চকার দেমাক দেখে রিদয় আর চুপ করে থাকতে পারল না; সে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে এসে বলল—'আমার নাম ছিল—ছিযুক্ত রিদয়নাথ পুততুণ্ড, ফুলুরি গাঁই, কাশ্যপ গোত্র—পুষ্যিপত্র; ডিহি বাখরগঞ্জ, মোকাম আমতলি—হাঁসপুকুর, তেঁতুলতলা। জাতে আমি মানুষ ছিলেম, সকলে এখন—' আর বলতে হল না; মানুষ শুনেই চকা নিকোবরের দল দশহাত পিছিয়ে গিয়ে গলা বাড়িয়ে খ্যাঁক খ্যাঁক করে বললে—'যা ভেবেছি তাই! সরে পড়। মানুষ আমরা দলে নিইনে। ভারী বজ্জাত তারা!'

খোঁড়া হাঁস আমতা আমতা করে বললে—'এইটুকু মানুষ, ওকে আবার ভয় কি? কাল ও তো আপনিই বাড়ি চলে যাবে; আজ রাতটা এখানে থাক না! এইটুকু টিকটিকির মতো ওকে এই অন্ধকারে শেয়াল কুকুরের মুখে ছেড়ে দেওয়া তো চলে না। তা ছাড়া ও আর মানুষ নেই—যক হয়ে গেছে!'

চকা 'যক' শুনে সাহস পেয়ে এগিয়ে এসে বললে—'বাপু, মানুষ জাত খারাপ, বরাবর দেখে এসেছি। ওদের বিশ্বাস নেই। তবে তুমি যদি জামিন থাক, তবে রাতের মতো ওকে আমরা থাকতে দিই। এই হিমে চড়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে যদি অসুখে পড়ে, তার দায়ী আমরা হব না—এই বেলা বুঝে দেখ!'

খোঁড়া হাঁস পিছোবার পাত্র নয়; সে বললে—'সে ভয় নেই। চড়ায় এক রাত কেন, সাত রাত কাটালেও ওর কিছু হবে না। এমন সৎসঙ্গ, ভাল জায়গা বনে আর পাবে কোথা? ওর বড় জোর কপাল যে চকা নিকোবরের সঙ্গে এ চরে শুতে পেয়েছে! চকার বাছা বাগদি চর; এতে শুয়ে আরাম কর।' বলে খোঁড়া রিদয়কে চোখ টিপলে!

চকা খোশামোদে খুশি হয়ে বললে—'তাহলে কাল কিন্তু ওর বাড়ি ফেরা চাই—কেমন?'

খোঁড়া বললে—'ওর সঙ্গে তাহলে আমাকেও ফিরতে হয়। আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি—ওকে ছাড়ব না!'

চকা-নিকোবর উত্তর দিলে—'তুমি যেমন বোঝো। ইচ্ছে হয় আমাদের সঙ্গে থাকতে পার, ইচ্ছে হয় ফিরতে পার।' এই বলে চকা চরের মধ্যিখানে উড়ে বসল।

একে একে বুনোহাঁস চরে গিয়ে ডানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়েছে। খোঁড়া হাঁস রিদয়ের কানে কানে বললে—'চরে বড় হিম; যত পার শুকনো ঘাস কুড়িয়ে নিয়ে আমার সঙ্গে এসো।' রিদয় দু'বোঝা শুকনো কুটোকাটা হাঁসের পিঠে দিয়ে চেপে বসল। হাঁস তাকে চরের একটা গর্তে নামিয়ে বললে—'ঘাসগুলো বালির উপর বিছিয়ে দাও; আমি ওর উপর বসি, তুমি আমার ডানার মধ্যে ঢুকে পড়, আর ঠাণ্ডা লাগবে না।' রিদয়কে ডানার মধ্যে নিয়ে সুবচনীর খোঁড়া হাঁস—'এই আমায় তুমি আরামে রাখ আমি তোমায় গরমে রাখি—' বলে খড়ের উপরে আরামে বসে ঘুম দিতে লাগল। রিদয়ের মনে হল সে পালকের তোশকে শুয়েছে। সেও একটিবার হাই তুলেই চোখ বুজলে।

শৃগাল

মেঘনার মোহানায় চর যে কখন কোথায় পড়ে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আজ যেখানে জল, কাল সেখানে দেখা গেল চড়া পড়ে বালি ধু ধু করছে; কাল যেখানে দেখেছি চরে উলু ঘাস বালুহাঁস; বছর ফিরতে সেখানে দেখলেম চরও নেই, হাঁসও নেই—অগাধ জল থই থই করছে! একরাতের মধ্যে হয়তো নদীর স্রোত ফিরে গেল—জলের জায়গায় উঠল বালি, বালির জায়গায় চলল জল।

বাগদি চরে হাঁসেরা যখন উড়ে বসল, তখন চরের চারদিকে জল—ডাঙা থেকে না সাঁতরে চরে আসা মুশকিল। অপার মেঘনার বুকে এক টুকরো ময়লা গামছার মতো ভাসছিল চরটি, কিন্তু রাত হতেই জল ক্রমে সরতে লাগল, আর দেখতে দেখতে সরু এক টুকরো চড়া ডাঙা থেকে বাগদি চর পর্যন্ত, একটি সাঁকোর মতো দেখা দিলে।

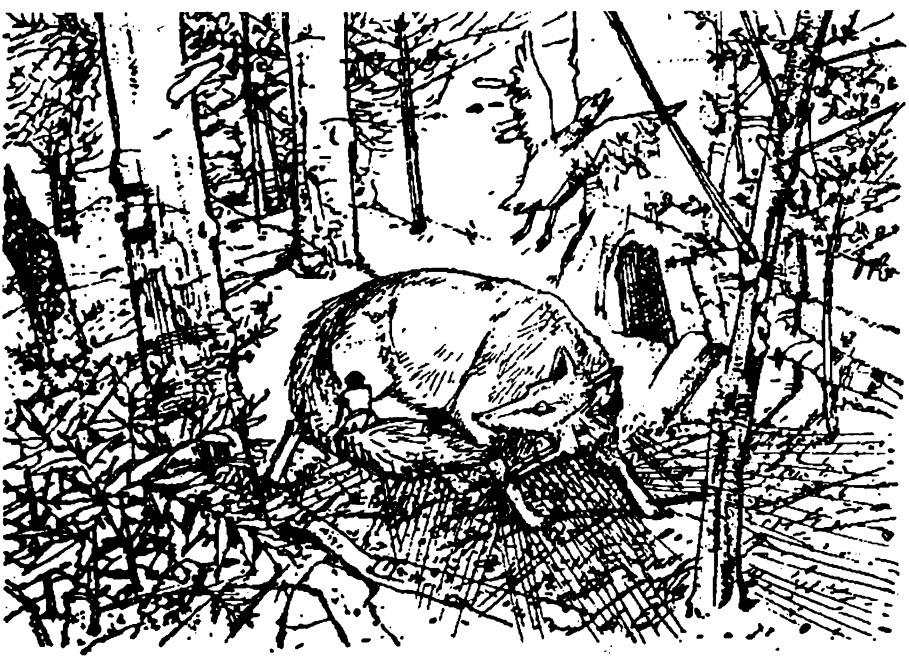
চাঁদপুরের জঙ্গলে বসে খেঁকশিয়ালি হাঁসের দলের উপরে নজর রেখেছিল; কিন্তু চকা নিকোবরকে সে চেনে; এমনি বেছে বেছে নিরাপদ জায়গায় চকা তার দল নিয়ে রাত কাটাত যে এ পর্যন্ত তার দলের একটি হাঁস শেয়ালে ধরতে পারেনি। মেঘনার পুব তীরের জঙ্গল ভেঙে রাতের বেলায় খেঁকশিয়ালি শিকারে বেরিয়েছে, এমন সময় জলের বুকে কুমিরের পিঠের মতো সরু সেই চরটির দিকে চোখ পড়ল। এক লাফ দিয়ে সে চর ডিঙিয়ে পায়ে পায়ে অগ্রসর হল! খেঁকশিয়ালি প্রায় হাঁসের দলে এসে পড়েছে, এমন সময় ছপ করে একটা ডোবার জলে তার পা পড়ল; অমনি চকা চমকে উঠে ডাক দিলে—"কেও?" আর সব হাঁস ডানা ঝেড়ে উড়ে পড়তে আরম্ভ করলে; সেই অবসরে তীরের মতো ছুটে গিয়ে শেয়াল লুসাই হাঁসের ডানা কামড়ে ধরে হিড়হিড় করে সেটকে ডাঙার দিকে নিয়ে চলল।

সব হাঁসের সঙ্গে ভয় পেয়ে খোঁড়া হাঁসও ডানা ছাড়িয়ে আকাশে উঠল; কেবল রিদয় হাঁসের ডানা থেকে ঝুপ করে মাটিতে পড়ে চোখ রগড়ে চেয়ে দেখলে অন্ধকারে সে একা, আর দূরে একটা কুকুর হাঁস ধরে পালাচ্ছে। অমনি রিদয় হাঁসটা কেড়ে নিতে শেয়ালের সঙ্গে ছুটল। মাথার উপর থেকে খোঁড়া হাঁস, একবার হাঁক দিলে—

'দেখে চল!' কিন্তু রিদয় তখন হই হই করে ছুটেছে। রিদয়ের গলা পেয়ে লুসাই কতকটা সাহস পেলে, কিন্তু বুড়ো আঙুলের মতো ছেলে কেমন করে শেয়ালের মুখ থেকে তাকে বাঁচাবে, এটা তার বুদ্ধিতে এল না। এত দুঃখেও লুসাই-এর হাসি এল। সে প্যাঁক প্যাঁক করে হাসতে হাসতে চলল।

মাথার উপর খোঁড়া হাঁস রিদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে— তার ভয়—পাছে রিদয় খানায় ডোবায় পড়ে হাত-পা ভাঙে। কিন্তু যক হয়ে অবধি খুব অন্ধকার রাতেও যকের মতো রিদয় দেখতে পাচ্ছে। খানাখন্দ লাফিয়ে দিনের বেলার মতো রিদয় সহজে ছুটেছে আর চেঁচাচ্ছে—'ছেড়ে দে বলছি, না হলে এক ইট মেরে পা খোঁড়া করে দেব!' কে তার কথা শোনে? শেয়াল একলাফে চড়া ছেড়ে পাড়ে উঠে দৌড়ে চলল। রিদয়ও চলেছে হাঁকতে হাঁকতে— 'মড়াখেকো কুকুর কোথাকার! ছাড় বলছি, না হলে মজা দেখাব।'

চাঁদপুরের খেঁকশেয়াল যার নাম, আসামের জঙ্গলে হেন পাখি নেই যে তাকে জানে না। সে শহরে গিয়ে কতবার মুরগি, হাঁস ধরে এনেছে। তাকে 'মড়াখেকো কুকুর' বলে এমন সাহস কার? শেয়াল একটু থেমে যেমন ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছে, অমনি রিদয় গিয়ে তার ল্যাজ চেপে পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিলে। মানুষটি বুড়ো আংলা, তার কিলটি কত বড়ই বা? শেয়ালের পিঠে একটা যেন বেদানা-বিচি পড়ল! কিন্তু মানুষের মতো গলার সুর শুনে শেয়াল সত্যি ভয় পেলে; সে ল্যাজ তুলে বনের মধ্যে দিয়ে পালিয়ে চলল; আর রিদয় তার ল্যাজ ধরে টিকটিকির মতো ঝুলতে ঝুলতে চলল—উলু ঘাসের মধ্য দিয়ে গা ঘেঁষড়ে। কাঁকড়ার মতো ল্যাজে কি কামড়ে রয়েছে, সেটা দেখবার শেয়ালের অবসর ছিল না, সে একেবারে নিজের গর্তের কাছে এসে দাঁড়িয়ে, মুখ থেকে হাঁসটা নামিয়ে, সেটার বুকে পা দিয়ে দাঁড়াল, তখন তার চোখে পড়ল ল্যাজে গাঁথা বুড়ো আংলার দিকে! এই টিকটিকির মতো ছেলেটা—ইনি চাঁদপুরী শেয়ালকে জব্দ করবেন, ভেবে শেয়াল ফ্যাক করে মুখ ভেংচে হেসে বলল—"এইবার তোমার মনিবকে খবর দাওগে চাঁদপুরের শেয়াল হাঁস খেয়েছে।'



ছুঁচোলো মুখ, নাটা চোখ দেখে এতক্ষণে রিদয় বুঝলে এটা শেয়াল। কিন্তু শেয়াল তাকে ভেংচেছে, এর শোধ সে দেবেই দেবে! রিদয় আরও শক্ত করে তার ল্যাজ চেপে, দুই পায়ে একটা গাছ আঁকড়ে, যেমন শেয়াল হাঁ করে হাঁসটার গলা কাটতে গেছে অমনি পিছনে এক টান দিয়ে, হাঁস থেকে শেয়ালকে দু'হাত তফাতে টেনে নিয়েছে! আর সেই ফাঁকে লুসাই হাঁসও ভাঙা ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়ে পালিয়েছে।

'হাঁস যাক, আজ তোকে খাব!'—বলে খেঁকশিয়ালি দাঁত খিঁচিয়ে রিদয়কে ধরবার জন্যে কেবলই নিজের ল্যাজটার সঙ্গে ঘুরতে লাগল। রিদয়ও ল্যাজ আঁকড়ে চরকি বাজির মতো শেয়ালের সঙ্গে ঘুরতে থাকল, আর বলতে লাগল—'ধর দেখি মড়াখেকো কুকুর!'

বনের মধ্যে শেয়াল-মানুষে চরকিবাজি এমনতর কেউ কোনওদিন দেখেনি। প্যাঁচা, চামচিকে, এমন কি দিনের পাখিরাও তামাশা দেখতে বার হল। রিদয় দেখলে তামাশা ক্রমে শক্ত হয়ে উঠছে—সে নিজে শেয়ালের ল্যাজ ছাড়তে চাইলেও, শেয়াল তাকে সহজে ছাড়ে কিনা সন্দেহ! খেঁকশিয়ালি পাকা শিকারি; তার গায়ের শক্তিও যেমন, বুদ্ধিও তেমনই, সাহসও কম নয়! রিদয় বুঝলে ঘুরে ঘুরে সে নিজে যেমনি হাঁপিয়ে পড়বে অমনি টুপ করে তাকে ধরবে শেয়াল! রিদয় একবার চারদিক চেয়ে দেখলে, হাতের কাছে কোনও বড় গাছ আছে কি না। কাছেই একটা সরু ঝাউ গাছ বন ঠেলে আকাশে সোজা উঠেছে, ঘুরতে ঘুরতে রিদয় সেইদিকে এগিয়ে গেল, তারপর হঠাৎ একসময় শেয়ালের ল্যাজ ছেড়ে একেবারে ঝাউ গাছটার আগ ডালে উঠে পড়ল। শেয়াল তখনও নিজের ল্যাজ কামড়াতে বোঁ বোঁ লাটিমের মতো ঘুরছে। রিদয় গাছের উপর থেকে চেঁচিয়ে বলে :

তাকুড় তাকুড় তাকা!
যাচ্ছে শেয়াল ঢাকা!
থাকে থাকে থাকে
হুক্কাহুয়া ডাকে!
চাঁদপুরের কাঁকড়া-বুড়ি
কামড়েছে তার নাকে!

শেয়াল দেখলে শিকার তাকে ঠকিয়ে পালাল! সে গাছের তলায় হাঁ করে বসে রিদয়ের দিকে চেয়ে বললে—'রইলুম এইখানে বসে, কতক্ষণে নেমে আসিস দেখি! তোকে না খেয়ে নড়ছিনে!' এক ঘণ্টা গেল, দু ঘণ্টা গেল, শেয়াল আর নড়ে না। ঝাউ গাছের সরু ডালে পা ঝুলিয়ে শীতের রাতে জেগে বসে থাকা যে কী কষ্ট আজ রিদয় বুঝলে। শীতে তার হাত-পা অসাড় হয়ে গেছে, চোখ ঢুলে পড়ছে, কিন্তু ঘুমোবার যো নেই—পড়ে যাবার ভয়ে। আর বনের মধ্যে অন্ধকারই বা কত! দু'হাত তফাতে নজর চলে না—মিশকালো ঘুটঘুটে চারিদিক! মনে হল যেন গাছপালা সব শীতে কালো পাথরের মতো পাষাণ হয়ে গেছে! একটি পাখি ডাকছে না, একটি পাতা নড়ছে না—সব নিথর নিঝুম! রিদয়ের মনে হচ্ছে রাত যেন ফুরোতে চায় না!—রিদয় আর না ঘুমিয়ে থাকতে পারে না! এই সময় ভোরের কনকনে বাতাস বইল, আর দেখতে দেখতে ভুসোকালির মতো রাতের রঙ ক্রমে ফিকে হতে হতে মিশি থেকে রাঙা, রাঙা থেকে রুপোলি, রুপোলি থেকে সোনালি হয়ে উঠল। তারপর বনের ওপারে সূর্য উঠলেন। বেলায় উঠত, কাজেই সূর্যকে চিরকাল রিদয় দেখে এসেছে কাঁচা সোনার মতো হলুদ বর্ণ; সূর্য যে ক্ষেপা মোষের চোখের মতো লাল টকটকে, তা তার জ্ঞান ছিল না; তার ঠিক মনে হল কে যেন রাত্তিরের কাণ্ডকারখানা শুনে রেগে তার দিকে চাচ্ছেন!

তারপর গাছের ফাঁকে ফাঁকে সকালের আলো উঁকি মারতে লাগল—বনের গাছপালা জীবজন্তু রাতের আড়ালে আবডালে অন্ধকারে বসে কি কাণ্ড করেছে, তারি খোঁজ নিতে লাগল। বনের তলাকার চোরকাঁটা, শেয়ালকাঁটা, কাটিকুটি, কাঁটাখোঁচা, যা কিছু সব যেন আলোর ধমকে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। ক্রমে মেঘে মেঘে আলো পড়ল—রঙ ধরল—গাছের পাতা, ঘাসের শীষ, ফোটা ফুলের পাপড়ি, তার উপর শিশিরের ফোঁটা—সবই আলোতে ঝলক দিতে থাকল! যেন সবাই সিঁদুর পরে সাটিনের কাপড়ে সেজেছে! ক্রমে চারিদিক আলোতে আলোময় হয়ে উঠল; অন্ধকারের ভয় দেখতে দেখতে কোথায় পালাল; আর অমনি কত পাখি, কত জীবজন্তুই বা বনে ছুটোছুটি আরম্ভ করল! লাল টুপি মাথায় কাঠঠোকরা ঠকাস ঠকাস গাছের ডালে ঘা দিতে বসে গেল, কাঠবেড়ালি অমনি খোপ ছেড়ে গাছের তলায় বসে কুটুস কুটুস বাদাম ছাড়াতে লেগে গেল; গাং শালিক, গো শালিক, ছাতারে গাছের তলায় নেমে শুকনো পাতা উল্টে-পাল্টে কিড়িং ফড়িং ধরে ধরে বেড়াতে লাগল—আগডালে বসে শ্যামা-দোয়েল শিস দিতে আরম্ভ করলে। রিদয়ের মনে হল সূর্য যেন সব পশুপাখি কীটপতঙ্গদের জাগিয়ে দিয়ে অভয় দিতে থাকলেন—রাত পালিয়েছে, তোরা ঘর ছেড়ে বার হ, আমি এসেছি, ভয় নেই!

রিদয় শুনলে মেঘনার চরে হাঁসেরা ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি লাগিয়েছে, দল একত্র হচ্ছে। চকা নিকোবর হাঁকলে—"মানস সরোবর! ধৌলাগিরি! আও আও আও!" তারপর রিদয় দেখলে মাথার উপর দিয়ে নিকোবরের

পুরো দল উড়ে চলল—খোঁড়া হাঁসটি সুদ্ধ! রিদয় তাদের একবার ডাক দিলে কিন্তু এত উপর দিয়ে হাঁসেরা চলেছে যে তার ডাক শুনলে কিনা বোঝা গেল না—উড়তে উড়তে আকাশে মিলিয়ে গেল। রিদয় স্থির করলে হাঁসেরা নিশ্চয়ই দেখেছে শেয়াল তাকে খেয়েছে। সে হতাশ হয়ে আকশে চেয়ে রইল। কিন্তু এত দুঃখেও সকালের আলো আর বাতাস, সে যেখানটিতে বসে আছে সেই ডালটি সোনার রঙে রাঙিয়ে ঝাউপাতার মধ্যে দিয়ে চুপিচুপি তাকে এসে বলতে থাকল—"ভয় কি? দিন হয়েছে—সূর্য উঠেছেন, আমরা থাকতে কিসের ভয়!" ঠিক সে সময় কমলালেবুর রঙের সাজ পড়ে হলুদবর্ণ যে সূর্য আমতলির মাঠে রোজ রোজ রিদয়কে দেখা দিতেন, তিনি চাঁদপুরের জঙ্গলের উপরে দেখা দিলেন।

বেলা প্রায় এক প্রহর। রিদয় গাছের উপরে, শেয়াল নিচে বসে আছে, হাঁসের দলেরও কোনও খবর নেই, যে যার খাবার সন্ধানে বেরিয়ে গেছে। ঠিক যখন বেলা ন'টা, তখন দেখা গেল, বনের মধ্যে দিয়ে একটিমাত্র হাঁস, যেন উড়তেই পারছে না, এইভাবে আস্তে আস্তে চলেছে। খেঁকশিয়ালি অমনি কান খাড়া করে হাঁসের দিকে নাক উঠিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল। হাঁসটা শেয়ালকে দেখেও দেখল না, তার নাকের সামনে দিয়েই উড়ে চলল। হাঁসটাকে ধরবার জন্যে শেয়াল একবার ঝম্ফ দিলে, হাঁস অমনি ফিক করে হেসে, উড়ে গিয়ে চড়ায় বসল। এর পরেই আর এক হাঁস ঠিক তেমনি করে আরও একটু মাটির কাছ দিয়ে উড়ে চলল; শেয়ালটা লাফ দিলে; তার কানের রোঁয়াগুলো হাঁসের পাঁয়ে ঠেকল, কিন্তু ধরতে পারলে না—হাওয়ার মতো হাঁস উড়তে উড়তে চড়ার দিকে চলে গেল। একটু পরে আর এক হাঁস—এটা যেন উড়তেই পারছে না—একেবারে মাটির কাছ দিয়ে ঝাউগাছের গা ঘেঁষে উড়ে চলল। এবারে প্রাণপণে শেয়াল ঝম্ফ দিলে। ধরেছে, এমন সময় হাঁস সোঁ করে তার দাঁতে পালক বুলিয়ে দিয়ে একেবারে মুখের মধ্যে থেকে পালিয়ে গেল। এবার যে এল, সে এমনি বেকায়দায় লটপট করে উড়ে আসছে যে খেঁকশিয়াল ভাবলে—একে তো ধরেছি! কিন্তু বারবার তিনবার ঠকে শেয়াল বিরক্ত হয়ে উঠেছে, সে হাঁসের দিক থেকে মুখটা ফিরিয়ে গোঁ হয়ে রইল। যে পথে আগের তিনটে হাঁস গেছে, এটাও সেই পথ ধরে ঝাউতলায় এসে শেয়ালের এত কাছ দিয়ে চলল যে শেয়াল আর থির থাকতে না পেরে দিয়েছে লাফ এমন জোরে যে তার ল্যাজটা ঠেকল হাঁসের পিঠে। কিন্তু হাঁসও পাকা—সে সাঁ করে শেয়ালের পেটের নিচে দিয়ে গলে তার ঝাঁটার মতো ল্যাজে ডানার এক থাপ্পড় বসিয়ে হাসতে হাসতে চম্পট দিলে। শেয়ালের আর দম নেবার সময় হল না, ঝপ ঝপ করে আরও গোটা পাঁচেক হাঁস নাকের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল, একটাকেও সে ধরতে পারলে না—লাফানি-ঝাঁপানি সার হল! এবারে পরপর আবার পাঁচটা হাঁস একে একে শেয়ালকে লোভ দেখিয়ে সজোরে তার পিঠে ডানার বাতাস দিয়ে হোঃ হোঃ করে হাসতে হাসতে একেবারে তার রগ ঘেঁষে চলে গেল—কিন্তু শেয়াল না রাম না গঙ্গা—চুপ করে বসে রইল। সে বুঝেছে চকা নিকোবরের দল কাল রাতে হাঁস নিয়ে যাওয়ার শোধ তুলতে মস্করা লাগিয়েছে।

অনেকক্ষণ আর হাঁসেদের দেখা নেই, শেয়াল ভাবচে তারা গেছে এমন সময় চকা নিকোবর দেখা দিলেন। তার সেই পাকা পালক ছিনে গলা দেখেই শেয়াল তাকে চিনে নিলে। একটা ডানা বেঁকিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এক-কাত হয়ে সে উড়ে এল—একেবারে যেন চলতেই পারে না, এইভাবে। শেয়াল এবারে লাফ দিয়ে নদীর ধার পর্যন্ত হাঁসটাকে তাড়িয়ে গেল; কিন্তু হাঁস যেন ধরা দিয়েও ধরা দিলে না; সোজা গিয়ে চরে বসে প্যাঁক প্যাঁক করে হেসে উঠল। শেয়াল একেবারে লজ্জায় লাল হয়ে জঙ্গলের দিকে ফিরে দেখলে—এবারে চমৎকার ধবধবে মোটাসোটা রাজহাঁস তার দিকে উড়ে আসছে। বনের অন্ধকারে তার ডানা দু'খানা যেন রুপোর মতো ঝকঝক করছে। এবারে শেয়ালের নোলা সকসক করে উঠল। সে এমন লাফ দিলে যে ঝাউ গাছের পাতাগুলো তার গায়ে খোঁচা মারলে, কিন্তু খোঁড়া রাজহাঁস ধরা পড়ল না—সোজা ঝাউগাছ ঘুরে চড়ায় গিয়ে উঠল।

এরপরে আর হাঁসের সাড়াশব্দ নেই; সব চুপচাপ। শেয়াল ঝাউগাছের দিকে চেয়ে দেখলে, ছেলেটাও সেখান থেকে সরে পড়েছে। শেয়াল ফ্যালফ্যাল করে চারদিকে চাইছে এমন সময় চড়ার দিক থেকে একে একে হাঁস সব আগেকার মতো তাকে লোভ দেখিয়ে উড়ে চলল। কিন্তু শেয়ালের তখন মাথার ঠিক নেই; সে পাগলের মতো কেবল ঝাঁপাঝাঁপি লাফালাফি করতে থাকল আর কেবলই হাঁস তার নাকের সামনে দিয়ে যেতে থাকল—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, দশ-পনের, কুড়ি, বাইশ! শেয়াল তাদের একটি পালক পর্যন্ত ছিঁড়ে নিতে পারলে না। শেয়াল এমন নাকাল কখনও হয়নি। চাঁদপুরের শেয়াল সে, কতবার গুলির মুখ থেকে মুরগি-হাঁস শিকার করেছে তার ঠিক নেই—শেয়ালের রাজা বললেই হয়—কিন্তু এই শীতকালে হাঁস শিকার করতে আজ তার ঘাম

ছুটে গেল! সারাদিন ধরে মোটাসোটা চিকচিকে হাঁস দলে দলে তার নাকের উপর দিয়ে যাওয়া আসা করছে, অথচ একটাকেও সে ধরে খিদে মেটাতে পারছে না। সবচেয়ে তার লজ্জা—মানুষটাও তাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে। আর তার দুর্দশার কথা সেই পোষা রাজহাঁসটাও জেনে গেল! দেশে দেশে নিশ্চয়ই তারা চাঁদপুরের খেঁকশিয়ালের কীর্তিকাহিনী রাষ্ট্র করে দেবেই দেবে।

ভোরে এই শেয়ালের গা চিকচিকে, ল্যাজ মোটা, রোঁয়াগুলো কেমন যেন সাটিনের মতো খয়েরি-কালো-সাদা ঝকঝক করছিল; কিন্তু বিকেলে তার পেটের চামড়া ঝুলে পড়েছে, গা ধুলোয়-ঘামে কাদা হয়ে গেছে, চোখ ঝিমিয়ে পড়েছে, জিব চার-আঙুল বেরিয়ে পড়ে মুখে গোটানাল ভাঙছে। তাকে দেখে কে বলবে সকালের সেই দুরন্ত শেয়াল! সারাদিন ধরে কেবলই উড়ে উড়ে হাঁসের দল তাকে এমনই নাকাল করেছে যে, বেচারা শেয়াল একেবারে হয়রান হয়ে পড়েছে! তার মাথার আর ঠিক নেই; কেবলই দেখছে যেন চোখের সামনে হাঁস ঘুরছে। সে গাছের তলায় সূর্যের আলো দেখে ভাবছে হাঁস; প্রজাপতি উড়লে হাঁস বলে লাফিয়ে ধরতে যাচ্ছে! যতক্ষণ দিনের আলো রইল চকা নিকোবরের দল কিছু দয়ামায়া না করে শেয়ালকে হয়রান করেই চলল। শেয়ালের তখন আর নড়বার শক্তি নেই, সে কেবল মাটির উপরে হাঁসের ছায়াগুলো থাবা দিয়ে দিয়ে আঁচড়াতে থাকল। হাঁসেরা যখন দেখলে শেয়ালটা মড়ার মতো শুকনো পাতার উপরে শুয়ে পড়ে হাঁপাতে লেগেছে, তখন তারা—'কেমন! কেমন! হাঁস ধরবে!' বলতে বলতে চাঁদপুরের জঙ্গল ছেড়ে নালমুড়ির চরের দিকে চলে গেল।

হংপাল

ঝাউগাছের উপর খোঁড়া হাঁস ঠোঁটে করে রিদয়কে বাগদি চরের থেকে একটু দূরে নালমুড়ির চরে নামিয়ে দিয়ে সারাদিন বুনোহাঁসের দলের সঙ্গে শেয়ালকে নিয়ে ঝপ্পটি আর দাঁতকপাটি খেলে বেড়াচ্ছে। ক্রমে সন্ধ্যে হয়ে এল দেখে রিদয় ভাবছে, নিশ্চয়ই হাঁসেরা রাগ করে তাকে ফেলে গেছে, এখন কেমন করে সে বাড়ি যায়? আর কেমন করেই বা ওই বুড়োআংলা চেহারা নিয়ে বাপ-মায়ের সঙ্গে দেখা করে? ঠিক এই সময় মাথার উপর ডাক দিয়ে হাঁসের দল উড়ে এসে নালমুড়িতে ঝুপঝাপ পড়েই জলে নেমে গেল। চরে মেলাই কাছিমের ডিম, রিদয় তারই একটা ওবেলা, একটা এবেলা খেয়ে পেট ভরিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ল। এমনি সে রাত কাটল। ভোর না হতে হাঁসের দল রিদয়কে নিয়ে আবার চলল। রিদয় দেখলে হাঁসেরা তাকে বাড়ি যাবার কথা বললে না। সেও সে কথা চেপে গিয়ে চুপচাপ খোঁড়া হাঁসের পিঠে চুপটি করে বসল।

লুসাই হাঁসের ডানাটা শেয়ালের কামড়ে একটু জখম হয়েছে, কাজেই বুনোহাঁসের দল আজ আর বেশি দূরে উড়ে গেল না। গোবরাতলির মাটির কেল্লা 'নুড়িয়া কাসেলের' উপরটায় এসে দেখতে লাগল, সেখানে মানুষ আছে কিনা। সেখানে শিকে গাঁথা ফাটাচটা কতকগুলো মাটির সঙ, পরী, সেপাই—এমনি সব। বাগানে মালি নেই, মালিকও নেই, কেবল একটা ভাঙা ফটকের মার্বেল পাথরে কালি দিয়ে দাগা সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে—'পালদিং অফ নুড়িয়া।' ঠিক তারই নিচে একটা ভাঙা পিপের মধ্যে বসে একটা রোগা, কানা দেশি কুকুর পোড়ো কেল্লায় পাহারা দিচ্ছে!

বুনোহাঁসেরা আকাশ থেকে শুধোলে—'ছপ্পড়টা কার? ছপ্পড়টা কার?'

কুকুরটা অমনি আকাশে নাক তুলে চেঁচিয়ে উঠল, ভেউ ভেউ করে বললে—'ছপ্পড় কি? দেখছ না এটা নুড়িয়ার কেল্লা—পাথরে গাঁথা? দেখছ না কেল্লার বুরুজ, তার উপর ওই গোলঘর—সেখানে কামান বসাবার ঘুলঘুলি, নিশেন ওড়াবার দাণ্ডা। গবাক্ষ, বাতায়ন, দরশন দরওজা। এ সব দেখছ না!'

হাঁসেরা কিছুই দেখতে পেল না—না কামান, না ঘুলঘুলি, না গবাক্ষ, না বাতায়ন। কেবল একটা চিলের ছাদে একটা আকাশ-পিদিম দেবার বাঁশ দেখা গেল, তাতে এক টুকরো গামছা ছেঁড়া লটপট করছে! হাঁসেরা হো হো করে হেসে বললে—'কই? কই?'

কুকুরটা আরও রেগে বললে—'দেখছ না, কেল্লার ময়দান যেন গড়ের মাঠ! দেখছ না কেলিকুঞ্জ—সেখানে রানি থাকেন। দেখ ওই হাম্মাম, সেখানে গোলাপজলের ফোয়ারা। দেখতে পাচ্ছ না বাগ-বাগিচা, আম-খাস, দেওয়ান-খাস?' হাঁসেরা দেখলে, পানা পুকুর, লাউ-কুমড়োর মাচা—এমনি সব, আর কিছু নেই।

কুকুর আবার চেঁচিয়ে বললে—'ওই দেখ ওদিকে গাছঘর, মালির ঘর; আর এই সব সুরকি পাতা রাস্তার ধারে ধারে পাথরের পরী, গ্যাস লাইটের থাম, বাঁধাঘাট, বারদোয়ারি নাটমন্দির। এ সব কি চোখে পড়ছে না যে

বলছ ছপ্পড় কার? ছপ্পড়ে কখনও কেলিকানন, পুষ্পকানন, কামিনীকুঞ্জ থাকে? না, পাথরের পরী, ঘাটের সিঁড়ি থাকে? ওই দেখ রাজার কাচারি, ওই হাতিশাল, ঘোড়াশাল, তোষাখানা। এ সব কি ছপ্পড়ে থাকে? ছপ্পড় কখনও দেখেছ? ছপ্পড় দেখতে হয় তো ও পাড়ার ওই জমিদারগুলোর বাড়ি দেখে এস। আমার মনিব কি জমিদার? এরা মুর্ধাভিষিক্ত। লেখাপড়ার ধার দিয়েও যায় না। ঘোড়া-রোগে এদের সবাই মরেছে। সেকালে এরা চিনের রাজা ছিল। এখনও দেখছ না ফটকে লেখা—'পালদিং অফ নুড়িয়া!' এই ছপ্পড়ের নহবতখানার চুড়ো দশক্রোশ থেকে দেখা যায়—এমনি ছপ্পড় এটা!'

কানা কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে থামলে হাঁসেরা হাসতে হাসতে বললে—'আরে মুখ্যু, আমরা কি তোর রাজার কথা, না রাজবাড়ির কথা, না মাটির কেল্লার কথা শুধোচ্ছি? এই ভাঙা ফটকের ধারে পোড়ো বাগানে ভাঙা মদের পিপেটা কার তাই বল না!' এমনি রঙ তামাশা করতে করতে হাঁসেরা নুড়িয়া ছাড়িয়ে সুরেশ্বরে—যেখানে প্রকাণ্ড ঠাকুরবাড়ির ধারে সত্যিকার বাগ-বাগিচা, দিঘি-পুষ্করিণী, ঘাট-মাঠ রয়েছে, সেইখানে কুশঘাসের গোড়া খেতে নামল। ও দিকে মেঘনা, এ দিকে পদ্মা— এই দুই নদী যেখানে মিলেছে, সেই কোণটিতে হল সুরেশ্বর মঠ। চারদিকে আমবাগান, জামবাগান, ঠাকুরবাড়ি, অতিথিশালা, ভোগ মন্দির, দোলমঞ্চ, আনন্দবাজার, রথতলা, নাটমন্দির, রন্ধনশালা, ফুলবাগান, গোহাল-গোষ্ঠ, পঞ্চবটী, তুলসীমঞ্চ, রাসমঞ্চ, রামকুণ্ড, সীতাকুণ্ড, গোলকধাম, দেবদেবীস্থান—এমনি একটা পরগনা জুড়ে প্রকাণ্ড ব্যাপার! এরই এককোণে বন আর মাঠ। সেইখানে হাঁসেদের সঙ্গে রিদয় নেমেছে। কেন যে এত বেলা থাকতে এখানে হাঁসেরা এসে আড্ডা গেড়ে বসল, রিদয় তা বুঝলে না, ভেবেও দেখলে না, নিজের মনে বনে বনে ঘুরে পাতবাদাম আর শাকপাতা কুড়িয়ে ছায়ায় খেলে বেড়াতে লাগল।

লুসাই হাঁসের ডানা ভাল হওয়া পর্যন্ত হাঁসেরা সেখানে অপেক্ষা করবার মতলব করেছে! একদিন খোঁড়া হাঁস দু'টো শোল মাছের ছানা এনে রিদয়কে দিয়ে বললে—"খেয়ে ফেল। মাছ না খেলে রোগা হবে।" রিদয় এবারে টপ করে হাঁসের মতো সে দু'টো গিলে ফেললে। তারপর খোঁড়া হাঁসের পিঠে চড়ে নানারকম খেলা চলল। কোনওদিন জলে বুনোহাঁসেদের সঙ্গে সাঁতার খেলা, কোনওদিন দৌড়াদৌড়ি, লুকোচুরি, হাঁসের লড়াই—এমনই সারাদিন ছুটোছুটি চেঁচামেচি! এমন আনন্দে রিদয় জন্মে কাটায়নি। পড়াশুনো সব বন্ধ, একেবারে কৈলাস পর্যন্ত লম্বা ছুটি আর ছুট! খেলা শেষ হলে দু'তিন ঘণ্টা দুপুর বেলায় ধলেশ্বরীর ভাঙনের উপরে বসে জিরোনো; বিকালে আবার খেলা; আবার চান। সন্ধ্যাবেলা খেয়ে নিয়েই ঘুম। রিদয়ের খাবার ভাবনা গেছে, শোবারও কষ্ট মোটেই নেই। খোঁড়া হাঁসের ডানায় এখন বেশ ভাল পালকের গদি পেতে সে বিছানা করে নিয়েছে, ঘুম পেলেই সেখানে ঢোকে। কেবল রাত হলেই তার ভয় আসে, বুঝি কাল সকালে বাড়ি ফিরতে হয়! কিন্তু হাঁসেরা তার ফেরবার কথাই আর তোলে না। একদিন, দু'দিন, তিনদিন হাঁসেরা সুরেশ্বরেই রইল; কোনও দিকে যাবার নামটি করলে না। রিদয়ও মনে ভরসা পেয়ে সুরেশ্বরের মন্দির, মঠ লুকিয়ে দেখে নিতে লাগল—চারদিক ঘুরে। চারদিনের দিন চকা নিকোবরকে কাছে আসতে দেখেই রিদয় ভাবলে—এইবার যেতে হল ফিরে! চকা গম্ভীর হয়ে তাকে শুধোলে—'এখানে খাওয়া দাওয়া চলছে কেমন?'

রিদয় একটু হেসে বললে—'চলছে মন্দ নয়। তবে শীতকাল, ফল বড় একটা নেই।'

চকা তাকে সঙ্গে নিয়ে এক ঝাড় কাঁচা বেত দেখিয়ে বললে—'বেত খেয়ে দেখ দেখি, কেমন মিষ্টি!'

রিদয় বেত অনেকবার খেয়েছিল, আরও খাবার তার মোটেই ইচ্ছে নেই! কিন্তু চকার হুকুমে খেতে হল। খেয়ে দেখে মিষ্টি গুড়! ঠিক যেন আক চিবোচ্ছে!

চকা বললে—'কেমন, ভাল লাগল কি? গুরুমশায় খাওয়ান শুকনো বেত, তাই লাগে বিশ্রী। যাহোক, এখন বলি শোনো। এই বাগানে, বনে যে তুমি আজকাল একলাটি ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করেছ, এটা ভাল হচ্ছে না।'

রিদয় ভাবলে, এইবার যেতে হল রে!

চকা বলে চলল—'এই বনে তোমার কত শত্রু রয়েছে, তা জান? প্রথম হচ্ছে শেয়াল, সে তোমার গন্ধে গন্ধে ফিরছে, সুবিধে পেলেই ধরবে, তারপর ভোঁদড়, ভাম দু'জনে আছে—যেখানে সেখানে গাছের কোটরে ঢুকতে গেলে বিপদে পড়বে কোনদিন! জলের ধারে উদবেড়াল আছে—একলা চান করবার সময় সাবধান! যেখানে সেখানে জড়ো করা পাথরের উপরে বসতে যেও না, তারমধ্যে বেঁজি লুকিয়ে থাকতে পারে। শুকনো পাতা বেছানো জায়গা দেখলেই সেখানে শুতে যেও না; পাতাগুলো নেড়ে, তলায় সাপ কি বিছে আছে কিনা, দেখা

ভাল। মাঠ দিয়ে যখন চল, তখন আকাশের দিকে কি একবার চেয়ে দেখ—সেখানে বাজপাখি, চিল, কাক, শকুনি আছে কিনা? সেটা একবার একবার দেখে চলা মন্দ নয়। ফস করে ঝোপেঝাড়ে উঠতে যেও না; গেরোবাজগুলো অনেক সময় সেখানে শিকার ধরতে লুকিয়ে থাকে। সন্ধ্যা হলে কান পেতে শুনবে, কোনওদিকে পেঁচা ডাকল কিনা। পেঁচারা এমন নিঃশব্দে উড়ে আসে যে টের পাবে না কখন ঘাড়ে পড়ল!'

তার এত শত্রু আছে শুনে রিদয় ভাবলে, বাঁচা তো তাহলে শক্ত দেখছি। সে চকাকে বললে—'মরতে ভয় নেই। তবে শেয়াল কুকুরের কিংবা শকুনের খাবার হতে আমি রাজি নই। এদের হাত থেকে বাঁচবার উপায় কিছু আছে বলতে পার?'

চকা একটু ভেবে বললে—'বনের যত ছোট পাখি আর জন্তু এদের সঙ্গে ভাব করে ফেলবার চেষ্টা কর; তাহলে কাঠঠোকরা, ইঁদুর, কাঠবেড়ালি, খরগোশ, তালচড়াই, বুলবুলি, টুনটুনি, শ্যামা, দোয়েল, এরা তোমায় সময়মতো সাবধান করে দেবে; লুকোবার জায়গাও দেখিয়ে দেবে। আর দরকার হয় তো এই সব ছোট জানোয়ারেরা তোমার জন্যে প্রাণও দিতে পারে।'

চকার কথামতো সেই দিনই রিদয় এক কাঠবেড়ালির সামনে উপস্থিত—ভাব করতে। যেমন দৌড়ে রিদয় সেদিকে যাওয়া, অমনি কাঠবেড়ালির গিয়ে গাছে ওঠা, আর ল্যাজ ফুলিয়ে কিচকিচ করে গালাগালি শুরু করা—'অত ভাবে আর কাজ নেই! তোমাকে চিনিনে? তুমি তো সেই আমতলির রিদয়! কত পাখির বাসা ভেঙেছ, কত পাখির ছানা টিপে মেরেছ। ফাঁদ পেতে, ধামাচাপা দিয়ে কত কাঠবেড়ালি ধরে খাঁচায় পুরেছ, মনে নেই? এখন আমরা তোমায় বিপদ থেকে বাঁচাব? এই ঢের যে বন থেকে আমরা এখনও তোমায় তাড়িয়ে মানুষের মধ্যে পাঠিয়ে দিচ্ছিনে! যাও, আমাদের দ্বারা কিছু হবে না। সরে পড় বাসার কাছ থেকে।'

অন্য সময় হলে রিদয় কাঠবেড়ালিকে মজা দেখিয়ে দিত! কিন্তু এখন সে ভালমানুষ হয়ে গেছে; আস্তে আস্তে হাঁসকে এসে সব খবর জানালে! খোঁড়া হাঁস বললে—'অত দৌড়ে কাঠবেড়ালির কাছে যাওয়াটা ভাল হয়নি। হঠাৎ কিছু একটা এসে পড়লে সব জানোয়ারই ভয় পায়, রাগ করে। যখন জানোয়ারদের কাছে যাবে—সহজে, আস্তে, ভদ্রভাবে যাবে। হুটোপাটি করে কিংবা চুপিচুপি চোরের মতো গেলেই তাড়া খাবে। তোমার স্বভাব একটু ভাল হয়ে এসেছে; এমনই আর দিনকতক ভালমানুষটি থাকলেই, ওরা আপনি তোমার সঙ্গে ভাব করবে। তুমি যদি তাদের উপকার কর, তবে তারাও তোমার সহায় হবে—বনের এই নিয়ম জেনে রাখ।'

রিদয় সারাদিন ভাবছে, কেমন করে সে বনের পশুপাখিদের কাজে লাগতে পারবে, এমন সময় খবর হল, বেতগাঁয়ের একটা চাষা কাঠবেড়ালির বউকে ধরে খাঁচায় বন্ধ করেছে; আর সে বেচারার আটদিনের বাচ্চাগুলি না খেয়ে মরবার দাখিল! খোঁড়া হাঁস রিদয়কে বললে—'দেখ, যদি কাঠবেড়ালির উপকার করতে চাও তো এই ঠিক সময়।' রিদয় অমনি কোমর বেঁধে সন্ধানে বেরুল।

লক্ষ্মীবার পিঠেপার্বণের দিন কাঠবেড়ালের বউ চুরি হল সুরেশ্বরে, আর শনিবার বাগবাজারের ছাপার কাগজে বার হল সেই খবর। কাগজওয়ালা ছোঁড়াগুলো গলিতে গলিতে হেঁকে চলল—

সুরেশ্বরের মজা ভারি—কাঠবেড়ালের বউ চুরি!
বুড়ো আংলা মানুষ এল, দুটো বাচ্চা দিয়ে গেল।
মহন্ত ঠাকুর বড় দয়াল!
খাঁচা খুলে, ছেড়ে দিলে বাচ্চা সমেত কাঠবেড়াল।
মজার খবর এক পয়সা—পড়ে দেখ এক পয়সা!

কাণ্ডটা হয়েছিল এই: কাঠবেড়ালির বউটি ছিল একেবারে সাদা ধপধপে; তার একটা রোঁয়াও কালো ছিল না! চোখ দুটি মানিকের মতো লাল টুকটুকে, পাগুলি গোলাপি; এমন কাঠবেড়ালি আলিপুরেও নেই! এ এক নতুনতর ছিষ্টি! গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো, রেল কোম্পানির সায়েবসুবো তাকে ধরতে কত ফাঁদই পেতেছে, কিন্তু এ পর্যন্ত কাঠবেড়ালি ধরা দেয়নি। পোষ-পার্বণের দিন বাদামতলি দিয়ে আসতে আসতে এক চাষা এই কাঠবেড়ালিকে টোকা চাপা দিয়ে হঠাৎ কেমন করে পাকড়াও করে ঘরে এনে একটা বিলিতি ইঁদুরের খাঁচায় বন্ধ করলে। পাড়ার লোক—ছেলে-বুড়ো, এই আশ্চর্য কাঠবেড়ালি দেখতে দলে দলে ছুটে এল। এক ডোম তার জন্যে এক চমৎকার খাঁচা কল তৈরি করে এনে দিলে। খাঁচার মধ্যে শোবার খাট, দোলবার দোলনা, দুধের বাটি, খাবার খই রাখবার

ঝাঁপি, বসবার চৌকি—এমনই সব ঘরকন্নার ছোট ছোট সামগ্রী দিয়ে সাজানো। সবাই ভাবলে, এমন খাঁচায় কাঠবেড়ালি সুখে থাকবে—খেলে বেড়াবে সারাদিন, দোলনায় দুলবে আর খই-দুধ খেয়ে মোটা হবে! কিন্তু কাঠবেড়ালি বউ চুপটি করে মুখ লুকিয়ে খাঁচার কোণে বসে রইল আর থেকে থেকে কিচকিচ করে কাঁদতে থাকল। সারাদিন সে কিছু মুখে দিলে না, দোলনাতেও দুললে না, চৌকিতেও বসল না, খাটেও শুল না; কেবলই ছটফট করতে লাগল আর কাঁদতে থাকল।

সুরেশ্বরের পুজো দেবার জন্যে চাষার বউ সেদিন মালপো ভাজছিল আর সব পাড়ার মেয়েরা পিঠে-পার্বণের পিঠে গড়ছিল। রান্নাঘরে ভারি ধুম লেগে গেছে। উনুন জ্বলেছে; ছেলে-মেয়েরা পিঠে ভাজার ছ্যাঁকছ্যাঁক শব্দ পেয়ে সে দিকে দৌড়েছে। চাষার বউ ঠাকুরের ভোগ মালপোগুলো কেবলই পুড়ে যাচ্ছে কেন, সেই ভাবনাতেই রয়েছে। ও দিকে উঠোনের বাইরে বেড়ার গায়ে কাঠবেড়ালির খাঁচাটার দিকে কি হচ্ছে, কেউ দেখছে না। চাষার দিদিমা বুড়ি, সে আর নড়তে পারে না, দাওয়ায় মাদুর পেতে বসে সে-ই কেবল দেখছে—রান্নাঘরের আলো গিয়ে ঠিক কাঠবেড়ালিটার খাঁচার কাছটিতে পড়েছে, আর সারা সন্ধ্যে কাঠবেড়ালিটা খাঁচার মধ্যে খুটখাট ছটফট করে বেড়াচ্ছে। খাঁচার পাশেই গোয়াল, তার কাছেই সদর দরজা—খোলা। বুড়ি পষ্ট দেখল বুড়ো আঙুলের মতো একটি মানুষ উঠোনে ঢুকল। যক দেখলে ধনদৌলত বাড়ে, বুড়ি সেটা জানে, কাজেই বুড়ো আংলাকে দেখে সে একটুও ভয় পেলে না। বুড়ো আংলা বাড়িতে ঢুকেই কাঠবেড়ালির খাঁচাটার দিকে ছুটে গেল; কিন্তু খাঁচাটা উঁচুতে ঝুলছে; কাছে একটা পাঁকাটি ছিল, বুড়ো আংলা সেইটে টেনে খাঁচায় লাগিয়ে সিঁড়ির মতো সোজা কাটি বেয়ে খাঁচায় চড়ে খাঁচার দরজা ধরে খোলবার চেষ্টা করতে লাগল। বুড়ি জানে খাঁচার তালা বন্ধ, সে কাউকে না ডেকে চুপ করে দেখতে লাগল—কি হয়! কাঠবেড়ালি বুড়ো আংলার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কি যেন বললে; তারপর বুড়ো আংলা কাটি বেয়ে নিচে নেমে চোঁচা দৌড় দিলে বনের দিকে। বুড়ি ভাবছে যক আর আসে কিনা, এমন সময় দেখলে বুড়ো আংলা ছুটতে ছুটতে আবার খাঁচার কাছে দৌড়ে গেল—হাতে তার দু'টো কি রয়েছে। বুড়ি তা দেখতে পেলে না, কিন্তু এটুকু সে পষ্ট দেখলে যে বুড়ো আংলা একটা পোঁটলা মাটিতে রেখে আর একটা নিয়ে খাঁচার কাছে উঠল; তারপর একহাতে খাঁচার কাটি ফাঁক করে জিনিসটা খাঁচার মধ্যে গলিয়ে দিয়ে, মাটি থেকে অন্য জিনিসটা নিয়ে আবার তেমনই করে খাঁচায় দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

বুড়ি আর চুপ করে বসে থাকতে পারলে না, সে ভাবলে যক বোধহয় তার জন্যে সাতরাজার ধন মানিকজোড় রেখে পালাল। খাঁচাটা খুঁজে দেখতে বুড়ি উঠল। বুড়ির কালো বেড়ালও এতক্ষণ খাঁচার দিকে নজর দিচ্ছিল, সেও উঠে অন্ধকারে গা ঢাকা হয়ে দাঁড়াল কি হয় দেখতে। বুড়ি পৌষমাসের হিমে উঠোন দিয়ে চলেছে, এমন সময় আবার পায়ের শব্দ; আবার বুড়ো আংলা হাতে দু'টো কি নিয়ে! এবারে বুড়ো আংলার হাতের জিনিস কিচকিচ করে ডেকে উঠল, বুড়ি বুঝলে যক কাঠবেড়ালির ছানাগুলিকে দিতে এসেছে—তাদের মায়ের কাছে। দিদিমা উঠোনে দাঁড়িয়ে দেখলেন, যক আগের মতো খাঁচার কাছে গেল, কিন্তু বেড়ালের চোখ অন্ধকারে জ্বলছে দেখে, সে যেখানকার সেইখানেই দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখতে লাগল—ছানা দু'টি বুকে নিয়ে। উঠোনে বুড়িকে দেখে ছুটে এসে তার হাতে একটি ছানা দিয়ে বুড়ো আংলা আগের মতো কাটি বেয়ে একটির পর একটি ছানাকে খাঁচায় পুরে দিয়ে বুড়িকে পেন্নাম করে চলে গেল।

বুড়ি ঘরে এসে সবার কাছে এই গল্প করলে, কিন্তু কেউ সেটা বিশ্বাস করতে চাইলে না—দিদিমা স্বপন দেখেছে বলে উড়িয়ে দিলে। কিন্তু বুড়ি বলতে লাগল—"ওরে তোরা দেখে আয় না!"

সকালে সত্যি দেখা গেল চারটে ছানাকে নিয়ে কাঠবেড়ালি দুধ খাওয়াচ্ছে। এমন ঘটনা কেউ দেখেনি। সুরেশ্বরের মোহন্ত পর্যন্ত এই আশ্চর্য ঘটনা দেখতে হাতি চড়ে চাষার বাড়ি উপস্থিত! ওদিকে চাষার বউ যত পিঠে সিদ্ধ করে, সবই পুড়ে ছাই হয়ে যায়, সুরেশ্বরের মালপো ভোগও হয় না, তখন মোহন্ত পরামর্শ দিলেন—"ওই কাঠবেড়ালি নিশ্চয় সুরেশ্বরী, নয় আর কোনও দেবী, ওকে ছোনাপোনা সুদ্ধ বন্ধ করেছ, হয়তো সুরেশ্বর তাই রাগ করেছেন। না হলে মালপো ভোগ পিঠে ভোগ হঠাৎ পুড়েই বা যায় কেন? যাও, এখনই ওঁদের যেখানে বাসা, সেইখানে দিয়ে এসো। না হলে আরও বিপদ ঘটতে পারে!"

চাষা তো ভয়ে অস্থির! গ্রামসুদ্ধ কেউ আর খাঁচায় হাত দিতে সাহস পায় না। তখন সবাই মিলে দিদিমাকে সেই খাঁচা নিয়ে বনে কাঠবেড়ালির বাসায় পাঠিয়ে দিলে! বুড়ি যেখানকার জিনিস সেখানে রেখে, আসবার সময় রাস্তার মাঝে একটা মোহর পেয়ে গেল। 'যতো ধর্ম স্ততো জয়' বলে খবরের কাগজের সম্পাদক খবরটা শেষ

করলেন। এই বুড়ো আংলাটি কিনি—লোকে তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগল সুরেশ্বরে, বাগবাজারে, ফরিদপুরে, যশোহরে, ময়মনসিংহে, আগরতলায়, আসামে, কাছাড়ে!

এই ঘটনার দু'দিন পরে আর এক কাণ্ড! গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র যেখানে এক হয়েছে, সেইখানে আড়ালিয়ার চর। বুনোহাঁসের সঙ্গে রিদয়কে নিয়ে খোঁড়া হাঁস সেই চরে চরতে নামল! চরটা কেবল বালি, মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঝাউ, আর এখানে ওখানে শুকনো ঘাস। চরের একদিকে আড়ালিয়া গ্রাম। হাঁসরা চরছে, এমন সময় চরের উপরে কতকগুলো জেলের ছেলে খেলতে এল। মানুষ দেখেই চকা হাঁক দিলে, আর অমনি সব বুনোহাঁস ডানা মেলে উড়ে পড়ল। কিন্তু খোঁড়া হাঁস ছেলে দেখে একটুও ভয় পেলে না; বরং গলা চড়িয়ে বুনোহাঁসদের বললে—'ছেলে দেখে ভয় কি?'

রিদয় হাঁসের পিঠ থেকে নেমে একটা ঝাউতলায় বসে ঝাউফুল কুড়িয়ে মার্বেল খেলছে, ছেলেগুলো কাছে আসতেই সে একবার শিস দিয়ে খোঁড়াকে সাবধান করে একটা ঘাসবনে লুকিয়ে পড়ল। কিন্তু খোঁড়ার আজ কি যে হল, সে যেমন চরছিল তেমনই চরে বেড়াতে লাগল। ছেলে দু'টো একটা বালির ঢিপি ঘুরে একেবারে দু'দিক থেকে হাঁসকে তাড়া করলে! কেমন করে যে তারা এত কাছে হঠাৎ এসে পড়ল, ভেবে না পেয়ে খোঁড়া একেবারে হতভম্ব! উড়তে যে জানে তা মনেই এল না। সে ক্রমাগত দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল। তারপর একটা ডোবার কাছে গিয়ে খোঁড়া ধরা পড়ে গেল।

রিদয়ের প্রথমে মনে এল যে ছুটে গিয়ে ছেলে দু'টোকে থাবড়া মেরে হাঁসটা কেড়ে নেয়, কিন্তু তখনই মনে পড়ল, সে ছোট হয়ে গেছে! তখন সে রেগে বসে বসে কেবলই বালি খুঁড়তে লাগল। এদিকে খোঁড়া ডাকছে—'বুড়ো আংলা ভাই, এসো লক্ষ্মীটি, আমায় বাঁচাও।'

'ধরা পড়ে এখন বাঁচাও!'—বলে রিদয় ছেলে দু'টোর সঙ্গে দৌড়ল। ছেলে দু'টো হাঁস নিয়ে একটা নালা পেরিয়ে চর ছেড়ে গ্রামে ঢুকল!

রিদয় আর তাদের দেখতে পেলে না। নালায় অনেক জল। রিদয় অনেকটা ঘুরে তবে একটা শুকনো গাছের ডাল বেয়ে ওপারে উঠে, হাঁসকে খুঁজতে মাটির উপর ছেলেদের পায়ের চিহ্ন ধরে এগিয়ে চলল। একটা চৌমাথায় দেখা গেল, ছেলে দু'টো দু'দিকে গেছে। কোনপথে যাওয়া যায় রিদয় ভাবছে, এমন সময় বাঁকের রাস্তায় একটা হাঁসের পালক রয়েছে দেখে রিদয় বুঝলে, হাঁস এই পথে গেছে—পালক ফেলতে ফেলতে, যাতে সে সন্ধান পায় সেই জন্যে।

রিদয় পালকের চিহ্ন ধরে দু'টো মাঠ পেরিয়ে গ্রামের একটা সরু গলি পেলে। গলির মোড়ে একটা মন্দির। হাঁস কোথায় দেখা নেই, মন্দিরের খিলানের উপরে লেখা—"হংসেশ্বরী!" আর তারই উপরে মাটির গড়া এক হাঁস। রিদয় রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে সেই দিকে চেয়ে আছে, এ দিকে পিছনে প্রায় একশ লোক জমা হয়েছে—নাকে তিলক, কপালে ফোঁটা, নেড়া মাথা বৈরাগীর দল! রিদয় যেমনই ফিরেছে অমনই সবাই মাটিতে দণ্ডবত হয়ে প্রণাম করে বললে—'জয় প্রভু বামনদেব, ঠাকুর, কৃপা কর!'

বামন কে, রিদয় তা জানত না, কিন্তু প্রণামের ঘটা দেখে সে বুঝলে, সবাই তাকে দেবতা ভেবেছে। রিদয় অমনই গম্ভীর হয়ে বললে—'তোমরা আমার হাঁস চুরি করেছ, এখনই এনে দাও। নাহলে হংসেশ্বরীর কোপে পড়ে যাবে!'

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তখন হংসেশ্বরীর পাণ্ডা গলবস্ত্র হয়ে বললে—'ঠাকুর, হাঁস কোথায় আছে বলে দিন, এখনই এনে দিচ্ছি!'

রিদয় রেগে বলে উঠল—'কোথায় জানলে কি তোমাদের আনতে বলি? এই গ্রামের দু'টো ছেলে তাকে নিয়ে এসেছে—এই দিকে।'

এই কথা হচ্ছে এমন সময় মন্দিরের পিছন দিকে হাঁসের ডাক শোনা গেল। বেচারা প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে! রিদয় দৌড়ে সেদিকে গিয়ে দেখে একটা ঘরের উঠোনে এক বুড়ি খোঁড়া হাঁসকে দুই হাঁটুতে চেপে ধরে ডানা কেটে দেবার উদ্যোগ করছে—দু'টো পালক কেটেছে, আর দুটো মুঠিয়ে ধরে কাটবার চেষ্টায় আছে। হঠাৎ বুড়ো আংলা রিদয়কে দেখে বুড়ি একেবারে হাঁ হয়ে গেল! সেই সময়ে যত নেড়ানেড়ির দল ছুটে এসে হই হই করে বুড়ির হাত থেকে খোঁড়া হাঁস ছাড়িয়ে নিলে। রিদয় হাঁসের উপরে চড়ে বসল আর অমনই রাজহাঁস তাকে নিয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল।

বৈরাগীর দল সেই হাঁসের পালক হংসেশ্বরীর পরমহংস বাবাজির কাছে হাজির করে দিলে।—তিনি পালক

ক'টি একটা হাঁড়িতে রেখে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন—'অভূতপূর্ব ঘটনা! হংসেশ্বরীর রাজহংস স্বশরীরে বামনদেবকে নিয়ে উপস্থিত হয়ে দু'টি পালক রক্ষা করে গেছেন। সে জন্যে একটি সোনার কৌটার প্রয়োজন। হিন্দুমাত্রেরই এই বিষয়ে মুক্তহস্ত হওয়া উচিত। চাঁদা আমার কাছে মঃ অঃ করিয়া পাঠাইবেন। ইতি—সুরেশ্বরের পরমহংস বাবাজি।'

মানুষদের মধ্যে যেমন খবরের কাগজ, পশুপাখিদের মধ্যে তেমনই খবর রটাবার জন্য পাখি আছে। কোথাও কিছু নতুন কাণ্ড হলেই সেই জায়গাটার উপরে প্রথমে কাক-চিল জড়ো হয়, তারপর তাদের মুখে এ পাখি, এ পাখির মুখে ও পাখি—এমনই এ বন, সে বন, এ দেশ, সে দেশ দেখতে দেখতে খবর রটে যায়।

কাঠবেড়ালির কথা আর খোঁড়া হাঁস উদ্ধারের কথা রিদয় ফিরে আসার পূর্বে হাঁসের দলে, বনেজঙ্গলে, জলেস্থলে কোনও জানোয়ারের জানতে আর বাকি রইল না। গাছে গাছে তাল চড়াই, গাঙ শালিক—এরা সুরে-তালে রিদয়ের কীর্তিকথা ঢেড়া পিটিয়ে বলে বেড়াতে লাগল:

শুন এবে অবধান পশুপক্ষিগণ।
বুড়ো আংলা মহাকাব্য করি বিবরণ।।
কাঠবেড়ালি রামদাস তাহারে উদ্ধরি।
বীরদাপে চলে যথা রাজ হংসেশ্বরী।।
হাঁসের পালক দুটা কেটে নিল বুড়ি।
যাহে লেখা যায় মহাকাব্য ঝুড়ি ঝুড়ি।।
হাঁসের দুর্দশা দেখি আংলা বুড়ো ধায়।
হংসেশ্বরী ছাড়ি বুড়ি পালায় ঢাকায়।।
মোহন্ত তুলিয়া নিল হংসের কলম।
সোনা চাই বলি তাহে লেখে বিজ্ঞাপন।।
তালচটক তাল ধরে গাঙশালিকে কয়।
সুবচনী হাঁস নিয়ে চলিল রিদয়।।
খোঁড়া হাঁসেরে লইয়া, খোঁড়া হাঁসেরে লইয়া
রচিলাম মহাকাব্য যতন করিয়া।
আংলা বিজয় নামে কাব্য চমৎকার।
গোটা দুই শ্লোক তারি দিনু উপহার।।
সকলে শুনহ আর শুনাহ অন্যকে।
ক্ষীর হতে নীর পিয়ে ধন্য হোক লোকে।।
ইতি আংলা বিজয় মহাকাব্যে প্রথম সর্গঃ।

আজ চকা নিকোবার ভারি খুশি। সে রিদয়কে কুর্নিশ করে বললে—'একবার নয়, বারবার তিনবার তুমি দেখিয়েছ যে পশুপাখিদের তুমি পরম বন্ধু! প্রথমে শেয়ালের মুখ থেকে বুনোহাঁস লুসাইকে উদ্ধার, তারপরে কাঠবেড়ালির উপকার, সবশেষে পোষা হাঁসকে বাঁচানো। তোমার ভালবাসায় আমরা কেনা হয়ে রইলেম। আর তোমায় আমরা ফেরাতে চাইনে। তোমার যদি মানুষ হতে ইচ্ছে হয় তো বল আমি নিজে গণেশ ঠাকুরকে তোমার জন্যে 'রেকমেণ্ডেশন' পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

রিদয়ের আর মোটেই মানুষ হতে ইচ্ছে ছিল না। হাঁসেদের সঙ্গে দেশ-বিদেশ দেখতে দেখতে বড় মজাতেই সে দিন কাটাচ্ছে; তবু মানুষ হবার রেকমেণ্ডেশনখানা না নিলে চকা পাছে কিছু মনে করে, সেই ভয়ে বললে—'মানুষ হবার সময় হলে আমি তোমাকে জানাব। এখন কিছুদিন তোমাদের সঙ্গে থাকতে আমি ইচ্ছে করেছি।'

চকা ঘাড় নেড়ে বললে—'সেই ভাল; যখন ইচ্ছে হবে বোলো, আমি সর্টিফিকিট দিয়ে তোমাকে গণেশের কাছে পাঠাব। এখন হাঁসের দলে হংসপাল হয়ে থাকো।' বলে চকা রিদয়ের মাথাটা ঠোঁট দিয়ে চুলকে দিলে। অমনই চারিদিকে বুনোহাঁস রিদয়ের নতুন উপাধি ফুকরে উঠল—'হংপাল! হংপাল!'

বনের পাখিরা প্রতিধ্বনি করলে—'হি-রি-দ-য় হংসপাল!'

টুং-সোনাটা-ঘুম

সুরেশ্বর ছেড়ে বৃষ্টি আরম্ভ হল। এতদিন রোদে কাঠ ফাটছিল। সকালে যখন হাঁসের দল যাত্রা করে বার হল তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার কিন্তু ব্রহ্মপুত্র নদের রাস্তা ধরে যতই তারা উত্তরমুখে এগিয়ে চলল, ততই মেঘ আর কুয়াশা আর সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি দেখা দিলে! হাঁসের ডানায় পাহাড়ের হাওয়া লেগেছে, তারা মেঘ কাটিয়ে হু হু করে চলেছে; মাটির পাখিদের সঙ্গে রঙতামাশা করে বকতে বকতে চলবার আর সময় নেই, তারা কেবলই টানা সুরে ডেকে চলেছে—'কোথায়, হেথায়, কোথায়, হেথায়।'

হাঁসের দলের সাড়া পেয়ে ব্রহ্মপুত্রের দু'পারের কুঁকড়ো ঘাটিতে ঘাটিতে জানান দিতে শুরু করলে। পুব পারের কুঁকড়ো হাঁকলে—'সাতনল, চন্দনপুর, কোমিল্লা, আগরতলার রাজবাড়ি, টিপারা, হিল টিপারা।' পশ্চিম পারের কুঁকড়ো হাঁকলে—'মীরকদম, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকার নবাববাড়ি, মুড়াপাড়া।' পুবে হাঁকলে—'ভেংচার চর,' পশ্চিমে হাঁকলে—'চর ভিন-দোর।'

হাঁসেরা তেজে চলেছে, এবার ছোট ছোট গ্রাম, নদীর আর নাম শোনা যাচ্ছে না, বড় বড় জায়গায় কুঁকড়ো হাঁকছে—'পাবনা, রামপুর-বোয়ালিয়া, বোগরা, রাজসাহি, দিনাজপুর, রংপুর, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি!' পুবের কুঁকড়ো অমনই ডেকে বললে—'খাসিয়া পাহাড়, গারো পাহাড়, জৈঁতিয়া পর্বত, কামরূপ।'

বুনোহাঁসের দল পাহাড় পর্বত অনেক দেখেছে, শিলিগুড়ি থেকে হিমালয় ডিঙিয়ে মানস সরোবরে চট করে গিয়ে পড়া গেলেও তারা শিলিগুড়ি থেকে ডাইনে ফিরে, ফুলচারি, হাড়গিলের চর, ধুবড়ি, শিলং, গৌহাটি, দিব্রুগড়, কামরূপ হয়ে যাবার মতলব করলে, কেননা দার্জিলিঙ হয়ে যাওয়া মানে ঝড়-ঝাপটা, বরফের উপর দিয়ে যাওয়া, আর কামরূপের পথে গেলে ব্রহ্মপুত্র নদের দু'ধারে নগরে গ্রামে চরে জিরিয়ে যাওয়া চলে।

রিদয় কিন্তু বেঁকে বসল, এত কাছে এসে দার্জিলিঙ যদি দেখা না হল তো হল কি? খোঁড়া হাঁসের যদিও পায়ে বাত তবু রিদয়ের কথাতেই সে সায় দিয়ে বসল। ঠিক এই সময় শিলিগুড়ি থেকে ছোট রেল বাঁশি দিয়ে পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলে, রিদয় আকাশের উপর থেকে দেখলে, যেন সাদাকালো একটি গুটিপোকা এঁকে বেঁকে পাহাড়ের গা বেয়ে চলেছে—হাঁসে চড়া রিদয়ের অভ্যেস, রেল এত ঢিমে চলেছে দেখে ভেবেছিল, গুগলির মতো কত বছরই লাগবে ওটার দার্জিলিঙ পৌছতে।

রিদয় চকাকে শুধোলে, 'ওটা কতদিনে দার্জিলিঙ পৌছবে?'

চকা উত্তর দিলে—'এই সকাল আটটায় ছাড়ল, বেলা তিনটে চারটেতে পৌছে যাবে।'

'আর আমরা কতক্ষণে সেখানে যেতে পারি'—রিদয় শুধোলে।

চকা উত্তর করলে—'যদি রাস্তায় কুয়াশা, হিম না পাই, তবে বড়জোর এক ঘণ্টায় 'ঘুম লেকে' গিয়ে নামতে পারি, সেখান থেকে কিছু খেয়ে নিয়ে সিঞ্চল, কালিম্পং, লিবং, সন্দকফু থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে কার্সিয়াং, টুং-সোনাদা হয়ে আবার ঘুমেতে নেমে একটু জল খেয়ে একচোট ঘুমিয়ে নিয়ে বেলা সাড়ে এগারটা নাগাদ দার্জিলিঙ ক্যালকাটা রোডের ধারে আলুবাড়ির গুম্ফার কাছটায় তোমায় নামিয়ে দিতে পারি। আমরা তিব্বতের হাঁস তার ওদিকে আর আমাদের যাবার যো নেই—গেলেই গোরারা গুলি চালাবে!'

এত সহজে দার্জিলিঙ দেখা যাবে জেনে খোঁড়া হাঁস পর্যন্ত নেচে উঠল। চকা তখন বললে—'এত বড় দল নিয়ে তো পাহাড়ে চলা দায়, ছোট রেলের মতো আমাদেরও দল ছোট করে ফেলা যাক। বড় দলটা নিয়ে আণ্ডামানি কামরূপে হাড়গিলে চরে গিয়ে অপেক্ষা করুক; আর আমি, খোঁড়া, হংপাল, কাটচাল, নানকৌড়ি চলো দার্জিলিঙ দেখে আসি।' শিলিগুড়ি থেকে হাঁসের দল দুই ভাগ হয়ে চলল, ঠিক সেই সময় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি নামল। কাঠফাটা রোদের পরে নতুন বৃষ্টি পেয়ে মাটি ভিজে উঠেছে, পাতা গজিয়ে উঠেছে, বনের পাখিরা আনন্দে উলু উলু দিয়ে কেবলই বলতে লেগেছে, বৃষ্টির গান:

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
বাজছে বাদল গামুর গুমুর
ডাল-চাল আর মক্কা-মুসুর
ফোঁটায় ফোঁটায় নামে—
আকাশ থেকে নামে—

জলের সাথে নামে—
ঘরে ঘরে নামে—
টাপুর টুপুর গামুর গুমুর
গামুর গুমুর টাপুর টুপুর।

'তিষ্টা' নদীর কাছে এসে হাঁসেরা শুনলে, নদীর দু'পারে সবাই বলছে:

মেঘ লেগেছে কালা ধলা
বইছে বাতাস জলা জলা
বরফ গলা পাগলা ঝোরা
শুকনা ধুয়ে আসে
তিষ্টা নদীর পাশে—
ঝাপুর ঝুপুর ছাপুর ছুপুর
ছাপুর ছুপুর-ঝাপুর ঝুপুর।

নতুন জল-বাতাস পেয়ে পৃথিবী জুড়ে সবাই রোল তুলেছে, আকাশের হাঁসেরাই বা চুপ করে থাকে কেমন করে, তারা পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে আলু, পেঁয়াজ, শাক, সবজি ক্ষেতগুলোর ধার দিয়ে ডাকতে ডাকতে চলল— 'রসা জমি ধসে পড় না, বসে থেক না, ফসল ধরাও, ফল ধরাও, নতুন বীজে ফল ধরাও!'

পাগলা ঝোরার কাছ বরাবর এসে একখানা প্রকাণ্ড মেঘ হাঁসেদের সঙ্গ নিয়ে উত্তর মুখে উড়ে চলল। কলকাতার এক বাবু পাহাড়ি রাস্তায় রবারের জুতো রবারের ওয়াটারপ্রুফ পরে বিষ্টির ভয়ে নাকেকানে গলাবন্ধ জড়িয়ে মোটা এক চুরুট টানতে টানতে ছাতা খুলে হাঁফাতে হাঁফাতে চড়াই ভেঙে তাড়াতাড়ি বাড়িমুখো হয়েছেন দেখে হাঁসেরা রঙ্গ জুড়লে:

জল চাও না, চাও কিন্তু খাসা পাঁউরুটি
হয় না তো সিটি!
জলের ভয়ে তাড়াতাড়ি খুললে কেন ছাতা!
জল না হলে গাছে গাছে ফলে পেঁপে আতা?
জল না পেলে কোথায় পেতে আলু পটোল চা!
হত নাকো রবার গাছ কিসে ঢাকতে পা?
বিষ্টি নইলে ছিষ্টি নষ্ট, সেটা মনে রেখো—
মেঘ দেখলে নাক তোলো তো উপোস করে থেকো!
সকালে পাবে না চা দুপুরেতে ভাত—
বিকেলে পাবে না ফল, রাতে জ্বলবে আঁত
না পাবে নদীতে মাছ ক্ষেতেতে ফসল—
ফোঁটা ফোঁটা ঝরবে তখন তোমার চোখে জল।

বাবু একবার ছাতার মধ্যে থেকে আকাশে চেয়ে দেখলেন, রিদয় টুপ করে তার নাকের উপর একটা শিল ফেলে হাততালি দিতে দিতে হাঁসের পিঠে উড়ে চলল। মেঘখানা শিল বর্ষাতে বর্ষাতে হাঁসের দলের পিছনে পিছনে আসছে, আর হাঁসেরা সারি দিয়ে আগে আগে যেন মেঘখানাকে টেনে নিয়ে চলেছে—আকাশ দিয়ে পুষ্পক রথের মতো! তিন দরিয়ার অনেক উপরে দুই পাহাড়ের দেয়াল যেন কেল্লার বুরুজের মতো সোজা আকাশ ঠেলে উঠেছে একেবারে মেঘের কাছে, তারই গায়ে পাগলা ঝোরা ঝরনা সাদা পৈতের মতো পাহাড়ের গা বেয়ে গাছপালার মধ্যে দিয়ে ঝুলে পড়েছে—এই পাহাড়ের দেওয়াল ডিঙিয়ে হাঁসেরা কার্সিয়াংয়ের মুখে চলল—



পাঙ্খাবাড়ি থেকে কার্সিয়াং দু'ধারে ঝরনা আর চা বাগান সবজির ক্ষেত, থাকে থাকে পাহাড়ের গায়ে পাহাড়ি বস্তি, সাহেবদের কুঠি, কার্সিয়াং শহরটা যেন আর একটা ঝরনার মতো দেখা যাচ্ছে—পাহাড়ি গোলাপ গেঁদা গাছ-আগাছায় কুঁড়ি ধরেছে।

বাঁ ধারে দূরে কালো কালো পাহাড়ের শিখরে বরফের পাহাড় যেন দুধের ফেনার মতো উথলে পড়েছে। একদল বাঙালি বউ-ছেলেপুলে নিয়ে কার্সিয়াংয়ের স্টেশনের উপরের রাস্তায় হাওয়া খেতে বেরিয়েছে—গিন্নি সবে অসুখ থেকে উঠেছেন, তিনি ছাতি মাথায় দাণ্ডি চেপে চলেছেন। কর্তা লাঠি ধরে সঙ্গে, পিছনে চার মেয়ে, ছোটোবড়ো তিন ছেলে, এক বউ, দুই জামাই, একপাল নাতিপুতি হাসিখুশি লুটোপাটি করে চলেছে। কেউ পাহাড় থেকে ফুল তুলছে, কেউ রাস্তা থেকে নুড়ি কুড়োচ্ছে, একটা ছেলের হাতে প্রজাপতির কুড়োজাল দেখে রিদয় চেঁচিয়ে বললে—'ধরো না ধরো না, যক হবে!'

হাঁসেরা বলে চলল—'ফুল যত চাও তোল, গোলাপ ফুটল বলে, গাঁদা ওই ফুটেছে, চেরি ফুলে রঙ ধরেছে, আমরা এনেছি, নাও কলাইশুটি নাও, ফুলকপি নাও, আপেল নাও, নাসপাতি যত পার খাও নাও দাও থোও, প্রজাপতি ধরা ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও!'

দেখতে দেখতে মেঘে, কার্সিয়াং ঢেকে গেল, ছেলেবুড়ো ঘরবাড়ি বাজার স্টেশান মায় ছোটরেল গিদা পাহাড় ডাউনহিল সব কুয়াশায় চাপা পড়ল, দূরে সিঞ্চল মেঘের উপরে মাথা তুলে দেখা দিল। এইবার রিদয়ের শীত আরম্ভ হল। খোঁড়া হাঁস ডানা ছড়িয়ে উড়ে চলেছে, পালকের মধ্যে ঢোকবার যো নেই, জলে শীতে থরথর করে বেচারা কাঁপতে লাগল, খোঁড়াও বাংলা দেশের মানুষ, পাহাড়ের শীতে তারও ডানার পালকগুলো কাঁটা দিয়ে উঠল, সে ডাক দিলে—'শীত শীত হংপাল শীতে গেল।'

চকা হাঁকলে—'নেমে পড় কার্সিয়াং!'

হাঁসরা অমনি মেঘের মধ্যে দিয়ে নামতে শুরু করলে। রিদয় দেখলে, মেঘের মধ্যেটায় খোলা আকাশের চেয়ে কম ঠাণ্ডা, যেন পাতলা তুলোর বালাপোষ গায়ে দিয়েছে। হাঁসেরা নামতে নামতে একটা বাড়ির ছাতে এসে বসল। বাড়ির বাইরে কেউ নেই, কুয়াশার ভয়ে সবাই ঘরে কাচ বন্ধ করে বসেছে, বাইরে কেবল গালফুলো একটুখানি একটা পাহাড়ি ছোঁড়া আগুন জ্বেলে কচি ছেলের একজোড়া পশমের মোজা তাতিয়ে নিচ্ছে, আর সেই সঙ্গে নিজের হাত-পাগুলোও একটু সেঁকে নিচ্ছে, এমন সময় ঘর থেকে বাড়ির গিন্নি ডাক দিলেন—'টুকনি!'

ছেলেটা তাড়াতাড়ি হাতের মোজা জোড়া মাটিতে ফেলে দৌড় দিলে, চকা অমনই ছোঁ দিয়ে মোজাটা নিয়ে রিদয়কে দিয়ে বললে—'পরে ফেল উলের জামা।' রিদয় মোজাটা মাথায় গলিয়ে ছেঁড়া মোজার তিনটে ছেঁদা দিয়ে হাত আর মাথা বার করে ফিট হয়ে যেন সোয়েটার পরে দাঁড়াল।

হাঁসের দল তাকে পিঠে নিয়ে আকাশে উঠল—টুকনি ছোঁড়াটা নিচে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগল, 'আরে আরে হাঁস মোজা লেকে ভাগা!' .

রিদয় শুনলে গিন্নি চেঁচাচ্ছেন—'হাঁসে কখনও মোজা নেয়? নিশ্চয় মোজাটা পুড়িয়ে রেখে মিছে কথা বলছে! ফের ঝুট বাত বোলতা।'

টুকনির মোজা পোড়ানোর মামলার শেষ কি হল দেখবার আর সময় হল না! মেঘ তখন মুষল ধারায় জল ঢালতে আরম্ভ করেছে, হাঁসেরা তাড়াতাড়ি মেঘ ছাড়িয়ে উঠতে চেষ্টা করতে লাগল আর বনজঙ্গলকে ডেকে বলতে লাগল—'কত জল আর চাই বল, তেষ্টা যে মেটে না দেখি, মেটে না দেখি!' কিন্তু দেখতে দেখতে আকাশ নীল মেঘে ছেয়ে গেল, সূর্য কোথায় কোনদিকে তার ঠিক নেই, হাঁসেদের ডানার উপরে বিষ্টি ক্রমাগত চাবুকের মতো পড়ছে, ডানার পালক ভিজে তাদের বুকের পালকে পর্যন্ত জল সেঁধিয়েছে, পাহাড়-পর্বত চড়াই-নাবাই গাছপালা ঘন কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেছে—দু'হাত আগে নজর চলে না। পাখিদের গান থেমে গেছে। হাঁসেরা চলেছে, ধীরে ধীরে পথ খুঁজে খুঁজে; রিদয় শীতে কাঁপছে আর ভাবছে, চুরি করার এই শাস্তি।

এই মেঘ আর কুয়াশার মধ্যে দিয়ে চকা নিকোবর যখন তাদের ক'টিকে নিয়ে সিংচল পাহাড়ের সিং-এ একটা ঝাউতলায় এসে বসল, তখন যেন রিদয় হাঁফ ছেড়ে বাঁচল! পাহাড়ের চুড়োয় কেবল সোনালি ঘাসের বন আর এক একটা ছাতের মতো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর বরফ পড়ে সাদা হয়ে রয়েছে—কোথাও কোথাও নালা দিয়ে বরফ জল বয়ে চলেছে, পাতায় পাতায় টিপটিপ করে বিষ্টি লাগছে কিন্তু শীত হলেও হাওয়া এখানে এমন পরিষ্কার যে রিদয় আনন্দে এ দিকে ও দিকে ছুটে বেড়াতে লাগল! বুনো টেঁপারি সোনালি পাতা রুপোলি পাতা সোনা ঘাস রুপো ঘাস তুলে তুলে রিদয় বোঝা বাঁধছে দেখে চকা হেসে বললে—'এগুলো হবে কি?'

রিদয় অমনি বলে উঠল—'দেশে গিয়ে দেখাব!'

খোঁড়া হাঁস ভয় পেয়ে বললে—'ওই মস্ত বোঝা নিয়ে ওড়া আমার কর্ম নয়, তুমি তবে রেলে করে বাড়ি যাও!'

চকা রিদয়কে ডেকে বললে—'খুব কাজের জিনিস ছাড়া একটি বাজে জিনিস সঙ্গে নেওয়া আমাদের নিয়ম নয়, পেট ভরে টেঁপারি খাও তাতে আপত্তি নেই, ঘাস দু'কানে দু'টো গুঁজতে পার তার বেশি নয়।'

রিদয় দু'কানে দু'টো ঘাস গুঁজে টেঁপারি খেয়ে বেড়াচ্ছে, এমন সময় ভালুকের সঙ্গে দেখা! রিদয় ভালুক নাচ অনেক দেখেছে কিন্তু এত বড় এমন রোঁয়াওয়ালা মিশকালো ভালুক সে কোনওদিন দেখেনি, ভালুক তাকে দেখে দু'পা তুলে থপথপ করে এগিয়ে এসে বললে—'এখানে মানুষ হয়ে কি করতে এসেছ? পালাও, না হলে শীতে মরে যাবে, বড় খারাপ জায়গা। গোরাগুলো পর্যন্ত এখানে টিকতে পারেনি, কত লোক যে এখানে ঠাণ্ডা আর রাতের বেলায় ভূতের ভয়ে কেঁপে মরেছে তার ঠিক নেই। এখানে এককালে গোরা-বারিক ছিল কাপ্তেন জাঁদরেল সব এখানে থাকত, এখন আর কেউ নেই! কোথায় গেছে তাদের বাগ-বাগিচা বাজার-শহর, কেবল দেখ চারদিকে আগুন জ্বালাবার চুলোগুলো পড়ে আছে, শীতে সব গোরা ভূত বেরিয়ে এইসব ভাঙা চুলির ধারে বসে আগুন পোহায় আর মদ খায়, হুক্কা-হুয়া গান গায়।'

ঠিক এই সময়ে শেয়াল ডাকের মতো গান শোনা গেল, আর মেম সঙ্গে একটা গোরা বোতল হাতে টলতে টলতে আসছে দেখা গেল। ভালুককে দূর থেকে দেখেই গোরা যেমন বন্দুক উঁচিয়েছে, অমনি ভালুক চট করে গাছের তলায় অন্ধকারে কালোয় কালো মিশিয়ে গেছে! রিদয়ের গায়ে টকটকে মোজা—মেম তাকে ভাবলে কার পোষা ছোট বাঁদর, সে অমনি 'মাংকি মাংকি' বলে রিদয়কে ধরতে ছুটল। রিদয় তাড়াতাড়ি যেমন পালাতে যাবে অমনি পাহাড় থেকে গড়াতে গড়াতে একেবারে কার্ট রোডে মালবোঝাই ছোট রেলের ছাতে এসে চিৎপাত!

রেলটা ঝরনা থেকে হোঁস-ফোঁস করে খানিকটা জল ইঞ্জিন ভরে নিয়ে ঘুম জোড়বাংলার দিকে এগিয়ে চলল ভকভক করে বকতে বকতে। এ দিকে ভালুকের কাছে খবর পেয়ে হাঁসেরা উড়েছে ঠিক রেলের সঙ্গে সঙ্গে—তারা দেখছে, রিদয় মালগাড়ির উপরটায় যেন একটি লাল নিশেনের মতো লটপট করছে। ঘুম বস্তিতে এসে রেল থামল। হাঁসেরা এমনি হাঁক দিলে—'ঘুম লেক যাও তো নেমে পড়!' কিন্তু তখন গাড়ির ঝাঁকানিতে রিদয়ের ঘুম এসেছে, সে হাত নেড়ে জানালে—'দার্জিলিঙ যাব!' এই সময় গাড়ির থেকে একপাল ছেলে চেঁচিয়ে উঠল—'টুং-সোনাদা-ঘুম!' রিদয় চমকে উঠে দেখলে গাড়ি ছেড়েছে।

ঘুমের পরেই 'বাতাসিয়া' নতুন লাইন খুলেছে—এক একটা পাহাড় কেটে সেগুলো কেল্লার বুরুজের মতো

পাথরের টালি দিয়ে পাহাড়ি মিস্ত্রি সব গেঁথে তুলেছে। রিদয়ের মনে হল, ঠিক কেল্লার মধ্যে ঢুকেছি! ঠিক সেই সময় হাঁসের দল ডাক দিল—'বাতাসিয়া বাতাস জোর, ধরে বোসো!' কিন্তু গুছিয়ে বসবার আগেই রিদয় বাতাসে লাল ছাতার মতো উড়ে একেবারে পথের মাঝে এসে বসল। সোঁ সোঁ করে বাঁশি দিয়ে রেল দার্জিলিঙের দিকে বেরিয়ে গেল।

পাহাড়ের মোড়টা সুনসান, লোক নেই, দূর থেকে একটা মোষের গাড়ি আসছে। রিদয় আস্তে আস্তে সেই মোষের গাড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে দার্জিলিঙের বাজারে হাজির। হাঁসেরা মাথার উপরে ডাক দিয়ে গেল—'আলুবাড়ি গুম্ফা মনে রেখো, সেখানে আমরা রইব।' রিদয় আলুবাড়ি আলুবাড়ি নাম মুখস্ত করতে করতে বাজার দেখতে চলল। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে—অন্ধকারে রিদয় ভিড়ের মধ্যে মিশে চলেছে। বাজারের ও ধারে কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড়ে বরফের উপর সন্ধ্যার আলো যেন সোনার মতো ঝলক দিয়ে উঠল। তারপর গোলাপি, গোলাপি থেকে বেগুনি হয়ে আবার যে সাদা সেই সাদা বরফ দেখা দিলে। সেই সময় চৌরাস্তায় গোরার বাদ্যি শুরু হল, আর দলে দলে লোক সেইদিকে ছুটল। রাস্তার দু'ধারে জুতো, খাবার, বাসন, গহনার দোকান—এখানে ওখানে ভুটিয়া লামারা মড়ার মাথার খুলি নিয়ে ঘণ্টা-ডমরু বাজিয়ে নন্দি-ভৃঙ্গির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাহাড়ের রাস্তা কখনও রিদয় ভাঙেনি, দু-এক চড়াই উঠে বেচারা হাঁপিয়ে পড়ল; কোথায় বসে জিরোয় ভাবছে, এমন সময় একটা খেলনার দোকানে নজর পড়ল, সেখানে লাল উলের মোজা পরানো ঠিক তারই মতো অনেকগুলো পুতুল শার্সির গায়ে কাগজের বাক্সতে দাঁড় করানো রয়েছে! রিদয় চুপিচুপি দোকানে ঢুকে একটা খালি বাক্স দেখে তারই মধ্যে শুয়ে রইল।

শার্সিমোড়া দোকানের মধ্যে বেশ গরম, এক খোট্টাবাবু বসে বিড়ি টানছেন আর একটা ভুটিয়া মেয়ে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। দোকানের মধ্যে ফুটবল পোস্টকার্ড নানা পুতুল লজেঞ্চুস মার্বেল এমনই সব সাজানো, দরজার উপরটায় একটা বিভীষণের মুখোশ হাঁ করে চোখ পাকিয়ে চেয়ে রয়েছে! রিদয় মুখোশটার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে এমন সময় এক বাবু দোকানে ঢুকেই বলে উঠলেন 'ওহে মার্কণ্ড, ছোটখাট দু'টো পুতুল দাও দেখি, টুনু আর সুরূপার জন্যে!'

মার্কণ্ড তাড়াতাড়ি রিদয় যে বাক্সে ছিল সেই বাক্সে আর একটা বিবি পুতুল দিয়ে কাগজে মুড়ে বাবুর হাতে দিলে। বাবু সেটাকে আলখাল্লার পকেটে ফেলে চুরুট ধরিয়ে পাহাড়ি রাস্তায় ঠকঠক লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বাড়িমুখো হলেন। পকেটের মধ্যে গরম পেয়ে রিদয় বিবি পুতুলটির পাশে ঘুমিয়ে পড়ল, আবার যখন চোখ মেলে চাইলে তখন দেখলে বাক্সর ডালাটা খুলে গেছে। একটা কাচমোড়া বারাণ্ডায় গোটাকতক তুলি, এক বাক্স রঙ, একটা গদিমোড়া চৌকি, তারই উপরে একটা এতটুকু কালো কুকুর বাক্স থেকে তাকে টানাটানি করে খেলবার চেষ্টা করছে! কুকুরটা যদি কামড়ে দেয়—! রিদয় ভাবছে, এমন সময় ওঘর থেকে ডাক এল 'টমা-টমা-টমাসে।' কুকুরটা দৌড়ে ও ঘরে গেল সেই ফাঁকে রিদয় বাক্স থেকে চোঁচা দৌড়।

বাড়ির বাইরে থেকে শার্সিতে মুখ লাগিয়ে দেখলে একটা লাল কম্বলপাতা খাটে ছেলে মেয়ে একদল বসে তাদের বড় ভাইটির কাছে গল্প শুনছে আর একটা ছোট ছেলে লাল ভুটিয়ার কাপড় পরে যে গল্প বলছে তার গলা জড়িয়ে ডাকছে—'পাখম দাদা, পাখম দাদা।'

শীতের রাতে আগুন জ্বালা ঘরখানি—এই ছেলের দল,'এই হাসিখুশি গল্প দেখে রিদয়ের চোখে জল আসতে লাগল। তারও ঘর আছে তারও দাদা আছে, দিদি আছে, অথচ সব থেকেও নেই! কোথার রইল তাদের আমতলি, কোথায় সেই মাটির দেওয়াল দেওয়া ঘরগুলি! রিদয়ের প্রাণ চাইছে এই ছেলেদের সঙ্গে একসঙ্গে খেলে, কিন্তু হায়, সে বুড়ো আংলা যক হয়ে গেছে আর কি মানুষের ঘরে তার স্থান হবে! বুড়ো আংলা জানলার বাইরে শীতে বসে অঝোরে কাঁদতে লাগল। সেই সময় বাবু ওধারে হুকুম দিলেন—'এ রবতেন কাল আলুবাড়ি জানে হোগা, ডাণ্ডি রাখ যাও!'

রবতেন ডাণ্ডিখানা জানলার ধারে বারাণ্ডায় রেখে চলে গেল। রিদয় সে রাত ডাণ্ডির ছৈটার মধ্যে কাটিয়ে বাবুর সঙ্গে লুকিয়ে যেমন এসেছিল, তেমনই ডাণ্ডিতে লুকিয়ে রওনা হল। পুতুলের মধ্যে টুনুর পুতুলটাই পাওয়া গেল, সুরূপার পুতুলটা নিশ্চয় টমা মুখে করে কোথায় ফেলেচে বলে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান হল না! সুরূপা টমার পিঠে দুই থাবড়া বসিয়ে পাহাড়ের উপর পা ছড়িয়ে কাঁদতে লাগল।

আলুবাড়ি থেকে রিদয়কে পিঠে নিয়ে জলাপাহাড় কাটপাহাড় পেরিয়ে হাঁসেরা এমন মেঘ আর শিলাবিষ্টি

পেলে যে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকেই এগোতে পারল না, তাড়াতাড়ি ঘুরে ঝুপঝাপ ঘুম লেকে গিয়ে পড়ল। ভয়ঙ্কর শিল পড়েছে, লেকের জলের উপরে বরফের সর পড়ে গেছে, পাহাড়ের গা বরফে সাদা হয়ে গেছে, খোঁড়া হাঁসের পায়ের বাত কটকট করে উঠল। সে বললে—'কাজ নেই বাপু এখানে থেকে, ফিরে চল, আর একবার আসা যাবে।' কিন্তু চল বললেই চলা যায় না—পাহাড় দেশে মেঘ, ভাল হাওয়ার গতিক বুঝে তবে চলাচল করতে হয়। কোনও রকমে পাঁপড়া নানকৌড়ি ঘুম-রকে চড়ে আকাশের ভাবটা জেনে আসতে চলল; অমনি রিদয় বললে—'আমি যাব ঘুম-রকে।' খোঁড়া বললে—'আমিও।' অমনই সবাই একসঙ্গে 'আমিও আমিও' বলতে বলতে উড়ে গিয়ে রকের উপরে বসল।

মানুষের বাড়িতে যেমন কোনও জায়গা রাঁধবার, কোনওটা বৈঠকখানা, কোনওটা বা শোবার খাবার জায়গা, হিমালয়েতেও তেমনই এক একটা জায়গা এক এক কাজের জন্য আছে। মানুষের বাড়িতে যেমন দালান থাকে বারান্ডা থাকে, রক থাকে, হিমালয়েতেও তাই। ঘুম-রকটা হল ঘুম দেবার স্থান, জলাপাহাড় হল জল খাবার কিম্বা জলো হাওয়া খাবার জায়গা, রংটং হল ধোবিখানা, কাপড় রঙাবার জায়গা, টুং হল ঘড়ির ঘর, এমনই সব নানা রক নানা দালান চাতাল গুহা এক এক কাজের জন্যে রয়েছে।

ঘুম-রকে দিনে বড় কেউ আসে না, দু'চার পথিক পাখি কি জানোয়ার কখনও কখনও জিরোতে বসে, না হলে জায়গাটা সারাদিন ফাঁকা থাকে দেখে বুড়ো রামছাগল মাস্টার এখানে ছানা পড়াবার জন্যে একটা ইস্কুল খুলেছেন। পাখির ছানা শেয়ালছানা শুয়োরছানা ভালুকছানার ঘুম-রকে বড় বড় পাথরের বেঞ্চিতে কেউ পা ঝুলিয়ে কেউ বা বেঞ্চিতে দাঁড়িয়ে সারাদিন ঝিমোচ্ছে আর রামছাগল শিঙের খোঁচায় তাদের জাগিয়ে দিয়ে কেবলই পড়াচ্ছেন, ক, খ,গ, ঐ বো স্যে! একে ঘুম-রক তাতে আজ বড় বাদলা, শিঙের খোঁচা খেয়েও চুনে চুনে পড়ছে দেখে রামছাগলও কম্বলমুড়ি দিয়ে ঘুমের যোগাড় করছেন এমন সময় রিদয়কে নিয়ে হাঁসেরা উপস্থিত। অচেনা লোক দেখে মাস্টারমশায় তাড়াতাড়ি গা ঝাড়া দিয়ে মস্ত ম্যাপ আঁকা প্রকাণ্ড কালো সেলেটখানায় শিং বুলিয়ে বুলিয়ে ছেলেদের জিওগ্রাফির লেকচার শুরু করলেন:

জলের জন্তুরা চোখ ফুটেই দেখে জল, আকাশ, ডাঙার জীব তারা দেখে বনজঙ্গল মাঠ, আর পাহাড়ের ছেলেমেয়ে তারা দেখে আকাশের উপরে বরফে ঢাকা ওই হিমালয়ের চুড়ো কটা। হিম-আলয় সন্ধি করে হয়েছে হিমালয়, অর্থাৎ কিনা হিমালয় মানে হিমের বাড়ি, পাহাড়ি ভাষায় বলে হিমালয়, সম্‌স্কৃতোতে বলবে হিমাচলম্‌, ইংরেজ তারা ভাল রকম উচ্চারণ করতেই পারে না, 'র' বলতে 'ল' বলে ফেলে—তারা হিমালয়কে বলে ইমালোইয়াস্‌! হিমালয়ের মতো উঁচু আর বড় পর্বত জগতে নেই। সব দেশের সব পর্বত আমাদের এই হিমালয়ের চুড়োর কাছে হার মেনেছে।

ধলা চামড়া জানোয়ারেরা ধরাকে সরা জ্ঞান করে, আমাদের বলে কালো, কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড় পাহাড় মোটে ষোল হাজার ফুট আর আমাদের এই বাড়ির চুড়োগুলো কত উঁচু তা জান? এর চল্লিশটা শিখর হচ্ছে চব্বিশ হাজার ফিট করে এক একটি। ওই কাঞ্চনজঙ্ঘা যেটা সকালে-সন্ধ্যায় সোনা আর দিনে-রাতে দেখায় রুপো, ওটা হচ্ছে আটাশ হাজার ফুট, ওরও আরও হাজার ফুট উপরে ধবলগিরির সব উঁচু চুড়ো ঊনত্রিশ হাজার ফুট। এর পাশে ধলা চামড়াদের জেতো পাহাড়—ফুঃ, রাজহস্তীর পাশে খরগোশ! মানুষের কথা দূরে থাক পাখিরাও এই হিমালয়ের চুড়োয় চড়তে পারে না, এখানে না ঘাস না গাছ! মেঘ পর্যন্ত ভয় পায় সেখানে উঠতে, শুধু ধপধপ করছে আছোঁয়া সাদা বরফ।

এই হিমালয়ের চুড়ো থেকে বরফ গলে বারটা মহানদী ছিষ্টি হয়ে পুব-পশ্চিমে দুই মহাসাগরে গিয়ে পড়েছে, কত দেশ কত বনের মধ্যে দিয়ে তার ঠিক নেই! এ সব নদীর ধারে কত নগর কত গ্রাম কত মাঠঘাট জমিজমা রাজ্য পেতে কত রকমের মানুষেরা রয়েছে তা গোনা যায় না।

এই হিমের বাড়ির চুড়োটা থেকে ধাপে ধাপে পৃথিবীর দিকে নেমে গেছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্বত প্রমাণ সিঁড়ি, এক এক ধাপে রকম রকম গাছপালা পশুপাখি! এ রকে সে রকে পাথরের কাজল এমন চওড়া যে সেখানে কতকালের পুরোনো পাথরের মেঝেতে বড় বড় গাছের বন হয়ে রয়েছে, ঝরনা দিয়ে বর্ষার জল বরফের জল সব গড়িয়ে চলেছে। কোনও রকের উপর দিয়ে মানুষেরা রেল চালিয়ে দিয়েছে, বড় বড় শহর বসিয়ে বাজার বসিয়ে রাজত্ব করছে।

জীবজন্তুর অগম্য স্থান ধবলাগিরি, সেখানে কেবলই বরফ। এই সিঁড়ির রক, যাতে আমরা বাস করছি, এরই

সব উপরের রকে শুধু বরফ আর শেওলা, একমাত্র চমরী গাই পাহাড়ি ছাগল আর ভেড়া, তার পরের ধাপে মানুষ সমান ঘাস আর দেবদারু বন, সেখানে শেয়াল ভালুক হেঁড়েল এরাই যেতে পারে, তার পরের রকে নানা ফুল-ফলের বাগান, সেখানে প্রজাপতি পাখি খরগোশ কুকুর বেড়াল ভোঁদড় ভাম বাঁদর হনুমান এরাই থাকে, সবশেষের ধাপে বেতবন বাঁশবন অন্ধকার ঘন জঙ্গল, সেখানে হরিণ মোষ বাঘ সাপ ব্যাঙ, তারপরে চাটালো জমি যার উপর দিয়ে সহস্রধারা নদী সব বয়ে চলেছে, এরই পরে অগাধ সমুদ্র, নীল জল, শেষ দেখা যায় না, এই সমুদ্রের ওপারে যে কি, তা কেউ জানে না।

চকা অমনই বলে উঠল—'আমি জানি। নীল সমুদ্রের মাঝে পাহাড় আছে, টাপু আছে, তারপরে পৃথিবীর শেষ বরফের দেশ, সেখানে বারমাস বরফ, জমি যেন সাদা চাদরে ঢাকা আর সেখানে ছ'মাস রাত্রি ছ'মাস দিন; সেখানে পেঙ্গু পাখিরা বরফের বাসায় ডিম পাড়ে, ধলা ভালুক আছে, ধলা শেয়াল সিন্ধুঘোটক আছে, সব সেখানে সাদা, কালো কিছুই নেই, দিনরাত সমান আলো, ঘুটঘুটে আঁধার মোটেই নেই, আমি সেইখানে পাঁচবার গেছি!'

চকার কথায় রামছাগল শিং বেঁকিয়ে বললে—'এত বুড়ো হলেম এমন আজগুবি কথা তো শুনিনি।'

রিদয় এবার এগিয়ে এসে বললে—'যে হিমালয়ের চুড়ো এখান থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বরফে ঢাকা, ওই হিমের বাড়ি গড়া নিয়ে কি কাণ্ড হয়ে গেছে এককালে, তার খবর চকা তো জানে না, রামছাগলও জানে না, মানুষেরা ধ্যান করে ওই নিচের তলাকার বনে বসে। ওই ধবলাগিরির উপরের খবর যা শাস্তরে লিখে গেছে—তাই বলচি, শোনো। বড় চমৎকার কথা!'

সবাই অমনি রিদয়কে ঘিরে বসল কথা শুনতে, মেঘলা দিন ভিজে স্যাঁতস্যাঁত করছে, ভালুকের গা ঘেঁষে ছাগল, ছাগলের গা ঘেঁষে হাঁস, হাঁসের গা ঘেঁষে শেয়াল।

রিদয় বসে গল্প শুরু করলে:

হিমালয় কেমন, তা শুনলে! হিমালয়ের উপরে কি, নিচে কি, সমুদ্রের এপারে কি, ওপারে কি সবই তো শুনলে, কিন্তু এগুলো তৈরি করলে কে, তার খবর রাখ? প্রথমে সেইটে বলি, শোনো—একদিন বিশ্বকর্মা গোলার মতো একতাল কাদা পাকিয়ে নতুন পৃথিবী গড়তে বসলেন। চন্দ্র সূর্য গড়া হয়েছে এইবার সসাগরা আমাদের এই ধরা তিনি গড়তে আরম্ভ করলেন। সেদিনটাও এমনই আঁধার আঁধার ছিল। বিশ্বকর্মার আর কাজে মন যাচ্ছে না, তিনি কাদা নিয়ে কেবল পৃথিবীটার উপরে বুড়ো আঙুলের টিপ দিয়ে এ দেশ-সে দেশ গড়ে চললেন, সব দেশ মিলিয়ে দেশ-বিদেশগুলোর চেহারাটা হল ঠিক যেন হাড্ডিসার—এখানে ওখানে মাটিঝরা শির বার করা বাঁকাচোরা টোল খাওয়া দোমড়ানো চোপসানো গরু, ঘাড় ঝুঁকিয়ে সমুদ্রের জল খাচ্ছে আর ঠিক তারই সামনে একটা গরুড় পক্ষীর ছানা, সেও যেন গো-ডিম থেকে সবে বার হয়ে মাছ ধরবার জন্যে সমুদ্রের দিকে গলা বাড়িয়েছে।

বিশ্বকর্মার পাশে বিশ্বামিত্র বসেছিলেন; তাঁর বিশ্বাস, বিশ্বকর্মার চেয়ে গড়ন-পিটন করতে তিনি পাকা। বিশ্বকর্মার সঙ্গে বাজি রেখে প্রায়ই বিশ্বামিত্র এটা ওটা গড়তেন, প্রত্যেক বারে বাজিও হারতেন কিন্তু তবু তাঁর বিশ্বাস গেল না যে বিশ্বকর্মার চেয়ে তিনি পাকা কারিগর! বিশ্বকর্মার ছিষ্টি মিষ্টি-আতা খেয়ে বিশ্বামিত্র এক আতা গড়লেন, দেখতে বিশ্বকর্মার আতার চেয়েও ভাল কিন্তু সমুদ্রের জল দিয়ে গড়বার কাদা ছানার দরুন বিশ্বামিত্রের আতা এমনই নোনা হয়ে গেল যে মুখে দেবার যো নেই! ডিম ফুটে পাখি বেরোচ্ছে বিশ্বকর্মা ছিষ্টি করলেন, পাখিদের মা-বাপ—তাদের ডিম, ডিমের মধ্যে বাচ্চা—বিশ্বামিত্র বললেন, 'ও কি হল? এ কি আবার একটা ছিষ্টি! আমি গাছে পাখি ফলাব।' বিশ্বামিত্র অনেক মাথা ঘামিয়ে অনেক আঁকজোক কষে স্থির করলেন—ডিমে তা দেওয়া চাই কিন্তু পাখি তা দিলে তো চলবে না—তিনি এমন নারকোল গাছ সুপুরি গাছ তাল গাছ ছিষ্টি করলেন যাতে দিনভর রোদ পায়, কিন্তু বেশি রোদ পেলে ডিম একেবারে সিদ্ধ হয়ে যাবে, আবার রাতে হিম পেলেও নষ্ট হবে, জল পেলে পচে যাবে! সব ভেবেচিন্তে বিশ্বামিত্র বড় বড় পাখির পালকের মতো পাতা গাছের আগায় বেঁধে দিয়ে সেই পাতার গোড়ায় দশটা বারটা কুড়িটা পঁচিশটা করে ছোট বড় নানা রকম ডিম ঝুলিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন পাখি বার হয়, কিন্তু পাছে কাগে চিলে ঠুকরে ডিমগুলো ভেঙে দেয় সেজন্যে বিশ্বামিত্র ডিমের খোলাগুলো এমনই শক্ত করে বানিয়েছেন যে বাচ্চা পাখি সেই পুরু নারকোল মালা নারকোল ছোবড়া তালের খোলা সুপুরির ছাল ভেঙে বার হতেই পারলে না। কোনওটা রোদে পক্ক কোনওটা অর্ধপক্ক কোনওটা অপক্কই রয়ে গেল। ডিম হল, তার শাঁস জল হল, তা দেওয়া হল, সবই হল, কিন্তু তা থেকে পাখি হল না।

এতেও বিশ্বামিত্রের চৈতন্য হল না! বিশ্বকর্মাকে গোরূপা পৃথিবী গড়তে দেখে তাঁরও গড়বার সাধ হল। তখন বিশ্বকর্মা গোরূপা পৃথিবীর বাঁটের মতো ভারতবর্ষটি অতি যত্ন করে গড়ছেন, সব তখনও গড়া হয়নি কিন্তু এতেই মনে হচ্ছে এই দেশটি হবে চমৎকার, একেবারে কামধেনুর বাঁটের মতো দেশটি—যা চাই যত চাই এখানে পাওয়া যাবে। বিশ্বামিত্র তাড়াতাড়ি একটু কাদা নিয়ে বসে বললেন, 'দাদা তুমি খানিক এই দেশটার গড়, আমিও খানিক গড়ি—দেখা যাক কার ভাল হয়।' বিশ্বকর্মা ভারতবর্ষের আদড়াটা প্রায় শেষ করেছিলেন কাজেই বিশ্বামিত্র খারাপ করে দিলেও দেশটা একেবারে মাটি হয়ে যাবে না জেনে, দেশটার উপরে বিশ্বামিত্রকে গড়াপেটা করতে দিতে বিশ্বকর্মা আপত্তি করলেন না। তাঁকে সমস্ত উত্তর দিকটা গড়তে ছেড়ে দিয়ে নিজে বাংলাদেশটা গড়তে বসে গেলেন। বাংলাদেশটা সুন্দর করে নদী গ্রাম ধানক্ষেত, সুন্দরবন, আমকাঁঠালের বাগান, খড়ের চাল দেওয়া ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর দিয়ে চমৎকার করে সাজিয়ে তুলতে বিশ্বকর্মার বেশি দেরি লাগল না। বুড়ো আঙুলের দু'চার টিপ দিয়ে মাঠগুলো আর আঙুলের দাগ দিয়ে নদীনালা বানিয়ে তিনি কাজ শেষ করে বসে বিশ্বামিত্রের দিকে চাইলেন। বিশ্বামিত্র অমনি বলে উঠলেন—'আমার কাজ অনেকক্ষণ শেষ হয়েছে, দেখবে এসো।'

বিশ্বকর্মার ছিষ্টি বাংলাদেশ দেখে বিশ্বামিত্র এবারে নিন্দা করতে পারলেন না, চমৎকার! সুজলা সুফলা—বীজ ছড়ালেই ফসল, কোথাও উঁচু-নিচু এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়-পর্বত নেই বললেই হয়, যতদূর চোখ চলে সবুজ ক্ষেত আর জলা। বিশ্বামিত্র দাড়ি নেড়ে বললেন—'হ্যাঁ, এবারের ছিষ্টিটা হয়েছে মন্দ নয়, কিন্তু আমার দেশটা আরও ভাল হয়েছে দেখতে', বলে বিশ্বামিত্র বিশ্বকর্মাকে উত্তর ভারতবর্ষটা কেমন হয়েছে দেখতে বললেন।

বিশ্বকর্মার আদড়া উলটে-পালটে বিশ্বামিত্র গ়ড়েছেন। পাঞ্জাবে টেনেছেন পাঁচটা নদীর খাত কিন্তু সেখানকার জমিতে সার মাটি না দিয়ে তিনি দিয়েছেন বালি আর কাঁকর, ধানও হবে না, চালও হবে না, মানুষগুলো কেবল যেন জল খেয়েই থাকবে। তারপর পাহাড় অঞ্চলে দু'জনে উপস্থিত—বিশ্বকর্মা বিশ্বামিত্রের কীর্তি দেখে অবাক! যেখানে যা পেরেছেন পাথর সবগুলো জড়ো করে এক হিমালয় পাহাড়ের ছিষ্টি করে বসেছেন বিশ্বামিত্র। তাঁর চিরকাল মাথায় আছে সূর্যের তাপ—গাছপালা মানুষ গরু সব জিনিসের পক্ষে ভাল, কাজেই তাঁর ছিষ্টি করা পাহাড় দেশ তিনি যতটা পারেন সূর্যের কাছে ঠেলে তুলেছেন আর সেই সব পাথরের গায়ে এখানে ওখানে দু-চার মুঠো মাটি ছড়িয়ে দু-একটা ঘাসের চাপড়া লাগিয়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসেছেন!

বিশ্বামিত্র একগাল হেসে যেমন বলেছেন, 'কেমন দাদা, ভাল হয়নি?' অমনি ঝুপঝুপ করে এক পশলা বৃষ্টি নামল আর পাহাড়ের সব মাটি ঘাস ধুয়ে গিয়ে খালি পাথর আর নুড়ি বেরিয়ে পড়ল। এদিকে পাহাড়ের এখানে-ওখানে উপরে-নিচেয় এত বিষ্টির জল জমা হল যে তাতে সারা পৃথিবীর নদীতে জল দেওয়া চলে!

বিশ্বকর্মা বলে উঠলেন—'করেছ কি, সব উল্টা-পাল্টা! যেখানে মাটি চাই, সেখানে দিয়েছ কাঁকর, যেখানে জল দরকার সেখানে দিয়েছ বালি, আর যেখানে জল মোটেই দরকার নেই সেখানে জমা করেছ রাজ্যের জলাশয়, তোমার মতলব তো কিছু বোঝা গেল না!'

বিশ্বামিত্র দাড়ি মোচড়াতে মোচড়াতে বললেন—'শীতে যাতে লোক কষ্ট না পায়, তাই দেশটা যতটা পারি সূর্যের কাছে দিয়েছি, এতে দোষটা হল কি!'

বিশ্বকর্মা বললেন—'উঁচু জমিতে দিনে যেমন গরম রাতে তেমনই ঠাণ্ডা, এটা তো তোমার মনে রাখা উচিত ছিল, এত উঁচুতে তো কিছু গাছপালা গজানো শক্ত, গরমে জ্বলে যাবে বরফে সব জমে যাবে! এত পরিশ্রম তোমার সব মাটি হল, দেখছি!'

বিশ্বামিত্র মাথা চুলকে বললেন—'আমি সব এখানকার উপযুক্ত মানুষ ছিষ্টি করে দিই। তারা দেখবে এই পাহাড়কে ভূস্বর্গ করে তুলবে!'

বিশ্বকর্মা বললেন—'আর তোমার ছিষ্টি করে কাজ নেই, মানুষ গড়তে শেষে বাঁদর গড়ে বসবে!''

'কোনও ভয় নেই, এবার আমি খুব সাবধানে গড়ছি। দেখ এবারে ঠিক হবে'—বলে বিশ্বামিত্র একরাশ প্রজাপতির ডানা গড়ে রেখে বিশ্বকর্মাকে ডেকে বললে—'দেখসে মজা!'

বিশ্বকর্মা ভেবেই পান না, এত ডানা নিয়ে বিশ্বামিত্র কি করবেন! তিনি শুধোলেন—'এগুলো কি হবে ভাই?'

বিশ্বমিত্র খানিক কপালে আঙুল বুলিয়ে চিন্তা করে বললেন—'পাহাড়দের সব ডানা দিয়ে দিতে চাই, তারা যেখানে খুশি—শীতের সময় গরমদেশে, গরমের সময় শীতদেশে, উড়ে উড়ে বিচরণ করতে পারবে, তাহলে এখানে যারা বাস করবে তাদের আর কোনও অসুবিধে হবে না!'

বিশ্বকর্মা ভয় পেয়ে বলে উঠলেন—'সর্বনাশ, পাহাড় যেখানে সেখানে উড়ে বসতে আরম্ভ করলে যে সব দেশে পাহাড়-পর্বত গিয়ে পড়বে, সে সব দেশের দশা হবে কি? লোকগুলো সুদ্ধ সারাদেশ যে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবে!'

বিশ্বামিত্র বলে উঠলেন—'তা কেন! লোকেরা সব ধনদৌলত খাবারদাবার নিয়ে পাহাড়ে চড়ে বসবে, তাহলেই কোনও গোল নেই!' বিশ্বকর্মা বললেন—'সবাই পাহাড়ে চড়ে ঘুরে বেড়ালে আমার জমিতে হাল দেয় কে, রাজত্বই বা করে কে, ঘরবাড়িই বা বেঁধে থাকে কে!'

'তা আমি কি জানি'—বলে বিশ্বামিত্র হিমালয়ের ডানা দিতে যান, এমন সময়ে বিশ্বকর্মা তাঁর হাত চেপে ধরে বললেন—'আগে হিমালয়ের বাচ্চা এই ছোটোখাটো মন্দর পর্বতটাকে ডানা দিয়ে দেখ, কি কাণ্ড হয়, পরে বড়টাকে নিয়ে পরীক্ষা কর।'

বিশ্বামিত্র মন্দর পর্বতে ডানা দিয়ে যেমন ছেড়ে দেওয়া, সে অমনি উড়তে উড়তে বাংলাদেশের দক্ষিণ ধারে যে সব দেশ গড়া হয়েছিল সেইখানে উড়ে বসল! যেমন বসা অমনি সারাদেশ রসাতলে তলিয়ে গেল; মাটি যেখানে ছিল সেখানে একটা উপসাগর হয়ে গেছে দেখা গেল। মানুষ যারা ছিল তাদের চিহ্ন রইল না, কেবল মাছগুলো জলে কিলবিল করতে লাগল, আর মন্দর পর্বতটা সমুদ্র তোলপাড় করে এমনই সাঁতার কাটতে আরম্ভ করলে যে, জলপ্লাবনে বিশ্বকর্মার ছিষ্টি মাটি ধুয়ে যাবার যোগাড়!

বিশ্বকর্মা তাড়াতাড়ি সমুদ্রের ধারে ধারে বালির বাঁধ দিয়ে জল ঠেকিয়ে কপালের ঘাম মুছে বললেন—'আমার হাতের কাজে তোমায় আর হাত দিতে দিচ্ছিনে। এই পৃথিবীর উত্তর শিয়র আর দক্ষিণ শিয়রে কিছু নেই, কিছু সৃষ্টি করতে হয় সেই দু'জায়গায় করগে! যে ভুলগুলো করেছ সেগুলো আমাকে শুধরে দিতে দাও এখন!' বিশ্বামিত্রের হাত থেকে বিশ্বকর্মা গড়বার যন্তর-তন্তর কেড়ে নিয়ে পাহাড়ে যত জল জমা হয়েছিল, সমস্ত নালা কেটে ঝরনা দিয়ে সমুদ্রের দিকে বইয়ে দিলেন। বিশ্বকর্মার ছিষ্টিতে কিছু বাজে থাকবার যো নেই, নষ্ট হবার যো নেই—পাহাড়ের জল সমুদ্রে পড়ে, সেখান থেকে সূর্যের তাপে মেঘ হয়ে আকাশ দিয়ে দেশ-বিদেশে বিষ্টি দিয়ে ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল গজাতে চলল!

বিশ্বকর্মা ইন্দ্রকে বললেন—'বাজ দিয়ে মন্দর পর্বতের ডানা কেটে দাও!' ডানা কাটা গেল, মন্দর সমুদ্রেই ডুবে রইল আর তার ডানার কুচিগুলো এখানে-ওখানে সমুদ্রের মাঝে টাপুর মতো ভাসতে লাগল। বিশ্বকর্মা সেগুলোর উপরে মাটি ছড়িয়ে দিলেন, বসতি বসিয়ে দিলেন। তারপর বিশ্বামিত্র যত ডানা গড়ে রেখেছিলেন সেগুলো দিয়ে বিশ্বকর্মা প্রজাপতি ভোমরা মৌমাছি সব গড়ে দিলেন। তারা দেশ-বিদেশ থেকে ফুলের রেণু ফুলের মধু এনে পাহাড়ে পাহাড়ে বাগান বসাতে শুরু করে দিলে। দেখতে দেখতে পাথরের গায়ে সব ফুল গজাল ফল ফলল। সব ঠিক করে বিশ্বকর্মা প্রকাণ্ড দুই ডানা দিয়ে দক্ষ প্রজাপতি ছিষ্টি করে হাত-পা ধুয়ে ভাত খেতে গেলেন, শাস্তরের ছিষ্টিতত্ত্ব তো এই হল, তারপর দক্ষ প্রজাপতির কথা পুরাণে লিখেছে যেমন, বলি শোনো—

বিধির মানস সূত দক্ষমুনি মজবুত
প্রসূতি তাহার ধর্ম-জায়া।
তার গর্ভে সতী নাম অশেষ মঙ্গলধাম
জনম লভিল মহামায়া।
নারদ ঘটক হয়ে নানামতে বলে কয়ে
শিবেরে বিবাহ দিল সতী।

নারদ তো ঘটকালি নিয়ে সরে পড়লেন, এদিকে শিব ষাঁড়ে চড়ে ভুটিয়ার দলের সঙ্গে ডমরু বাজিয়ে জটায় সাপ জড়িয়ে হাড়মালা গলায় ঝুলিয়ে নাচতে নাচতে হাজির।

দক্ষ প্রজাপতি বরের চেহারা দেখেই চটে লাল—

শিবের বিকট সাজ
দেখি দক্ষ ঋষিরাজ
বামদেবে হৈল বাম-মতি।

সেই থেকে জামাই শ্বশুরের মুখ দেখেন না। দক্ষ প্রজাপতিও শিবনিন্দে না করে জল খান না। এই সময়ে দক্ষ শিবহীন যজ্ঞ করলেন, সব দেবতা নেমতন্ন পেলেন। সতীর বোনেরা গয়নাগাটি পরে পালকি চড়ে শিবের বাড়ির সামনে দিয়ে ঝমর ঝমর করতে করতে বাপের বাড়ি মাছের মুড়ো খেতে চলল দেখে সতীর চোখে জল এল। দুঃখী বলে বাবা তাঁদের নেমতন্ন পাঠাননি!

সতী বোনেদের পালকির কাছে গিয়ে দিদির গলা ধরে কেঁদে কেঁদে বললেন:

অশ্বিনীদিদি! আমারে দুখিনী দেখিয়া পিতে
অবজ্ঞা করিয়া যজ্ঞে আজ্ঞা না করিলেন যেতে,
নিজ বাপ নহে অন্য শুনে হৃদে এই ক্ষুণ্ণ
আমা ভিন্ন নেমতন্ন করেছেন এই ত্রিজগতে।

অশ্বিনীদিদি আঁচলে সতীর চোখের জল মুছিয়ে বললেন—'তুই চল না। বাপের বাড়ি যাবি তার আবার নেমন্তন্ন কিসের? আয় আমার এই পালকিতে।'

সতী ঘাড় নেড়ে বললেন—'না ভাই—তিনি রাগ করবেন!'

'তবে তুই তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পরে আয়'—বলে সতীর দিদিরা—

চতুর্দোলে সবে চড়ি চলিলেন হরষে
হেথায় শঙ্করী ধেয়ে করপুটে দাণ্ডাইয়ে
চরণে প্রণতি হয়ে কহিলেন গিরিশে
আমি বাপের বাড়ি যাব।

শিব বললেন—

সতী তুমি যেতে চাচ্ছ বটে,
পাঠাইতে না হয় ইচ্ছা দক্ষের নিকটে।

আমাদের শ্বশুর জামায়ে কেমন ভাব শোনো—

আমাদের ভাব কেমন জামাই শ্বশুরে, যেমন দেবতা আর অসুরে,
যেমন রাবণ আর রামে, যেমন কংস আর শ্যামে,
যেমন স্রোতে আর বাঁধে যেমন রাহু আর চাঁদে,
যেমন জল আর আগুনে, যেমন তেল আর বেগুনে,
যেমন পক্ষী আর সাতনলা, যেমন আদা আর কাঁচকলা,
যেমন ঋষি আর জপে, যেমন নেউল আর সাপে,
যেমন ব্যাঘ্র আর নরে, যেমন গোমস্তা আর চোরে,
যেমন কাক আর পেচক, যেমন ভীম আর কীচক।

'দক্ষ যখন অমান্য করে বারণ করেছেন নিমন্ত্রণ, কেমন করে সেখানে তোমার যাওয়া হয়!'

সতী কিন্তু শোনেন না শিবের কথা, তিনি সেজেগুজে নন্দীকে সঙ্গে নিয়ে মহাদেবের ষাঁড়ে চড়ে বাপের বাড়ি চললেন দুঃখিনী বেশে। কুবের দেখে বাক্সভরা একালের সেকালের গহনা এনে বললে—'মা, এমন বেশে কি যেতে আছে! বাপের বাড়ির লোকে বলবে কি—ওমা, একখানা গয়নাও দেয়নি জামাই!' সতী কুবেরের দেওয়া গহনা পরে সাজলেন, কিন্তু দক্ষ প্রজাপতির কন্যা সতী এমন সুন্দরী যে সোনা হীরে তাঁর সোনার অঙ্গের আলোর কাছে টিমটিম করতে লাগল। 'দূর ছাই' বলে সতী সেগুলো ফেলে দিয়ে পাহাড়ি ফুলের সাজে সেজে বার হলেন। ত্রিলোক সতীর চমৎকার বেশ দেখে ধন্য ধন্য করতে করতে সঙ্গে চলল।

এদিকে ছোট মেয়ে সতী এল না, কাজের বাড়ি শূন্য ঠেকছে, সতীর মা কেবলই আঁচলে চোখ মুচছেন, এমন সময় দাসীরা এসে প্রসূতিকে খবর দিলে—'ওমা তোর সতী এল ঐ!' এই শুনে—

রানী উন্মাদিনী প্রায়
কৈ সতী বলিয়া অতি বেগে তথা ধায়।
অম্বিকারে দৃষ্টি করি বাহিরেতে এসে
আয় মা বলে লইয়া কোলে
নয়ন জলে ভাসে।

সতী মায়ের কাছে বসে একটু দুধ সন্দেশ খেয়ে সভা দেখতে চললেন। ইন্দ্র চন্দ্র সব বসেছেন, বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ সব বসেছেন দক্ষ প্রজাপতিকে ঘিরে, আর কালোয়াত সব গান-বাজনা করছে—

ধির কুট কুট তানা নানা তাদিম তা, তা দিয়ানা ঝেন্না ঝেন্না
নাদেরে দানি তাদেরে দানি, ওদেরে তানা দেরে তানা
তাদিম তারয়ে তারয়ে দানি।
দেতারে তারে দানি ধেতেনে দেতেনে নারে দানি।

বেশ গান-বাজনা চলেছে—এমন সময় সভাতে সতীকে আসতে দেখেই দক্ষ শিবনিন্দে শুরু করলেন। দক্ষ প্রজাপতি:

কেবল এ গ্রহ আনি নারুদে ঘটালে,
কনিষ্ঠা কন্যাটা আমি দিলাম জলে ফেলে;
বস্ত্রবিনা বাঘছাল করে পরিধান,
দেবের মধ্যে দুঃখী নাই শিবের সমান!
ভূত সঙ্গে শ্মশানে-মশানে করে বাস,
মাথার খুলি বাবাজির জল খাবার গেলাস!
যায় বলদে বসে গলদেশে মালাগুলো সব অস্থি,
সিদ্ধি ঘোঁটার সদাই ঘটা বুদ্ধি সেটার নাস্তি;
অদ্ভুত সঙ্গেতে ভূত গলায় সাপের পৈতে,
তারে আনিলে ডেকে হাসিবে লোকে—তাই হবে কি সইতে!
পাগলে সম্ভাষা করা কোন প্রয়োজন,
সাগরে ফেলেছি কন্যা বলে বুঝাই মন।

দক্ষের শিবনিন্দা শুনে সতী আর সইতে পারলেন না।

পতিনিন্দা শুনি সতী জীবনে নৈরাশ,
ঘন ঘন চক্ষে ধারা সঘনে নিশ্বাস;
পিতারে কুপিতা হইয়া অঙ্গ অবসান,
ধরা শয্যা করি 'তারা' ত্যেজিলেন প্রাণ!

সতী শিবনিন্দা শুনে প্রাণত্যাগ করলেন, চারদিকে হাহাকার উঠল। সতীর সাতাশ বোন আকাশের তারা সব কাঁদতে লাগল, নন্দী কাঁদতে লাগল, ভৃঙ্গী কাঁদতে লাগল, দেবতারা কাঁদতে লাগলেন, মানুষেরা কাঁদতে লাগল—

ফিরে চাও মা বাঁচাও পরাণী,
ধূলাতে পতিত কেন পতিত-পাবনী;
দুটি নয়নতারা মুদিয়া তারা—
অধরা কেন ধরাসনে!

নন্দী গিয়ে কৈলাসে মহাদেবকে খবর দিলে—'মা আর নেই।' তখন শিব ক্রোধে হুহুঙ্কার ছাড়লেন, অমনই শিবদাস সব দক্ষযজ্ঞ নাশ করতে আগুয়ান হল। মহাদেব যুদ্ধে চললেন, পৃথিবী কাঁপতে থাকল, মেঘ সব গর্জন করে উঠল, আকাশে বিদ্যুৎ বাজ ছুটোছুটি করতে থাকল কড়মড় করে, শিব ত্রিশূল হাতে সাজলেন—

মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে,
ভবম্বম ভবম্বম সিঙ্গা ঘোর বাজে;
ফণাফণ ফণাফণ ফণী ফন্ন গাজে
মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে;
ধকধ্বক ধকধ্বক জ্বলে বহ্নি ভালে,
ববম্বম ববম্বম মহাশব্দ গালে;
ধিয়াতা ধিয়াতা ধিয়া ভূত নাচে
উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে।

চলে ভৈরবা ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী,
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে
চলে শাঁখিনী পেতিনী মুক্ত কেশে!

ভূতপ্রেত নিয়ে শিব এসে উপস্থিত। ভয়ে কারু মুখে কথা নেই, মহাদেব হুকুম দিলেন ভূতিয়া ফৌজকে—যজ্ঞনাশ কর। অমনি—

রুদ্রদূত ধায় ভূত নন্দী ভৃঙ্গী সঙ্গিয়া
ঘোরবেশ মুক্ত কেশ যুদ্ধ রঙ্গ রঙ্গিয়া,
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে,
যজ্ঞগেহ ভাঙ্গি কেহ হব্যগব্য খাইছে,
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে,
ঘোররোল গণ্ডগোল চৌদ্দলোক কাঁপিছে;
ভূত ভাগ পায় লাগ লাথি কিল মারিছে
বিপ্র সর্ব দেখি খর্ব ভোজ্য বস্ত্র সারিছে
ভার্গবের সৌষ্ঠবের দাড়ি গোঁফ ছিণ্ডিল
পুষণের ভূষণে দন্ত পাঁতি পড়িল,
ছাড়ি মন্ত্র ফেলি তন্ত্র মুক্ত কেশ ধায় রে,
হায় হায় প্রাণ যায় পাপ দক্ষ দায় রে!

নৈবিদ্যির থালা ফেলে বিশ্বামিত্র দৌড়—বশিষ্ঠ চম্পট, সবার দাড়িগোঁফ ছিঁড়ে কিলিয়ে দাঁত ভেঙে ভূতেরা লম্ফঝম্প করতে লাগল—

মৌনী তুণ্ড হেঁট মুণ্ড দক্ষ মৃত্যু জানিছে
মৈল দক্ষ, ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে।

দক্ষ-নিপাত দেখে সতীর মা কেঁদে শিবকে বললেন—

সতীর জননী আমি, শাশুড়ী তোমার,
তথাপি বিধবা দশা হইল আমার?
প্রসূতির বাক্যে শিব সলজ্জ হইল,
রাজ্যসহ দক্ষরাজে বাঁচাইয়া দিল।
ধড়ে মুণ্ড নাহি দক্ষ দেখিতে না পায়,
উঠে পড়ে ফিরে ঘুরে কবন্ধের প্রায়—

কন্দকাটা দক্ষের দুর্গতি দেখে ভূতেরা সব হাসতে লাগল, তখন শিবের হাতের কাছে ছিল পাহাড়ি একটা রামছাগল দড়ি দিয়ে হাড়কাঠে বাঁধা। তিনি সেইটে নন্দীকে দেখিয়ে দিলেন। নন্দী তার মুড়োটা কেটে দক্ষের কাঁধে জুড়ে দিয়ে দক্ষ প্রজাপতির ডানা দুটো কেটে নিয়ে চলে গেল, শিব সতীদেহ নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে কৈলাসে গেলেন! এরপরে আরও কথা আছে, কিন্তু এইখানেই দক্ষযজ্ঞ শেষ—হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়—বলে রিদয় চুপ করলে।

রামছাগল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালে, খানিক চেয়ে থেকে বললে—"ফুঃ, এমন আজগুবি কথা তো কখনও শুনিনি। বুড়ো হয়ে শিং ক্ষয়ে গেল, এমন কথা তো কোনওদিন শুনলেম না যে প্রজাপতির মাথা হয় রামছাগলের মতো আর পাহাড়গুলোর গজায় ডানা!"

রামছাগল ছেলেদের বললেন ঃ

ও সব বাজে কথায় বিশ্বাস কোরো না, বড় হয়ে মধুর সন্ধানে পেটের দায়ে তোমরা জানি দেশ-বিদেশে যাবে, এমন অনেক বাজে গল্পও তোমাদের এই দেশের পাহাড়-পর্বত নদ-নদীর নামে শুনতে পাবে। কেউ বলবে তোমার দেশ মন্দ, কেউ বলবে মন্দ নয়, কিন্তু মনে রেখো, এই হিমালয়ের জলে বাতাসে তোমরা মানুষ, ভগবান তোমাদের জন্যে সবচেয়ে ভাল, সবচেয়ে উঁচু, সবচেয়ে চমৎকার বাড়ি দিয়েছেন। এই কথাটি সর্বদা মনে রেখো, কোনওদিন ভুলো না যে পৃথিবীর সেরা হচ্ছে এই হিমালয়, আর সেইটে ভগবান দিয়েছেন তাঁর কালো ছেলেদের। এই পাথরের

সিঁড়ি এতকালের পুরানো যে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আগে এটা, তারপর গাছপালা, জন্তু-জানোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। পাখির ছানাগুলো জন্মাবার আগে যেমন তাদের বাসা তৈরি হয়ে থাকে, মানুষদের, জানোয়ারদের জন্মাবার আগে তেমনই জগৎমাতা আর বিশ্বপিতা তাদের জন্যে এই চমৎকার হিমালয় আর সমুদ্র পর্যন্ত গেছে যে পাঁচ ধাপ পাথরের সিঁড়ি তা প্রস্তুত করিয়েছিলেন। জীবজন্তুরা জন্মে যাতে আরামে থাকে, কষ্ট না পায় সেই জন্যে চমৎকার করে পাথর দিয়ে দালান রক এমনই সব নানা ঘর নানা বাড়ি তাঁরা সুন্দর করে বাঁধিয়ে দিলেন!

কিন্তু কত কালের এই বাড়ি, একে পরিষ্কার রাখা, মেরামত রাখা, যারা জন্মাতে লাগল তাদের তো সাধ্য হল না, এককালের নতুন বাড়ি পাথরের সিঁড়ি সব ভেঙে ফেটে পড়তে লাগল, বর্ষায় এখানে-ওখানে সোঁতা লাগল, শেওলা গজাল, হাওয়াতে ধুলোমাটি এসে ধাপগুলোতে জমা হতে থাকল, ঝড়ে ভুমিকম্পে বড় বড় পাথর খসে খসে এখানে ওখানে পড়ল, এখানটা ধসে গেল, সেখানটা বসে গেল, ওটা ভেঙে পড়ল, সেটা বেঁকে রইল, এইভাবে কালে কালে ধাপগুলোর উপরের তলার মাটি তাকে ধুয়ে নিচের তলায় নামতে লাগল; আর ধাপে ধাপে সেখানে যেমন মাটি পেলে নানা জাতের গাছপালা বনজঙ্গল দেখা দিলে। উপরতলার মাটি ধুয়ে গেছে সেখানে কাঁকর আর নুড়িই বেশি, তারপরের ধাপে অল্প মাটি আছে সেখানে অল্পসল্প চাষবাস চলেছে দেখ, খুব ছোটো ছোটো ক্ষেত, ছোট গ্রাম। মাঝের ধাপে অনেকটা মাটি জমা হয়েছে। সেখানে দেখ দার্জিলিং শহর বাড়িঘর বাজার চা বাগান। কোম্পানির বাগান সব বসে গেছে, উপরতলার মতো অতটা ঠাণ্ডাও নয়, কাজেই সেখানে নানা গাছ ঝাউ বাদাম আখরোট পিচ পদম সব তেজ করেছে। নানা ফুলও সেখানে!

কিন্তু হিমালয়ের সব নিচের ধাপে যত কিছু ভাল মাটি এসে জমা হয়েছে জলে ধুয়ে একেবারে সমুদ্রের ধার পর্যন্ত, সেখানে ফলফুলের বাগান ক্ষেতের আর অন্ত নেই, মাটিতে সেখানে এত তেজ যে, যা দাও ফলবে, আর সেখানে শীতও বেশি নয়, বরফও পড়ে না, সেখানে গাছ এক একটা যেন একখানা গ্রাম জুড়ে রয়েছে, আর চারদিকে আম-কাঁঠালের বন।

পাহাড়ে বরফ পড়লে আমি ইস্কুল বন্ধ করে সেখানে চরতে যাই, নিজের চোখে দেখে এসেছি যা, তাই বলছি। ঋষিদের মতো চোখ বুজে ধ্যান করে গল্প বলবার জন্যে আমি ইস্কুল মাস্টারি করতে আসিনি। ছাত্রগণ! চোখ দিয়ে দেখাই হল আসল দেখা, ঠিক দেখা, আর চোখ বুজে ধ্যান করে দেখবার মানে খেয়াল দেখা বা স্বপন দেখা। খেয়ালীদের বিশ্বাস কোরো না, তা তাঁরা ঋষিই হন, কবিই হন, যা দুই চোখে দেখছি তাই সত্যি, তাছাড়া সব মিছা, সব কল্পনা, গল্পকথা, খেয়াল!

রামছাগল দাড়ি নেড়ে শিং বেঁকিয়ে কটমট করে তাদের দিকে তাকাচ্ছে দেখে সুবচনীর খোঁড়া হাঁস হেলতে দুলতে এগিয়ে এসে বললে—'ছাত্রগণ, তোমাদের মাস্টার যা বললেন ঠিক, চোখে না দেখলে কোনও জিনিসে বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু এই পাহাড়-পর্বত কুয়াশায় যখন দেখা যায় না, তখন কি বলতে হবে কুয়াশার মধ্যে কিছু নেই? না বলতে হবে, সূর্য চন্দ্র আকাশ ছেড়ে পালিয়েছেন। ঠিক জিনিস সব সময়ে চোখে পড়ে না, সেইজন্যে এই দুই চোখের উপর নির্ভর করে থাকি বলে আমরা কোনওদিন মানুষের সমান হতে পারব না। মানুষের মধ্যে যাঁরা ঋষি, যাঁরা কবি, তাঁরা শুধু দুই চোখে দেখলেন না, তাঁরা ধ্যানের চোখে যা দেখতে পেয়েছেন সেইগুলো ধ্যান করে কেতাবে লিখেছেন, তা পড়লে তোমরা জানতে পারবে—এই হিমালয় প্রথমে সমুদ্রের তলায় ছিল। হঠাৎ এক সময় পৃথিবীর মধ্যেকার তেজ মহাবেগে জল ঠেলে আকাশের দিকে ছুটে বার হল আর তাতেই হল সব পর্বত। যে সময় পাহাড় হয়েছিল সে সময় কেউ দেখিনি কেমন করে কি হল, কিন্তু মানুষ ধ্যান করে অনুসন্ধান করে এই পাহাড়ের জন্ম যেন চোখে দেখে কেতাব লিখেছে।'

'মাস্টার মহাশয়ের কথায় কি কেতাবগুলো অবিশ্বাস করবে।' বলে খোঁড়া একটি সমুদ্রের শাঁখ পাহাড়ের উপর থেকে তুলে নিয়ে রামছাগলকে দেখিয়ে বললে—'হিমালয় তো এককালে সমুদ্রের গর্ভে ছিল, এই শাঁখই তার প্রমাণ!'

রামছাগল ঘাড় নেড়ে বললে—'ও কথা আমি বিশ্বাসই করিনে। নিশ্চয় কোনও পাখিতে এনে ওটাকে ফেলেছে।'

খোঁড়া বললে—'তা হয় না। সমুদ্রের একেবারে নিচেয় থাকে এই শামুক, পাখি সেখানে যেতে পারে না।'

রামছাগল তর্ক তুললে—'তবে মাছে খেয়েছে, সেই মাছ মরে ভেসে এসেছে সমুদ্রের ধারে, সেখানে পাখি তাকে খেয়ে শাঁখটা মুখে নিয়ে হিমালয়ে এনে ফেলেছে!'

খোঁড়া হাত নেড়ে বললে—'তাও হয় না। সমুদ্রের যেখানে এই শাঁখ থাকত, সেখানে মাছ কেন, মানুষ পর্যন্ত যেতে পারা শক্ত!'

রামছাগল অমনই দাড়ি চুমড়ে বললে—'তবে মানুষ জানল কেমন করে এ শাঁখ সমুদ্রের তলাকার, পাহাড়ের উপরকার নয়।'

সুবচনী পাছে তর্কে হেরে যায় রিদয় তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠল—'জানো না, মানুষ ডুবুরি নামিয়ে মুক্তো তোলবার সময় এই সব শাঁখ কুড়িয়ে এনেছিল ঝুড়ি ঝুড়ি!'

রামছাগল শিং নেড়ে বললে—'ঝুড়ি থেকে তারই গোটাকতক শাঁখ হয়তো মাটিতে পড়ে গিয়েছিল।' হঠাৎ সুবচনী বললে—'তা নয়'—সুবচনী আরও কি বলতে যাচ্ছে অমনই ছাগল রেগে বললে—'তা যদি নয়তো নিশ্চয় আগে শাঁখের সব ডানা ছিল, উড়ে এসেছে হাঁসেদের মতো এই পাহাড়ে।'

রিদয় অমনই বলে উঠল—'শাঁখের যদি ডানা থাকতে পারে তবে পাহাড়গুলোর ডানা ছিল একথাই বা কেন বিশ্বাস করবে না?'

সুবচনী অমনই বলে উঠল—'আর প্রজাপতির মাথায় রামছাগলের মুখই বা না হবে কেন, তা বল!'

ভালুকে-শেয়ালে হাঁসে-ছাগলে তর্ক বেধে গেল, দেশের জানোয়ার সেই তর্কে যোগ দিয়ে চেঁচামেচি হট্টগোল বাধিয়ে দিলে।

শিকরা বহরী বাসা বাজ তুরমুতি
কাহা কুহী লগড় ঝগড় জোড়াথুতি
ঠেটি ভেটি ভাটা হরিতাল গুড়গুড়
নানাজাতি কাক পেঁচা বাবুই বাদুড়।

সবাই মিলে তর্ক লাগিয়েছে—'যাও যাও হুঁদি খাও!' এমন সময় গণ্ডগোল শুনে পাহাড়ের গুহা থেকে বুড়ো লামা-ছাগল বেরিয়ে এলেন—

অতি দীর্ঘকক্ষ লোম পড়ে উরু পর
নাভি ঢাকে দাড়ি গোঁফে বিশদ চামর।

ববম বম ববম বম বলতে বলতে লামাকে আসতে দেখে সবাই তটস্থ; ভালমানুষ হয়ে বসল। লামা বললেন—'তোমরা সব কি বৃথা তর্ক করছ? দেখ তর্ক কি ভয়ানক ব্যাপার, কোথায় তোমরা পড়া পড়বে, না হাতাহাতি বাধিয়েছ ভায়ে-ভায়ে—'

অভেদ হইল ভেদ এ বড় বিরোধ
কি জানি কাহারে আজি কার হয় ক্রোধ!
ভ্রান্তজীব অন্ত না বুঝিয়ে কর দ্বন্দ্ব,
কারও কিছু ঠিক নাই কেবল কহ মন্দ;
উভয়ের মন তোরে মন্ত্রণা আমি কই,
তর্কে নাহি মেলে কিছু গণ্ডগোল বই;
শুন বাক্য গুরু বাক্য করেছে প্রামাণ্য;
একে পঞ্চ পঞ্চে এক, নাই কিচ্ছু অন্য!

লামা-ছাগল লেকচার শেষ করলেন অমনই বোকা ছাগলের দল জাতীয় সঙ্গীত শুরু করে দিল—

জটজালিনী ক্ষুরশালিনী,
শিংঅধারিণী গো—
ঘনঘোষিণি ঘাস-খাদিনি,
গৃহ-পোষিণি গো।
চোঁ ভোঁ প্যোঁ পোঁ।

সেই সময় ভূমিকম্পে পাহাড় টলমল করে উঠল, অমনই হাঁসেরা রিদয়কে নিয়ে আকাশে উড়ে পড়ল। সব জানোয়ার ভয়ে লেজ গুটিয়ে চুপ হয়ে রইল! লামা-ছাগল মাঝে দাঁড়িয়ে দুলতে থাকলেন আর বলতে থাকলেন, 'একি দোলায় যে, এ্যঁ কি ভয়ানক বিয়াপার!'

রামছাগল লামার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললেন—'পর্বতটা পার্বতী-পাঠশালা সমেত উড়বে না কি—এ্যঁঃ!'

যোগী গোফা

রংপো নদীটি খুব বড় নদীও নয় ম্যাপেতেও তার নাম ওঠেনি। ঘুম আর বাতাসিয়া দুই পাহাড়ের বাঁকের মধ্যে ছোট একটি ঝরনা থেকে বেরিয়ে নদীটি পাহাড়ের গা বেয়ে দু'ধারের বনের মাঝ দিয়ে নুড়ি পাথর ঠেলে আস্তে আস্তে তরাইয়ের জঙ্গলে নেমে গেছে, নদীর দু'পার করঞ্চা টেঁপারি তেলাকুচো বৈচি ডুমুর জাম এমনই সব নানা ফল নানা ফুল গাছে একেবারে ছাওয়া করা, মাথার উপরে আকাশ সবুজ পাতার ছাউনিতে ঢাকা, তলায় সরু নদীটি ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে। এই পাখির গানে ভোমরার গুনগুনে ফুলফলের গন্ধে জলের কুলকুল শব্দে ভরা অজানা এই নদীর গলিপথ দিয়ে হাঁসেরা নেমে চলেছে আবার শিলিগুড়ির দিকে। উপরে মেঘ করেছে, বনের তলা অন্ধকার! শেওলা জড়ানো একটা গাছের ডাল এক থোকা লাল ফুল নিয়ে একেবারে নদীর জলে ঝুঁকে পড়েছে, তারই উপরে লাল টুপি নীল গলাবন্ধ সবুজ কোর্তা পরে মাছরাঙা নদীতে মাছ ধরতে বসেছে বাদলার দিনে। নদীর মাঝে একরাশ পাথর ছড়ানো; তারই কাছাকাছি এসে চকা হাঁক দিলে—'জিরওবো জিরওবো।' অমনই মাছরাঙা সাড়া দিলে—'জিরোও জিরোও।' আস্তে আস্তে হাঁসের দল ঝরনার স্রোতে পিছল পাথরগুলোর উপর একে একে উড়ে বসল। এমনই জায়গায় জায়গায় জিরিয়ে জিরিয়ে চলতে চলতে সন্ধ্যা হয়ে এল, নিচের অন্ধকার পাহাড়ের চুড়োর দিকে আস্তে আস্তে উঠতে আরম্ভ করলে, মনে হচ্ছে কে যেন বেগুনি কম্বলের ঘেরাটোপ দিয়ে একটার পর একটা পর্বত মুড়ে রাখছে, দেখতে দেখতে আকাশ কালো হয়ে গেল, তারই মাঝে গোলাপি একটুকরো ধোঁয়ার মতো দূরের বরফের চুড়ো রাত্রের রঙের সঙ্গে ক্রমে মিলিয়ে গেল।

পাহাড়ের গলিতে অন্ধকার যে কি ভয়ানক কালো রিদয় আজ টের পেলে, নিজেকে নিজে দেখা যায় না, কোনদিক উপর কোনদিক নিচে চেনা যায় না, কিন্তু অন্ধকারেও ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে রাতের পাখিরা পাহারা দিচ্ছে। এ পাহাড়ে এক পাখি হাঁকলে—'হুহু বাতাস হুহু,' ও পাহাড়ের পাখি তারি প্রতিধ্বনি দিয়ে বলে উঠল—'ঘুটঘুট আঁধার ঘুটঘুট।' দই পাখি থামল, আবার খানিক পরে দুই পাখি আরম্ভ করলে—'জল পিটপিট তারা মিটমিট।' বোঝা গেল এখনও বিষ্টি পড়ছে, দু'একটি তারা কেবল দেখা দিয়েছে। ভালুক-ভালুকী ঝরনার পথে জল খেতে নেমেছে, তাদের চেহারা দেখা যাচ্ছে না, কেবল বলাবলি করছে শোনা যাচ্ছে—'সেঁৎ সেঁৎ।' একটা হরিণ কিম্বা কি বোঝা গেল না হঠাৎ বলে উঠল— 'পিছল।' তারপরেই পাহাড়ের গা দিয়ে একরাশ নুড়ি গড়িয়ে পড়ল।

রাতে যে এত জানোয়ার চারিদিকে ঘোরাঘুরি হাঁকাহাঁকি করে বেড়ায়, তা রিদয়ের জানা ছিল না। আঁধারের মধ্যে কত কি উসখুস করছে, খুসখুস করছে, চলছে, বলছে—কত সুরে কত রকম গলায় তার ঠিক নেই। রিদয়ের মনে হল বাতাসটা পর্যন্ত যেন বনের সঙ্গে ফুসফাস করে এক একবার বলাবলি করে যাচ্ছে। তখন রাত গভীর, ঝিঁঝি পোকা বলে চলেছে ঝিমঝিম, ঝরনা বলছে ঘুম ঘুম, রিদয়ের চোখ ঢুলে আসতে লাগল। সেই সময় দূরে শোনা গেল—''ইয়াহু ইয়াহু!'' তারপরে একেবারে রিদয়ের যেন কানের কাছেই ডেকে উঠল বিকট গলায় কী এক জানোয়ার—'তোফা হুয়া তোফা হুয়া।'

রিদয় চমকে উঠে শুনলে, কখনও এ পাহাড়ে কখনও ও পাহাড়ে দূরে কাছে আগে পাছে উপরে নিচে যেন দলে দলে কারা চিৎকার লাগিয়েছে—'ইয়াহু ইয়াহু তোফা হুয়া তোফা হুয়া।' ভয়ে রিদয়ের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সে চকার গা ঘেঁসে শুধোল—'একি ব্যাপার?'

চকা অমনই বললে—'চুপ চুপ কথা কয়ো না, ডালকুত্তা শিকারে বেরিয়েছে'—বলতে বলতে ছায়ার মতো একটা হরিণ ওপার দিয়ে দৌড়ে জলের ধারে এসে থরথর করে কাঁপতে লাগল! ঠিক সেই সময় নদীর দুই পারে শব্দ উঠল—যেন একশ কুত্তা একসঙ্গে ডাকছে—'হুয়াহু হুয়াহু হুয়াহু।' ঝপাং করে জলে একটা ছায়া লাফিয়ে পড়ল, তারপর পিছল পাথরের উপর খুরের আঁচড় বসিয়ে ভিজে গায়ে হরিণ এসে রিদয়ের পাশে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে শ্বাস টানতে টানতে কেবলই ঘাড় ফিরিয়ে চারদিকে চাইতে লাগল। চকা হরিণের ভয় দেখে বললে—'ডালকুত্তা রইল কোন পাহাড়ে তুমি এখানে ভয়ে কাঁপছ দেখি!'

রিদয় বললে—'সে কি, এই পাহাড়েই তো এখনই ডাকছিল কুকুরগুলো।'

চকা হেসে বলল—'কুকুরগুলো নয়, একটা কুকুর ডাকছিল তাও খুব দূরে। ডালকুত্তার ডাকের মজাই এই, একটা ডাকলে মনে হবে যেন দশটা ডাকছে—দূরে কাছে চারদিকে—ভয়ে কোনদিকে যাব ভেবে পাওয়া যায় না,

বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। ডালকুত্তার ডাক শুনে ভয় পেয়ে ছুটাছুটি করেছ কি মরেছ। ঠিক পায়ের শব্দ শুনে কুত্তা এসে তোমায় ধরেছে, যেখানে আছ সেইখানেই বসে থাকো চুপটি করে, তোমার সন্ধানও পাবে না ডালকুত্তা।'

হরিণ চকার কথায় কতকটা সাহস পেলে বটে কিন্তু তখনও ভয়ে তার কান দু'টো কেঁপে কেঁপে উঠছে, এমন সময় পিছনে অন্ধকারে খেঁকশিয়াল খেঁক করে হেসে উঠল, হরিণছানাটা একলাফ দিয়ে একেবারে নদী টপকে উপরের পাহাড়ে দৌড় দিলে। চকা বলে উঠল—'কে ও খেঁকশিয়াল নাকি?'

এই পাহাড়ে যে চাঁদপুরের শেয়াল এসে উপস্থিত হবে তা চকা ভাবেনি, আর খেঁকশিয়ালও মনে করেনি হাঁসেদের দেখা পাবে সে এখানে। শেয়াল আনন্দে চিৎকার আরম্ভ করলে—'হুয়া হুয়া হুয়া উয়া বাহোয়া ওয়া ওয়া!'

চকা শেয়ালকে ধমকে বললে—'চুপ অত গোল করো না, এখনই ডালকুত্তা এসে পড়বে, তখন তুমিও মরবে আমরাও মরব।'

শেয়াল একগাল হেসে বললে—'এবার আমি বাগে পেয়েছি, ডালকুত্তা লেলিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ব। সেদিন বড় সে হাঁসবাজি দেখানো হয়েছিল, এইবার শেয়ালবাজিটা দেখে নাও।' বলেই শেয়াল ডাকতে লাগল—'হুয়া উহ্য হুয়া উহ্য—তোদের জন্যে আমার আর দেশে মুখ দেখাবার যো নেই!'

চকা নরম হয়ে বললে—'অত চেঁচাও কেন, তুমি আগে আমাদের সঙ্গে লেগেছিলে। আমাদের দলের লুসাই আর বুড়ো আংলা দু'জনকে খেতে চেয়েছিলে, তবে না আমরা তোমায় জব্দ করেছি, আমরা তো মিছিমিছি তোমার সঙ্গে লাগতে যাইনি।'

শেয়াল দাঁত কড়মড় করে বললে—'ও সব আমি বুঝিনে, বিচার আমার কাছে নেই। বুড়ো আংলাটিকে আমার দু'পাটি দাঁতের মধ্যে যদি হাজির করে দাও তো এবার ছাড়া পাবে, না হলে ডালকুত্তা এল বলে!'

চকা মুখে সাহস দেখিয়ে বললে—'আসুক না কুত্তা, এই ঝরনার মধ্যে পাথরের উপরে আর আসতে হয় না—জলে নেমেছে কি কুটোর মতো কোথায় তলিয়ে যাবে তার ঠিক নেই! রিদয়কে আমরা কিছুতে ছেড়ে দেব না শেয়ালের মুখে, মরি সেও ভাল।' চকা খুব তেজের সঙ্গে এই কথা বললে বটে কিন্তু রিদয় দেখলে ভয়ে তার লেজের ডগাটি পর্যন্ত কাঁপছে। চকা চুপিচুপি তাদের সবাইকে বললে—'সাবধান, বড় গোল এবারে, যে অন্ধকার উড়ে পড়বার যো নেই; ডালকুত্তা পাকা সাতারু, বিষম জোরালো ঝরনা মানবে না, সাঁতরে উঠবে। সে জলের কুমির, ডাঙার বাঘ বললেই হয়। সব সাবধান, যে যার সামলে, দেখতে না পায় পাথরের সঙ্গে মিশিয়ে বোসো।'

হাঁসরা অমনি ডানায় মুখ ঢেকে গুটিসুটি হয়ে এক এক পাথরের মতো এখানে সেখানে চেপে বসল, কালো বুনোহাঁসের ডানার রঙে পাথরের রঙে এমন এক হয়ে গেল যে, দু'হাত তফাত থেকে চেনা যায় না, হাঁস কি পাথর। কিন্তু সুবচনীর হাঁস—তার সাদা রঙ অন্ধকারেও ঢাকা গেল না, সে রিদয়কে বুকের কাছে নিয়ে বললে—'দেখ ভাই, এবার তোমার হাতে মরণ বাঁচন।'

রিদয় নিজের টেঁক থেকে নরুনের মতো পাতলা ছুরিটি বার করে বললে—'দেখছ তো আমার অস্তর!'

হাঁস বললে—'অস্তরে ভাল করে শান দিয়ে রাখো।'

ঠিক সেই সময়ে উপর থেকে একবার ডাক এল—'ইয়াহু!' তারপরেই ঝপাং করে জলে পড়ে ডালকুত্তা হাঁসের দিকে সাঁতরে আসছে দেখা গেল। শেয়ালটা ঝোপের আড়াল থেকে চেঁচিয়ে উঠল—'হুয়া হুয়া হত্যা হুয়া!'

শেয়াল দেখলে, কুত্তা জল থেকে একটা বাঁকা নখওয়ালা লাল থাবা সাদা হাঁসটির দিকে বাড়িয়ে দিলে। হাঁসটা কখন ক্যাঁক করে ওঠে শেয়াল ভাবছে, ঠিক সে সময়ে ডালকুত্তা 'উয়াহুঃ' বলে ডিগবাজি খেয়ে জলে পড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে ওপারে উঠল, আর ডানা ঝটপট করে হাঁসের দল অন্ধকার দিয়ে একদিকে উড়ে পালাল।

শেয়ালের ইচ্ছে হাঁসের পেছনে তাড়া করে চলে, কিন্তু ব্যাপারটা হল কি সেটা জানতে তার লোভ হচ্ছে, সে ওপর থেকে ডালকুত্তাকে ডাক দিয়ে শুধোলে—'ক্যায়া হুয়া ক্যায়া হুয়া?'

রিদয়ের নরুনের ঘায়ে তখন ডালকুত্তা অস্থির! সে রেগে বললে—'চোপরাও যাও যাও!'

শেয়াল বললে—'কি দাদা হাত ফসকে গেল নাকি?'

কুত্তা গা ঝাড়া দিয়ে বললে—'সাদা হাঁসটাকে টেনে নিয়েছিলুম আর কি, কি জানি সেই সময় টিকটিকির মতো একটা কি জানোয়ার হাতে এমন দাঁত বসিয়ে দিলে যে চোখে আমি সরষে ফুল দেখলুম!' কুত্তা তার থাবা চাটতে বসে গেল।

শেয়াল 'হাঁঃ গিয়া হাঃ গিয়া' বলে কাঁদতে কাঁদতে হাঁসেদের সঙ্গে আবার দৌড়ল। হাঁসেরা রিদয়কে নিয়ে দুই পাহাড়ের গলির মধ্যে দিয়ে কেবল কুলকুল জলের শব্দটি ধরে এঁকেবেঁকে উড়ে চলেছে অজানা জায়গায়, কোথায় গিয়ে বসে ঠিক পাচ্ছে না, এমন সময় মেঘ কেটে আকাশে চাঁদ উঠল, তখন আর চকাকে পায় কে, ঝকঝকে সরু সাপের মতো নদীর ধারাটির উপরে চোখ রেখে চকা হাঁসের দলকে নিয়ে সোজা নিচ মুখে নেমে চলল। সিনিবালি চা বাগানের উপরটায় এসে নদী একটা বড় পাথর ঘুরে ঝরনা দিয়ে একেবারে দু'শ হাত নিচে পড়েছে, চাতালের মতো সেই পাথরে এসে চকা দলবল নিয়ে বাকি রাতটা কাটাতে বসল।

ঝরনার একদিকে ধাপে ধাপে চা বাগান পাহাড়ের চুড়ো পর্যন্ত সিঁড়ির মতো উঠে গেছে, আর একদিকে বনের ধারে চা বাগানের মালিকের ঘরবাড়ি, সেখান থেকে পাকদণ্ডি নেমেছে ঝরনা পর্যন্ত। হাঁসেরা রাতে এখানে-ওখানে উড়ে হাঁপিয়ে পড়েছিল, সবাই তারা ঘুমিয়ে পড়ল, রিদয় কেবল জেগে পাহারা দিতে লাগল।

খানিক রাতে বনের মধ্যে একটা ঝটাপট শব্দ শোনা গেল, তারপরেই রিদয় দেখলে ডালকুত্তার সঙ্গে শেয়াল কি ফুসফাস করতে করতে পাকদণ্ডি দিয়ে নামছে, অন্ধকারে দু'জনের চোখ আগুনের মতো জ্বলছে। রিদয় তাগ করে একটা পাথর কুচি ছুড়ে শেয়ালটাকে মারতে যাবে ঠিক সেই সময় একটা পাহাড়ি সাপের গায়ে তার হাত পড়ল, ঠাণ্ডা যেন বরফ! রিদয় একেবারে হাঁসের পিঠে লাফিয়ে উঠে বললে—'পালাও পালাও, শেয়ালটা এবারে আমাদের সাপে খাওয়াবার মতলব করেছে।'

হাঁসেরা একেবারে ডানা মেলে আকাশে যেমন লাফিয়ে উঠল, ঠিক সেই সময় পাথরের হাতুড়ির মত পাহাড়ি সাপের মাথাটা সোঁ করে তাদের পায়ের নিচে দিয়ে ছুটে এসে পাথরে ছোবল দিলে। চকা শিয়ালের উপর ভারি চটেছে, নদীর উপর দিয়ে গেলে শেয়ালটা সহজে তার সঙ্গ ছাড়বে না বুঝে চকা এবারে একেবারে উপর দিয়ে উড়ে চলল, সোজা শিলিগুড়ির স্টেশনের টিনের ছাতের দিকে।

দার্জিলিঙ মেল আসতে এখনও তিন ঘণ্টা। স্টেশনে লোকজন নেই, হোটেলগুলোর টিনের ছাত বিষ্টিতে ভিজে চাঁদের আলোয় ঝকঝক করছে। পাহাড়ের অন্ধকার ছেড়ে হঠাৎ ফাঁকায় পড়ে রিদয়ের ধাঁধা লেগে গেল। আকাশ থেকে সে টিনের ছাতগুলোকে দেখছে যেন ছোট ছোট পাহাড়ের চুড়ো সাদা বরফে ঢাকা! হাঁসেরা সেই দিকে নেমে চলল দেখে রিদয় চেঁচিয়ে বললে—'কর কি, ওখানে যে খালি বরফ, বসবার জায়গা কোথা!' কিন্তু হাঁসেরা তার কথায় কান না দিয়ে নেমেই চলল!

রিদয় দেখলে পাহাড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আকাশে দুইহাত ছড়িয়ে একটা যেন দৈত্য লাল সবুজ দু'টো চোখ নিয়ে কটমট করে তার দিকে চেয়ে রয়েছে! রিদয়ের আরও ভয় হল। সে দুই পা গুটিয়ে হাঁসের পিঠের পালকে লুকোবার চেষ্টা করছে এমন সময় হাঁসেরা ঝুপঝাপ করে স্টেশনের টিনের ছাতে নেমে পড়ল। তখন রিদয়ের ভুল ভাঙল, সে দেখলে রাস্তার আলোগুলোকে ভেবেছিল সব তারা, টিনের ছাতগুলোকে পাহাড়ের চুড়ো—আর লাল সবুজ লণ্ঠন দেওয়া সিগনাল পোস্টটাকে একটা দৈত্য।

রিদয় স্টেশন কখনও দেখেনি, টিনের ছাতে ছুটোছুটি করে এ দিক ও দিক দেখতে আরম্ভ করলে, স্টেশনের সব উঁচু চুড়োয় দু'টো কাঁটা উত্তর দক্ষিণ কোনদিকে বাতাস বইছে দেখবার জন্যে কেবলই ঘুরছে, তারই উপরে একটি গোলা, সেই গোলায় এক পা রেখে আকাশে চিমটের মতো দুই ঠোঁট উঠিয়ে কঙ্ক পাখি আরামে ঘুম দিচ্ছেন। রিদয়কে টিনের উপর ছুটোছুটি করতে শুনে কঙ্ক পাখি গোলার উপর থেকে ধমকে উঠলেন—'গোল করে কে?'

রিদয়ের দুষ্টুমি গেছে কিন্তু ফষ্টিনষ্টি করবার বাতিক এখনও খুব আছে। সে অমনি বলে উঠল—'গোল আর করবে কে, গোলের মাঝে বসে আছ তুমি, তোমারই এ কাজ!'

'ভালো রে ভালো বলেছিস' বলে কঙ্ক পাখি চিমটের মতো ঠোঁটে গিরগিটির মতো রিদয়কে ধরে বার কতক আকাশে ছুড়ে দিয়ে আবার লুফে নিয়ে আদর করে বললেন—'দেখ ছোকরা, এত রাত্রে ছাতে খুটখাট করলে এখনই স্টেশনমিস্ট্রেস মেমের ঘুম ভেঙে যাবে আর স্টেশনমাস্টার এসে আমাদের উপর গুলি চালাবে। যদি স্টেশন দেখতে চাও তো ওই জলের পাইপটা ধরে নেমে যাও কিন্তু খবরদার স্টেশনের জল খেও না, তাহলেই ম্যালেরিয়া হয়ে যুধিষ্ঠিরের চারভাই যেমন একবার মরেছিলেন তেমনই তুমিও মরবে।'

রিদয় বললে—'সে কেমন কথা?'

কঙ্ক বললেন—'শোনো তবে বলি!'

কথার নাম শুনেই চারদিকে থেকে হাঁস পাখি যে যেখানে ঘুমিয়ে ছিল চাঁদের আলোতে টিনের ছাতে বুড়ো কঙ্ক পাখিকে ঘিরে বসল। চাঁদটাও যেন গল্প শুনতে কঙ্কের ঠিক পিঠের দিকে টিনের ছাতের কার্নিশে এসে বসল।

কঙ্ক গলা খাঁকানি দিয়ে শুরু করলেন :

আমাদের কঙ্কবংশের শেষ অঙ্কের যে আমি, আমার স্বর্গীয় প্রপিতামহ ছোট কঙ্ক, তাঁর প্রস্বর্গীয় মধ্যম প্রপিতামহ মেজো কঙ্ক মহাশয়ের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ধর্মাবতার বড় কঙ্ক—তিনি কাম্যবনে এক রম্য সরোবরে বাস করছেন, এদিকে একদিন হয়েছে কি, না ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের তৃষ্ণা পেয়েছে। বনের মধ্যে তেষ্টা পেয়েছে, খুঁজেখাঁজে জল খেয়ে নিলেই হত, না হুকুম করলেন—'ওরে ভীম জল নিয়ে আয়।' ভীম চললেন—জল খুঁজেখুঁজে তাঁরও তেষ্টা পেয়ে গেল। সেই সময় আমাদের ধর্মাবতার বড় কঙ্ক সে পুকুরে পাহারা দিচ্ছিলেন, সেই কত কালের পানাপুকুরটার দিকে ভীমের নজর পড়ল, জল দেখে ভীমের তেষ্টা যুধিষ্ঠিরের চেয়ে দু'গুণ বেড়ে গেল। ভীম তাড়াতাড়ি পুকুরে নামলেন, অঞ্জলি ভরে বৃকোদর প্রায় পুকুরের অর্ধেক জল তুলে নিলেন দেখে আমার স্বর্গীয় প্রপিতামহের পিতামহের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ বলে উঠলেন—'অঞ্জলি করিয়া জল না করিহ পান, সমস্যা পূরণ করি কর জলপান—নতুবা তোমার মৃত্যু।'

সমস্যা দিয়ে জল ফিলটার করে খাবার দেরি সইল না, বৃকোদর আমাদের ধর্মাবতারের পানাপুকুরের পচাজল চকচক করে খেয়ে ফেললেন। যেমন খাওয়া, অমনই কম্পজ্বর সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। তারপর অর্জুন এলেন, নকুল সহদেব এলেন, দ্রৌপদী এলেন, সবার সেই দশা, কেউ সমস্যা দিয়ে জল শোধন করে নিতে চাইলেন না। শেষে যুধিষ্ঠির এসে ধর্মবতার কঙ্কের কথা মতো চারবার সমস্যা দিয়ে জল শোধন করে তবে বেঁচে গেলেন; আর সেই শোধন করা শান্তিজল দিয়ে চারভাই আর দ্রৌপদীকেও বাঁচিয়ে দিলেন।

রিদয় শুধোলে—'বারি শোধন করার সমস্যা কোথায় পাওয়া যায়, তার দাম কত?'

কঙ্ক হেসে বললেন—'সমস্যা কি জলের কুঁজো যে, বাজারে পাবে? সমস্কৃততে সমস্যা লেখা হয় মন্তরের মতো, সেইটে পাঠ করে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে এক নাক টিপে নাকের মধ্যে জল টেনে নিতে হয়, আর বলতে হয়, আদি গঙ্গা সাত সমুদ্র তের নদী বান্ধিলাম, দশঘড়ায় বান্ধিলাম, জিহ্বার উপর বান্ধিলাম, সরস্বতী যমুনা বন্ধ, মাতা ভাগীরথী ফুঃ ফুঃ ফুঃ। মন্তর যদি শিখতে চাও তো কামরূপ কামিখ্যেয় আমার হাড়গিলে দাদার কাছে যাও। সাপের মন্তর বাঘের মন্তর শেয়ালের মন্তর সব মন্তর তিনি জানেন, আর কোনও ভাবনা থাকবে না। নির্ভয়ে যেখানে খুশি বেড়িয়ে বেড়াতে পারবে!'

চকা বলে উঠল—'এ পরামর্শ মন্দ নয়! খেঁকশিয়ালটা যে রকম সঙ্গে লেগেছে তাতে একটা শেয়ালের মন্তর রিদয়কে না শিখিয়ে নিলে তো আর চলছে না। সেই কৈলাস পর্যন্ত যেতে হবে, এর মধ্যে কত বিপদ-আপদ আছে—চল কিছুদিন কামরূপে থেকে গোটাকতক মন্তর নিয়ে যাওয়া যাক।'

কঙ্ক বললেন—'চল, দাদার কাছে আমারও গোটাকতক মন্তর নেবার আছে।' চকাকে কঙ্ক শুধোলেন—'তোমরা কোনপথে কামরূপ যেতে চাও? ব্রহ্মপুত্রের পথে গেলে অনেক ঘুরে যেতে হবে, আর আমার সঙ্গে যদি সিধে রাস্তায় যেতে চাও তো এখান থেকে তরসা নদী একবেলা, সেখান থেকে জলপাইগুড়ি বক্সাও কুচবিহার হয়ে জয়ন্তী আর একবেলা, সেখানে রাত কাটিয়ে মোচু নদীতে জল খেয়ে গোয়ালপাড়া দশটার মধ্যে, সেখান থেকে বেলা পাঁচটায় মানস নদী, ছ'টা নাগাদ কামরূপ কামাখ্যার মন্দির—সেখানে ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে হাড়গিলের চরে আমার দাদা থাকেন।'

চকা কঙ্ক পাখির কথায় সায় দিয়ে তরসার পথেই বাঁয়ে হিমালয় পাহাড় রেখে সোজা পুবমুখী কামরূপে রওনা হল। খানিক উড়েই চকা বুঝলে কঙ্ক পাখির সঙ্গে বেরিয়ে ভাল করেনি। তার নাম যেমন কঙ্ক চলাও তেমনই বঙ্ক, মোটেই সোজা নয়! সে শিলিগুড়ি ছেড়েই দক্ষিণমুখে চলল, মহানদীর ধার দিয়ে জলপাইগুড়ি স্টেশন হয়ে তিতলিয়া পর্যন্ত, সেখান থেকে উত্তর-পুবে বেঁকে কুচবিহার ঘেঁষে বার্নিশঘাট, তারপর তিস্তা নদীর উপর দিয়ে এঁকতে-বেঁকতে উত্তরমুখে রামসাই হাট হয়ে বোগরাকুঠি, একেবারে পাহাড়তলিতে উপস্থিত, এখান থেকে সেখান থেকে পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে পুবে মাদারি পর্যন্ত। সেখান থেকে তরসা নদীর স্রোত ধরে দক্ষিণে এসে একেবারে কুচবিহার রাজবাড়ির উপরে এসে পড়া, সেখান থেকে আবার উত্তরে আলিপুর বক্সাও জয়িন্তী হয়ে একেবারে জলপাইগুড়ি পরগনার পুব মোহড়ায় মোচু নদীতে হাজির। এর পরেই গোয়ালপাড়া আরম্ভ।

এইভাবে এদিক-ওদিক একোণ-ওকোণ এপাড়া-ওপাড়া যেন কী খুঁজতে খুঁজতে কঙ্কপাখি তীরবেগে চলেছে।

তার সঙ্গে উড়ে চলা হাঁসদের সম্ভব নয়, কাজেই চকা নিজের পথ দেখে হাঁক দিতে দিতে চলল—'তরসা—তরসা।' ও দিকে যেমন কুঁকড়ো, এ দিকে তেমনই উত্তর থেকে দক্ষিণমুখে যে সব নদী চলেছে, তারই ঘাটে ঘাটে কাদা খোঁচা জলপীপী ঘাটিয়াল হাঁক দিচ্ছে—'তরসা পশ্চিমকূল মাদারি!' মাদারি হয়ে তরসার উপর দিয়ে হাঁসেরা পাড়ি দিতে লাগল, দূরে ডাইনে কুচবিহারের রাজবাড়ি, তরসার পুবপারে রাজাদের জলকরে পানিকাক হাঁকলে—'বক্সাও।' আরও দূরে জলপাইগুড়ির সীমানায় তিতিরে হাঁকলে—'জয়ন্তী।'

জলপাইগুড়ি ছাড়িয়ে গোয়ালপাড়ার মোচু নদীর কাছ বরাবর এসে হাঁসেরা আকাশ মেঘে অন্ধকার দেখলে, জোর বাতাস তাদের ক্রমেই উত্তরে পাহাড়ের গায়ে ঠেলে নিয়ে চলল। হাঁসেরা এঁকেবেঁকে কখনও উত্তর ঘেঁষে একেবারে হিমালয়ের দেওয়ালের ধার দিয়ে কখনও দক্ষিণে ফাঁকা মাঠের উপর দিয়ে উড়ে চলল সারাদিন।

গোয়ালপাড়া ছাড়িয়ে কামরূপ মানস নদীর কাছ বরাবর এসেছে, এমন সময় পশ্চিম দিকে বোঁ বোঁ সোঁ সোঁ শব্দ উঠল যেন হাজার হাজার পাখি উড়ে আসছে। পায়ের তলার মানস নদীর জল হঠাৎ কালো ঘোরাল হয়ে উঠল, দমকা হাওয়ার একটা ঝাপটা এসে হাঁসেদের ডানার পালকগুলো উস্কোখুস্কো করে দিলে!

চকা ঝপ করে ডানা বন্ধ করে পলকের মতো চমকে যেন আকাশে স্থির হয়ে দাঁড়াল তারপরে তীরের মতো মানস নদীর দিকে নেমে চলল ডাক দিতে দিতে—'সামাল, জমি লাও জমি লাও।' কিন্তু জমি নেবার আগে ঝড় একেবারে ধুলোবালি শুকনো পাতা ছোট ছোট পাখিদের ঠেলতে ঠেলতে তরতর করে এসে পড়ল। বাতাসের জোরে মাঝ দরিয়ার দিকে চকা নিকোবরের দলকে ঠেলে নিতে লাগল, জমি নেবার উপায় নেই। মানস নদীর পশ্চিম কূলে বিজলিগাঁয়ের উপর দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে বাতাস হাঁসের দলকে দেখতে দেখতে মাঝদরিয়ায় নিয়ে আসছে, সামনে মানস নদীর ওপারের ভাঙনজমি পাহাড়ের মতো উঁচু, সেখানে হাওয়া যদি আছড়ে ফেলে, তবে একটি হাঁসও বাঁচবে না। ঘোরবারও উপায় নেই, ওদিকে মাঝনদীতে তুফান উঠেছে, ঝড়ের মুখে উড়ে গিয়ে সামনের ভাঙনে আছড়ে পড়লে মৃত্যু নিশ্চয়, তার চেয়ে জলে পড়ে বরং সাঁতরে বাঁচবার উপায় আছে স্থির করে সব হাঁস ঝুপঝাপ নদীতে নেমে পড়ল, সাদা সাদা ফেনা নিয়ে চারিদিকে সাপের ফণার মতো ঢেউ উঠছে পড়ছে, একটার পিছে তেড়ে আসছে আর একটা, মাথার উপর ঝড় ডাকছে সোঁ সোঁ, চারদিকে জল ডাকছে গোঁ গোঁ, নদীতে একখানি নৌকা নেই, একটি ডিঙ্গিও নেই, কেবল মাঝনদীতে ঢেউয়ের উপর উপরে স্রোতের মুখে ভেসে চলেছে মোচার মতো হাঁস ক'টি।

জলে পড়ে হাঁসেদের কোনও কষ্ট নেই। স্রোতে গা ভাসিয়ে একগাছ ছেঁড়া মালার মতো, ঢেউয়ের সঙ্গে উঠে পড়ে চলেছে। কেবল চকার ভয় হচ্ছে পাছে দলটা ছড়িভঙ্গ হয়ে পড়ে! তাই সে থেকে থেকে ডাক দিচ্ছে—'কোথায়!' অমনি বাকি হাঁসেরা উত্তর দিচ্ছে—'হেথায় হেথায়।' চকা একবার রিদয়কে ডাক দিচ্ছে—'হংপাল হংপাল।' রিদয় অমনি উত্তর দিচ্ছে—'ভাসান ভাসান।' আকাশ দিয়ে স্থলচর পাখিরা ঝড়ে লুটোপুটি হয়ে চলেছে। হাঁসেরা দিব্বি আছে দেখে তারা বলতে বলতে উড়ে চলল—'সাঁতার সাঁতার, উ-উ-উ গেছি গেছি গেছি, মরি মরি মরি!' কিন্তু ঢেউয়ের উপর দিয়ে দড়িছেঁড়া নৌকার মতো দুলতে দুলতে চলাতেও বিপদ আছে। চকা দেখলে হাঁসেরা ডানায় মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়বার যোগাড় করছে, সে অমনি সবাইকে সাবধান করতে লাগল—'ঘুমেসারা দলছাড়া, দলছাড়া, গেছ মারা, চোখ খোল চোখ মেল।' চকা বলছে বটে চোখ খোল কিন্তু নিজেরও তার চোখ ঢুলে এসেছে, অন্য হাঁসগুলো তো একঘুম ঘুমিয়েই নিচ্ছে।

ঠিক সেই সময় সামনের একটা ঢেউয়ের মাথায় পোড়া কাঠের মতো একটা কী ভেসে উঠল। চকার অমনি চটকা ভেঙে গেল—সে কুমির কুমির বলেই দুই ডানার ঝাপটা মেরে সোজা আকাশে উড়ে পড়ল, খোঁড়া হাঁস রিদয়কে নিয়ে যেমন জল ছেড়েছে আর কুমির জল থেকে ঝম্প দিয়ে তার খোঁড়া পায়ে একটা দাঁতের আঁচড় বসিয়ে ডুব মারলে। খোঁড়া ইস বলে একলাফে আরও পাঁচহাত উপরে উড়ে পড়ল। কুমিরটা আর একবার জল থেকে নাটাচোখ পাকিয়ে নাকটা তুলে এদিক ওদিক করে ভুস করে ডুব মারলে।

হাঁসের দল উড়তে উড়তে খানিক গিয়ে আবার জলে পড়ল, কিন্তু সেখানেও আবার কুমির, আবার ওড়া, আবার গিয়ে জলে পড়া—এইভাবে সারাদিন কাটল।

কত ছোট পাখি যে এই ঝড়ে মারা পড়ল, পথ হারিয়ে একদিকে যেতে আর একদিকে গিয়ে পড়ল, না খেয়ে জলে ভিজে নদীতে পড়ে পাহাড়ে আছাড় খেয়ে কত যে পাখি মরে ঝরে গেল তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

চকার দল হাঁফিয়ে পড়েছে, এ দিকে অজানা নদী, ও দিকে অচেনা ডাঙা। পাহাড় থেকে জল বরফ মতো

ঠাণ্ডা হয়ে গড়িয়ে চলেছে—ঝড়ে ভাঙা বড় বড় গাছের ডাল ভেসে চলেছে, চকা দলবল নিয়ে একবার গাছের ডালে ভর দিয়ে জিরোবার চেষ্টা করলে কিন্তু ভিজে ডাল একেই পিছল তার উপরে আবার স্রোতে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। বাতাস ক্রমাগত তাদের জলে ঠেলে ফেলতে লাগল, ও দিকে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এল, জলে থাকা আর চলে না, হাঁসেরা উড়ে পড়ল।

আকাশে চাঁদ নেই, তারা নেই, কেবল কালোমেঘ আর বিদ্যুৎ, আর হু হু বাতাস, থেকে থেকে পাখিরা ভয়ে চিৎকার করে উঠছে, জলের ধারে ঝুপঝাপ পাড় ভেঙে নদীতে পড়ছে, বজ্রাঘাতে বড় বড় গাছ মড়মড় করে মুচড়ে পড়ছে, এরই মাঝ দিয়ে চকা তার দল নিয়ে ডাঙায় আশ্রয় নিতে চলেছে। হঠাৎ একসময় সামনে একটা গুনগুন আওয়াজ শোনা গেল, তারপরেই রিদয় দেখল হাওয়ার মতো একটা পাহাড়ের দেওয়াল নদী থেকে আকাশে উঠেছে আর তারই তলায় নদীর জল তুফান তুলে ঝপাঝপ পড়ছে। চকা সোজা পাহাড়ের দিকে চলেছে! রিদয় ভাবলে—এইবার শেষ, আর রক্ষে নেই, সে বিষ্টিতে কুয়াশায় ঝাপসা পাহাড়ের দিকে চেয়ে রয়েছে এমন সময় চকা ডাক দিলে—'বাঁয়ে ঘেঁষে।' দেখতে দেখতে পাহাড়ের গায়ে প্রকাণ্ড খিলেনের মতো একটা গুহা দেখা গেল, চকা হাঁসের দল নিয়ে তারই মধ্যে ঢুকে পড়ল—সেখানে বিষ্টি নেই, জল নেই, বাতাসও আস্তে আস্তে আসছে সোঁ সোঁ করে। ডাঙায় পা দিয়েই চকা দেখতে লাগল সেথো সবাই আছে কিনা। সবাইকে পাওয়া গেল, কেবল কঙ্ক পাখি, যে তাদের পথ দেখিয়ে আনছিল তার কোনও খোঁজ হল না!

গুহাটার মধ্যে শুকনো বালি কাঁকর আর ঘাস। হাঁসেরা তারই উপরে বসে ভিজে পালক ঝেড়েঝুড়ে নিচ্ছে, চকা রিদয়কে নিয়ে গুহাটা তদারক করতে চলল। মস্ত গুহা, মুখের কাছটায় আলো পড়েছে, ভিতর দিকটা অন্ধকার, দু'ধারে দেওয়ালের গায়ে রেলগাড়ির বেঞ্চির মতো থাকে থাকে পাথর সাজানো—একপাশে একটি ডোবা, তাতে পরিষ্কার বিষ্টির জল ধরা রয়েছে। রিদয় বলে উঠল—'বাঃ ঠিক যেন ধর্মশালাটি।' অমনি গুহার ও ধারে অন্ধকার থেকে কারা বলে উঠল—'ধর্মশালাই বটে!' রিদয় ভয়ে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে গেল।

চকা এ দিক ও দিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে অন্ধকারে এ কোণে ও কোণে জোড়া জোড়া সবুজ চোখ পিটপিট করছে। 'ওই রে বাঘ!' বলেই চকা রিদয়কে মুখে করে তুলে দৌড়! রিদয় চেঁচাচ্ছে—'বাঘ বাঘ!' সেই সময় অন্ধকার থেকে জবাব হল—'ভ্যে ভ্যে ভেড়া!'

এবার রিদয়ের সাহস দেখে কে, সে বুক ফুলিয়ে ভেড়াদের সর্দার দুম্বার কাছে গিয়ে শুধোলে—'এখানে যে তোমরা বড় এলে? এটা আমাদের ঘর, যাও!'

দুম্বা তার কানের দু'পাশে গুগলি পেঁচ দুই শিং পাথরে ঘষে বললে—'এখানে আমরা ইচ্ছে সুখে এসে ধরা পড়ে কামিখ্যের ভেড়া বনে গেছি, যাব কোথায়, যাবার স্থান নেই।'

রিদয় অবাক হয়ে বলে—'কী বল এই কামরূপ কামিখ্যের মন্দির? এইখানে মানুষকে তারা ভেড়া ছাগল বানিয়ে রাখে!'

হাঁও বটে নাও বটে, এইভাবে ঘাড় নেড়ে দুম্বা বললে—'এটা কি গোয়াল না এটা আমাদের বাড়ি—এটা একটা যাদুঘর। এখানে যা দেখছ সব ইন্দ্রজাল, ভৌতিক ব্যাপার। এ দিক দিয়ে পাখিরা পর্যন্ত উড়ে চলতে ভয় পায়, তোমরা কার পরামর্শে এখানে এলে শুনি? মহাভারতের ধর্মাবতার কঙ্ক তার কোনও পুরুষের কেউ নয়, সেই বকধার্মিক কঙ্ক পাখির সঙ্গে তোমাদের পথে দেখা হয়নি তো?'

কঙ্ক পাখির পাল্লায় পড়েই তারা এ দিকে এসেছে শুনে দুম্বা হা-হুতাশ করে বললে—'এমন কাজও করে, বকধার্মিকের কাজই হচ্ছে নানাছলে লোককে ভুলিয়ে এই কামরূপে এনে মানুষকে ভেড়া, ভেড়াকে ছাগল বানিয়ে দেওয়া, এটা বুঝলে না—কি আপশোস!'

রিদয় ভয় পেয়ে বলে উঠল—'এখন উপায়!'

দুম্বা খানিক ভেবে বললে—'উপায় আর কী, এক উপায় যদি বকর্ধামিক এই ঝড়ে রাস্তা ভুলে অন্যদিকে গিয়ে পড়ে থাকে তবেই তোমরা এবারের মতো বেঁচে গেলে।'

চকা শুধোলে—'আর সে যদি এসে পড়ে তবে কি হবে?'

দুম্বা উত্তর করলে—'সে এসে ঠোঁট দিয়ে তোমাদের মাথা ফুটো করে যা কিছু বুদ্ধি আছে মগজের সঙ্গে সবটুকু বার করে নেবে; আর তোমরা কেউ বোকা ছাগল, কেউ মেড়া, কেউ ভেড়া হয়ে আ-আ করে তাকেই তোমাদের ভেড়া বানিয়ে দেবার জন্যে বাহবা ধন্যবাদ দিতে থাকবে।'



রিদয় রেগে বলে উঠল—'মাথা ফুটো করতে দিলে তবে তো? যেমন দেখব সে আসছে, অমনি আমরা সরে পড়ব না?'

দুম্বা শিং নেড়ে বললে—'তা হবার যো নেই, সে ধুলোপড়া দিয়ে সবার চোখে ধুলো দিয়ে কখন যে কাজ উদ্ধার করে যাবে তোমরা টেরও পাবে না। মনে হবে, কে তোমাদের মাথা চুলকে দিচ্ছে, তোমরা ঘুমিয়ে পড়বে আরামে। তারপর চোখ খুলে দেখবে ভেড়া হয়ে গেছ।'

চকা এগিয়ে এসে শুধোলে—'এত বোকা ছাগল, বোকা মেড়ায় তার কি দরকার বলতে পার?' দুম্বা খানিক চোখ বুজে বললে—'ঠিক জানিনে, তবে শুনেছি নাকি'—বলেই দুম্বা হঠাৎ চুপ করে এ দিক ও দিক চাইতে লাগল।

রিদয় ব্যস্ত হয়ে শুধোলে—'কি শুনেছ বলেই ফেল না।'

দুম্বা আরও ব্যস্ত হয়ে বললে—'চুপ চুপ অত চেঁচিও না, কাজ কি বাবু ওসব কথায়, শেষে কি ফ্যাঁসাদে পড়ব? কে কোন দিকে শুনবে, শেষে আমাকে নিয়ে টানাটানি। যাক ও কথা, কুবরী কুবরী'—বলে দুম্বা চোখ বুজল।

রিদয় অনেক পেড়াপীড়ি করেও কুবরী ছাড়া আর একটি কথাও বোকাছাগলের মুখ দিয়ে বার করতে পারলে না। চকা চুপিচুপি রিদয়কে বললে—'তুমিও যেমন, বোকা মেড়া ও, ওর কথার আবার মূল্য আছে? নিশ্চয় ওটার মাথার গোল আছে, এসো এখন খেয়েদেয়ে একটু বিশ্রাম করা যাক, সকালে উঠে নিজের পথ নিজে দেখা যাবে।' তারপর দুম্বার দিকে চেয়ে বললে—'মশায় যদি জানতেন আমরা আজ সারা রাস্তাটা কী কষ্টে কাটিয়ে এখানে এসেছি, তবে এই রাতে আমাদের মিছে ভয় দেখিয়ে তাড়াবার চেষ্টা না করে বরং কিছু অতিথি সৎকারের বন্দোবস্ত করে দিতেন। আমরা নিতান্ত দায়ে পড়েই এখানটায় আশ্রয় নিয়েছি, এখন উচিত হয় আপনার আর কাল বিলম্ব না করে আমাদের জন্যে জলযোগ এবং তারপরে সুনিদ্রার ব্যবস্থা করে দেওয়া।'

এবারে দুম্বা অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে এসে বললে—'আপনারা আমার কথায় বিশ্বাস করছেন না, আচ্ছা আমি আপনাদের খাবার ব্যবস্থা করছি, দেখুন কি কাণ্ড হয়, তখন কিন্তু আমায় দোষ দিতে পারবেন না!'

চকা এবার সত্যিই ভয় পেলে, কোনদিক থেকে বিপদ আসে ভেবে চারদিকে চাইতে লাগল।

দুম্বা ডাকলে—'আসুন আহার প্রস্তুত কিন্তু দেখবেন চটপট আহার সেরে উঠবেন, নাহলে ব্যাঘাত হতে পারে। আপনারা আসন গ্রহণ করুন আমি এখানে দাঁড়িয়ে আসনবন্ধন মন্ত্রটি পাঠ করছি।' রিদয় আর হাঁসেরা খেতে বসে গেল। দুম্বা মন্ত্র পাঠ করতে লাগল—

মেঘ চর্মের আসন তোরে করিরে পেন্নাম
আমার কার্যে তুই হ রে সাবধান।
কামিখ্যার বরে তোরে করিলাম বন্ধন
এ কার্যে যেন তুই না হোস লঙ্ঘন।।

হাঁসেদের অর্ধেক খাওয়া হয়েছে এমন সময় দূরে ফেউ ডাকল। দুম্বা মন্তর জপতে জপতে বললে—'ওই শুনছেন তো ওঁরা আসছেন, এরই মধ্যে খবর হয়ে গেছে। ব্যাঘাত হল চটপট খেয়ে নিন' বলেই দুম্বা তাড়াতাড়ি মন্তর পড়তে লাগল:

লাগ লাগ ফেরুপালের দন্তের কপাটি
কোনও ভূতে করিতে নারিবে আমার ক্ষতি
শীঘ্রি লাগ শীঘ্রি লাগ।

মন্তরের চোটে কেউ ঘরে ঢুকতে সাহস পেলে না বটে কিন্তু বাইরে চারদিকে ফেরুপাল চিৎকার করে কানের তালা ধরিয়ে দিতে লাগল—'হুয়া হুয়া, খাওয়া হুয়া, হুয়া খাওয়া, হুয়া খাওয়া।'

রিদয় বললে—'এত গোল করে কে?' রিদয়ের কথা তখন আর কে শোনে? তখন দুম্বা 'ব্যেঘাৎ ব্যেঘাৎ' বলে চেঁচাচ্ছে আর ঘরের মাঝে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, যেন সর্বনাশ হচ্ছে। রিদয় দুম্বার রকম দেখে চেঁচিয়ে বললে—'আরে মশায়, ব্যাপারটা কি খুলে বলুন না, অত বুক চাপড়ে ছুটোছুটি করচেন কেন?'

দুম্বার তখন ভয়ে মাথা ঘুলিয়ে গেছে। সে কাঁপতে কাঁপতে বললে—'সর্বনাশ হল, হায় হায় কি উপায়।'

রিদয় আরও চটে বললে—'আরে মশায়, হয়েছে কি তাই বলুন না?'

দুম্বা তখন একটু স্থির হয়ে বললে—'ওই খেঁকি খেঁকি খেঁকি খেঁকশিয়ালী ওই তিন ফেরুপাল ওরা যদি আমাদের দেওয়া মুড়ো কিম্বা ভেড়ার মাংস না খেতে চান তো কি হবে এখন!'

রিদয় হেসে বললে—'এই জন্যে এত ভয়, তা ওঁরা যদি আপনাদের মুড়ো মাংস না খান তো আপনাদেরই তো লাভ, এতে আপনার দুঃখুই বা কি, ভয়ই বা কি?'

দুম্বা শিং নেড়ে বললে—'আহা আপনি বুঝবেন না, ওঁদের মুড়ো মাংস খাওয়ানো যে ভেড়াবংশের সনাতন প্রথা, সেটা বন্ধ হলে যে আমাদের জাত যাবে, আমরা একঘরে হয়ে যাব, তার করবেন কি?'

রিদয় গম্ভীর হয়ে বললে—'আগে আপনি কি করতে চান শুনি!'

দুম্বা কেঁদে বললে—'আমি এ প্রাণ আর রাখব না—আমি সমাজদ্রোহী, আমি নরকে যাব স্থির করেছি, আমি অতি হতভাগ্য।'

রিদয় দুম্বার শিং-এ হাত বুলিয়ে বললে—'ওদের ঠাণ্ডা করবার কি আর কোনও উপায় নেই!'

দুম্বা হাত নেড়ে বললে—'আর এক উপায়—তুষানলে জ্বলেপুড়ে মরা, কিন্তু তার চেয়ে নরককুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়াই সহজ।'

রিদয় বলে উঠল—'কাজ আরও সহজ হয় ওই তিনটে কুকুরকে নরকে পাঠিয়ে দেওয়া!'

দুম্বা দুই চোখ পাকল করে অবাক হয়ে বললে—'একি সম্ভব!'

রিদয় বললে—'দেখি তোমার শিং, খুব সম্ভব এক ঢুঁয়ে তিনটেকে একেবারে নরকে চালান করে দেওয়া যায় যদি তুমি তাল ঠুকে লাগ!'

দুম্বা বলল—'তাল ঠুকে ঢুঁ লাগাতে আমি মজবুত কিন্তু ওদের দেখলেই যে আমাদের বুদ্ধি লোপ পায়, তার কি?'

রিদয় দুম্বার পিঠ চাপড়ে বললে—'তোমরা চোখ বুজে থেকো—আমি যেমন বলব 'শিং টিং চট' অমনি একসঙ্গে সবাই ঢুঁ বসিয়ে দিও, দেখি ওরা কী করে!'

এবারে অন্য অন্য ভেড়া তুলাড়ু ঝাঁকাড়ু তারা এগিয়ে এসে বললে—'আমরা দু'একটা কথা বলতে চাই. আমরা ঢুঁসোতে রাজি কিন্তু তার আগে ভেবে দেখা কর্তব্য যে ফেরুপালদের সরিয়ে দিয়ে কি আমরা চলতে পারব? তাঁরা হলেন আমাদের ধোপা নাপিত এবং চরাবার কর্তা, ধরতে গেলে মেষবংশের মাথা। রাজদ্বারে শ্মশানে চ ওঁরা আমাদের বান্ধব, আত্মীয়, কুটুম্ব বললেই হয়। ওঁরা মাঝে মাঝে আমাদের চিরুনি দাঁতে টেনে, নখে আঁচড়ে, রোঁয়া ছেঁটে, চাম ছাড়িয়ে চেটেপুটে সাফ না করে দিলে—কে মড়মড়ায় কে গড়পড়ায় কে ভাঙে খড়ি?

আমাদের গা-শুদ্ধি হবারই যো নেই যদি না পালপার্বণে তাঁদের মাঝে মাঝে মেষচর্মের আসনে বসিয়ে মেষমাংসে আমরা মুখশুদ্ধি করিয়ে দিতে পারি, এছাড়া আমরা খাঁড়া আর হাড়িকাঠ সামনে রেখে হাড়িবাবা আর হাড়ি-ঝি মাতাজির কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি—তুমি খণ্ডা দ্বিখণ্ডা সুমুক্তি বাহার গরল ভাবহং মানুরিক্ত ঘুমাইয়া আছি স্ফটিকের মুণ্ডি! আমাদের এ মাথায় কোনও কাজ করতে গেলেই গুরুর কোপে পড়তে হবে, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ পাপে লিপ্ত হয়ে নরকেও যেতে হবে, এর জবাব আপনি কি দেন?'

রিদয়কে আর কোনও জবাব দিতে হল না—খেঁকি-খেঁক-খেঁকি খেঁক-খেঁকানি তিনটে হেঁড়েল হঠাৎ এসে তিন মেড়ার লেজ ধরে টেনে নিয়ে চলল, হাঁসেরা ডানা ঝটাপট করে গুহার মধ্যে অন্ধকারে উড়ে বেড়াতে লাগল, রিদয় তাড়াতাড়ি দুম্বার পিঠ চাপড়ে দুই হাতে তার ঘাড় বেঁকিয়ে ধরে হুকুম দিলে—'শিং টিং চট, দে ঢুঁসিয়ে চটপট।' দুম্বা আর ভাবতে সময় পেলে না, অন্ধকারে সামনে আর ডাইনে বাঁয়ে তিন ঢুঁ বসিয়ে দিলে। খটাশ খটাশ করে তিনটে হাঁড়িমুখো হাড়খেগো হেঁড়েলের মাথার খুলি ফেটে চৌচির হয়ে গেল; ঠিক সেই সময় বাইরে দুদ্দাড় করে ঝড়বৃষ্টি নামল—

শিল পড়ে তড়বড় ঝড় বহে ঝড়ঝড়
হড়মড় কড়মড় বাজে—ঘনঘন ঘনঘন গাজে!
ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝনী বিদ্যুৎ চকচকি
হড়মড়ি মেঘের ভেকের মকমকি
ঝড়ঝড়ি ঝড়ের জল ঝরঝরি
তড়তড়ি শিলার জলের তরতরি
ঘুটঘুট আঁধার বজ্রের কড়মড়ি
সাঁই সাঁই বাতাস শীতের থরথরি।

ভেড়াগুলো কুবরী কুবরী বলতে বলতে এ ওর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে, এমন সময় ঝড়ে একখানা পাথর খসে গুহার মুখটা একেবারে দরাজ হয়ে কত বড় যে হয়ে গেল তার ঠিক নেই। ঝড় থামলে সেই খোলা পথে সকালের আলো এসে গুহার মধ্যে সবাইকে জাগিয়ে দিলে! চকা সেই আলোতে ডানা মেলে রিদয় আর খোঁড়া আর কাটচাল আর নানকৌড়িকে নিয়ে হাড়গিলের চরে যেখানে আণ্ডামানি লালসেরা হাঁসদের বড় দলটা নিয়ে অপেক্ষা করছে, সেই দিকেই চলল!

ভেড়ার দল হঠাৎ কতকালের অন্ধকার গুহার মধ্যে দিনের আলো পেয়ে প্রথমটা অনেকক্ষণ ধরে হতভম্বের মতো আকাশের দিকে চেয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে পাহাড়ের উপর বুনো ভেড়ার দলে মিশে দিব্যি চরে বেড়াতে লাগল। রাতের কথা, রিদয়ের কথা, হাঁসদের কথা, কোনও কথাই তাদের মনে রইল না। তারা যেন চিরকালেই বুনো ভেড়া এইভাবে সহজে খোলা আকাশের নিচে পাহাড়ের চাতালে চাতালে ঘাস খেয়ে লতাপাতা খেয়ে মনের সুখে দিন কাটাতে লাগল! ভেড়ার মধ্যে দুম্বাই কেবল মনে রাখতে পারলে রিদয় কেমন করে, তাদের নরককুণ্ডের মুখের কাছ থেকে পাহাড়ের উপরকার এই খোলা জায়গায় পৌঁছে দিয়ে গেছে, সেখানে স্বচ্ছন্দে চরে বেড়াতে কোনও বাধা নেই! দলের ভেড়ারা সন্ধ্যেবেলায় অভ্যেসমতো যখন তাদের পুরানো ঘর গুহাটার দিকে চলল তখন দুম্বা তাদের এক এক ঢুঁ মেরে বনের দিকে ফিরিয়ে দিলে।

আসামী বুরুঞ্জি

উত্তর থেকে বড়নদী যেখানে ব্রহ্মপুত্রের জলে এসে মিলেছে ঠিক সেই বাঁকের মুখেই কতকালের পুরনো ডিমরুয়ার আসামী রাজা আড়িমাওয়ের নাটবাড়ি। নাটবাড়ির নিচেই নদী মজে গিয়ে মস্ত চর পড়েছে। এতকাল থেকে হাড়গিলে পাখিরা এই চর দখল করে আছে যে, ক্রমে চরটার নাম হয়ে গেছে হাড়গিলার চর! এই চরের ওপারেই দেওয়ানগিরি মস্ত একটা বুড়ো আঙুলের মতো আকাশের দিকে ঠেলে উঠেচে। এই দেওয়ানগিরি হল যত ফরিয়াদি পাখির আড্ডা। একপারে রইল আসামী মাছেদের রাজা আড়িমাওয়ের নাটবাড়ি আর একপারে দেওয়ানী ফরিয়াদির আড্ডা দেওয়ানগিরি, মাঝখানে বসে রয়েছেন হাড়গিলে। আসামী ফরিয়াদিতে লড়াই মোকদ্দমা প্রায়ই হয়, তাতে দুই দলই মাঝে মাঝে মারা পড়ে।

হাড়গিলের খাম্বাজং রাজা দুইদলের মধ্যে আরামে বসে দুইদলেরই হাড়মাস খেয়ে সুখে আছেন, এমন সময় চরমুখে খবর পৌঁছল, বুড়ো আংলা আসছেন। হাড়গিলের রাজা খাম্বাজং লম্বা লম্বা পা ফেলে জলের ধারে তাঁর কাশবাগিচায় বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন! 'চুপিম-পা' আর 'চোরম-পা' দুই সেনাপতি পায়ে পায়ে হাড়গিলে রাজের কাছে হুকুম নিতে এলে—রিদয় হংপালকে এ পথে আসতে দেওয়া হবে কিনা! খাম্বাজং হাড়গিলে অনেকক্ষণ আকাশের দিকে ঠোঁট উঁচিয়ে ভেবে বললেন—'আসতে দিতে পার।' হঠাৎ দেশের মধ্যে মানুষ আসতে দিতে হাড়গিলে চরের প্রজারা রাজি ছিল না। দুই সেনাপতি একটু ইতস্তত করছে দেখে খাম্বাজং সভাপণ্ডিত চুহুংমুংকে ডেকে বললেন—'দেখ তো বুরুঞ্জি পুঁথিতে কলির কত হাজার বছরে এখানে মানুষের আগমন লিখেছে?'

চুহুংমুং মুখ গম্ভীর করে বুরুঞ্জির পাতা উল্টে-পাল্টে মাটিতে খানিক আঁকজোক কেটে বললেন—"আগামী ভূতচতুর্দশীতে এখানে সিদ্ধিদাতা গণেশের শাপভ্রষ্ট একজন উপস্থিত হবেন, বার বৎসর এগার দিন একদণ্ড তিনপল ঊনপঞ্চাশ বিপল বয়সে, বুরুঞ্জিতে লেখে—সুন্দরবনস্থ আমতলি গ্রামের কাশ্যপ গোত্রের অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ এই মহাপুরুষ, তাঁর আগমনে দেশে সুখসৌভাগ্য সঙ্গে সঙ্গে মুষিক ও মশক বৃদ্ধি, হেঁড়েল বংশ ধ্বংস ও চুয়াদিগের নাটবাড়ি আক্রমণ এবং হাড়গিলা প্রভৃতির প্রচুর ভোগ ঐশ্বর্য এবং সর্বসিদ্ধিযোগ। গণেশ চতুর্থীতে এই কলির বামন অবতার হংসরথে গৃহত্যাগ করবেন এবং ভূতচতুর্দশীতে ঊনপঞ্চাশ পবনে ভর দিয়ে কল্পাব্দ ঊনশত ঊনপঞ্চাশে সূর্যাস্তের দিক হতে উদয় হয়ে ক্রমে সূর্যোদয়ের দিকে অভ্যুত্থান করবেন। শ্যামবর্ণ সুন্দর বপুঃ বুড়োরষ্ঠ বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু মহাভুজ' বলে চুহুংমুং বুরুঞ্জি বন্ধ করলেন।

সেইদিন থেকে হাড়গিলের রাজা খাম্বাজং ভাঙাচোরা পুরানো নাটবাড়ির চুড়োয় গিয়ে একপায়ে দাঁড়িয়ে পশ্চিমমুখো হয়ে ঘাড় তুলে রইলেন—হংপাল কখন আসেন দেখতে, ও দিকে কাকচিরাতে কাকেদের রাজা যোম কাকের কাছে চাঁদপুরী শেয়াল খবর দিয়ে গেল—টিকটিকির মতো এক মানুষ এসে ভেড়াদের বিদ্রোহী করে তুলে হেঁড়েল বংশ ধ্বংস করলে, এবারে কাকেদের আর এঁটোকাঁটা হাড়গোড় কিছু পাবার উপায় থাকবে না। মাংসখোর সব মারা গেল, কেইবা আর ভেড়া মারবে, ছাগল ধরবে। কাকচিরাতে কাকের ঘোঁট বসে গেল, কি করলে মানুষটাকে সরানো যায় দেশ থেকে, আর ভেড়া গরু ছাগল এদের আরও বেশি করে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া যায়—যাতে কোনওদিন তারা ফেরুপাল বা সনাতন স্বধর্মের ভুঁড়ো শেয়ালদের বিরুদ্ধে শিং চালাতে না পারে।

নদী মাঠ আর জঙ্গল এই তেমাথার মধ্যে রয়েছে কাকচিরার না জঙ্গল, না মাঠ, না পাহাড়, বালুচর—দূরে থেকে দেখলে বোধ হবে জমিটাতে ঘাসও যেমন গাছও তেমন, পাহাড় রয়েছে, নদীও বইছে কিন্তু কাছে গিয়ে দেখ কেবল চোরকাঁটা, শেওড়া আর বড় বড় নোড়ানুড়ি, কাঁকর বালি। তার মধ্যে এখানে ওখানে কাদাজল নালা নর্দমা!

কোনওকালে ফেনচুগঞ্জের এক নীলকর সাহেব এখানে এক মস্ত কুঠি বানিয়েছিল। সেই বাংলা ঘরখানা এখনও রয়েছে, কিন্তু মানুষ কেউ নেই। কুঠিবাড়ির বাগানে চোরকাঁটার সঙ্গে গোটাকতক দোপাটি ফুলের গাছ, ঘরের সমস্ত শার্সি দরজা বন্ধ। জিনিসপত্র যেখানকার সেখানে গোছানো, অথচ কেউ নেই এখানে। দরজায় চাবি দিয়ে বাড়িওয়ালা যেন দু'দিনের মধ্যে আসবে বলে গেল, যেখানে শার্সিটা ভাঙা ছিল সেখানে কাগজ মেরে ঘরগুলি গুছিয়ে রেখে চোরের ভয়ে তালা বন্ধ করে সব ঠিকঠাক রেখে গেল, কিন্তু কোনওদিন এসে আর চাবি খুলে কেউ ঘরে ঢুকল না। বর্ষা এসে শার্সির ফাঁকে আঁটা পুরানো খবরের কাগজটা গলিয়ে দিলে, কাকচিরার একটা কাক কোন সময়ে একদিন ঠোঁটে করে সেই কাগজখানা ঠেলে ফেলে ঘরের ভিতরে যাবার আসবার একটা পথ করে রেখে দিলে। তারপর একদিন বোশেখ মাসে ডিম পাড়বার সময় দলে দলে কাক এসে কাকচিরায় চিরকাল যেমন বাসা বেঁধে আসছে তেমনই ঘরকন্না পেতে জায়গাটা দখল করে বসল। সকাল না হতে দূর দূর গ্রামে তারা চরতে যায়, এঁটোকাঁটার সন্ধানে। কিন্তু সন্ধ্যার আগেই দলে দলে এই আপন রাজত্বে তারা ফিরে আসে, রাঙা আকাশ কালো করে।

আমাদের মধ্যে যেমন ডোম চাঁড়াল তেলি মালি যুগি কায়েত বামুন এমনই নানা জাত, কিন্তু দেখতে চেহারায় মানুষ, তেমনই কাকেদের মধ্যেও দেখতে কাক কিন্তু জাত হরেক রকমের রয়েছে—যেমন ডোমকাক বা যোমকাক, ধাড়িকাকা বা দাঁড়কাক বা দাঁড়াকাক, ধোড়াকাক, ঝোড়োকাক, ঢোঁড়াকাক, পাণিকাক বা পাতিকাক, শ্বেতকাক বা ছিটেকাক, ভুষোকাক বা ভুষুণ্ডেকাক। সব কাকেরই চালচলন এক ভাবা ভুল, এদের মধ্যে কোনও দল তারা

ভদ্দর সভ্যভব্য কাক, ছোলাকলা চিংড়িমাছটা আঁশটা আর বামুনের মতো মরা জানোয়ারের শ্রাদ্ধের ফলার খেয়ে দিন কাটায়, আর একদল কাক তারা যা তা খায় বাচবিচার নেই, পাখির ছানা খরগোশ ছানা খেয়েই এরা সুখ পায়। কোনও দলের পেশাই হল লুটতরাজ চুরিচামারি খুনখারাবি। এদের জ্বালায় পাখির বাসায় ডিম থাকবার যো নেই, বাইরে কিছু চকচকে জিনিস রাখবার উপায় নেই! আমসত্ত্ব শুকোতে দিলে এরা খেয়ে যায়, কাপড় শুকোতে দিলেও টেনে ছেঁড়ে, ছেলের হাতের মোয়া কেড়ে খায়, বুড়োর পাকা মাথায় ঠোকর বসায়, চালের খড় টেনে ফেলে, ভাতের থালায় ছোঁ দেয়, এমনি নানা উৎপাত করে বেড়ানোই এদের কাজ।

কাকেদের ডাকনাম শুনলেই বোঝা যায় কোনদল কেমন—যেমন যোমকাকের বংশ তারা হল ডোমকাক, এদের সবাই ভয় করে। মরা জানোয়ার নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি মারামারি এদের কাজ। তারপর ধাড়িকাক বা দাঁড়কাক—এরা পুরানো চালের, কাক যখন কোকিলের মতো গাইতে পারত তখন লোকে এদের পুষে দাঁড়ে বসিয়ে ছোলা খাওয়াত। সেই থেকে এরা নানা বিদ্যেতে কৌশলে কারিগরিতে মজবুত বলে সব কাকই দায়ে পড়লে এদের পরামর্শ মতো চলে। তারপর, ঝোড়োকাক—এরা এককালে সবচেয়ে সাহসী বড়ই নামজাদা রাজবংশ ছিল, এখন বিষ হারিয়ে ঢোড়াকাক হয়ে পড়েছে কাজেই চুপচাপ থাকে সন্ন্যাসীর মতো। পাতিকাক হল পানিকাকের বংশ, এরা সব দলেই আছে কিন্তু কোনও দলেই এদের পোঁছে না, পুকুর পাড়ে এরা গুগলি শামুক এঁটো কাঁটা খেয়েই দিন চালায়। শ্বেতকাক—এরা আসলে দিশি কালোকাকেরই বংশ কিন্তু রঙ বদলে সাদা বিলিতি কাক হতে যাচ্ছে—এদের কারু গলা সাদা, কারু ডানা সাদা, কারু মাথা সাদা, এখনও দোরঙা আছে বলে এদের নাম ছিটেকাক হয়েছে।

পৃথিবীর আদি কাক হল ভুষুণ্ডিকাক, তারই বংশ ভুষুণ্ডে বা ভুষো, দেখতে কালিঝুলি, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই কাকের বংশ চলে আসছে—এদেরই পূর্বপুরুষ রামের সঙ্গে লড়ায়ে একচোখ হারিয়েছিল, সেই থেকে এদের নামডাক ছড়িয়ে পড়েছে, এমন কি এদের নকল করে অনেক কাক একচোখো সেজে নিজেদের বলাতে চাচ্ছে এদেরই একজন, আসলে হয়তো সে পাতিকাক, কিন্তু লেখবার বেলায় লিখছে পাতি অব ভুষুণ্ডি! এইসব নানাধরনের কাকেদের মধ্যে যখন যে দলপতি হয় তখন কাক সমাজকে সে নিজের মতো ভালোমন্দ নরমগরম ভাবে চালায়, এই হল কাক সমাজের নিয়ম।

যে কাকটা নীলকর সাহেবের ঘরের শার্সিতে মস্ত ফাঁকটা আবিষ্কার করেছিল, সে বহুকালের পুরানো রাজবংশী ঢোঁড়াকাক। যতদিন এই ঢোঁড়াকাক দলপতি ছিল ততদিন কাক সমাজ ভদ্ররকম ছিল, কোনও পাখিই তাদের কোনও দোষ কোনও খুঁত ধরতে পারেনি। কিন্তু কাকসমাজে ক্রমে প্রজাবৃদ্ধি হয়ে নানারকম কাক তাতে এসে যখন সেঁধোল তখন চালচোলও ক্রমে বদলাতে আরম্ভ করলে। শেষে একদিন সবাই মিলে ঢোঁড়াকাককে সিংহাসন থেকে তাড়িয়ে ডোমকাককে সর্দার করে এমন লুটতরাজ মারামারি আরম্ভ করে দিলে যে, পায়রা, সিকরে গেরোবাজ এমন কি পেঁচারা পর্যন্ত অস্থির হয়ে কাকচিরা ছেড়ে পালাতে পথ পেলে না।

পুরানো দলপতি ঢোঁড়াকাক সিংহাসন ছেড়ে মনের দুঃখে ঝোড়োকাকের মতো হয়ে ডানা ঝুলিয়ে চুপচাপ শেওড়াগাছের ডালে দিন কাটায়, কেউ তাকে কোনও কথা শুধোয় না, সবাই মিলে বলতে লাগল ওটা বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া হয়েছে, বুড়ো হয়ে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। নতুন দলপতি ডোমকাক তামাশা করে তার নাম রাখলে ডরাকাক, দেশের লোক তাকে বললে ঢোঁড়াকাক! একেবারে কাজের বার ভেবে সবাই তাকে তুচ্ছ করছে দেখে ঢোঁড়াকাক মনে মনে একটুখানি হেসে আপনার কোণটিতে চুপচাপ রইল। নতুন রাজা ডোম জাঁক দেখাবার জন্যে প্রায়ই ঢোঁড়াকে রাজবাড়িতে নিমন্ত্রণ দিত। কোনওদিন বা নিজের বীরত্ব আর বাহাদুরি দেখাতে শিকারের সময় প্রায়ই সঙ্গে নিত। ঢোঁড়া সব বুঝত কিন্তু বুঝেও বোবা হয়ে থাকত।

ফেনচুগঞ্জের নীলকর সাহেব যদিও অনেককাল কুঠিবাড়ি ছেড়ে গেছে, কিন্তু এখনও কোনও কাকের এমন সাহস হয় না যে সেদিকে যায়, কিন্তু ডরাকাক বলে ডোমকাকের দল যাকে তুচ্ছ করছে সেই কাকটি গিয়ে একদিন কুঠিবাড়ির মধ্যে যাবার একটি রাস্তা করে এল নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে একলা গিয়ে, কিন্তু খবরটা সে কাউকে জানায়নি! একে মানুষ তাতে গোরা, তার ঘরে সুড়ঙ্গ কাটা, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসার চেয়েও অসমসাহসের কাজ, কোনও কাক এ পর্যন্ত যা পারেনি ঢোঁড়া সেই কাজটা করেছে—অথচ মুখে তার কথাটি নেই, অন্য কাক হলে চিৎকারের চোটে কাকচিরা মাত করত! নতুন দলপতি ডোমকাকটা দিনের বেলায় এই বুকে পাটকিলে ডোরাটানা ঢোঁড়াকাককে ভয় করে খাতির করে চলত, ঢোঁড়ার বুকের লাল ডোরা দেখে তার মনে হত যেন

কতকালের মহাযুদ্ধের রক্তের দাগ রাজটিকের মতো এখনও এর বুকে দাগা রয়েছে। কিন্তু রাতে অন্ধকারে যখন লাল কালো সব এক হয়ে গেছে তখন ডোমকাক ধোড়াকে জ্বালাতন করতে ছাড়ত না—একদিন প্রায় মেরেই ফেলেছিল। সেইদিন থেকে ধোড়া বা ঢোঁড়াকাক শেওড়া গাছে আর ঘুমোতে যেত না, সেই শার্সি দিয়ে চুপিচুপি ঘরের মধ্যে দেওয়ালের গায়ে বেলা আড়াইটা বেজে বন্ধ হওয়া একটা ঘড়ির পিছনে বসে রাত কাটাতে আরম্ভ করলে।

রিদয় যে ঝড়ে পড়ে যোগীগোফায় আশ্রয় নিয়েছিল সেই ঝড়ে কাকচিরার বহুকালের পুরানো শেওড়া গাছটা গোড়াসুদ্ধু উপড়ে রাজ্যের ডোমকাকের বাসা ডিম ছানাপোনা নিয়ে উল্টে পড়ল ঠিক বেলা আড়াইটাতে। বাসা গেল, ডিম ভাঙল, তাতে কাকেদের বড় একটা দুঃখ হল না কিন্তু গাছের গোড়াটা যেখানে উল্টে পড়ে বড় একটা গর্ত দেখা দিয়েছে, সেই গর্তটায় কি আছে না আছে খুঁজে দেখবার জন্যে দলে দলে কাক আকাশের দিকে পা করা গাছের মোটা মোটা শিকড়গুলো নিয়ে টানাটানি চেঁচামেচি বাধিয়ে দিলে।

ডোমকাক, ঢোঁড়াকাক পাতিকাক দু'জনকে নিয়ে একেবারে ডোবাটার মধ্যে পড়ে এ দিক ও দিক তদারক করে ইঁট পাটকেল উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগল! হঠাৎ এতবড়ো গর্তটা কেন এখানে আসে, ঠোকর দিয়ে সন্ধান করতে করতে গর্তের একদিকে খানিক কাঁকর মাটি ঝরঝর করে খসে পড়ল, আর দেখা গেল ইটে গাঁথা একটা চোরকুঠুরি, তারমধ্যে তালা দেওয়া ছোট একটা পেঁটরার সামনে একটা মড়ার মাথা, কতকালের কলঙ্কধরা একটা পিদুম আর গোখরো সাপের একটা খোলস! মড়ার মাথা সাপের খোলস দু'টোই সব কাকের দেখা ছিল, পিদুম নিয়েও অনেকবার তারা পালিয়েছে, কিন্তু পেঁটারাটার মধ্যে কি আছে কোনও কাকই তা জানে না, কাজেই এ দিকে ও দিকে ঠোকর দিয়ে তালাটা ধরে নাড়া দিয়ে দেখছে, এমন সময় গর্তের উপর থেকে খেঁকশিয়াল আস্তে আস্তে বললে—'হচ্ছে কি? ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া কোরো না, ওতে সাতরাজার ধন আছে, যদি খুলতে চাও তো একজন যক ধরে আনো, যকের ধন যক নাহলে কেউ খুলতে পারবে না।'

সাতরাজার ধন আছে শুনে কাকদের চক্ষুস্থির! চকচকে পয়সা মোহর ভালবাসতে তাদের মতো দু'টো নেই, ডোমকাক পাতিকাক ভূষোকাক ছিটেকাক দাঁড়কাক সব কাক এসে শেয়ালকে ঘিরে—ক্যা-ক্যা-ক্যা কও-কও-কও রব করে গণ্ডগোল বাধিয়ে দিলে! ডোমকাক সবাইকে ধমকে চুপ করিয়ে শেয়ালকে শুধোলে—'যক এখন কেমন করে পাওয়া যায়?'

শেয়াল ডাঁওর করে মাথা চুলকে নাক রগড়ে যেন কতই ভেবে বললে—'আমি জানি এক যকের সন্ধান, সে ছুঁলেই এই বাক্স খুলে যাবে!'

কাকেরা অমনি চিৎকার করে উঠল—'কই কই'—বলে এগিয়ে গর্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডোমকাক তাড়াতাড়ি পেঁটরার উপরে চেপে বললে—'রও রও'।

তারপর শেয়াল এগিয়ে এসে বললে—'আমি সেই যকের সন্ধান তোমাদের দিতে পারি, যদি তোমরা এই সিন্দুক খুলিয়ে নিয়ে যকটিকে আমার পেট ভরাবার জন্যে দিতে রাজি হও।'

কাকেরা শেয়ালের কথায় রাজি হলে, শেয়াল তাদের রিদয়ের খবর জানিয়ে দিলে। তিনকুড়ি কাক সঙ্গে ডোমরাজা ঢোঁড়াকাককে সঙ্গে নিয়ে যক ধরতে চলল পাহাড় জঙ্গলের উপর দিয়ে।

হাড়গিলের রাজা খাম্বাজং যখন চৌষট্টিখানা নাটবাড়ির নহবতখানার চুড়োয় পশ্চিমমুখো হয়ে রিদয়ের আশায় রয়েছেন, আর কাকদের রাজা ডোম রিদয়কে ধরবার জন্যে বনেজঙ্গলে সন্ধান করে বেড়াচ্ছে, সেই সময় গণেশের নেংটি ইঁদুরের সঙ্গে পাহাড়ি চুয়োদের যুদ্ধ বেধে গেল! ব্রহ্মপুত্র আর বড়নদীর মোহনার পুরানো নাটবাড়িটা ইঁদুরদের দখলে কতকাল থেকে আছে তার ঠিকানা নেই। দেওয়ানগিরির উপরে কেল্লার মতো আড়িমাও রাজাদের নাটবাড়ি, প্রকাণ্ড কারখানা, এতবড়ো নাটবাড়ি যে সেখানে রাজাদের আমলে যে সব হাতি-ঘোড়া সেপাই-সান্ত্রী থাকত সেগুলোকে দূর থেকে মনে হত যেন ছোটোপুতুল চলে বেড়াচ্ছে। দশ বারোহাত চওড়া এক একখানা পাথরের ইটে গাঁথা বাড়ির দেওয়ালগুলো, এক একটা থাম যেন এক একটা তালগাছ! সাততলা বাড়ি কিন্তু তার নিচের পাঁচতলা নিরেট দেওয়ালে ভরাট করা, তার মাঝে পাহাড়ের গহ্বরের মতো অন্ধকার একটা সিংগি দরজা, আশেপাশে বাক্সর মতো চোরকুঠুরি। সেগুলোতে দেওয়ালই সব, থাকবার জায়গা অল্পই। তাও আবার এখানে ওখানে লোহার গরাদে দিয়ে বন্ধ, কতকালের অস্ত্রশস্ত্র, রাজাদের আসবাবপত্র, চালডাল, ঘি-ময়দা, ধন দৌলত দিয়ে ঠাসা! যেমন সোঁতা তেমনই অন্ধকার, সে সব ঘরে একবার ঢুকলে রাস্তা হারিয়ে চিরকাল

গোলকধাঁধার মতো ঘুরে বেড়াতে হয়, আর বাইরে আসবার উপায় নেই, এমনই প্যাঁচালো রকমে সে সব ঘর সাজানো। ছ'তলার উপরে রাজসভা, সেখানে কতকটা আলো বাতাস আসবার জন্যে সারি সারি জানলা বারান্দা, সাততলায় অন্দরমহল, সেখানে জানলা সব খাঁচার মতো পাথরের জাল দিয়ে বন্ধ, পোষাপাখির মতো রানীদের ধরে রাখার জন্যে ছোট ছোট কুলুঙ্গি দেওয়া দরজায় শিকল আঁটা সব শয়নমন্দির।

অন্ধকূপ এই নাটবাড়িতে আড়িমাও রাজাদের বংশ ভাল আলো বাতাস না পেয়ে গুষ্টিসুদ্ধ লোকলস্কর সমেত অল্পদিনের মধ্যে মরে ভূত হয়ে গেল, রইল কেবল বাড়ির চুড়োয় মস্ত একটা পাথরের আলসের উপরে খড়কুটো দিয়ে বাসা বানিয়ে এক ঠেঙে—সে হাড়গিলের রাজা খাম্বাজং। রানির শয়নঘরের কুলুঙ্গিগুলোতে গোটাকতক লক্ষ্মীপেঁচা, কালোপেঁচা, ভুতুমপেঁচা, রাজসভার কার্নিশে কার্নিশে ঝুলে দলে দলে বাদুড়, রন্ধনশালায় একটা কালো বেড়াল, আর ঘি-ময়দা চাল-ডাল শাল-দোশালা ধন-দৌলতে ঠাসা নিচেকার ভাঁড়ার ঘরগুলোতে গড়বন্দি পালে পালে গণেশের নেংটি ইঁদুর। হাড়গিলে পেঁচা বেড়াল এরা সবাই ইঁদুরের শত্রু হলেও গণেশের ইঁদুরকে তারা খাতির করে চলত। পৃথিবীর যেখানে যত গণেশ আছে, সবার জন্যে এই নাটবাড়ি থেকে ইঁদুর যায়, এদের কেউ কিছু বলবার যো নেই, কাজেই নেংটি ইঁদুরের দল দেশজুড়ে নানা উৎপাত আর রাজত্ব করছিল, এই সময় কোথা থেকে তাতারি-চুয়ো এসে হানা দিয়ে, যেখানে সেখানে গণেশ উলটে ফেলে নেংটি বংশ ধ্বংস করতে শুরু করে দিলে।

গোলাবাড়ি, ঠাকুরবাড়ি, গোয়ালঘর, রান্নাঘর, কাছারিঘর, হেঁসেলঘর, শোবারঘর, বসবারঘর, তোষাখানা, বৈঠকখানা, দেশের সব জায়গা থেকে তাড়া খেয়ে নেংটি সরে পড়তে লাগল, লড়ায়ে হারতে থাকল, না খেয়ে মরতে লাগল; শেষে এমন হল যে এক পুরানো নাটবাড়ি ছাড়া গণেশের ইঁদুর আর কোথাও রইল না। গণেশের সিংহাসন টলমল করতে থাকল, মানুষে নেংটি ইঁদুর মারত বটে, কিন্তু গণেশ তাতে টলেননি, কেন না এত ইঁদুর বাইরে বাইরে জন্মাত যে, মানুষ জন্ম জন্ম মেরেও তাদের বংশ লোপ করতে পারত না। কিন্তু নেংটিরই বড় জাত যে চুয়ো, তারা যখন এসে হানা দিয়ে পড়ল, তখন গণেশ ভেবে অস্থির হলেন।

এই চুয়োরা একেবারে চোয়াড়, যা তা খায়, দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি মোটেই নেই, একেবারে গোঁয়ার গোবিন্দ, দু'টি একটি করে যেন ভালমানুষের মতো প্রথমে নদীনালার ধারে ধারে, নৌকোর খোলে এসে বাসা বাঁধলে, দেবতার মন্দিরে কিংবা মানুষের ভাঙা ঘরের উপরে, গ্রাম-নগরের দিকেই ঘেঁষত না—নেংটি ইঁদুরগুলো যে সব পোড়ো বাড়ি, পতিত জমি ছেড়ে গেছে সেই জায়গাগুলোয় এসে রইল, নেংটিদের ফেলে দেওয়া যা কিছু কুড়িয়ে খেয়ে বড় হতে লাগল। ক্রমে তারা বড় হতে হতে শেষে নেংটিদের মাটির কেল্লাগুলো দখল করে জমিদারি ফাঁদলে। সেখান থেকে এ জমিদারি সে জমিদারি, এ পরগনা সে পরগনা, এ দেশ সে দেশ করে সারাদেশ তারা দখল করলে। মাটির নিচেটা দখল করে মাটির উপরে চুয়োর দল লড়াই দিতে যখন বার হল, তখন নেংটিরা বুঝলে দাঁড়াবার স্থান গেছে। নিরুপায় হয়ে তারা যে কটা পারে তাদের পুরানো নাটবাড়ির কেল্লায় এসে ঢুকে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগল। নাটবাড়ির দেওয়াল মোটা, কাজেই নেংটিরা কতকটা নির্ভয়ে রইল। কিন্তু চুয়োরাও ছাড়বার পাত্র নয়; তারা বছরের পর বছর যুদ্ধ চালিয়ে শেষে একদিন নাটবাড়ির উঠোনটা দখল করতে বারজন তাতারি সওয়ার পাঠিয়ে দিলে! যুদ্ধং দেহি বলে শত্রুদল চারদিক ঘিরে লেজ আপসে লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে, চারদিকে সাজ রে সাজ রব পড়ে গেছে—

পায় দল কলবল ভূতল টলমল
সাজল দলবল অটল তাতারি।
দামিনী তক তক জামকী ধক ধক
ঝকমক চমকত খরতর বারি।
ধুধু-ধুধুধু নৌবত বাজে,
ঘন ভোরঙ্গ ভমভম, দামামা দদদম,
ঝনন্ন ঝমঝম ঝাঁজে—
ধা ধা গুড়গুড় বাজে।
নিশান ফরফর নিনাদ ধরধর
তাতারি গরগর গাজে।

ধুধু ধমধম ঝাঁ ঝাঁ ঝমঝম
দামামা দম দম বাজে।
রণজয়ী ভেরী বাজে রে ঝাঁগড় ঝাঁগড় ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁজে রে
মুচরিয়া গোঁফে চলে লাফে লাফে,
খেলে উড়ো পাকে থাকে থাকে থাকে ঝাঁপে রে
বাজে রণভেরী বাজে রে।
ভয় পেয়ে মরে নেংটি হাজার হাজার
তল গেল মানমত্তা ইঁদুর রাজার।
ঘাসের বোঝায় বসি ইন্দুরানী কাঁদে
ইন্দুরায় এতদিনে পড়িয়াছে ফাঁদে।
কান্দি কহে ইন্দুরানী, গণেশ গোঁসাই
এমন বিপাকে কভু আর ঠেকি নাই।

এইভাবে ইঁদুর রানি কাঁদছেন, এদিকে একশ বছরের ইঁদুরের রাজা তাতারিদের ভয়ে থরথরি কম্পমান, রানীর আঁচল ধরে মন্ত্র পড়ছেন, খট ভৈরবী—দ্রুত ত্রিতালি—আর কেঁদে বলছেন সুর করে:

চল চল যাই নীলাচলে। (রে অরে যাই)
ঘটালে বিধি ভাগ্যফলে।।
মহাপ্রভু জগন্নাথ সুভদ্রা বলাই সাথ
দেখিব অক্ষয় বটতল,
খাইয়া প্রসাদ ভাত মাথায় মুছিব হাত
নাচি বেড়াই কুতূহলে
ভবসিন্ধু বিন্দু জানি পার হইনু হেন মানি
সাঁতার খেলিব সিন্ধুজলে।।

নেংটির রাজা যখন কেল্লা ছেড়ে রানিকে নিয়ে পাছ-দুয়োর দিয়ে গঙ্গাসাগরের দিকে পলায়নের মতলব করছেন—লড়াই না দিয়ে, সেই সময় হাঁসের দল রিদয়কে নিয়ে দেওয়ানগিরির তলায় এসে উড়ে বসল। একদিকে নাটবাড়ির পাথরের পাঁচিল, আর একদিকে হাড়গিলের চর, এরই মাঝে জলের ধারে শুশনি কলমি শাক খেয়ে হাঁসের দল চরে বেড়াচ্ছে, এমন সময় আণ্ডামানি হাঁসের সঙ্গে দেখা, ছোটোদল বড়োদল দুই দলে অমনি কথাবার্তা চলল, সাঁতার খেলা আরম্ভ হল।

যোগী গোফাতে ভেড়াদের নিয়ে যে কাণ্ড হয়েছে শুনে আণ্ডামানি বললে—'তাহলে শেয়াল লোভ সহজে ছাড়বে না, নিশ্চয়ই আমাদের পিছু নেবে, আর এখন দু'দিন উড়ে কাজ নেই, এইখানেই থাকা যাক, আর ব্রহ্মপুত্রের বাঁক ধরে মানস সাগরেও গিয়ে কাজ নেই। এইখান থেকে বাঁহাতি মোড় নিয়ে একেবারে পাহাড়ের পাশ দিয়ে সোজা উত্তরে চলাই ভাল।'

চকা বললে—'অজানা রাস্তা কেমন করে যাব।'

আণ্ডামানি অমনি জবাব দিলে—'অজানা নয়, উত্তর সমুদ্রের ধারে রুশ দেশে যে সব পাখিরা থাকে তারা পাহাড়ের এই গলি পথটা দিয়ে সোজা হিমালয়ের ওপারে চলে যায়। আজ ক'দিন ধরে দলে দলে সারস বক কাদাখোঁচা জলপীপী এরা দেখি এই পথ দিয়ে যাওয়া আসা করছে।'

বুড়ো চকা ঘাড় নেড়ে বললে—'ওহে রাস্তা তো আছে জেনেছ, রাস্তার কোথায়, কেমন দানাপানির ব্যবস্থা তার খবর নিয়েছ কি?'

আণ্ডামানি লালসেরা মাথা নেড়ে বললে—'সে খবরও নিতে বাকি রাখিনি। এই দেওয়ানগিরি থেকে বড়নদীর রাস্তা বেয়ে সোজা উত্তরে গেলে তাসগং, তাউয়াং, দুটো বড় বড় বস্তি, তার পরই চুখাং-এর জলা। সেখানে একরাত্তির কাটিয়ে তার পরদিন সন্ধ্যায় চোনা হ্রদ পাওয়া যাবে, তারপর একদিনে নারায়ুম হ্রদ, সেখান থেকে একবেলার পথ, 'তিগুৎসো'। সেখান থেকে পশ্চিমে গেলে পেমো চাং, বাসাং সো, চোলু, খাম্বাজং গোঁসাইথান হয়ে ধবলাগিরি, আর উত্তর-পুবে গেলে যামদক্ষা নগরের ধারে প্রকাণ্ড পালতি হ্রদ, তার পরে 'তামলং কঙ্কজং'

হয়ে আবার ব্রহ্মপুত্রের রাস্তায় পড়া যেতে পারে, অনেক পাখিই এই রাস্তা দিয়ে চলেছে, সেথোর অভাব হবে না। তাছাড়া কঙ্কজং-এর রাজা কঙ্ক পাখির সঙ্গে যখন তোমাদের পরিচয় আগেই হয়ে গেছে, তখন সেখানেও কিছুদিন জিরিয়ে যাওয়া যেতে পারে।'

চকা ঘাড় নেড়ে বললে—'সে সব ভাল, কিন্তু ও দিকের আকাশটা যেন কেমন ঘোলাটে ঠেকছে, দেওয়ানগিরির উত্তর গা-টাতে মেঘের ছাওয়াটাও দেখতে পাচ্ছি; হঠাৎ ওদিক যাওয়া নয়, দু'একদিন দেখা যাক।'

হাঁসদের মধ্যে এইসব পরামর্শ চলেছে, এ দিকে রিদয় একটা ডোবায় পা ডুবিয়ে আড়িমাও রাজার পুরানো নাটবাড়িটার পাঁচিলের দিকে চেয়ে রয়েছে, এমন সময় দেখলে সন্ধ্যের অন্ধকারে পাঁচিলের ধারে রাশ রাশ নুড়িগুলো যেন নড়তে চড়তে আরম্ভ করলে, তারপর সার বেঁধে সব নুড়িগুলো কেল্লার দিকে এগোতে লাগল! রিদয় চেঁচিয়ে উঠল—'দেখ দেখ!' অমনি সব হাঁস সে দিকে চেয়ে দেখলে দলে দলে চুয়ো রাস্তা ঢেকে চলেছে।

রিদয় যখন বড় ছিল তখন একবার ইঁদুরের কামড় কেমন টের পেয়েছে, এখন এই বুড়ো আংলা অবস্থায় ইঁদুরের পাল্লায় পড়লে যে কি হবে তাই ভেবে সে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল! হাঁসেরাও রিদয়ের মতো ইঁদুরের গন্ধ মোটেই সইতে পারত না, যতক্ষণ সে দিক দিয়ে ইঁদুরগুলো গেল ততক্ষণ সবাই চুপচাপ মুখ বন্ধ করে রইল। তারপর 'ছি ছি' বলে যেন কেবলই ডানা ঝাড়া দিতে শুরু করে দিলে।

চুয়োর দল ছোটোবড়ো নুড়ির ঝরনার মতো গড়াতে গড়াতে পাথরের পাঁচিলের গোড়া বেয়ে নাটবাড়ির সিংগি দরজার দিকে চলে গেল, ঠিক সেই সময় আকাশে দুই পা লটপট করতে করতে হাড়গিলেরাজ খাম্বাজং ঝুপ করে হাঁসদের মধ্যে এসে পড়লেন। রিদয় এমনতর পাখি কোনওদিন দেখেনি, এঁর মাথা, গলা, আর পিঠ সাদা রাজহাঁসের মতো, ডানা দু'খানা কালো দাঁড়কাকের মতো, তেলে পাকানো গেঁটে-বাঁশের ছড়ির মতো লাল দু'খানা সরু ঠ্যাং, আর বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচির মতো এতটুকু মাথায় এতবড়ো এক লম্বা ঠোঁট—এক আঙুল কলমের যেন দশ আঙুল নিব, তার ভারে মাথাটা ঝুঁকেই আছে, মুখের দু'পাশে বোয়াল মাছের মতো দু'টো চোখ বসানো! রিদয়ের বোধ হল, পাখি মাছ কাঁকুড় কলম বাঁশ সব মিলিয়ে যেন এই পক্ষিরাজ সৃষ্টি হয়েছে!

হাড়গিলেকে দেখে চকা তাড়াতাড়ি ডানার পালক ঝেড়েঝুড়ে সামনে এগিয়ে এসে দণ্ডবত হয়ে দু'তিন বার প্রণাম করে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল হঠাৎ খাম্বাজং কী কাজে এলেন? নাটবাড়ির চুড়োয় হাড়গিলের বাস চকা জানে আর ফাল্গুন মাসের গোড়াতেই হাড়গিলেদের আনবার পূর্বে খাম্বাজং বাসাটা একবার তদারক করতে প্রতি বছরে এখানে এসে থাকেন সেটাও জানা কথা। কিন্তু হাড়গিলেরা তো হাঁসদের সঙ্গে প্রায়ই আলাপ-সালাপ রাখে না, হঠাৎ আজ হাঁসের দলে রাজার আগমন হল কেন, এটা চকা ভেবে না পেয়ে একবার ঘাড় চুলকে বললে—'জং বাহাদুরের বাসার খবর ভাল তো, গেল ঝড় বিষ্টিতে কোনও লোকসান হয়নি তো?'

হাড়গিলেরা সবাই তোতলা, সহজে কথা কওয়া তাদের মুশকিল, খাম্বাজং অনেকক্ষণ ঠোঁট কাঁপিয়ে এ চোখ বুজে ও চোখ খুলে ভাঙা গলায় কাঁদুনি শুরু করলেন—'বুড়োবয়সে বাসাটা ঝড়ে পড়ে গেছে, একে উঁচু নাটবাড়ি, তায় আবার চুড়ো, গিন্নি দেখে দেখে সেখানেই বাসা বাঁধলেন, টিকবে কেন? এই বুড়োবয়সে জল-ঝড়ের মধ্যে ওই গোটাকতক ভাঙা কাঠির বাসায় তো আমার টেকা দায় হয়েছে! এ দিকে আবার মানুষগুলো সমস্ত জলা আর খালবিল ভরাট করে তার উপর দিয়ে রেলগাড়ি চালাবার বন্দোবস্ত করচে, দু'একটা সাপ ব্যাঙ যে ধরে খাব তারও রাস্তা বন্ধ! শুনেছি না কি আবার এই নাটবাড়িটাতে ইস্টিশান বসাবে, তাহলে তো আমাকে এ দেশ ছাড়তে হয় দেখি!'

চকা খুব দুঃখ জানিয়ে বললে—'আপনি তো তবু এতকাল এই নাটবাড়িতেই কাটালেন, ইচ্ছে করলে পরেও আপনি ইস্টিশানের চুড়োটায় বাসা বাঁধতে পারেন। মানুষে কোনওদিন আপনার উপরে গুলিও চালাবে না। আর বাসা থেকে আপনার আণ্ডাবাচ্চা চুরি করে ভেজেও খাবে না, আপনার তো কোনও পরোয়া নেই। বড়জোর এখন চুড়োয় আছেন, না হয় চরে নেমে বসবেন; কিন্তু আমাদের দশা দেখুন দেখি—

ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে
মরণং গোমতী তীরে অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি!

এই ভাবেই সারাজীবন কাটাতে হবে। আপনার তো যা হক একটা দাঁড়াবার স্থান আছে, আমাদের দশাটা ভাবুন তো। ভবঘুরের মতো—

যেখানে সেখানে শোও আর খাও
পৃথিবীটা ঘিরে চক্কর দাও
শেষ একদিন অকস্মাৎ!
বিনি মেঘে বজ্রঘাৎ!

তাগে পেলেই মানুষ গুলি চালাচ্ছে আমাদের দিকে!'

হাড়গিলে গলার পালকের দাড়ি দুলিয়ে বললেন—'কথাটা তো বলেছ ঠিক, কিন্তু নাটবাড়ি হয়ে পর্যন্ত ওই চুড়োটায় বাস করে আসছি সাতপুরুষ ধরে, আজ হঠাৎ চুড়ো থেকে চরে নেমে বসা কি কম কষ্টের কথা, আর ওই হাড়গিলের চরটাও শুনেছি মানুষেরা চেঁচে ফেলে ওখান দিয়ে বড় বড় মালের জাহাজ চালাবে!'

চকা এবারে আমতা আমতা করে বললে—'তাহলে তো মুশকিল দেখছি, মানুষের সঙ্গে তো আমরা পেরে উঠব না, এ বিষয়ে আপনি—'

এবারে হাড়গিলে ঠোঁট বাজিয়ে বলে উঠলেন—'আঃ, সে মানুষের কথা, যখন তারা আসবে তখন ভাবা যাবে। এখন একটা কথা শুধোই, এদিক দিয়ে চুয়োদের পল্টন যেতে দেখেছ কি?' হাজার হাজার চুয়ো এই মাত্র এইদিক দিয়ে গেছে শুনে হাড়গিলে আকাশে চোখ তুলে বললে—'এতদিনে বুঝি গণেশের ইঁদুরের দফারফা, আজ রাতের মধ্যেই চুয়োরা নাটবাড়ি দখল করবে।'

চকা ভয় পেয়ে বললে—'কি বলেন লড়াই বাধবে নাকি?'

হাড়গিলে বলে উঠলেন—'বাধবে আর কি, বিনাযুদ্ধে চুয়োরা আজ কেল্লা মেরে নেবে, রাজা গঙ্গাসাগরের দিকে রানিকে নিয়ে দৌড় দিয়েছেন। বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর, কেল্লায় যারা ছিল তারা মানস সরোবরের ধারে আসছে পূর্ণিমায় পক্ষির দলের বারোয়ারির নাচ দেখতে ছুটেছে, ঠিক ঝোপ বুঝেই চুয়োর দল কোপ দিতে চলেছে। কেল্লায় গোটাকতক অকর্মণ্য বুড়ো নেংটি ছাড়া আর তো কেউ নেই, এতকাল নেংটিদের সঙ্গে এই নাটবাড়িতে কাটালেম, এখন বুড়ো বয়সে আর শিং ভেঙে বাছুরের দলে যাওয়ার মতো চুয়োর দলে ভিড়তে আমার ইচ্ছে যায় না, তাই ভাবচি থাকি কি যাই।'

হাড়গিলে যে ইঁদুরদের বিপদের খবরটা না দিয়ে হাঁসের দলে এসে কাঁদুনি শুরু করেছে এটা চকার মোটে ভাল লাগল না। সে একটু এগিয়ে গিয়ে হাড়গিলেকে বললে—'গণেশের ইঁদুরদের আপনি ও খবরটা পাঠাননি এখনও?'

হাড়গিলে গলার থলি দুলিয়ে বললে—'খবর দিয়ে লাভ? তারা আসবার আগেই সে কেল্লা দখল হয়ে যাবে।'

চকা এবারে চটে বললে—'হয়ে যাবে বললেই হয়ে গেল, এমন অঘটন হতে দেব না আমি বলছি!'

যে চকার ঠোঁট একেবারে ভোঁতা, নেই বললেই হয় আর যার পায়ের নখও ততোধিক ধারাল, সন্ধ্যে না হলেই যার ঘুম আসে, তিনি লড়তে চান চিরুনিদাঁত চুয়োদের সঙ্গে! হাড়গিলে হেসেই অস্থির। ঘাড় নেড়ে চকাকে বললেন—'বুরুঞ্জিতে লেখা আছে এই ঘটবে, কারও সাধ্য নেই তা রদ করা, আমি পণ্ডিতদের দিয়ে গণিয়ে দেখেছি কোনও উপায় নেই, না হলে আমি চুপ করে বসে আছি!'

চকা হাড়গিলের কথায় কান না দিয়ে ডাক দিলে—'পাঁপড়া নানকৌড়ি, নেড়োল কাটচাল, লালসেরা আণ্ডামানি, চোখধলা ডানকানি, পাটাবুকো হামস্ত্রি, মারাগুই চাপড়া, তীরশুলি আকায়ব, তোমরা যাও মানস সরোবরের পথে যত নেংটি দেখবে সবাইকে খবর দাও লড়াই বাধবে।' অমনই সাতটা বুনোহাঁস অন্ধকারে ডানা ছড়িয়ে উড়ে পড়ল। চকা আবার বাংলাদেশের হাঁসদের ডাক দিলে—'সনদ্বীপের বাঙাল, ধনমানিকের কাওয়াজি, রায়মঙ্গলার ঘেংরাল, চব্বিশ পরগনার সরাল!' অমনই তেল চুকচুকে মোটাপেট পাঁচজন উপস্থিত হল হেলতে দুলতে, চকা তাদের বললে—'চট করে যাও গঙ্গাসাগরের দিকে, নেংটিদের রাজা পলাতক ইন্দুরায় আর ইন্দুরানীকে ফিরিয়ে আনো!' কিন্তু এবারের দল অত চটপট উড়ে পড়ল না, বাঙাল মাথা চুলকে বললে—'এ কাজটা কি সমীচীন হবে, ইঁদুরের যুদ্ধে হাঁসেদের যোগ দেওয়া কি সঙ্গত, তাছাড়া এই অন্ধকার রাত্রে আপনাকে একলা এই শত্রুদের মাঝে—'

চকা ধমকে উঠল—'বড় দেরি করছ তোমরা!' বাংলার হাঁসরা পটাস পটাস করে ডানা ঝাপটে দক্ষিণ মুখে আস্তে আস্তে উড়ে চলল।

চকা তাদের দিকে খানিক কটমট করে চেয়ে থেকে সুবচনীর হাঁসকে বললে—''তুমি গিয়ে হাড়গিলে চরে চুপচাপ বসে থাকো, আমি কেবল হংপাল বুড়ো আংলাকে পিঠে নিয়ে নাটবাড়িতে যাব, যদি কেউ চুয়োদের তাড়াতে পারে তো এই ছোকরা।' বলে চকা হাড়গিলের সঙ্গে রিদয়ের আলাপ করে দিল।

টিকটিকির মতো বুড়ো আংলাকে দেখে হাড়গিলে একবার গলার থলি ফুলিয়ে খানিক হেলেদুলে হেসে নিলেন। তারপর ঝপ করে ঠোঁটে করে রিদয়কে আকাশে ছুড়ে ছুড়ে লোফালুফি শুরু করে দিলেন, রিদয় ভয়ে চিৎকার করতে লাগল। চকা তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বললেন—'জং বাহাদুর করেন কি! ওটা মানুষ—ব্যাঙ নয়, ওকে ছাড়ুন, গেল যে!'

'মানুষ!' বলেই হাড়গিলে মাটিতে রিদয়কে নামিয়ে দিয়ে দু'চারবার ডানা আপসে নৃত্য করে বসলেন—'বুরুঞ্জিতে ঠিক তো লিখেছে, অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ এই মহাপুরুষ এসেছেন ঠিক ভূতচতুর্দশীতেই, আর ভয় নেই, আমি এখনই গিয়ে নাটবাড়ির সকলকে এ খবর দিচ্ছি। জয় গণেশের জয়'—বলে হাড়গিলে নাটবাড়ির দিকে উড়ে গেল।

হাড়গিলের ব্যবহারে রিদয় ভারি চটে ছিল, সে গোঁ হয়ে চকার পিঠে উঠে বসল। নাটবাড়ির চুড়োয় একখানা যাঁতার মতো পাথর, তার মাঝখানটায় রাজাদের ধ্বজি গাড়বার গর্ত, সে গর্তে খান দুই পুরানো হোগলা পাতার মাদুর বিছানো, তার উপরে কাঠকুটো আর পালকের তোশক, একপাশ কোনকালের রানীদের ছেঁড়া কাপড়ের এক টুকরো জরির আঁচল মাদুর ছেঁড়ার মধ্যে ঝিকমিক করছে, কতকালের মরচে ধরা একটা খিল ভাঙা তালা, একটা কলঙ্কপড়া রুপোর চুষিকাঠি, ভোঁতা একটা শরের কলম, ছেঁড়া একপাটি জরির লপেটা জুতো, আধখানা পরকলা লাগানো শিং-এর চশমা একটা, গেল বছরের ফাটা টিনের পেয়ালার মতো গোটাকতক ডিমের খোলা, পেটটা ফুটো করা একটা আধমরা ব্যাঙ, এমনই সব নানা সাজসরঞ্জাম দিয়ে বাসাটা ভর্তি। কতকালের সে বাসা তার ঠিক নেই, তার গায়ে ছোটোবড়ো ঘাসপাতা গজিয়ে গেছে, এমন কি গেটের উপর লতাওয়ালা একটা বটগাছ পর্যন্ত, তাতে আবার ফল ধরেছে।

চকার সঙ্গে রিদয় এসে দেখলে নাটবাড়ির সবাই এসে আজ বাসার হাড়গিলেকে ঘিরে কী সব পরামর্শ করছে, বুড়ো ভুতুম পেঁচা একদিকে বসে গোল দুইচোখ বার করে কেবলই হুঁ হুঁ সায় দিচ্ছে, কালো বেড়ালটা লেজ নাড়ছে আর মিউমিউ করে কি যে বকছে তার ঠিক নেই, হাড়গিলে মাঝে বসে কেবলই গলার থলি ঝাড়ছেন আর পাঁচগণ্ডা বুড়ো নেংটি ইঁদুর শুকনো মুখে একধারে চুপটি করে বসে এ দিক ও দিক কান ঘোরাচ্ছে।

ইঁদুর বেড়াল পেঁচা হাড়গিলে এখানে জমা হয়েছে দেখেই রিদয় বুঝলে নাটবাড়িতে আজ বিষম গণ্ডগোল। চকা আর রিদয়ের দিকে কেউ আজ চেয়েও দেখলে না, সবাই চেয়ে রয়েছে হাঁ করে যে দিকে দিয়ে দলে দলে চুয়ো সার বেঁধে মাঠের উপর দিয়ে আসছে।

ভুতুম পেঁচা খানিক ভূতের মতো নাকিসুরে চুয়োদের বিষম উৎপাতের কথা বর্ণনা করে চলল। বেড়াল মিউমিউ করে খানিক কাঁদুনি গাইলে—'এই বুড়ো বয়সে শেষে কি চুয়োর পেটে যেতে হবে নাকি, আণ্ডাবাচ্চা কাউকেই তারা রেহাই দেবে না!'

হাড়গিলে ইঁদুরদের ধমকে বললে—'এই দুঃসময়ে তোমাদের চাঁইদের বারোয়ারিতে যেতে দিয়ে যত মুখ্যুমি করেছ, লড়াই দেবার জন্যে একটা লোক পর্যন্ত রইল না কেল্লায়! আমি কি এই বুড়ো বয়সে চুয়ো মেরে ঠোঁটে গন্ধ করতে পারি, ছি ছি। এমন করে কেল্লা ফাঁক রেখে সব নেংটির চলে যাওয়াটা ভারি অন্যায় হয়েছে!'

ইঁদুরগুলো কেবল হতভম্ব হয়ে বেড়ালের দিকে চাইতে লাগল। বেড়াল ফোগলা দাঁত খিঁচিয়ে বললে—'আমার দিকে দেখছ কি? তোমরা নিজেদের ঘর সামলাতে না পার নিজেরাই মরবে। আমার কি, আমি ষষ্ঠীর দুয়োরে গিয়ে ধন্না দেব। সেখানে পেসাদের কিছু না পাই দুধ তো আছে।'

ইঁদুরেরা হাড়গিলের দিকে চাইতে তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন—'আমি আর কী করতে পারি বল? এই অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ টিকটিকির মতো মানুষটিকে তোমাদের এনে দিলেম, এর সঙ্গে পরামর্শ করে যা ভাল হয় কর। আমার যথাসাধ্য তো তোমাদের জন্যে করলেম, এখন যা করেন গণেশ ঠাকুর। আঃ আর পারিনে!' বলে হাড়গিলে পা মোড়া দিয়ে আকাশের দিকে ঠোঁট তুলে চোখ বুজলেন।

ইঁদুর বেড়াল পেঁচা একবার রিদয়ের মুখের দিকে চাইলে তারপর আস্তে আস্তে সভা ছেড়ে যে যার বাসায় যাবার উদ্যোগ করলে। এদের রকম দেখে চকার এমনই রাগ হচ্ছিল যে সব কটাকে ঠেলে সে চুয়োদের মুখে

ফেলে দেয়, বিশেষ করে ওই একঠেঙে হাড়গিলেটাকে এক ধাক্কায় নাটবাড়ির চুড়ো থেকে একেবারে নিচে ফেলে দেবার জন্যে চকা নিসপিস করতে লাগল।

রিদয় তাকে চোখ টিপে বললে—'চুয়োদের জব্দ করা বড় শক্ত নয়, যদি নাটবাড়ির ঠাকুরঘরের লক্ষ্মী পেঁচা আমাকে এখনই একবার ঠাকুরঘরে যে দুয়োরের উপরে কুলুঙ্গিতে গণেশ বসে আছেন তাঁর কাছে নিয়ে যান!'

ভুতুম অমনই তাড়াতাড়ি লক্ষ্মীপেঁচাকে ডেকে আনলে। রিদয় লক্ষ্মীপেঁচাকে গণেশের কথা শুধোতে সে বললে—'ঠাকুর তো এখন শয়ন করেছেন, ঠাকুরঘরের দরজা বন্ধ!'

রিদয় চকার সঙ্গে চুপিচুপি দু'একটা কথা বলাবলি করে পেঁচাকে বললে—'পুরনো দরজা খুলে নিতে কতক্ষণ? চলো, পথ দেখাও।'

লক্ষ্মী পেঁচা আগে পথ দেখিয়ে চলল, সঙ্গে রিদয়।

চকা বললে—'এই চর্তুদশীর রাত্রে পোড়ো বাড়িতে একা তোমায় যেতে দিতে মন সরছে না—যদি পেঁচোয় পায়, আমাকেও সঙ্গে যেতে হল।'

হাড়গিলে অমনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—'না না, সে হতে পারে না, তুমি গেলে গোল হবে, বুরুঞ্জিতে লিখছে এই ভূতচতুর্দশীতে একা এই অঙ্গুলিপ্রমাণ মানুষটি এসে নাটবাড়িতে মূষিকদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে হাড়গিলে বংশের সুখসৌভাগ্য বৃদ্ধি করবেন। তুমি গেলে শাস্ত্রের কথা মিথ্যে হয়ে যায়। এই নাও শনিবার অমাবস্যাতে তোলা এই মানকচুর শিকড় সঙ্গে রাখ; ভূত পালাবে।' বলে রিদয়ের হাতে হাড়গিলে তাঁর বাসার ছেঁড়া মাদুর একটু ভেঙে দিয়ে তার কানে মন্তর দিলেন।

রিদয় ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে কচুর শিকড় গুঁজে চিলে ছাতের গোল সিঁড়ি বেয়ে পেঁচার সঙ্গে নেমে চলল, মনে মনে ভূতের মন্তর আওড়াতে আওড়াতে—হং সং বং লং হাঃ ফুঃ। ভূতচতুর্দশীর রাত্রি এমন অন্ধকার যে ভূতকে পর্যন্ত দেখা যায় না! রিদয় সেই অন্ধকারে পেঁচার সঙ্গে চিলের ছাতের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ক্রমাগত নেমে চলেছে। দু'দিকে পিছল পাথরের দেওয়াল। তার মাঝে মাঝে এক একটা ঘুলঘুলি, সেইখানে দিয়ে একটু যা আলো আর বাতাস আসতে পায়! রিদয় দেওয়ালের গা ঘেঁষে টিকটিকির মতো পায়ে পায়ে নামছে, অন্ধকারে পেঁচা যে কোনদিকে চলেছে সেই জানে, কেবল সে এক একবার হাঁকছে—'উঁচা-নিচা!' আর সেই ডাক শুনে রিদয় চলেছে, ইস্ক্রুপের প্যাঁচের মতো পাক দেওয়া সিঁড়ি পার হয়ে অন্ধকারে।

একটা কিসের গায়ে হাত পড়তেই সেটা ক্যেঁ বলে ঝটপট করে উঠল, এক জায়গায় জল পড়ে ডোবা মতো হয়েছে। হঠাৎ ঠাণ্ডা জলে পা রেখেই রিদয় থমকে দাঁড়াল, পেঁচা অমনি বলে উঠল—'বাঁয়ে ঘেঁষে।' কখনও বাঁয়ে কখনও ডাইনে কখনও উঁচায় কখনও নিচায় এইভাবে রিদয় চলেছে! চোখে কিছু দেখছে না, কানে শুনছে খালি যেন এখানে কি একটা ঝটপট করে উঠল, ওখানে মাথার উপর থেকে কি ঠিক ঠিক করে ডাক দিলে, কখনও শুনলে পাথরের গায়ে কে নখ আঁচড়াচ্ছে, ওদিকে কারা যেন দুদ্দাড় করে পালিয়ে গেল, পায়ের কাছে কি একটা পাশমোড়া দিলে, হঠাৎ গালে যেন কে একটা চিমটি কেটে গেল, কানের কাছে চট করে একটা কে 'টু' দিয়ে পালাল! এর উপরে রিদয় নানা বিভীষিকা দেখছে—হঠাৎ এক জায়গায় গোটাকতক চোখ আলেয়ার মতো জ্বলেই আবার নিভে গেল। যেন ইলিশ মাছের জাল নাকের সামনে কে একবার ঝেড়ে দিয়েই সরে পড়ল, হঠাৎ একটা গরম হাওয়া মুখে লাগল, তারপরেই বরফের মতো বাতাস এসে কাঁপিয়ে দিলে!

রিদয়ের মনে হচ্ছে এইবার সিঁড়ি শেষ হল কিন্তু খানিক গিয়ে আবার সিঁড়ি, আবার চাতাল, আবার ধাপ, আবার দেয়াল, এমনই ক্রমাগত ওঠানামা করতে করতে চলা—এর যেন শেষ নেই। আঁধিধাদি ভূতপেত্নি ব্রহ্মদৈত্য ঝামঝামড়ি কন্ধকাটা শাঁকচুন্নি ডাকিনী যোগিনী ভ্যাল ভেলকি, পেটকামড়ি সবই আজ ভূতচতুর্দশীতে জটলা করতে বেরিয়েছে, আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে রিদয়কে দেখে কেউ ঝমঝম করে নাচতে লাগল, কেউ ফিকফিক করে হাসতে লাগল। খুসখাস খিটখাট আওয়াজ করে ভূতেরা কেউ খড়ম পায়ে, কেউ হাড় মড়মড় করে, কেউ বা ঘণ্টা বাজিয়ে, কেউবা চটি চটচট করে তার সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে নামছে। ভয়ে রিদয়ের হাত পা অবশ হয়ে এসেছে, ঠিক সেই সময় সরু গলির শেষে মস্ত একটা চাতালের উপর এসে পেঁচা 'ঠাকুরবাড়ি' বলেই অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেল!

অনেকক্ষণ ধরে কারুর সাড়াশব্দ নেই, রিদয় অন্ধকারে হাতড়ে দেখলে চারদিকে দেওয়াল, দরজাও নেই, কিছুই নেই! রিদয় ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, একটা কে তার পায়ে এসে সুড়সুড়ি দিয়ে তাকে আস্তে আস্তে

দেওয়ালের কাছে টেনে নিয়ে গেল, তারপর কিচ করে যেন চাবি খোলার শব্দ হল! একটা মস্ত দরজা হড়হড় করে গড়িয়ে আপনি যেন খুলে যাচ্ছে, পায়ের নিচে পাথরের মেঝেটা তারই ভারে কাঁপছে!

ঠিক সেই সময় বিকট শব্দে মাথার উপরে ঘটং ঘং ঘটং ঘং করে রাত বারটার ঘড়ি পড়ল। অমনই দপদপ করে চারদিকে আলোয় আলো এসে দেওয়ালির পিদুম জ্বালিয়ে দিলে, আর ঘণ্টা নাড়তে নাড়তে ভয়ংকর এক কাপালিক ব্রহ্মদৈত্য মড়ার মাথার খুলিতে ঘিয়ের সলতে জ্বালিয়ে উপস্থিত—

গলে দোলে ভীষণ রুদ্রাক্ষ মালা
পিঙ্গল নয়নে যেন মহেশের কোপানল জ্বালা!

রিদয় দেখলে, ঘরের মধ্যে কালোপাথরের প্রকাণ্ড এক মূর্তি, তাতে কতকালের রক্তচন্দনের ছিটে, ভৈরবটির জিব লকলক করছে আর গায়ে সোনা-রুপো হীরে-জহরৎ আর মুণ্ডুমালা ঝুলছে! ব্রহ্মদৈত্য আরতি আরম্ভ করলেন :

রম-ঝম রম-ঝম শব্দ উঠে
ভূত প্রেত পিশাচ দাঁড়ায় সবে জোড় করপুটে।
তাধিয়া তাধিয়া বাজায় তাল
তাতা থেই থেই বলে বেতাল
ববম ববম বাজায়ে গাল
ডিমি ডিমি বাজে ডমরু ভাল
ভবম ভবম বাজায়ে সিঙ্গা
মৃদঙ্গ বাজায় তাধিঙ্গা-ধিঙ্গা
ধেই ধেই নাচে পিশাচ দানা।

রিদয় হাঁ করে ভূতের কাণ্ড দেখছে এমন সময় পেঁচা কানের কাছে ফিসফিস করে বললে, 'এখানে নয়, পাশের কুঠরিতে গণেশ ঠাকুরের সভা।' হোমের ধোঁয়ায় আলোগুলো ক্রমে ঘোলাটে হয়ে এল; সেই সময় রিদয় পেঁচার সঙ্গে আস্তে আস্তে পাশ কাটিয়ে গণেশ মহালের গলিতে সেঁধোল। দেউড়িতে একটা মোটাপেট হিন্দুস্থানি দারোয়ান সিদ্ধি খেয়ে খালি গায়ে ভোঁ হয়ে ঢোলক পিটছে, অন্ধকারে রিদয় তাকেই গণেশ ভেবে টিপ করে একটা পেন্নাম দিয়ে হাতজোড় করে দাঁড়াল।

দারোয়ানজি ভারি গলায় বললে, 'কৌন হোঃ?'

রিদয় কিছুই বুঝলে না, তবু ঘাড় নেড়ে বললে—'আজ্ঞে আমি রিদয়, নেংটি ইঁদুরেরা বড় বিপদে পড়েছে তাই—'

'ক্যা বক বক লাগায়া'—বলে দারোয়ান আবার ঢোল পিটতে লাগল।

রিদয় ভাবলে গণেশ বকের কথা শুধোচ্ছেন; সে তাড়াতাড়ি বললে—'আজ্ঞে বকের সঙ্গে আমার আলাপ আছে, কিন্তু আজ আমি ইঁদুরের হয়ে লড়াই করতে চাই, সেইজন্যে আপনার ওই জয়ঢাকটি আমি চাই।' বলে রিদয় যেমন ঢোলকে হাত দিয়েছে, অমনই গণেশের দারোয়ান ধমকে উঠল—'ধেৎ তেরি!'

রিদয় ভয়ে দশহাত পিছিয়ে পড়ল—সেই সময় পেঁচা এসে তার কানে কানে বললেন—'করছ কি? উনি গণেশ নন, ভিতরে চল!' তারপর দারোয়ানের সঙ্গে পেঁচা গিয়ে কি খানিক বকাবকি করলে, তখন দারোয়ান দুয়োর ছেড়ে দিয়ে বললে—'আইয়ে বাবু!'

মহলের মধ্যে গণেশের পরিচয় চৌষট্টি ভাগ কলাবৌ, কেউ রঙ তুলি নিয়ে আলপনা দিচ্ছিল, কেউ সেতার বাজিয়ে গানবাজনা করছিল, কেউ মালা গাঁথছিল, কাঁথা বুনছিল, এমনই চৌষট্টি খাম্বা ঘরের মধ্যে সবাই এক এক কাজে, হঠাৎ রিদয়কে দেখে সবাই মাথায় ঘোমটা টেনে জুজুবুড়িটি হয়ে বসল।

পেঁচা সেখান থেকে রিদয়কে নিয়ে আর একটা হাতিশুঁড়ো গজদন্তের খিলানের মধ্যে গণপতি গণেশের বৈঠকখানায় এনে হাজির করে দিলে। রিদয় দেখলে ঘরের উত্তর গায়ে মস্ত একটা তক্তাপোশে গের্দা হেলান দিয়ে থানধুতি পরে মেরজাই পরে এক ভদ্রলোক বসে আছেন, তাঁর গজদাঁতও নেই শুঁড়ও নেই, মোটা পেটও নয়, দিব্যি দেবতার মতো চেহারা!

পেঁচা রিদয়ের কানে কানে বললে—'ইনিই রাজা গণেশ, এঁকে যা দরবার করতে হয় কর।'

রিদয়ের মুখে কথা নেই, ইনিই গণেশ! ভয়ে ভয়ে সে এগিয়ে বললে—'মশায়ের নাম?'

উত্তর হল—'আমি গণপতি, কি চাই?'

রিদয় খুব নরম হয়ে বললে—'যে ইঁদুরগুলিতে চড়ে মশায় বেড়িয়ে বেড়ান সেগুলির বড় বিপদ উপস্থিত!'

গণেশ ভুরু কুঁচকে বললেন—'ইঁদুর! আমি তো কোনওদিন ইঁদুরে চড়িনে।'

রিদয় বললে—'আজ্ঞে, ভুলে যাচ্ছেন আপনি, হস্তীবেশ ধরে যখন হাওয়া খেতে বেরোন, সেই সময় যে ইঁদুর আপনার গাড়ি—'

গণেশ হোঃ হোঃ করে হেসে বললেন—'তুমি পাগল নাকি আমাকে সুদ্ধ গাড়ি টেনে চলতে পারে যে ইঁদুর তাকে তুমি কোথায় দেখলে? ছেলেবেলায় আমি দু'একটা ইঁদুর পুষেছিলাম কিন্তু সবগুলোর বাচ্চা হয়ে আমার ঘরে এমনই উৎপাত লাগালে যে সবকটাকে আমি ইঁদুরকলে ধরে বিদায় করেছি। তুমি ভুল খবর শুনেছ, ইঁদুরে আমি চড়িনে, হস্তী-বেশেও সঙ সেজে আমি হাওয়া খেতে যাইনে, নিশ্চয়ই কেউ তোমায় ঠকিয়েছে!'

রিদয় অবাক হয়ে বললে—'সে কী মশায়, ঘরে ঘরে ইঁদুরে-চড়া আপনার ছবি, তাছাড়া আমি নিজের চোখে দেখেছি আপনি ঢোল বাজিয়ে ইঁদুর নাচ করছেন, আমাকে শাপ পর্যন্ত দিয়ে এলেন, এখন বলছেন উল্টো, আমাকে ছলনা করছেন!'

গণেশ গম্ভীর হয়ে বললেন—'বাপু আমি যাই করি, এটুকু জেনো আমি ছলনাও করিনি শাপও দিইনি। ইঁদুরেও চড়িনি কোনওদিন, ঢোলও পিটিনি। ওই আমার দারোয়ানগুলো মাঝে মাঝে হোলিতে দেওয়ালিতে ঢোল পিটিয়ে আমার কান ঝালাপালা করে, ওদের গিয়ে শুধোও। যদি আর কোনও গণেশ থাকেন তো বলতে পারিনে।'

রিদয় চোখ মুছে বললে—'মশায় যে আমাকে শাপ দিলেন, এখন শাপান্ত না করে দিলে তো আমি মারা যাই!'

গণপতি চোখ পাকিয়ে বললেন—'কোনও সাপের ওঝাকে শুধোওগে বলে দেবে কে তোমায় শাপ দিয়েছে আর কেমন করে শাপান্ত হবে—যাও, আমাকে বিরক্ত কোরো না!'

রিদয় মুখ কাঁচুমাচু করে বললে—'মশায়, আমি গরিব!'

গণেশ বিরক্ত হয়ে মুখ ফেরালেন।

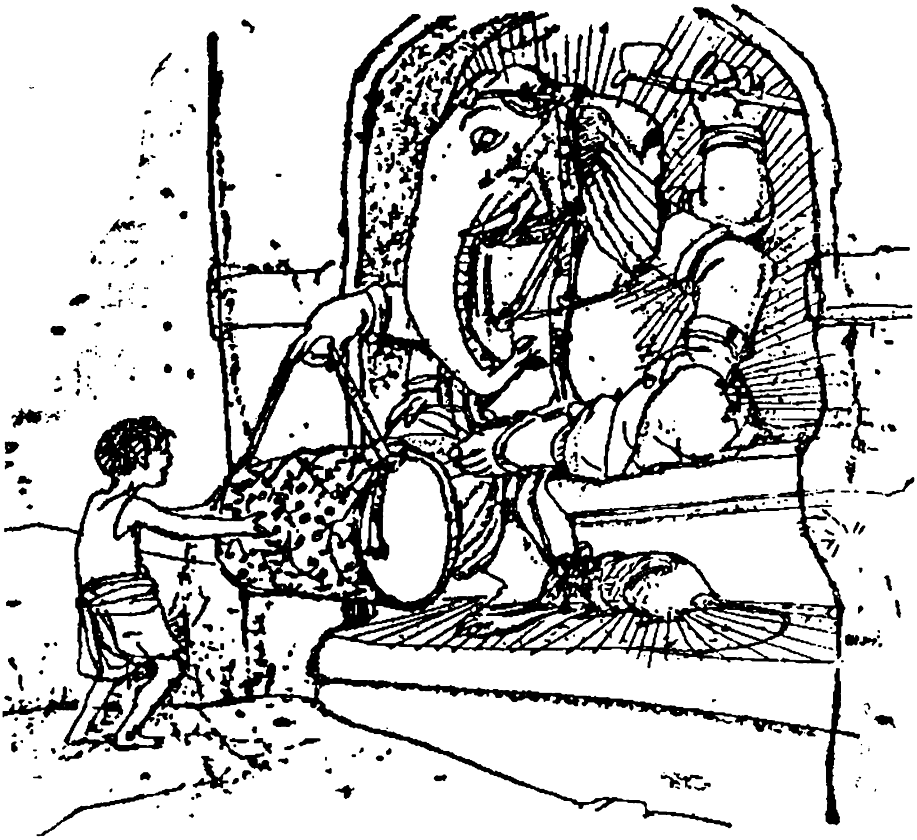
রিদয় জানত স্তুতি করলেই দেবতারা খুশি হন তাই সে একেবারে গলায় বস্তর দিয়ে গণেশের রূপ বর্ণনা করে গণেশ বন্দনা শুরু করে দিলে :

> খর্বস্থূল কলেবর গজমুখ লম্বোদর
> বিঘ্ন নাশ কর বিঘ্নরাজ,
> পূজা হোম যোগে যাগে তোমার অর্চনা আগে
> তব নামে সিদ্ধ সর্ব কাজ।
> শুণ্ডে তুলি খই মোয়া দন্তে খাও চিবাইয়া
> ইঁদুর বাহন গণপতি,
> আপনি আসরে উর রিদয়ের আশা পুর
> নিবেদিনু করিয়া প্রণতি।

গণেশ কানে হাত দিয়ে বললেন—'আরে রাম রাম কি বাজে বকছ, তুমি তো ভাল বিপদে ফেললে দেখি, রোসো আমি একবার বাড়ির মধ্যে থেকে আসছি, বিশেষ কাজ আছে।' বলে গণেশ উঠে গেলেন।

এতক্ষণ গণেশের চৌষট্টি কলাবৌ ঘরে কি হচ্ছে দরজার পাশ উঁকি দিয়ে দেখছিলেন, কর্তা উঠে যেতেই গণেশ-দাসীকে দিয়ে রিদয়কে ডেকে তাঁরা শুধোলেন—'হ্যাঁগা তুমি কর্তার কাছে কি নালিশ করছিলে?' রিদয়ের মুখে ইঁদুরের খবর শুনে তাঁরা বলে উঠলেন—'ওমা, এই দরবার করতে এসেছ তা বলতে হয়, ওই আমাদের কুমোর-বৌ কর্তার যে মূর্তিগুলো গড়ে গড়ে ভটচায্যি মশায়ের হাতে দিয়ে লোকের ঘরে ঘরে বিক্রি করতে পাঠায়, সেই গণেশের তুমি বুঝি সন্ধান করছ? ওই দারোয়ানজিকে বল সে তোমাকে সেই গণেশের দোকান দেখিয়ে দেবে।'

রিদয় কলাবৌদের পেন্নাম করে আবার দেউড়িতে এসে দরোয়ানজির সঙ্গে আর একটা ঘুপসি ঘরে গিয়ে দেখলে, দোকানঘরের এক এক কুলুঙ্গিতে এক একরকম গণেশ—গোবর গণেশ তিনি হাতে পুঁথি লিখছেন,



সিদ্ধিদাতা গণেশ তিনি এক ধামা দিল্লির লাড্ডু দিয়ে বসেছেন, মাড়োয়ারিপটির টঙ্ক-গণেশ বসে বসে খালি আকাশে আঁকশি দিচ্ছেন, হেড়ম্ব-গণেশ তিনি খুব আড়ম্বর করে ঢোল পিটছেন।

রিদয় টিপ করে তাঁকে নমস্কার করে বললে—'গণেশদাদা, চিনতে পারেন?' হেড়ম্ব রিদয়ের কথায় জবাব দিলেন সমস্কৃত দেবভাষায়—'বুং!' রিদয় ভাবলে এ তো মুশকিল, যদি বা কত কষ্টে এসে ধরলেম, এখন কথা না বুঝলে উপায়? সে একবার ইঁদুরের দিকে, একবার ঢোলকের দিকে, একবার নিজের দিকে আঙুল নেড়ে ইশারায় বোঝাল ঢোলকটা চাই। গণেশ ঢোলকটা রিদয়কে দিয়ে এদিক ওদিক শুঁড় নেড়ে কি বললেন বোঝা গেল না। রিদয় শুধু শুনলে—'বুং চটাপট ত্বং কং করং বাদনং পুনস্তম্ ব্যস্তম্ নাদম্ কুণ্ডমকুলম্ পৌউনড্রবর্ধনম্ গণ্ডস্থলম্ আগচ্ছতু।'

রিদয় গণেশের মুখ দেখে বুঝলে তিনি খুব খুশি হয়েছেন। সে অমনই আচার্যি পুরুতকে দুর্গাপুজোয় শ্রাদ্ধে-শান্তিতে যেমন করে সব মন্তর আওড়াতে শুনেছিল ঠিক তারই নকলে বললে—'হুং ভূত স্বাহা, কুরু কুরু কুণ্ডলিনী নমোঃ আসিতো দেবল গৃহ্যং কুরু তুভ্যং হং যং ছট ফট বক্ষবিদ্যা হবিষে স্বাহা অহঃচিটপটাং হুং শান্তি ভূশান্তি ভূত্যর শান্তি অষুধেঃশান্তি ছিহরি ছিহরি ছিহরি হরিবোল হরিবোল হরিবোল সূর্য প্রণাম।' গণেশ খুশি হয়ে দু'বার ঘাড় নেড়ে 'তথাস্তু' বলে চোখ বুজলেন।

রিদয় আস্তে আস্তে ঢোলক নিয়ে বেরিয়ে এল। দরোয়ান ঘরের দুয়োরই দাঁড়িয়ে ছিল, সে অমনই বখশিশের জন্যে হাত পাতল, রিদয় এদিক ওদিক দেখে আস্তে আস্তে মানকচুর শিকড়টি বার করে বললে—'দারোয়ানজি আর তো কিছু নেই, এইটে নাও।'

দারোয়ান 'হাৎ তেরি,' বলে হাত ঝাড়া দিলে।

শিকড় যেমন মাটিতে পড়া অমনই পেঁচা রিদয়কে ছোঁ দিয়ে একেবারে ঘুরোনো সিঁড়ি বেয়ে ছাতে এসে উপস্থিত। সঙ্গে সঙ্গে পেঁচো এসে রিদয়কে পেয়ে বসল—রিদয় অজ্ঞান হয়ে পড়ল আর বহুরূপীর চামড়ার মতো তার গায়ের রঙ লাল, নীল, হলদে, রকম রকম বদলাতে আরম্ভ করলে। হাড়গিলে অমনি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে মন্তর পড়ে পেঁচো ঝাড়তে বসে গেলেন।

স্বন্ধাপসার শকুনি
অন্ধ পুতনা শীত পুতনা মুখমণ্ডিকা
নৈগমেষ প্রসীদতু
ক্লীং চর্চ হুং হুং ঝংশা
ওঁলং শ্রীং কপালিকং জং জং
তিষ্টতি মূষিকং চং চং চর্বশং হংসঃ
হুং ফট্ স্বাহা।

মন্তরের চোটে রিদয় হাঁ করলে, যেন খেতে এল, অমনি চট করে হাড়গিলে ধুলোপড়া বেড়ি দিয়ে পেঁচোর মুখবন্ধন করে দিলেন :

ধুল ধুল স্বর্গের ধুল
মর্তের মাটি
লাগ লাগ পেঁচোর দন্ত কপাটি
হাঁ করে নাড়িস তুণ্ড খা পেঁচির মুণ্ড
যাঃ ফুঃ
কার আজ্ঞে হাড়িপ বাবার আজ্ঞে
হাড় মড় মড় হাড়গিলের আজ্ঞে
শিগ্‌গির যাঃ শিগ্‌গির যাঃ।

পেঁচো রিদয়কে ছেড়ে পালাতেই রিদয় ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। চকা রিদয়ের কানে কানে শুধোলে—'গণেশ কি বললেন?'

রিদয় বললে—'তা তো সবটা বুঝলুম না, কেবল আসবার সময় তিনি বললেন—তথাস্তু।'

চকা হেসে বললে—'তবে আর কি, কেল্লা মার দিয়া! আর তোমার ভয় নেই, একদিন সকালে উঠে দেখবে, যে রিদয় সেই রিদয় হয়ে গেছ। চল এখন যুদ্ধং দেহি করা যাক গে।'

এদিকে কেল্লা খালি পেয়ে চুয়োর দল এ ওর পিঠে চড়ে একটা ঘুলঘুলি দিয়ে কেল্লার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটার পর একটা নেংটি ইঁদুরের গড়-ভাণ্ডার সব দখল করে লুঠের চেষ্টায় দলে দলে পিলপিল করে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে তেতলায় চৌতলায় পাঁচতলায় উঠে ছ'তলায় রাজসভায় ঠাকুরবাড়িতে, এমন কি অন্দরমহল পর্যন্ত ঢোকবার যোগাড়, দু'একটা চুয়ো ছাতেও উঠে হাড়গিলের বাসাটা পর্যন্ত প্রায় এগিয়েছে। এমন সময় উত্তর-দক্ষিণ থেকে নেংটি ইঁদুরের দলকে খবর দিয়ে চকার বাকি হাঁসেরা ফিরে এল। ঠিক সেই সময় গণেশের ঢোলকে রিদয় চাঁটি বসালে—ধিক ধিক ধিক ধাঁকুড় ধাঁকুড়।

ঢোলের শব্দে চুয়োর দল লেজ উঁচু করে শিউরে উঠে যে যেখানে ছিল থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, তারপর তালে তালে লেজ দোলাতে দোলাতে দলে দলে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে আরম্ভ করলে। চুয়োতে চুয়োতে কেল্লার প্রকাণ্ড ছাত ভরে গেল, রিদয় চুড়োয় বসে ঢোল বাজাচ্ছে—

চুয়ো, হাততালি দুয়ো
নেংটি ধিং নিগিতি টিং
ধাতিং তিং নাতিং থিং
চুয়ো, হাততালি দুয়ো।

আর সব চুয়ো লেজে লেজে জড়াজড়ি করে নৃত্য করছে, পেঁচা পালক ফাঁপিয়ে, বেড়াল লেজ ফুলিয়ে, হাড়গিলে গলার থলি দুলিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাল দিচ্ছে! সব চুয়ো যখন ছাতে এসে জড়ো হল, তখন রিদয় চকার পিঠে চড়ে ঢোল বাজাতে বাজাতে আকাশে উড়তে আরম্ভ করলে, চুয়োগুলো নাচতে নাচতে লাফাতে থাকল।

আনন্দে তারা মনে করলে যেন সবার ডানা গজিয়েছে, তারা প্রথমে ছাতের পাঁচিল, তারপর ছাতের আলসে, শেষে একেবারে আকাশে ঝম্প দিয়ে ডিগবাজি খেতে খেতে মাটিতে এসে পড়ে জোড়া জোড়া হাঁ করে আকাশের পানে চার পা তুলে চেয়ে রইল।

চুয়োগুলো নাটবাড়ির লীলাখেলা সাঙ্গ করে সরে পড়েছে অনেকক্ষণ। হাড়গিলে, বেড়াল, পেঁচা পর্যন্ত ঢোলের আওয়াজে এমনই মশগুল হয়ে গেছে যে পায়ে পায়ে কখন সবাই একেবারে ছাতের প্রায় কিনারায় এসে পড়েছে টেরই পায়নি, হঠাৎ রাত একটার ঘণ্টা পড়ল অমনই রিদয় ঢোল বন্ধ করলে, সবাই চটকা ভেঙে দেখলে কেল্লা খালি, আকাশে অমাবস্যার চাঁদ দেখা দিয়েছে, চুয়ো আর একটাও নেই। রিদয়কে নিয়ে চকা উড়ে চলেছে। হাড়গিলে, পেঁচা চটকা ভেঙেই দেখলে বেড়াল আলসে থেকে আকাশে একটা পা বাড়িয়ে চুয়োদের মতো ঝাঁপ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে আর কি! হাড়গিলে তার লেজ ধরে একটান দিয়ে বললে—'কর কী, পড়ে মরবে যে!'

বেড়াল ফ্যাল ফ্যাল করে খানিক চেয়ে থেকে—'ইকি'—বলেই ফ্যাঁচ করে হেঁচে আস্তে আস্তে পেছিয়ে এল।

ওদিকে নেংটির দল আস্তে আস্তে কেল্লায় এসে যে যার ঘরে ঢুকে ধান ভানতে বসে গেল। চুয়ো তাড়াবার জন্যে হেড়ম্ব-গণেশের ঢোলককে ছাড়া আর কাউকে যে ধন্যবাদ দেওয়া দরকার সেটা তাদের মনেই এল না!

রাতের মধ্যে পেঁচার দল প্রায় বার আনা মরা চুয়ো খেয়ে সাফ করে দিলে, বাকি যা রইল সেগুলোর উপরে সকালবেলায় কাক চিল এসে পড়ল। বেলা আটটার মধ্যে সব সাঙ্গ হয়ে গেল।

আজ অমাবস্যা তিথি, রাত্তিরটা হিমালয়ের এপারটায় কাটিয়ে কাল থেকে হাঁসেরা পাহাড়ের ওপারে নিজের নিজের দিকে রওনা হবে, দেশের কথা ছাড়া আর কারুর মুখে অন্য কথা নেই। আকাশে মেঘ করেছে, বিষ্টি নেই। কেবল ঠাণ্ডা হাওয়া আর শীতালু বাতাস। মাথার উপর দিয়ে দলে দলে পাখি হু হু করে উত্তরমুখো চলেছে—সবাই দেশে যেতে ব্যস্ত, তার ওপর এ বছর পাখিদের বারোয়ারি পড়েছে। কুঁচে বক কুঁচি বক তারা বারোয়ারির নেমন্তন্ন করতে বেরিয়েছে, যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে চেঁচিয়ে জানাচ্ছে পুন্নিমার দিনে বারোয়ারিতে যেতে হবে, ভারী জলসা।

চকা নিমন্ত্রণ পেয়ে ভারি খুশি, রিদয়কে বললে—'তোমাদের দু'জনের কপাল ভাল, বার বছর অন্তর কৈলাস পর্বতের ধারে মানস সরোবরে এই বারোয়ারির মজলিস হয়, সেখানে সারসের নাচ, হরিণ-দৌড়, আর্গিন পাখির কনসার্ট, গাঙ শালিকের গীত, ছুঁচোর কেত্তন, শেয়ালের যুক্তি, মেড়ার লড়াই, ভালুকনাচ, সাপবাজি, মাছের চান, এমনই আরও কত কি হবে তার ঠিকানা নেই! ব্রহ্মার হাঁস কর্মকতা, স্বয়ং পশুপতি হবেন সভাপতি, পৃথিবীর পশুপক্ষী সেখানে হাজির হবে। মানুষের কপালে এমন আশ্চর্য কারখানা দেখা এ পর্যন্ত ঘটেনি, কোথায় লাগে তোমাদের হরিদ্বারের কুম্ভমেলা! আর পাহাড়ের ও ধারে আমাদের দেশটা কি চমৎকার তোমায় কি বলব, পালতি জলা—যেটা ব্রহ্মার হাঁস আর পৃথিবীর জলচর পাখি, কি পোষা কি বুনো সবাইকার আড্ডা, সেটা যে কত বড় তা কেউ জানে না, উত্তরের সমস্ত নদী সমস্ত পাহাড় এসে সেইখানেই শেষ হয়ে আবার সব নতুন নতুন নাম নিয়ে দক্ষিণ দিকে নেমে এসেছে! এই পালতির উত্তর গায়ে ঢোলা পর্বত, সেই ঢোলা পর্বতের ওপারে পাঁচিলে ঘেরা চীন মুল্লুক, তারও ওধারে বরফের দেশের ধারে 'তন্দ্রা' বলে একটা দেশ। বছরে প্রায় দশমাস সেখানে বরফের চাদর মুড়ি দিয়ে ফুলপাতা নদনদী সবাই ঘুমিয়ে থাকে, কেবল বসন্তের মাস দুই সেখানে সূর্য দেখা দেন, আর অমনি সারাদেশ ফুলেফলে পাতায় ঘাসে দেখতে দেখতে সবুজ হয়ে ওঠে, আর আমরা সব পাখিরা মিলে সেখানে গিয়ে বাসা বেঁধে ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফুটিয়ে চলে আসি। বসন্তের শেষে পালতি জলায় বাচ্চারা বড় হবার জন্যে আপনারাই উড়ে আসে, আমরা সারাবছর দেশে-বিদেশে ঘুরে আবার বছরের এই সময়টিতে গিয়ে দেখি আমাদের ছেলেপিলেরা কেউ বড় হয়েছে, কেউ বড় হয়ে নিজের পথ দেখে নিতে বিদেশে চলেছে, কোনও কোনও বাচ্চা বা মরে গেছে, কেউ কেউ বা এরই মধ্যে বিয়ে থাওয়া করে ঘরকন্না পাতবার চেষ্টায় আছে, কোনও বাচ্চা বা সন্ন্যাসী হয়ে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে গেছে, কাউকে ধরে মানুষে খেয়ে ফেলেছে, কাউকে মানুষে গুলি করে মেরে ফেলেছে, আর কাউকে বা তারা জেলখানার মতো খাঁচায় ভরেছে, আর কাউকে বা ডানা কেটে পোষ মানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। বছরের এই সময়টিতে আমরা একবার করে নিজেদের জন্মস্থানে আর পুরানো বাসায় ফিরে আসতে পাই, নিজের ছেলেমেয়ের দেখা পাই, সুখদুঃখের দু'টো কথা কয়ে নিই, তারপর আবার চলি এ দেশ সে দেশ করে।'

রিদয় বলে উঠল—'আমারও তো দেশ আছে কিন্তু আমার তো সেখানে ফিরতে একটুও ইচ্ছে হয় না।'

চকা বললে—'সে কি! তোমার বাপ-মা কেউ নেই নাকি? যখন বড় হবে, বউ হবে সংসার হবে, ছেলেপুলে নাতিপুতি হবে তখন বুঝবে সারা বছরের পরে দেশে ফিরতে কি আনন্দ। তখন দেশের ডাক যখন এসে পৌঁছবে দেখবে মন অমনই উধাও হয়ে ছুটেছে আর কিছুতে মন বসছে না, প্রাণ নীল আকাশে প্রজাপতির মতো সোনার পাখনা মেলে দিয়ে উড়ে পড়তে চাচ্ছে, তখন দেশের কথাই কইতে থাকবে। এর সঙ্গে তার সঙ্গে, দিন নেই রাত নেই কি সকাল কি সন্ধ্যে কেবল বঁধুর মুখ মধুর হাসিই মনে জাগবে তখন।'

চকার কথা শুনতে শুনতে রিদয় কেমন আনমনা হয়ে গেল। সারাদিন ধরে আজ তার কেবলই মনে পড়তে লাগল—আমতলির সেই ঘর ক'খানি, সেই তেঁতুলতলার ঘাট, তেপান্তর মাঠ, হাঁসপুকুরের কাদাজল, তাতে শালুক ফুল, বাড়ির ধারে ঝুমকো লতার মাচা তার উপরে দুগ্‌গা টুনটুনি পাখিটি, উঠোনের কোণে তুলসীমঞ্চটি, কালো মাটিলেপা ঘরের দেওয়াল তার উপরে মায়ের হাতে লেখা লক্ষ্মীপুজোর আলপনা, দড়ির আলনায় বাপের কোঁচানো চাদর, পুরনো শোবার তক্তো তার উপরে শীতলপাটি আর লাল ঝালর দেওয়া তালপাতার পাখাখানি। সব আজ পরিষ্কার যেন রিদয় চোখে দেখতে লাগল, আর থেকে থেকে মন তার ঘরে যেতে আকুলি বিকুলি করতে থাকল—সকাল কেটে দুপুর হয়েছে, তখনও রিদয় আকাশের দিকে চেয়ে ঘরের কথা ভাবছে—দলে দলে কত পাখির ঝাঁক দেশমুখে চলে গেল—'চল চল চলরে চল' বলতে বলতে। নাটবাড়ির জলায় যত পাখি—

কাদাখোঁচা জলপীপী কামি কোড়া কঙ্ক
পালতির কুঁচবেক আর মৎস্য বঙ্ক।
ডাহুকা ডাহুকি আর খঞ্জনী খঞ্জন
সারস সারসী যত বক বকীগণ।
তিত্তিরী তিত্তিরা পানিকাক পানিকাকি
কুরবী কুরল চক্রবাক চক্রবাকি।

সবাই দলে দলে দেশমুখে উড়ে পড়ছে! রিদয় দেখলে মাথার উপর দিয়ে কত পাখির ঝাঁক দেশ-বিদেশ থেকে, কেউ বন ছেড়ে, কেউ খাঁচা ভেঙে হু হু করে দেশে চলেছে—

ময়না শালিকা টিয়া তোতা কাকাতুয়া
চাতক চকোর নুরী তুরী রাঙ্গচুয়া।
ময়ূর ময়ূরী সারিশুক আদি খগ
কোকিল কোকিলা আদি মরাল বিহগ।
সীকরী বহরী বাসা বাজ তুরমুতী
কাহা-কুহি লগড় ঝগড় জোড়া ধুতি।
শকুনি গৃধিনী হাড়গিলা মেটেচিল
শঙ্খচিল নীলকণ্ঠ শ্বেত রক্ত নীল।
ঠেঁটি ভেটি ভাটা হরিতাল গুড়-গুড়—
বাকচা হারিত পারাবৎ পাকরাল
হাতারিয়া করকটে ফিঙ্গা দহিয়াল।

চড়ুই মুনিয়া পাবদুয়া টুনটুনি বুলবুল ফুলঝুটি ভিংরাজ রঙে রঙে সবুজে-লালে সোনালিতে-রুপালিতে আকাশ রাঙিয়ে চলেছে যে যার দেশে বাতাসে ডানা ছড়িয়ে। রিদয় কেবলই বসে বসে দেখতে লাগল আর মনে মনে বলতে লাগল—'যদি ডানা পেতুম!'

পাখিদের দেখাদেখি ভীমরুল ডাঁশ মশা দলে দলে উড়তে আরম্ভ করেছে, চকার দলের হাঁসেরা আর থির থাকতে পারছে না, এখনও সারারাত এখানে কাটাতে হবে ভেবে তারা কেবলই উসুখুসু করছে আর ডানা ঝাড়া দিচ্ছে!

চকা একবার রিদয়ের কানের কাছে বলে গেল, যা কিছু নেবার সঙ্গে, এইবেলা বেঁধেছেঁদে রাখ, কাল ভোরেই রওনা হতে হবে। রিদয়ের দেশের জন্যে মনটা আনচান করছে কিন্তু বেড়াবার শখ এখনও মেটেনি। সে পথের মাঝে নিজের আর খোঁড়ার জন্যে গোটাকতক গুগলি টোপাপানা এটা ওটা সেটা নিয়ে উলুখড়ের একটি গেজে বুনতে বসে গেল।

থলেটা তৈরি হতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এল। হাঁসেরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে চোখ বুজে রাতটা কোনওরকমে কাটিয়ে দেবার যোগাড় করছে এমন সময় চকা এসে রিদয়কে শুধালে—'খোঁড়াকে দেখেছ কি? তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

রিদয় তাড়াতাড়ি থলে ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—'সে কি, গেল কোথায়, শেয়ালে নিলে না তো?'

চকা শুকনো মুখে বললে—'এই তো এখানে একটু আগেই ছিল, হঠাৎ গেল কোথা!'

রিদয় বিষম ভয় পেয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। একে সন্ধ্যা হয়ে গেল, যেখানে পাখির ডাক শোনে সেইদিকেই রিদয় ছুটে যায়, ঝোপঝাড় নেড়ে দেখে, নাম ধরে ডাক দেয়, এমনই সারারাত রিদয় ছুটোছুটি করতে লাগল অন্ধকারে জল কাদা ভেঙে! নাটবাড়ির উঠোনটা পর্যন্ত রিদয় খুঁজে এল, কিন্তু সুবচনীর খোঁড়া হাঁস কোথাও নেই!

এ দিকে সকাল হয়ে এল, চকা বললে—'সে নিশ্চয়ই অন্য দলে মিশে এগিয়ে গেছে, আর মিছে খোঁজা, চল আমরা বেরিয়ে পড়ি, সময় উতরে যাচ্ছে!'

রিদয় ঘাড় নেড়ে বললে—'তাকে না নিয়ে আমি এখান থেকে নড়ছিনে, তোমরা যেতে চাও যাও।'

চকা মুশকিলে পড়ল! রিদয় নড়তে চায় না, এ দিকে সব হাঁসেরই দেশে যাবার টান রয়েছে, তবু খোঁড়ার জন্যে চকা আরও এক ঘণ্টা দেরি করলে, তাতেও যখন খোঁড়ার সন্ধান পাওয়া গেল না তখন তারা রিদয়কে একলা রেখে চট করে দেশ থেকে ঘুরে আসবার জন্যে উত্তরমুখে উড়ে পড়ল—আসি আসি বলতে বলতে।

চকার দল চলে যেতে রিদয়ের চারদিক যেন শূন্যবোধ হতে লাগল! সে আস্তে আস্তে নাটবাড়ির ভাঙা পাঁচিলটা আর একবার সন্ধান করতে চলেছে, এমন সময় দূর থেকে দেখলে খোঁড়া কিরাশকলমির ডাঁটা মুখে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে পাঁচিলের গায়ে একরাশ ভাঙাচোরা পাথরের মধ্যে গিয়ে সেঁধোলে। এমনই খোঁড়াকে শেওলাগুলি নিয়ে সেখানটায় আনাগোনা করতে দেখে রিদয় লুকিয়ে লুকিয়ে পাঁচিলে উঠে দেখলে—জড়োকরা পাথরের মধ্যে চমৎকার ছাই রঙের একটি বালিহাঁস শুয়ে আছে, খোঁড়া তার মুখে খাবার তুলে তুলে দিচ্ছে আর দু'জনে কথা হচ্ছে—'আজ কেমন আছ? তেমনই? ডানার ব্যথাটা যায়নি?'

'না, এখনও নাড়তে গেলে বুকটায় বেদনা করে।'

'মানুষগুলো কি নিষ্ঠুর! ভাগ্যি গুলিটা বুকে লাগেনি।'

'লাগলে আর কি হত, না হয় মরে যেতুম!'

'ছি ছি অমন কথা বোলো না, আমার ভারি দুঃখ হয়।'

'আমি তোমার কে যে আমার জন্যে দুঃখু হবে; আজ এই দেখাশোনা এত ভাব এত যত্ন, কাল হয়তো তুমি চলে যাবে, দু'দিন পরে মনেও থাকবে না, কে বালি কোথাকার বালি!'

খোঁড়া ঘাড় নেড়ে বললে—'অমন কথা বোলো না, যতদিন বাঁচব তোমায় ভুলব না, জলার মধ্যে এই দিনটি মনে থাকবে!'

বালিহাঁস একটু ঘাড় হেলিয়ে খোঁড়ার গা ঘেঁষে বললে—'আমি দলছাড়া হয়ে পড়লুম, কতদিনে সারব তার ঠিক নেই!'

খোঁড়া বুক ফুলিয়ে বললে—'ভয় কি আমি তোমার কাছে রইলুম, এখন একটু ঘুমোও আমি একবার ঘুরে আসি।'

খোঁড়া চলে গেলে রিদয় আস্তে আস্তে গর্তর মধ্যে ঢুকে দেখলে এমন সুন্দরী হাঁস সে কোনওদিন দেখেনি, এতটুকু তার মুখটি, পালকগুলি নরম যেন তুলো, সাটিনের মতো ঝকঝক করছে, চোখ দু'টিও কাজলটানা যেন ঢলঢল করছে। রিদয়কে হঠাৎ দেখে বালিহাঁস ভয় পেয়ে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু বেচারার ডানায় বেদনা, উড়তে পারে না, বালি চআঁ করে কাঁদতে লাগল।

রিদয় তাড়াতাড়ি বললে—'আমি হংপাল হাঁসেদের বন্ধু, খোঁড়া হাঁসের সেঙাত, আমায় দেখে ভয় কি?'

বালিহাঁস রিদয়ের কথায় সাহস পেয়ে ঘাড়টি একটু নিচু করে বললে—'তাঁর মুখে আপনার নাম শুনেছি, আপনি অতি মহাশয় লোক।' এমনই ভাবে এই কথাগুলি বালি বললে যে রিদয়ের মনে হল কোনও রাজকন্যে যেন তার সঙ্গে আলাপ করছেন!

রিদয় বললে—'দেখি, আপনার কোথায় হাড়টা ভেঙেছে সোজা করে দিই।' আস্তে আস্তে বালিহাঁসের ডানার

তলায় হাত দিয়ে রিদয় মচকানো হাড়টা ধরে খুট করে যেমন সরিয়ে দেওয়া, অমনই বালিহাঁসটি 'মাগো!' বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

রিদয় কখনও ডাক্তারি করেনি, পাখিটা মরে গেল ভেবে সে তাড়াতাড়ি পাছে খোঁড়া এসে দেখে, সেই ভয়ে লম্ফ দিয়ে চোঁচা চম্পট। খোঁড়া বেশি দূর যায়নি, দু'ঢোক জল খেয়েই ফিরে আসছে, পথের মধ্যে রিদয়ের সঙ্গে দেখা! রিদয় তাড়াতাড়ি খোঁড়াকে বললে—'কোথায় ছিলে সবাই যে চলে গেল, সারারাত তোমাকে খোঁজাখুঁজি করেছি, চল আর দেরি নয়, এই বেলা গিয়ে তাদের ধরি, বেশিদূরে এখনও যায়নি!'

খোঁড়া আমতা আমতা করে বললে—'রোসো, এখনই যেতে হবে? এত শিগ্‌গির কি না গেলেই নয়?'

রিদয়ের ভয় হল পাছে খোঁড়া গিয়ে দেখে বালিহাঁস মরে গেছে। সে তাড়াতাড়ি খোঁড়ার পিঠে চেপে তাকে ওড়াবার চেষ্টা করতে লাগল।

খোঁড়া ঘাড় নেড়ে বললে—'দেখ ভাই আমার এক বন্ধু বড় বিপদে পড়েছে, তাকে একলা ছেড়ে যাওয়া তো হতে পারে না, বেচারার ডানাটি জখম হয়েছে নাড়তে পারে না, আমি গেলে তাকে কে-বা খাওয়ায় আর কে-ই বা যত্ন করে!'

রিদয়ের ইচ্ছে হাঁস সে দিকে না যায়, সে কেবলই তাকে ফেরাতে চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু খোঁড়ার মন পড়ে আছে সেই রূপকথার রাজকন্যের মত সুন্দরী বালিহাঁসের দিকে, সে রিদয়কে নিয়ে একবার উত্তরমুখে উড়ল, কিন্তু খানিক পথ গিয়েই বললে—'ভাই বড় মনকেমন করছে, মানস সরোবরের এই নাটবাড়ির চালায় দু'চারদিন কাটিয়ে চল বাড়িমুখো হওয়া যাক, দেশে যাবার জন্যে মন টেনেছে আর ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগছে না।'

রিদয়ের মনটা সকাল থেকে দেশের দিকে টানছিল, সে কোনও কথা কইলে না। খোঁড়া হাঁস আস্তে আস্তে উড়ে এসে আবার নাটবাড়ির ধারে নামল ঠিক বেছে বেছে সেইখানটিতে, যেখানে তার বালিহাঁস রয়েছে। খোঁড়া রিদয়কে পিঠ থেকে নামিয়ে গলা উঁচু করে দু'বার ডাক দিলে—'বালি, ও বালি!' কোনও উত্তর এল না, তারপরে ছুটে গিয়ে দেখলে পাথরের মধ্যে শুকনো ঘাসপাতা বিছানো তাদের দু'দিনের বাসাটি খালি হা হা করছে, কেউ কোথাও নেই। রিদয় চুপ করে রইল, ভাঙা গলায় খোঁড়া হাঁস আবার ডাক দিলে—'বালি, কোথায় বালি!'

রিদয় ভাবছে নিশ্চয় শেয়াল এসে মরা হাঁসটা টেনে নিয়ে গেছে, ঠিক সেই সময় জলার ধারে বেনাবনের সবুজ পাতাগুলো নড়ে উঠল, তারপরেই মিঠে সুরে—'এই যে আমি, একটু গা ধুয়ে নিচ্ছি' বলে বালি আস্তে আস্তে জলা থেকে উঠে এল! তার ঝকঝকে পালকে শিশিরের মতো জলের ফোঁটাগুলি আলো পেয়ে হীরের মতো ঝকঝক করছে, রিদয়ের মনে হল যেন জলদেবী জল থেকে উঠে এলেন।

খোঁড়া হেলতে দুলতে বালির কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে তার গলা চুলকে দিয়ে বললে—'বেদনা আছে কি?' বালি ঘাড় নেড়ে বললে—'একটুও না, তোমার বন্ধুর কৃপায় আর তোমার যত্নে আমি ভাল হয়ে গেছি।' তারপর দু'জনে জলে গিয়ে সাঁতার আরম্ভ করলে, রিদয় জলের ধারে বসে একটা বেনার শীষ চিবোতে থাকল।

বালিহাঁসকে সঙ্গে নিয়ে খোঁড়া এর মধ্যে একদিন চুপিচুপি পদ্মবনে পদ্মফুলের সোনালি রেণু এ ওর গায়ে চড়িয়ে দিয়ে নিজেরাই নিজেদের গায়ে হলুদ মেখে, মাছরাঙা পাখিদের বউভাতে মাছ খাইয়ে, বিয়ে-থাওয়া খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে জলার ধারে বাসা বাঁধবার যোগাড়ে আছে, দেশে ফেরার কিম্বা বিদেশে উড়ে চলার আর নামটি করে না। রিদয় শুধোলে বলে—'আমরা দু'টিতে যেখানে থাকি সেইখানেই আমাদের দেশ।'

রিদয় বলে—'আমার তো দেশ আছে, আমাকে তো সেখানে যেতে হবে, বিয়ে-থাওয়াও করতে হবে। এই জলার মধ্যে না পাওয়া যায় ভাল খাবার, না আছে ভাল শোবার জায়গা, এখানে বাসা বাঁধলে তো আমার চলবে না।'

বালিহাঁস বললে—'তা বেশ তো, এই জলার ওপারেই একটা গয়লাপাড়া আছে, চলুন আপনাকে তাদের গোয়ালে রেখে আসি। একটি বুড়ি গাই তাদের আছে একছটাক করে দুধ দেয়, দুধ ভাত সবই সেখানে পাবেন।'

রিদয় শুধোলে—'আর তোমরা?'

বালিহাঁস লজ্জায় মুখটি নিচু করে রইল। খোঁড়া চুপিচুপি রিদয়ের কানে বললে—'ভাই, ওর ডিম পাড়বার সময় হয়েছে, দু'টো মাস অপেক্ষা কর, তারপরে সবাই একসঙ্গে বাড়ি ফেরা যাবে, এই ক'টা দিন তুমি কোনও রকমে গৌহাটিতে কাটাও।'

হাঁসের বাচ্চা হবে শুনে রিদয় ভারি খুশি, সে একখানা শালপাতার নৌকোতে ভর দিয়ে গয়লাপাড়ার ঘাটে

গিয়ে উঠল। গয়লাপাড়া নামেই পাড়া, একঘর বই গয়লা নেই, তাও আবার গয়লাবুড়ো অনেককাল হল মরেছে, আছে কেবল এক বুড়ি গাই আর আর বুড়ি গয়লানি!

গয়লাবাড়ির উঠোনে ঢুকে রিদয় এদিক ওদিক চাইতে লাগল, ঘুটঘুটে আঁধার রাতটা, বাড়ির কোথাও একটি আলো নেই, কোনদিকে গোয়াল কোনদিকে ঢেঁকিশাল কোথায় বা হেঁসেল কিছুই দেখবার যো নেই, একটা কেবল বেলগাছ ভূতের মতো এঁকেবেঁকে টেরাবাঁকা মোচড়ানো দোমড়ানো শুকনো ডাল নিয়ে উঠোনের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার উপরে বসে একটা কালোপেঁচা কেবলই চেঁচাচ্ছে—'যো-মেঁ-র বাড়ি যাঃ, মাথা খাঃ!'

ঝড় উঠল, তার সঙ্গে টিপটিপ বৃষ্টি নামল, আরও দুটি পথিক নেউল আর খটাস তাড়াতাড়ি উঠোনে ঢুকে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে রিদয়কে দেখে শুধোলে—'এটা কি গৌহাটির চটি, রাতে থাকবার ঘর পাওয়া যাবে কি এখানে?'

রিদয় বললে—'আমি তো গয়লাবাড়ি বলে এখানে ঢুকেছি, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখছিনে। এটা গোয়াল কি চটি কি ধর্মশালা বা পাঠশালা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, কারু সাড়াশব্দ পাচ্ছিনে, কেবল একটা পেঁচা ডাকছিল একটু আগেই শুনেছি।'

খটাস বললে—'তবে নিশ্চয় এটা গঙ্গাযাত্রীর ঘর!'

নেউল বলে উঠল—'মাঠের মধ্যে কখনও মড়া পোড়ার ঘাট হয়? বাড়িই বটে, তবে এটা কলুর বাড়ি কি গয়লাবাড়ি কিম্বা পুলিসের খাদাবাড়ি তা বোঝা যাচ্ছে না!'

খটাস বললে—'সেটা বোঝবার সহজ উপায় আছে।'

রিদয় শুধোলে—'কোনও বাড়ি সহজে চিনবার উপায় কি প্রকাশ কর!'

খটাস খানিক ভেবে বললে—'মানুষেরা নানাকাজের জন্যে নানারকম বাড়িঘর বাঁধে তা তো জান—উত্তরমুখো, দক্ষিণমুখো, পুবমুখো, পশ্চিমমুখো। গয়লা বাঁধবে এক রকম, তেলি বাঁধবে অন্যরকম, মালি বাঁধবে একরকম, কুমোর বাঁধবে একরকম। আর্ট বোঝ না? কে কি রকম বাঁধবে তার হিসাবটা জানলেই কোনটা কি বাড়ি বোঝা যাবে।'

নেউল বললে—'হিসেবটা কেমন শুনি?'

'শোনো তবে, প্রথমে মালির বাড়ি কেমন তা বলি শোনো,' বলে খটাস খনার বচন আরম্ভ করলে :

চৌদিকে প্রাচীর উচা কাছে নাই গলি কুচা
পুষ্প বনে ঢাকে রবি শশী
নানা জাতি ফোটে ফুল উড়ি বৈসে অলি কুল
কোকিল কুহুরে দিবা নিশি।
মন্দ মন্দ সমীরণ বহে সেথা অনুক্ষণ
বসন্ত না ছাড়ে এক তিল!

রিদয় বলে উঠল—'এখানে তো ফুলের গন্ধ মোটেই পাচ্ছিনে! তবে এটা মালির ঘর নয়।'

'আচ্ছা, গন্ধে গন্ধে বোঝ এটা তেলির বাড়ি কিনা,' বলেই খটাস আবার শুরু করলে :

সরষের ঝাঁঝে তেলি হাঁচে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ
বলদেতে ঘানি টানে ঘোঁচ ঘ্যোঁচ ভ্যোঁচ।

নেউল বাতাসে নাক উঁচিয়ে বললে—'কই হাঁচি তো পাচ্ছে না! তবে এটা তেলির বাড়ি নয়, মালির বাড়িও নয়।'

'কুমোরের বাড়ি কিনা দেখ তো,' বলে খটাস শোলক আওড়ালে :

হাঁড়ি পাতিল ঠুকুর ঠাকুর কলসীর কাঁধা
পাতখোলার সোঁদা গন্ধ কুমোর বাড়ি বাঁধা।

রিদয় এদিক ওদিক নাক ঘুরিয়ে বললে—'নাঃ, কোনও গন্ধই পাচ্ছিনে!''

''আচ্ছা দেখ দেখি গয়লাবাড়ি কিনা' :

গোয়াল ঘরে দিচ্ছে হামা নেহাল বাছুর
ঘোল মউনি বলছে ঘরে গাবুর গুবুর

ভাল দুধ টোকো দই দিচ্ছে সেথা বাস
মোষ দিচ্ছে নাক ঝাড়া গরু চিবায় ঘাস!

রিদয় পুবদিকে নাক তুলে বললে—'এসব কিছুই নেই এখানে।'

নেউল পশ্চিম দিকে শুঁকে শুঁকে বললে—'যেন ভিজে ঘাসের গন্ধ পাচ্ছি!'

খটাস উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম চারদিকে কান পেতে নাক ঘুরিয়ে বললে—'এটা গয়লাবাড়ি বটে, কিন্তু তেমন গোঁড়া গয়লা নয়, শব্দ আর গন্ধগুলো কেমন ফিকে ফিকে ঠেকছে, বিচিলি আছে, ঘাসও কিছু আছে, গরুও একটা যেন আছে বোধ হচ্ছে।'

ঠিক সেই সময় বুদি গাই "ওমঃ" বলে একবার ডাক দিলে! তিন পথিক তাড়াতাড়ি সেই দিকে গিয়ে দেখলে কতকালের পুরানো চালাখানা তার ঠিক নেই, বিষ্টির জলে মাটির দেওয়াল গলে গিয়ে বুড়ো মানুষের পাঁজরের হাড়গুলোর মতো ভিতরের চাঁচ আর খোঁটাখুঁটি বেরিয়ে পড়েছে, দরজার একটা ঝাঁপ খুলে মাটিতে শুয়ে পড়েছে, আর একটা পচা দড়ি ধরে পড় পড় হয়ে এখনও ঝুলে রয়েছে। চালের খড় এখানে ওখানে উড়ে গিয়ে ভিতর থেকে ঘুণধরা বাঁশের আড়া দু'চারটে ফোগলা দাঁতের মতো দেখা যাচ্ছে!

তিন পথিকের পায়ের শব্দ পেয়ে গোয়ালের মধ্যে থেকে বুদি ভাবলে গয়লাবুড়ি তার জাব নিয়ে এল—সে দরজা থেকে মুখটা বাড়িয়ে এদিক ওদিক দেখে বললে—'মাগোঃ মাঃ, রাত হল আজ কি খেতে দিবিনে!'

খটাস, রিদয় আর নেউল বুদির কথার উত্তর দিলে—'তিন পথিক মোরা, রাতের মত জায়গা মিলবে কি?'

বুদি মাথা হেলিয়ে কেবলই শুধাতে লাগল—'কেগাঃ কে?'

রিদয় বললে—'আমি আমতলির তাঁতির পুত্তুর শাপভ্রষ্ট বুড়ো আংলা দেশভ্রমণে বেরিয়েছি।'

বুদি নেউলের দিকে শিং হেলিয়ে বললে—'ইনি?'

'নেউল পুত্তুর, ইনিও বেরিয়েছেন মৃগয়া করতে।'

খটাসের দিকে চোখ ফিরিয়ে বুদি রিদয়কে শুধালে—'আর ইনি কে?'

'ইনি হচ্ছেন খটাসের পুত্তুর, দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন।'

বুদি গোয়ালের দুয়োর ছেড়ে একপাশ হল, তিন বন্ধুতে বাদলার রাতে গোয়ালে আশ্রয় নিয়ে রাত কাটাবার যোগাড় করতে চলেছেন, বুদি গাই লেজ নেড়ে বললে—'আর জন্মে কত তপিস্যি করেছি, তাই কাঙালিনীর ঘরে রাজপুত্তুর, পাত্তরের পুত্তুর আর কোটালের পুত্তুরের পা পড়ল।' রিদয় খুশি হয়ে বুদির ঘাড়টা একটু চুলকে দিলে, তারপর খড়ের গাদায় শুয়ে তিন বন্ধুতে চোখ বুজলে।

এ দিকে বুদি গাই সারাদিন জাব পায়নি, সে পেটের জ্বালায় কেবলই উসখুস করছে—'ওমঃ মাগোঃ, কোথায় গেলে আজ কি আর খাব না? ও ভাই রাজপুত্তুর মাচানের উপর থেকে এক বোঝা খড় নামিয়ে দিতে পার, বড় খিদে লেগেছে!'

রিদয় দেখলে চালের বাতায় মস্ত এক বোঝা খড় চাপানো রয়েছে বটে, কিন্তু সেটা টেনে নামানো রিদয়ের সাধ্যি নয়, একটা আঁটি কোনওরকমে টেনে রিদয় বুদির মুখের কাছে ধরে দিলে। গাই খড়গুলো মুখে নিয়ে জাবর কাটতে লাগল।

রিদয়ের একটু তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় বুদি আবার বলে উঠল—'ওমা গো, ভাই পাত্তরের পুত্তুর একটুখানি জল এনে দিতে পার?'

নেউল ঘুমের ঘোরে বললে—'এত রাতে জল পাই কোথা!'

বুদি বিনয় করে বললে—'বাইরেই বৃষ্টির জল জমা হয়েছে, উঃ বড় তেষ্টা, আমার গলার দড়িটা যদি খুলে দাও তো ওখানে গিয়ে একটু জল খেয়ে বাঁচি!'

নেউল বুদির গলার দড়িটা দাঁতে কেটে দিয়ে বললে—'যাও তবে!'

বুদি দু'পা গিয়ে বললে—'ইস ভারি অন্ধকার, ভাই কোটালের পুত্তুর!'

খটাস আধবোজা চোখ মেলে বললে—'কি?'

বুদি একে রাতকানা তাতে আবার কানে কালা হয়েছে, খটাস কি বললে—শুনতেই পেলে না। আবার ডাকলে—'ও ভাই কোটালের পুত্তুর আমি রাতকানা, যদি গলার দড়িটি ধরে একটুখানি এগিয়ে দিয়ে এসো তো ভাল হয়!'

'ভাল বিপদেই পড়া গেল,' বলে খটাস দড়িটা ধরে বুদি গাইকে উঠানের মাঝে টেনে নিয়ে অন্ধকারে দাঁড় করিয়ে সরে পড়ল!

রাত তখন বারটা, খড়ের গাদায় তিন বন্ধুতে আরামে নিদ্রা যাচ্ছে, এমন সময় বুদি গাই এসে সবার কানে কানে বললে—'বড় বিপদ, বুড়িটা মরে গেছে!'

রিদয় তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বললে—'সে কি! মরল কেমন করে?'

বুদি নিশ্বেস ফেলে বললে—'দুঃখের কথা কইব কি, এই সন্ধ্যেবেলা সে আমার গলাটি ধরে বলে গেল—'বুদি শুনেছিস এই নাটবাড়ির জলায় রাজা এবার ধান বোনবার হুকুম দিয়েছেন, এতকালে জমি সব আবাদ হবে; আমাদেরও দুঃখু ঘুচবে।' আমি বললেম,—'মা, তোমার আর দুঃখু ঘুচবে কি, তোমার ছেলেপুলে ক'টাই বিদেশে গিয়ে সংসার ফেঁদে কাজ কারবার করতে বসে গেল, বুড়ি মাকে তো তারা একটিবার মনেও করলে না!' মা বললে—'বুদি লো বুদি, তাদের দুষিসনে, ঘরের ভাত পেলে কি তারা আমাকে একলা ফেলে বিদেশে যায়, না পরের চাকরি করে? এইবার তাদের চিঠি দেব দেখিস কেমন না তারা আসে। আমার মরবার সময় সব ছেলেরা এসে আমায় ঘিরে দাঁড়াবে আর আমি ডঙ্কা মেরে স্বর্গে চলে যাব এই সাধটি আমার কি পূর্ণ হবে বুদি!' এই বলে মাঁ ঘরের মধ্যে চিঠি লিখতে গেল, গোয়ালঘরে আর জাবও দিতে এল না, পিদুমও জ্বাললে না! সন্ধ্যেবেলা মাকে যেন কেমন কেমন দেখনু, তাই বলি একবার যাই দেখে আসি। ওমা, ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি যেখানকার যেটি সব তেমনই গোছানো রয়েছে—পিদুমটি জ্বলছে বিছানা পাতা রয়েছে কিন্তু মা আমার চিঠিটুকু হাতে নিয়ে আলুথালু হয়ে দরজার ধারে পড়ে রয়েছেন, ছেলেরা আসবে ছেলেরা আসবে করেই বুড়ি মলো গো!

'আহা! এই গয়লা বোয়ের দশা কি এমন ছিল। এই বাড়িতে দেখেছি ছেলেমেয়ে চাকর-বাকর গিসগিস করছে—ওই নাটবাড়ির সমস্ত জলাটা ওদের জমিতে পড়েছে, আজ এখনও কত জমি যে বেখবর পড়ে আছে তার ঠিক নেই। কর্তা যতদিন ছিলেন যেমন বোলবোলা তেমনই লক্ষ্মীর ছিরি, আহা, ওই গয়লা বউ তখন দু'বেলা সেজেগুজে পাঁচজন গয়লানি সঙ্গে গাই দোহাতে আসত, নূপুরের শব্দ শুনলে গাই-গরু সব চারদিক থেকে হামা দিয়ে ছুটে আসত গো। এমন লক্ষ্মী বউ কচিকাচা নিয়ে বিধবা হল গো। তখন এক একদিন সে আমার গলা ধরে কানতো আর বলত—'বুদি, আর পারিনে যন্ত্রণা সইতে!' আমি বলি, 'মা, এই শরীর তোমার, একা সবদিক দেখা কি তোমার কর্ম, দু'চারটে দাসদাসী নায়েব গোমস্তা বেশি রাখলে হয় না?' কিন্তু সে বড় কর্মিষ্টি, নিজের হাতে ছেলে মানুষ ধান বোনা রান্নাকরা গাইদোয়া সব করবে! আমি বলি—'মা, শরীর যে ক্ষেয় হল!' কিন্তু বউ কেবলই বলে—'ভাল দিন আসছে বুদি আসছে!' আর ভাল দিন! ছেলেগুলো বড় হয়ে চাকরির চেষ্টায় বিভুঁয়ে বিদেশে টো টো করে ঘুরতে লাগল, কেউ বিদেশে গিয়ে সংসার পাতলে, ছেলেপুলে হল কিন্তু বুড়িকে আর কেউ দেখলে না। জমিজমা গহনা-গাঁটি বেচে ছেলেমেয়ে নাতিপুতি এমনই তিনপুরুষ ধরে সবাইকে বিয়ে দিয়ে চাকরি নিয়ে বিদেশে পাঠাতে পাঠাতে বুড়ি ক্রমে সর্বস্বান্ত হয়ে না খেয়ে মরবার দাখিল হল! ছেলেমেয়ে কত যে জন্মাল, মানুষ হল, বড় হয়ে বুড়িকে একলা রেখে চলে গেল, এই গয়লাবাড়িতে ক'পুরুষ ধরে কত কারখানাই দেখলুম যে তা কি বলি!'

'এদানি বুড়ি আর দুঃখু করত না, ছেলেদের কথা হলে বলত—'বুদি এখানে এলে তাদের তো কষ্ট বই আরাম হবে না, তবে কেন আর তাদের ডেকে পাঠাই; এই তো ভাঙাবাড়ি, এখানে জায়গা কোথায় তাদের বসবার শোবার খাবার! ওই বাপ-মা হারা আমার শিবরাত্রির সলতে ওই ছোট নাতিটি বেঁচে থাক, মরবার সময় তবু মুখে জল দেবার একজন তো রইল—কি বলিস!' কিন্তু এ নাতিও বড় হয়ে যেদিন কুলির সর্দারি করতে বিদেশে গেল সেদিন থেকে বুড়ির আর চোখের জল থামল না। সে দিন দিন কুঁজো হয়ে পড়ল, হাল-গরু জোত-জমা সমস্ত পাঁচ ভূতে লুঠে পালাল, বুড়ি দেখেও দেখলে না—শেষে এখানে আর কেউ রইল না—এই বুদি আর ওই বুড়ি ছাড়া! বুড়ি খেতে পায় না দেখে আমি একদিন বললুম—'মাগো, কসায়ের কাছে আমাকে বেচলে তো পয়সা পাও, তা কর না কেন!' মুড়ি আমার গলা ধরে বললে—'বুদি সব ছেলেমেয়ে তোর দুধ খেয়ে মানুষ হল তোকে আমি কি ছাড়তে পারি!' আহা সেই আমার সেঙাতনি মনিবনী, গিন্নি, মা-জননী আজ নিজেই চলে গেল গোঃ, ওমা'—বলে সে অঝোরে কাঁদতে লাগল।

রিদয় অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—'আহা বুদি, আমতলিতে মাকে এমনই করে ফেলে এসেছি যে!'

বুদি বলে উঠল—'যাও কালই ফিরে যাও, নাহলে হয়ত এই বুড়ির মতো ছেলে ছেলে করে শেষে সেও

মরবে। তোমার তো এখনও গিয়ে মাকে দেখবার সময় আছে কিন্তু এই বুড়ির ছেলেরা কি পোড়াকপাল নিয়েই জন্মেছিল, কখনও দেশে এল না, মা মরে গেল তাকেও দেখতে পেলে না!'

সকাল বেলায় মিউনিসিপালের মুর্দোফরাসগুলো এসে বুড়িকে পোড়াতে নিয়ে গেল, খটাস চলে গেল দিগ্বিজয়ে, নেউল চলে গেল মৃগয়াতে। রিদয় বুড়ির ঘর থেকে তার ছেলেদের নামের চিঠিখানি ডাকে ফেলে দিয়ে বুদিকে মাঠে রেখে খোঁড়ার কাছে ফিরে চলল। পাতিজলার কাছ বরাবর এসে রিদয় দেখলে খোঁড়া হাঁস সকালে উঠে জলের মাঝে একটা মাটির ঢিপিতে দাঁড়িয়ে ডানা ঝাড়ছে, বালি হাঁস তখনও ঝোপের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। রিদয় সারারাত কিছু খায়নি, হাঁসের কাছে না গিয়ে সে বরাবর বুদি গাইটার পিছনে পিছনে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল! দু'একটা পাত বাদামের চেষ্টায় রিদয় একটা শিরীষ গাছের উঁচু ডালে কাঠবেড়ালির ঘরে ভিক্ষে করতে চলেছে। মস্ত শিরীষ গাছ, তার সব উপরের ডালে কাঠবেড়ালিদের খোপ বসতি, ঝোপ বসতি। এমনই এ পাড়া ও পাড়ায় রিদয় 'জয়রাম' বলে গান গেয়ে দাঁড়াচ্ছে আর কেউ এসে তাকে দুটো শুকনো ছোলা, কেউ একটা বাদাম, এমনই টুকিটাকি ভিক্ষে দিচ্ছে। রামের দোহাই দিলে কাঠবেড়ালিদের ভিক্ষে দিতেই হয়, কিন্তু এক এক কাঠবেড়ালি গিন্নি ভারী কিপটে, রিদয়কে দূর থেকে দেখেই বলছে—'ওগো ঘরে কিছু নেই, কর্তা হাটে গেছেন, ওবেলা এসো—এখন কিছু হবে না।' রিদয় পাকা ভিখিরি, সহজে ছাড়বে কেন, গান শুরু করলে :

বাসনা করায় মন পাই কুরেরের ধন
সদা করি বিতরণ তুমি যত আশ না
আস তাই আরও চাই ইন্দ্রের ঐশ্বর্য পাই
ক্ষুধা মাত্র সুধা খাই মরি মরি ফাঁস না
ফাঁসনা কেবল রৈল বাসনা পূরণ নৈল
লাভে হতে লাভ হৈল লোকে মিথ্যা ভাসনা!

কাঠবেড়ালি গিন্নি এতেও সাড়া দেয় না, রিদয় এবারে হিন্দি গান ধরলে :

ধুম বড়া ধুম কিয়া খানে জোনে নাহি দিয়া
চহুঁয়ার ঘেরলিয়া ফোজ কি গিতাপয়া!
আরে চহুঁয়ার, আরে চহুঁয়ার।

এক থোকা শিরীষ ফুলের তলায় দাঁড়িয়ে বুড়ো আংলা পেট বাজিয়ে গাইছে, এমন সময় মনে হল তার কোমরের কাপড় ধরে কে টান দিচ্ছে, রিদয় ফিরে দেখতেই একটা কাক 'খাও' বলে তার ঠোঁট আর ডান হাতটা চেপে ধরলে, অমনি আর একটা কাক, তারপর আর একটা এসে রিদয়কে ছোঁ দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলল। ডোম-কাকের দল রিদয়কে চোখেমুখে কিছু দেখতে দিচ্ছে না—"যকা যকা" বলে এর মুখ থেকে ও, তার মুখ থেকে সে, এমনই রিদয়কে ফুটবলের মতো ছুড়ে দিতে দিতে দল বেঁধে গোলমাল করতে করতে চলেছে দেখে বুদি গাই "ওমা ওমা" করে চেঁচাতে চেঁচাতে লেজ তুলে ছুটোছুটি করতে লাগল। ইচ্ছেটা কাকগুলোকে শিং দিয়ে গোঁতায়, কিন্তু তারা আকাশে সে বেচারা মাটিতে—বুদি কেবল ধুলো উড়িয়ে মাঠে ছুটোছুটি করতে লাগল!

খোঁড়া হাঁসও আকাশে কাক দেখে—"ক্যা ক্যা" বলে একবার ডাক দিলে, কিন্তু দেখতে দেখতে কাকের দল অদৃশ্য হয়ে গেল।

রিদয় চটকা ভেঙে যখন চেয়ে দেখলে, তখন কাকেরা পাতিজলা পেরিয়ে নাটবাড়ি ছাড়িয়ে কাকচিরের দিকে চলেছে। হাঁসের পিঠে আরামে উড়ে চলা এক, আর কাকের ঠোঁটে ঝুলতে ঝুলতে চলা অন্য এক রকম। রিদয় দেখলে জলাজমি যেন একখানা ফাটাফুটো গালচের উল্টো পিঠের মতো পায়ের তলায় বিছানো রয়েছে, সবুজ লাল কালো কত রকমের যেন সুয়োঁ ওঠা পশমে বোনা, বাংলাদেশের পরিষ্কার ছককাটা জমির মতো মোটেই নয়, জলগুলো দেখাচ্ছে যেন মাঝে মাঝে ছোটোবড়ো আয়না ভাঙা।

দেখতে দেখতে সূর্যি উঠল, আলো পেয়ে মাটি যেন সোনারুপো আর নানারঙের উলে বোনা কাশ্মীরি শালের মতো দেখতে লাগল। তারপরে জলা পার হয়ে বনজঙ্গল মাঠঘাটের উপর দিয়ে কাকেরা রিদয়কে নিয়ে উড়ে চলল! কাকেরা তাকে ধরে নিয়ে কোথায় চলেছে, কোথা রইল খোঁড়াহাঁস, কোথায় বা চকার দল, কোথা বুদি, কোথা বালি!

রিদয় ভয় পেয়ে চারদিক চাইছে এমন সময় ডোমকাক ডাক দিলে—"খবরদার!" অমনই সব কাক রিদয়কে

নিয়ে জঙ্গলের তলায় নেমে পড়ল! চোরকাঁটার বনে রিদয়কে ঠেলে ফেলে গোটা পঞ্চাশেক কাক সঙিনের মতো ঠোঁট উঁচিয়ে তার চারদিকে পাহারা দিতে দাঁড়িয়ে গেল।

রিদয় গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বললে—'তোরা যে আমাকে বড় ধরে আনলি!'

ডোমরাজা দৌড়ে এসে বললে—'চুপ, কথা কবি তো চোখ ঠুকরে নেব।'

রিদয় বুঝলে এবার সহজে ছাড়ান নেই, এরা সব ডাকাতে-পাখি। গোলযোগ করলে হয়তো মাথাটাই ফাটিয়ে দেবে। সে কি করে, শুকনো মুখে কাকগুলোর দিকে চেয়ে রইল। কাকগুলোও তাকে ঘিরে ধারাল ঠোঁট বাড়িয়ে একচোখে তাগ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

দূর থেকে দেখে রিদয় ভাবত কাকগুলো বেশ কালো চিকচিকে, যেন কালো আলপাকার চায়না কোট পরা নতুন উকিল কৌঁছিলের মতো, চালাক চতুর চটপটে। কিন্তু কাছ থেকে কাকগুলোকে রিদয় দেখলে কদাকার কালো কুচ্ছিত যতদূর হতে হয়, পালকগুলোকে রুখো মড়মড়ে যেন কালিতে ছুপোনো তালপাতা, পাগুলো গেঁটে গেঁটে কাদামাখা খরখরে, ঠোঁটের কোণে এঁটো ঝোলঝাল মাখানো; একটা চোখ যেন ছানি পড়া আর একটা যেন ময়লা পয়সার মতো তামাটে কালো। কোথায় সাদা ধপধপে সুবচনীর হাঁস আর কোথায় এই কালো কুচ্ছিত কাগের ছা সব।

রিদয় এই কথা ভাবছে এমন সময় মাথার উপর অনেক দূর থেকে হাঁসের ডাক এল—'কোথায়—কোথায়?' রিদয় গলা শুনে বুঝলে খোঁড়া তার সন্ধানে চলেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে বালি হাঁসও ডাক দিয়ে গেল 'সেঙাত সেঙাত!' বনের ওধারটায় বুদিও একবার হাঁক দিলে—'ওগোঃ ওগোঃ!' রিদয় বুঝলে তিনজনেই এসেছে, সে অমনি হাত নেড়ে হেথায় বলে চেঁচাতে যাবে আর ডোমরাজা ছুটে এসে ধমকে বললে—'কিও! আর দিই চোখ দুটো খুবলে!' রিদয় অমনই মুখ বুজে গোঁ হয়ে বসল।

হাঁসেরা চলে গেল, বুদি গাইও ডেকে ডেকে থামল, তখন ডোমকাক হুকুম দিলে—'উঠাও!' দুটো কাক তাকে আবার ঠোঁটে ঝুলিয়ে নিয়ে ওড়বার চেষ্টায় আছে দেখে রিদয় বললে—'বাপু তোমাদের মধ্যে কেউ পালোয়ান কাক থাকে তো আমাকে পিঠে করে নিয়ে চল, অমন ঝোলাঝুলি করলে আমার হাত-পায়ের জোড় সব খুলে যাবে যে!'

ডোমকাক ধমকে বললে—'চল চল, অত বাবুগিরিতে কাজ নেই। কাকে চড়বেন এত সুখ তোর কপালে—আমরা কি ঘোড়া যে তোকে পিঠে নেব!'

এবারে ঝোড়োকাক এগিয়ে এসে বললে—'মহারাজ, মানুষটাকে হাড়গোড় ভেঙে দ করে নিয়ে গেলে তো ওটা আমাদের কোনও কাজে আসবে না, আমি বরং ওকে পিঠে নিই, কি বলেন?'

ডোমকাক মুখ সিঁটকে বললে—'তোমার ইচ্ছে হয় তো ওর পালকি বেহারার কাজ করতে পার, কিন্তু দেখো পালায় না যেন!'

রিদয় দেখলে ঢোঁড়াকাকটা ওর মধ্যে দেখতে শুনতে ভদ্দর রকম, সে আস্তে আস্তে তার পিঠে চড়ে বসল।

কাকের দল ক্রমাগত দক্ষিণ মুখেই উড়ে চলেছে। পরিষ্কার দিনটি খটখট করছে, চারদিকে যেন বাতাস আর আলো ছড়িয়ে পড়েছে, বনের শিয়র দিয়ে রিদয়কে নিয়ে কাকরা উড়ে চলল।

রিদয় দেখলে বউ-কথা-কও পাখি বকুল গাছের আগডালে বসে বউকে শুনিয়ে কেবলই গাইছে—'কথা কও বউ, কথা কও, মাথা খাও বউ কথা কও!' রিদয় অমনই বলে উঠল—'কথা কইবে কি ছলে, কথা শুনলে গা জ্বলে!'

'কে রে?' বলে হলদি পাখি আকাশের দিকে ঘাড় তুলতেই, রিদয় তাকে শুনিয়ে বললে—'কাকে ধরা যক! কাকে ধরা যক!'

ডোমকাক অমনি ধমকে উঠল—'আবার কথা!'

আরও দক্ষিণমুখো গিয়ে রিদয় দেখলে আমবাগানের মাথায় ঘুঘু বসে তার বউকে গান গেয়ে ঘুম ভাঙাচ্ছে আর গলা ফুলিয়ে আদর করে ডাকছে—'বুবু ওঠো দেখি ম্‌ম্‌।'

রিদয় অমনি বলে উঠল—'আদর দেখ উহুঃ।'

ঘুঘু গলা তুলে বললে—'কে রে কে রে?'

রিদয় তাকেও শুনিয়ে দিলে—'কাকে ধরা যক!'

এবার ডোমকাক রেগে রিদয়কে ডানার থাপ্পড় দিয়ে বললে—'ফের বকচিস, চুপ!'

ঢোঁড়াকাক বলে উঠল—'বকুক না যত পারে, পাখিগুলো ভাবচে আমরাও ঠাট্টা-তামাশা শিখেছি।'

ডোমকাক আর উচ্চবাচ্য করলে না। রিদয় ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে সব পাখিকে জানিয়ে দিতে দিতে চলল—তাকে কাকে ধরেছে।

এমনই বন ছাড়িয়ে তারা একটা নগরের উপরে এসে পড়ল। নদীর ধারে মস্ত শিবমন্দির, তারই চুড়োয় ত্রিশূলের ডগায় বসে শালিক তার বউকে শুনিয়ে রাগরাগিণীতে গলা সাধছে, বউ তার পঞ্চবটীর বাসায় ডিমে তা দিচ্ছে আর কর্তার গান শুনছে—'সা রে গা মা পা—চারটে ডিমে তা, ধা নি সা—দুই জোড়া ছা!'

রিদয় অমনি আকাশ থেকে বলে উঠল—'কাগে খাবে গা!'

শালিক 'কেও?' বলে মুখ ফেরতেই রিদয় শুনিয়ে দিলে—'কাকে ধরা যক।'

যতই দক্ষিণ দিকে এরা এগোতে থাকল ততই বড় বড় নদী খালবিল ক্ষেত মাঠঘাট গ্রাম-নগর দেখা দিতে থাকল। একটা মস্ত বিলের ধারে একটা হাঁস আর একটা হাঁসের সামনে দাঁড়িয়ে কেবলই ঘাড় নাড়ছে আর বলছে, 'চেয়ে দেখ আমি তোরই চিরদিন আমি তোরই।'

রিদয়ের মনে হল যেন খোঁড়া আর বালি দু'জনে কথা কইছে; সে অমনি তাদের শুনিয়ে বলে উঠল, 'এসা দিন রহে থোড়ি রহে থোড়ি!'

'কেও—কেও?' বলে হাঁস মুখ ফেরাতেই রিদয় শুনিয়ে দিলে—'কাকে ধরা যক!' এমনই যাকে দেখে, তাকেই নিজের খবর শুনিয়ে দিতে দিতে রিদয় চলেছে!

বেলা দুপুর, কাকের ঝাঁক এক মঠের জমিতে নেবে সড়া পেসাদ খেতে আরম্ভ করলে। রিদয় খেলে কিনা সে দিকে কারুর লক্ষ্য নেই। ডোমকাক রিদয়কে আগলে বসে আছে, এমন সময় ঢোঁড়াকাক একটা ডালিম এনে ডোমকাককে বলে—'মহারাজ দুটো ফল খেতে আজ্ঞে হোক!' ডালিম ভাঙা কাকের কর্ম নয়, তা ঢোঁড়াকাক জানত—ডোমরাজা নাক তুলে বললে—'ওই শুকনো ফল আমি খাব, থুঃ!' ঢোঁড়া অমনি সেটা রিদয়ের পায়ের কাছে ফেলে তাড়াতাড়ি রাজার জন্যে যেন ভাল ফল আনতেই যাচ্ছে এইভাবে ছুটে পালাল। রিদয় বুঝলে ঢোঁড়া তার জন্যেই ডালিমটা এনেছে; সে অমনি সেটা দাঁতে চিবিয়ে ছালসুদ্ধ খেয়ে ফেললে।

ভাত খেয়ে ডোমরাজ মঠের চুড়োর উপরেতে গেলেন, অন্য সব কাক খেয়ে দেয়ে পেট ভরিয়ে রিদয়কে ঘিরে গালগল্প শুরু করলে। পাতিকাক দাঁড়কাককে শুধোলেন, 'দাদা চুপচাপ ভাবছ কি শুনি!'

দাঁড়কাক গলা খাঁকনি দিয়ে বললে—'ভাবছিলুম এই তল্লাটে এক মিয়া সাহেব একটি মুরগি পুষেছিল, মুরগি ওই মোছলমানের বিবিকে এত ভালবাসত যে তাকে খাওয়াবার জন্যে লুকিয়ে বিবির পানের ডাবরে গিয়ে চারটে করে ডিম পেড়ে আসত। মিয়া ডিম খুঁজে খুঁজে হয়রান, তখন কিন্তু আমাদের মধ্যে কে একটা চালাক কাক সেই লুকানো ডিম খুঁজে বার করেছিল, না? তার নামটা কি মনে পড়ছে না। সে কি তুমি না আমি, না ওই ডোম না এই ঝোড়োকাক?'

পাতিকাক বলে উঠল—'ওঃ! বুঝেছি, আচ্ছা শোনো দেখি বলি, বোষ্টমবাড়ির সেই কালো বেড়ালটাকে মনে আছে তো? সেই যেটা বোষ্টম বোয়ের হেঁসেলের মাছ রোজ নিয়ে পালাত, কোথায় সে লুকিয়ে মাছটা রাখত তা বোষ্টম না বোষ্টমী না কালো কেউ টের পেত না, সেই মাছের সন্ধান কে কে পেয়েছিল দাদা, তুমি না আমি, রাজা না মন্ত্রী?'

সব কাক অমনি এগিয়ে এসে নিজের নিজের বড়াই করতে আরম্ভ করলে। কেউ বললে—'মাছ চুরি আবার একটা কাজের মধ্যে, আমি একবার একটা খরগোশের লেজ ঠুকরে দিয়েছিলেম; আর একটু হলেই সেটাকে নিয়ে চিলের মতো ছোঁ দিয়ে উড়েছি আর কি, এমন সময় সেটা তার গর্তে সেঁধিয়ে গেল!'

আর এক কাক বলে উঠল—'আরে বাবা খরগোশছানা বেড়ালছানা এদের নিয়ে খেলা করেছ—মানুষের কাছে কখনও এগিয়েছ? আমি একবার ফিরিঙ্গির বাড়িতে গিয়ে তাদের টেবেলের রুপোর কাঁটা চামচে চুরি করে সাফ বেরিয়ে এসেছি, একটি পালকে পর্যন্ত আঁচড় লাগেনি!'

রিদয় থেকে থেকে বলে উঠল—'এই বিদ্যের আবার এত বড়াই, এই বেলা ও সব চুরিচামারি ছাড়, নাহলে মানুষ বিরক্ত হয়ে একদিন এমন গুলি চালাতে আরম্ভ করবে যে কাকবংশ ধ্বংস করে তবে ছাড়বে!'

'কি বলিস?' বলে সব কাক রিদয়কে তেড়ে এল, মনে হল এখনই তাকে ছিঁড়ে খাবে!

ঢোঁড়াকাক তাড়াতাড়ি সবাইকে ঠাণ্ডা করে বললে—'ছেলেমানুষ কি বলতে কি বলেছে। থাম হে ওকে মেরো না, রাজা তাহলে ভারি দুঃখিত হবেন! মনে নেই সেই যকের ধনটা বার করা চাই! ছোঁড়াটা নাহলে সে কাজটা করে কে? তাছাড়া এটা মানুষ, একে মারলে পুলিস হাঙ্গামা হতে পারে।'

কাকেরা রিদয়কে আর কিছু না বলে ঢোঁড়াকেই ধমকাতে লাগল—'হাঃ মানুষ, ভারী তো উনি বড়লোক যে ভয় করতে হবে, ঢের ঢের অমন মানুষ দেখেছি—'

এই সময় ডোমকাক উপর থেকে হাঁক দিলে—'চালাও!' এবারে কাকের দল রিদয়কে নিয়ে কাকচিরার পতিত জমির দিকে চলেছে—গ্রাম নগর আর দেখা যাচ্ছে না, কেবল ধু ধু বালি আর কাঁটাগাছ। মানুষ নেই, গরু নেই, পাখি নেই—কেবল আগুনের মতো রাঙা সূর্যটা পশ্চিম দিকে ডুবছে—সমস্ত আকাশে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়ে।

ভরসন্ধ্যাবেলা ডোমকাক রিদয়কে ধরে নিয়ে কাকচিরার জঙ্গলে এসে নামল। ডোমকাক দূত হয়ে আগে গিয়ে সবার বাসায় খবর দিলে রাজা এলেন, অমনি সব কাকিনী 'বা-বা-বা তোবা তোবা' বলে বাসা ছেড়ে তামাশা দেখতে ছুটল।

শেয়ালের দল আহ্লাদে লেজ ফুলিয়ে হাঁক দিলে—'হুয়া—কয়েদ হুয়া, তোফা হুয়া!' চারদিকে হই চই—ক্কা ক্কা হুয়া শব্দ উঠেছে, তারই মধ্যে ঢোঁড়া রিদয়ের কানে কানে বললে—'আমি তোমার দিকে আছি, দেখো খবরদার ওদের কথা শুনে কোনও কাজ কোরো না। কাজ করিয়ে নিয়েই তোমায় মেরে ফেলবে, সাবধান।'

ডোমকাক এসে রিদয়কে টানতে টানতে শেওড়াগাছের গোড়ায় গর্তটার মধ্যে নামিয়ে দিলে, রিদয় যেন জেরবার হয়ে পড়েছে এমনইভাবে আধমরার মতো গর্তের মধ্যে শুয়ে পড়ল। ডোমরাজা ডাকলে—'ওঠ, যা বলি তা কর।' রিদয় যেন শুনতেই পেল না, চোখ বুজে রইল। ডোম তাকে ধরে যকের পেঁটরার কাছে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে বললে—'খোল এটা।'

রিদয় ধাক্কা দিয়ে ডোমকে সরিয়ে বললে—'খিদেয় পেট জ্বলছে এখন আমি কাজ করব? আজ রাত্তিরটা না ঘুমিয়ে নিলে আমি কিছু কাজ পারব না, গা-হাত-পা টাটিয়ে গেছে।'

'খোলো আভি!' বলে ডোম রিদয়কে ঝাপটা মেরে পেঁটরার গায়ে ঠেলে দিলে : রিদয় গোঁ হয়ে পেঁটরা ধরে নেড়ে বললে—'বাবা, যে মরচে ধরা তালা, এ তো খোলা সহজ নয়, খেয়েদেয়ে গায়ে জোর হোক, কাল তখন দেখা যাবে!'

ডোম রেগে রিদয়ের গায়ে এক ঠোকর বসিয়ে বললে—'খোল বলছি!'

রিদয় এবারে আর রাগ সামলাতে পারলে না, ডোমকে এক থাপ্পড় কষিয়ে কোমর থেকে ছুরি বার করে বললে—'ফের বজ্জাতি, পাজি কোথাকার!'

ডোমকাক রাগে আর চোখে দেখতে পাচ্ছে না—'তবে রে' বলে সে রিদয়ের উপরে যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ল, অমনই রিদয় ছুরিটা তার চোখে বসিয়ে দিলে। ডোমকাক দু'বার ডানা ঝটপট করেই অক্কা পেলে।

'হত্যা হুয়া, হত্যা হুয়া,' বলে শেয়াল চেঁচাতে লাগল, 'ক্যা ক্যা' বলে কাকরা গোলমাল করে তেড়ে এল। ঢোঁড়া বোকা সেজে কেবলই রিদয়কে আড়াল করে করে ডানা ঝাপটাতে লাগল, যেন কতই রেগেছে এইভাবে। রিদয় বিপদ গুণে পেঁটরাটা জোরে টেনে খুলে তার মধ্যে লুকোবার চেষ্টা করতে লাগল। পেঁটরাটা কিন্তু টাকায় পয়সায় ঠাসা, তার মধ্যে জায়গা নেই দেখে দু'চার মুঠো পয়সা বাইরে ছড়িয়ে ফেললে!

এতক্ষণ কাকরা হট্টগোল করছিল যেন কাঙালি বিদেয়ের ভিড় লাগিয়েছে। পয়সা পড়তে সবাই ছোঁ দিয়ে এক একটা তুলে বাসার দিকে দৌড়—চকচকে পয়সা পেয়ে তারা রাজা, রাজহত্যা সব কথাই ভুলে গেল।

সব কাক যে যার ঘরে গেছে, তখন ঢোঁড়াকাক এসে রিদয়কে বললে—'তুমি জান না আমার কী উপকার করেছ। এসো আমার পিঠে চড়ো, আমি তোমাকে এমন জায়গায় রেখে আসব যেখানে শেয়ালের বাবাও আর ধরতে পারবে না।'

এত হুটোপাটির পর রিদয়ের ঘুম পাচ্ছিল, সে কাকের পিঠে চড়ে ঢুলে ঢুলে পড়তে লাগল! ঘুমের ঘোরে তার মনে হল অন্ধকারে কাকের চেহারাটা গণেশের ইঁদুরের মতো হয়ে যাচ্ছে—কাক বক হাঁস শেয়াল সব এক সঙ্গে তার মাথার ভিতরে ঘুরছে। এমন সময় আকাশ থেকে যেন বোধ হল চকার দল হাঁকলে—'কোথায়?'

'হেথায়' বলে যেমন রিদয় চেয়েচে অমনই দেখলে কোঁ করে দরজা খুলে গণেশের মতো মোটা পেট নিয়ে তার বাপ ঘরে ঢুকে বললেন—'কিছু ভাঙিসনি তো?'

রিদয় ভয়ে ভয়ে একবার কুলুঙ্গিটার দিকে চেয়ে দেখলে যেখানকার গণেশ সেইখানেই রয়েছে—দু'বার মাথা চুলকে রিদয় এক দৌড়ে বাড়ির উঠোনে এসে দেখলে খোঁড়া হাঁস পুকুর পাড়ে একটা বুনোহাঁসের সঙ্গে ভাব করছে—আর একটা ঝোড়োকাক চালে বসে 'কা কা' করে ডাকছে—গোয়ালঘর থেকে কপলে গাই ডাক দিলে 'ওমঃ,' ঠিক সেই সময় একটা গুগলি পুকুর ঘাট বেয়ে আস্তে আস্তে জলে নেমে গেল।

রিদয় পুকুর পাড়ে হাঁ করে কি ভাবছে দেখে রিদয়ের মা কাছে এসে বললে—'কি হল তোর?'

রিদয় মাথা চুলকে বললে—'আমি কি সত্যিই বড় হয়ে গেছি?' বলে আপনার মাথায় হাত বুলোতে লাগল!

সেই সময় ডালিমগাছে টুনটুনি পাখি বলে উঠল—'ও কি রিদয় হল কি!'

'মাথা আর মুণ্ডু হল!' বলে রিদয় পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে সাঁতার আরম্ভ করলে।

রিদয়ের মা চেঁচিয়ে বললে—'এত বড়টি হলি তবু তোর ছেলেমানুষি গেল না। উঠে আয়, পাঠশালায় যাঃ!'

মাসি



মাসি

'ওলো, কে আছিস, অবু এয়েছে, ঘরে খই-মোয়া আছে নিয়ে আয়।'
'মাসি, আমাকে দেখলেই বুঝি তোমার খই-মোয়ার কথা মনে পড়ে?'

'মনে পড়বে না, অবু? মাসির মোয়া খাবার জন্যে আবদার করে এমন তো দু'টি নেই আমার, অবু।'

'আর একটি যদি থাকত মাসি—'

'ছিল তো, রইল না যে। আহা, যদি থাকত আজ—'

'বলতে বলতে থামলে কেন, মাসি?'

মাসি আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে ডাকলেন, 'ওলো ও ঝিঙ্কারী।'

'ঝিঙ্কারী কে, মাসি?'

'ঝঙ্কারীর বোন। নয়াদুমকা থেকে এসেছে দু'জনে কাজ করতে। কাজ জানে, কিন্তু কথা বোঝে না।'

'নাম দু'টো নতুন ঠেকল মাসি। তোমার সে ফুকারি দাসী কোথা গেল?'

'সে গেছে এ দেশ ছেড়ে পালিয়ে। বলি, 'যেয়ে করবি কী', জবাব করলে না; পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে মাথায় নিয়ে চলে গেল চোখ মুছতে মুছতে।'

'নিশ্চয় মাসি সে তুসু-জুজুর ভয়ে পালিয়েছে, নাহলে কখনও যায় তোমাকে ছেড়ে? ফুকারি দাসী লোক ছিল ভাল; তোমায় যত্ন করত; আর রোজ আমার ঘন দুধের সরে ফুটো করে দুধটুকু ঢেলে নিয়ে নিজের জন্যে রাখত, সবসুদ্ধু খালি বাটি আমায় ধরে দিত—চুমুক দিয়ে বলতেম, 'দুধ কোথা গেল?' তো সাফ বুঝিয়ে দিত, 'দুষ্টু গয়লা ফুঁকো দুধ দিয়েছে, ওই সরটুকুই এখন খেয়ে নাও, ও বেলা ফুঁকো দুধের চাঁচি খাওয়াব। মাসিকে বোলো না, আমারও চাকরি যাবে, গয়লারও জরিমানা হয়ে যাবে; দুধও আসবে না, সরও পড়বে না, চাঁচিও পাবে না।'—আমি তার নাম দিয়েছিলুম চালাক দাসী। সে তোমার মোয়া চুরি করে আমাকে এক একদিন ধরা পড়লে দিত, মাসি।'

'ওমা, এমন! আচ্ছা, তোকে দেখলে যেমন আমার খই-মোয়ার কথা মনে পড়ে, আমাকে দেখলে তোর কী মনে পড়ে, অবু?'

'ছেলেবেলার কথা মাসি, খুব ছোটোবেলা—যখন আসত তাড়াতাড়ি সকাল, তাড়াতাড়ি পড়ন্ত বেলা।'

'এখন?'

'মাসি, আমার মনে হয় আমি ঠিক তেমনই আছি ছোট্টটি।'

'না, তুই বড় হয়েছিস, তাই আমাকে মনে পড়তে তোর দেরি হয়ে যায়, না হলে কোন কালে আসতিস। দেখ না, দাসী দু'টোকে কোনকালে ডেকেছি, এখনও দেখা নেই। ওলো ও ঝিঙ্কারী, ও ঝঙ্কারী, আয় না—'

'আঁউ মায়ী, যাঁউ মায়ী—'

'এই দেখ, চুল বাঁধার আয়না মুখ সাফের বাক্স নিয়ে এল দু'টোতে। হাঁউমাউ করছেই সারাদিন। ওরাও বোঝে না আমার কথা, আমিও বুঝি না ওদের বুলি। এর কী করি উপায় বল তো, অবু!'

'এ তো সহজ। ছিরিক্ষেত্তরের লোকজনের কথা তো বুঝতে, মাসি?'

'তা একরকম বুঝতেম—'চিতাবাড়ি ধাঁইকিড়ি মৌসীমা পড়কী চড়'। এদের কথা যে কিছু বুঝি নে।'

'বুঝবে কী করে, মাসি? ফাইলোলজি পড়নি তো।'

'তুই তো পড়েছিস, অবু?'

'একটু একটু।'

'তাই না হয় আমাকে শেখা একটু। কী উপায়ে এদের বোঝাই কখন কী চাই।'

'আচ্ছা দেখো মাসি, ছিরিক্ষেত্তরের লোকেরা সব কথার গোড়ায় চন্দ্রবিন্দু উলকির মত বসায়; আর এরা দুমকা পাহাড়ের লোক, কথার শেষে উলকি টানে 'ভুখি লাগা দুহি পিলাউ'; তারা হলে বলত, 'ভুখ লাগিলা, দুধ না পাইলা কাঁই, ধাঁইকিড়ি গোয়ালী বাড়ি যাঁই'। বুঝলে তো মাসি?'

'বুঝেছি, দেখি তো তোর বুদ্ধিতে এদের মতো কথা কয়ে—ওরে শিগগিরি মেঠাই লাঁ, দাঁড়িয়ে হাঁসতা কাঁ, জলদি যাঁ।'

'মাসি, ছুটছে দু'টোতে। বোধহয় বুঝেছে কিছু কিছু!'

'কই অবু, দৌড়ে গেল, দৌড়ে আসার নামও যে করে না।'

'ব্যস্ত হোয়ো না মাসি, আমি খেয়ে এসেছি, খিদে নেই, ও বেলা খাব।'

'ওমা, সেকি অবু, কে এমন ভাগ্যিমন্তী, তোমায় পেটটি ভরিয়ে পাঠালে এখানে?'

'তাকে তুমি চিনবে কি মাসি—ফেলার মা।'

'ফেলার মা? কই, চিনলেম না তো। কোথায় থাকে?'

'সিংগির বাজারে।'

'সিংগির বাজারে?'

'হাঁ মাসি, মিণ্টুদির বাড়ির কাছে। অমন করে আকাশ তাকিয়ে কী ভাবছ, মাসি? শোনো না বলি—'

'হাঁ বল, তারপর?'

'সেই তো, মাসি, পিসেমশায় আমাকে ইস্কুলে পাঠালে, তারপর কতকাল তোমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ নেই। রথ গেল, দোল গেল, চড়কপুজো আসে আসে, গাজনের বড় সন্ন্যাসী কাঁটা-ঝাঁপ খাবে, পঞ্চাননতলার মাঠে চড়কগাছ পোঁতা হল, ঢাকে-ঢোলে কাঠি পড়ে আর কি—আমার আর সবুর সইল না মাসি, তোমায় দেখতে চৌপাটি ছেড়ে দিলেম লম্বা, পায়ে হেঁটে বকুলতলার বাড়ির ঠিকানা ধরে। দিন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন আসে, আবার যায় দিন, আবার আসে রাত। মনে কত ভাবনা আসে যায়। মাসি কি পর করে দিলে, মাসি কি ঘরবাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে গেল তুসু-জুজুর ভয়ে? কিছুই ঠিক পাই নে। হাঁটতে হাঁটতে চলি। যশোর থেকে বসিরহাট, সেখান থেকে দমদমার মাঠ, পাইকপাড়া, চিৎপুর, টালার জলকল, আহিরিটোলা, হাটখোলা, নতুনবাজার, জগন্নাথের ঘাট, মাথাঘষার গলি, আমড়াতলা, খেংরাপট্টি ঘুরে ঘুরে শেষে বাক্সপটি, মশারিপটি, চোরবাগান, জোড়াসাঁকো—বকুলতলা। এমন ফেরে কোনওদিন পড়িনি, মাসি। আগেও তো তোমার বাড়িতে গেছি, গলির মোড় ফিরতেই শরীর যেন শীতল হয়ে যেত। এবারে যেন একটা তাপ এসে লাগল মুখে। চোখ তুলে দেখি, লোহার ফটকের ধারে হেলে পড়া সে নিমগাছটি নেই। প্রাণটা তখনই কেমন করে উঠল বাড়ি ঢোকবার মুখেই।'

'সে বাড়ি তো আর আমাদের নেই, অবু। আর একজনরা সে বাড়ি যে নিয়ে নিয়েছে। বাড়ি ছাড়বার সময় আমার অসুখ, তাই কাউকে খবর দিয়ে আসতে পারিনি। তোমাকে যে একটা পত্তর দিয়ে আসব সেটুকু সময়ও দিলে না তারা।'

'এতক্ষণে বোঝা গেল, মাসি। পুরনো বাড়িতে ঢুকে দেখি সদর ফটক আধখানা আছে আধখানা নেই, পাহারায় কেউ নেই—না পট্টুলাল, না উচ্ছেলাল, ছেদিলাল, ছোটেলাল; সাড়াশব্দ নেই কারও। চাকরদের নাম ধরে ডাকি— ও রামলাল, ও গদাধর, ও ঈশেন, বিপিন, দুগ্‌গোদাস। কেউ দেখা দেয় না। ভয়ে ভয়ে ঢুকলেম ভিতরে, উঠে গেলেম ঘুরনো সিঁড়ি বেয়ে বৈঠকখানাতে। দেখি কি মাসি—ঝাড়লণ্ঠন, দেয়ালগিরি, আরশি-কুর্সি কিছু নেই। বসি কোথায় ভেবে পাইনে। কোথা টানাপাখা, কোথা ফুলকাটা গালচে, বড় বড় তসবির সব বড়কর্তা মেজকর্তা ছোটকর্তাদের, দেয়ালজোড়া বড় বড় পর্দা—সব অদৃশ্য। ফটিকের বাতিদান, চীনের পেটিসান, ফুলকাটা ফুলদান, পাথরের মুরত, দামী দামী বইঠাসা আলমারি—কিছু কি নেই; সব যেন ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। কেবল সিঁড়ির ঘরগুলো খাড়া আছে এখনও; ধাপের পর ধাপ, পঁচিশ তিরিশ বিশ পঞ্চাশ চিৎ হয়ে পড়ে কড়ি গুনছে—বড় সিঁড়ি, ছোট সিঁড়ি, পাথরের সিঁড়ি, গোল সিঁড়ি, ঘুরনো সিঁড়ি, কেটো সিঁড়ি, মেটে সিঁড়ি। কোথায় সে ঘড়ির ঘর, নাচঘর, ছবিঘর, ইস্কুলঘর—সব ঘর একশা হয়ে চুপচাপ আছে। এমন কাউকে দেখি না যে শুধিয়ে জানি, মাসি কোথায়। মাসি মাসি বলে ডেকে ডেকে গলা চিরে গেল। একবার মনে হল যেন অন্দরবাড়ির দিকটায় কে যেন ডাকল 'মাসি গো মাসি'। তারপরেই যে চুপ সেই চুপ, নিঃসাড়া পুরী। ছুটলুম অন্দরের দিকে, বলি মাসির যদি দেখা পাই সেখানে। দালান, দরদালান, গলিঘুঁজি, চাকর-দাসীদের ঘর পেরিয়ে পালকিদোরের সামনে যেয়ে দেখি, মাসি, সেই যে আমাকে সময়-ভোলা ঘড়িটি দিয়েছিলে, আর আমি যেটিকে ভোলানাথের ঘড়ি নাম দিয়ে ঠিক পালকিদোরের উপরে বসিয়ে দিয়েছিলেম, সেটা ঠিক তেমনই বসে আছে—

'বুঝেছি, দেখি তো তোর বুদ্ধিতে এদের মতো কথা কয়ে—ওরে শিগগিরি মেঠাই লাঁ, দাঁড়িয়ে হাঁসতা কাঁ, জলদি যাঁ।'

'মাসি, ছুটছে দু'টোতে। বোধহয় বুঝেছে কিছু কিছু!'

'কই অবু, দৌড়ে গেল, দৌড়ে আসার নামও যে করে না।'

'ব্যস্ত হোয়ো না মাসি, আমি খেয়ে এসেছি, খিদে নেই, ও বেলা খাব।'

'ওমা, সেকি অবু, কে এমন ভাগ্যিমন্তী, তোমায় পেটটি ভরিয়ে পাঠালে এখানে?'

'তাকে তুমি চিনবে কি মাসি—ফেলার মা।'

'ফেলার মা? কই, চিনলেম না তো। কোথায় থাকে?'

'সিংগির বাজারে।'

'সিংগির বাজারে?'

'হাঁ মাসি, মিণ্টুদির বাড়ির কাছে। অমন করে আকাশ তাকিয়ে কী ভাবছ, মাসি? শোনো না বলি—'

'হাঁ বল, তারপর?'

'সেই তো, মাসি, পিসেমশায় আমাকে ইস্কুলে পাঠালে, তারপর কতকাল তোমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ নেই। রথ গেল, দোল গেল, চড়কপুজো আসে আসে, গাজনের বড় সন্ন্যাসী কাঁটা-ঝাঁপ খাবে, পঞ্চাননতলার মাঠে চড়কগাছ পোঁতা হল, ঢাকে-ঢোলে কাঠি পড়ে আর কি—আমার আর সবুর সইল না মাসি, তোমায় দেখতে চৌপাটি ছেড়ে দিলেম লম্বা, পায়ে হেঁটে বকুলতলার বাড়ির ঠিকানা ধরে। দিন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন আসে, আবার যায় দিন, আবার আসে রাত। মনে কত ভাবনা আসে যায়। মাসি কি পর করে দিলে, মাসি কি ঘরবাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে গেল তুসু-জুজুর ভয়ে? কিছুই ঠিক পাই নে। হাঁটতে হাঁটতে চলি। যশোর থেকে বসিরহাট, সেখান থেকে দমদমার মাঠ, পাইকপাড়া, চিৎপুর, টালার জলকল, আহিরিটোলা, হাটখোলা, নতুনবাজার, জগন্নাথের ঘাট, মাথাঘষার গলি, আমড়াতলা, খেংরাপট্টি ঘুরে ঘুরে শেষে বাক্সপটি, মশারিপটি, চোরবাগান, জোড়াসাঁকো—বকুলতলা। এমন ফেরে কোনওদিন পড়িনি, মাসি। আগেও তো তোমার বাড়িতে গেছি, গলির মোড় ফিরতেই শরীর যেন শীতল হয়ে যেত। এবারে যেন একটা তাপ এসে লাগল মুখে। চোখ তুলে দেখি, লোহার ফটকের ধারে হেলে পড়া সে নিমগাছটি নেই। প্রাণটা তখনই কেমন করে উঠল বাড়ি ঢোকবার মুখেই।'

'সে বাড়ি তো আর আমাদের নেই, অবু। আর একজনরা সে বাড়ি যে নিয়ে নিয়েছে। বাড়ি ছাড়বার সময় আমার অসুখ, তাই কাউকে খবর দিয়ে আসতে পারিনি। তোমাকে যে একটা পত্তর দিয়ে আসব সেটুকু সময়ও দিলে না তারা।'

'এতক্ষণে বোঝা গেল, মাসি। পুরনো বাড়িতে ঢুকে দেখি সদর ফটক আধখানা আছে আধখানা নেই, পাহারায় কেউ নেই—না পট্টুলাল, না উচ্ছেলাল, ছেদিলাল, ছোটেলাল; সাড়াশব্দ নেই কারও। চাকরদের নাম ধরে ডাকি— ও রামলাল, ও গদাধর, ও ঈশেন, বিপিন, দুগ্‌গোদাস। কেউ দেখা দেয় না। ভয়ে ভয়ে ঢুকলেম ভিতরে, উঠে গেলেম ঘুরনো সিঁড়ি বেয়ে বৈঠকখানাতে। দেখি কি মাসি—ঝাড়লণ্ঠন, দেয়ালগিরি, আরশি-কুর্সি কিছু নেই। বসি কোথায় ভেবে পাইনে। কোথা টানাপাখা, কোথা ফুলকাটা গালচে, বড় বড় তসবির সব বড়কর্তা মেজকর্তা ছোটকর্তাদের, দেয়ালজোড়া বড় বড় পর্দা—সব অদৃশ্য। ফটিকের বাতিদান, চীনের পেটিসান, ফুলকাটা ফুলদান, পাথরের মুরত, দামী দামী বইঠাসা আলমারি—কিছু কি নেই; সব যেন ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। কেবল সিঁড়ির ঘরগুলো খাড়া আছে এখনও; ধাপের পর ধাপ, পঁচিশ তিরিশ বিশ পঞ্চাশ চিৎ হয়ে পড়ে কড়ি গুনছে—বড় সিঁড়ি, ছোট সিঁড়ি, পাথরের সিঁড়ি, গোল সিঁড়ি, ঘুরনো সিঁড়ি, কেটো সিঁড়ি, মেটে সিঁড়ি। কোথায় সে ঘড়ির ঘর, নাচঘর, ছবিঘর, ইস্কুলঘর—সব ঘর একশা হয়ে চুপচাপ আছে। এমন কাউকে দেখি না যে শুধিয়ে জানি, মাসি কোথায়। মাসি মাসি বলে ডেকে ডেকে গলা চিরে গেল। একবার মনে হল যেন অন্দরবাড়ির দিকটায় কে যেন ডাকল 'মাসি গো মাসি'। তারপরেই যে চুপ সেই চুপ, নিঃসাড়া পুরী। ছুটলুম অন্দরের দিকে, বলি মাসির যদি দেখা পাই সেখানে। দালান, দরদালান, গলিঘুঁজি, চাকর-দাসীদের ঘর পেরিয়ে পালকিদোরের সামনে যেয়ে দেখি, মাসি, সেই যে আমাকে সময়-ভোলা ঘড়িটি দিয়েছিলে, আর আমি যেটিকে ভোলানাথের ঘড়ি নাম দিয়ে ঠিক পালকিদোরের উপরে বসিয়ে দিয়েছিলেম, সেটা ঠিক তেমনই বসে আছে—

মাসি

'ওলো, কে আছিস, অবু এয়েছে, ঘরে খই-মোয়া আছে নিয়ে আয়।'
'মাসি, আমাকে দেখলেই বুঝি তোমার খই-মোয়ার কথা মনে পড়ে?'

'মনে পড়বে না, অবু? মাসির মোয়া খাবার জন্যে আবদার করে এমন তো দু'টি নেই আমার, অবু।'

'আর একটি যদি থাকত মাসি—'

'ছিল তো, রইল না যে। আহা, যদি থাকত আজ—'

'বলতে বলতে থামলে কেন, মাসি?'

মাসি আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে ডাকলেন, 'ওলো ও ঝিঙ্কারী।'

'ঝিঙ্কারী কে, মাসি?'

'ঝঙ্কারীর বোন। নয়াদুমকা থেকে এসেছে দু'জনে কাজ করতে। কাজ জানে, কিন্তু কথা বোঝে না।'

'নাম দু'টো নতুন ঠেকল মাসি। তোমার সে ফুকারি দাসী কোথা গেল?'

'সে গেছে এ দেশ ছেড়ে পালিয়ে। বলি, 'যেয়ে করবি কী', জবাব করলে না; পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে মাথায় নিয়ে চলে গেল চোখ মুছতে মুছতে।'

'নিশ্চয় মাসি সে তুসু-জুজুর ভয়ে পালিয়েছে, নাহলে কখনও যায় তোমাকে ছেড়ে? ফুকারি দাসী লোক ছিল ভাল;তোমায় যত্ন করত; আর রোজ আমার ঘন দুধের সরে ফুটো করে দুধটুকু ঢেলে নিয়ে নিজের জন্যে রাখত, সবসুদ্ধু খালি বাটি আমায় ধরে দিত—চুমুক দিয়ে বলতেম, 'দুধ কোথা গেল?' তো সাফ বুঝিয়ে দিত, 'দুষ্টু গয়লা ফুঁকো দুধ দিয়েছে, ওই সরটুকুই এখন খেয়ে নাও, ও বেলা ফুঁকো দুধের চাঁচি খাওয়াব। মাসিকে বোলো না, আমারও চাকরি যাবে, গয়লারও জরিমানা হয়ে যাবে; দুধও আসবে না, সরও পড়বে না, চাঁচিও পাবে না।'—আমি তার নাম দিয়েছিলুম চালাক দাসী। সে তোমার মোয়া চুরি করে আমাকে এক একদিন ধরা পড়লে দিত, মাসি।'

'ওমা, এমন! আচ্ছা, তোকে দেখলে যেমন আমার খই-মোয়ার কথা মনে পড়ে, আমাকে দেখলে তোর কী মনে পড়ে, অবু?'

'ছেলেবেলার কথা মাসি, খুব ছোটোবেলা—যখন আসত তাড়াতাড়ি সকাল, তাড়াতাড়ি পড়ন্ত বেলা।'

'এখন?'

'মাসি, আমার মনে হয় আমি ঠিক তেমনই আছি ছোট্টটি।'

'না, তুই বড় হয়েছিস, তাই আমাকে মনে পড়তে তোর দেরি হয়ে যায়, না হলে কোন কালে আসতিস। দেখ না, দাসী দু'টোকে কোনকালে ডেকেছি, এখনও দেখা নেই। ওলো ও ঝিঙ্কারী, ও ঝঙ্কারী, আয় না—'

'আঁউ মায়ী, যাঁউ মায়ী—'

'এই দেখ, চুল বাঁধার আয়না মুখ সাফের বাক্স নিয়ে এল দু'টোতে। হাঁউমাউ করছেই সারাদিন। ওরাও বোঝে না আমার কথা, আমিও বুঝি না ওদের বুলি। এর কী করি উপায় বল তো, অবু!'

'এ তো সহজ। ছ্রীক্ষেত্তরের লোকজনের কথা তো বুঝতে, মাসি?'

'তা একরকম বুঝতেম—'চিতাবাড়ি ধাঁইকিড়ি মৌসীমা পড়কী চড়'। এদের কথা যে কিছু বুঝি নে।'

'বুঝবে কী করে, মাসি? ফাইলোলজি পড়নি তো।'

'তুই তো পড়েছিস, অবু?'

'একটু একটু।'

'তাই না হয় আমাকে শেখা একটু। কী উপায়ে এদের বোঝাই কখন কী চাই।'

'আচ্ছা দেখো মাসি, ছ্রীক্ষেত্তরের লোকেরা সব কথার গোড়ায় চন্দরবিন্দু উলকির মত বসায়; আর এরা দুমকা পাহাড়ের লোক, কথার শেষে উলকি টানে 'ভুখি লাগা দুহি পিলাউ'; তারা হলে বলত, 'ভুখ লাগিলা, দুধ না পাইলা কাঁই, ধাঁইকিড়ি গোয়ালী বাড়ি যাঁই'। বুঝলে তো মাসি?'

'বুঝেছি, দেখি তো তোর বুদ্ধিতে এদের মতো কথা কয়ে—ওরে শিগগিরি মেঠাই লাঁ, দাঁড়িয়ে হাঁসতা কাঁ, জলদি যাঁ।'

'মাসি, ছুটছে দু'টোতে। বোধহয় বুঝেছে কিছু কিছু!'

'কই অবু, দৌড়ে গেল, দৌড়ে আসার নামও যে করে না।'

'ব্যস্ত হোয়ো না মাসি, আমি খেয়ে এসেছি, খিদে নেই, ও বেলা খাব।'

'ওমা, সেকি অবু, কে এমন ভাগ্যিমন্তী, তোমায় পেটটি ভরিয়ে পাঠালে এখানে?'

'তাকে তুমি চিনবে কি মাসি—ফেলার মা।'

'ফেলার মা? কই, চিনলেম না তো। কোথায় থাকে?'

'সিংগির বাজারে।'

'সিংগির বাজারে?'

'হাঁ মাসি, মিণ্টুদির বাড়ির কাছে। অমন করে আকাশ তাকিয়ে কী ভাবছ, মাসি? শোনো না বলি—'

'হাঁ বল, তারপর?'

'সেই তো, মাসি, পিসেমশায় আমাকে ইস্কুলে পাঠালে, তারপর কতকাল তোমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ নেই। রথ গেল, দোল গেল, চড়কপুজো আসে আসে, গাজনের বড় সন্ন্যাসী কাঁটা-ঝাঁপ খাবে, পঞ্চাননতলার মাঠে চড়কগাছ পোঁতা হল, ঢাকে-ঢোলে কাঠি পড়ে আর কি—আমার আর সবুর সইল না মাসি, তোমায় দেখতে চৌপাটি ছেড়ে দিলেম লম্বা, পায়ে হেঁটে বকুলতলার বাড়ির ঠিকানা ধরে। দিন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন আসে, আবার যায় দিন, আবার আসে রাত। মনে কত ভাবনা আসে যায়। মাসি কি পর করে দিলে, মাসি কি ঘরবাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে গেল তুসু-জুজুর ভয়ে? কিছুই ঠিক পাই নে। হাঁটতে হাঁটতে চলি। যশোর থেকে বসিরহাট, সেখান থেকে দমদমার মাঠ, পাইকপাড়া, চিৎপুর, টালার জলকল, আহিরিটোলা, হাটখোলা, নতুনবাজার, জগন্নাথের ঘাট, মাথাঘষার গলি, আমড়াতলা, খেংরাপট্টি ঘুরে ঘুরে শেষে বাক্সপটি, মশারিপটি, চোরবাগান, জোড়াসাঁকো—বকুলতলা। এমন ফেরে কোনওদিন পড়িনি, মাসি। আগেও তো তোমার বাড়িতে গেছি, গলির মোড় ফিরতেই শরীর যেন শীতল হয়ে যেত। এবারে যেন একটা তাপ এসে লাগল মুখে। চোখ তুলে দেখি, লোহার ফটকের ধারে হেলে পড়া সে নিমগাছটি নেই। প্রাণটা তখনই কেমন করে উঠল বাড়ি ঢোকবার মুখেই।'

'সে বাড়ি তো আর আমাদের নেই, অবু। আর একজনরা সে বাড়ি যে নিয়ে নিয়েছে। বাড়ি ছাড়বার সময় আমার অসুখ, তাই কাউকে খবর দিয়ে আসতে পারিনি। তোমাকে যে একটা পত্তর দিয়ে আসব সেটুকু সময়ও দিলে না তারা।'

'এতক্ষণে বোঝা গেল, মাসি। পুরনো বাড়িতে ঢুকে দেখি সদর ফটক আধখানা আছে আধখানা নেই, পাহারায় কেউ নেই—না পট্টুলাল, না উচ্ছেলাল, ছেদিলাল, ছোটেলাল; সাড়াশব্দ নেই কারও। চাকরদের নাম ধরে ডাকি— ও রামলাল, ও গদাধর, ও ঈশেন, বিপিন, দুগ্‌গোদাস। কেউ দেখা দেয় না। ভয়ে ভয়ে ঢুকলেম ভিতরে, উঠে গেলেম ঘুরনো সিঁড়ি বেয়ে বৈঠকখানাতে। দেখি কি মাসি—ঝাড়লণ্ঠন, দেয়ালগিরি, আরশি-কুর্সি কিছু নেই। বসি কোথায় ভেবে পাইনে। কোথা টানাপাখা, কোথা ফুলকাটা গালচে, বড় বড় তসবির সব বড়কর্তা মেজকর্তা ছোটকর্তাদের, দেয়ালজোড়া বড় বড় পর্দা—সব অদৃশ্য। ফটিকের বাতিদান, চীনের পেটিসান, ফুলকাটা ফুলদান, পাথরের মুরত, দামী দামী বইঠাসা আলমারি—কিছু কি নেই; সব যেন ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। কেবল সিঁড়ির ঘরগুলো খাড়া আছে এখনও; ধাপের পর ধাপ, পঁচিশ তিরিশ বিশ পঞ্চাশ চিৎ হয়ে পড়ে কড়ি গুনছে—বড় সিঁড়ি, ছোট সিঁড়ি, পাথরের সিঁড়ি, গোল সিঁড়ি, ঘুরনো সিঁড়ি, কেটো সিঁড়ি, মেটে সিঁড়ি। কোথায় সে ঘড়ির ঘর, নাচঘর, ছবিঘর, ইস্কুলঘর—সব ঘর একশা হয়ে চুপচাপ আছে। এমন কাউকে দেখি না যে শুধিয়ে জানি, মাসি কোথায়। মাসি মাসি বলে ডেকে ডেকে গলা চিরে গেল। একবার মনে হল যেন অন্দরবাড়ির দিকটায় কে যেন ডাকল 'মাসি গো মাসি'। তারপরেই যে চুপ সেই চুপ, নিঃসাড়া পুরী। ছুটলুম অন্দরের দিকে, বলি মাসির যদি দেখা পাই সেখানে। দালান, দরদালান, গলিঘুঁজি, চাকর-দাসীদের ঘর পেরিয়ে পালকিদোরের সামনে যেয়ে দেখি, মাসি, সেই যে আমাকে সময়-ভোলা ঘড়িটি দিয়েছিলে, আর আমি যেটিকে ভোলানাথের ঘড়ি নাম দিয়ে ঠিক পালকিদোরের উপরে বসিয়ে দিয়েছিলেম, সেটা ঠিক তেমনই বসে আছে—

দ্যালে গাঁথা, চাঁদ ওঠার দিকে চেয়ে। দেখে সাহস হল, তবে হয়তো মাসিও আছে। একছুটে দোতলায় উঠে গেলেম তোমার ঘরে, মাসি। কোথায় মাসি! খালি ঘর চুপচাপ সবুজ খড়খড়ি বন্ধ করে অঘোরে পড়ে আছে। বলি, দেখি তো ভাণ্ডারঘরটা খুঁজে যদি পাই। দেখি, না—তালাখোলা দোর, তার একদিকে গলাভাঙা একটা কুঁজো, আর একদিকে কানাভাঙা কলসি একটা। ভয় করল মাসি, উপোসী ঘরখানা গজালপোঁতা গর্তগুলো নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে যেন খাবে বলে—যাকে পায়। ঠিক মনে হল, মাসি, যেন রাবণবধের বিংশলোচন আমাকে দেখছে। সেখান থেকে পালিয়ে, মাসি, তোমার তরকারি ঘরে ঢুকে দেখি সেখানেও তুমি নেই। উঠানের ধারে কলতলা, সেখানে দু'বেলা থালা কাঁসিগুলো বাসন মাজুনির হাতে পড়ে 'মাসি মাসি' বলে চেঁচাত, ঝগড়া লাগত কাঁসাতে-পিতলে, লোহার কড়াতে-হাতাতে-বেড়িতে-খুন্তিতে—ঝনঝন খনখন। আর ঢালু বারান্দা থেকে তোমার ময়না চেঁচাত 'ও বউ, ও খোকা, ও সরলা'—সব সুনসান। কী বলব, মাসি, বুকটা যেন টিপটিপ করে উঠল। মেটে সিঁড়ি বেয়ে উঠলেম গিয়ে রান্নাবাড়ির ছাতে। মাথা ঘুরে গেল, মাসি, সেখান থেকে চারিদিক দেখে—ঠাকুরবাড়ির চুড়ো থেকে সুদর্শনচক্কর অদর্শন হয়ে গেছেন। বাজপড়া শিক মুঠিয়ে ধরে যে গোদাচিল সারাদিন বসে ভাবত আর থেকে থেকে চিল্লাত 'চির্‌র্ আঁচি-র্ পাঁচি-র্ মাসি-র', সেটাও নেই চিলঘরে। ছাতের আলসে থেকে ঝুঁকে দেখি, তোমার ঘরের দেওয়াল ছাওয়া করেছিল যে আমসির গাছ সেটি, আর উত্তর-পশ্চিম হাতায় তিন্তিড়ি গাছ—যার গোড়ায় আমাদের সাতপুরুষের নাড়ি পোঁতা, আর যার নামে বাড়ির নাম হয়েছিল 'বকুলতলার বাড়ি'—সে গাছটিও নেই। পুকুরের পুবধার ঢেকে নেই সে জটেবুড়ির বটগাছ, ঝুরি নামিয়ে কালো জলে। গোলবাগানের এক ধারে সেই শিশুগাছ আর একধারে সেই কাঁঠাল গাছ—কিছু কি নেই। জলের ফোয়ারা, রঙিন টালির গোল রাস্তা—সব লোপাট হয়ে গেছে। গাছ নেই বাগান থাকে? ফোয়ারা নেই, ঘাস থাকে সবুজ? মাসি, অমন বাগান মরে গিয়ে যেন শুকনো লেবুর খোলার মতো পাঙাশ বর্ণ হয়ে পড়ে আছে। সে ছিরি চলে গেছে পুরনো বাড়ির। ছি ছি মাসি, অমন বাড়ি অমন বাগান তুমি কোন প্রাণে তেয়াগ করে এলে? বসে থাকলেই পারতে, কে তোমায় তাড়াত দেখতেম। মাসি আমার সেই সময়-ভোলা ঘড়ি, সেটি এখনও বসে আছে তোমার ঘরের পাঁচিল আগলে; তাকে নড়াতে চাইলেম, সে নড়ল না। আমি বললুম 'থাক তবে, মাসির ঘর পাহারা দে'! সে এখনও চাঁদ ওঠার দিকে চেয়ে বসে আছে তেমনই শক্ত হয়ে; আর তুমি, মাসি, এলে কিনা তাকে একলা ফেলে। মনে আছে তো সেটিকে?'

'আছে অবু, অসুখ শরীর তখন, গোলেমালে তাকে আনতে মনে ছিল না।'

'তা জানি, মাসি। তোমার খোঁজ নিয়ে এখানে আসতে পঁচিশ দিন সেই নিবান্ধব পুরীতে আমি একলা কাটিয়ে এলেম। আর তুমি, মাসি, আমায় একটা পত্তর ফেলে দু'দিন অপিক্ষে করতে পারলে না সেই পুরনো ঘরে?'

'পুরনো ঘরের কথা থাক, অবু। পুরনো ঘরের সঙ্গে পুরানো সবকিছু বাড়ি বাগান মানুষ মুনিষ চলে গেছে। আর ফিরবে কি? যাক, এখন তোর সেই ফেলার মায়ের কাহিনী ক' শুনি।'

'সে হবে এখন বৈকেলে, চিনির পানা খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসে। এখন একবার ঘুরেঘারে এই বাড়িটার সঙ্গে পরিচয় করে আসি।'

'সেই ভাল। পুকুরে নেয়ে এসে পেসাদ পাস, ঠাকুরের ভোগ সারা হলে।'

'আচ্ছা মাসি।'

দিশা

তুলাগাছে কুড়গাল পাখি বৈকালে কাড়ে রাও।
শসা কলা শাঁখআলু বেলের পানা খাও।।

ঝকঝকে কাঁসিতে জলপান সাজিয়ে মাসির বাড়ির ঠাকুরঘরের সেবায়েত সামনে ধরে দিয়ে বললে, 'খায়েন।'

'খায়েন কী। এই যে আড়াইটে বেলায় ভোগ খেয়ে উঠেছি।'

'বৈকালি খায়েন।'

'বাপু, খায়েন তো জানি। খায় কে?'

‘উদর, বাবু উদর।’

বুঝলেম সেবায়েত পণ্ডিতলোক, খাও-কে বলেন খায়েন, পেটকে বলেন উদর। কাজেই অনুস্বর বিসর্গ চন্দরবিন্দু দিয়ে সাধুভাষা কইতে হল আমায়। নৈবিদ্যির কাঁসিখানি হাতে নিয়ে কলার চোপা, শসার টিকলি, শাঁখআলুর টুকরো গালে ফেলি আর বলি, ‘কিং নাম? কুত্র বাসা? অত্র না তত্র? চ পিতা চ মাতা?’ আর সমস্কৃত বিদ্যেতে কুলোলে না, ‘কয়টি ভ্রাতা?’ বলেই বেলের পানাতে চুমুক।

সেবায়েত জবাব দিলেন, ‘এজ্ঞে, মোর নাম বাসুন্তে।’

‘তাই বল, নামটা যেন শোনা শোনা; বাসুন্দের কেউ হও?’

‘নহঃ।’

‘হারুন্দে-মারুন্দের?’

সে দু’বার ঘাড় নেড়ে ছড়া কেটে দিলে, পুঁথির পাতায় যেন আঙুল বুলিয়ে চলল তার জিভ—

‘দুস্কের কথা কিবে কহিমু তোমারে,
আমা চেয়ে অভাগিয়া না কেহ সংসারে।
পরিচয় কিবা দিমু, শুন বিবরণ,
ছেলা-বয়সে মাও-বাপ মরিল দুইজন।
বাপ নাই, মাও নাই, নাই বহিন-ভাই,
ঠাকুরসেবায় নাগিঁয়াছি, অন্য কাম নাই।’

‘এ তো ভাল কাম পাইলা?’ বলে খালি কাঁসিখানি তার হাতে দিয়ে মাসিকে গিয়ে গড় করতে মাসি বললেন, ‘চারিদিক ঘুরে কেমন দেখলি, অবু?’

‘আশ্চর্য দেখলেম, মাসি।’

‘কী দেখলে?’

‘সুদর্শনচক্কর অদর্শন হননি, মাসি। তিনি এখানে এসে ঠাকুরদালানের আলসেতে গট হয়ে বসে গেছেন।’

‘আর কী দেখলে আশ্চর্যি?’

‘চাঁইবুড়ো আর চাংড়াবুড়ি দু’জনে পেঁপেতলা থেকে তুলসীতলায় রোদ পোয়াচ্ছেন।’

‘আর কী দেখলে, অবুচাঁদ?’

‘মাসি, এমন আশ্চর্যি কাণ্ড আমি জন্মে দেখিনি। কোথায় সে বকুলতলার পুরনো বাড়ি, আর কোথায় এই নতুন বাসা!’

‘ঘুরেঘারে দেখলি সব তো, অবু। কেমন বোধ হল?’

‘বোধ আর হবে কী, মাসি। দেখেশুনে বুদ্ধিহত হয়ে গেছি। সেখানটা যেন এখানে কে এনে বসিয়ে দিয়ে গেছে। সেই পুকুরের দক্ষিণপাড়ে সারি সারি নারকেল গাছ, সেই ভুতুড়ি-কাঁঠাল, সেই তেঁতুল, সেই পাতবাদাম— সবাই যেন উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এখানে যে যার জায়গায়। কেউ দক্ষিণের বারান্দার দিকে চেয়ে, কেউ উত্তরের পাঁচিল ঘেঁষে। নিশ্চয় তুমি ডাকমন্তর জান, মাসি। ডাকমন্তরে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে সবাই, এতে আর সন্দ নেই—’

‘ডাকমন্তর যদি হত তবে বাগানের পারে পাঁচিল ঠেস দিয়ে বসত সিংগির বাজার, উড়ে যাত্রা, কুঁড়েঘর, ছ্যাকরাগাড়ি, মুদির দোকানপাট সব নিয়ে; আর ওই ঠিক দক্ষিণে নাকের সামনে বসে যেত খেতু-খোট্টার তিনতলা মোকামটা, আর তারই পাশে হিমি বাড়িওয়ালির দেড়তলার ছাতে পাঁপড়ওয়ালির টিনের ঘরটি। কই, এ সব তো আসেনি, অবু?’

‘এসেছে মাসি। পাঁপড়ওয়ালির টিনের ঘর এসেছে, পাঁচিল টপকে তোমার বাগানে এখানে লোহার ফটকের ধারে বসে আছে চেয়ে দেখো।’

‘তাই তো, ওটা তো চোখে পড়েনি।’

‘আমি শহরে থাকতে খোঁজ নিয়েছিলেম; ফেলার মা বললে, ‘ঘর তুলে পাঁপড়ওয়ালি চলে গেছে; কেউ জানে না কোথায়’।’

‘পাঁপড়ওয়ালিকে ওঘরে দেখলি কি, অবু?’

'না মাসি, তুমি যে ফটক বন্ধ রেখেছ, ঢুকবে কোন সাহসে। ভুতি কুকুর তেড়ে যাবে। ওধারে একখানা মুদির দোকান ভাড়া নিয়েছে, দেখলেম যেন তাকে।'

'তা হবে!'

'হবে কি মাসি, হয়েছে। আমি বলছি তাকে একদিন খুঁজে ডেকে আনব দেখো। বেতালা তেতালা মারোবাড়ি মোকামগুলো ভারি বলে এতদূর উড়ে আসতে পারেনি, মাসি; রেল রাস্তার উঁচু বাঁধে ঠেকে ঝুপঝাপ পড়ে গেছে লোহালক্কড় তাল পাকিয়ে ও ধারে। ইস্টার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির মহাদেব তেওয়ারি সেইসব মাল কুড়িয়ে-বাড়িয়ে গাড়ি গাড়ি চালান দিচ্ছে কারখানায়, কানাইবাবুর হুকুমে।'

'তা ভাল। কিন্তু সেই পাঁচি ধোপানির গলি, আর সেই 'অর্চনা' পোস্ট আপিস?'

'সব এসেছে, মাসি। কেবল এখানে এসে ভোল ফিরিয়েছে। হয়ত পোস্ট আপিসটা হয়ে গেছে পেট্রোলের ডিপো।'

'আর সেই কাদামাখা অন্ধকার গলিটা, অবু?'

'ভারি সাজ সেজেছে সে, মাসি। লাল শাড়িতে ঘাসি রঙের পাড়, তাতে কাঁচপোকার চমক—রাস্তাটি যেন পাড়াগাঁয়ের মেয়েটির মতো। ওই টিনের ঘরের কাছ দিয়ে আমি দেখেছি?'

'তুই কেমন করে চিনলি তাকে, অবু?'

'মাসি, পা চেনে রাস্তাকে, রাস্তা চেনে পা। গঙ্গা নাইতে যদি কোনওদিন হেঁটে হেঁটে যাও তো, মাসি, সেই রাস্তায় তোমার পা পড়তেই তোমাকেও সে চেনা দেবে। যাবে একদিন, মাসি, গঙ্গা নাইতে?'

'তা যাব সময় হোক। তুই নিয়ে যাস পথ দেখিয়ে।'

'সেই ঠিক হবে, মাসি। পারবে তো হাঁটতে?'

'ও অবু, কাঁকর ফোটে যদি পায়ে?'

'ঘাসের উপর দিয়ে যাবে।'

'পায়ে যদি চোরকাঁটা বিঁধে যায়?'

'রোসো মাসি, ভেবে দেখি। আচ্ছা, তুমি যাবে পালকিতে আর আমি তোমার হাত ছুঁয়ে পাশে পাশে চলব। তা হলেই হবে, এতে তো রাজি?'

'রাজি। কিন্তু পথ যদি ভুল হয়, অবু।'

'তা হতে পারে না, মাসি। আমি ফিজিকাল জিয়োগ্রাফি পড়েছি। বেহারাদের জানিয়ে দেব, ঠিক রাস্তা ধর, মানচিত্র-মতো।'

'সে আবার কেমন?'

'শোনো না মাসি—

কাঁধ বদলি করুক জয়নগরের পালকি
বরানগরের মোড়ে যেখানে আপিস এ.আর.পি,
সেখান থেকে হাফিস কল,
ডাইনে রেখে দক্ষিণেশ্বর
চলুক সোজা বরাবর,
বাঁয়ে রাখো হাই ইস্কুল সাগর দত্তর,
ডাইনে মোড় ফিরে আগড়পাড়া, আদ্যপীঠ,
তারই ওপিঠে ইছাপুর গন্ ফ্যাকটারি পাচ্ছি।

দেখতে পাচ্ছ তো মাসি এ পাড়া সে পাড়া পরিষ্কার?'

'তা পাচ্ছি, কিন্তু গঙ্গা তো দেখতে পাচ্ছি নে, অবু।''

'এইবার পাবে, শোনো—

ফ্যাকটারি ছাড়িয়ে দাঁতিয়ার খাল,
সেখানে রাতে বেরোয় ডাকাত, দিনে খ্যাঁকশেয়াল।
আড়াআড়ি খালটা পেরিয়ে চলো কামারহাটি,

তারপরেই খড়দা, শ্যামসুন্দরের বাঁধাঘাট আর কি,
সেখানে চান সেরে, ফের কাঁধ-বদলি করে
পানিহাটি গদাধরের ছ্রীপাট ধরে
এখানে এসে দাখিল হোক মাসির বাড়ির পালকি।'

'সে পালকি বুঝি আর আস্ত রেখেছ তুমি সেবারে পিসির বাড়ি যাবার কালে। নড়িটি দিয়েছিলেম, সেটিও খুইয়ে এসেছ। সেটি থাকলে না হয় হেঁটে হেঁটে গঙ্গাচানে যেতুম। পুরনো লণ্ঠনটিই বা কী হল তা তুমিই জান।'

'ও মাসি, আমি তো পষ্ট সাফ কথা ছাপিয়ে সাধারণে প্রকাশ করে দিয়েছি। লাঠিগাছা মুনশিবুড়ো কেড়ে রেখেছে, লণ্ঠন আর পালকি দুইই খুইয়েছে তোমার হারুন্দে-মারুন্দে পাঁচভূতে মিলে বালুঘাই পেরোবার সময়। কটক পুলিসের বাবুরাও পড়ে দেখেছে সে কথা। দেখ না, এবার ঠেকলেন সবাই রাহাজানির মামলায়, হুলিয়া বেরল বলে তাদের নামে চ্যাটার্জি কোম্পানি থেকে।'

'ও অবু, করেছিস কী? মুনশি যে গ্রাম সম্পর্কে আমার নাতজামাই, হারুন্দে-মারুন্দে তারা হল পুরনো চাকর। তাদের ফ্যাসাদে ফেলতে আছে?'

'পুরনো চাকর তো এল না কেন তারা তোমার সেবা করতে এখানে? তোমাকে এই বনালয়ে একা পাঠিয়ে তারা কেউ গেল মামার বাড়ি, কেউ গোঁসাইপাড়ায় শ্বশুরবাড়ি আরামে থাকবেন আর দরকার হলে লিখবেন 'পত্তরপাঠ মনিঅডার করিলেই যাইব', কেউ লিখবেন 'হাত ভেঙে গেছে, হাঁড়ি ঠেলা অসম্ভব', কেউ লিখবেন 'আমি বাটী আঁসিয়া কালাজ্বর নুমোনিয়া ইত্যাদিতে শয্যাগত, এক বোতল সালসা পাইলে এ যাত্রা রক্ষা পাই, এই পত্র টেলিগ্রাপ বলিয়া জানিবেন'। এই ব্যাভার তোমার সঙ্গে মাসি! যা এককলম ঝেড়েছি, পুলিসের ঠেলায় তোমার পায়ে এসে পড়তে পথ পাবে না, দেখো। তোমার সম্পর্কে নাতজামাইই-বা কেমন তা তো বুঝি নে— লাঠিটি সাফ গাপ্পাই!'

'ছি ছি অবু, এমন জুলুম করতে নেই মানুষের উপর।'

'মানুষ কী বলছ মাসি, হারুন্দে-মারুন্দে তারা সব ভূত।'

'আহা, গালাগাল দিসনে। আমি ইচ্ছেসুখে তাদের ছুটি দিয়েছি। তুসু-জুজুর ভয় পেয়েছে তারা, গরিব তারা তো আমার মাইনের চাকর ছিল না, অবু।'

'তবে কে ছিল তারা, মাসি?'

'তুই বল না ভেবে।'

'ভাবতে গেলে, মাসি, মাথা ঘুরবে।'

'আচ্ছা, না ভেবেই বল।'

'বলি—

কে ছিল মাসি, কে ছিল তারা?
তোমাকে মা বলেছিল,
আমার মাকে মাসি বলেছিল যারা,
তারা কে ছিল সব, মাসি?
কত গরব করে বলত তারা—
'আমরা মাসিমার লোক গো'।
তোমার ঘরকে বলত তাদের ঘর;
তারা সবাই কে ছিল?
চাকর-চাকরানী, দাস না দাসী,
কেন বাঁদী না কেনা নফর?
না আপ্তজন, না কেউ অপর?
আর সেই যে ছিল গোবরার মা—
জাঁতা ঘোরাত দিনে,

রাতে দাবাত পা,
মাইনেও নিত না, দেশেও যেত না—
তাকে কি দাসীহাটে কিনেছিলে মাসি?
আর সেই যে, আকাশী পিদুম ঝুলিয়ে দিত
শুকতারার কাছাকাছি বাঁশের আগাতে,
ঘণ্টাকে বলত 'হুম তৎসৎ' সন্ধিপূজাতে
উঠত দেখে উদয়তারা,
নামটি ছিল যার উদাসী—
পড়াপাখিকে শিখিয়েছিল সে
বলতে—জয় মাসি।
আর সেই বেহারি? আর সেই রাধামালী?
আর সেই যে সে আনত জ্বালানি কাঠ—
কাঠফাটা রোদে খাটত ফাইফরমাশ
আমার, তোমার, বাড়ির সবার,
ছাগলছানার, হাঁসের বাচ্ছার,
কী শীতে কী গরমে দিনরাত।
সে বলেছিল 'বাবু, তোমার বিয়েতে
আমার বউকে রুপোর বালা গড়িয়ে দেবেন মাসি'।
তাকে তোমার মনে পড়ে কি?
আচ্ছা মাসি, সেই যে আমাকে বিনিপয়সায়
মুঠো ভরে দিত টোপাকুল,
এনে দিত রথে রঙিন ছাতা, সোনার ফুল,
ভিঙ্গারে ভরে দিত মিঠেজল কপ্পুরবাস,
সে খাওয়াত কপ্পুরকাঠি পানের দোনা
চানাচুর বেগনিভাজি
তার নাম ছিল না রাজি?
এমন শত কাজের শত জনা ছিল—
কেউ আমায় কাঁধে চাপিয়ে ঘোড়া হয়েছিল,
কাঠের দোলনায় ঝাঁকানি দিয়ে
নাট সাহেবের পালকি চাপিয়েছিল,
তিনতলার ছাদে তুলে ধরে দু'হাতে
চাঁদামামাকে চিনিয়েছিল—
পুকুরঘাটে, কাগাবগাকে,
পানকৌটিকে, বেনেবউটিকে,
শোলার ঝারাতে টুনটুনি পাখিকে—
ঝুমঝুমি গাছে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমির কথা শুনিয়েছিল।
এমনই সব তারা কোন দেশ হতে
এসেছিল, মাসি?
তারা কেউ কুটত আনাজ, বাটত লঙ্কা,
সংক্রান্তিতে কখনও শুনিনি চেয়েছে তঙ্কা,
আপনি এসে বেড়ালের বিয়েতে থালা চাপড়ে
ডঙ্কা পেটাত, কাজল পাড়াত, ঘষত চন্দন—

কাজেতে যেমন খেলাতে তেমন মজবুত
ছিল তারা বড়ো অদ্ভুত।
না চাকর, না নফর, না বাঁদী, না দাসী,
তা কে ছিল ভেবে পাই নে, মাসি।'

'অবু, তারা তোমারও কেউ ছিল,
আমারও কেউ ছিল,
পাখিরও কেউ ছিল,
বেড়ালেরও কেউ ছিল।'

'আর বলতে হবে না, মাসি।'

'বুঝলে তো, অবু আর কোনওদিন তাদের দোষ ধরে ডাইরি লেখাতে যেও না যেন পুলিসে—'

'মাসি, যে দোষ করে ঠকেছি তার আর চারা নেই। আজ থেকে হুলিয়া লেখালেখিতে নাকে খত, দণ্ডবত।'

২

মাসির বাড়ির দক্ষিণ পাঁচিল ঠেসান দিয়ে ঘরখানি, রেলের ধারেই লাল রং করা তিনটি জানলা। ঘরটা চায়ের ক্যাবিন ডাকবাংলা মিলে দেড় ছটাক, পুরো একটা কিছু হতে পারেনি; হবেও না কোনওদিন।

বাসুন্তে ভাল ঘর পেয়ে এটা ছেড়ে দিয়েছে আমার জন্যে; দিনরাত রেলগাড়ির চলার শব্দে ঘরখানা কাঁপে, পাছে কোনওদিন ঘাড়ে পড়ে এই ছিল তার ভয়। এই ঘরখানি দখল করে থাকি আমি একা। একটা পুরনো কুর্সি, একটা টেবিল, একটা বেঞ্চি, আর পায়াভাঙা একটা তক্তা, আর একটি ডালাফাটা কাঠের সিন্দুক, একটি শুঁড়ভাঙা মাটির গণেশ—এই দিয়ে সাজিয়ে দ্যালে পেরেকআঁটা পট ঝুলিয়ে বসে গেছি আরামে ফুলবাগিচার একপাশে; পুতুল খেলা, পটদাগা, অল্পপড়া অনেকখানি মনগড়া কত কী নিয়ে। লণ্ঠন নেই, চাঁদ-সূর্যি আলো দেয়, পাই; পাখিরা গায়, শুনি। বাসুন্তে মাসির কাছে তেলবাতির পয়সা নিয়ে ফুলুরি কিনে খায়। বললে বলে,'আমার কাছে ঘরভাড়া তো চাইতে পারে না, এমনই করে উসুল দিচ্ছে—মাসি যেন না শোনে।'

ফুলবাগিচার উত্তরধারে দেখা যায় মাসির দোতলা বাসাবাড়ি, গেরিমাটির রং করা ছোট্ট যেন পুতুলখেলার বাড়িটি। পশ্চিমধারে দিঘি, পুবধারে পুকুর হাঁসচরা, আঁকতে ইচ্ছে করে; বসে বসে নিজের ঘরে দেয়ালে কাঠকয়লা দিয়ে কত কী দেগেছি—বাঁশঝাড়, পানাপুকুরে হাঁস; পুতুলও গড়েছি—ঝিঙ্কারী-ঝঙ্কারী, কাঠবেড়াল, গোহালের শিংভাঙা বাছুর।

এইসব করছি বসে বসে, মাসি যে কখন এসে গেছেন বুঝতেই পারিনি।

'ও অবু, তোর খেলাঘর কেমন গোছালি দেখি!'

'ও মাসি, তুমি এসেছ? এ যে ভাঙা তক্তা, কোথায় বসবে?'

'দেখি না ঘুরে ঘুরে। ওমা, এ যে পট লিখেছিস দেয়ালে। ওমা, এ যে চমৎকার সব পুতুল। নিজে গড়লি নাকি? বাঃ, বেশ তো হয়েছে খেলনাগুলি—সিংগি বাঘ গোরু কাছিম। এটি কি টিয়েপাখি?'

'না মাসি, ও পরিবানু বেগম।'

'এ দু'টি?'

'চিনতে পারছ না ঝিঙ্কারী-ঝঙ্কারী? একটু শালুর টুকরো দিও মাসি, ওদের পরিয়ে দেব। দেখবে ঠিক যেন দু'টি বোন।'

'এসব কাঠকাটরা কোত্থেকে জোগাড় করিস?'

'এই বাগান থেকেই কুড়িয়ে-বাড়িয়ে জমা করি সিন্দুকে।'

'দেখ অবু, তোকে আমি কেষ্টনগরে পাঠিয়ে দেব।'

'কেন মাসি, আমি তো দুষ্টুমি করিনি।'

'তা নয়, অবু। পুতুলগড়া পটলেখা এ সব কারিগরের কাছে শিখতে হয়। কেষ্টনগরে কুমোরপাড়ায় আমার চেনা লোক আছে, গেলে সে যত্ন করে শেখাবে।'

‘কেন মাসি, আমায় মিথ্যে পাঠাবে? আমি আবার পালিয়ে আসব তোমার কাছে।’

‘তা কি হয়, অবু? এ সব বিদ্যে গুরুর কাছে শিখতে হয়।’

‘শিখলে কী হয়, মাসি?’

‘পয়সা হয়, কড়ি হয়, গাড়ি হয়, জুড়ি হয়।’

‘হয়ে কী হবে?’

‘প্রবাসী কাগজে তোর নাম বেরোবে; চাকরি পেয়ে যাবি বিশ্বভারতীতে।’

‘দুলালকে চিঠি লিখে জানি, মাসি; সে যদি বলে তো যাব।’

‘দুলাল আবার কে, অবু?’

‘সে একজন বড়দরের আর্টিস, আমার বন্ধু।’

‘ও, বুঝেছি। মোটা মোটা চুরুট খায়, ঠ্যাংঠেঙে লুঙি, ঠনঠনের চটি, নাকের উপরে গোল চশমা, ঢিলে আস্তিন, বুকের বোতাম খোলা জামা, লম্বা ইস্টিক হাতে মাটির দিকে চেয়ে হাঁটে—কি যেন খুঁজছে, থেকে থেকে ধুলোবালি হাতড়ে কি যেন তুলে নিয়ে পকেটে ভরে, মাথার তেলোতে চুল নেই—’



‘মাসি, তুমি কি বলছ? দুলাল তো কোনওদিন পুরানো বাড়িতে যায়নি। তুমি অন্য কাউকে দেখেছ। দুলাল এই আমার সঙ্গে ইস্কুল পালিয়েছে।’

‘অবু, সব ইস্কুল পালানো ছেলের সঙ্গে মিশো না। তারা সব কুবুদ্ধি।’

‘মাসি, দুলাল বুদ্ধিমান ছেলে বলে ইনস্পেকটারের মেডেল পেয়েছে।’

‘কুবুদ্ধি বলি আর কাকে! মেডেল পেলি তো ইস্কুল ছাড়লি কেন, বাপু?’

‘সে কেন মেডেল পেলে শোনো, তবে তার বিচার কোরো।’

‘আচ্ছা শুনি।’

'বলি—

ইনস্পেকটার শুধোলেন, 'দুলাল,
ইজি রিডার, মোক্তব উর নোক্তা,
বুধচন্দ্রিকা,ঋজুপাঠ—
কেমন লাগে তোমার?'
'মশায়, একেবারে গুরুভার।'

গুরুমশায় বেত তুলেছিলেন,
ইনস্পেকটার তাঁকে থামিয়ে বলেন,

'কেমন হওয়া চাই শিশুদের শিক্ষাটি?'
'আজ্ঞে, যেমন বোঝার উপর শাকের আঁটি।'
'আর, এখন কেমন আছে?'
'ধোপার মোট যেন উলটে পড়েছে
কলমিশাকের গাছে।'
ক্লাসসুদ্ধু লোক কেলাপ কেলাপ!
পেয়ে গেল মেডেল
মাস্টার রামদুলাল।'

'ও অবু,

পাকা পাকা কথা কয়,
মন নেই পড়াশুনায়,
ইঁচড়ে-পাকা তারে কয়।

তোমার এ বন্ধুটিকে তো ভাল বোধ হচ্ছে না। বুড়িয়ে গেছে যে।'

'না মাসি, ছেলেমানুষ। ফেলা তাকে দাদা বলে।'

'ও বুঝেছি। ফেলা তোমারে কি বলে, অবু?'

'সে বড় হাসির কথা, মাসি। সে আমার নাম দিয়েছে নসিবমশায়।'

'তার মানে?'

'সে-ই জানে, মাসি। এখানে আসার আগে পুরনো বাড়িতে রোজ একবার করে এসে বলত। 'নসিব, আমি এয়েছি।'—'এয়েছ, বেশ করেছ।'—'দাও আমি তোমার জিনিসগুলি গুছিয়ে দিই।'—মুখ চলল বকে, হাত চলল গুছিয়ে—'এই কাগজগুলো কী হবে নসিব?'—'ফেলে দাও।'—'আমি নিই এইগুলি।'—'নিয়ে হবে কি ছেঁড়া কাগজ?'—'নিয়ে মা, মুড়ির ঠোঙা করবে। এই টিনের কৌটোটি দাও না।'—'কী করবি?'—'মা সিঁদুর রাখবে। এই নুড়িগুলি নেব?'—'বা রে, ও আমার দরকারি নুড়ি, ওতে হাত দিও না।'—'আচ্ছা থাক, গুছিয়ে রাখি। এই কড়িগুলি আমি নিলুম।'—'কড়ি নিয়ে করবি কী?'—'ঘুঁটি খেলব আমরা।'— 'আচ্ছা, কড়িগুলো নিতে পারো।'—'মনিব তো ধমকাবে না?'—'মনিব কে?'—'ওই যে দুয়োরগোড়ায় বসে থাকে বউদাসীর কোলে চেপে।'—'ওঃ, সেই বুঝি তোমার মনিব? কিছু বলবে না সে, নিতে পারো তুমি।' আর কিছু বলে না, যাবার সময় বলে যায়, 'তুমি যা ফেলে দেবে আমাকে দিও। মা নেবে, আমরা খেলব, বাবা বেচবে বাজারে।' এমন গিন্নি মেয়েটা, কিছু ফেলতে দেবে না। আমি শুধোলেম, 'ফেলা, তোর মায়ের নাম কি?'—'কোমদী।'—'বাপের নাম?'—'বসন্ত।'—'কি করে তারা?'—'কাজ করে।'—'কি বললি, নাচ করে?'—'ধেৎ, কাজ করে বলছি।' আমাকে এক ধমক দিয়ে চলে গেল, মাসি। ভাবলেম, আর আসবে না। সকালে একলা সন্দেশ কিনে খাচ্ছি, দেখি ঠিক সময়ে ফেলা হাজির।—'নসিব, সন্দেশ দাও না!'—'খাও।' তারপর চলল 'এটা দেবে, সেটা দেবে, তোমাদের ঘর দেখাও না।' খুব কাজের মেয়েটা; মাসি, তুমি চাও তো আমি লিখলেই চলে আসবে; তোমার হুস্কারী মুস্কারীর চেয়ে ঢের ভাল দাসী হবে সে।'

'তার মা তাকে কেন ছেড়ে দেবে, অবু?'

'ফেলা যে বললে, 'মা বলেছে, নসিব যদি ডাকে তো যাস ফেলা'। '

'ওমা, এমন! কত বড় মেয়েটা?'

'এই মাসি, এত বড়; না না, এই এমন ছোটটি; না না, রোসো মাসি, দেখি, ওই যে তোমার দক্ষিণ বারান্দার কোণে দেখা যাচ্ছে ওই ওইটির মতো এতটুক মেয়েটা।'

'ওটি বুঝি এতটুক হল! ওটি যে একটি সুপুরি গাছ, ফুলের লতা তাকে জড়িয়ে আছে; এখান থেকে দেখাচ্ছে বটে ছোট্ট।'

'হাঁ মাসি, ঠিক অমনটি; খোঁচা খোঁচা চুল তার, সুন্দর মেয়েটি। কিন্তু একটি দোষ আছে বলে রাখি। সন্দেশ দাও, খেয়ে নেবে; তারপর বলবে, 'তোমাদের সন্দেশ কেমন আটা আটা; আমার মা যে সন্দেশ দেয় ডেলা ডেলা মিছরির মতো, মিষ্টি খেতে।' একটু নিন্দুক আছে, যদি এখানে এসে তোমার নিন্দে করে বসে?'

'তাহলে কি করবে, অবু?'

'সেই তো ভাবনার কথা। এল তো ঘাড়ে-পড়া হয়ে রয়ে গেল।'

'দেখি বিবেচনা করে; এখন তুমি লেখাপড়াতে মন নাও। পরের কথা পরে হবে। ফেলাও দেখছি ফেলনা নন।'

এই বলে মাসি তো যান। আমি জানলার ধাতে বসে পড়া মুখস্থ করতে লাগি—

'ইঞ্জিলী বিঞ্জিলী তিমিঙ্গিলী
ওয়ান টু থিরি
ফোর ফাইব সিক্স—ম্যাথেম্যাটিক্স।'

রাস্তার ওপার দিয়ে তিনটি মানুষ পায়ে পায়ে যাচ্ছে। পুরুষ মানুষটি নিয়েছে শাবল কোদাল; তার পাছে পাছে দু'টি মেয়ে, মাঝেরটির মাথায় পুঁটুলিবাঁধা ভাতের হাঁড়ি, কোলে খুকু একটি ঘুমিয়ে, হাতে ধরেছে ছাগলের গলার দড়ি; শেষের মেয়েটি চলেছে কালো ছাগলছানা একটি বুকে করে। তিনটি জানলা পেরিয়ে যায় তারা, পড়ে চলি আমি—

'সিক্স পিয়ার, হিসটিরী,
ট্রী মানে বিরিক্ষ, থ্রী মানে তিন,
নাইট মানে বীরপুরুষ, ডে মানে দিন।'

গড়ানে টিনের চালে শালিক পাখির ছা দৌড়নো অভ্যেস করছে; খুটখাট শব্দ পাই আর পড়ে চলি—

'ফ্রী মানে ছাড়া, হারি মানে তাড়াতাড়ি।'

এবারে শালিক পাখি দুটো ঘাসের পরে নেমে আমার সঙ্গে যেন পড়া মুখস্থ করছে—

'ব্রীক ইট, ব্রীজ পুল, মন্থ মাস, স্কুল ইস্কুল'

ঘর কাঁপিয়ে রেলগাড়ি বেরিয়ে যায় স্টেশনের নাম মুখস্থ করতে করতে—ডানকুনি বাগনান, ডানকুনি বাগনান। আমিও তেজে মুখস্থ বলি—

'ময়দা ফ্লাউয়ার, বোকা ফুল,
ডককে বলে বন্দর, ওর্ককে বলে কাজ,
লিপ হল লাফ, শিপ হল জাহাজ,
হিমগিরি ইমোলোইয়াস, লঙ্কা চিলি,
টেমারিণ্ডিকা তিন্তিড়ি,
মেকাপকে বলে সাজ,
সাজাকে বলে পানিশমেণ্টো,
সদাগর মারচেণ্টো, মোচার ঘণ্টো, নো ইঞ্জিলী
—ইতি রুল অব্ থ্রী।'

রুল অব্ থ্রী—রুল—অব্—থ্রী—রু-রুন বাঁশি শুনলেম ইস্টিমারের, বিগুল শুনলেম কেল্লার মাঠের, তুসু-জুজু জুজু-তুসু। তারপরে আর সান নেই, একেবারে ঘোরতর স্বপন। ট্যাঁক হাতড়াচ্ছি পয়সা দেব, ট্যাঁক খুঁজে পাচ্ছি নে; কোথায় আছি বোঝা দায় হোটেলে না মুদিখানায়।

পেট চাপড়ে বোঝাতে চাচ্ছি খিদে লেগেছে, পেট আর খুঁজে পাচ্ছি নে। পেটের ছাঁদ কনভেক্‌সিটি না কনকেভিটি, সিটি আর মনে পড়ে না। সিটি কলেজ, ইউনিভারসিটি, মিউনিসিপালিটি, পোকা-মাকড়ে দাঁত খিটিমিটি দিলে খানিক, তারপরেই এল মেডিক্যাল ফ্যাকালটি। বিদ্যুৎপ্রকাশ অকস্মাৎ। দেখি না পুকুরঘাটের কাছেই জলে পড়ে আছে খুঁটেবাঁধা চকচকে দুয়ানি। তুলতে যেতে হাত পিছলে পালাল। 'কড় কি কড় কি' ডাক দিল কোলাব্যাঙ। ঘেটো রাঘব বোয়াল খুঁটসুদ্ধু দুয়ানি মুখে পুরে কড়বলাং ঝম্প দিয়েই ডুব মারল। থিরজলে গণ্ডির পরে ভাই লক্ষ্মণের গণ্ডি—চৌকা পুকুর হয়ে গেল গোল চশম। হঠাৎ ফিসফিনিস্ বলে কানের ছাঁদায় মশা ঢুকে পড়ে—ব্যস। চটকা ভেঙে কান ঝাড়তে ঝাড়তে খাতা ফেলে দে দৌড়, মোচা চিংড়ি চড়িয়েছে যেখানে চাংড়াদি।

এমনই প্রায়ই কোনওদিন ঠেকে যাচ্ছে পড়া মোচার ঘণ্টতে, কোনওদিন গুড়-অম্বলে, কাঁটা-চচ্চড়িতে, ডাঁটাসিদ্ধতে, কখনও বা হাঁসের ডিমের কালিয়াতে। চাঁইবুড়ো চাঁপাতলার ঘাটে ছিপ ফেলে বসে আমাকে আড়চোখে দেখে বলেন, 'আজ কিসের হাঁড়িতে বিদ্যের জাহাজ তলাতে চললে হে অবুবাবু?'

আমি রোজই বলি, 'সুক্তোর হাঁড়িতে, চাঁইদাদা।'

চাঁইবুড়ো অমনই শোলক আউড়ে দেন ছিপ গুড়িয়ে—

'শুক্তায় মুক্তা, ডিম্বের মধ্যে হাঁস,
ডুবুরি হই তো তুলি, তলাক না জাহাজ।

চলো দাদা, দু'টো ডুব দিয়ে বসা যাকগে পাতে।'

চাঁইবুড়ো মন্তর পড়েন, পুকুর জলে দাঁড়িয়ে—'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ—যাবৎ পিবেৎ তাবৎ জীবেৎ'। দু'চার কুলকুচি, দু'টো ডুব, দু'পাক ডুবসাঁতার, একপাক চিৎসাঁতার খেয়ে পৈতে মাজতে মাজতে ঘাটে ওঠা হয়, রোদে-জলে-তেলে পিতলাই হাঁড়ার মতো চাঁইবুড়োর পেটটা চকচক করতে থাকে।

আমি বলি, 'চাঁইদাদা, যে মন্তরটা জপো তার মানে কী?'

'মন্তরের মানে ভাঙতে নেই দাদা, গুরুর নিষেধ আছে।' বলে গামছা নিঙড়োতে নিঙড়োতে চলেন আর হাঁক পাড়েন বুড়ো, 'রান্না হল গো? আর কত দেরি? একবাটি ঘি বেশি দিও অবুবাবুকে।'

এমনই রোজ দুপুরবেলায় মাসির বাড়িতে চাঁইদাদার বাসাঘরে ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণ মুখস্থ করে কাটাচ্ছি। এক একদিন রোদ ঝাঁঝাঁ দুপুরবেলায় শালিক পাখির ছানারা কপচাতে শেখে প্রথমপাঠ—'কীট কীট কিড়িং'।

তক্তার পরে চাঁইবড়ো তালপাতার পাখা চালেন আর বলেন, 'পাখিগুলো কি বলছে বলো তো, অবুদাদা।'

'ওরা কবর্গ মুখস্থ করছে। কীট মানে কিড়িং।'

'অ্যাঃ, এও জান না? ওরা কিট কিট খেলছে গাছতলায়। কাঠঠোকরা কি করছে শুনে বলো তো দেখি।'

'ওরা কে জানে কি করছে।'

'বুঝলে না, ওরা কোটরে বসে কাঠের তক্তিতে ক খ না লিখে টুকটাক খেলাচ্ছে হে অবু। ওরা কেউ পড়া মুখস্থ করছে না। ওরা জানে পড়া নয়, দইবড়া মুখস্থ করতে হয়।'

'তুমি কেমন করে জানলে, চাঁইদাদা?'

'শকুনবিদ্যের জোরে।'

'আমাকে শকুনবিদ্যে শেখাও না।'

'ক্রমশঃ প্রকাশ্য ভাই। আগে বোবিদ্যেতে তোমার নাক দোরস্ত হোক।''

'সে কবে হবে? হবে তো?'

'অভ্যেস কর, কেন হবে না। এখন বাগানের ওপারে বসে চাংড়ার রান্নার খোশবো পাচ্ছ, এরপর রেলরাস্তার ওপার থেকে পাবে।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি! দক্ষিণেশ্বরে আমার শ্বশুরালয়ে চাংড়া চড়াত হাঁড়ি, গঙ্গাপারে উত্তরপাড়ার টোলে বসে পেলেম তার খোশবো। খেয়ানৌকো ধরে বসলেম গিয়ে ষষ্ঠিবাটার ভোজে।'

'এমন?'

'হাঁ ভাই, এমন যখন হবে তখন জানবে বোবিদ্যের বি. এ. পাস হলে।'

'তোমার চেয়ে বোবিদ্যেয় বেশি পাস করেছে কেউ?'

'করেছে বৈকি? গন্ধগোকুল এ বিদ্যের এম. এ., মৌমাছি পোস্টগ্রাজুয়েট পর্যন্ত ঠেলে উঠেছে। বোবিদ্যেয় পুরো দখল পেয়ে গেছে অনেক কৃষ্ণের জীব ভাই।'

বলেই চাঁইবুড়ো পাঁচালি আওড়ালেন—

'তাই না আসে বাদুড়ছানা না পাকতে তেঁতুল,
কলা না পাকতে আগে থাকতে বাগানে পড়ে লেঙুর,
মালী না জানতে জেনে নেয় কাঠবেড়াল
কোন ডালে লিচু হল বলে লাল,
কোন ডালে ঝোলে নারকোলে কুল;
মালী জেগে দেখে খ্যাঁকশৃগাল
রাতারাতি টপকে আল
বেগুনের খেত করেছে নির্মূল।

এইবার বুঝলে তো দাদা?'

'বুঝেছি।'

'কই, বুঝিয়ে বলো কেমন বুঝেছ দেখি।'

'রোসো বুড়োদা, ভেবে বলছি। বো=বাস, বাস=সেণ্ট=খোশবো।'

'হাঁ, ওই বিদ্যেয় কৃষ্ণের জীবমাত্রে পাকা হয়ে ওঠে মানুষের আগেই।'

'না বুড়োদাদা, তোমার হিসেবে ভুল আছে।'

'শুনি কেমন ভুল।'

'বলি বুড়ো দাদা—

১. প্যাঁচা আর ছুঁচা দুজনে বেরোলো রাতের ঘোরে,
বুড়ো ছুঁচা পড়ে গেল কেন
খপ করে কালোপ্যাঁচার খপ্পরে?
২. শেয়াল বেরোলো গন্ধযুক্তি ধরে পাহারা হেঁকে
পাকড়াও করলে সহজে পাতিহাঁসটাকে
দাঁতিয়ার খাল বেঁকে।

এমনটা হয় কেন কৃষ্ণের জীবের বিদ্যে যদি সমান হয়?'

'আহা দাদা, এটাও বুঝলে না, ছুঁচোটার নাক তার নিজের গায়ের বিকট গন্ধে নস্যিঠাসা, প্যাঁচার গন্ধ পায় কখনও?'

'পাতিহাঁসের ছানাগুলো—'

'ওঃ, তাদের পুকুরে নেয়ে ছর্দি লেগে নাক বন্ধ ছিল, প্যাঁক্ করতে সময় পেলে না।'

এমনই শকুনবিদ্যের পাঠ দিতে দিতে চাঁইবুড়োর নাকডাকা শুরু হয়ে যায়—'যাক থাক থাক প—ড়—আ'। কামানের গাড়ি, তারপরে সরু সুরে সাইরিন—'শুঁ শুঁ শুঁই শাঁই'।

রোদ উঠোনের আড়াই ভাগ ছেড়ে দিয়ে পশ্চিম দেওয়ালে লাগে, আমিও সরি চাংড়াদির কাছে বিদ্যে ফলিয়ে টিফিন আদায় করতে।

'জানো চাংড়াদি, আমি বোবিদ্যে সাধন করেছি? বাগানের ওপার থেকে তোমার রান্নার গন্ধ পাই। চাঁইদাদা বলেছেন শিগগিরি বোবিদ্যেয় বিয়ে পাস করব ফাস কেলাস।'

'ও দাদা, যেদিন বোয়ের হাতের চাপড়ঘণ্ট খেয়ে বলতে পারবে, তাতে কতভাগ তেল, কতভাগ লঙ্কা, কতভাগইবা গুড়, তখন জানবে পাস করলে—ফাস কেলাস খাস গেলাস। আগে নয়, জেনে রাখো।'

'চাঁইদাদু এ পরীক্ষায় পাস করেছিল, শুধিয়ে নেব তো—'

'ও মা ছিঃ, এ কথা শুধোতে নেই। বুড়ো চটে যাবে। বলবে, ছেলেমানুষকে জ্যাঠামো শেখানো হচ্ছে। রেগে শেষে খড়মপেটা করে হয়তো—'

'হয়তো কি করবে, চাংড়াদি?'

'হাতের হাড় এমনই গুঁড়িয়ে দেবে যে আর কোনওদিন হাতা বেড়ি ধরতে হবে না, রান্না চড়ানো জন্মের মতো ঘুচিয়ে দেবে।'

'তাহলে এ কথা তুলে কাজ নেই, কি বল?'

'দেখো, ভুলেও যেন এ কথা প্রকাশ না হয়—যা জানলে তুমি।'

'আমি আর জানলেম কী? তুমি শুধোতেই দিলে না।'

'দুঃখ কোরো না দাদা, বদলে সাতখানা আকের টিকলি নিয়ে লক্ষ্মীটি হয়ে নিজের ঘরে যাও। বুড়োকে আর ক্ষেপিয়ো না। খড়ম তো খড়ম, আবার যদি ভাস্কা লাঠি বেরোয় তো তুমিও গেছ আমিও গেছি।'

'ভাস্কা লাঠি! সে কেমন?'

'আবার সে কেমন! তুমি দেখছি ফ্যাসাদ বাধিয়ে ছাড়বে। ভাস্কা লাঠির কথা তুলো না যেন বুড়োর কাছে।'

'কেন?'

'আবার কেন? মানা করছি তুলতে। নাও আকের টিকলির সঙ্গে কুঁচো গজা একমুঠো—লক্ষ্মীটি হয়ে ঘরে যাও।'

মাসির কথামতো দুলালকে পত্তর দিয়েছিলেম কেষ্টনগর যাব কিনা পরামর্শ নিতে। জবাব এল, দুলাল লিখছে, শ্রীশ্রীদুলাল ওরফে রামদুলাল লিখছে—

'অত্র অমঙ্গল বিশেষ। মাসিমাতা-ঠাকুরানী পাড়া ছাড়িয়া যাওয়াবধি শহরে তুসু-জুজুর ভয় অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। শহরে লোক তিষ্ঠিতে পারিতেছে না, নচেৎ তোমাকে বলিতাম শহরে আসিয়া তোমার নিজের গড়া পুতুলের একটা প্রদর্শনী খুলিতে। কিন্তু দেখিতেছি ফেলার মা'র ফেলাকে লইয়া বিপদ—তাহারা বাসা উঠাইয়া অন্তর্ধান করিয়াছে, কুত্র তাহা জানা নাই। কেহ বলিতেছে তাহারা মাসির বাড়ি গিয়াছে, কেহ বলিতেছে অন্য প্রকার। কবিরাজ বলিল, যাইবার কালে ফেলা বারবার বলিয়া গেল, 'নসিব ডেকেছে'; তিনি স্বকর্ণে ইহা শ্রবণ করিয়াছেন। ব্যাপার কিছু জটিল বোধ হইতেছে। তমি লিখিয়াছ মাসিমাতা-ঠাকরানী তোমাকে কেষ্টনগরে আর্টশিক্ষার জন্য পাঠাইতে চাহেন। ইচ্ছা হয় যাইতে পার, কিন্তু বলিয়া আমি খালাস, যথা—

সেখানে মাটিতে গড়বে ঠিক সন্দেশ,
ঠিকঠাক সরভাজা, খৈচুর, জিবেগজা—
বোধ হবে দেখে রসে ভিজে,
মুখে দিলেই বুঝবে কানা যা ভেবেছিল তা না—
পাতখোলার মতোও না খেতে সরেস।
—জলসাই দুলাল।

এরোড্রম সিনেমা, ট্রেঞ্চ গার্ডেন, ডিস্টিক গাঞ্জাম। পত্র দিও। ইতি—

অবুবাবু—
মাসিমাতার বাসা, গুপ্তনিবাস,
পোঃ আলমবাজার, বরাহনগর, বেলঘুরিয়া।
পুনশ্চ—মোলায়েম মুনশির দেওয়া পুঁথিখানি আমার নিকটে ছিল, অত্র সহিতে ফেরত দিলাম।'

ব্যস। চুকে গেল কেষ্টনগরের ল্যাঠা। দুলালের চিঠিখানা বালিশের তলায় রেখে মোলায়েম মুনশির পুঁথি নিয়ে থাকলেম—

'পুকুরে ভরিছে জল, আঁখি ঝরায় পানি।
প্রাণরূপী পানকৌটি ডুবে মরে জানি।।'

পড়তে পড়তে চোখে জল আসে। পাতা ওল্টাই উর্দু ফ্যাশানে—ডাইনে থেকে বাঁয়ে না বাঁয়ে থেকে ডাইনে, ঠিক করতে পারি নে। পড়ে যাই—

'কুমার কুসন্ত কাচ বিশেষ বিকাশ।
কান্দন শুকাত্রিক কিবা ভুবন প্রকাশ।।
মঙ্গল পঞ্চসিমউচ্ছ হয় মহাসুখ।
মুঞি অতি ভাগ্যহীন, মরমে মোর দুখ।।'

মানে না বুঝেই কান্না পায়—

'ভাব সুখ খঞ্জরীট কুটায় সানন্দ।
ভেলা ভক্তি মিলনে করুণ অতি বন্দ।।'

গোটা গোটা অক্ষরে ছাপা পুঁথি; পড়তে কষ্ট নেই, মানে বুঝতে কথায় কথায় মিনিং বুক কনসল্ট করায় না; পড়তে পড়তেই হাসি পায়, কান্না পায়, পেটে খিল ধরে, চোখের জল গড়িয়ে পড়ে, ঘাম ছোটে; কেচ্ছা শেষ, জ্বরও ছাড়ে।

নতুন কেচ্ছা শুরু হয়, বেগুনা বেগম দম্পোক্তি চড়িয়ে ফোছনৎ মিঞার জন্যে হাহুতাশ করে চলছে—মন উদাস হয়ে গেছে, বুক ধড়াস ধড়াস করছে। হঠাৎ মাসি এসে উদয় টিনের ঘরে।

'কি পড়ছিস, অবু? চোখ ছলছল করছে কেন? আয় তো দেখি কপালটা, একটু যেন গরম ঠেকছে।'

'ও কিছু নয় মাসি, অনেকক্ষণ ধরে পুঁথি পড়েছি কিনা।'

'পুঁথি পড়তে পারিস?'

'পারি, কিন্তু সব পুঁথি নয়। বটতলার পুঁথি পারি, কলুটোলার নয়।'

'এমন হয় কেন?'

'মাসি, বটতলার পুঁথি গোটা গোটা কাঠের টাইপে ছাপা। আর কলুটোলার কলে ছাপা পুঁথি—রোগা রোগা অক্ষর, পড়তে মাথা ধরে যায়, পিঁপড়ের সারি যেন সব অক্ষর বিজবিজ করে পাতায়, একরকম চেহারা। বটতলার পুঁথি তেমন নয়।'

'তুই এখন কি পুঁথি পড়ছিলি?'

'মসল্লম মসল্লা, মোলায়েম মুনশির লেখা।'

'আচ্ছা, ছবি দিয়ে মাসিকপত্তর যেগুলো বেরোয়, সেগুলো?'

'ছবিগুলো পড়তে পারি, প্রবন্ধগুলো নয়। থিয়েটারের বাংলা উর্দু ইঞ্জিলী খুব চক করে পড়তে পারি, বুঝতেও পারি।'

'তোর নিজের লেখা ছবি পড়তে পারিস?'

'চেষ্টা করিনি মাসি, হয়তো পারি।'

'পুতুল যা গড়িস যে সব পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, দ্বিপদ চতুষ্পদ—ওদের?'

'ওদের আর পড়তে হয় না মাসি, গড়ে ছেড়ে দিতেই ওরাই পড়তে থাকে নানা বুলিতে নানা কথা; আমি খালি শুনি মজার মজার কল্পকথা, গল্পকথা।'

'দু'চারটে কথার নাম বল না শুনি।'

'এই যেমন, হজ ফেরত উটের কথা, গানবন্ধ পাখির কথা, টোটাচোর ইঁদুর ঝাঁটাখোর বেড়ালের সংগ্রাম, জস্টিস অ্যান্টিফোজেস্টিনের জীবনচরিত, আমজাদ উজির ও ব্যান্ডমাস্টার, মিস বেলা কাউটের দাস্তান, ঝারার পাখি কাব্য, তাম্বাক অসুরের দরবার।'

'আমার ভারি ইচ্ছে করে এমনই সব কথা শুনতে।'

'মাসি, চাঁইদাদুকে বল না কেন, সন্ধেবেলা তোমাকে পুঁথি পড়ে শোনায়।'

'বেই যে কার্তিক মাস ছাড়া পুঁথি ছোঁবেন না। আমি একটা কথকপুতুল গড়াব কেষ্টনগরে ফরমাশ দিয়ে। সে কথা কইবে, আমি রোজ শুনব।'

'সে কি হবে, মাসি? কথকপুতুল যেন কত কথকতা করছে এই ভাব দেখিয়ে বসে থাকবে তাক জুড়ে। মাসি, সে হবার জো নেই, আমার পুতুল সব সেই বত্রিশ সিংহাসনের পুত্তলিকাদেরও কথার আগেকার, তারও আগেকার কথা কয়, আবার আজকের কথাও কয়; কথক সেজে বসে থাকে না। আমার ডাবুকে দেখনি, মাসি?'

'না।'

'ভারি মিষ্টি কথাগুলি বলত সে। তার একটি হাত ছিল না, মাসি; ডাবগাছ থেকে তুসু-জুজু তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল।'

'কোথায় সে এখন? দেখা না।'

'তাকে ঘাটশিলায় কাবুলিদের কাছে হাওয়া বদলাতে পাঠিয়ে দিয়েছি। তুসু-জুজুর রাগ আছে তার উপর, এখন আর আনব না। সে তো তোমার ঘরের তাকেই শুয়ে থাকত, দেখনি?'

'না তো, অবু।'

'আর লাট্টুরামের ভাইঝি?'

'তাকে দেখেছি।'

'তার নাম, মাসি, সেঁদুরীয়া বাই।'

'তা তো বলেনি সে।'

'তুমি শুধোলেই বলত। লাট্টুরাম মাসে লাখটাকার লাটিম আর কাটিম গড়ে চালান দেয় বর্মা থেকে চীনেতে সুতোর কলের জন্য; তুসু-জুজু তাদের গদি পুড়িয়ে মেয়েটাকে ফতুর করে ছেড়েছে। রাজমহিষীর টাকা ছিল সেঁদুরীয়ার। ওকে তোমার দয়া হবে ভেবে আশ্রয় দিয়েছি অনাথা বলে, সব নিচের তাকে, তোমার ঘরের দেয়ালে। ভাল করিনি, মাসি?'

'তা ভাল করেছ; কিন্তু উট ঘোড়া এ সব এনে আমার ঘরে ঢুকিও না।'

'তা কি পারি, মাসি? তাদের জন্যে আলমারির তাকে আস্তাবল পিঁজরাপোল আছে, তাতেই থাকে তারা। আর সব পুতুল নম্বরওয়ারি ঘরে থাকে—আলমারির গায়ে লেখা আছে ভোজ বিলডিং।'

'তুমি বুঝি তাদের বাড়িওয়ালা?'

'না মাসি, আমাকে তারা ডাকে ল্যাণ্ডলর্ড বলে।'

'কত ভাড়া আদায় হয় মাসে বাড়ি থেকে?'



'সে কি মাসি, তারা কি বাইরের কেউ যে ভাড়া চাইব? এরা সব আমার কুটুমকাটাম। তুমি চাও আমার কাছে এই ক্যাবিনভাড়া?'

'না চাইলেই দেবে তুমি অবুচাঁদ? দেখ অবু, পুরনো বাড়ি ছাড়বার সময় রোগশয্যেতে পড়ে আমি ঠাকুরকে ডেকে বলেছিলেম, প্রভু, যেখানেই যাই কেন উদয়-অস্ত চাঁদ-সূর্যির আলো পাই; আর সেখানে খেলাঘরে অবু আমার হেসে খেলে বেড়াবে দেখব।'

'তুমি যেমনটি চেয়েছিলে তেমনটি তো দিয়েছেন ঠাকুর, মাসি?'

'দিয়েছেন অবু। দেখ, প্রথম প্রথম এখানে এসে দেখতুম সারা দিনরাত সামনে দিয়ে রেলগাড়ি যাচ্ছে আসছে কত লোক নিয়ে; তখন মনে হত হায়, এই পথ দিয়ে আমার বাড়ি যাবার গাড়ি আর আসবে না। তারপর একদিন এই ঘরের দাওয়াতে বসে একলা, চাঁদ ছিল না আকাশে, তুইও ছিলি না কাছে, সেইকালে হাওয়া এসে যেন পর্দা সরিয়ে দিলে চোখের উপর থেকে, দেখলেম, আমি আমার সেই বাড়িতে বসে আছি।'

'মাসি, এখানে সেই বাড়িরই হাওয়া বইছে! আমি তো এখানে এসেই বলেছি তোমায়—সেই বাড়িই এটা মাসি; মিছে তুমি উতলা হও নানাখানা ভেবে।'

'আর ভাবব না অবু, তোর কথাই ঠিক।'

'মাসি।'

'অবু।'

পশ্চিমবাগানের উপরে আকাশে ধরল চম্পাই রং; পুবধারে পুকুরের পারে শিশুগাছ নতুন পাতা ছেড়েছে। তারই ফাঁক দিয়ে উঠল চাঁদ; পুকুরজলে তার ছাওয়া। শালুক পাতার কিনারায় যেন মাসির পোষা সাদা হাঁসটি ঘুমিয়ে যাবার আগে গা ভাসিয়ে চুপ হয়ে আছে। চাঁদের আলো পাতার ছাওয়া মাড়িয়ে মাসি চলে গেলেন নিজের ঘরে। যেন শ্বেতপাথরের পুতুল বাগান ঘুরে ঘুরে মিলিয়ে গেল চোখের আড়ালে। মাসির ঘরের আজন্ম চেনা কতদিনের ঘড়ি সুর পাঠালে, যেন একটি ছোট্ট মেয়ে সোনার মন্দিরাতে ঘা দিয়ে দিয়ে থামল।

বনলতা

'আচ্ছা মাসি, তুমি যে সেদিন বললে আমার মতো তোমার আর একটি ছিল, কই মাসি, তার কথা তো আমায় শোনালে না?'

'তার কথা তুমি তো শুধাওনি, অবু।'

'আজ শুধোচ্ছি।'

'আচ্ছা, কাছে বোসো, বলি। দেখো অবু, তুমি যেমন আমার দিদির ছেলে, তেমনই, আমাকে যে দিদি বলত তার কথা শোনো বসে থির হয়ে।'

'মাসি, তোমাকে যে দিদি বলত সেই তোমার ছোটবোনের নাম কি ছিল, মাসি?'

'সে আমার মায়ের পেটের বোন ছিল না, অবু; তোমার মা আর আমি দুই বোন।'

'তবে?'

'সে আমাকে ভালবেসে ডাকত দিদি বলে।'

'তার নাম?'

'বনলতা।—হাঁ অবু, এত খবর জানতে চাও কেন? চুপ করে শোনো, বলি।'

'মাসি, বনলতা ডাকতেন তোমায় দিদি বলে? আমার মনে হচ্ছে আমি দেখেছি তাঁকে খব ছোটবেলায়।'

'না অবু, তুমি আসবার আগেই সে চল্ গেল।'

'কোথায়?'

'রাজবাড়িতে।'

'আর ফিরল না?'

'না। আর ফেরেনি বনলতা।'

'বেশ নামটি।'

'জানো অবু, রাজার ভাই তাকে বিয়ে করে নিয়ে চলে গেল। সেখানে বনলতা নাম পালটে রাজপরিবারের সবাই তাকে অন্য নামে ডাকতে থাকল।'

'তার দরকার কি ছিল, মাসি? বনলতা তো বেশ নাম ছিল।'

'ওকে বলে রাজকায়দা। আদরের নাম উল্টে বিজলিবাতির মতো জমকালো নামই পছন্দ করলেন বুড়োরানী,

বড়রাজা, বড়বউরানী সবাই। রাজবাড়িতে গিয়ে বৈদুর্যলতা নাম হল বনলতার; ফুলশয্যার রাতের গহনাগাঁটির ঝকমকানি দিয়ে গড়া নাম।'

'কি করকরে নাম বৈদুর্যলতা, মাসি! বনলতার কথা বলো।'

'তাই বলব অবু, কিন্তু তুমি কথার পর কথা চাপা দিলে বলতে পারব না।'

'ব ন ল তা। আচ্ছা মাসি, তুমি যখন আমার মায়ের কথা বল তখন তোমার কথার ফাঁকে ফাঁকে মাকে দেখতে পাই। বনলতার বেলায় তেমনটি হয় না, তাই তো বারে বারে শুধিয়ে চলতে হচ্ছে—কে ছিল কেমন ছিল সে মানুষটি।'

'সে যেই থাক, শোনো থির হয়ে। তোমার বয়সে আমাকে ডেকে বাবা একদিন বললেন, 'দামিনী, এই তোর ছোটবোন বনলতা।' সেই থেকে বনলতা রইল আমাদের ঘরের মানুষ হয়ে। আমাকে সে জানল তার দিদি বলে। একটি কথাও শুধোতে হয়নি বাবাকে, বনলতা কার মেয়ে, কোথা থেকে এল।'

'মাসি, আমার মা তাকে দেখেছিলেন?'

'না।'

'কেন?'

'অবু, এইখানকার কথা এইখানেই রইল। যাও খাওয়া-দাওয়া কর।'

'না মাসি, আমি আর কোনও কথা তুলব না, সত্যি বলছি।'

'দেখো অবু, কথা খেলাপ না হয়।'

'অবু, তুমি আমাদের ঘরে আসবার আগে এসেছিল সে বনগাঁ থেকে জয়নগরে বাবার কোলে চেপে ঘুমন্ত এতটুকখানি ফুটফুটে একটি মেয়ে—বনলতা। সে যখন চোখ মেলে চাইত, দেখতেম যেন চাঁদের আলো দুটি পাতার ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে, ভারি সুন্দরী ছিল মেয়েটা। বাহারবন্ধ পরগনার বজরা যেদিন এল তাকে নিতে সেদিনের তার চোখের দৃষ্টি আমি ভুলব না কোনওদিন। সে বললে, 'দিদি, আমি তবে আসি।' আমি তাকে বকে আগলে কেবলই কেঁদে ভাসালাম। 'আসি' এই কথাটি বলে সে গিয়েছিল, অবু; কিন্তু দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস, রয়ে গেল সে বাহারবন্ধ পরগনার রাজাদের অন্দরেই বন্ধ। বাবার মুখে শুনলুম তাদের অন্দরের বন্ধখানায় যে মেয়ে যায় সে যায়, আর ফিরে আসতে পারে না; আপ্তজনের সাথে দেখাশোনা বন্ধ।'



'তুমি তো তাকে দেখতে যেতে পারতে, মাসি।'

'না অবু, সেও হবার জো ছিল না।'

'কেন মাসি?'

'তাদের রাজকায়দায় বাধত। আমরা কেউ যেতে পাব না এই জেনেশুনেই বনলতার খুড়ো তাকে রাজার ঘরে বিয়ে দিয়েছিল।'

'তারপর, মাসি, কি হল? আর কোনওদিন তার খবর পেলে না বুঝি?'

'খবর আসত, অবু, গহনার নৌকোতে মহাজনের গোমস্তার কাছ থেকে। যখন জয়নগরের ঘাটে লাগত

ফিরতি নৌকো বাহারবন্ধ থেকে ব্যাপারিদের নিয়ে, কত কথাই না বলত তারা—ভাল মন্দ, সুখের দুঃখের, সেখানের ছোটরানীর। শুনতেম আর কাঁদতেম, আর মনকে প্রবোধ দিতেম নানা কথা ভেবে।'

'এমন জায়গায় কেন পাঠালে তাকে বিয়ে দিয়ে, মাসি?'

'বনলতার খুড়ো যে রাজাদের গরিব আত্মীয় ছিল, অবু।'

'তোমাকে তো তিনি দিদি বলতেন।'

'অবু, মাসি বলে যে জোর তোমার উপর করতে পারি, দিদি হয়ে সে জোর কি খাটে, অবু?'

'তারপর কি হল, বলো।'

'তারপর অনেক সাল পরে এল একখানি ফটো, বনলতার কোলে একটি একমাসের খোকা। ফটোর উলটো পিঠে বনলতার হাতের লেখা—দিদি, আমার খোকাকে পুষ্যি নিয়ে এরা রাজগদি দিতে চাইছে, আমাকে আর খোকাকে লুকিয়ে তুমি জয়নগরে নিয়ে রাখো লক্ষ্মীটি; আমি তোমার কাছে গেলে নির্ভয় হই।'—বাবাকে দেখালেম লেখাটা, বাবা বললেন, 'উপায় নেই দামিনী, এত সহজ ভাবিসনে তাকে নিয়ে আসা। বাহারবন্ধ বাড়ি তাদের, বেরিয়ে আসার কপাট খুলে বনলতাকে মুক্তি দিতে তোরও নেই আমারও নেই সাধ্য।' '

'মাসি, তুমি আমাকে পাঠাও, আমি সেই অসাধ্যসাধন করব।'

'ভাবিস নে অবু, ছেলের জন্যে কেঁদে কেঁদে বনলতা অনেকদিন হল তোর মাকে বড়দিদি বলতে চলে গেছে রাজবাড়ি ছেড়ে। দুঃখ করিস নে।'

'মাসি, বনলতা মাসিকে আমার ভারি দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

'ছবিতে দেখাব একদিন, আজ মন ঠাণ্ডা করে পড়তে বস গে।'

হাতে খড়ি

'মাসি, তুমি তো চমৎকার ছবি আঁকতে জান? কার কাছে শিখেছিলে আঁকতে, নন্দদার কাছে, না মুকুল দের কাছে, অসিতবাবুর কাছে, না দেবীবাবুর কাছে?'

'অবু, আমার আঁকা ছবি তুমি দেখলে কোথায়?'

'যদি না ধমকাও তো বলি।'

'বলে ফেল, ধমকাব না।'

'চাংড়াদিদি দেখিয়েছে ঠাকুরঘরে কুলুঙ্গিতে একটি টিনের বাক্সের মধ্যে তোলা ছিল লাল সুতোয় বাঁধা সোনার তাবিচ। তার মধ্যে কাচের ঢাকন দেওয়া দু'টি মুখ—একজন বাঁশি বাজাচ্ছে আর একজন চেয়ে দেখছে তার দিকে।'

'অবু, সে ছবি দেখেছ তুমি?'

'চাংড়াদিদি ঢাকন খুলে দেখালে তাই তো দেখলুম; বললে, এ তোমার মাসির মা-বাপের ছবি, ছেলেবেলায় তুমি এঁকেছিল। বলো না মাসি, কে তোমায় আঁকতে শিখিয়েছিল।'

'চাংড়াদিদিকে শুধোলে না কেন, অবু? বলে দিতেন যিনি শিখিয়েছিলেন তাঁর নাম।'

'তুমি বল না।'

'না অবু, গুরুজনের নাম মনে মনে জপ করতে হয়, মুখ ফুটে বলতে নেই।'

'আচ্ছা, চাংড়াদিদিকে শুধিয়ে জানব।'

'শোনো অবু, ছবি আঁকা যদি শিখতে চাও—নন্দদার কাছে, কি অসিতবাবুর কাছে, কি মুকুল দের কাছে শিখতে যেতে চাও তো বলো আমি পত্তর দিয়ে তোমাকে পাঠিয়ে দেব বিশ্বভারতীতে, নন্দদা ছবি আঁকতে শেখান খুব ভাল।'

'না মাসি, তোমাকে যিনি শিখিছিলেন তাঁকে পাই তো তাঁরই কাছে শিখি।'

'তিনি যে অনেক দূরে গেছেন অনেক দিন হল। এখন আমার কাছে শিখবি, অবু?'

'শেখাও তো শিখি, মাসি।'

'তবে চাঁইবুড়োকে বল গা একটা ভাল দিন দেখতে। তোর হাতে খড়ি দিতে হবে।'

'ওরে বাবা, ও মাসি, আবার হাতে খড়ি ক খ এইসব লিখে আরম্ভ করতে হবে?'

'তা হবে না, অবু? ছবিও যে লেখার সামিল।'

'থাক মাসি, তুমি তোমার ছবি লিখতে শেখার গল্প বলো, আমি শুনি। সেলেট-পেনসিল খড়ি-তক্তি কাগজ-কলম এসব হাতে নিলেই আমার ঘুম পায়।'

'তবে চুপ করে বসে শোন না বলি—দেখ অবু, আমাকে যে সবাই মাসি বলে ডাকে তার কারণ হচ্ছে আমার ডাকনাম ছিল পূর্ণমাসী। সেই থেকে আজ পর্যন্ত সবাই আমাকে মাসিই বলে আসছে। বাবা তখন নেই, মা আছেন। তোমার বয়সে একদিন মা বললেন, 'পূর্ণমাসী, শোন, আমার একটি কথা রাখবি?' আমি হাঁ না কিছুই বলি নে দেখে মা বলে চললেন : 'জানিস ছোটবেলায় তুই ছবি দেখতে চাইতিস। বাইরের ঘরে একটা কি জানি কি কল ছিল তাতে চোখ দিয়ে বসলে কত দেশ-বিদেশের ঘরবাড়ি বাগান সব রঙিন ছবির মতো দেখা যেত। সে এক দিনের কথা, সেই কল নিয়ে তোকে নাড়াচাড়া করতে দেখে তোকে ভারি ধমকাই; দস্যি মেয়ে বলে পিঠে কিল বসিয়ে অন্দরে বন্ধ করি। সেই থেকে তোর মুখ দেখলেই কে যেন আমার মনে এসে ঘা দিয়ে বলে, ওকে ছবি আঁকা শেখানো চাই তোমার। কে এ কথা বলে তা বুঝি নে—অবোধ নারী। বেঁচে থাকতে তিনিও এই কথাই বলতেন। হয়তো এ তাঁরই হুকুম, আসে যায় এখনও, কে জানে। পূর্ণমাসী, বল তুই আঁকা শিখবি?'—'শিখব, মা'।'

'মাসি, তুমি যে ছোটমাসি বনলতার কথা বলতে বলতে সেদিন বললে তোমার নাম ছিল দামিনী?'

'অ, অবু, সেইটে বুঝি তুমি মনে করে রেখেছ। শোনো তবে বলি সে যে কাণ্ড হয়েছিল। বিয়ের রাতে ওই পূর্ণমাসী নাম নিয়ে মন্ত্র পড়তে গিয়ে আমার বর বেঁকে বসলেন, 'আমি মাসি বলে একে ডাকতে পারব না। পূর্ণমাসী নামটা যেন মাসি মাসি শোনায়।' সেই রাত্রেই আমার নূতন নাম দামিনী দিয়ে বাপ আমাকে সম্প্রদান করেন।'

'এমন? আচ্ছা বলে যাও, মাসি।'

'মা বিলাসী দাসীকে ডেকে বললেন, 'চৈতনকে বল, তসবির-কামরা খুলিয়ে ঝাড়পোঁছ করিয়ে রাখে, আমি সে ঘরে পূর্ণমাসীকে নিয়ে ছবি দেখাব।' আমি বললেম,'মা, ছবি লিখতে শেখাবে যে সে থাকবে না?' মা বললেন, 'পরে আসবে শিক্ষক, আগে নিজে নিজে দেখে শিখবে, তারপরে অন্যের কাছে বিদ্যে নিতে যাবে'—'

'আমারও ওই মত, মাসি। তারপর?'

'তারপর তো মায়ের সঙ্গে সঙ্গে বৈকাল উতরে সাজগোজ করে ছবির ঘরে গেলেম। পুরনো বাড়ির সে ঘর তো তুমি দেখনি, অবু—'

'দেখেছি বইকি মাসি, সেই বাড়ির দখিন ধারে লম্বা ঘর, না উত্তর ধারে।'

'না, তাও না, পশ্চিম বারান্দার ঠিক সামনে।'

'সে তো আমাদের পড়বার ঘর ছিল। তাহলে আমি দেখিনি মাসি, তুমি বলো।'

'সে ঘর ছিল যেখানে সেখানটা হয়ে গেছে এখন লোপ, খালি আছে একখানা ভাঙা কপাট ইটখসা একটুখানি দেয়ালে ঝুলে।'

'দেখেছি মাসি, আমি সে জায়গা দেখেছি মনে হচ্ছে। ঠাকুরঘরে ওঠবার সিঁড়ির গায়েই এতটুকু একটি কুলুঙ্গি, তাতে আঁটা একটা কুলুপ দেওয়া দরজা। হরিদাসী তার মধ্যে ঘুঁটে জমা করত।'

'না, অবু, না। আমার মায়ের বাপের বাড়িতে তুমি দেখনি, অবু।'

'জয়নগরের বাড়ি দেখেছি আমি। থেকেছি সেখানে, জন্মেছি সেখানে, তুমিই ভুলে গেছ, মাসি।'

'জয়নগরের বাড়ি তো আমার মায়ের বাড়ি নয় অবু, সেটা তাঁর শ্বশুরবাড়ি।'

'তবে মাসি! আমার মায়ের বাপের বাড়ি ছিল ফুলতলায় রায়দিঘির পাড়ে। এখনও আছে সেটা ভাঙাচোরা অবস্থায় ঝাড়ে-জঙ্গলে ঘেরা। তাহলে আর কেমন করে দেখব, মাসি।'

'হাঁ, তাই বলছিলেম কি সেই পুরনো বাড়ির পুরনো ছবির ঘর—তার দেয়ালে ছবি, ছাতে ছবি, মেঝেতে ছবি; আনাচে কানাচে যে দিকে চাই যে দিকে যাই সে দিকে ছবি ছিল। সেই ঘরের চাবি আমার হাতে দিয়ে মা বললেন, 'এই ঘর রইল তোমার। এই চাবি, এই রঙের বাক্স, তুলি, ছবি আঁকবার যা কিছু দরকার, পাবে। এই আমি এখন দায়-খালাস হয়ে কাশীবাস করি গে যাই'।'

'কাশীবাস কি, মাসি?'

'তা কি জানি, অবু।'

'আমি জানি, মাসি। চৈতন্য বারুইকে চন্দর কবিরাজ বলেছিল, 'চৈতন্য, দিন থাকতে কাশীবাস করো গে।' সেইদিনই পানের বোরজে আগুন ধরিয়ে চলে গেল, আর আসে না। দেখি, তার বউ চন্দর কবিরাজকে ধরে পড়ল। কাশীতে চৈতন্যের খোঁজ করার খরচা আদায় করে ছাড়ে আর কি। এমন সময় বারুই এসে উপস্থিত কাশী থেকে দিব্যি হিরিষ্টপস্ট হয়ে। কাশীবাস করতে গিয়ে লোক প্রায় ফেরে না, ওই একটি মানষকে দেখেছিলেম ফিরতে।'



'তবে চৈতন কি করে ফিরল, অবু?'

'সে এসে বলেছিল সবাইকে, নন্দি ভিরিঙ্গি তাকে ঘাঁড়ে চাপিয়ে কৈলেসে সিংগির খোরাক জোগাতে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। মা অন্নপূর্ণার মন্দিরে কিছুকাল কলাভোগ খেয়ে গায়ে যখন বল পেলে তখন রাতারাতি গঙ্গা সাঁতরে উঠল গিয়ে বলরামপুরের রাজার বাড়ি। সেখানে দ্বারপালকে কুস্তিতে হারিয়ে বাহবা নিয়ে ফিরেছে দেশে চন্দর কবিরাজকে হাতের কসরত দেখাতে।'

'তারপর কি হল, অবু, চন্দর কবরেজের?'

'তা জানি নে, মাসি। শুনেছি, ওই একটি মানুষ কাশীবাস করতে গিয়ে ফিরেছে, আর কেউ ফেরেনি। তোমার মা তোমাকে ছবিঘরের চাবি দিয়ে ভুলিয়ে কাশীবাস করতে গেলেন, তুমি এমন যে বুঝতেই পারলে না!'

'তোর কথাই ঠিক, অবু, আজ বুঝতে পারছি! আজ এইখানে গল্প থাক, কাল শুনো, কেমন?'

'তাই হবে, মাসি।'

উড়ন চণ্ডির পালা



উড়ন চন্ডির পালা

(গীত)

(অধিকারী তুড়ি—জুড়ি)

বিরুমল্ল নামে মর্দ বলবন্ত অতি
বনে আসিতেছে সৈন্য সামন্ত সংহতি
মৃগয়া করিতে সেজে হয়েছে বাহির।
চম্পা সরোবর তীরে ফেলেছে শিবির।
কল্য প্রাতে কর্পূর-কাটি দীর্ঘিকার নীরে
টানা-জালে ফেলাইবে কৈবর্ত অচিরে,
জেনেছে সংবাদ এই হাওয়ায় হাওয়ায়
চাচা আপনারে বাঁচা—বলেছে কাউয়ায়।

(কাউয়ার গীত)

(নৃত্য)

চাচা আপাতত জানটা তো বাঁচা!
আগে ভাগে চম্পট দিয়ে
চালচুলো ছেড়ে চাল চিঁড়ে নিয়ে
দৌড় দেওয়া চোঁচা!
প্রাণটা রইলে অনেক রইল,
বাঁচলে পরে অন্যস্তরে বাসা যাবে খোঁজা।।

(কাকগণের নৃত্যগীত)

আয় আয় আয় হায় হায় হায়!
কাকস্য পরিবেদনা!
দিনে দিনে আয় রাতে রাতে আয়,
কাল পরশ্ব বিবেচনা
করার সময় নেইরে হায়।। (প্রস্থান)

(কূর্মের প্রবেশ ও উক্তি)

কূর্ম। হে পতিতপাবন; একী শুনি? ভেবেছিলাম গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ হয়ে চুকেছে, এখন কিছুকাল বিশ্রাম করা যাবে—কোথা থেকে একি উৎপাত বনে উপস্থিত হল দেখ!

(ফেউয়ার প্রবেশ ও গীত)

পালাও পালাও লুকাও লুকাও!
কি আর শুধাও, হও উধাও!
ডুব দাও, ছুট দাও!
পা চালাও, পাখা মেলাও!
যঃ পলায়তি স জীবতি!
দুদ্দাড় দৌড় দাও।।

কূর্ম। এই বর্মচর্ম আঁটা বিরাট ভারি দেহটা নিয়ে দৌড়ই কি প্রকারে, লুকাই বা কোথা—হে পতিতপাবন!



(গীত)

দিঘিতে অল্পই জল, তাও বিষময়,
কোলাবেংও ডুবজল এবে নাহি পায়।
পঙ্কজ নাই, পাঁক নাই, রোদ খরতর,
কাদামাটি শুখাইয়া হয়েছে প্রস্তর।।

জলপথ বন্ধ, গাড়িখানিক নিরেট মাটি না খুঁড়লে পাতালে প্রবেশ করাই যাবে না। স্থলপথে পা পা করে যাওয়া মানে সোজা যমের হাতে গিয়ে পড়া; আছে একমাত্র গগনপথ খোলোসা—কিন্তু শর্মা উড়তে অক্ষম! কিং কূর্ম কি করি এখন—

(গীত)

কালবৈশাখী আগুন ঝড়ে,
কালবৈশাখী রোদে পোড়ে!
গঙ্গা শুকু শুকু আকাশে ছাই!
পদ্মপত্রে জলবিন্দু নাই,
সরোবরের দশায় দশা,
লাগল মাছের জল পিপাসা!
চাতক পক্ষির গলা হল কাঠ!
ডাকে ত্রাহি ত্রাহি তৃণশূন্য মাঠ।
গলদঘর্ম পুড়িছে চর্ম—শক্তি নেই ধড়ে।।

কি ফৈজতেই পড়লেম—এখন কিং কূর্ম? হে পতিতপাবন, হে পরম কারুণিক অনাদ্যন্ত মরুৎ ব্যোম—আমি confess করছি, আমি পাপী, আমি বলছি, আমি পড়েছি বিষম ফৈজতে, তুমি আমাকে পড়তে দিও না, তুলে নেও তোমার কোলে! Father Mother India-র অধম সন্তানকে অনাথ ভেবে দয়া কর—আর কিছু না শুধু দু'খানি পিঁপড়ের পাখা, ক্ষুদ্র তোমার এই দাসকে দান কর! I am penitent, repent করছি আমি পশু, পশু, পশ্বাধম পশু, আমাকে পরিত্রাণ কর, হে পতিতপাবন কৃপা কর—

(গীত)

হে পতিতপাবন, পরম দয়ালু,
তোমার কৃপায় ডানা গজায়,
শিং জোড়া পায় ব্রহ্মাতালু!
বাদুড় ওড়ে, পিঁপড়া ওড়ে,
ওড়ে জলের মাছ!

ঝড় পেয়ে ওড়ে অষ্টচালা,
খাপরা খোলা—কৃপাং কুরু হে পালু।।

হে পতিতপাবন, কৃপাং কুরু, কৃপাং কুরু, বিকট সঙ্কট, কোথায় রইলে এ সময়?

(চামচিকি নৃত্যগীত)

ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি, চাম ছাত চামের ঘর,
উড়ে পড় দামোদর, পারাছুট খুলে ধর,
উড়ে পড় ঝুলে পড়, উঠে পড় নেমে পড়,
ডুবে পড় ভেসে পড়, ঘুরে পড় সরে পড়,
গান ধর—চিরিমিরি চিরিমিরি (প্রস্থান)

কূর্ম। ওগো ও পাখিরা, আমারেও—যাঃ গেল হাওয়ায় মিশিয়ে মেঘের পারে! আমিই রইলেম পড়ে, গন্ধমাদন গোবর্ধন পর্বত যেন ডানা কাটা! উঃ বুকের ভিতরটা গুরু গুরু করছে, বাইরে হাত বুলিয়ে বোঝবার জো নেই। হে পতিতপাবন, পাঠাও দু'খানা ডানা, ধারধোর করে গরুড়ের কাছে, আকাশে উড়িয়ে নাও; নয়তো হে আকাশ, হে নীলমণি, এসো আমার কাছে নেমে—কোলে তুলে নাও এ অধমকে।

(বোকাছাগলের প্রবেশ)

বোকা। বোকাঃ—কোথাকার বোক্যা—বলি, চ্যাঁচালে শুনবে কেব্যা—উল্টে বরং কৈবর্তটারে ডেকেই ল্যেঠা। পতিতপাবন কে তোমার শুনি?

কূর্ম। শুনেছি God Father. ভয় খেলেই নামটা বেরিয়ে পড়ে—বুক খোঁচানি, হৃদ কাঁপুনি ঠাণ্ডা একদম, চোখ দিয়ে খানিক জল পড়ে—চোখও সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার।

বোকা। আজ হঠাৎ বুক খোঁচানি হল কেন? গুরুভোজন হয়েছিল নাকি?

কূর্ম। গুরুভোজনের আগেই হয়ে গেছে গুরুপাক। জান না কী হয়ে গেছে কাণ্ড। ভয়ে আমার কথা সরছে না। পেট সমদম।

বোকা। কথা না জোগায় বল, কিন্তু আস্তে গেও।

কূর্ম। শোনো, বলি, বীরুমল্ল আজ তার বেটার অন্নপ্রাশনে না শ্রাদ্ধে, কে জানে, গুরুভোজন করাবে তাই কৈবর্তদের হুকুম দিয়েছে—

(গীত)

'জ'এ আকার 'ল' টানা জাল ফেল,
'জ'এ আর 'ল'এ মহা জলাশয়ে
'ম'এ আকার 'ছ' মাছ
'হ'য়ে আকার 'স' হাস
হাসে মাছে একসাথে ধরে ল ধরে ল।

বোকা। বাপরে, এ কী বিপরীত কাণ্ড, তা তোমার ভয় নেই,—চলি।

কূর্ম। বলি চললে কোথায়? সখে,—ত্রায়স্ব মাম্ কালপাশাদির ব্যাধপাশাৎ—ব্যাধের হাত থেকে বাঁচাও সখে।

বোকা। আসছি আসছি, ঘাড়টা কেমন দরদ করছে—দুটো নটে শাক খেয়ে আসি। (প্রস্থান)

কূর্ম। হে পতিতপাবন, কেউ গেল উড়ে, কেউ গেল দৌড়ে—আমিই একা পড়ে রইলেম বিপদের বেড়াজালে ঘেরা—

(গীত)

ধরা গেছি এ বেড়া জালেতে
দড়ার ফাঁসে আটকে আছি,

পাথর চাপা বুকে পিঠে
জাঁতা কলেতে পেষা হতেছি।
জলে নাই পথ স্থলে নাই পথ,
সমুখে পিছনে বিষম বিপদ,
সুপথে বিপথে শমন নিকট,
বিকট সঙ্কটে পড়ে কাঁদিতেছি।

হে পতিতপাবন, তোমার সঙ্গে এত দিনের আলাপ, একবার খবরও দিলে না। শিয়রে শমন এসে উপস্থিত যখন, তখন জল দিলে শুকিয়ে। এখন বলে দাও, কাক বক কার কাছে যাই—ওকি শুনি

কালো বিড়াল তিনবার
করে দিল চিচ্‌কার।
সজারুর বাচ্ছাগুলো
চেঁচাইয়া বলে দিল—
এইবার নাই নিস্তার।
ঐ শোনা যায় ডাইনে কইছে
সময় হৈচে, সময় হৈচে।
বাঁয়েতে কইচে—দিন কাবার।।
হায় আমি চলৎশক্তি রহিত, অসহায়।

(সজারুর প্রবেশ)

সজারু! তবে যে শুনি, হেয়ার ছুটে খরগোশকে হারিয়ে ঈশপ কাপ পেয়েছিলে?

কূর্ম। আরে কর্তা, সে হল উনপঞ্চাশ সালের কথা—তারপর থেকে কিছু না হোক তিনশ' পয়ষট্টিটা শাল গিয়া জয়ন্তী চুকিয়ে অথর্ববেদ বনে গেছি। এখন কেবল চতুষ্পদীতে লেখা দুর্মুশ পিটিয়ে স্মৃতিসভার পথে অগ্রসর হচ্ছি ধীরে ধীরে। সেদিন কি আর আছে,

এখন দিকভ্রম লাগে কটা পায়,
উত্তরে যাইতে ওরা ঈশানেতে যায়।

তার উপরে ভয়ে হাত পা এখন পেটের মধ্যে সেঁধোতে চাচ্ছে। কি করি এখন, কঃ যাম কিং কূর্ম?

সজারু।
মিছে ভয় করছ—
যখন কিছু নাই ভয়
তখন আছে ভয়ের ভয়,
ভয় এসে পড়লে ঘাড়ে
পরিত্রাণোপায় আপনি হয়।

তাবৎ ভয়স্য ভেতব্যম্ যাবৎ ভয়মনাগতম্—বুঝলে?

কূর্ম। আরে রাখ তোমার সমস্কৃত—আর আমার মাথা ঘুলিয়ে দিও না।

সজারু।
শোকস্থান সহস্রানি ভয়স্থান শতানি চ
দিবসে দিবসে মূঢ় মাবিশন্তি ন পণ্ডিতঃ।।

কূর্ম। আবার মাথা ঘুলিয়ে দেয়—বাংলায় বল না।

সজারু।
ভয় অনেক, অনেক দুঃখ
দিনে দিনে পায় যে জন মূর্খ।
জ্ঞানবান যেই অটল প্রাণ
শোকে ভয়ে নয় মুহ্যমান।।

(ভেড়ার প্রবেশ)

ভেড়া। ব্যামাৎ ব্যামাৎ ব্যা—ব্যা—ব্যা—

সজারু। কি? কি? বলে ফেল—

কূর্ম। গয়ং গচ্ছ—কেন করছ?

ভেড়া। ব্যা ব্যা ব্যামাৎ—

সজারু। অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—ব্যাবাৎ উৎপৎ হঠাৎ অকস্মাৎ বজ্রঘাৎ—

কূর্ম। গোল কর কেন? কথাটাই শুনতে দাও।

ভেড়া। অতি তুঙ্গ ঘোর ঘনম কলিকাল বন্ধুবর্গমিবৈকত্র অঞ্জনশিলাস্তম্ভ সম্ভারমিব অন্ধকার—কা—কা—কা—

কূর্ম। এঃ! ভেড়ার গোয়ালে আগুন দিতে বসল সাদা বাংলায় কও না।

ভেড়া।
মানুষ কি জানোয়ার বুঝে ওঠা ভার,
শবর কটা দেখা দিল কিম্ভুতকিমাকার,
ওষ্ঠ মাস ঠেলি দন্ত আছে মেলি,
দশ দশ অঙ্গুলিতে বক্র নখধার,
দারুণ ব্যাপার অরণ্যে এবার
—ব্যা ব্যা—ব্যামাৎ (প্রস্থান)

সজারু। কই আমার গর্তটা কোন বাগে? আমার বিলের দুয়োর—পকেট পকেট—

কূর্ম। আমার নাকের ছাঁদাটা কি তোমার পকেট না বিল? সরো—খোঁচা দিও না।

সজারু। ভাই ভয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে, পা-টা চালাই কোন বাগে?

(গীত)—নৃত্য

চল পা পা পম্পার পার মাট,
জলপিপি কাদাখোঁচা মারে যেথা পাক্‌সাট
জেলের ছেলেরা সেথা ধরিতেছে কুচে মাছ,
বাঁধের সে পারে আছে উইটিপি তালগাছ।।

কূর্ম। হে পতিতপাবন, আমি আর কুঁচে কেঁচো খাব না, জীবহত্যা করব না, শুধু গিরগিটির ডিম খেয়ে থাকব, আমিষ পরিত্যাগ করলেম—নিরামিষ আজ থেকে। আমাদের পথ দেখাও নয়তো অনশনে প্রাণত্যাগ করব—এই দণ্ডে, এইখানে। উঃ আমার গা ঝিমঝিম করছে, ঘুম পাচ্ছে।

সজারু।
ধর বাক্য কোরো না অবহেলা।
ঠাঁই ছাড়ি দাও পাড়ি শীঘ্র এই বেলা।

কূর্ম।
চলো অগ্রসর হই—
কী বৃহৎ এই দিঘি সওয়া ক্রোশ পাক্কা
ঘুরিয়া যাইতে হলে দু'ঘণ্টার ধাক্কা।।
মাঝপথে ধরা পড়ে না যাই—দেখো পতিতপাবন। (উভয়ের প্রস্থান)

(জরদ্‌গবের প্রবেশ—ফুল্কামুখী ও উল্কামুখী আলেয়া লণ্ঠন হাতে)

(গীত)

ওরে জেগেজুগে বসে থাকো হয়ে হুঁশিয়ার
ধরে হাতিয়ার সকল চোরার
গমনাগমন দমনে রাখ,
কতকাল আর ঘুমাবে বল
জেগে পড় দিন যে গেল,
সন্ধ্যা হল রাত ঘনালো,
প্রদীপ জ্বেলে বসে থাকো।

জরদ্‌গব। দুরাত্মা লুব্ধক জাল তণ্ডুল হস্তে সদলে উপস্থিত হয়েছে। না জানি কি বিপদ উপস্থিত হয় আজ।

উল্কামুখী আলেয়া, তোমরা অগ্নি কুক্কুটি ধরে এ বনে ও বনে বনবাসী জীবগণকে সাবধান কর। লুব্ধক সে ভয়ানক চতুর—এ হাতে মুষ্টিভিক্ষার তণ্ডুল দেয় ও হাতে জাল পেতে চলে, তাকে বিশ্বাস নেই। ব্যস্! আমার কাজ আমি করলেম, এখন তোমরা হুলিয়া দিয়ে বেড়াও সারারাত। হাঁ দেখ ইতিমধ্যে যদি বিশেষ ঘটনা কিছু ঘটে তো আমাকে জাগিয়ে দিও কোটরে গিয়ে। দেখি ব্যাধ কি করে? হাঁ—

আমি জরদ্গব বুড়ো, জটাই পক্ষীর খুড়ো,
নখে ছিঁড়ি মুড়ো, ঠোঁটে নাড়া-ভুঁড়ো
একলা আমি একা বুড়ো, দোকা বুড়ো, তেকা বুড়ো!
মুড়োনো মাথা, বুড়ো হাবড়া, গরুড় বংশের চুড়ো।। (প্রস্থান)

(ফুল্কা ও উল্কামুখীর নৃত্যগীত)

কত আঁধারে গাঁটের কড়ি খরচ করে
তেল দেব আর জ্বালতে তোমার লণ্ঠনটায়!
পায় পায় কাদায় পা পিছলায়
পাঁকে পড়ি বারে বারে হে।। (প্রস্থান)

(কাক ও কূর্মের প্রবেশ)

কাক। ভাই কূর্ম, এ স্থানটা তো দেখি ঘোর অন্ধকার।

কূর্ম। ঠিক তোমার পাখার কত কালো।

কাক। চিরনিদ্রার দেশে এসে গেলেম বোধ হচ্ছে, ঘুমে ডানা ভারি ঠেকছে।

কূর্ম। হে পতিতপাবন, সত্বরমুপসর্পতু।

কাক। অ্যাঁ সর্প!

কূর্ম। সর্প বলিনি—চটপট এস সরি—বলতে ভুলে সাধুভাষা বেরিয়ে গেছে।

কাক। তাই বল। এই এইখানে বসে মন্ত্রণা আঁটা যাক—উঃ কি মশা!

কূর্ম। মশা থাক, ব্যাধ তো নেই—একেবারে নিরাপদ স্থান। টিকটিকি আছে বলছে শোন ঠিক ঠিক ঠিক—দু'একটা খেয়ে নেওয়া যাক নিরাপদে।

কাক। নিরাপদ হলে কি হয়—মশা টিকটিকি খেয়ে কদিন বাঁচব?

কূর্ম। ওরে ভাই নিরাপদে জলকর্দম যদি লাভ হয়
আর যদি পরমান্নে থাকে হরদম প্রাণভয়,
বিচার করিয়া তবে বুঝিয়া উত্তম
তাহাই বাছিয়া লবে যাতে ভয় কম।।

(গীত)

ভাই রে ভাই, নির্ঝঞ্ঝাটের বালাই নাই,
খাই দাই নিরাপদে,
করি নিজের কাঁসি ডলাই মালাই।
আপন হাত পান্তাভাত, নাই চাটলেম পরের পাত!
দিনরাত কান মলায়ে কালিয়া খেয়ে সুখটা কই?
হাড়ভাঙা খেটে ক্ষীর সর ছানা—
পিঠের জ্বালা নয় তাতে মানা।
পেটের জ্বালা মিঠে জলে মেটে,
নাও না তাই
বেশি ফৈজতের মোচাক থাক
নুনভাত খাই।।

কাদামাটি খেয়ে বেঁচে রয়েছি তো কয় যুগ আরামে, কিন্তু এবারে বুঝি প্রাণ যায় কৈবর্তের হাতে। অধুনা কিং কূর্ম, কঃ যাম, তাই বল।

কাক। জাল পড়েছে বলেই কি ধরা পড়ব। দেখা যাক্‌-না কতদূর কি হয় পশ্চাৎ যদুচিতং তৎ কর্তব্যং।

কূর্ম। না হে না আজ কাল করে সময় নষ্ট করা কিছু নয়। যদ্‌ভবিষ্যের মতো বিনশ্যতি হয়ে যাব। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ। খোলাভাজা হয়ে এক ফুঁ-এ যে উড়ে যাব তার কি?

কাক। ভয় কি 'অস্তুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়োনাম নগাধিরাজ।'

কূর্ম। কি কি হল? অস্থি দেবার কথা কি হল?

কাক। অস্থি দেবার কথা হচ্ছে না—

উত্তরদিকে হিমবৎ তদুত্তরে মানস হ্রদ
সেখানে যেতে পারলে হওয়া যায় নিরাপদ।।

কূর্ম। কিন্তু মানস হ্রদ যে এ সময়ে বরফ পড়ে সান বাঁধ হয়ে গেছে—ডুব মারবে কোথায়?

কাক। এই তো খটকা লাগালে—উত্তরে না যেয়ে চলো যাই দক্ষিণে।

কূর্ম। ও বাবা, দক্ষিণ দুয়োর খোলা সে ধারে, কাককূর্মতীর্থের রৌরবে পড়ে, পাথর বনে যাব দু'জনে—রসম খেয়ে কদিন চলবে। তারা শুনেছি কাক বলি দেয় রোজ।

কাক। পশ্চিমে গেলে কেমন হয়?

কূর্ম। কাছিমের কোর্মা, নয় কাবাব, নয়তো সুরুয়া—ব্যস।

কাক। হিন্দুকুশটা টপকে সুসভ্য অক্সিডেণ্টে গিয়ে পড়ি চল।

কূর্ম। অ্যাকসিডেন্ট হয়ে পড়বে হঠাৎ! সেখানে সর্বভুক তারা আছে, কাকের পালক তারা টুপিতে গোঁজে, মক্‌টরটল সুপ খায়। উদ্যানে একটা করে রুকারি রাখে তারা কাক পুষতে। খেয়ে দেয়ে কাকটা যখন মোটা হয়, তখন ব্যস—আর কি টুপটাপ গুলি করে মেরে, রুক-পাই বা কাগা পিঠে করে খায়।

কাক। বাপরে। কাজ নেই সেখানে, চল বরং পূর্বস্থলীতে চলে যাই।

কূর্ম। পদ্মা পার হলেই কেটোর ঝোল বানিয়ে ফেলবে। তুমি যেতে চাও যাও, আমার যাওয়া হচ্ছে না।

কাক। শুনেছি ব্রহ্মদেশে তারা জাতকমালা জপে, কাছিমকে দেবতা বলে, কাককে উপদেষ্টা বলে মানে।

কূর্ম। মগের মুল্লুক সে বাগে, নাপ্পি বানিয়ে ফেলবে পচিয়ে পচিয়ে—তার চেয়ে রৌরব শতগুণে ভাল।

কাক। তবে তো কোথাও যাওয়া হয় না।

কূর্ম। কোথাও গিয়ে নিস্তার নেই, হয় হঠাৎ সীতা যেখানে পাতাল প্রবেশ করেন, আর শকুন্তলা উড়ে পালিয়ে বেঁচে গেলেন, সেইখানে চলে যাই, নয়তো এইখানেই মৃত্যুর মুখে বসে থাকি গা ঢাকা দিয়ে। হে পতিতপাবন! মাথা চালছ কি? নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়!

কাক। স্বর্গে একবার গিয়েছিলেম, রামচন্দ্রের মৃত্যুবাণ সেখানে পর্যন্ত তেড়ে গিয়েছিল। মাথা চালছি সাধে, সব ঘূর্ণায়মান দেখছি।

(গীত)

ভেবে যে দিশাহারা হলাম ভাই
এ যে কোন দিকেই রাস্তা নাই
এগোলেও গোল পেছলেও গোল
গেলেও যা, না গেলেও তাই।।

দেখ, বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালেহ্যুপস্থিতে; বৃদ্ধ জরদ্গবের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখা যাক চল।

কূর্ম। কে হন তিনি? কোথা তাঁর নিবাস?

কাক। অস্থি গোদাবরী তীরে—

কূর্ম। আবার অস্থি দেওয়ার কথা তুল্লে—সোজা বাংলায় বল না কেন—আমি মলেই তুমি বাঁচ, শ্রাদ্ধটা খেয়ে। সে হচ্ছে না, তার ঢের দেরি আছে; পিঠে দাগা রাশি চক্কর পড়ে দেখ—আশি শরৎ তার উপরে শূন্য যোগ আছে আমার ভোগ—বুঝলে।

কাক। আচ্ছা ভাই বাংলাতেই বলি—

পক্ষ নাই কিন্তু ও সে পক্ষপালন করে,
চঞ্চুহীন, চক্ষুকোটর কোটরেই বাস করে,
নেড়া নয় নেড়ি নয়—ওল কামানো মুণ্ডু।
তিনকাল বর্তে আছে নয় কাগ ভুষুণ্ড,
বৃক্ষ রক্ষে করে নিত্য বানর তাড়ায়,
খোঁজ তার নাহি পাবে মালীর পাড়ায়।
যে যা দেয় তাই খায় জরদ্গব নাম
যোগী নয় রোগী নয় জাগে চার যাম।।

কূর্ম। এ তো একটা সমিশ্যে! এর সঙ্গে আবার পরামর্শ করতে যাব কি? না! তুমি হাসালে! তুমি পরামর্শ করতে চাচ্ছ যাও, কিন্তু গিয়ে দেখবে হয় একটি পাকা বেল নয় ঝুনো নারকেল। এর চেয়ে গজহস্তীর কাছে গেলে ভাল করতে। সেই গজকচ্ছপের যুদ্ধের সময় দু'জনে হাডু—ডু-ডু খেলেছি; এখন কোথায় আছেন, আছেন কি নেই তাও জানিনে—চললে তাহলে?



কাক। আর্য্য ত্বং অভিবান্দ!

কূর্ম। যাও, কার্যসিদ্ধি করে ফিরে এসো।

কাক। দু'জনে গেলে ভাল হত—সঙ্কট বিকট সবাই তো গেল।

কূর্ম। কেউ এ পর্যন্ত ফিরেছে দেখছ—ওহে ন গনস্যগ্রতো গচ্ছেৎ তা হলেই অগস্ত্যযাত্রা—বুঝলে।

(গীত)

ওরে ভাই আগে ভাগে যেতে নাই মোড়লি করে,
কার্যসিদ্ধি হলে ভাগে সবারই পড়ে।
দৈবাৎ হয় যদি কাজেতে ব্যাঘাৎ,
আগে যেই রয় সেই হয় কুপোকাৎ।।

এখন এই কথা কচ্ছি দু'জনে, হঠাৎ যদি ব্যাধ এসে পড়ত—

কাক। এক বুদ্ধি বলে—যেমন দেখবে ব্যাধ আসা অমনি বাতেনোদরং পুবয়িত্বা একেবারে মৃতবৎ পড়ে থাকবে, আর আমি তোমার চোখে চোঁচ ফোঁকাতে থাকব, যেন খুবলে যাচ্ছি।

কূর্ম। এই তো পেট ফুলিয়ে চিৎপাত হলেম, তারপর?

কাক। আরও খানিক ফোলাও।

কূর্ম। আরও ফোলাতে গেলে বোমা ফেটে একনপ্লোসান হবে।

কাক। আচ্ছা রোসো চোখ খোবলাই, ভয় নেই কাজল পরাচ্ছি, চোখ মেলো।

কূর্ম। মলে কি চোখ খোলা থাকে?—এই নাও শিবনেত্র হলেম।

কাক। এই আমি আস্তে আস্তে খোবালাচ্ছি চোখ—ব্যাধ ভাবুক কূর্ম প্রাণত্যাগ করেছেন।

কূর্ম। যদি কাতুকুতু দেয়? উঃ, আস্তে—খোঁচা সোঁচা দিবে তো বুঝেসুঝে দিবে, এ হল চক্ষুরত্ন—ও কে আসে ও।

নেপথ্যে। পালাও পালাও ! ব্যাধ ব্যাধ!

কূর্ম। আর না এইবারে চোখ বন্ধ একদম, ওঃ দমবন্ধ—হে পতিতপাবন।

(সঙ্কট বিকটের প্রবেশ)

সং। ব্যামাৎ ব্যামাৎ পালাও পালাও।

বি। কূর্ম কোথায় গেলেন?

সং। ওই যে ঘুমোচ্ছেন।

কাক। ঘুমোতে দাও ওঁকে, আর জাগিয়ে কাজ নেই, বৃদ্ধ হয়েছেন—যতক্ষণ নিদ্রায় রন দুঃখশোক বিস্মরণ—কালটা তো কেটে যাক ভাই অনায়াসে।

সং। দেখে হিংসা হয়, কি আরামেই নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাচ্ছেন দেখো—নিদ্রা একটা প্রধান ভোগ, চলো আমরা যে যার বাসায় লুকোই গিয়ে।

বি। এটা তো ভাই ভাল কইলে না। জরদ্গব বল্লেন, আজি মহাযাত্রার নিশি সে কথা কি ভুললে? ঘুমোনো চলবে না, পালা করে জাগতে হবে। ভাই কাক, তুমি গাছে চড়ে পাহারা দাও, আমরা এইখানেই রইলেম—উনি ঘুমোন।

(গীত)

আয় ঘুম ঘুম যায় ঘুম ঘুম ঘুমে দোলা দিয়ে,
তালের পাতা ঘুম ঘুম যায় ঘুমের বাতাস দিয়ে,
আস ঘুমা ঘুম পাশ ঘুমা ঘুম ঘুমচি গাছের পাতা
ঘুমায় তরুলতা।
ঝুমকো লতায় ঝিঁঝিরা ঝিমায়
ঘুঙুর বাজন থামিয়ে
নিথর ঘুলে তলিয়ে।।

কূর্ম। আমি ঘুমোইনি হে পতিতপাবন। ওহে সঙ্কট বিকট, শোনো কাছে এসো।

সং। হিমে আকাট মেরে এখানে পড়ে যে? শরীর ভাল তো?

কূর্ম। নেহাৎ কেটো শরীর বলেই টিকে আছি, কাকের খোঁচা সয়ে, ভয়ে গলা কাঠ হয়ে আছে—স্বপ্ন দেখছিলেম যেন মেঘপার থেকে হঠাৎ মাটিতে প্রপাত হয়েছি পর্বতের চূড়োয়—চমক ভেঙে দেখি তোমরা। বলি, কাজের কত দূর কি হল? আর এ বনে তো থাকা নয়।

বি। বলছি, রোসো আগে কিছু কর্দম আর গুগলি খেয়ে চাঙ্গা হয়ে আসি।

কূর্ম। এসো, আমি ওই কচুতলায় গা ঢাকা হয়ে রইগে; ফাঁকায় থাকা নিরাপদ নয়—প্রদোষে নিহতঃ পন্থা রাত্রৌচ ভ্রমণম্ বিষম্। (তিনজনের প্রস্থান)

(ভোঁদড়—ভামের প্রবেশ ও নৃত্যগীত)

ঘুমতা ঘুমায় ঘুমতা ঘুমায় রাতদুপুরে চাঁদটা ঘুমায়,
জাগে বাদুড় করে ঘুরঘুর হুতুম প্যাচায় হুতুম থুমায়!

ঘুমতা ঘুমায় গাঙ্গের বাতাস
রাতের আকাশ।
নীদ্ পাড়ে নীদ্ পাড়ে বিল ধারে বাঁশ ঝাড়ে
কাউয়া মানুষ—ফুস্‌ফুস্
ভোঁদড় ভাম করে উসখুস।
ঝরে পাতা নড়ে ঘাস—ডাঙায় জলায়।।

১। বলি ভোঁদড়, চুনোপুঁটি না চিংড়ি?

২। বলি, তোমার কি ভেটকি না ইলসী?

(গীত)

ওরে জাল পড়েছে রে মহাজাল
তাতে আটকে গেছে ভেট্‌কি চিতাল
শঙ্কর শাল বুয়াল।
উড়াজাল ঘেরা বেড়াজাল ঘেরা
বাসা ডেরা বিল খাল।।

১। কূর্ম কোথায়? ডেকে তোলো না তাঁকে।

২। কুড়মো ও কুড়মো—

(গীত)

নিদ্রার মুখে আগুন, জাগ ভাই
জাগরণের গুণ শ্রবণ করহ কর্ণ কুহরে
নিদ্রাযুক্ত প্রাণী সব বেঁচে থেকে যেন শব
সিঁদ কেটে চোর প্রবেশ করে ঘরে।
হাত দিয়ে লয় গলার হার,
অথবা করে সংহার
বলবানকে দুর্বল করে জয়।
জাগ্রত জীবের ভাই ফৈজৎ বালাই নাই
নিদ্রাতুর জীবাপেক্ষা বাঁচে চতুর্গুণ।।

১। বলি ও কুড়মো, ঘরে আছ হে—

(কূর্মের প্রবেশ)

কূর্ম। আমি ঘরে নাই—ব্যাপার কি? কে অন্ধকারে ডাকাডাকি করে?

১। ঘরে বসে বলো ঘরে নাই।

কূর্ম। ওটা হল ইঞ্জিরি কায়দা—নট্ এট্ হোম—বুঝলে না?

২। *যজ্ঞি হোম কর, এ বয়সে মিছে কথাগুলো কেন বলা?*

কূর্ম। ঘরে নাই তবু বলতে হবে ঘরে আছি।

১। এই যে চোখের সামনে ডোবা থেকে বার হচ্ছে।

২। ওটা আমাদেরই দেখার ভুল—উনি নেই।

কূর্ম। ছোকরা, তোমাদের কি দেখার ভুল হতে পারে, নাকের উপর জোড়া জোড়া গোল চশমা থাকতে?

১। তবে?

কূর্ম। দেখবার ভুল নয়, বোঝবার ভুল হয়েছে—গর্তটা হল আমার ঘরের গোলাপ, যেমন গহনার বাক্সের উপরে লোহার সিন্দুক। বুঝলে না—আসল ঘর হল আমার কাছিম-খোলার কৌটা, এরমধ্যে যখন গুটি সুটি আছি তখন ঘরেই আছি। আর যখন ঢাল আর বর্ম বহে চলাফেরা করছি, তখন বলতে হবে তো আমি ঘরে নাই, অর্থাৎ বাইরে আছি ঘরের। যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

১। চুনোখালিতে—মুক্তস্তানে।

২। আজ যে গ্রহণ লেগেছে।

কূর্ম। গ্রহণ লেগেছেই বটে, ব্যাধ দেখা দিয়েছে, বনে—গেলেই টপ করে গ্রহণ—এমন যে তার আর মুক্তি নেই। যেও না ওদিকে, ওই পানা পুকুরটায় ডুব দিয়ে মুক্তিচান সারবে চলো—বিষম ব্যাপার।

১। ওই কারা আসছে।

২। চলো পালাই।

কূর্ম। আমিও গো হোম করি,। (প্রস্থান)

(জালিয়াদের প্রবেশ ও নৃত্যগীত)

মাকড়টা ফুলবনে খাসা বোনে জাল,
পোকা পতং লটকে পড়ে—মাছ পালে পাল—।
জালিয়া জলে থলে ফেলি বেড়াজাল
মাছের গাঁদি জালে বাঁধি কেটো কাঁকড়ার
তাল তাল।
মাকড়সার জালে মশা বনবন পড়ে উড়ে
ঘুরে ঘুরে কানামাছি আটকা পড়ে জাল জুড়ে।
টোপ গিলে ছিপে মাছ ভুল করে হয় নাকাল।।
চল চল, বড় মাছ কটা এখনও ধরা পড়েনি—

(নৃত্য গীত)

ইলিশ মাছ মাছের রাজা
গভীর জলে হেলায় মাজা
ভেটকি চিতাল পার্সে রুই
শঙ্কর শাল বোয়াল টুই
তলিয়ে চলে খেলিয়ে লেজা।
ও সে ডিমে ভরা তেল কুচ্‌কুচ্‌
খেতেই মজা তেলেতে ভাজা
তাজা বেতাজা।।

আগে ধরে নে মাছ রাতারাতি, তবে আনন্দ করিস—

(গীত)

কে কে যাবি মাছ ধরতে আয়রে ভাই আমার সাথে।
পদ্মপুকুরের মাঝে গোড় করিয়ে মাছ রয়েছে,
যদি পারিস ধরে নিতে কোনমতে
সুখ পাবি রে ভোজনেতে।
যদি রে মাছ ধরতে পার ইচ্ছেমত পাকসাক কর,
ভাতে ভাজা ঝোল কোর্মা অম্বল
যেমন ইচ্ছা হয় মনেতে।
ওহে মাছ না ধরে আপন হাতে
মাছ ভাজছে সবাই কল্পনাতে
স্বপ্নে রাঁধছে ঝোল, খাচ্ছে ঘোল
গণ্ডগোল তাই বাড়ি বাড়িতে।।

(বীরমল্লের গীত)

জাল উড়িলা রে উড়া জাল
বেড়িলা রে দিক বেড়িলা রে
বেড়াজালে ঝাঁকে ঝাঁকে
পারাবত পড়িলা রে
বনের মৃগ জলের মাছ
দলে দলে পড়িলা রে।। (প্রস্থান)

(জরদ্গবের প্রবেশ)

(পদ)

দেখছি ঘোর ঘোর রাত্রি ভোর ভোর,
জানতে পারছি—যাচ্চি যাচ্চি করছে রাত্রি।
ডাকিছে না পক্ষী ছাড়িছে না বাসা,
উড়িয়া পড়িছে না খাবে করি আশা,
ফিরিয়া যেতেছে না—না পেয়ে দিশা,
মন যেন বলতেছে—আসেনি ঊষা কাটেনি নিশা।।

দেখি একবার পর্কটি বনটা ঘুরে ব্যাধ কটা কার কি সর্বনাশ করে গেল? চঞ্চু দু'খানা হয়েছে ভোঁতা, চোখে পড়েছে ছানি, নখর গেছে ক্ষয়ে—কাজের মধ্যে হয়েছে এখন বনরক্ষা করা। যাই দুটো পর্কটি ফল কুড়িয়ে খাই।

(গীত)

যাত্রী চলার পথের ধারে রাত্রি দিনের এই যে বাসা
কারও নয় এ আপন বাসা।
কি এখানে সুখের আশা,
কোন বিরতি বিরাম দুখের,
দু'দিনের এই পান্থশালার ঘণ্টাঘরে
ঘড়ি ঘড়ি প্রহর পড়ে!
ঘুম ভাঙায় পথিকজনার,
ঘড়ি বলে চল হো,
এল দিন গেল রাত্রি।। (প্রস্থান)

কূর্ম। যাক এবারে ফসকে কোনরকমে বেঁচে গেছি। বীরমল্লটা পিঠে পা রেখে পার হয়েছে নদী—এমন বেমালুম নোড়ানুড়ির সঙ্গে বসেছিলেম যে, শিব ভেবে তিনটে গড় করে গেছে।

ব্যাং। আমি ভাই যমটার হাত পিছলে গেছি—এখনও একটা ঠ্যাং দরদ করছে। ও দিকে গেরোনও কাটল; সঙ্গে সঙ্গে ফাঁড়াও কাটল—এখন মুক্তিচান করি চলো।

(ব্যাং-এর নৃত্যগীত)

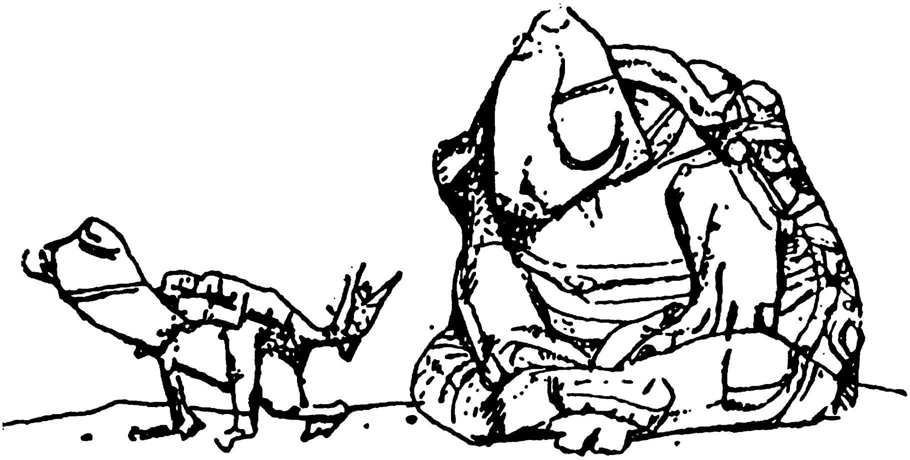
আজ মুক্তির দিনে ব্যাং বেঙাচি ছাড়ুক ডিম
সুক্তি ছাড় যুক্তি কর, সুক্তির মাঝে মুক্তি ধর
ঘেটে চল কাদা জল হিম।।

কূর্ম। আর মুক্তিচানেও কাজ নেই যুক্তি-সুক্তিতেও কাজ নেই—আগে মাথা গুঁজে তিনদিন তিনরাত্রি ঘুম, তবে মাথা ঠাণ্ডা করে অন্য চিন্তা।

ব্যাং। এত চিন্তাই বা কেন? চিন্তামণি যা করেন—চিন্তার চিন্তা ছাড়। এসো একটু নাচি গাই।

(গীত)

রাত দিন চিন্তা ছেড়ে দিন দিন তা
নেচে নিন ঢিমেতালে, তালে তালে পা পা।
চেও না নেই যা, নিয়ে যাও পেলে যা,
চলি চল সাফা, ফেলি রাখ চিন্তা,
রয়ে বসে, জোয়ে সোয়ে, কেটে যাক দিনটা।।



কূর্ম। চিন্তার কারণ আছে—তুমি তো চিন্তিত, ব্যাংপোড়া কেউ ছোঁয় না—ফরাসিরা আর শৌখিন দু'একজন বিলেতফেরত ছাড়া। এই দেখো না এই দ্বিতীয়বার খাণ্ডবদাহন ব্যাপার ঘটল বলে। পোড়া অদৃষ্ট, পাখা নেই, উড়তে না পেরে কৃতান্তের হাতে পড়ব। তুমি তবু বাতাসের মুখে ছাতাটা মেলিয়ে খানিক উড়তে পারবে। আমি একেবারে কয়েদ! কি বলব—

(গীত)

যদি পাখির মতো রইত পাখা পারতাম উড়তে,
চলে যেতেম সোজাসুজি চাঁদে গর্ত খুঁড়তে।
পা নাই পাখা নাই আকাশের নাগাল না পাই,
উড়তে গেলে ভুঁয়ে পড়ে থাকি হাত পা ছুড়তে।
মোর জলে বা কি, স্থলে বা কি—আছি ডুবতে
আর উঠতে।।
ওড়ার পন্থা বাতলাতে পার তো বুঝি।

ব্যাং। খুব সহজ উপায় বলি—

(গীত)

এক আঁটি গঞ্জিকা তাতে কিছু ভাঙ,
ছিটে গুলি আর কিছু—কষে মারো টান।
ধুঁয়া করে ছেড়ে দাও, তার পরে উড়ে যাও সটান,
গজিয়ে নিয়ে খোলার চালে
ধুমধামে পাখনা দু'খান,
শিবলোক ব্রহ্মলোক—মন চায় যেখান।। (প্রস্থান)

কূর্ম। দেখলে, দেখলে, গাঁজাখোর-বলে গালাগাল দিয়ে গেল ছোকরা! আমার মূর্খতা, গিয়েছিলেম মন্ত্রণা নিতে তার কাছে যে নিজের ল্যাজ খসিয়ে—ছিল ব্যাঙাচি, এখন বলাচ্ছে ব্যাং। সম্পাতির লেখা

উড্ডীন শাস্ত্র আছে শুনেছি—তার একখান পুঁথির দু'খানা পাতা পেলে কাজ হত। যাক একবার ধ্যান-সমুদ্রে ডুব দিয়ে দেখি কিছু হাতে ঠেকে কিনা।

(গীত)

ডুবেছি না ডুবতে আছি
তলিয়ে এবার নেব যাচি
পাতাল কত দূর।
তল তলাতল তলিয়ে গিয়ে
রসাতলে কাটব পুকুর।
পড়ি তো পড়ব আকাশেই চড়ব
হঠব না নড়ব না
চাঁদকেই ধরব।
শরীর হোক পতন পক্ষের কারণে যতন
করবই করব।
কিসে বা ভয়টা হবই হব একমন।।

উঁহুঃ, এমনতা হতে পারছি না—তার চেয়ে ঢের ভারি রয়েছি এখনও।

(গীত)

উড়ু উড়ু করে মন না পারি রহিতে
চারিদিক আসে যেন আইসে ধরিতে।

ওগো পাখি. আমাকে তোমাদের সাথে নিয়ে চলো, শোনো বলি, ও কলহংসগণ, উড়োকলের কৌশল শেখাওসে আম—যাঃ শুনলে না, হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

(গীত)

উড়ি যায় রে হংসারে পাখি
যায় রে বাটে ফেলে ছায়া
জলের পাখি আকাশে চলে,
কাটিয়ে থলের মিছার মায়া।।
কত আর চেয়ে রব মেঘের পানেতে
দেল নাহি চাহে আর থাকে এখানেতে।।

মন উড়ু ি করছে যখন, দেহ উড়ু উড়ু করবে না কেন তুমি? উড়তেই হবে আমাকে—নাহলে নোড়ার ঘয়ে চূর্ণ করবার চলবে না, নাহলে অস্তর দিয়ে কেটে কুটিকুটি করতেম—উড়তেই হবে তোমায়, মাটিছাড়া করব তবে ছাতোকে—তাতে থাকে প্রাণ যাক প্রাণ। ধ্যান ধরে বসে কিছু হবে না। Action চাই, দেখি একবার প্রেয়ারে রীতিমতো—

হে পতিতন, মাই লর্ড, এ তোমাদের কেমন বিচার. শকুন ওড়ে আবার শকুন পড়েও, পাখিদের, এমন কি ইঁদুর জাতাদুড় শ্রেণীর জীবদেরও একসঙ্গে উৎপতিত হবার চাতুরি শিখিয়ে দিলে, আর অধম কূর্ম তোমার কাছে। অপরাধে অপরাধী হল যে তাকে শুধু পতিত হবার কৌশল দিয়েই নিশ্চিন্তি করলে? এককে দিলে ডবল প্রন, আর আমার বেলা এক উল্টো প্রমোশন! পতিতপাবন! এ যে ঘোরতর ইনজস্‌টিস, স্যার, মোস্ট হাই প্রেকজন, আর মোস্ট লো পেলে যে কূর্ম অবতারের আমল থেকে তোমার ভৃত্য! হাঁস জলে চলে মাটিতে আমিও তাই; কিন্তু কি পক্ষপাত তোমার পক্ষী জাতির প্রতি, হাঁস পারলে উড়তে আকাশে—একে-তিন তিক পেলে তারা—আর আমি দুই নম্বরের ফাঁকি পেয়ে খুশি হব? সে হবে না প্রভু—আর এক নম্বর চাই-ই চাহলে আমি আত্মঘাতী হব কিম্বা কাগজে তোমার নামে পার্সালিটির অভিযোগ—ছিঃ ছিঃ কি বললেম?—আগ নয় অনুযোগ—পতন নয় উৎপতন দাও প্রভু আমাকে! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক এবং

আমারও ইচ্ছা পূর্ণ হোক, হে পতিতপাবন! কই যে পা সেই পা-ই রয়েছে, পাখা তো হয়নি। দূর ছাই, ও প্রেয়ারে কিছুই হবে না—

যা না চাই—তাই পেয়ে যাই!
চাই যা—তার পাবার নাম নাই।।

পতিতপাবন নিজেই নির্ভর করেন গরুড়ের ডানা দু'খানার উপর, তিনি আবার আমায় দেবেন ডানা, ওড়াবেন আকাশে! ওড়া না-ওড়া সয়েন্সের কাজ—ধ্যানের কর্ম নয়! ইনটেলেক্ট খাটিয়ে দেখি! পতনের উল্টোটাই হল উৎপতন! এই উৎপতন পতন,—উৎপতন পতন—এই চললদু'খানা পাখির ডানা উঠে পড়ে ডাইনে-বাঁয়ে! ওড়ার এই হল সিক্রেট। আঃ শরীরটা হালকা বোধ হচ্ছে। দেখি একবার প্রাকটিশ করে নিই তালে তালে।

(নৃত্য ও গীত)

এই পতন এই উৎপতন!
এই চট্ ওড়ন এই ঝট্ পতন!
ওড়ন পড়ন,
পতনোৎপতন!
এই উপর হতে নিচে নামন!
এই নিম্ন থেকে উচ্চে ধাবন!
এই হঠাৎ মাটিতে ছোঁ মারন,
এই সটাৎ আকাশে সোঁ চালন!
এই ঘুরতে ঘুরতে
ভূমিতে নাবন,
এই মাথা ঘুরে চিৎপাতন
হে পতিতপাবন।।

কি উৎপাত কিমিদং, আকাশে থেকে বেত্রদণ্ড হাতে তোমরা দ্বৌ? আমার ডবল প্রমোশন এলে নাকি? হে পতিত—

(সঙ্কট বিকটের প্রবেশ ও গীত)

সং ও বি। দেখো পার কিনা পার চিনতে ভেবেচিন্তে
চেনা জনে চিনতে হার একি বিপরীত এ?
কূর্ম। সিদ্ধ বা গন্ধর্ব চারণ কিনা,
বুঝতে পারছি না চশমা বিনা,
সময় নেইকো সেটা কিনতে।
সং ও বি। রও, কোথা যাও
এতকালের ফ্রেনশিপ্
একেবারে মেমারি শ্লিপ,
কেবা হই কও।
কূর্ম। পক্ষী না হস্তী পরিচয় দাও।
সং ও বি। তাকাও তাকাও, কেন ভয় পাও?
কূর্ম। বিকট সঙ্কট হে পতিতপাবন
এবারে বাঁচাও
যমদূত নাকি রও।
সং ও বি। মগধের জয়পুরে উৎপল সরোবরে
সঙ্কট বিকট নামে দু'টা হংস চরে
কম্বুগ্রীব কূর্ম হয় পড়শি এদের,
মগধের নাড়ু খেয়ে দিন গেল ঢের।।

কূর্ম। তাই বুঝি দিল্লির লাড্ডু খাওয়াতে এলে? হে পতিতপাবন, রক্ষে কর!

সং। একেবারে বিস্মরণ!

বি। দুষ্মন্ত বনে গেলে যে—আমরা যে সঙ্কট বিকট।

কূর্ম। এমন গোল্ডেন গুজ রকমের কাবাবি চেহারা তো তাদের ছিল না।

সং। গৃধ্ররাজসভায় গিয়েছিলাম।

বি। তিনি দিয়েছেন এই শিরোপা।

কূর্ম। যাক, বেঁচে এসেছ এই ঢের—আগাপাস্তালা প্লাক্‌ট হয়ে যাওনি, এই ঢের। গৃধ্ররাজ আমার সম্বন্ধে কি পরামর্শ স্থির করলেন?

সং। পর্কটি বন থেকে স্বহস্তে পাকাটি কাটি দিয়েছেন তোমায়।

বি। এই কথা বলে যে—এই কাঠি যেদিন উড়বে সেদিন তুমিও উড়বে।

কূর্ম। জরদ্‌গবের মতোই কথা হয়েছে। ওরে ভাই মাধ্যাকর্ষণ কেউ ঠেকাতে পারে না—সেটা জানতে সেই বালকের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না।

সং। গৃধ্ররাজ বুঝি বালক হলেন? বয়সের তাঁর গাছপাথর নেই।

কূর্ম। বুদ্ধির গোড়ায় একটি ফোঁটাও নেই। তাই তাঁর নামই হয়ে গেছে জরদ্‌গব—হ য ব র ল গোছের না পাখি, না গরু।

বি। বাচালতা কোরো না—
গুরুজনের সম্মুখে চাপল্য পরিহাস
যে ব্যক্তি করয়ে লোকে পায় উপহাস।।

কূর্ম। কে কার গুরু? পংখির দলের মধ্যে তিনি বৃদ্ধ বটে, কিন্তু আমরা যে সেই গজকচ্ছপের যুদ্ধের আমলের হে, তখন মহাভারতই ছিষ্টি হয়নি তো শকুনিমামার বংশাবতংশ। কূর্ম অবতারের কমঠপৃষ্ঠে মন্দার পর্বত রেখে যে কালে সমুদ্রমন্থন চলেছে, সেই সময়কার আমরা। বিশ্বাস না হয় পিঠে পর্বত ঘর্ষণের দাগ, পেটে সমুদ্রের তলাকার রত্নবালুকার আঁচড় এখনও বহন করছি। আমাকে সহজ বুড়ো ঠাউরো না। জল ছেড়ে স্থলে ওঠবার কৌশল অধিকার করেছি, দেখি মর্ত্য ছেড়ে স্বর্গ অধিকার করতে পারি কিনা।

সং। সে তো বলেছি, কাঠি আর তুমি একদিনে একসঙ্গে স্বর্গে—

বি। হাঃ হাঃ আর হাসিও না ভাই, ঠোঁট কপাটি লাগবে।

কূর্ম। শোনো স্থির হয়ে, কাঠি ওড়েনি বলতে চাও, চেয়ে দেখ দেখি আকাশপানে—ওটা কি উড়ছে?

সং। ঘুড়ি।

বি। পংখিরাজার জুড়ি।

কূর্ম। তোমাদের মাথা! উড়ছে কটা সরু সরু লাঠি, ওড়াচ্ছে কটা সরু-মোটা কাঠিতে প্রস্তুত লাটাই, সুতো টানছে কারিগর একটা মানুষ। যাকে ঘুড়ি বলছ, সেটা কাগজ আর কাঠির সমষ্টি, তাছাড়া কিছু নয়—দেখে নাও।—

(গীত)

কোন কারিগর ঘুড়ি ওড়াচ্ছে
কাঠি পঞ্জর কাগজ ওড়াচ্ছে,
নাটাই নাটাই ডুরি ফেরাচ্ছে,
কাঠি শূন্যভরে ঘুরে ঘুরে প্যাঁচ খেলাচ্ছে,
গোঁত্তা খেয়ে লপটাইয়ে
কোন ঝুঁকিয়ে ডাইনে বাঁয়ে
কাটাকাটি বাধাচ্ছে!
সাঁই সাঁই উপরে উঠছে নিচেতে নামছে

ঘাড় হেলাচ্ছে পাখা মেলাচ্ছে,
লেজ দোলাচ্ছে
কলে বাঁধা।।

ওই দেখো, কাগজ কাঠির ফানুষ তারার মালা গাঁথতে গাঁথতে উড়ে চলল। হুস্ করে ওটা কি উঠল জানো? হাউই কাঠি পাঁকাটির—আগুন ঘেরা সাপকে সঙ্গে নিয়ে ধূমকেতুর দেশে এঁকেবেঁকে চলে গেল। শুনতে পাচ্ছ—লোহার কাটি, লোহার শিক, লোহার পাখার ভীষণ ধ্বনি,—চেয়ে দেখো পাখিরা পালাচ্ছে ছত্রভঙ্গ হয়ে।

(নেপথ্যে এরোপ্লেনের গর্জন)

সং। কি ওটা?

বি। ওকি রাবণের পুষ্পক রথ নাকি?

কূর্ম। না, বিলিতি ডাকপিওন পাখি, অবনীন্দ্রের চিঠি নিয়ে চলেছে লণ্ডনে তরুণ ঠাকুরের কাছে। ওকে বলে কেউ এরোপ্লেন, কেউ উড়োজাহাজ।

সং। তারপর?

কূর্ম। তারপর আর কি? এই পাকাটি আছে, তোমরা আছ, শর্মা আছেন সশরীরে উৎপতন করব একসঙ্গে শূন্যভরে—পতিতপাবনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বৈকুণ্ঠে!

বি। বৈকুণ্ঠটা কোন বাগে শুনি—ঊর্ধ্বে না অর্ধে?

কূর্ম। সে ঠিক করে নেওয়া যাবে। স্বর্গের আর মর্ত্যের মাঝে একটা সাতরঙা তোরণদ্বার আছে দেখনি, সেইখানে গিয়ে দ্বারপালকে সুধোলেই সে বলে দেবে বৈকুণ্ঠ কোন বাগে!

সং। যদি বলে বৈকুণ্ঠটা এই পৃথিবীতেই?

বি। কিম্বা বলে বসে সেটা বলিভিয়াতে, পাতালে?

কূর্ম। অ্যাঁ কি বললে অ্যাঁ, পতিতপাবন কোথায় থাকেন তোমরা জান না? আগে সেটা ঠিক হওয়া চাই—খটকা লাগালে। কাঠি দাও দেখি একটা দিকনির্ণয় যন্ত্র লিখে ফেলি মাটিতে। খড়ি হলে ভাল হত—যাক তোমরাও ঘোরো চক্রাকারে আমার সাথে সাতপাক—

(নৃত্যগীত)

এই জলপথ স্থলপথ আকাশপথ,
এই তিনটা
স্থলেতে চলি ধরে লাঠি, জলেতে চলি সাঁতার কাটি,
আকাশপথে স্বপ্নে হাঁটি।
তবু ছাড়ে না বিপদ আপদ যেন রে দ্বিপদ
সঙ্গে চলে চিন্তা।
এই বড় গোল ছোট গোল খগোল ভূগোল
পার হলে তবে হই নিশ্চিন্তা।।

সং। আমি বলি তুমি যেখানে আছ সেইখানেই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকো। জলচর ভূচর দুই হয়েছে—খেচরটা নাই হলে!

বি। আকাশ থেকে পড়লে খেচরান্ন হয়ে যাবে, কাছিম আর থাকবে না স্থলে জলে কোথাও—সর্বভূকের উদরস্থ হবে!

কূর্ম। অ্যাঁ সেকি? জলে ভাসি শোলার মতো বাতাসে ভাসতে পারব না?

সং। না ভাসান হয়ে যাবে—চিরকালের মতো কাদার তাল হয়ে থাকবে।

কূর্ম। কি বলছ?

(গীত)

আমি জলে ভাসি শোলার প্রায়,
লোহার মতো ডুব দিই,

উড়তে আমার ভয় নেই
আমি উড়বই উড়ছি—ই।।

দু'জনে মিলে কাঁধে করে খানিকটা ঠেলে তুলে দাও, মাধ্যাকর্ষণের বাইরে—ব্যস! আর আমায় পায় কে? মেঘের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যাব।

সং। তুমি পিঠে চাপলে ডানা হেলাই কি করে?

বি। বললেই তো হল না—পিঠ দাও।

কূর্ম। তবে দাও আমায় ফুঁ দিয়ে বেলুন করে ছেড়ে, নয়তো ফানুসের মতো পেটে আগুন দিয়ে ছেড়ে দাও, কিম্বা ঘুড়ির মতো দুই পায়ে লক বেঁধে ওড়াও আমাকে।

সং। পার তো দু'খানা তালপাতার পাখা পিঠে বেঁধে আগে ওই উইটিপিটা থেকে আকাশবাগে উড়তে চেষ্টা করো।

কূর্ম। ও ভারি উঁচু টিপি, তাছাড়া উইপোকা খেয়ে আর আমি নড়তে পারব না। ঘুড়ি করেই ওড়াও দেখি, দাও তো ধরতা, তুমি এসো সামনে বিকট. তমি থাকো পিঠের দিকে ঠেলা দিতে সঙ্কট। চালাও উঠাও—

সং ও বি। হেঁইও জোয়ান, মালুম হোয়ান—নাঃ বিকট ভারি!

কূর্ম। রোসো, বেলুন করে পেটটা ফোলাতে ভুলেছি, নাও, ইস, ফেলে দিলে, দেখ তো! যাও খেয়েদেয়ে গায়ে জোর করে এসো। নামে সঙ্কট বিকট—গায়ে কিছু শক্তি নেই। রামসীতা মোটা মোটা দু'জন তারপর হনমান, জাম্ববান বিভীষণাদি এদের নিয়ে রাবণের পম্পকরথ টেনেছিল তোমাদের পূর্বপুরুষরা—তোমরা আমাকে তুলতেই পারলে না?

সং। কলিকাল, এখন সে শক্তি পাই কোথায়?

কূর্ম। আচ্ছা তোমরা গীত গাও, আমি Musical ড্রিলে ওড়া প্রাকটিস করি—

(নৃত্যগীত)

মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন
সম্পাতম্ বিপ্রপাতম্
মহাপাতম্ নিষ্পাতনম্
বক্রতির্যক তথাচোর্দ্ধং
অষ্টমম্ লঘু সঙ্গকম্
হাই জাম্প লো জাম্প জগঝম্প
উড়ছি উড়ছি অল্প অল্প উৎপাতন
শেষটাতে চিৎপাতন।।

কূর্ম। এ যে না একাৎ না ওকাৎ হে পতিতপাবন! এ যে জাঁতা ঘুরেই চললে! ওঃ আকাশ বাতাস শিলের মতো বুকে চেপে পড়ছে। মাটি একেবারে জাপটে ধরেছে ছাড়তে চায় না যে! ওঃ বুঝি তলিয়ে গেলাম সীতার পাতালে।

পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে, জ্বলে মলেম, কে কোথা আছ? দম বন্ধ মূর্ছা পতন হচ্ছে ক্রমে ধীরে ধীরে। ওঃ পতিতপাবন গেলেম সম্বিৎরহিত, সঙ্গীত—

(গীত)

ধরে তোল হে ও আমার ও দরদী,
বুঝি তলায়ে গেলাম ঘোরপাকে মার পাঁকে।
সোজা তো নয় দেহের বোঝা
তলিয়ে যেতেই চায় হে সোজা,
নড়িতে চড়িতে চায় সে পড়িতে
তুমি ছাড়া কে তারে রাখে সোজা?

হায়! কোথায় আমি উড়ব না পড়লেম মাটিতেই! হে মা পৃথিবী! তোমাকে নমস্কার! আমায় পরিত্যাগ করো, অত আঁকড়ে থেকো না! উঃ পাঁজরা চুলকায় কেন? পিঁপড়ের কামড়ে পালক গজাচ্ছে নাকি? উঃ কর- কর করছে—দু'দিকে দু'পাটি আক্কেল দাঁত! পিঁপড়ের পালক ওঠে মরিবার তরে—পালকে কাজ নেই, ও আমার খোলই ভাল হে পতিতপাবন! একটু ফুঁ দিয়ে আমায় উপুড় করে দাও। উপরে ওড়ার আর দরকার নেই। নমো নমো পতিতপাবন! হুঁইও—যাক উপুড়হস্ত মাটি ছাড়া—প্রেয়ার মঞ্জুর হয়েছে। আর ভয় নেই।

(সঙ্কট বিকটের প্রবেশ)

সং। হ্যাক ছোঃ কিমিদং?

বি। কিমিদং?

কূর্ম। এতক্ষণে কিমিদং! চিৎসাঁতারং, ঘুরপাকং, নৌকা ভাসায়নং, যাঁতা ঘুরায়নং, লাঠি খেলায়নং, সব হয়ে গেল—এতক্ষণে কিমিদং! বিলম্বেনালম্। এসো এখন উড্ডায়নংহোক!

সং। জরদ্গবের উপদেশ মতো এই কাঠির সঙ্গেই উড়তে হবে। দেখ তো কাঠির দুই মুখ ধরে তোমরা দু'জনে পার কিনা?

বি। কেন পারব না—এই তো!

কূর্ম। যদি একটা বেলকুল আমকাঁঠালের পাতা ফুল বসে; কি ধর, এই পদ্মফুলই রাখা হয়?

সং। তা হলেও পারি!

কূর্ম। যদি একটা বেলকুল আমকাঁঠালের ঝুড়ি বেঁধে দেওয়া যায়, তবে কি হয়?

বি। আমাদের বইতে কষ্ট হবে না, কিন্তু ভর সইলে হয়—সরু কাঠি মচকে গেলেই সর্বনাশ!

কূর্ম। তুমি কি ভাব এটা একটা সামান্য পাঁকাটি কাটি জরদ্গব পাঠিয়েছেন? যে ডালে গজ-কচ্ছপের যুদ্ধকালে গরুড় পক্ষী দাঁড়ে বসেছিলেন প্লক্ষদ্বীপের সেই পর্কটি গাছের একটি কচা! এ তোমার হরধনু নয় যে মৃড় মৃড় মচাৎ করে ভাঙবে! আর কথা নয়, চলো শূন্যভরে চলি মহীরাবণবৎ, কিম্বা পুষ্পরথে যথা বজ্রমুষ্টি বাসব! আমি লাঠি কামড়ে ঝুলতে থাকছি, তোমরা—চালাও হে, দ্রুতরথ মনোরথ গতি!

বি। অতিবুদ্ধি আগতং!

কূর্ম। না হে ছোকরা, বুদ্ধি তলিয়েছিল, ঘুরপাক আর ঝাঁকানি পেয়ে ঘুলিয়ে উঠেছে। এই দিলেম কচ্ছপের কামড় এতে আর কিন্তু নেই।

সং। এক ভাবনা আকাশপথে চলার সময় যদি তোমার ক্ষুধা পায়?

কূর্ম। পদ্মনাল সঙ্গে নিও।

বি। মুখ যে তোমার আটকা থাকচে—তার করলে কি?

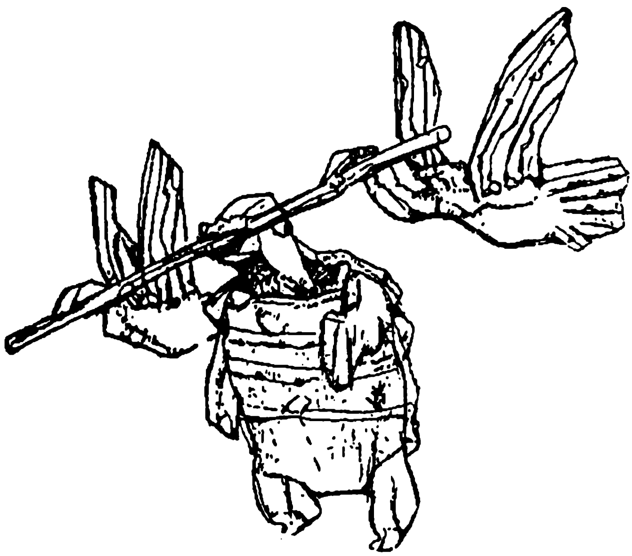
কূর্ম। অ্যাঁ অ্যাঁ—চলো ওধারে আর একবার ভেবে নেওয়া দরকার। বাঁক ধরে আমার সঙ্গে চলো—ওই উইঢিপির উপরে আমায় তোলো। ব্যাপারটা বুঝে নিই প্র্যাকটিকালি ফিজিবল হবে কি না। এই ধরলেম কাঠি চলতো গিয়ে চিতবাড়ি খেলে—

(গীত)

আরে উত্তরেতে মেঘ করেছে কুমড়ো যাচ্ছে উড়ে
হারি শুঁড়ো ডানা মেলেছে মাটি ছেড়ে দূরে,
হুরুরো হো হুরুরো হো হুরুরো হো।
আরে ভাই সামাল সামাল ধরি রও হাল,
নামায়ো না পাল ঘটিবে জঞ্জাল,
চেপে আছি হাল লঙ্গর জলদি করে টানো,
তেজে চল তেজে চল হুরুর হো হুরুর হো।।

(সঙ্কট বিকটের নৃত্যগীত)

ওড়ে ওড়ে হংস ওড়ে নীল আকাশে ঘোরে ফেরে
শরত মেঘের পরশটানা বাতাস চেনা মিলিয়ে ডানা,
ওরে ওরা ভোরে ভোরে ঝিলিক ধরে,



যায় আসে আসে যায় ডানায় ডানায়
শিহরায় চমকায় জোরে জোরে।। (প্রস্থান)

(রাজা, মন্ত্রী, পণ্ডিত, মাস্টার, ভাঁড় প্রভৃতির প্রবেশ)

পণ্ডিত। অহো কিমেতৎ ব্যোমৈকান্ত বিচারিণঃ? ও মাস্টার, বিচার করে দেখো তো কি ওটা উঠেছে আকাশে? বোমা নয়?

মাস্টার। হেলিজ কমেট বোধ হচ্ছে—টেলিস্‌কোপ হলে দেখা যেত।

মন্ত্রী। তোমার বায়স্কোপ হয়েছে—কবরেজ দেখাও। কমেট বল কারে?

রাজা। কমেট আমি দেখিনি, চপার সাহেবের তাম্বুর বাহিরে পড়ে আছে বাক্সের মতো চৌকশ ব্যাপার একটা, কমেট কখনও গোল হয়?

মন্ত্রী। বোধ করি চন্দ্রগ্রহণ লেগেছে।

পণ্ডিত। দিবসে চন্দ্রগ্রহণ আসেন কি প্রকারে?

রাজা। তবে সূর্যগ্রহণ, শঙ্খধ্বনি করো। তুমি কি বলছ গোপাল ভাঁড়?

ভাঁড়। গন্ধমাদন উড়িলা আকাশে বিস্তারি বিশাল পক্ষ কিম্বা নভোদেশে অনড্ডান মহাছায়া ফেলিয়া ভূতলে আঁধারি পর্কটি বন গিরি নদী নদ।

রাজা। ঠিক বলেছ।

পণ্ডিত। ওটা মহারাজ, পুষ্পক রথ, বিভীষণ চলেছেন অযোধ্যায় হয় রামলীলা দেখতে নয় মিটিং করতে।

রাজা। এ বলে গন্ধমাদন ও বলে বিভীষণ, কার কথা শুনি।

মন্ত্রী। এবারে ঠেকেছেন পণ্ডিত মশায়।

পণ্ডিত। না না রোসো ভাল করে দেখি, হাঁ গন্ধমাদনের টুকরোই বটে। তাই তো বলি সারা গন্ধমাদন তো উড়তে পারে না। ওই দেখো ভরতের বাঁটুল এখনও ওতে গাঁথা রয়েছে। মহারাজের কথাই ঠিক।



ভাঁড়। দাঁড়িপাল্লার মতো যে দেখা যায়।

পণ্ডিত। তার প্রমাণ?

ভাঁড়। প্রমাণ কালিদাস—পূর্বাপরং তোয়নিবিধগ্রাহ্যস্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।

পণ্ডিত। বেঁচে থাকুন কালিদাস—গিরিরাজ চলেছেন কন্যার বাড়ি খোকা গণেশের অন্নপ্রাশনে।

রাজা। চেং ঘুড়ির মতো চীর শব্দে ওটা যেন নামছে।

মন্ত্রী। হাঁ তাই তো পড়ছেই তো পতিতপাবন মাঠের দিকে।

রাজা। মন্দিরে বুঝি ধাক্কা খায়।

ভাঁড়। লেগেছে, লেগেছে—দেখেন মন্দিরের ধ্বজাটা কাত হয়ে গেল।

রাজা। চলো হে কি কাণ্ড দেখা যাক—

পণ্ডিত। মহারাজ চোখ ঢাকেন, ইন্দ্রপাত দেখতে নেই। ওই শোনেন আকাশবাণী—আমি পলেম মলেম পড়ছি মরছি উড়ছি উড়ছি।

মাস্টার। গলাটা মানুষের মতো নয়?

পণ্ডিত। তোমার যেমন বিদ্যে। দেবকণ্ঠ কম্বুশাঁখের মতো ধ্বনি দিচ্ছে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আকাশ থেকে পড়ছে ফুলঝুরি ছেড়ে।

ভাঁড়। এ নিশ্চয় কেউ শাপেনাস্তং গমিত মহিমা—ও পাড়ার কারু ঘরে আবির্ভূত হচ্ছেন।

রাজা। তোমারই ঘরে আবির্ভূত হচ্ছেন না তাই বা জানলে কি প্রকারে?

ভাঁড়। চললেম মহারাজ ষষ্ঠীপূজা কি শান্তিযাগ তা দেখা চাই। কি বলেন মন্ত্রী মশাই?

রাজা। আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দ যে, সেনাপতি কোথায়?

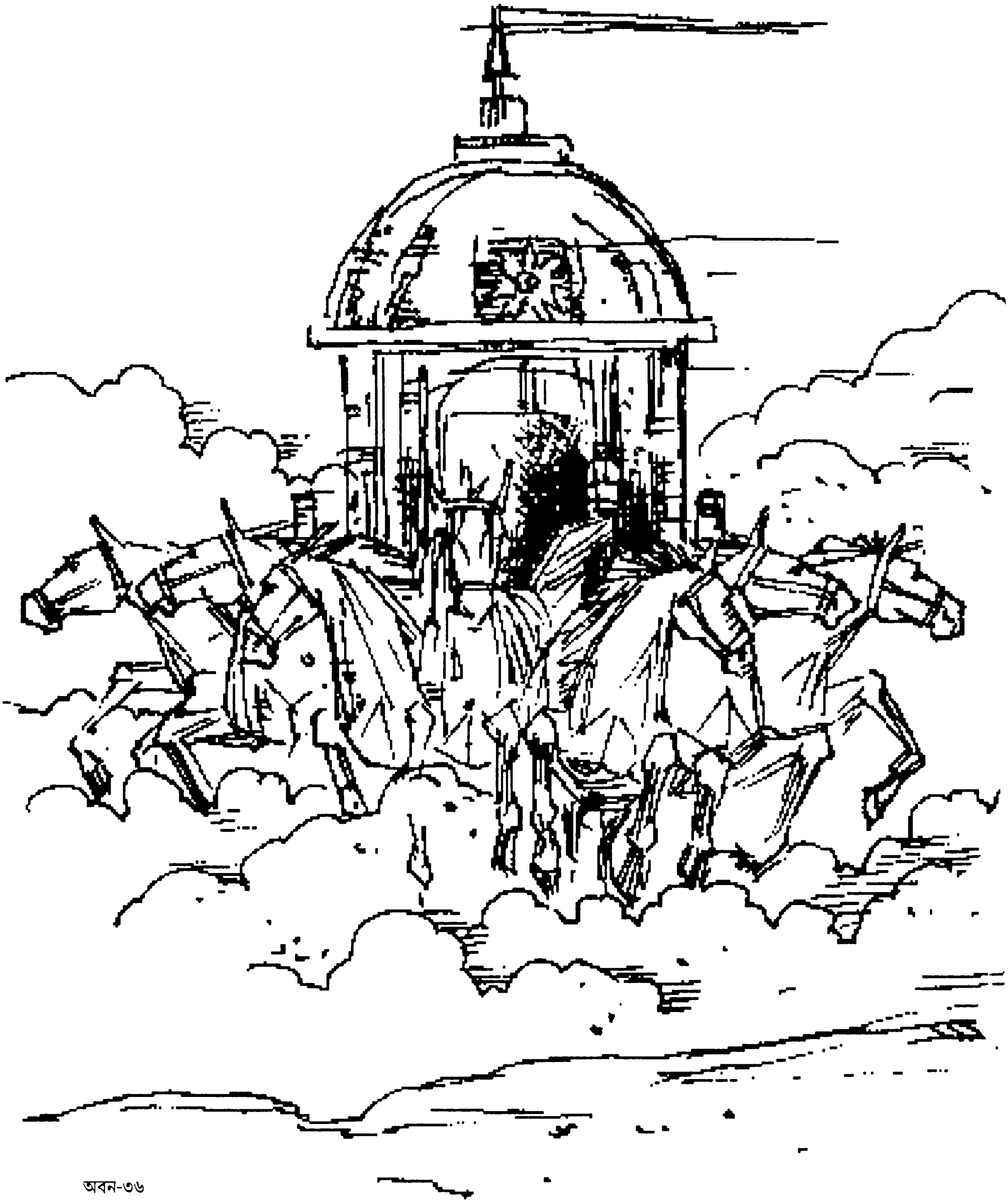
সেনা। চলেন মহারাজ, খোলা ছাতে থাকা ঠিক নয় কি জানি শত্রুপক্ষ হতেও পারে।

ভিখারি। ও যাই হোক! দান করো দান করো অন্নদান বস্ত্রদান, টাকাদান, কড়িদান। (সকলের প্রস্থান)

(কূর্মের প্রবেশ)

কূর্ম। বাংলাদেশের নরম মাটি বলেই এবারে আকাশ থেকে পড়ে রক্ষে পেয়ে গেলাম—ধন্যবাদ হে পতিতপাবন। উড়নচণ্ডির ব্রত ভালয় ভালয় সাঙ্গ হল তোমার কৃপায়। চলি গঙ্গাস্নানে!

রাজ কাহিনী



অবন-৩৬



শিলাদিত্য

শিলাদিত্যের যখন জন্ম হয়নি, যে সময়ে বল্লভীপুরে রাজা কনকসেনের বংশের শেষ রাজা রাজত্ব করছিলেন, সেই সময় বল্লভীপুরে সূর্যকুণ্ড নামে একটি অতি পবিত্র কুণ্ড ছিল। সেই কুণ্ডের একধারে প্রকাণ্ড সূর্যমন্দিরে এক অতি বৃদ্ধ পুরোহিত বাস করতেন। তাঁর একটিও পুত্রকন্যা কিংবা বন্ধুবান্ধব ছিল না। অনন্ত আকাশে সূর্যদেব যেমন একা, তেমনই আকাশের মতো নীল প্রকাণ্ড সূর্যকুণ্ডের তীরে আদিত্য মন্দিরে সূর্যপুরোহিত তেজস্বী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বড়োই একাকী, বড়োই সঙ্গীহীন ছিলেন। মন্দিরে দীপদান, ঘণ্টাধ্বনি, উদয়-অস্ত দুই সন্ধ্যা আরতি, সকল ভারই তাঁর উপর—ভৃত্য নেই, অনুচর নেই, একটি শিষ্যও নেই! বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একাই প্রতিদিন ত্রিশ সের ওজনের পিতলের প্রদীপে দুই সন্ধ্যা সূর্যদেবের আরতি করতেন; প্রতিদিনই সেই শীর্ণ হাতে রাক্ষস রাজার রাজমুকুটের মতো মন্দিরের প্রকাণ্ড ঘণ্টা বাজাতেন; আর মনে মনে ভাবতেন, যদি একটি সঙ্গী পাই, তবে এই বৃদ্ধ বয়সে তার হাতে সমস্ত ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

সূর্যদেব ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। একদিন পৌষ মাসের প্রথমে ঘন কুয়াশায় চারিদিক অন্ধকার ছিল, সূর্যদেব অস্ত গেছেন, বৃদ্ধ পুরোহিত সন্ধ্যার আরতি শেষ করে ভীমের বুকপাটাখানার মতো প্রকাণ্ড মন্দিরের লোহার কপাট বহুকষ্টে বন্ধ করেছেন, এমন সময় ম্লানমুখে একটি ব্রাহ্মণকন্যা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হল—পরনে ছিন্নবাস কিন্তু অপূর্ব সুন্দরী! বোধ হল যেন শীতের ভয়ে একটি সন্ধ্যাতারা সূর্যমন্দিরে আশ্রয় চায়! ব্রাহ্মণ দেখলেন—কন্যাটি সুলক্ষণা, অথচ তার বিধবার বেশ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—'কে তুমি? কি চাও?' তখন সেই ব্রাহ্মণবালিকা কমলকলির মতো ছোট্ট দুইখানি হাত জোড় করে বললে—'প্রভু, আমি আশ্রয় চাই; ব্রাহ্মণ-কন্যা, গুর্জর দেশের বেদবিদ ব্রাহ্মণ দেবাদিত্যের একমাত্র কন্যা আমি, নাম সুভাগা; বিয়ের রাতে বিধবা হয়েছি, সেই দোষে দুর্ভাগী বলে সকলে মিলে আমায় আমাদের দেশের বার করেছে। প্রভু, আমার মা ছিলেন, এখন মা-ও নেই, আমায় আশ্রয় দাও।' ব্রাহ্মণ বললেন—'আরে অনাথিনী, এখানে কোন সুখের আশায় আশ্রয় চাস? আমার অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আমি যে নিতান্ত দরিদ্র, বন্ধুহীন।'

ব্রাহ্মণ মনে মনে এই কথা বললেন বটে, কিন্তু কে যেন তাঁর মনের ভিতর বলতে লাগল—'হে দরিদ্র, হে

বন্ধুহীন, এই বালিকাকে তোমার বন্ধু করো, আশ্রয় দাও।' ব্রাহ্মণ একবার মনে করলেন আশ্রয় দিই; আবার ভাবলেন—যে মন্দিরে আশি বৎসর ধরে একা এই সূর্যদেবের পূজা করলেম আজ শেষ দশায় আবার কার হাতে পূজার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। ব্রাহ্মণ ইতস্তত করতে লাগলেন। তখন সহসা সন্ধ্যার সমস্ত অন্ধকার ভেদ করে পৃথিবীর পশ্চিম পার থেকে একবিন্দু সূর্যের আলো সেই দুঃখিনী বালিকার মুখখানিতে এসে পড়ল। ভগবান আদিত্যদেব যেন নিজের হাতে দেখিয়ে দিলেন—এই আমার সেবাদাসী! হে আমার প্রিয় ভক্ত, এই বালিকাকে আশ্রয় দাও, যেন চিরদিন এই দুঃখিনী বিধবা আমার সেবায় নিযুক্ত থাকে। ব্রাহ্মণ জোড়হস্তে সূর্যদেবকে প্রণাম করে, দেবাদিত্য ব্রাহ্মণের কন্যা সুভাগাকে সূর্যমন্দিরে আশ্রয় দিলেন।

তারপরে কতদিন কেটে গেল, সুভাগা তখন মন্দিরের সমস্ত কাজই শিখেছেন, কেবল ননীর মতো কোমল হাতে ত্রিশ সের ওজনের সেই আরতির প্রদীপটা কিছুতেই তুলতে পারলেন না বলে আরতির কাজটা বৃদ্ধকেই করতে হত। একদিন সুভাগা দেখলেন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জীর্ণ শরীর যেন ভেঙে পড়েছে—আরতি প্রদীপ শীর্ণ হাতে টলে পড়ছে। সেই দিন সুভাগা বল্লভীপুরের বাজারে গিয়ে এক সের ওজনের একটি ছোটো প্রদীপ নিয়ে এসে বললেন—'পিতা, আজ সন্ধ্যার সময় এই প্রদীপে সূর্যদেবের আরতি করুন।' ব্রাহ্মণ একটু হেসে বললেন—'সকালে যে প্রদীপে দেবতার আরতি আরম্ভ করেছি, সন্ধ্যাতেও সেই প্রদীপে দেবতার আরতি করা চাই! নতুন প্রদীপ তুলে রাখো, কাল নতুন দিনে নতুন প্রদীপে সূর্যদেবের আরতি হবে।' সেই দিন ঠিক দ্বিপ্রহরে সূর্যের আলোয় যখন সমস্ত পৃথিবী আলোময় হয়ে গেছে, সেই সময় ব্রাহ্মণ সুভাগাকে সূর্যমন্ত্র শিক্ষা দিলেন—যে মন্ত্রের গুণে সূর্যদেব স্বয়ং এসে ভক্তকে দর্শন দেন, যে মন্ত্র জীবনে একবার ছাড়া দুইবার উচ্চারণে নিশ্চয় মৃত্যু। তারপর সন্ধিক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকারে আরতি শেষে নিভন্ত প্রদীপের মতো ব্রাহ্মণের জীবন-প্রদীপ ধীরে ধীরে নিভে গেল—সূর্যদেব সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার করে অস্ত গেলেন। সুভাগা একলা পড়লেন।

প্রথম দিনকতক সুভাগা বৃদ্ধের জন্য কেঁদে কেঁদে কাটালেন। তারপর দিনকতক নিজের হাতে জঙ্গল পরিষ্কার করে মন্দিরের চারিদিকে ফলের গাছ, ফুলের গাছ লাগাতে কেটে গেল। আরও কতদিন মন্দিরের পাথরের দেয়াল মেজে-ঘষে পরিষ্কার করে তার গায়ে লতা, পাতা, ফুল, পাখি, হাতি, ঘোড়া, পুরাণ, ইতিহাসের পট লিখতে চলে গেল। শেষে সুভাগার হাতে আর কোনও কাজ রইল না। তখন তিনি সেই ফলের বাগানে ফুলের মালঞ্চে একা-একাই ঘুরে বেড়াতেন। ক্রমে যখন সেই নতুন বাগানে দুটি-একটি ফল পাকতে আরম্ভ হল, দুটি-একটি ফুল ফুটতে লাগল, তখন ক্রমে ছোটোপাখি, গুটিকতক রঙিন প্রজাপতি, সেই সঙ্গে একপাল ছোটোবড়ো ছেলেমেয়ে দেখা দিলে। প্রজাপতি শুধু একটুখানি ফুলের মধু খেয়ে সন্তুষ্ট ছিল, পাখি শুধু দু-একটা পাকা ফল ঠোকরাত মাত্র; কিন্তু সেই ছেলের পাল ফুল ছিঁড়ে, ফল পেড়ে, ডাল ভেঙে চুরমার করত। সুভাগা কিন্তু কাকেও কিছু বলতেন না, হাসিমুখে সকল উৎপাত সহ্য করতেন। গাছের তলায় সবুজ ঘাসে নানারঙের কাপড় পড়ে ছোটোছোটো ছেলেমেয়ে খেলে বেড়াত, দেখতে দেখতে সুভাগার দিনগুলো আনমনে কেটে যেত। ক্রমে বর্ষা এসে পড়ল—চারিদিকে কালো মেঘের ঘটা, বিদ্যুতের ছটা, আর গুরুগুরু গর্জন—সেই সময় একদিন ক্ষুরের মতো পুবের হাওয়া সুভাগার নতুন বাগানে ফুলের বোঁটা কেটে, গাছের পাতা ঝরিয়ে, তার সাধের মালঞ্চ শূন্যপ্রায় করে শনশন শব্দে চলে গেল। পাখির ঝাঁক হাওয়ার মুখে উড়ে গেল; প্রজাপতির ভাঙা ডানা ফুলের পাপড়ির মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, ছেলের পাল কোথায় অদৃশ্য হল। সুভাগা তখন সেই ধারা শ্রাবণে একা বসে বসে বাপমায়ের কথা, শ্বশুরশাশুড়ির নিষ্ঠুরতা, আর বিয়ের রাত্রের সুন্দর বরের হাসিমুখের কথা মনে করে কাঁদতে লাগলেন; আর মনে মনে ভাবতে লাগলেন—'হায় এই নির্জনে সঙ্গীহীন বিদেশে কেমন করে সারাজীবন একা কাটাব।' হরিণের চোখের মতো সুভাগার কালো কালো দুটি বড়ো বড়ো চোখ অশ্রুজলে ভরে উঠল। তিনি পুবে দেখলেন অন্ধকার, পশ্চিমে অন্ধকার, উত্তর, দক্ষিণে—চারিদিকে অন্ধকার; মনে পড়ল, এমনি অন্ধকারে একদিন তিনি সেই মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আজও সেদিনের মতো অন্ধকার—সেই বাদলার হাওয়া, সেই নিঃশব্দ প্রকাণ্ড সূর্যমন্দির—কিন্তু হায়, কোথায় আজ সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, যিনি সেই দুর্দিনে অনাথিনী অভাগিনী সুভাগাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন! সুভাগার কালো চোখ থেকে দুটি ফোঁটা জল দুই বিন্দু বৃষ্টির মতো অন্ধকারে ঝরে পড়ল। সুভাগা মন্দিরের সমস্ত দুয়ার বন্ধ করে প্রদীপ জ্বালিয়ে ঠাকুরের আরতি করলেন। তারপর কি জানি কি মনে করে, সুভাগা সেই সূর্যমূর্তির সম্মুখে ধ্যানে বসলেন। ক্রমে সুভাগার দুটি চক্ষু স্থির হয়ে এল, চারিদিক থেকে ঝড়ের ঝনঝনা, মেঘের কড়মরি, ক্রমে যেন দূর হতে বহুদূরে সরে গেল! সুভাগার মনে আর কোনও শোক নেই

কোনও দুঃখ নেই। তাঁর মনের অন্ধকার যেন সূর্যের তেজে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সুভাগা ধীরে ধীরে, ভয়ে ভয়ে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে শেখা সেই সূর্যমন্ত্র উচ্চারণ করলেন; তখন সমস্ত পৃথিবী যেন জেগে উঠল, সুভাগা যেন শুনতে পেলেন, চারিদিকে পাখির গান, বাঁশির তান, আনন্দের কোলাহল! তারপর গুরুগুরু গভীর গর্জনে সমস্ত আকাশ কাঁপিয়ে, চারিদিক আলোয় আলোময় করে সেই মন্দিরের পাথরের দেয়াল, লোহার দরজা যেন আগুনে আগুনে গলিয়ে দিয়ে সাতটা সবুজ ঘোড়ার পিঠে আলোর রথে কোটি কোটি আগুনের সমান জ্যোতির্ময় আলোময় সূর্যদেব দর্শন দিলেন। সে আলো সে জ্যোতি মানুষের চোখে সহ্য হয় না। সুভাগা দু'হাতে মুখ ঢেকে বললেন—'হে দেব, রক্ষা করো, ক্ষমা করো, সমস্ত পৃথিবী জ্বলে যায়!' সূর্যদেব বললেন—'ভয় নেই, ভয় নেই, বৎসে, বর প্রার্থনা করো।' বলতে বলতে সূর্যদেবের আলো ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এল। একটুখানি রাঙা আভা সধবার সিঁদুরের মতো সুভাগার সিঁথি আলো করে রইল। তখন সুভাগা বললেন—'প্রভু, আমি পতিপুত্রহীনা, বিধবা অনাথিনী, বড়োই একাকিনী, আমাকে এই বর দাও যেন এই পৃথিবীতে আমায় আর না থাকতে হয়; সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে আজই তোমার চরণতলে আমার মরণ হোক।' সূর্যদেব বললেন—'বৎসে, দেবতার বরে মৃত্যু হয় না, দেবতার অভিশাপে মৃত্যু হয়, তুমি বর প্রার্থনা করো!' তখন সুভাগা সূর্যদেবকে প্রণাম করে বললেন—'প্রভু, যদি বর দিলে, তবে আমাকে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে দাও, আমি তাদের মানুষ করি! ছেলেটি তোমারই মতো তেজস্বী হবে, মেয়েটি হবে যেন চাঁদের কণার মতো সুন্দরী!'

সূর্যদেব তথাস্তু বলে অন্তর্ধান করলেন। ধীরে ধীরে সুভাগার চোখে ঘুম এল, সুভাগা পাষাণের উপর আঁচল পেতে শুয়ে পড়লেন। চারিদিক ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। তখন ভোর হয়ে এসেছে, সুভাগা ঘুমের ঘোরে শুনতে লাগলেন, তাঁর সেই ভাঙা মালঞ্চে দুটি ছোটো পাখি কি সুন্দর গান ধরেছে। ক্রমে সকাল বেলার একটুখানি সোনার আলো সুভাগার চোখে পড়ল, তিনি তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন, আঁচলে টান পড়ল, চেয়ে দেখলেন কচি দুটি ছেলেমেয়ে কোলের কাছে ঘুমিয়ে আছে। সূর্যদেবের বর সফল হল—সুভাগা দেবতার মতো সুন্দর সন্তান দুটি কোলে নিলেন। সকল লোকের চোখের আড়ালে নির্জন মন্দিরে জন্ম হল বলে, সুভাগা দু'জনের নাম দিলেন, গায়েব, গায়েবী।

সুভাগা গায়েব আর গায়েবীকে বুকে নিয়ে মন্দিরের বাইরে এলেন; তখন পুবে সূর্যদেব উদয় হচ্ছিলেন, পশ্চিমে চাঁদ অস্ত যাচ্ছিলেন। সুভাগা দেখলেন, গায়েবের মুখে সূর্যের আলো ক্রমে ফুটে উঠতে লাগল, আর গায়েবীর কালো চুলে চাঁদের জ্যোৎস্না ধীরে ধীরে নিভে গেল। তিনি মনে মনে বুঝলেন, গায়েবীকে এই পৃথিবীতে বেশিদিন ধরে রাখা যাবে না।

গায়েব ক্রমশ যখন বড়ো হয়ে পাঠশালায় যেতে আরম্ভ করলেন, সেই সময় গায়েবী মায়ের কাছে বসে মন্দিরের কাজকর্ম শিখতে লাগলেন। গায়েব যেমন দুরন্ত দুর্দান্ত, গায়েবী তেমনি শিষ্ট শান্ত। গায়েবীর সঙ্গে কত ছোটো ছোটো মেয়ে সেধে সেধে খেলা করতে আসত, কিন্তু গায়েবের উৎপাতে পাঠশালার সকল ছেলে অস্থির হয়ে উঠেছিল। শেষে তারা সকলে মিলে একদিন পরামর্শ করলে—গায়েব আমাদের চেয়ে লেখায়, পড়ায়, গায়ের জোরে সকল বিষয়ে বড়ো; এসো আমরা সকলে মিলে গায়েবকে রাজা করি, আর আমরা তার প্রজা হই; তাহলে গায়েব আর তাদের উপর অত্যাচার করতে পারবে না। এই বলে সকলে মিলে গায়েবকে রাজা বলে কাঁধে করে নৃত্য আরম্ভ করলে। গায়েব হাসিখুশিতে সেই সকল ছোটো ছোটো ছেলের কাঁধে বসে আছেন, এমন সময় একটি খুব ছোটো ছেলে বলে উঠল—'আমি রাজার পূজারী। মন্ত্র পড়ে গায়েবকে রাজটীকা দেব।' তখন সেই ছেলের পাল গায়েবকে একটা মাটির ঢিবির উপর বসিয়ে দিলে। গায়েব সত্যি রাজার মতো সেই মাটির সিংহাসনে বসে আছেন, এমন সময় সেই ছোটো ছেলেটি তাঁর কপালে তিলক টেনে দিয়ে বললে—'গায়েব, তোমার নাম জানি, বলো তোমার মায়ের নাম কি? বাপের নাম কি?' গায়েব বললেন—'আমার নাম গায়েব, আমার বোনের নাম গায়েবী—মায়ের নাম সুভাগা। আমার বাপের নাম—কি?' গায়েব জানেন না যে তিনি সূর্যদেবের বরপুত্র। নাম বলতে পারলেন না, লজ্জায় অধোবদন হলেন, চারিদিকে ছেলের পাল হো হো করে হাততালি দিতে লাগল, লজ্জায় গায়েবের মুখ লাল হয়ে উঠল। তখন এক পদাঘাতে সেই মাটির সিংহাসন চূর্ণ করে চড়চাপড়ে ছোটো ছেলেদের ফোলা গাল বেশি ফুলিয়ে, রাগে কাঁপতে কাঁপতে গায়েব একেবারে দেবমন্দিরে উপস্থিত হলেন। সুভাগা গায়েবীর হাতে পিতলের একটি ছোটো প্রদীপ দিয়ে কেমন করে সূর্যদেবের আরতি করতে হয় শিখিয়ে দিচ্ছিলেন; এমন সময় ঝড়ের মতো গায়েব এসে পিতলের প্রদীপটা কেড়ে নিয়ে টান

মেরে ফেলে দিলেন। নিরেট পিতলের প্রদীপ পাথরের দেয়ালে লেগে ঝনঝন শব্দে চুরমার হয়ে গেল, সেই সঙ্গে সূর্যদেবের মূর্তি আঁকা একখানা কালো পাথর সেই দেয়াল থেকে খসে পড়ল। সুভাগা বললেন—'আরে উন্মাদ কি করলি? সূর্যদেবের মঙ্গল-আরতি ছারখার করে দেবতার অপমান করলি?' গায়েব বললেন—'দেবতাও বুঝিনে, সূর্যও বুঝিনে; বলো, আমি কার ছেলে? না হলে আজ তোমার সূর্যমূর্তি কুণ্ডের জলে ডুবিয়ে দেব।' যদিও প্রকাণ্ড সেই সূর্যমূর্তি ভীম এলেও তুলতে পারতেন না তবু গায়েবের বীরদর্প দেখে সুভাগার মনে হল—কি জানি কি করে! তিনি তাড়াতাড়ি গায়েবের দুটি হাত ধরে বললেন,—'বাছা শান্ত হ, স্থির হ, আর সূর্যদেবের অপমান করিসনে; পিতার নামে কি কাজ? আমি তোর মা আছি, গায়েবী তোর বোন, আর তোর কিসের অভাব?' গায়েব তখন কাঁদতে-কাঁদতে বললেন—'তবে কি মা, আমি নীচ, জঘন্য, অপবিত্র পথের ধুলো, ভিখারির অধম?' কথাগুলো তীরের মতো সুভাগার বুকে বাজল, তিনি দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন; মনে মনে ভাবলেন—হায় ভগবান, কি করলে? এ দুরন্ত ছেলেকে কেমন করে বোঝাই, কি বলে প্রবোধ দিই? গায়েব গায়েবী নীচ নয়, অপবিত্র নয়, সূর্যের সন্তান, সকলের চেয়ে পবিত্র, এ কথায় কে বিশ্বাস করবে? সুভাগার সূর্যমন্ত্রের কথা একবার স্মরণ হল, কিন্তু যখন ভাবলেন যে দুইবার মন্ত্র উচ্চারণ করলে নিশ্চয় মৃত্যু—এই কচি বয়সে গায়েব গায়েবীকে একা ফেলে পৃথিবী ছেড়ে চিরকালের মতো চলে যেতে হবে—তখন তাঁর মায়ের প্রাণ কেঁদে উঠল। সুভাগা বললেন—'বাছা কথা রাখ, ক্ষান্ত দে, চল আমরা অন্য দেশে চলে যাই, সূর্যদেবকেই তোদের পিতা বলে জেনে রাখ।' গায়েব ঘাড় নাড়লেন, বিশ্বাস হয় না। তখন সুভাগা বললেন—'তবে মন্দিরের সমস্ত দরজা বন্ধ কর, এখনি তোদের পিতাকে দেখতে পাবি, কিন্তু হায়, আমাকে আর ফিরে পাবি না।' সুভাগার দুই চক্ষে জল পড়তে লাগল। গায়েবী বললে—'ভাই, মাকে কেন কষ্ট দাও?' গায়েব উত্তর না দিয়ে মন্দিরের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিলেন। সুভাগা দু'জনের হাত ধরে সূর্যমূর্তির সম্মুখে গিয়ে ধ্যানে বসলেন। এই মন্দিরে একাকিনী সুভাগা একদিন মৃত্যু ইচ্ছা করে যে মন্ত্র নির্ভয়ে উচ্চারণ করেছিলেন, কালসর্পের মতো সেই সূর্যমন্ত্র আজ উচ্চারণ করতে তাঁর মায়ের প্রাণে কতই ভয়, কতই ব্যথা! সূর্যদেব দর্শন দিলেন—সমস্ত মন্দির যেন রক্তের স্রোতে ভাসিয়ে প্রচণ্ড মূর্তিতে দর্শন দিলেন। সুভাগা বললেন—'প্রভু গায়েব গায়েবী কার সন্তান?' সূর্যদেব একটি কথা কইলেন না। দেখতে দেখতে সূর্যের প্রচণ্ড তেজে ভিখারিণী সুভাগার সুন্দর শরীর জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল। গায়েবী কেঁদে উঠল—'মা, মা!' গায়েব জিজ্ঞাসা করলেন—'মা কোথায়?' সূর্যদেব কোনও‌ই উত্তর করলেন না, কেবল পাষাণের উপর রাশীকৃত ছাই দেখিয়ে দিলেন! গায়েব বুঝলেন মা আর নেই। রাগে দুঃখে তাঁর চোখে আগুন ছুটল। গায়েব মন্দিরের কোণ থেকে সূর্যমূর্তি আঁকা সেই পাথরখানা কুড়িয়ে সূর্যদেবকে ছুড়ে মারলেন। যমরাজের মহিষের মাথাটার মতো সেই কালো পাথর সূর্যদেবের মুকুটে লেগে জ্বলন্ত কয়লার মতো একদিকে ঠিকরে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে গায়েব মূর্চ্ছিত হলেন।

অনেকক্ষণ পরে গায়েব জেগে উঠলেন, তখন সূর্যদেব অন্তর্ধান করেছেন, মাথার কাছে শুধু গায়েবী বসে আছে। গায়েব জিজ্ঞাসা করলেন—'সূর্যদেব কোথায়?' গায়েবী তখন সেই কালো পাথরখানা দেখিয়ে বললে—'ওই নাও ভাই আদিত্যশিলা। এই পাথর তুমি যার উপর ফেলবে তার নিশ্চয় মৃত্যু। সূর্যদেব এটি তোমায় দিয়ে গেছেন আর বলেছেন তুমি তাঁরই ছেলে, আজ থেকে তোমার নাম হল শিলাদিত্য। তোমার বংশ সূর্যবংশ নাম নিয়ে পৃথিবী শাসন করবে, আর তুমি মনে মনে ডাকলেই ওই সূর্যকুণ্ড থেকে সাতটা ঘোড়ার পিঠে সূর্যের রথ তোমার জন্যে উঠে আসবে! রথের নাম সপ্তাশ্বরথ! যাও ভাই, সপ্তাশ্বরথে আদিত্যশিলা হাতে পৃথিবী জয় করে এসো।' গায়েব বললেন—'তোকে কোথা রেখে যাব বোন?' গায়েবী বলল—'ভাই আমাকে এই মন্দিরে রেখে যাও, আমি বাগানের ফল, কুণ্ডের জল খেয়ে জীবন কাটাব। তারপর তুমি যখন রাজা হবে, আমায় এই মন্দির থেকে রাজবাড়িতে নিয়ে যেয়ো।'

গায়েব মহা আনন্দে গায়েবীকে সেই মন্দিরে বন্ধ রেখে সাত ঘোড়ার রথে পৃথিবী জয় করতে চলে গেলেন। আর গায়েবী সেই রাশীকৃত ছাই সূর্যকুণ্ডের জলে ঢেলে দিয়ে 'মারে! ভাইরে!' বলে পাষাণের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল।

সেদিন গভীর রাত্রে যখন আকাশে তারা ছিল না, পৃথিবীতে আলো ছিল না, সেই সময় হঠাৎ সূর্যমন্দির ঝনঝন শব্দে কেঁপে উঠল। তারপর আশি মণ কালো পাথরের প্রকাণ্ড সূর্যমূর্তিকে নিয়ে আর ননীর পুতুলের মতো সুন্দরী গায়েবীকে নিয়ে, আধখানা মন্দির ক্রমে মাটির নিচে চলে যেতে লাগল! গায়েবী প্রাণভয়ে পালাবার

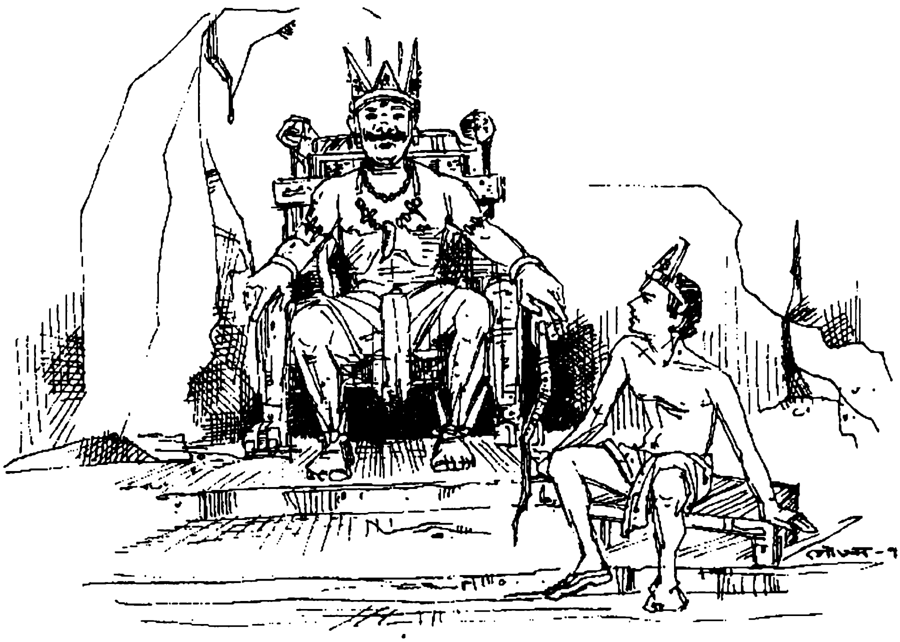
চেষ্টা করলে। বৃথা চেষ্টা। গায়েবী দেয়াল ধরে ওঠবার চেষ্টা করলে, পাথরের দেয়ালে পা রাখা যায় না—কাচের সমান। তখন গায়েবী 'ভাইরে!' বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তারপর সব শেষ, সব অন্ধকার।

কতদিন চলে গেছে গায়েব সেই সপ্তাশ্বরথে পৃথিবী ঘুরে দেশবিদেশ থেকে সৈন্যদের সংগ্রহ করে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে, শেষে বল্লভীপুরের রাজাকে সেই আদিত্যশিলা দিয়ে সম্মুখযুদ্ধে সংহার করে শিলাদিত্য নাম নিয়ে রাজসিংহাসনে বসে, পাঠশালার সঙ্গীদের কাউকে মন্ত্রী, কাউকে বা সেনাপতি করে, যত নিষ্কর্মা বুড়ো কর্মচারীদের তাড়িয়ে দিলেন। তারপর হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনির মাঝখানে শিলাদিত্য চন্দ্রাবতী নগরের রাজকন্যা পুষ্পবতীকে বিয়ে করে, শ্বেতপাথরের শয়ন মন্দিরে বিশ্রাম করতে গেলেন। ক্রমে রাত্রি যখন গভীর হল, কোনও দিকে সাড়া শব্দ নেই, পায়ের ধারে চামরধারিণী চামর হাতে ঢুলে পড়েছে, মাথার শিয়রে সোনার প্রদীপ নিভ-নিভ হয়েছে, সেই সময় শিলাদিত্য তাঁর ছোটো বোন গায়েবীর কচি মুখখানি স্বপ্নে দেখলেন, তাঁর মনে হল যেন অনেক দূর থেকে সেই মুখখানি তাঁর দিকে চেয়ে আছে; আর সেই সূর্যমন্দিরের দিক থেকে কে যেন ডাকছে—'ভাইরে, ভাইরে, ভাইরে!'

শিলাদিত্য চিৎকার করে জেগে উঠলেন। তখন ভোর হয়েছে, তিনি তৎক্ষণাৎ রথে চড়ে সৈন্যসামন্ত নিয়ে সূর্যমন্দিরে উপস্থিত হলেন; দেখলেন ভীমের বর্ম দুখানার মতো মন্দিরের দু'খানা কপাট একেবারে বন্ধ—কতকালের লতাপাতা সেই মন্দিরের দুয়ার যেন লোহার শিকলে বেঁধে রেখেছে। শিলাদিত্য নিজের হাতে সেই লতাপাতা সরিয়ে মন্দিরের দুয়ার খুলে ফেললেন—দিনের আলো পেয়ে এক ঝাঁক বাদুড় ঝটাপট করে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। শিলাদিত্য মন্দিরে প্রবেশ করলেন; চেয়ে দেখলেন, যেখানে সূর্যদেবের মূর্তি ছিল, সেখানে প্রকাণ্ড একখানা অন্ধকার কালো পর্দার মতো সমস্ত ঢেকে রেখেছে! শিলাদিত্য ডাকলেন—'গায়েবী! গায়েবী! কোথায় গায়েবী?' অন্ধকার থেকে উত্তর এল—'হায় গায়েবী! কোথা গায়েবী!' শিলাদিত্য মশাল আনতে হুকুম দিলেন; সেই মশালের আলোয় শিলাদিত্য দেখলেন—উত্তর দিকটা শূন্য করে সূর্যমূর্তির সঙ্গে মন্দিরের আধখানা যেন পাতালে চলে গেছে! কেবল কালো পাথরের সাতটা ঘোড়ার মুণ্ডু বাসুকির ফণার মতো মাটির উপরে জেগে আছে। যে ঘরে শিলাদিত্য গায়েবীর সঙ্গে খেলা করেছেন, যে ঘরে সারাদিন খেলার পর দুটি ভাই-বোন গুর্জর দেশের গল্প শুনতে শুনতে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়তেন, সেখানে দেবদারু গাছের মতো পিতলের সেই আরতি-প্রদীপ ছিল, সে সকল ঘরের চিহ্নমাত্র নেই। শিলাদিত্য সেই প্রকাণ্ড গহ্বরের মুখে দাঁড়িয়ে ডাকলেন—'গায়েবী! গায়েবী!' তাঁর সেই করুণ সুর, সেই অন্ধকার গহ্বরে ঘুরে ফিরে ক্রমে দূর থেকে দূরে, পাতালের মুখে চলে গেল। গায়েব নিশ্বাস ফেলে রাজমন্দিরে ফিরে এলেন।

সেইদিন রাজ-আজ্ঞায় রাজকর্মকারেরা পুরু সোনার পাত দিয়ে সেই প্রকাণ্ড মন্দির আগাগোড়া মুড়ে দিতে লাগল। শিলাদিত্য সে মন্দিরে আর অন্যমূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন না। সেই অন্ধকার গহ্বর থেকে সূর্যের ঘোড়াগুলি যেমন আধখানা জেগেছিল, তেমনই রইল। তারপর শিলাদিত্য পাহাড় কেটে শ্বেতপাথর আনিয়ে, সূর্যকুণ্ডের চারিদিক সুন্দর করে বাঁধিয়ে দিলেন। যখনই কোনও যুদ্ধ উপস্থিত হয়, শিলাদিত্য সেই সূর্যকুণ্ডের তীরে সূর্যের উপাসনা করতেন; তখনই তাঁর সপ্তাশ্বরথ জল থেকে উঠে আসত। শিলাদিত্য সেই রথে যখন যে যুদ্ধে গিয়েছে, সেই যুদ্ধেই তাঁর জয় হয়েছে। শেষে একজন বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী যাকে তিনি সবচেয়ে বিশ্বাস করতেন, সবচেয়ে ভালোবাসতেন, সে-ই তাঁর সর্বনাশ করলে। সেই মন্ত্রী ছাড়া পৃথিবীতে কেউ জানত না যে, শিলাদিত্যের জন্য সূর্যকুণ্ড থেকে সপ্তাশ্বরথ উঠে আসে।

সিন্ধুপারে শ্যামনগর থেকে পারদ নামে অসভ্য একদল যবন যখন বল্লভীপুর আক্রমণ করলে, তখন সেই বিশ্বাসঘাতক, তুচ্ছ পয়সার লোভে সেই অসভ্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে, গো-রক্তে সেই পবিত্র কুণ্ড অপবিত্র করলে। শিলাদিত্য যুদ্ধের দিন যখন সেই সূর্যকুণ্ডের তীরে সূর্যের উপাসনা করতে লাগলেন, তখন আগেকার মতো নীল জল ভেদ করে দেবরথ উঠে এল না; শিলাদিত্য সাতটা ঘোড়ার সাতটা নাম ধরে বার বার ডাকলেন, কিন্তু হায়, কুণ্ডের জল যেমন স্থির তেমনই রইল! শিলাদিত্য হতাশ হয়ে রাজরথে শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হলেন, কিন্তু সেই যুদ্ধেই তাঁর প্রাণ গেল। সমস্ত দিন যুদ্ধের পর সূর্যদেবের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের বরপুত্র শিলাদিত্য অস্ত গেলেন। বিধর্মী শত্রু সোনার মন্দির চূর্ণ করে বল্লভীপুর ছারখার করে চলে গেল।

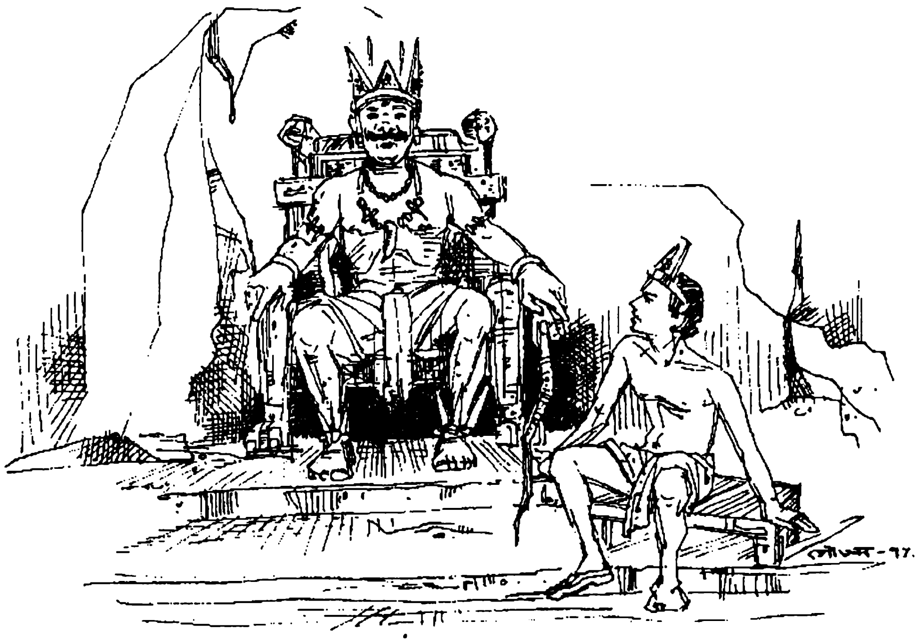


গোহ

প্রকাণ্ড বটগাছের মাঝে পাতায়-ঢাকা ছোটোখাটো পাখির বাসাটি যেমন, গগনস্পর্শী বিন্ধ্যাচলের কোলে চন্দ্রাবতীর শ্বেতপাথরের রাজপ্রাসাদও তেমনই সুন্দর, তেমনই মনোরম ছিল। ম্লেচ্ছদের সঙ্গে যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে শিলাদিত্য একদিন জনকতক রাজপুত-বীরকে সঙ্গে দিয়ে চন্দ্রাবতীর রাজকন্যা গর্ভবতী রানী পুষ্পবতীকে সেই চন্দ্রাবতীর রাজপ্রাসাদে বাপ-মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মনে বড়ো ইচ্ছা ছিল যে যুদ্ধের পর শীতকালটা বিন্ধ্যাচলের শিখরে নির্জনে সেই শ্বেতপাথরের প্রাসাদে রানী পুষ্পবতীকে নিয়ে আরামে কাটাবেন; তারপর রানীর ছেলে হলে দু'জনে একসঙ্গে রাজপুত্রকে কোলে নিয়ে বল্লভীপুরে ফিরবেন। কিন্তু হায়, বিধাতা সে সাধে বাধ সাধলেন, বিধর্মী শত্রুর বিষাক্ত একটা তীর তাঁর প্রাণের সঙ্গে বুকের সমস্ত আশা বিদীর্ণ করে বাহির হয়ে গেল—শিলাদিত্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারালেন। তাঁর আদরের মহিষী পুষ্পবতী চন্দ্রাবতীর সুন্দর প্রাসাদে একাকিনী পড়ে রইলেন।

বিন্ধ্যাচলের গায়ে রাজ-অন্তঃপুরে যেদিকে পুষ্পবতীর ঘর ছিল, ঠিক তার সম্মুখে, পাহাড় থেকে পঞ্চাশ গজ নিচে, বল্লভীপুরে যাবার পাকা রাস্তা। পুষ্পবতী সেইবার চন্দ্রাবতীতে এসে, যত্ন করে নিজের ঘরখানির ঠিক সম্মুখে দেয়ালের মতো সমান সেই পাহাড়ের গায়ে পঁচিশ গজ উপরে যেন শূন্যের মাঝখানে ছোটো একটি শ্বেতপাথরের বারান্দা বসিয়েছিলেন। সেইখানে বসে, রাস্তার দিকে চেয়ে, তিনি প্রতিদিন একখানি রুপোর চাদরে সোনার সুতোয়, সবুজ রেশমে, সবুজ ঘোড়ায় চড়া সূর্যের মূর্তি সোনার ছুঁচ দিয়ে সেলাই করতেন আর মনে মনে ভাবতেন—মহারাজা যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে, পাখির পালকের মতো হাল্কা সেই পাগড়িটি মহারাজের মাথায় নিজের হাতে বেঁধে দেব; তারপর দু'জনে মিলে, পঁচিশ গজ ভাঙনের গায়ে—পাতলা একখানা মেঘের মতো সাদা শ্বেতপাথরের সেই বারান্দায় বসে মহারাজের মুখে যুদ্ধের গল্প শুনব।

মাঝে মাঝে পুষ্পবতী দেখতেন সেই বল্লভীপুরের রাস্তায় বহুদূরে একটি বল্লমের মাথা ঝকঝক করে উঠত;



গোহ

প্রকাণ্ড বটগাছের মাঝে পাতায়-ঢাকা ছোটোখাটো পাখির বাসাটি যেমন, গগনস্পর্শী বিন্ধ্যাচলের কোলে চন্দ্রাবতীর শ্বেতপাথরের রাজপ্রাসাদও তেমনই সুন্দর, তেমনই মনোরম ছিল। ম্লেচ্ছদের সঙ্গে যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে শিলাদিত্য একদিন জনকতক রাজপুত-বীরকে সঙ্গে দিয়ে চন্দ্রাবতীর রাজকন্যা গর্ভবতী রানী পুষ্পবতীকে সেই চন্দ্রাবতীর রাজপ্রাসাদে বাপ-মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মনে বড়ো ইচ্ছা ছিল যে যুদ্ধের পর শীতকালটা বিন্ধ্যাচলের শিখরে নির্জনে সেই শ্বেতপাথরের প্রাসাদে রানী পুষ্পবতীকে নিয়ে আরামে কাটাবেন; তারপর রানীর ছেলে হলে দু'জনে একসঙ্গে রাজপুত্রকে কোলে নিয়ে বল্লভীপুরে ফিরবেন। কিন্তু হায়, বিধাতা সে সাধে বাধ সাধলেন, বিধর্মী শত্রুর বিষাক্ত একটা তীর তাঁর প্রাণের সঙ্গে বুকের সমস্ত আশা বিদীর্ণ করে বাহির হয়ে গেল—শিলাদিত্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারালেন। তাঁর আদরের মহিষী পুষ্পবতী চন্দ্রাবতীর সুন্দর প্রাসাদে একাকিনী পড়ে রইলেন।

বিন্ধ্যাচলের গায়ে রাজ-অন্তঃপুরে যেদিকে পুষ্পবতীর ঘর ছিল, ঠিক তার সম্মুখে, পাহাড় থেকে পঞ্চাশ গজ নিচে, বল্লভীপুরে যাবার পাকা রাস্তা। পুষ্পবতী সেইবার চন্দ্রাবতীতে এসে, যত্ন করে নিজের ঘরখানির ঠিক সম্মুখে দেয়ালের মতো সমান সেই পাহাড়ের গায়ে পঁচিশ গজ উপরে যেন শূন্যের মাঝখানে ছোটো একটি শ্বেতপাথরের বারান্দা বসিয়েছিলেন। সেইখানে বসে, রাস্তার দিকে চেয়ে, তিনি প্রতিদিন একখানি রুপোর চাদরে সোনার সুতোয়, সবুজ রেশমে, সবুজ ঘোড়ায় চড়া সূর্যের মূর্তি সোনার ছুঁচ দিয়ে সেলাই করতেন আর মনে মনে ভাবতেন—মহারাজা যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে, পাখির পালকের মতো হাল্কা সেই পাগড়িটি মহারাজের মাথায় নিজের হাতে বেঁধে দেব; তারপর দু'জনে মিলে, পঁচিশ গজ ভাঙনের গায়ে—পাতলা একখানা মেঘের মতো সাদা শ্বেতপাথরের সেই বারান্দায় বসে মহারাজের মুখে যুদ্ধের গল্প শুনব।

মাঝে মাঝে পুষ্পবতী দেখতেন সেই বল্লভীপুরের রাস্তায় বহুদূরে একটি বল্লমের মাথা ঝকঝক করে উঠত;

তারপর কালো ঘোড়ার পিঠে বল্লভীপুরের রাজদূত দূর থেকে হাতের বল্লম মাটির দিকে নামিয়ে অন্তঃপুরের বারান্দায় রাজরানী পুষ্পবতীকে প্রণাম করে তীরবেগে চন্দ্রাবতীর সিংহদ্বারের দিকে চলে যেত।

যেদিন দাসীর হাতে মহারাজা শিলাদিত্যের চিঠি পুষ্পবতীর কাছে আসত, পুষ্পবতী সেদিন সমস্ত কাজ ফেলে শূন্যের উপরে সেই বারান্দায় মহারাজার চিঠি হাতে বসে থাকতেন।

সেই আনন্দের দিনে যখন কোনও বুড়ো জাঠ গান গেয়ে মাঠের দিকে যেতে যেতে, কোনও রাখাল বালক পাহাড়ের নিচে ছাগল চরাতে চরাতে চন্দ্রাবতীর রাজকুমারীকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করত তখন পুষ্পবতী কারও হাতে এক ছড়া পান্নার চিক, কারও হাতে বা একগাছা সোনার মল ফেলে দিতেন।

রাজকুমারীর প্রসাদ মাথায় ধরে হাজার হাজার আশীর্বাদ করতে করতে সেই সকল রাজভক্ত প্রজা সকালবেলায় কাজে যেত; সন্ধ্যাবেলায় সেই রাজদূত কালো ঘোড়ার পিঠে বল্লম হাতে মহারানী পুষ্পবতীর চিঠি নিয়ে বল্লভীপুরের দিকে ফিরে যেত।

পুষ্পবতী নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় পাহাড়ে পাহাড়ে কালো ঘোড়ার খুরের আওয়াজ অনেকক্ষণ ধরে শুনতে পেতেন—কখনও কোনও বুড়ো জাঠের মেঠো গান আর সেই সঙ্গে রাখাল বালকের মিষ্টি সুর সন্ধ্যার হাওয়ায় ভেসে আসত! তারপর বিন্ধ্যাচলের শিখরে বিন্ধ্যবাসিনী ভবানীর মন্দিরে সন্ধ্যাপূজার ঘোর ঘণ্টা বেজে উঠত, তখন পুষ্পবতী মহারাজের সেই চিঠি খোঁপার ভিতর লুকিয়ে রেখে পাটের শাড়ি পরে দেবীর পূজায় বসতেন; আর মনে মনে বলতেন—'হে মা চামুণ্ডে, হে মা ভবানী, মহারাজকে ভালোয় ভালোয় যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে আনো। ভগবতী, আমার যে ছেলে হবে, সে যেন মহারাজের মতো তেজস্বী হয়, আর তাঁরই মতো যেন নিজের রানীকে খুব ভালোবাসে।' হায়, মানুষের সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয় না! পুষ্পবতী রাজারই মতো তেজস্বী ছেলে পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনে যে বড়ো সাধ ছিল—সেই শ্বেতপাথরের বারান্দায় বসে মহারাজের মুখে যুদ্ধের গল্প শুনবেন—তাঁর যে বড়ো সাধ ছিল—নিজের হাতে মহারাজের মাথায় হাওয়ার মতো পাতলা সেই সুন্দর চাদরখানি জড়িয়ে দেবেন—সে সাধ কোথায় পূর্ণ হল? তাঁর সে মনের ইচ্ছা মনেই রইল, এ জন্মে আর মহারাজের সঙ্গে দেখা হল না।

যেদিন বল্লভীপুরে শিলাদিত্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন সেই দিন চন্দ্রাবতীর রাজপ্রাসাদে রানী পুষ্পবতী মায়ের কাছে বসে রুপোর চাদরে ছুঁচের কাজ করছিলেন। কাজ প্রায় শেষ হয়েছিল, কেবল সূর্যমূর্তির নিচে সোনার অক্ষরে শিলাদিত্যের নামটি লিখতে বাকি ছিল মাত্র।

পুষ্পবতী যত্ন করে নিজের কালো চুলের চেয়ে মিহি, আগুনের চেয়ে উজ্জ্বল, একখানি সোনার তার, সরু হতেও সরু একটি সোনার ছুঁচে পরিয়ে একটি ফোঁড় দিয়েছেন মাত্র, আর চাঁপার কলির মতো পুষ্পবতীর কচি আঙুলে সেই সোনার ছুঁচ বোলতার হুলের মতো বিঁধে গেল। যন্ত্রণায় পুষ্পবতীর চোখে জল এল; তিনি চেয়ে দেখলেন, একটি ফোঁটা রক্ত জ্যোৎস্নার মতো পরিষ্কার সেই রুপোর চাদরে রাঙা এক টুকরো মণির মতো ঝকঝক করছে। পুষ্পবতী তাড়াতাড়ি নির্মল জলে সেই রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলতে চেষ্টা করলেন; জলের ছিটে পেয়ে সেই একবিন্দু রক্ত ক্রমশ ক্রমশ বড়ো হয়ে, একটুখানি ফুলের গন্ধ যেমন সমস্ত হাওয়াকে গন্ধময় করে, তেমনই পাতলা ফুরফুরে চাদরখানি রক্তময় করে ফেললে।

সেই রক্তের দিকে চেয়ে পুষ্পবতীর প্রাণ কেঁদে উঠল; তিনি ছলছল চোখে মায়ের দিকে চেয়ে বললেন—'মা, আমাকে বিদায় দাও, আমি বল্লভীপুরে ফিরে যাই, আমার প্রাণ কেমন করছে, বুঝিবা সেখানে কি সর্বনাশ ঘটল!' রাজরানী বললেন—'আর কটা দিন থেকে যা, ছেলেটি হয়ে যাক।'

পুষ্পবতী বললেন—'না, না, না, মা!'

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বল্লভীপুরের আশিজন রাজপুত বীর, আর দুটো উটের পিঠে নীল রেশমী মোড়া একখানি ছোটো ডুলি, বড়ো রাস্তা ধরে বল্লভীপুরের দিকে চলে গেল। চন্দ্রাবতীর রাজপ্রাসাদ শূন্য করে রাজকুমারী পুষ্পবতী বিদায় নিলেন।

চন্দ্রাবতী থেকে বল্লভীপুর যেতে হলে প্রকাণ্ড একটা মরুভূমি পার হতে হয়। মালিয়া পাহাড়ের নিচে বীরনগর পর্যন্ত চন্দ্রাবতীর পাকা রাস্তা, তারপর মরুভূমির উপর দিয়ে আগুনের মতো বালি ভেঙে, উটে চড়ে বল্লভীপুরে যেতে হয়, আর অন্য পথ নেই। পুষ্পবতী সেই পথের শেষে মরুভূমির সম্মুখে এসে শুনতে পেলেন যে, শিলাদিত্য আর নেই। বিধর্মী ম্লেচ্ছ বল্লভীপুর ধ্বংস করেছে। পুষ্পবতীর চোখের এক ফোঁটা জল পড়ল না,

তাঁর মুখে একটিও কথা সরল না, কেবল তাঁর বুকের ভিতরটা সম্মুখের সেই মরুভূমির মতো ধূ ধূ করতে লাগল; তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার হীরের গহনা গা থেকে খুলে বালির উপর ছড়িয়ে দিলেন, সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেললেন। তারপর উদাস প্রাণে বিধবার বেশ ধরে শিলাদিত্যের আদরের মহিষী পুষ্পবতী সন্ন্যাসিনীর মতো সেই মালিয়া-পাহাড়ের প্রকাণ্ড গহ্বরে আশ্রয় নিলেন।

মরুপারে দশমাস দশদিন পূর্ণ হলে সন্ন্যাসিনী রানীর কোলে অন্ধকার গুহায়, রাজপুত্রের জন্ম হল। নাম রইল গোহ।

রানী পুষ্পবতী সেইদিন বীরনগর থেকে তাঁর ছেলেবেলার প্রিয়সখী ব্রাহ্মণী কমলাবতীকে ডেকে পাঠিয়ে সেই আশিজন রাজপুত বীরের সম্মুখে তাঁর বড়ো সাধের রাজপুত্র গোহকে সঁপে দিয়ে বললেন—'প্রিয় সখী, তোমার হাতে আমার গোহকে সঁপে দিলুম, তুমি মায়ের মতো একে মানুষ কোরো! তোমায় আর কি বলব ভাই? দেখো রাজপুত্রকে কেউ না অযত্ন করে! আর ভাই, যখন চিতার আগুনে আমার এই দেহ ছাই হয়ে যাবে, তখন আমার সেই এক মুঠো ছাই কার্তিক পূর্ণিমায় কাশীর ঘাটে গঙ্গাজলে ঢেলে দিও—যেন আমাকে জন্মান্তরে আর বিধবা না হতে হয়।' ঝরঝর করে কমলাবতীর চোখে জল পড়তে লাগল।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা সেই আশিজন রাজভক্ত রাজপুত চন্দনের কাঠে চিতা জ্বালিয়ে চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াল; শিলাদিত্যের মহিষী, রাজপুত রানী, সন্ন্যাসিনী, সতী পুষ্পবতী হাসিমুখে জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিলেন। দেখতে দেখতে ফুলের মতো সুন্দর পুষ্পবতীর কোমল শরীর পুড়ে ছাই হল। চারদিকে রব উঠল—'জয় মহারানীর জয়! জয় সতীর জয়!' কমলাবতী ঘুমন্ত গোহকে এক কোলে, আর সেই ছাই মুঠো এক হাতে নিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বীরনগরে ফিরে গেলেন; সঙ্গে সঙ্গে সেই আশিজন রাজপুত বীর রাজপুত্রকে ঘিরে সেদিন থেকে বীরনগরে বাসা নিলেন।

চন্দ্রাবতীর রাজরানী অনেকবার গোহকে চন্দ্রাবতীতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বল্লভীপুরের তেজস্বী সেই রাজপুত বীরের দল গোহকে কিছুতেই ছেড়ে দেননি। তাঁরা বলতেন—'আমাদের মহারানী আমাদের হাতে রাজপুত্রকে সঁপে গেলেন, আমরাই তাঁকে পালন করব। বল্লভীপুরের রাজকুমার বল্লভীপুরের রাজপুতদের রাজা হয়ে এই মরুভূমিতেই থাকুন। এই তাঁর রাজপ্রাসাদ।'

গোহ সেই বীরনগরে কমলাবতীর ঘরে মানুষ হতে লাগলেন। কমলাবতী গোহকে ব্রাহ্মণের ছেলের মতো নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত করতে চেষ্টা করতেন; কিন্তু বীরের সন্তান গোহের লেখাপড়া পছন্দ হত না, তিনি বনে বনে, পাহাড়ে পাহাড়ে, কোনওদিন ভীলদের সঙ্গে ভীল বালকের মতো, কোনওদিন বা সেই রাজপুত বীরদের সঙ্গে রাজার মতো, কখনও ঘোড়ায় চড়ে মরুভূমির উপর সিংহ শিকার করে, কখনও বা জাল ঘাড়ে বনে বনে হরিণের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন।

মালিয়া পাহাড়ের নিচে বীরনগর। সেখানে যত শিষ্ট, শান্ত, নিরীহ ব্রাহ্মণের বাস, আর পাহাড়ের উপরে যেখানে বাঘ ডেকে বেড়ায়, হরিণ চড়ে বেড়ায়, যেখানে অন্ধকারে সাপের গর্জন, দিবারাত্রি ঝরনার ঝর্ঝর, আশ্চর্য আশ্চর্য ফুলের গন্ধ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনের ছায়া, সেখানে সেই সকল অন্ধকার বনে বনে, ভীলরাজ মাণ্ডলিক, সাপের মতো কালো, বাঘের মতো জোরালো, সিংহের মতো তেজস্বী, অথচ ছোটো একটি ছেলের মতো সত্যবাদী, বিশ্বাসী, সরলপ্রাণ ভীলের দল নিয়ে রাজত্ব করতেন।

গোহ একদিন সেই সকল ভীল বালকের সঙ্গে ভীল রাজত্বে ঘোড়ায় চড়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে বল্লম-হাতে বাঘের ছাল পরা হাজার হাজার ভীল বালক, ঘোড়ায় চড়া সেই রাজপুত রাজকুমারকে ঘিরে 'আমাদের রাজা এসেছে রে! রাজা এসেছে রে!' বলে, মাদল বাজিয়ে নাচতে নাচতে ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ক্রমে সেই ছেলের পাল গোহকে নিয়ে রাজবাড়িতে উপস্থিত হল। তখন খোড়ো চালের রাজবাড়ি থেকে ভীলদের রাজা বুড়ো মাণ্ডলিক বেরিয়ে এসে বললেন—'হা রে, কোথায় রে, তোদের নতুন রাজা?' ছেলের পাল গোহকে দেখিয়ে দিলে। তখন সেই বুড়ো ভীল গোহকে অনেকক্ষণ দেখে বললেন—'ভালো রে ভালো, নতুন রাজার কপালে তিলক লিখে দে।' তখন একজন ভীল বালক নিজের আঙুল কেটে বুড়ো রাজা মাণ্ডলিকের সামনে রক্তের ফোঁটা দিয়ে গোহের কপালে রাজতিলক টেনে দিল, ভীলদের নিয়মে সে রক্তের তিলক মুছে দেয়, এমন সাধ্য কারও নেই।

গোহ সত্যই সত্যই রাজা হয়ে ভীলদের রাজসভায় বুড়োরাজার কাঠের রাজসিংহাসনের ঠিক নিচে একখানি

ছোটো পিঁড়ির উপর বসলেন। এই পিঁড়িখানি অনেকদিন শূন্য পড়ে ছিল; কারণ মাণ্ডলিক চিরদিন নিঃসন্তান। তাঁর দীনদুঃখী সামান্য প্রজা, তাদের ঘর আলো-করা কালোবাঘের মতো কালো ছেলে; কিন্তু হায়, রাজার ঘর চিরদিন অন্ধকার, চিরকাল শূন্য ছিল! সেদিন যখন সমস্ত ভীলদের মধ্যস্থলে রক্তের তিলক পরে গোহ যুবরাজ হয়ে পিঁড়েয় বসলেন, তখন বুড়ো মাণ্ডলিকের দুই চক্ষু সেই সুন্দর রাজকুমারের দিকে চেয়ে আনন্দে ভেসে গেল!

ভীলরাজের এক ছোটো ভাই ছিলেন। দশ বৎসর আগে একদিন কি জানি কি নিয়ে দুই ভাইয়ের খুব ঝগড়া হয়েছিল, সেই থেকে বিচ্ছেদ, দেখাশোনা পর্যন্ত বন্ধ ছিল। গোহ যুবরাজ হবার দিন মাণ্ডলিকের ছোটো ভাই হিমালয় পর্বত থেকে ভীল রাজত্বে হঠাৎ ফিরে এলেন, এসে দেখলেন রাজপুতের ছেলে যুবরাজের আসন জুড়ে বসেছে। রাগে তাঁর সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল, তিনি রাজসভার মাঝে মাণ্ডলিককে ডেকে বললেন—'এ রে ভাইয়া! বুড়ো হয়ে তুই কি পাগল হয়েছিস? বাপের রাজ্যি ছেলেতে পাবে, তোর ছেলে হল না, তোর পরে আমি রাজা; রাজপুতের ছেলেকে পিঁড়েয় বসালি কি বলে।' মাণ্ডলিক বললেন—'ভাইজি, ঠাণ্ডা হ।' ভাই-রাজ বললেন—'ঠাণ্ডা হব যেদিন তোরে আগুনে পোড়াব।' এই বলে মাণ্ডলিকের ভাইজি রাগে ফুলতে ফুলতে রাজসভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। মাণ্ডলিক বললেন—'দূর হ, আজ হতে তুই আমার শত্রু হলি।' তারপর সোজা হয়ে সিংহাসনে বসে গোহকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে সমস্ত ভীল সর্দারদের ডেকে গোহের কপালে হাত দিয়ে শপথ করালেন, যেন সেইদিন থেকে সমস্ত ভীল সর্দার আপদে-বিপদে সুখে-দুঃখে গোহকে রক্ষা করে—গোহের শত্রু যেন তাদেরও শত্রু হয়। তারপর রাজসভা ভঙ্গ হল। অনেক আমোদ-আহ্লাদ করে গোহ বীরনগরে ফিরে গেলেন।

সেইদিন কি ভেবে গভীর রাত্রে ভীলরাজ মাণ্ডলিক গোহের কাছে চুপি চুপি গিয়ে বললেন—'গোহ, আমি তোকে ছেলের মতো ভালোবাসি, তোকে আমি রাজা করেছি, তোর ছুরিখানা আমায়ে দে, আমি নিজের হাতে তোর শত্রুকে মেরে আসব।' গোহ কোমর থেকে নিজের নাম লেখা ধারালো ছুরি খুলে দিলেন।

ভীলরাজ সেই ছুরি হাতে বেরিয়ে পড়লেন। পাহাড়ের গায়ে তখন জোনাকি জ্বলছে, ঝিঁঝি ডাকছে, দূরে দূরে দু'একটা বাঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে। মাণ্ডলিক সেই ছুরি হাতে রাতদুপুরে ভাই-রাজার দরজায় ঘা দিলেন—কারও সাড়াশব্দ নেই! ভীলরাজ ধীরে ধীরে ভাইয়ের ঘরে প্রবেশ করলেন; দেখলেন, তাঁর ছোটো ভাই সামান্য ভীলের মতো মাটির উপরে এক হাতে মুখ ঢেকে পড়ে আছেন।

ভীলরাজের প্রাণে যেন হঠাৎ ঘা লাগল; তিনি কালো পাথরের পুতুলটির মতো ছোটো ভাইয়ের সুন্দর শরীর মাটির উপরে পড়ে থাকতে দেখে আর চোখের জল রাখতে পারলেন না। মনে ভাবলেন আমি কি নিষ্ঠুর! হায়, ছোটো ভাইয়ের রাজ্য পরকে দিয়েছি, আবার কিনা শত্রু ভেবে ঘুমন্ত ভাইকে মারতে এসেছি!

মাণ্ডলিক কুড়ি বৎসরের সেই ভীল রাজকুমারের মাথার শিয়রে বসে ডাকলেন—'ভাইয়া!' একবার ডাকলেন, দু'বার ডাকলেন, তারপর মুখের কাছ থেকে তার নিটোল হাতখানি সরিয়ে নিয়ে ডাকলেন — 'ভাইয়া!'—কোনওই উত্তর পেলেন না। তখন বুড়ো রাজা ছোটো ভাইয়ের মুখের কাছে মুখ রেখে তার কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুলে হাত বুলিয়ে বললেন—'ভাইয়া রাগ করেছিস? ভাইয়া, আমার সঙ্গে কথা কইবিনে ভাইয়া? আমি তোর জন্যে হিমালয়ের আধখানা জয় করে রেখেছি, সেইখানে তোকে রাজা করব; তুই উঠে বোস, কথা ক! ওরে ভাই, কেন তুই এই দশ বছর আমায় ছেড়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ালি! কেন আমার কাছে কাছে চোখে চোখে রইলিনে ভাই? আমি সাধ করে কি রাজপুতের ছেলেকে ভালোবেসেছি? তুই ছেড়ে গেলে আমার যে আর কেউ ছিল না; সে সময়ে গোহ যে আমার শূন্য ঘর আলো করেছিল। ভাই ওঠ, আমি তোর রাজত্ব কেড়ে নিয়েছি, আবার তোকে শত্রু বলে মারতে এসেছি, এই নে এই ছুরিখানা—আমার বুকে বসিয়ে দে, সব গোল মিটে যাক।'

মাণ্ডলিক ভাইয়ের হাতে ছুরিখানা জোর করে গুঁজে দিলেন। ধারালো ছুরি ভাই-রাজের মুঠো থেকে খসে পড়ল—বুড়ো চমকে উঠলেন, ছোটো ভাইয়ের গা-টা যেন বড়োই ঠাণ্ডা বোধ হল! কান পেতে শুনলেন, নিশ্বাসের শব্দ নেই! তিনি 'ভাইয়া! ভাইয়া!' বলে চিৎকার করে উঠলেন।

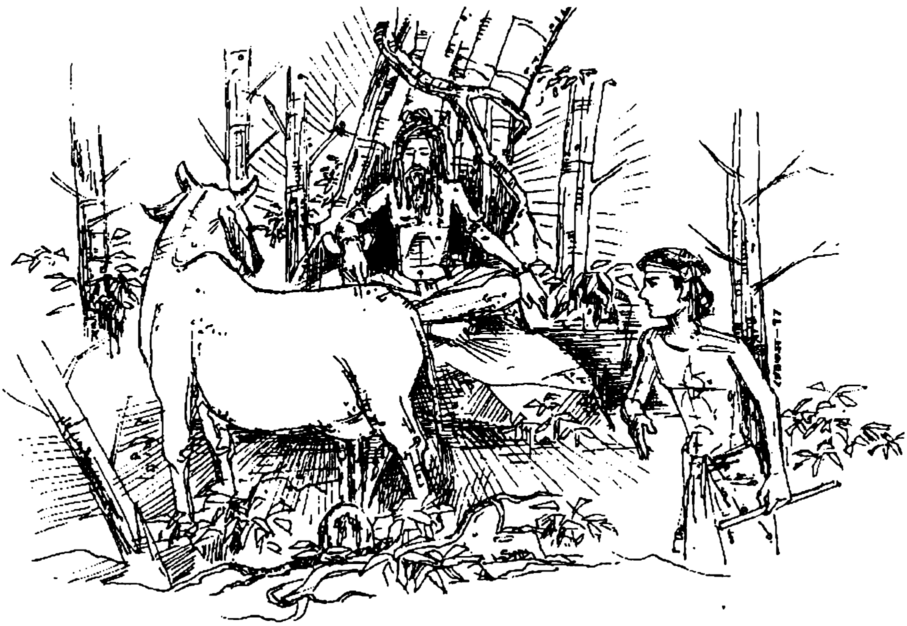
তাঁর সমস্ত রাগ মাটির উপর মরা ভাইকে ছেড়ে রাজসিংহাসনে গোহের উপর গিয়ে পড়ল। গোহ যদি না থাকত, তবে তো আজ দশ বৎসর পরে তিনি ছোটো ভাইটিকে বুকে ফিরে পেতেন; তবে কি আজ ভীল রাজকুমার রাজ্যহারা হয়ে রাগে দুঃখে বুক ফেটে মারা পড়ত! মাণ্ডলিক অনেকক্ষণ ধরে ছোটো ভাইটির বুকে

হাত বুলিয়ে দিলেন; কিন্তু হায়, খাঁচা ফেলে পাখি যেমন উড়ে যায়, তেমনি সেই ভীল বালকের সুন্দর শরীর শূন্য করে প্রাণপাখি অনেকক্ষণ উড়ে গেছে।

মাণ্ডলিক আর সে ঘরে বসে থাকতে পারলেন না, ছুরি হাতে সদর দরজা খুলে বাইরে দাঁড়ালেন। তাঁর প্রাণ যেন কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল—'গোহ্ রে তুই কি করলি? আমার রাজ্য নিলি, রাজসিংহাসন নিলি, ভায়ে ভায়ে বিচ্ছেদ ঘটালি; গোহ্ তুই কি শেষে আমার শত্রু হলি?' হঠাৎ পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে দুটি ভীলের মেয়ে গলা ধরাধরি করে চলে গেল। একজন বলে গেল—'আহা কি সুন্দর রাজা দেখেছিস ভাই!' আর একজন বললেন—'নতুন রাজা যখন আমার হাত ধরে নাচতে লেগেছিল, তখন তার মুখখানা যেন চাঁদপানা দেখলুম।' মাণ্ডলিক নিশ্বাস ফেলে ভাবলেন, হায়, এরই মধ্যে আমার প্রজারা বুড়ো রাজাটাকে ছেঁড়া কাপড়ের মতো ছেড়ে ফেলেছে! ভীলরাজের মনে হল যে পৃথিবীতে তাঁর আর কেউ নেই।

তিনি শূন্য মনে পূর্ণিমার প্রকাণ্ড চাঁদখানার দিকে চেয়ে রইলেন; সেই সময় কালো ঘোড়ায় চড়ে দুইজন রাজপুত ভীলরাজের সামনে দিয়ে চলে গেল। একজন বললে—'ভাই, রাজকুমার আজ শুভদিনে ভীলরাজত্বের সিংহাসনে না বসে সকলের সামনে যুবরাজের আসনে বসে রইলেন কেন?' অন্যজন বললে—'গোহ প্রতিজ্ঞা করেছেন, যতদিন বুড়ো রাজা বেঁচে থাকবেন ততদিন তিনি যুবরাজের মতো তাঁর পায়ের কাছে বসবেন।' মাণ্ডলিকের প্রাণ যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হল; তিনি হাসিমুখে মনে মনে বললেন—'ধন্য গোহ্! ধন্য তার ভালোবাসা!' হঠাৎ সেই অন্ধকারে কার নিশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। মাণ্ডলিক ফিরে দেখলেন, ছোটো ভাইয়ের প্রকাণ্ড শিকারী কুকুরটা নিশব্দে অন্ধকারে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে! বুক যেন তাঁর ফেটে গেল, তিনি, 'ভাই রে!' বলে পাহাড়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়লেন। পাথরের গায়ে লেগে গোহের সেই ছুরি, শিকারি কুকুরের দাঁতের মতো ভীল-রাজের বুকে সজোরে বিঁধে গেল—পাহাড়ে পাহাড়ে শিয়ালের পাল চিৎকার করে উঠল—হায় হায়, হায় হায়, হায় হায় হায়।

পরদিন সকালে একজন রাজপুত পাহাড়ের পথে বীরনগরে যেতে যেতে এক জায়গায় দেখতে পেলেন—ভীল-রাজের রক্তমাখা দেহ, বুকে মহারাজ গোহের ছুরি বেঁধা! রাজপুত সেই ছুরি হাতে গোহের কাছে এসে বললেন—'মহারাজ, করেছ কি? আশ্রয়দাতা চিরবিশ্বাসী ভীলরাজকে খুন করেছ?' গোহ তৎক্ষণাৎ সেই রাজপুতের মাথা কেটে ফেলতে হুকুম দিলেন। তারপর সেই রক্তমাখা ছুরি কোমরে গুঁজে দুই হাতে চক্ষের জল মুছে, ভাই-রাজার সঙ্গে প্রাণের চেয়ে প্রিয় মাণ্ডলিককে চিতার আগুনে তুলে দিয়ে সূর্যবংশের রাজপুত্র গোহ ভীলরাজের রাজসিংহাসনে বসে রাজত্ব করতে লাগলেন।



বাপ্পাদিত্য

তুষের আগুন যেমন প্রথমে ধিক ধিক, শেষে হঠাৎ ধূ ধূ করে জ্বলে ওঠে, তেমনি গোহের পর থেকে রাজপুতদের উপর ভীলদের রাগ ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে বাড়তে বাড়তে একদিন দাউ দাউ করে পাহাড়ে পাহাড়ে, বনে বনে দাবানলের মতো জ্বলে উঠল।

গোহের সুন্দর মুখ, অসীম দয়া, অটল সাহসের কথা মনে রেখে ভীলেরা আট পুরুষ পর্যন্ত রাজপুত রাজাদের সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেছিল। যদি কোনও রাজপুত রাজা শিকারে যেতে পথের ধারে কোনও ভীলের কালো গায়ে বল্লমের খোঁচায় রক্তপাত করে চলে যেতেন, তবে তার মনে পড়ত—রাজা গোহ একদিন তাদেরই বংশের একজনকে বাঘের মুখের থেকে বাঁচিয়ে এনে নিজের হাতে তার বুকের রক্ত মুছে দিয়েছিলেন। যখন কোনও রাজকুমার, কোনও একদিন শখ করে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে তামাশা দেখতেন তখন তাদের মনের পড়ত—এক বছর—দুর্ভিক্ষের দিনে রাজা গোহ তাঁর প্রকাণ্ড রাজবাড়ি, পরিপূর্ণ ধানের গোলা আশ্রয়হীন দীনদুঃখী ভীল-প্রজাদের জন্য সারা বৎসর খুলে রেখেছিলেন! ভাগ্যদোষে যুদ্ধে জয় না হলে যেদিন কোনও কাপুরুষ যুবরাজ বিশ্বাসঘাতক বলে সেনাপতিদের মাথা একটির পর একটি হাতির পায়ের তলায় চূর্ণ করে ফেলতেন, সেদিন সমস্ত ভীলবাহিনী চক্ষের জল মুছে ভাবত—হায় রে হায়, মহারাজ গোহ ছিলেন, যিনি যুদ্ধের সময় ভায়ের মতো তাদের যত্ন করতেন, মায়ের মতো তাদের রক্ষা করতেন, বীরের মতো সকলের আগে চলতেন!

এত অত্যাচার, এত অপমান, তবু সেই বিশ্বাসী ভীল প্রজাদের সরল প্রাণ আট পুরুষ পর্যন্ত বিশ্বাসে, রাজভক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল! কিন্তু যখন বাপ্পাদিত্যের পিতা নাগাদিত্য রাজসিংহাসনে বসে ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করলেন; যখন গরিব প্রজাদের গ্রাম জ্বালিয়ে, খেত উজাড় করে তাঁর মন সন্তুষ্ট হল না; তিনি যখন হাজার হাজার ভীলের মেয়ে দাসীর মতো রাজপুতের ঘরে ঘরে বিলিয়ে দিতে লাগলেন, যখন প্রতিদিন নতুন নতুন অত্যাচার না হলে তাঁর ঘুম হত না, শেষে সমস্ত ভীলের প্রাণের চেয়ে প্রিয় তাঁদের একমাত্র আমোদ—বনে বনে পশু শিকার—যেদিন নাগাদিত্য নতুন আইন করে একেবারে বন্ধ করলেন, সেদিন তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল।

নাগাদিত্য ভীল প্রজাদের উপর এই নতুন আইন জারি করে সমস্ত রাত্রি সুখের স্বপ্নে কাটিয়ে সকালে উঠে

দেখলেন, দিনটা বেশ মেঘলা মেঘলা, ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়েছে, কোনওদিকে ধুলো নেই, শিকারের বেশ সুবিধা। নাগাদিত্য তৎক্ষণাৎ হাতি সাজিয়ে দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সেদিন রাজার সঙ্গে কেবল রাজপুত! দলের পর দল, বড়ো বড়ো ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত! সামান্য ভীলের একটি ছোটো ছেলের পর্যন্ত যাবার হুকুম নেই! শিকার দেখলে খাঁচার ভিতরে চিতাবাঘ যেমন ছটফট করে আজ এমন শিকারের দিনে ঘরের ভিতরে বসে থেকে ভীলদের প্রাণ তেমনই ছটফট করছে—এই কথা ভেবে নিষ্ঠুর নাগাদিত্যের মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল।

মহারাজ নাগাদিত্য দলবল নিয়ে ভেরি বাজিয়ে হই হই শব্দে পর্বতের শিখরে চড়লেন, বজ্রের মতো ভয়ঙ্কর সেই ভেরির আওয়াজ শুনে অন্যদিন মহিষের পাল জল ছেড়ে পালাত, বনের পাখি বাসা ছেড়ে আকাশে উঠত, হাজার হাজার হরিণ প্রাণভয়ে পথ ভুলে ছুটতে ছুটতে যেখানে শিকারী সেইখানে এসে উপস্থিত হত, ঘুমন্ত সিংহ জেগে উঠত, বাঘ হাঁকার দিত—শিকারীরা কেউ বল্লম হাতে মহিষের পিছনে, কেউ খাঁড়া হাতে সিংহের সন্ধানে ছুটে চলত; কিন্তু নাগাদিত্য আজ বারবার ভেরি বাজালেন, বারবার শিকারীর দল চিৎকার করে উঠল, তবু সেই প্রকাণ্ড বনে একটিও বাঘের গর্জন, একটিও পাখির ঝটাপট কিম্বা হরিণের খুরের খুটখাট শোনা গেল না—মনে হল, সমস্ত পাহাড় যেন ঘুমিয়ে আছে! রাগে নাগাদিত্যের দুই চক্ষু লাল হয়ে উঠল। তিনি দলবলের দিকে ফিরে বললেন—'ঘোড়া ফেরাও। অসন্তুষ্ট ভীল প্রজা এ বনের সমস্ত পশু অন্য পাহাড়ে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। চলো, আজ গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে পশুর সমান ভীলের দল শিকার করিগে।'

মহারাজার রাজহস্তী শুঁড় দুলিয়ে কান কাঁপিয়ে পাহাড়ের উপর ইদরপুরের দিকে ফিরে দাঁড়াল—তার পিঠের উপর সোনার হাওদা, জরির বিছানা হীরের মতো জ্বলে উঠল, তার চারদিকে ঘোড়ায় চড়া রাজপুতের দু'শ বল্লম সকালের আলোয় ঝকমক করতে লাগল! নাগাদিত্য হুকুম দিলেন—'চালাও!' তখন কোথা থেকে গভীর গর্জনে, সমস্ত পাহাড় যেন ফাটিয়ে দিয়ে প্রকাণ্ড একটা কালো বাঘ, যেন একজন ভীল সেনাপতির মতো, সেই অত্যাচারী রাজার পথ আগলে পাহাড়ের সুঁড়ি পথে রাজহস্তীর সম্মুখে এসে দাঁড়াল! নাগাদিত্য মহা আনন্দে ডান হাতে বল্লম নিয়ে হাতির পিঠে ঝুঁকে বসলেন। কিন্তু তাঁর হাতের বল্লম হাতেই রইল—বনের অন্ধকার থেকে কালো চামরে সাজানো প্রকাণ্ড একটা তীর তাঁর বুকের একদিক থেকে আর একদিক ফাটিয়ে দিয়ে শনশন শব্দে বেরিয়ে গেল! অত্যাচারী নাগাদিত্য ভীলদের হাতে প্রাণ হারালেন। তারপর চারিদিক থেকে হাজার হাজার কালো বাঘের মতো কালো কালো ভীল ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে রাজপুতের রক্তে পাহাড়ের গা রাঙা করে তুললে; একজনও রাজপুত বেঁচে রইল না, কেবল সোনার সাজপরা মহারাজ নাগাদিত্যের কালো একটা পাহাড়ি ঘোড়া অন্ধকার সমুদ্রের সমান ভীল সৈন্যের মাঝ দিয়ে ঝড়ের মতো রাজবাড়ির দিকে বেরিয়ে গেল।

রাজমহিষী তখন ইদরপুরে কেল্লার ছাদে রাজকুমার বাপ্পাকে কোলে নিয়ে সন্ধ্যার হাওয়ায় বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন, আর এক একবার যে পাহাড়ে মহারাজ শিকারে গিয়েছেন, সেই দিকে চেয়ে দেখছিলেন। একসময় হঠাৎ পাহাড়ের দিকে একটা গোলমাল উঠল, তারপর রানী দেখলেন সেই পাহাড়ে রাস্তায়, বনের অন্ধকার থেকে মহারাজার কালো ঘোড়াটি তীরের মতো ছুটে আসতে লাগল—পিছনে তার শত শত ভীল—কারও হাতে বল্লম, কারও হাতে বা তীরধনুক! মহারানী দেখলেন কালো ঘোড়ার মুখ থেকে সাদা ফেনা চারিদিকে মুক্তোর মতো ঝরে পড়ছে, তার বুকের মাঝ থেকে রক্তের ধারা রাস্তার ধুলোয় ছড়িয়ে যাচ্ছে; তারপর দেখলেন আগুনের মতো একটি তীর তার কালোচুলের ভিতর দিয়ে ধনুকের মতো তার সুন্দর বাঁকা ঘাড়ে সজোরে বিঁধে ঘোড়াটিকে মাটির সঙ্গে গেঁথে ফেললে; রাজার ঘোড়া কেল্লার দিকে মুখ ফিরিয়ে ধুলোর উপরে ধড়পড় করতে লাগল। ঠিক সেই সময় মহারানীর মাথার উপর দিয়ে একটা বল্লম শনশন শব্দে কেল্লার ছাদের উপর এসে পড়ল। রাজমহিষী ঘুমন্ত বাপ্পাকে ওড়নার আড়ালে ঢেকে তাড়াতাড়ি উপর থেকে নেমে এলেন। চারিদিকে অস্ত্রের ঝনঝনি আর যুদ্ধের চিৎকার উঠল—সূর্যদেব মালিয়া পাহাড়ের পশ্চিম পারে অস্ত গেলেন।

সে রাত্রি কী ভয়ানক রাত্রি! সেই মালিয়া পাহাড়ের উপর অসংখ্য ভীল, আর মাঝে গুটিকতক রাজপুত প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগলেন; আর অন্ধকার রাজপুরে নাগাদিত্যের বিধবা মহিষী পাঁচ বছরের রাজকুমার বাপ্পাকে বুকে নিয়ে নির্জন ঘরে বসে রইলেন! তিনি কতবার কত দাসদাসীর নাম ধরে ডাকলেন—কারও সাড়া শব্দ নেই। মহারাজের খবর জানবার জন্য তিনি কতবার কত প্রহরীকে চিৎকার করে ডাকলেন, কিন্তু তারা সকলেই যুদ্ধে ব্যস্ত, মহারানীর ঘরের ভিতর দিয়ে ছুটে গেল, তবু তাঁর কথায় কর্ণপাতও করলে না! রানী তখন আকুল হৃদয়ে কোলের বাপ্পাকে ছোটো একখানি উটের কম্বলে ঢেকে নিয়ে অন্দরমহলের চন্দনকাঠের প্রকাণ্ড

দেখলেন, দিনটা বেশ মেঘলা মেঘলা, ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়েছে, কোনওদিকে ধুলো নেই, শিকারের বেশ সুবিধা। নাগাদিত্য তৎক্ষণাৎ হাতি সাজিয়ে দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সেদিন রাজার সঙ্গে কেবল রাজপুত! দলের পর দল, বড়ো বড়ো ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত! সামান্য ভীলের একটি ছোটো ছেলের পর্যন্ত যাবার হুকুম নেই! শিকার দেখলে খাঁচার ভিতরে চিতাবাঘ যেমন ছটফট করে আজ এমন শিকারের দিনে ঘরের ভিতরে বসে থেকে ভীলদের প্রাণ তেমনই ছটফট করছে—এই কথা ভেবে নিষ্ঠুর নাগাদিত্যের মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল।

মহারাজ নাগাদিত্য দলবল নিয়ে ভেরি বাজিয়ে হই হই শব্দে পর্বতের শিখরে চড়লেন, বজ্রের মতো ভয়ঙ্কর সেই ভেরির আওয়াজ শুনে অন্যদিন মহিষের পাল জল ছেড়ে পালাত, বনের পাখি বাসা ছেড়ে আকাশে উঠত, হাজার হাজার হরিণ প্রাণভয়ে পথ ভুলে ছুটতে ছুটতে যেখানে শিকারী সেইখানে এসে উপস্থিত হত, ঘুমন্ত সিংহ জেগে উঠত, বাঘ হাঁকার দিত—শিকারীরা কেউ বল্লম হাতে মহিষের পিছনে, কেউ খাঁড়া হাতে সিংহের সন্ধানে ছুটে চলত; কিন্তু নাগাদিত্য আজ বারবার ভেরি বাজালেন, বারবার শিকারীর দল চিৎকার করে উঠল, তবু সেই প্রকাণ্ড বনে একটিও বাঘের গর্জন, একটিও পাখির ঝটাপট কিম্বা হরিণের খুরের খুটখাট শোনা গেল না—মনে হল, সমস্ত পাহাড় যেন ঘুমিয়ে আছে! রাগে নাগাদিত্যের দুই চক্ষু লাল হয়ে উঠল। তিনি দলবলের দিকে ফিরে বললেন—'ঘোড়া ফেরাও। অসন্তুষ্ট ভীল প্রজা এ বনের সমস্ত পশু অন্য পাহাড়ে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। চলো, আজ গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে পশুর সমান ভীলের দল শিকার করিগে।'

মহারাজার রাজহস্তী শুঁড় দুলিয়ে কান কাঁপিয়ে পাহাড়ের উপর ইদরপুরের দিকে ফিরে দাঁড়াল—তার পিঠের উপর সোনার হাওদা, জরির বিছানা হীরের মতো জ্বলে উঠল, তার চারদিকে ঘোড়ায় চড়া রাজপুতের দু'শ বল্লম সকালের আলোয় ঝকমক করতে লাগল! নাগাদিত্য হুকুম দিলেন—'চালাও!' তখন কোথা থেকে গভীর গর্জনে, সমস্ত পাহাড় যেন ফাটিয়ে দিয়ে প্রকাণ্ড একটা কালো বাঘ, যেন একজন ভীল সেনাপতির মতো, সেই অত্যাচারী রাজার পথ আগলে পাহাড়ের সুঁড়ি পথে রাজহস্তীর সম্মুখে এসে দাঁড়াল! নাগাদিত্য মহা আনন্দে ডান হাতে বল্লম নিয়ে হাতির পিঠে ঝুঁকে বসলেন। কিন্তু তাঁর হাতের বল্লম হাতেই রইল—বনের অন্ধকার থেকে কালো চামরে সাজানো প্রকাণ্ড একটা তীর তাঁর বুকের একদিক থেকে আর একদিক ফাটিয়ে দিয়ে শনশন শব্দে বেরিয়ে গেল! অত্যাচারী নাগাদিত্য ভীলদের হাতে প্রাণ হারালেন। তারপর চারিদিক থেকে হাজার হাজার কালো বাঘের মতো কালো কালো ভীল ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে রাজপুতের রক্তে পাহাড়ের গা রাঙা করে তুললে; একজনও রাজপুত বেঁচে রইল না, কেবল সোনার সাজপরা মহারাজ নাগাদিত্যের কালো একটা পাহাড়ি ঘোড়া অন্ধকার সমুদ্রের সমান ভীল সৈন্যের মাঝ দিয়ে ঝড়ের মতো রাজবাড়ির দিকে বেরিয়ে গেল।

রাজমহিষী তখন ইদরপুরে কেল্লার ছাদে রাজকুমার বাপ্পাকে কোলে নিয়ে সন্ধ্যার হাওয়ায় বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন, আর এক একবার যে পাহাড়ে মহারাজ শিকারে গিয়েছেন, সেই দিকে চেয়ে দেখছিলেন। একসময় হঠাৎ পাহাড়ের দিকে একটা গোলমাল উঠল, তারপর রানী দেখলেন সেই পাহাড়ে রাস্তায়, বনের অন্ধকার থেকে মহারাজার কালো ঘোড়াটি তীরের মতো ছুটে আসতে লাগল—পিছনে তার শত শত ভীল—কারও হাতে বল্লম, কারও হাতে বা তীরধনুক! মহারানী দেখলেন কালো ঘোড়ার মুখ থেকে সাদা ফেনা চারিদিকে মুক্তোর মতো ঝরে পড়ছে, তার বুকের মাঝ থেকে রক্তের ধারা রাস্তার ধুলোয় ছড়িয়ে যাচ্ছে; তারপর দেখলেন আগুনের মতো একটি তীর তার কালোচুলের ভিতর দিয়ে ধনুকের মতো তার সুন্দর বাঁকা ঘাড়ে সজোরে বিঁধে ঘোড়াটিকে মাটির সঙ্গে গেঁথে ফেললে; রাজার ঘোড়া কেল্লার দিকে মুখ ফিরিয়ে ধুলোর উপরে ধড়পড় করতে লাগল। ঠিক সেই সময় মহারানীর মাথার উপর দিয়ে একটা বল্লম শনশন শব্দে কেল্লার ছাদের উপর এসে পড়ল। রাজমহিষী ঘুমন্ত বাপ্পাকে ওড়নার আড়ালে ঢেকে তাড়াতাড়ি উপর থেকে নেমে এলেন। চারিদিকে অস্ত্রের ঝনঝনি আর যুদ্ধের চিৎকার উঠল—সূর্যদেব মালিয়া পাহাড়ের পশ্চিম পারে অস্ত গেলেন।

সে রাত্রি কী ভয়ানক রাত্রি! সেই মালিয়া পাহাড়ের উপর অসংখ্য ভীল, আর মাঝে গুটিকতক রাজপুত প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগলেন; আর অন্ধকার রাজপুরে নাগাদিত্যের বিধবা মহিষী পাঁচ বছরের রাজকুমার বাপ্পাকে বুকে নিয়ে নির্জন ঘরে বসে রইলেন! তিনি কতবার কত দাসদাসীর নাম ধরে ডাকলেন—কারও সাড়া শব্দ নেই। মহারাজের খবর জানবার জন্য তিনি কতবার কত প্রহরীকে চিৎকার করে ডাকলেন, কিন্তু তারা সকলেই যুদ্ধে ব্যস্ত, মহারানীর ঘরের ভিতর দিয়ে ছুটে গেল, তবু তাঁর কথায় কর্ণপাতও করলে না! রানী তখন আকুল হৃদয়ে কোলের বাপ্পাকে ছোটো একখানি উটের কম্বলে ঢেকে নিয়ে অন্দরমহলের চন্দনকাঠের প্রকাণ্ড

দরজা সোনার চাবি দিয়ে খুলে বাইরে উঁকি মেরে দেখলেন—রাত্রি অন্ধকার, রাজপুরী অন্ধকার, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের খিলান, তার মাঝে গজদন্তের কাজ করা বড়ো বড়ো দরজা খোলা—হাঁ হাঁ করছে; অত বড়ো রাজপুরী, যেন জনমানব নেই।

মহারানী অবাক হয়ে একহাতে বাপ্পাকে বুকে ধরে আর হাতে সোনার চাবির গোছা নিয়ে খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ সেই অন্ধকারে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল, চামড়ার জুতো পরা রাজপুত বীরের মচমচ পায়ের শব্দ নয়; রুপোর বাঁকি পরা রাজদাসীর ঝিনিঝিনি পায়ের শব্দ নয়, কাঠের খড়ম পরা পঁচাত্তর বৎসরের বুড়ো রাজপুরোহিতের খটাখট পায়ের শব্দ নয়—এ যেন চোরের মতো, সাপের মতো খুসখাস, খিটখাট পায়ের শব্দ; মহারানী ভয় পেলেন। দেখতে দেখতে অসুরের মতো একজন ভীল সর্দার তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হল। মহারানী জিজ্ঞাসা করলেন—'কে তুই? কি চাস?' ভীল সর্দার বাঘের মতো গর্জন করে বললে—'জানিসনে আমি কে? আমি সেই দুঃখী ভীল, যার মেয়েকে তোর মহারাজা দাসীর মতো চিতোরের রাজাকে দিয়ে দিয়েছে। আজ কি সুখের দিন! এই হাতে নাগাদিত্যের বুকে বল্লম বসিয়েচি, আজ এই হাতে তার ছেলেসুদ্ধ মহারানীকে দাসীর মতো বেঁধে নিয়ে যাব।' মহারানীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। 'ভগবান রক্ষা করো।' বলে তিনি সেই নিরেট সোনার বড়ো বড়ো চাবির গোছা সজোরে ভীল সর্দারের কপালে ছুড়ে মারলেন। দুরন্ত ভীল 'মা-রে!' বলে চিৎকার করে ঘুরে পড়ল। মহারানী কচি বাপ্পাকে বুকে করে রাজপুরী থেকে বেরিয়ে পড়লেন—তাঁর প্রাণের আধখানা মহারাজ নাগাদিত্যের জন্য হাহাকার করতে লাগল, আর আধখানা এই মহাবিপদে প্রাণের বাপ্পাকে রক্ষা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল।

রানী পথ চলতে লাগলেন—পাথরে পা কেটে গেল, শীতে হাত জমে গেল, অন্ধকারে বারবার পথ ভুল হতে লাগল—তবু রানী পথ চললেন। কত দূর! কত দূর!—পাহাড়ের পথ কত দূর? কোথায় চলে গেছে, তার যেন শেষ নেই! রানী কত পথ চললেন, তবু সে পথের শেষ নেই! ক্রমে ভোর হয়ে গেল, রাস্তার আশেপাশে বীরনগরের দু'একটি ব্রাহ্মণের বাড়ি দেখা দিতে লাগল। পাহাড়ি হাওয়া বরফের মতো ঠাণ্ডা, পাখিরাও তখন জাগেনি, এমন সময় নাগাদিত্যের মহিষী রাজপুত্র বাপ্পাকে কোলে নিয়ে সেই বীরনগরের ব্রাহ্মণী কমলাবতীর বাড়ির দরজায় ঘা দিলেন। আট পুরুষ আগে, একদিন শিলাদিত্যের মহিষী পুষ্পবতী প্রাণের কুমার গোহকে এই বীরনগরের কমলাবতীর হাতে সঁপে গিয়েছিলেন; আর আজ আবার কত কাল পরে সেই কমলাবতীর নাতির নাতি বৃদ্ধ রাজপুরোহিতের হাতে গোহর বংশের গিহ্লোট রাজকুমার বাপ্পাকে সঁপে দিয়ে নাগাদিত্যের মহিষী চিতার আগুনে ঝাঁপ দিলেন।

সকালে বৃদ্ধ পুরোহিত রাজপুত্রকে আশ্রয় দিলেন, আর সেইদিন সন্ধ্যার সময় একটি ভীলের মেয়ে ছোটো ছোটো দুটি ছেলে কোলে তাঁরই ঘরে আশ্রয় নিল। এদের পূর্বপুরুষ সর্বপ্রথমে নিজেদের আঙুল কেটে রাজপুত গোহের কপালে রক্তের রাজতিলক টেনে দিয়েছিল—আজ রাজপুত রাজার সঙ্গে তাদেরও সর্বনাশ হয়ে গেল, বিদ্রোহী ভীলেরা তাদের ঘর দুয়োর জ্বালিয়ে দিয়ে তাদের তিনটিকে পাহাড়ের উপর থেকে দূর করে দিলে। রাজপুরোহিত সেই তিনটি ভীল আর রাজকুমার বাপ্পাকে নিয়ে বীরনগর ছেড়ে ভাণ্ডীরের কেল্লায় যদুবংশের আর এক ভীলের রাজত্বে কিছুদিন কাটালেন। কিন্তু সেখানেও ভীল রাজা; সেখানেও ভয় ছিল—কোন দিন কোনও ভীল মা-হারা বাপ্পাকে খুন করে! ব্রাহ্মণ যে মহারানীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, বিপদে-সম্পদে অনাথ বাপ্পাকে রক্ষা করবেন। তিনি একেবারে ভীল রাজত্ব ছেড়ে তাদের ক'টিকে নিয়ে নগেন্দ্রনগরে চলে গেলেন। একদিকে সমুদ্রের তিনটে ঢেউয়ের মতো ত্রিকূট পাহাড় আর একদিকে মেঘের মতো অন্ধকার পরাশর অরণ্য, মাঝখানে নগেন্দ্রনগর, কাছাকাছি শোলাঙ্কি বংশের একজন রাজপুত রাজার রাজবাড়ি। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেই নগেন্দ্রনগরের ব্রাহ্মণপাড়ার গা ঘেঁষে ঘর বাঁধলেন। সেই ভীলের মেয়ে তাঁর ঘরের সমস্ত কাজ করতে লাগল, আর রাজপুত্র বাপ্পা সেই দুই ভাই ভীল—বালিয় ও দেবকে নিয়ে মাঠে মাঠে বনে বনে গরু চরিয়ে রাখাল বালকদের সঙ্গে রাখালের মতো খেলে বেড়োাতে লাগলেন। রাজপুরোহিত কারও কাছে প্রকাশ করলেন না যে, বাপ্পা রাজার ছেলে; কেবল একটি তামার কবচে আগাগোড়া সমস্ত পরিচয় নিজের হাতে লিখে বাপ্পার গলায় বেঁধে দিলেন—তাঁর মনে বড়ো ভয় ছিল পাছে কোনও ভীল বাপ্পার সন্ধান পায়।

ক্রমে বাপ্পা যখন বড়ো হয়ে উঠলেন; যখন মাঠে মাঠে খোলা হাওয়ায় ছুটোছুটি করে, পাহাড়ে পাহাড়ে ওঠা-নামাতে রাজপুত্র বাপ্পার সুন্দর শরীর দিন দিন লোহার মতো শক্ত হয়ে উঠল; যখন তিনি ক্ষেপা মোষ একহাতে

ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন; সমস্ত রাখাল বালক যখন রাজপুত্র বলে না জেনেও রাজার মতো বাপ্পাকে ভয়, ভক্তি, সেবা করতে লাগল তখন ব্রাহ্মণ অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। তখন তিনি বাপ্পার শরীরের সঙ্গে মনকেও গড়ে তুলতে লাগলেন। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে একলা ঘরে বাপ্পার কাছে বসে সেই মালিয়া পাহাড়ের গল্প, সেই ভীল বিদ্রোহের গল্প, সেই রানী পুষ্পবতী, মহারাজা শিলাদিত্য, রাজকুমার গোহ, তাঁর প্রিয়বন্ধু মাণ্ডলিকের কথা একে একে বলতে লাগলেন। শুনতে শুনতে কখনও বাপ্পার চোখে জল আসত, কখন বা রাগে মুখ লাল হয়ে উঠত, কখনও ভয়ে প্রাণ কাঁপত। বাপ্পা সারারাত্রি কখনও সূর্যের মন্ত্র, কখনও পাহাড়ে ভীলের যুদ্ধ স্বপ্নে দেখে জেগে উঠতেন, মনে ভাবতেন—আমিও কবে হয়তো রাজা হব, লড়াই করব।

এমনি ভাবে দিন কাটছিল। সেই সময় একদিন শ্রাবণ মাসে নতুন নতুন ঘাসের উপর গরুগুলি চরতে দিয়ে বনের পথে বাপ্পাদিত্য একা একা ঘুরে বেড়োাচ্ছিলেন। সেদিন ঝুলন পর্ব, রাজপুতদের বড়ো আনন্দের দিন, সকাল না হতে দলে দলে রাখাল নতুন কাপড় পরে, কেউ ছোটো ভাই বোনকে কোলে করে, কেউ বা দই-এর ভার কাঁধে নিয়ে, একজন তামাশা দেখতে অন্যজন বা পয়সা করতে, নগেন্দ্রনগরের রাজপুত রাজার বাড়ির দিকে মেলা দেখতে ছুটল। বাপ্পা প্রকাণ্ড বনে একলা রইলেন; তাঁর প্রাণের বন্ধু, দুটি ভাই ভীল বালিয় আর দেব, দিদির হাত ধরে এই আনন্দের দিনে বাপ্পাকে কতবার ডাকলে—'ভাই, তুই কি রাজবাড়ি যাবি?' বাপ্পা শুধু ঘাড় নাড়লেন—'না, যাব না।' হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল—আমার ভাই নেই, বোন নেই, মা নেই, আমি কার হাত ধরে কাকে নিয়ে আজ কিসের আনন্দের মেলা দেখতে যাব? কিন্তু যখন বালিয় আর দেব ভীলনী দিদির সঙ্গে হাসতে হাসতে চলে গেল, যখন সকালের রোদ মেঘের আড়ালে ঢেকে গেল, বাপ্পার একটিমাত্র গাই চরতে চরতে যখন মাঠের পর মাঠ পার হয়ে বনের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল, যখন বনে আর সাড়া শব্দ নেই, কেবল মাঝে মাঝে ঝিঁঝির ঝিনি ঝিনি, পাতার ঝুরুঝুরু, সেই সময় বাপ্পার বড়োই একা একা ঠেকতে লাগল। তিনি উদাস প্রাণে ভীলনী দিদির মুখে শোনা ভীল রাজত্বের একটি পাহাড়ি গান ছোটো একটি বাঁশের বাঁশিতে বাজাতে লাগলেন। সেই গানের কথা বোঝা গেল না, কেবল ঘুমপাড়ানি গানের মতো তার বুনো সুরটা মেঘলা দিনে বাদলা হাওয়ায় মিশে স্বপনের মতো বাপ্পার চারিদিকে ভেসে বেড়োাতে লাগল। আজ যেন তাঁর মনে পড়তে লাগল—ওই পশ্চিমের দিকে, যেখানে মেঘের কোলে সূর্যের আলো ঝিকিমিকি জ্বলছে, যেখানে কালো কালো মেঘ পাথরের মতো জমাট বেঁধে রয়েছে, সেইখানে সেই অন্ধকার আকাশের নিচে, তাদের যেন বাড়ি ছিল; সেই বাড়ির ছাদে চাঁদের আলোয় তিনি মায়ের হাত ধরে বেড়িয়ে বেড়াতেন; সে বাড়ি কী সুন্দর! সে চাঁদের কী চমৎকার আলো! মায়ের কেমন হাসিমুখ! সেখানে সবুজ ঘাসে হরিণছানা চরে বেড়াত; গাছের উপরে টিয়ে পাখি উড়ে বসত; পাহাড়ের গায়ে ফুলের গোছা ফুটে থাকত—তাদের কী সুন্দর রঙ, কি সুন্দর গলা! বাপ্পা সজল নয়নে মেঘের দিকে চেয়ে চেয়ে বাঁশের বাঁশিতে ভীলের গান বাজাতে লাগলেন—বাঁশির করুণ সুর কেঁদে কেঁদে, কেঁপে কেঁপে বন থেকে বনে ঘুরে ঘুরে বেড়োাতে লাগল।

সেই বনের একধারে আজ ঝুলন পূর্ণিমায় আনন্দের দিনে, শোলাঙ্কিবংশের রাজার মেয়ে সখীদের নিয়ে খেলে বেড়াচ্ছিলেন। রাজকুমারী বললেন—'শুনেছিস ভাই, বনের ভিতর রাখালরাজা বাঁশি বাজাচ্ছে!' সখীরা বললে—'আয় ভাই সকলে মিলে চাঁপা গাছে দোলা খাটিয়ে ঝুলনো খেলা খেলি আয়!' কিন্তু দোলা খাটাবার দড়ি নেই যে। সেই বৃন্দাবনের মতো গহন বন, সেই বাদলা দিনের গুরু গর্জন, সেই দূর বনে রাখালরাজের মধুর বাঁশি, সেই সখীদের মাঝে শ্রীরাধার সমান রূপবতী রাজনন্দিনী, সবই আজ যুগযুগান্তরের আগেকার বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-রাধার প্রথম ঝুলনের মতো। এমন দিন কি ঝুলনা বাঁধার একগাছি দড়ির অভাবে বৃথা যাবে? রাজনন্দিনী গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন। আবার বাঁশি, পাখির গানের মতো, বনের এপার থেকে ওপার আনন্দের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে বেজে উঠল। রাজকুমারী তখন হীরে জড়ানো হাতের বালা সখীর হাতে দিয়ে বললেন—'যা ভাই, এই বালার বদলে ওই রাখালের কাছ থেকে একগাছা দড়ি নিয়ে আয়।'

রাজকুমারীর সখী সেই বালা হাতে বাপ্পার কাছে এসে বললে—'এই বালার বদলে রাজকুমারীকে একগাছা দড়ি দিতে পার?' হাসতে হাসতে বাপ্পা বললেন—'পারি, যদি রাজকুমারী আমায় বিয়ে করে।'

সেই দিন সেই নির্জন বনে, রাজকুমারীর হাতে সেই হীরের বালা পরিয়ে দিয়ে রাজকুমার বাপ্পা চাঁপাগাছে ঝুলনা বেঁধে দিয়ে রাজকন্যার হাত ধরে বসলেন। চারিদিকে যত সখী দোলার উপর বর-কনেকে ঘিরে ঘিরে ঝুলনের গান গেয়ে ফিরতে লাগল—'আজ কী আনন্দ! আজ কী আনন্দ!' খেলা শেষ হল, সন্ধ্যা হল; রাজকুমারী

বনের রাখালকে বিয়ে করে রাজবাড়িতে ফিরে গেলে ; আর বাপ্পা ফুলে ফুলে প্রফুল্ল চাঁপার তলায় বসে ঝুলন পূর্ণিমার প্রকাণ্ড চাঁদের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলেন—আজ কী আনন্দ! আজ কী আনন্দ!

হঠাৎ একটুখানি পুবের হাওয়া গাছের পাতা কাঁপিয়ে ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে হু হু শব্দে পশ্চিমদিকে চলে গেল। সেই সঙ্গে বড়ো বড়ো দুটি বৃষ্টির ফোঁটা টুপটাপ করে চাঁপাগাছের সবুজ পাতার উপরে ঝরে পড়ল। বাপ্পা আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন—পশ্চিমদিক থেকে একখানা কালো মেঘ ক্রমশ পূর্বদিকে এগিয়ে চলেছে—মাঝে মাঝে গুরুগুরু গর্জন আর ঝিকিমিকি বিদ্যুৎ হানছে! বাপ্পা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন, মনে পড়ল, ঘরে ফিরতে হবে। দুধের মতো সাদা তাঁর ধবলী গাই বনের মাঝে ছাড়া আছে। তিনি চাঁপাগাছ থেকে ছাদন খুলে নিয়ে ধবলী গাইটির সন্ধানে চললেন। তখন চারিদিকে অন্ধকার, মাঝে মাঝে গাছে গাছে রাশি রাশি জোনাকি পোকা হীরের মতো ঝকঝক করছে, আর জায়গায় জায়গায়, ভিজে মাটির নরম গন্ধ বনস্থল পরিপূর্ণ করছে। বাপ্পা সেই অন্ধকার বনের পথে পথে ধবলীর সন্ধানে ফিরতে লাগলেন। হঠাৎ এক জায়গায়, ঘন বেতের বনের আড়ালে বাপ্পা দেখলেন—এক তেজোময় ঋষি ধ্যানে বসে আছেন; ঠিক তাঁর সম্মুখে মহাদেবের নন্দীর মতো তাঁর ধবলী গাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর সেই সাদা গাইয়ের গাঢ় দুধ সুধার মতো একটি শ্বেতপাথরের শিবের মাথায় আপনা আপনি ঝরে পড়ছে। বাপ্পা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ক্রমে ধ্যানভঙ্গে মহর্ষির দুটি চোখ সকালবেলায় পদ্মের পাপড়ির মতো ধীরে ধীরে খুলে গেল। মহর্ষি মহাদেবকে প্রণাম করে এক অঞ্জলি দুধের ধারা পান করলেন। তারপর বাপ্পার দিকে ফিরে বললেন—'শোনো বৎস, আমি মহর্ষি হারীত। তোমায় আশীর্বাদ করছি—তুমি দীর্ঘজীবী হও, পৃথিবীর রাজা হও। তোমার ধবলীর দুধের ধারায় আজ আমি বড়োই তুষ্ট হয়েছি! আজ আমার মহাপ্রস্থানের দিন, এই শেষদিনে তোমায় আর কি দেব? এই ভগবতী ভবানীর খাঁড়া, এই অক্ষয় ধনুঃশর—এই খাঁড়া পাহাড়ও বিদীর্ণ করে, এই ধনুঃশর পৃথিবী জয় করে দেয়—এই দুটি তুমি লও। আর বৎস ভগবান একলিঙ্গের এই শ্বেতপাথরের মূর্তিটি সঙ্গে রেখো, সর্বদা এঁর পূজা করবে। আজ হতে তোমার নাম হল—একলিঙ্গকা দেওয়ান। তোমার বংশে যত রাজা, এই নামেই সিংহাসনে বসবে।' তারপর নিজের হাতে বাপ্পার গলায় চামড়ার পৈতা জড়িয়ে দিয়ে মহর্ষি সমাধিতে বসলেন। দেখতে দেখতে তাঁর পবিত্র শরীর আগুনের মতো ধূ ধূ করে জ্বলে গেল। বাপ্পা কোমরে খাঁড়া, হাতে ধনুঃশর, মাথায় একলিঙ্গের মূর্তি ধরে ধবলী গাইয়ের পিছনে পিছনে ফিরে চললেন—মেঘের গুরুগুরু, দেবতার দুন্দভির মতো, সমস্ত আকাশ জুড়ে বাজতে লাগল।

তখন ভোর হয়ে এসেছে, মেলা শেষে মলিন মুখে যে যার ঘরে ফিরছে, বাপ্পা সেই যাত্রীদের সঙ্গে ঘরে ফিরলেন। কিছুদিন পরেই বাপ্পাকে নগেন্দ্রপুর ছেড়ে যেতে হল। ঝুলন পূর্ণিমায় খেলাচ্ছলে দু'জনে বিয়ে হবার পর বিদেশ থেকে রাজকুমারীর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এক ব্রাহ্মণ রাজসভায় উপস্থিত হলেন। সেদিন সন্ধ্যাবেলা নগেন্দ্রনগরে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে ব্রাহ্মণ রাজকন্যার হাত দেখে গুণে বলেছেন আগেই নাকি কোনও বিদেশির সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হয়ে গেছে। আজ রাজার গুপ্তচর সেই বিদেশির সন্ধানে ঘুরে বেড়োচ্ছে—রাজা তার মাথা আনতে হুকুম দিয়েছেন। কথাটা শুনে বাপ্পার মন অস্থির হয়ে উঠল, ভাবনায় ভাবনায় সমস্ত রাত্রি কাটিয়ে ভোরে উঠে তিনি দেশ ছেড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। যাবার সময় বাপ্পা তাঁর পালক পিতা পঁচাশি বৎসরের সেই রাজপুরোহিতের কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ করে বললেন—'পিতা, আমায় বিদায় দাও। আমি তো এখন বড়ো হয়েছি, আমার জন্যে তোমরা কেন বিপদে পড়?' ব্রাহ্মণ বললেন—'বৎস, তুমি জান না তুমি কে; তুমি রাজপুত্র, তোমার মা তোমাকে আমার হাতে সঁপে গেছেন; আমি আজ এই অল্প বয়সে একা ভিখারির মতো তোমাকে কেমন করে বিদায় করব?' বাপ্পা তখন ভগবতীর সেই খাঁড়া আর অক্ষয় ধনুঃশর দেখিয়ে বললেন—'পিতা, বিদেশে এরাই আমার সহায়, আর আছেন একলিঙ্গজী।' ব্রাহ্মণ তখন আনন্দে দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন—'যাও বৎস, তুমি রাজার ছেলে, রাজারই মতো ধনুঃশর হাতে পেয়েছ! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করছি—পৃথিবীর রাজা হও। যদি কেউ তোমার পরিচয় চায়, তবে গলার কবচ খুলে দেখিয়ে দিও কোন পবিত্র বংশে তোমার জন্ম, তোমার পূর্বপুরুষেরা কোন রাজসিংহাসন উজ্জ্বল করে গেছেন! যাও বৎস, সুখে থাকো!'

ব্রাহ্মণের কাছে বিদায় হয়ে বাপ্পা ভীলনী দিদির কাছে বিদায় নিতে চললেন কিন্তু সেখানে বিদায় নেওয়া ততটা সহজ হল না। অনেক কাঁদাকাটার পর ভীলনী দিদি বললেন—'বাপ্পা রে, যদি যাবি তবে তোর দুই

ভাই—বালিয় ও দেবকে সাথে নে। ওরে বাপ্পা, তোকে একা ছেড়ে দিতে প্রাণ আমার কেমন করে যে!' তারপর তিনজনের হাতে তিন তিনখানি পোড়া রুটি দিয়ে ভীলনী দিদি তিনটি ভাইকে বিদায় করলেন। বালিয় ও দেবকে সঙ্গে নিয়ে বাপ্পা গহন বনে চলে গেলেন। সেখানে বড়ো বড়ো পাথরের থামের মতো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে, কোথাও ময়ূর-ময়ূরী বন আলো করে উড়ে বেড়াচ্ছে, কোথাও আস্ত ছাগল গিলে প্রকাণ্ড একটা অজগর স্থির হয়ে পড়ে আছে; কোথাও বাঘের গর্জন, কোথাও বা পাখির গান; এক জায়গায় সবুজ ঘাসে সোনার রোদ, আর জায়গায় কাজলের সমান নীল অন্ধকার। বালিয় ও দেবকে সঙ্গে নিয়ে বাপ্পা কখনও বনের মনোহর শোভা দেখতে দেখতে, কখনও মহা মহা বিপদের মাঝখান দিয়ে ভগবতী ভবানীর খাঁড়া হাতে নির্ভয়ে চললেন।

সেই প্রকাণ্ড পরাশর অরণ্য পার হতে তাঁর তিন দিন, তিন রাত কেটে গেল; রাজপুত্র বাপ্পা সেই তিনদিন তিনখানি পোড়া রুটি খেয়ে কাটিয়ে দিলেন। তারপর গ্রামের পর গ্রাম, দেশের পর দেশ পার হয়ে, কত বর্ষা, কত শীত, পথে পথে কাটিয়ে বাপ্পা মেবারের মৌর্যবংশীয় রাজা মানের রাজধানী চিতোর নগরে উপস্থিত হলেন। সেখানে তখন মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের মহা আয়োজন হচ্ছে। হাতির পিঠে, উটের উপরে গোলাগুলি, চাল ডাল, তাম্বু-কানাত; গরুর গাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র, খাবার-দাবার; বড়ো বড়ো জালায় খাবার জল, রাঁধবার ঘি তোলা হচ্ছে; রাস্তায় রাস্তায় রাজপুত সৈন্য মাথায় পাগড়ি, হাতে বল্লম ঘুরে বেড়াচ্ছে। চারিদিকে রাজার চর মুসলমানের সন্ধানে সন্ধানে ফিরছে। মহারাজ মান নিজে সমস্ত রাজাদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন দেখে বেড়াচ্ছেন—চারিদিকে হৈ হৈ পড়ে গেছে।

এত গোলমাল, এত লোকজন, এমন প্রকাণ্ড নগর, এত বড়ো বড়ো পাথরের বাড়ি বাপ্পা এ পর্যন্ত কখনও দেখেননি। নগেন্দ্রনগরে বাড়ি ছিল বটে কিন্তু তার মাটির দেওয়াল। সেখানেও মন্দির ছিল, কিন্তু সে কত ছোটো! বাপ্পা আশ্চর্য হয়ে রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে রইলেন, বালিয় আর দেব বড়ো বড়ো হাতি দেখে অবাক হয়ে হাঁ করে রইল। সেই সময় রাজা মান ঘোড়ায় চড়ে সেই রাস্তায় উপস্থিত হলেন; সাদা ঘোড়ার সোনার সাজ মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে, মাথায় রাজছত্র ঝলমল করছে, দুইদিকে দুইজন ময়ূর পাখার চামর দোলাচ্ছে; বাপ্পা ভাবলেন—রাজার সঙ্গে দেখা করবার এই ঠিক সময়। তিনি তৎক্ষণাৎ বালিয় ও দেবের হাত ধরে রাস্তার মাঝে উপস্থিত হয়ে ভগবতী ভবানীর খাঁড়া কপালে স্পর্শ করে মহারাজকে প্রণাম করলেন। রাজা মান জিজ্ঞাসা করলেন—'কে তুমি, কি চাও?' বাপ্পা বললেন—'আমি রাজপুত রাজার ছেলে, আপনার আশ্রয়ে রাজার মতো থাকতে চাই!' এই ভিখারি আবার রাজার ছেলে! চারিদিকে বড়ো বড়ো সর্দার মুখ টিপে হাসতে লাগলেন, কিন্তু রাজা মান বাপ্পার প্রকাণ্ড শরীর, সুন্দর মুখ, অক্ষয় ধনুঃশর আর সেই ভবানীর খাঁড়া দেখেই বুঝেছিলেন—এ কোনও ভাগ্যবান, ভগবান কৃপা করে এই মুসলমান যুদ্ধের সময় এই বীরপুরুষকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। মান-রাজা তৎক্ষণাৎ নিজের জরির শাল বাপ্পার গায়ে পরিয়ে দিয়ে একটা কালো ঘোড়া বাপ্পার জন্যে আনিয়ে দিলেন। বাপ্পা বললেন—'মহারাজ, আমার ভীল ভাইদের জন্যে ঘোড়া আনিয়ে দিন!' তারপর, বালিয় ও দেবকে ঘোড়ায় চড়িয়ে বাপ্পা সেই কালো ঘোড়ায় উঠে বসলেন—সমস্ত সৈন্যসামন্ত সেনাপতির মাথার উপর বাপ্পার সেই প্রকাণ্ড শরীর, সমুদ্রের মাঝে পাহাড়ের মতো, প্রায় আধখানা জেগে রইল; তখন রাস্তার লোক দেখে বলতে লাগল—'হ্যাঁ বীর বটে—যেমন চেহারা, তেমনই শরীর।' চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল; কেবল রাজার যত সেনাপতি মাথার উপরে রাজবেশ মোড়া সেই ভিখারিকে দেখে মান-রাজার উপর মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেন। রাজা দিন দিন বাপ্পাকে যতই সুনয়নে দেখতে লাগলেন, যতই তাকে আদর অভ্যর্থনা করতে লাগলেন, ততই সেনাপতিদের মন হিংসার আগুনে পুড়তে লাগল।

ক্রমে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের দিন উপস্থিত হল। সেই দিন রাজসভায় দেশ-বিদেশের যত সামন্ত রাজা, যত বুড়ো বুড়ো সেনাপতি একমত হয়ে মান-রাজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন—'মহারাজ, আমরা অনেক সময় অনেক যুদ্ধে তোমার জন্য প্রাণ দিতে গিয়েছি, সে কেবল তুমি আমাদের ভালোবাসতে বলে, আমাদের বিশ্বাস করতে বলে; যদি মহারাজ, আজ তুমি সেই ভালোবাসা ভুলে একজন পথের ভিখারিকে আমাদের সকলের উপর বসালে, বাপ্পা আজ যদি তোমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়, সকলের চেয়ে বিশ্বাসী হল—তবে আমাদের আর কাজ কি? বাপ্পাকেই এই মুসলমান যুদ্ধে সেনাপতি করো; আমাদের বীরত্ব তো অনেকবার দেখা আছে, এবার নতুন সেনাপতি কেমন যুদ্ধ করেন দেখা যাক!' মহারাজ মান চিরবিশ্বাসী রাজভক্ত সর্দারদের মুখে হঠাৎ এই নিষ্ঠুর কথা

ভাই—বালিয় ও দেবকে সাথে নে। ওরে বাপ্পা, তোকে একা ছেড়ে দিতে প্রাণ আমার কেমন করে যে!' তারপর তিনজনের হাতে তিন তিনখানি পোড়া রুটি দিয়ে ভীলনী দিদি তিনটি ভাইকে বিদায় করলেন। বালিয় ও দেবকে সঙ্গে নিয়ে বাপ্পা গহন বনে চলে গেলেন। সেখানে বড়ো বড়ো পাথরের থামের মতো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে, কোথাও ময়ূর-ময়ূরী বন আলো করে উড়ে বেড়াচ্ছে, কোথাও আস্ত ছাগল গিলে প্রকাণ্ড একটা অজগর স্থির হয়ে পড়ে আছে; কোথাও বাঘের গর্জন, কোথাও বা পাখির গান; এক জায়গায় সবুজ ঘাসে সোনার রোদ, আর জায়গায় কাজলের সমান নীল অন্ধকার। বালিয় ও দেবকে সঙ্গে নিয়ে বাপ্পা কখনও বনের মনোহর শোভা দেখতে দেখতে, কখনও মহা মহা বিপদের মাঝখান দিয়ে ভগবতী ভবানীর খাঁড়া হাতে নির্ভয়ে চললেন।

সেই প্রকাণ্ড পরাশর অরণ্য পার হতে তাঁর তিন দিন, তিন রাত কেটে গেল; রাজপুত্র বাপ্পা সেই তিনদিন তিনখানি পোড়া রুটি খেয়ে কাটিয়ে দিলেন। তারপর গ্রামের পর গ্রাম, দেশের পর দেশ পার হয়ে, কত বর্ষা, কত শীত, পথে পথে কাটিয়ে বাপ্পা মেবারের মৌর্যবংশীয় রাজা মানের রাজধানী চিতোর নগরে উপস্থিত হলেন। সেখানে তখন মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের মহা আয়োজন হচ্ছে। হাতির পিঠে, উটের উপরে গোলাগুলি, চাল ডাল, তাম্বু-কানাত; গরুর গাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র, খাবার-দাবার; বড়ো বড়ো জালায় খাবার জল, রাঁধবার ঘি তোলা হচ্ছে; রাস্তায় রাস্তায় রাজপুত সৈন্য মাথায় পাগড়ি, হাতে বল্লম ঘুরে বেড়াচ্ছে। চারিদিকে রাজার চর মুসলমানের সন্ধানে সন্ধানে ফিরছে। মহারাজ মান নিজে সমস্ত রাজাদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন দেখে বেড়াচ্ছেন—চারিদিকে হৈ হৈ পড়ে গেছে।

এত গোলমাল, এত লোকজন, এমন প্রকাণ্ড নগর, এত বড়ো বড়ো পাথরের বাড়ি বাপ্পা এ পর্যন্ত কখনও দেখেননি। নগেন্দ্রনগরে বাড়ি ছিল বটে কিন্তু তার মাটির দেওয়াল। সেখানেও মন্দির ছিল, কিন্তু সে কত ছোটো! বাপ্পা আশ্চর্য হয়ে রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে রইলেন, বালিয় আর দেব বড়ো বড়ো হাতি দেখে অবাক হয়ে হাঁ করে রইল। সেই সময় রাজা মান ঘোড়ায় চড়ে সেই রাস্তায় উপস্থিত হলেন; সাদা ঘোড়ার সোনার সাজ মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে, মাথায় রাজছত্র ঝলমল করছে, দুইদিকে দুইজন ময়ূর পাখার চামর দোলাচ্ছে; বাপ্পা ভাবলেন—রাজার সঙ্গে দেখা করবার এই ঠিক সময়। তিনি তৎক্ষণাৎ বালিয় ও দেবের হাত ধরে রাস্তার মাঝে উপস্থিত হয়ে ভগবতী ভবানীর খাঁড়া কপালে স্পর্শ করে মহারাজকে প্রণাম করলেন। রাজা মান জিজ্ঞাসা করলেন—'কে তুমি, কি চাও?' বাপ্পা বললেন—'আমি রাজপুত রাজার ছেলে, আপনার আশ্রয়ে রাজার মতো থাকতে চাই!' এই ভিখারি আবার রাজার ছেলে! চারিদিকে বড়ো বড়ো সর্দার মুখ টিপে হাসতে লাগলেন, কিন্তু রাজা মান বাপ্পার প্রকাণ্ড শরীর, সুন্দর মুখ, অক্ষয় ধনুঃশর আর সেই ভবানীর খাঁড়া দেখেই বুঝেছিলেন—এ কোনও ভাগ্যবান, ভগবান কৃপা করে এই মুসলমান যুদ্ধের সময় এই বীরপুরুষকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। মান-রাজা তৎক্ষণাৎ নিজের জরির শাল বাপ্পার গায়ে পরিয়ে দিয়ে একটা কালো ঘোড়া বাপ্পার জন্যে আনিয়ে দিলেন। বাপ্পা বললেন—'মহারাজ, আমার ভীল ভাইদের জন্যে ঘোড়া আনিয়ে দিন!' তারপর, বালিয় ও দেবকে ঘোড়ায় চড়িয়ে বাপ্পা সেই কালো ঘোড়ায় উঠে বসলেন—সমস্ত সৈন্যসামন্ত সেনাপতির মাথার উপর বাপ্পার সেই প্রকাণ্ড শরীর, সমুদ্রের মাঝে পাহাড়ের মতো, প্রায় আধখানা জেগে রইল; তখন রাস্তার লোক দেখে বলতে লাগল—'হ্যাঁ বীর বটে—যেমন চেহারা, তেমনই শরীর।' চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল; কেবল রাজার যত সেনাপতি মাথার উপরে রাজবেশ মোড়া সেই ভিখারিকে দেখে মান-রাজার উপর মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেন। রাজা দিন দিন বাপ্পাকে যতই সুনয়নে দেখতে লাগলেন, যতই তাকে আদর অভ্যর্থনা করতে লাগলেন, ততই সেনাপতিদের মন হিংসার আগুনে পুড়তে লাগল।

ক্রমে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের দিন উপস্থিত হল। সেই দিন রাজসভায় দেশ-বিদেশের যত সামন্ত রাজা, যত বুড়ো বুড়ো সেনাপতি একমত হয়ে মান-রাজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন—'মহারাজ, আমরা অনেক সময় অনেক যুদ্ধে তোমার জন্য প্রাণ দিতে গিয়েছি, সে কেবল তুমি আমাদের ভালোবাসতে বলে, আমাদের বিশ্বাস করতে বলে; যদি মহারাজ, আজ তুমি সেই ভালোবাসা ভুলে একজন পথের ভিখারিকে আমাদের সকলের উপর বসালে, বাপ্পা আজ যদি তোমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়, সকলের চেয়ে বিশ্বাসী হল—তবে আমাদের আর কাজ কি? বাপ্পাকেই এই মুসলমান যুদ্ধে সেনাপতি করো; আমাদের বীরত্ব তো অনেকবার দেখা আছে, এবার নতুন সেনাপতি কেমন যুদ্ধ করেন দেখা যাক!' মহারাজ মান চিরবিশ্বাসী রাজভক্ত সর্দারদের মুখে হঠাৎ এই নিষ্ঠুর কথা

শুনে বজ্রাহতের মতো স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, তাঁর আর কথা বলার শক্তি থাকল না। তখন সেই প্রকাণ্ড রাজসভায় এই বিদ্রোহী সর্দারদের মধ্যস্থলে পনেরো বৎসরের বীর বালক বাপ্পাদিত্য উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'শুনুন মহারাজ! আজ রাজস্থানের প্রধান প্রধান সর্দরেরা রাজসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন—এ ঘোর বিপদের সময় বাপ্পাই এবার সেনাপতি হয়ে যুদ্ধ চালান; তবে তাই হোক!' রাজা মান হতাশের মতো চারিদিকে চেয়ে দেখলেন; তারপর ধীরে ধীরে বললেন—'তবে তাই হোক।' তারপর একদিক দিয়ে মূর্ছিত প্রায় মান-রাজা চাকরের কাঁধে ভর দিয়ে অন্তঃপুরে চলে গেলেন; আর একদিক দিয়ে বাপ্পাদিত্য সৈন্য সাজাতে বাহির হলেন।

বিদ্রোহী সর্দারদের মাথা হেঁট হল। তাঁরা মনে ভেবেছিলেন যে, পনেরো বৎসরের বালক বাপ্পা যুদ্ধে যেতে কখনই সাহস পাবে না—সভার মাঝে অপমান হবে; কিন্তু যখন সেই বীর বালক নির্ভয়ে হাসিমুখে এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের ভার রাজার কাছে চেয়ে নিলে, তখন তাঁদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। তাঁরা আরও আশ্চর্য হলেন, যখন সেই বাপ্পা—যাকে তাঁরা একদিন পথের ভিখারি বলে ঘৃণা করেছেন—পনেরো বৎসরের সেই বালক বাপ্পা—যুদ্ধ জয় করে কোটি কোটি রাজপুত প্রজার আশীর্বাদ, জয়জয়কারের মধ্যে একদিন শুভদিনে শুভক্ষণে সমস্ত রাজস্থানের রাজমুকুটের সমান রাজপুতের রাজধানী চিতোর নগরে ফিরে এলেন! সেদিন সমস্ত রাজস্থান জুড়ে কী আনন্দ, কী উৎসাহ!

নতুন সেনাপতি বাপ্পা সমস্ত রাজস্থানকে ভয়ঙ্কর মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করে যেদিন চিতোর নগরে ফিরে এলেন, সেদিন রাজা মানের বুড়ো বুড়ো সর্দারেরা ক্ষুণ্ণ মনে রাজসভা ছেড়ে গেলেন। মহারাজ মান তাঁদের ফিরিয়ে আনতে কতবার চেষ্টা করলেন, কাকুতি-মিনতি, এমন কি শেষে রাজগুরুকে পর্যন্ত তাঁদের কাছে পাঠালেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, সর্দারেরা দূতের মুখে বলে পাঠালেন—'আমরা মহারাজের নিমক খেয়েছি, এক বৎসর পর্যন্ত আমরা শত্রুতা করব না, বৎসর শেষ হলে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা হবে।'

সেই এক বৎসর কত ভীষণ ষড়যন্ত্র কত ভয়ঙ্কর পরামর্শে কেটে গেল। এক বৎসর পরে সেই বিদ্রোহী সর্দারদের দুষ্ট পরামর্শে রাজা মানকে ভুল বুঝে বাপ্পা তাঁদের সকলের সেনাপতি হয়ে যুদ্ধে চললেন! রাজা মান যখন শুনলেন বাপ্পা তাঁর রাজসিংহাসন কেড়ে নিতে আসছেন; যখন শুনলেন যে বাপ্পাকে তিনি পথের ধুলো থেকে একদিন রাজসিংহাসনের দিকে তুলে নিয়েছিলেন, যার দীনহীন বেশ একদিন তিনি রাজবেশ দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলেন, যাকে তিনি প্রাণের চেয়েও প্রিয় ভেবেছিলেন—হায় রে! সেই অনাথ আজ সমস্ত কৃতজ্ঞতা ভুলে তাঁরই রাজছত্র কেড়ে নিতে আসছে, তখন তাঁর দুই চক্ষে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল।

তিনি সেই বৃদ্ধ বয়সে একা একদল রাজভক্ত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে গেলেন; সেই যুদ্ধই তাঁর শেষ যুদ্ধ; যুদ্ধক্ষেত্রে বাপ্পার হাতে মান-রাজা প্রাণ দিলেন।

ষোলো বৎসরের বাপ্পা দেববন্দরের রাজকন্যাকে বিয়ে করে হিন্দুমুকুট, হিন্দুসূর্য, রাজগুরু, চাকুয়া উপাধি নিয়ে চিতোরের রাজসিংহাসনে বসলেন। বালিয় ও দেব দুটি ভাই ভীল, বাপ্পার কপালে রাজতিলক টেনে দিয়ে দু'খানা গ্রাম বকশিস পেলে! বাপ্পা সেদিন নিয়ম করে দিলেন যে, তাঁর বংশের যত রাজা সকলকেই এই দুই ভীলের বংশাবলীর হাতে রাজটীকা নিয়ে সিংহাসনে বসতে হবে। আজও সেই নিয়ম চলে আসছে। এই নতুন নিয়ম বাপ্পা রাজস্থানে যখন প্রচলিত করলেন, তখন এই ভীলের হাতে রাজটীকা নেবার কথা যে শুনলে, সেই মনে ভাবলে নতুন রাজার এ একটা নতুন খেয়াল; কিন্তু মান-রাজার সভাপণ্ডিতেরা ভাবলেন, ইনি কি তবে গিহ্লোট রাজকুমার গোহের বংশীয়!—সূর্যবংশেই তো ভীলের হাতে রাজটীকা নেবার নিয়ম ছিল জানি! মহারাজ বাপ্পা নাগাদিত্যের মহিষী চিতোর-রাজকুমারীর ছেলে নয় তো? রাজা মান, বাপ্পার মায়ের ভাই মামা নয় তো? ছি! ছি! বাপ্পা কি অধর্ম করলেন—চোরের মতন মামার সিংহাসন আপনি নিলেন? এমন নিষ্ঠুর রাজার রাজত্বে থাকাও যে মহাপাপ! পণ্ডিতেরা আর রাজসভার মুখো হলেন না—একে একে চিতোর ছেড়ে অন্য দেশে চলে গেলেন! হায়, তাঁরা যদি জানতেন বাপ্পা কত নির্দোষ; বাপ্পা স্বপ্নেও ভাবেননি রাজা মান তাঁর মামা! তিনি তাঁর পালক পিতা, সেই রাজপুরোহিতের কাছে ভীল বিদ্রোহ, রাজা গোহ, গায়েব-গায়েবীর গল্প শুনতেন বটে, কিন্তু তিনি জানতেন না, যার নিষ্ঠুর অত্যাচারে সরল ভীলেরা একদিন ক্ষেপে উঠেছিল, সেই মহারাজ নাগাদিত্য তাঁর পিতা; তিনি জানতেন না যে, তাঁরই পূর্বপুরুষ রাজকুমার গোহ, যাঁকে পুষ্পবতী ব্রাহ্মণী কমলাবতীর হাতে সঁপে দিয়ে চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। বাপ্পা ভাবতেন তিনি কোনও সামান্য রাজ্যের রাজপুত্র।

রাজা হবার পর বাপ্পার যখন দেববন্দরের রাজকন্যাকে বিয়ে করে ফিরে আসেন, তখন বাণমাতা দেবীর

সোনার মূর্তি সঙ্গে এনেছিলেন। চিতোরের রাজপ্রাসাদে শ্বেতপাথরের মন্দিরে সোনার সেই দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে প্রতিদিন দুই সন্ধ্যা পুজো করতেন।

অনেকদিন কেটে গেছে, বাপ্পা প্রায় বুড়ো হয়েছেন, সেই সময় একদিন ভক্তিভরে বাণমাতাকে প্রণাম করে উঠবার সময় বাপ্পার গলা থেকে ছেলেবেলার সেই তামার কবচ ছিঁড়ে পড়ল। বাপ্পা বড়ো হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু সুতোয় বাঁধা তামার কবচটি তাঁর গলায় যেমন, তেমনই ছিল—অনেকদিনের অভ্যাসে মনেই পড়ত না যে, গলায় একটা কিছু আছে। আজ যখন হীরামতির কুড়িগাছা হারের নিচে থেকে সেই পুরোনো কবচখানি পায়ের তলায় ছিঁড়ে পড়ল, তখন বাপ্পা চমকে উঠে ভাবলেন, এ কি! এতদিন আমার মনেই ছিল না যে এতে লেখা আছে আমি কে, কোথায় ছিলুম! আজ সব সন্ধান পাওয়া যাবে! বাপ্পা প্রফুল্ল মুখে সেই তামার কবচ মহারানীর হাতে এনে দিয়ে বললেন—'পড়ো তো শুনি।' বাপ্পা নিজে এক অক্ষরও পড়তে জানতেন না। মহারানী বাপ্পার পায়ের কাছে বসে পড়তে লাগলেন। কবচের এক পিঠে লেখা রয়েছে। 'বাসস্থান ত্রিকূট পর্বত, নগেন্দ্রনগর, পরাশর অরণ্য।' বাপ্পা হাসিমুখে রানীর কাঁধে হাত রেখে বললেন—'এই আমার ছেলেবেলার দেশ, এইখানে কত খেলা খেলেছি! সেই ত্রিকূট পাহাড়, সেই আশি বৎসরের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গম্ভীর মুখ, নগেন্দ্রনগরে ঝুলন পূর্ণিমার সেই জ্যোৎস্না রাত্রি, সেই শোলাঙ্কি রাজকুমারীর মধুর হাসি, স্বপ্নের মতো আমার এখনও মনে আসে! কতবার কত লোককে জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু পৃথিবীতে তিনটে-চুড়ো পাহাড় কত আছে, কে তার সন্ধান পাবে! আমি যদি বলতে পারতেম যে সেই মেঘের মতো তিনটে পাহাড়ের ঢেউকে 'ত্রিকূট' বলে, যদি বলতে পারতেম সেই ছোটো শহরের নাম নগেন্দ্রনগর, যদি জানতে পারতেম সেই ঘন বন, যেখানে আমি রাখালদের সঙ্গে খেলে বেড়াতাম, যেখানে ঝুলন পূর্ণিমায় শোলাঙ্কি রাজকুমারীকে বিয়ে করেছিলেম, সেটি পরাশর অরণ্য তবে কোনও গোলই হত না, হায় হায়! জন্মাবধি লেখাপড়া না শিখে এই ফল! এতকাল পরে কি আর সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, সেই শোলাঙ্কি রাজনন্দিনীকে ফিরে পাব? পড়ো তো শুনি আর কি লেখা আছে।' রানী কবচের আর এক পিঠ উলটে পড়তে লাগলেন—'জন্মস্থান মালিয়া পাহাড়, পিতা নাগাদিত্য, মাতা চিতোরকুমারী, নাম বাপ্পা।'

মহারানীর বড়োবড়ো চোখ মহাবিস্ময়ে আরও বড়ো হয়ে উঠল—তিনি তামার সেই কবচ হাতে বাপ্পার পায়ের তলায়, ফুলের বিছানার মতো সুন্দর গালিচায় অবাক হয়ে বসে রইলেন; আর গজদন্তের পালঙ্কের উপর বাপ্পা ডান হাতের আঙুলে এক ফোঁটা রক্তের মতো বড়ো একখানা লালের আংটির দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলেন, হায়-হায়! কি পাপ করেছি! এই হাতে পিতৃহন্তা ভীলদের শাসন না করে, মামার প্রাণহন্তা হয়ে আমি সিংহাসনে বসেছি! 'মহারানী! আমি মহাপাপী; আমি চিতোরের সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত নই। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ আর আত্মীয়বধের প্রায়শ্চিত্ত আমার জীবনের ব্রত হল।'

একলিঙ্গের দেওয়ান বাপ্পা সেইদিনই সকলের কাছে বিদায় হয়ে, দশ হাজার দেওয়ানী ফৌজ নিয়ে চিতোর থেকে বার হলেন। তাঁর সমস্ত রাগ মালিয়া পাহাড় ভীল রাজত্বের উপর গিয়ে পড়ল। বাপ্পা মালিয়া পাহাড় জয় করে ভীল রাজত্ব ছারখার করে চলে গেলেন। তারপর দেশ-বিদেশ—কাশ্মীর, কাবুল, ইস্পাহান, কান্দাহার, ইরান, তুরান জয় করলেন। বাপ্পার সকল সাধ পূর্ণ হল, মালিয়া পাহাড় জয় করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধের সাধ পূর্ণ হল, আধখানা পৃথিবী চিতোর সিংহাসনের অধীনে এনে আত্মীয়বধের কষ্ট অনেকটা দূর হল; কিন্তু তবু মনের শান্তি প্রাণের আরাম কোথায় পেলেন? বাপ্পা যখন সমস্ত দিন যুদ্ধের পর শ্রান্ত হয়ে নিজের শিবিরে বসে থাকতেন, যখন নিস্তব্ধ যুদ্ধক্ষেত্র কোনও দিন পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় আলোময় হয়ে যেত, তখন বাপ্পার সেই ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রে চাঁপাগাছের ঝুলনায় শোলাঙ্কি রাজকুমারীর হাসিমুখ মনে পড়ত; যখন কোনও নতুন দেশ জয় করে বাপ্পা সেখানকার নতুন রাজপ্রাসাদে সোনার পালঙ্কে নহবতের মধুর সুর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তেন, তখন সেই পূর্ণিমার রাতে চাঁপাগাছের চারিদিকে ঘিরে ঘিরে রাজকুমারীর সখীদের সেই ঝুলন গান স্বপ্নের সঙ্গে বাপ্পার প্রাণে ভেসে আসত। শেষে যেদিন তিনি নগেন্দ্রনগরে গিয়ে দেখলেন তাঁদের পাতার কুটির মাটির দেওয়াল মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, যখন দেখলেন শোলাঙ্কি রাজবাড়ি জনশূন্য, নিস্তব্ধ অন্ধকার হয়ে পড়ে আছে—সে রাজকুমারীও নেই সে সখীও নেই, তখন বাপ্পার মন একেবারে ভেঙে গেল, তিনি শান্তিহারা পাগলের মতো সেই দিগ্বিজয়ী সৈন্য নিয়ে শান্তির আশায় এদেশ-ওদেশ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন; চিতোরের প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ, শূন্য সিংহাসন আর অন্দরে একা মহারানীকে নিয়ে পড়ে রইল!

এই রকম দেশে-বিদেশে ঘুরতে ঘুরতে বাপ্পা একদিন বল্লভীপুরে গায়নীনগরে যেখানে দুটি ভাই-বোন গায়েব

গায়েবী পৃথিবীর আলো প্রথম দেখেছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হলেন। একদিন যোলো বৎসর বয়সে রাজা মানের সেনাপতি হয়ে বাপ্পা মুসলমান সুলতান সেলিমের সমস্ত সৈন্য এই গায়নীনগর থেকে তাড়িয়ে চিতোরে ফিরে গিয়েছিলেন; আজ কত বৎসর পরে যখন কালো চুলে পাক ধরেছে, যখন চোখের কোলে কালি পড়েছে, গায়ের মাংস লোল হয়েছে, পৃথিবী যখন তাঁর কাছে অনেকটা পুরানো হয়ে এসেছে, সেই সময় বাপ্পার সেই দুটি ভাই-বোন গায়েব-গায়েবীর গল্প মনে পড়ল।

বাপ্পাদিত্য সেই সূর্যকুণ্ডের জলে সূর্যপূজা করে গায়নীর রাজপ্রাসাদে শ্বেতপাথরের শয়নমন্দিরে বিশ্রাম করতে গেলেন। হঠাৎ অর্ধেক রাত্রে কার একটি মধুর গান শুনতে শুনতে বাপ্পার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি শয়নমন্দির থেকে পাথরের ছাদে বেরিয়ে দাঁড়ালেন। সম্মুখে মুসলমানদের প্রকাণ্ড মসজিদ জ্যোৎস্নার আলোয় ধপধপ করছে। আকাশে আধখানি চাঁদ; চারিদিক নিশুতি। বাপ্পা জ্যোৎস্নার আলোয় দাঁড়িয়ে গান শুনতে লাগলেন। তাঁর মনে হল, এ গান যেন কোথায় শুনেছেন। হঠাৎ দক্ষিণের হাওয়ায় গানের কথা আরও স্পষ্ট হয়ে বাপ্পার কানের কাছে ভেসে এল; বাপ্পা চমকে উঠে শুনলেন—'আজ কী আনন্দ! ঝুলত ঝুলনে শ্যামর চন্দ!'—এ যে সেই গান! নগেন্দ্রনগরে রাজপুত রাজকুমারীর ঝুলন গান!.

বাপ্পা ছাদের উপর ঝুঁকে দাঁড়ালেন; নিচে দেখলেন এক ভিখারিণী রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাইছে—'আজ কী আনন্দ!' বাপ্পা তৎক্ষণাৎ সেই ভিখারিণীকে ডেকে পাঠালেন। সেই চাঁদের আলোয় নির্জনে শ্বেতপাথরের ছাদে পথের ভিখারিণী রাজ্যেশ্বর বাপ্পার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। বাপ্পা জিজ্ঞাসা করলেন—'কে তুমি? তুমি কি নগেন্দ্রনগরের শোলাঙ্কি রাজকুমারী? তুমি কি কখনও ঝুলন পূর্ণিমায় এক রাখাল বালককে বিয়ে করেছিলে?' ভিখারিণী অনেকক্ষণ একদৃষ্টে বাপ্পার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর একটুখানি হেসে বলল—'মহারাজ, অর্ধেক রাত্রে ভিখারিণীকে ডেকে এ কী তামাশা!' বাপ্পা বললেন—'তবে কি তুমি রাজকুমারী নও?' ভিখারিণী নিশ্বাস ফেলে বললে—'আমি একদিন রাজকুমারী ছিলাম বটে, আজ ভিখারিণী। মহারাজ আমি মুসলমান নবাব সেলিমের কন্যা! একদিন পনেরো বৎসর বয়সে তুমি আমাদের রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলে, সেদিন আমি এই রাজপ্রাসাদের এই ছাদের উপর থেকে তোমায় দেখেছিলাম—কী সুন্দর মুখ, কী প্রকাণ্ড শরীর! আর আজ তোমায় কী দেখছি! সে শরীর নেই, সে হাসি নেই! এমন দশা তোমার কে করলে? কোন রাজপুত-কুমারীর আশায় তুমি পাগলের মতো দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ?' বাপ্পা বললেন—'সে কথা থাক; তুমি আবার সেই গান গাও।' ভিখারিণী গাইতে লাগল—'আজ কী আনন্দ! ঝুলত ঝুলনে শ্যামর চন্দ।' বাপ্পা সমস্ত দুঃখ ভুলে সেই ভিখারিণীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। গান শেষ হল; বাপ্পা বললেন—'নবাবজাদী তোমায় কি দেব বলো?' ভিখারিণী বললে—'আমার যদি রাজ্য থাকত তবে তোমায় বলতেম আমায় বিয়ে করে তোমার বেগম করো—কিন্তু সে আশা এখন নেই, এখন আমি ভিখারিণী যে! আমাকে তোমার বাঁদী করে কাছে কাছে রাখো!' বাপ্পা বললেন—'তুমি বাঁদী হবার যোগ্য নও, আমি তোমায় বেগম করব, তুমি চিরদিন আমার কাছে বসে এই গান গাইবে।'

তার পরদিন, সেই মুসলমান কন্যাকে বিয়ে করে বাপ্পা খোরাসান দেশে চলে গেলেন! সেখানে গুলবাগে খাসমহলে গোলাবের ফোয়ারার ধারে সিরাজির পেয়ালা হাতে বেগমসাহেবার মুখে আরবি গজল আর সেই হিন্দুস্তানের ঝুলন গান শুনতে শুনতে বাপ্পা প্রাণের আরাম, মনের শান্তি পেয়েছিলেন কিনা কে জানে!

একশত বৎসর বয়সে বাপ্পার মৃত্যু হল। পূর্বদিকে—হিন্দুস্তানে তাঁর হিন্দু মহিষী, হিন্দু প্রজারা; পশ্চিমে ইরানিস্তানে তাঁর মুসলমানি বেগম আর পাঠানের দল; হিন্দুরা তাদের মহারাজকে চিতায় তুলে দিতে চাইলে, আর নৌসেরা পাঠানের দল তাঁকে মুসলমানের কবর দিতে ব্যস্ত হল। শেষে যখন একপিঠে সূর্যের স্তব আর একপিঠে আল্লার দোয়া লেখা প্রকাণ্ড কিংখাবের চাদর বাপ্পার উপর থেকে খুলে নেওয়া হল, তখন সেখানে আর কিছুই দেখা গেল না—কেবল রাশি রাশি পদ্মফুল আর গোলাপফুল! চিতোরের মহারানী সেই পদ্মফুল বাণমাতাজির মন্দিরে মানস সরোবরের জলে রেখে দিলেন! ইরানি বেগম একটি গোলাপ ফুল শখের গুলবাগে খাসমহলের মাঝে গোলাপ ফুলের ফোয়ারার ধারে পুঁতে দিলেন; আর সেইদিন হিন্দুস্তান ও ইরানিস্তানের মধ্যস্থলে হিন্দুকুশ পর্বতের শিখরে হীরে-জহরতে মোড়া এক রাজার শরীর চিতার উপরে তুলে দিয়ে এক সন্ন্যাসিনী বললেন—'সখী, তোরা সেই গান গা।' চারদিকে চার সন্ন্যাসিনী ঘিরে ঘিরে গাইতে লাগল—'আজ কি আনন্দ।'

সন্ন্যাসিনী সেই শোলাঙ্কি রাজকুমারী; আর সেই রাজদেহ বাপ্পার মৃতদেহ—দু'জনে চিরদিন দু'জনের সন্ধানে ফিরেছিলেন, কিন্তু ইহলোকে মিলন হয়নি।



পদ্মিনী

বাপ্পাদিত্যের সময় মুসলমানেরা ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ করেন। তারপর থেকে সূর্যবংশের অনেক রাজা অনেকবার চিতোরের সিংহাসনে বসেছেন, রাজ সিংহাসন নিয়ে কত ভায়ে ভায়ে বিচ্ছেদ, কত মহা মহা যুদ্ধ, কত রক্তপাত, কত অশ্রুপাতই হয়ে গেছে; কিন্তু এত রাজা, এত যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে কেবল জনকতক রাজার নাম আর গুটিকতক যুদ্ধের কথা সমস্ত রাজপুতের প্রাণে এখনও সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে। তার মধ্যে একজন হচ্ছেন মহারাজ খোমান—যিনি চব্বিশবার মুসলমানের হাত থেকে চিতোরকে রক্ষা করেছিলেন, যিনি আরব্য উপন্যাসের সেই বোগদাদের খালিফ হারুণ অল রসিদের ছেলে আল মামুনকে চিতোরের রাজপ্রাসাদে অনেকদিন বন্দী রেখেছিলেন; আর্শীবাদ করতে হলে এখনও যাঁর নাম করে রাজপুতেরা বলে—'খোমান তোমায় রক্ষা করুন।' আর একজন রাজা মহারাজ সমরসিংহ—যেমন বীর তেমনই ধার্মিক! তিনি যখন নাগা সন্ন্যাসীর মতো মাথার উপর ঝুঁটি বেঁধে পদ্মবীজের মালা গলায় দিয়ে ভবানীর খাঁড়া হাতে নিয়ে রাজসিংহাসনে বসতেন, তখন বোধ হত যেন সত্যই ভগবান একলিঙ্গের দেওয়ান কৈলাস থেকে পৃথিবীতে রাজত্ব করতে এসেছেন। তখনকার দিল্লীশ্বর চৌহান পৃথ্বীরাজের হাত থেকে শাহাবুদ্দিন ঘোরি যখন দিল্লীর সিংহাসনের সঙ্গে অর্ধেক ভারতবর্ষ কেড়ে নিতে এসেছিলেন, সেই সময় এই মহারাজ সমরসিংহ তেরো হাজার রাজপুত আর নিজের ছেলে কল্যাণকে নিয়ে অর্ধেক ভারতবর্ষের রাজা পৃথ্বীরাজের পাশে পাশে, কাগার নদীর তীরে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। সেই যুদ্ধই তাঁর শেষ যুদ্ধ। পৃথ্বীরাজ সমরসিংহের প্রাণের বন্ধু—তাঁর আদরের মহিষী মহারানী পৃথার ছোটো ভাই। দুইজনে বড়ো ভালোবাসা ছিল। তাই বুঝি এই শেষ যুদ্ধে সমরসিংহ জন্মের মতো বন্ধুত্বের সমস্ত ধার শুধে দিয়ে চলে গেলেন! যখন যুদ্ধের দিনে প্রলয়ের ঝড়-বৃষ্টির মাঝে পৃথ্বীরাজের লক্ষ লক্ষ হাতি-ঘোড়া, সৈন্য-সামন্ত ছিন্নভিন্ন; ছারখার হয়ে গেল, যখন জয়ের আর কোনও আশা নেই, প্রাণের মায়া

কাটাতে না পেরে যখন প্রায় সমস্ত রাজাই পৃথ্বীরাজকে বিপদের মাঝে রেখে একে একে নিজের নিজের রাজত্বের মুখে পালিয়ে চললেন; তখন একমাত্র সমরসিংহ স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, রাজমুকুট, রাজসিংহাসন তুচ্ছ করে প্রাণের বন্ধু পৃথ্বীরাজের জন্য মুসলমানদের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। আগে সেই ধর্মাত্মা মহাবীর সমরসিংহ, তাঁর ষোলো বছরের ছেলে কল্যাণ, আর সেই তেরো হাজার রাজপুতের বুকের রক্তে কাগার নদীর বালুচর রাঙা হয়ে গেল, তবে পৃথ্বীরাজ বন্দী হলেন, তবে দিল্লীর হিন্দু সিংহাসন মুসলমান বাদশা শাহাবুদ্দিনের হস্তগত হল। এখন সে শাহাবুদ্দিন কোথায়, কোথায় বা সেই দিল্লীর রাজভক্ত! কিন্তু যে ধর্মাত্মা বন্ধুর জন্যে নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করলেন, সেই মহাবীর সমরসিংহের নাম রাজপুত কবিদের সুন্দর গানের মধ্যে চিরকাল অমর হয়ে আছে; এখনও রাজপুতানায় সেই গান গেয়ে কত লোক রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে।

সমরসিংহের পর থেকে প্রায় একশো বৎসর কেটে গেছে। চিতোরের রাজসিংহাসনে তখন রানা লক্ষ্মণসিংহ আর দিল্লীতে পাঠান বাদশা আল্লাউদ্দিন। সেই সময় একদিন রানা লক্ষ্মণসিংহের কাকা ভীমসিংহ, সিংহল দ্বীপের রাজকুমারী পদ্মিনীকে বিয়ে করে সমুদ্রপার থেকে চিতোরে ফিরে এলেন। পদ্মের সৌরভ যেমন সমস্ত সরোবর প্রফুল্ল করে ক্রমে দিগদিগন্তে ছড়িয়ে যায়, তেমনই কমলালয়া লক্ষ্মীর সমান সুন্দরী সেই পদ্মমুখী রাজপুত রানী পদ্মিনীর রূপের মহিমা, গুণের গরিমা দিনে দিনে সমস্ত ভারতবর্ষ আমোদ করলে! কি দীনদুঃখীর সামান্য কুটির, কি রাজাধিরাজের রাজপ্রাসাদ—এমন সুন্দরী, এ হেন গুণবতী কোথাও নেই।

এই আশ্চর্য সুন্দরী পদ্মিনীকে নিয়ে ভীমসিংহ যখন চিতোরের একধারে, সাদা পাথরে বাঁধানো সরোবরের মধ্যস্থলে, রাজ অন্তঃপুরের শীতল কোঠায় সুখে দিন কাটাচ্ছিলেন, সেই সময় একদিন দিল্লীতে তখনকার পাঠান বাদশাহ আল্লাউদ্দিন, খাসমহলের ছাদে গজদন্তের খাটিয়ায় বসে বসন্তের হাওয়া খাচ্ছিলেন। আকাশে চাঁদ উঠেছিল, পাশে শরবতের পেয়ালা হাতে পিয়ারী বেগম বসেছিলেন, পায়ের কাছে বেগমের এক নতুন বাঁদী সারঙ্গীর সুরে গজল গাইছিল। বাদশা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'কী ছাই, আরবী গজল! হিন্দুস্থানের গান গাও!' তখন পিয়ারী বেগমের নতুন বাঁদী নতুন করে সারঙ্গী বেঁধে নতুন সুরে গাইতে লাগল—'হিন্দুস্থানে এক ফুল ফুটেছিল—তার দোসর নেই, জুড়ি নেই। সে কী ফুল? সে কী ফুল, আহা সে যে পদ্মফুল, সে যে পদ্মফুল—চারিদিকে নীল জল, মাঝে সেই পদ্মফুল! দেবতারা সে ফুলের দিকে চেয়েছিল, মানুষে সে ফুলের দিকে চেয়েছিল, চারদিকে অপার সিন্ধু তরঙ্গভঙ্গে গর্জন করছিল! কার সাধ্য, সমুদ্র পার হয়, কার সাধ্য সে রাজার বাগিচায় সে ফুল তোলে! সে রাজার ভয়ে দেবতারাও কম্পমান!'

আল্লাউদ্দিন বলে উঠলেন, 'আমি হিন্দুস্থানের বাদশা, আমি কোনও রাজারও তোয়াক্কা রাখি না, কোনও দেবতাকেও ভয় করি না। পিয়ারী! আমি কালই সেই পদ্মফুল তুলতে যাব!' বাঁদী আবার গাইতে লাগল—'কে সে ভাগ্যবান সিন্ধু হল পার? কে সে গুণবান তুলল সে ফুল?—মেবারের রাজপুতবীরের সন্তান—রানা ভীমসিংহ—নির্ভয়, সুন্দর!'

আল্লাউদ্দিন কিংখাবের মছলন্দে সোজা হয়ে বসলেন, আনন্দের সুরে গান শেষ হল—'আজ চিতোরের অন্তঃপুরে সে ফুল বিরাজে, কবি যার নাম গায় ভারতে, তার দোসর কোথা? জগতে তার জুড়ি কই? ধন্য রানা ভীমসিংহ! জয় রাজরানী—চিতোরের রাজ-উদ্যানে প্রফুল্ল পদ্মিনী।' আল্লাউদ্দিনের কানে অনেকক্ষণ ধরে বাজতে লাগল—'চিতোরের রাজ-উদ্যানে প্রফুল্ল পদ্মিনী!' তিনি আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে বলে উঠলেন, 'বাঁদী তুই কি স্বচক্ষে পদ্মিনীকে দেখেছিস? সে কি সত্যই সুন্দরী?' বাঁদী উত্তর করলে, 'জাঁহাপনা! দিল্লী আসবার আগে আমি চিতোরে নাচ গান করে জীবন কাটাতেম, পদ্মিনীর বিয়ের রাত্রে আমি রানীর মহলে নেচে এসেছি।'

আল্লাউদ্দিন গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন; কিছুক্ষণ পরে বলে উঠলেন, 'পিয়ারী, আমার ইচ্ছে করে পদ্মিনীকে এই খাসমহলে নিয়ে আসি।' পিয়ারী বেগম বলে উঠলেন, 'শাহেনশা, আমার সাধ যায়, আকাশের চাঁদটাকে সোনার কৌটায় পুরে রাখি!' কথাটা আল্লাউদ্দিরে ভালো লাগল না। দিল্লীর বাদশা, যাঁর মুঠোর ভিতর অর্ধেক ভারতবর্ষ তিনি কি একজন রাজপুত রানীকে ধরে আনতে পারেন না? শাহেনশা মুখ গম্ভীর করে উঠে গেলেন—মনে মনে বলে গেলেন, 'থাক পিয়ারী, যদি পদ্মিনীকে আনতে পারি তবে তোমাকে তার বাঁদী হয়ে থাকতে হবে।'

তারপর দিন লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়ে আল্লাউদ্দিন চিতোরের মুখে চলে গেলেন। পাঠান সৈন্য যে দিক দিয়ে গেল সেই দিকে পথের দুই ধারে, ধানের খেত, লোকের বসতি ছারখার করে যেতে লাগল।

তখন বসন্তকাল। সমস্ত চিতোর জুড়ে দিকে দিকে আনন্দের রোল উঠেছে—'হোরি হ্যায়! হোরি হ্যায়!' ঘরে ঘরে আবিরের ছড়াছড়ি, হাসির হো হো আর বাসন্তী রঙের বাহার। সেই ফাগুনে, ভরা আনন্দ আর হাসি খেলার মাঝখানে, একদিন চিতোরে খবর পৌঁছল আল্লাউদ্দিন আসছেন—ঝড়ের মুখে প্রদীপের মতো চিতোরের সমস্ত আনন্দ এক নিমেষে নিভে গেল! তখন কোথায় রইল রানার রাজসভায় ধ্রুপদ খেয়ালে হোরি বর্ণনা, কোথায় রইল রানীদের অন্দরে 'ফাগুনমে হোরি মচাও' বলে মিষ্টি সুরে মধুর গান, কোথায় লালে লালে রাস্তায় দলে দলে হাসি-তামাশা আর কোথায় বা গোপালজির মন্দির থেকে রাগ বসন্তে নওবতের সুর!

আবিরে গোলাপে লালে লাল চিতোরের ঘরে ঘরে অস্ত্রশস্ত্রের ঝনঝনার সঙ্গে আর এক ভয়ঙ্কর খেলার আয়োজন চলতে লাগল—সে খেলা লোকের প্রাণ নিয়ে খেলা—তাতে বুকের রক্ত, ছুরির ঘা, কামানের গর্জন আর যুদ্ধের খোলা মাঠ! শেষে একদিন পাঠান বাদশার কালো নিশান শকুনির মতো মেবারের মরুভূমির উপর দেখা দিলে। ভীমসিংহ হুকুম দিলেন, 'কেল্লার দরজা বন্ধ করো।' ঝনঝন শব্দে চিতোরের সাতটা ফটক তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

আল্লাউদ্দিন ভেবেছিলেন—যাব আর পদ্মিনীকে কেড়ে আনব; কিন্তু এসে দেখলেন, বুকের পাঁজর প্রাণের চারিদিক যেমন ঢেকে রাখে, তেমনই রাজপুতের তলোয়ার পদ্মিনীর চারিদিকে দিবারাত্রি ঘিরে রয়েছে। সমুদ্র পার হওয়া সহজ, কিন্তু এই সাতটা ফটক পার হয়ে চিতোরের মাঝখান থেকে পদ্মিনীকে কেড়ে আনা অসম্ভব! পাঠান বাদশা পাহাড়ের নিচে তাঁবু গাড়বার হুকুম দিলেন।

সেইদিন গভীর রাত্রে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন শেষ করে রানা ভীমসিংহ পদ্মিনীর কাছে এসে বললেন, 'পদ্মিনী, তুমি কি সমুদ্র দেখতে চাও? যেমন অনন্ত নীল সমুদ্রের ধারে তোমাদের রাজপ্রাসাদ ছিল, তেমনই সমুদ্র?' পদ্মিনী বললেন, 'তামাশা রাখো, তোমাদের এ মরুভূমির দেশে আবার সমুদ্র পেলে কোথা থেকে?' ভীমসিংহ পদ্মিনীর হাত ধরে কেল্লার ছাদে উঠলেন। অন্ধকার আকাশ—চন্দ্র নেই, তারা নেই, পদ্মিনী দেখলেন সেই অন্ধকার আকাশের নিচে আর একখানা কালো অন্ধকার কেল্লার সম্মুখ থেকে মরুভূমির ওপর পর্যন্ত জুড়ে রয়েছে। পদ্মিনী বলে উঠলেন, 'রানা, এখানে সমুদ্র ছিল, আমি তো জানি না, মাগো সাদা সাদা ঢেউ উঠছে দেখো।' ভীমসিংহ হেসে বললেন, 'পদ্মিনী, এ যে সে সমুদ্র নয়; এ পাঠান বাদশার চতুরঙ্গ সৈন্যবল! ওই দেখো তরঙ্গের পর তরঙ্গের মতো শিবিরশ্রেণী; জলের কল্লোলের মতো ওই শোনো সৈন্যের কোলাহল! আজ আমার মনে হচ্ছে, সেই নীল সমুদ্র যার বুকের মাঝ থেকে আমি একটি সোনার পদ্মফুলের মতো তোমায় ছিঁড়ে এনেছি, সেই সমুদ্র যেন আজ এই চতুরঙ্গিনী মূর্তি ধরে তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে এসেছে। কেমন করে যে এই বিপদসাগর পার হব ভাবছি।'

ভীমসিংহ আরও বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা কালো পেঁচা চিৎকার করে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল; তার প্রকাণ্ড দু'খানা কালো ডানার ঠাণ্ডা বাতাস অন্ধকার ছাদে রানা-রানীর মুখের ওপর কার যেন দু'খানা ঠাণ্ডা হাতের মতো বুলিয়ে গেল। পদ্মিনী চমকে উঠে রানার হাত ধরে নেমে গেলেন। সমস্ত রাত ধরে তাঁর মন বলতে লাগল—একী অলক্ষণ! একী অলক্ষণ!

তার পরদিন পুবের আকাশে ভোরের আলো সবেমাত্র দেখা দিয়েছে, এমন সময় একজন রাজপুত সওয়ার পাঠান শিবিরে উপস্থিত হল। বাদশা আল্লাউদ্দিন তখন রুপোর কুর্শিতে বসে তশবী দানা জপ করছিলেন; খবর হল, 'রানা লক্ষ্মণসিংহের দূত হাজির।' বাদশা হুকুম দিলেন, 'হাজির হোনে কো কহো।' রানার দূত তিনবার কুর্নিশ করে বাদশার সামনে দাঁড়িয়ে বললে, 'রানা জানতে চান বাদশার সঙ্গে তাঁর কিসের বিবাদ যে আজ এত সৈন্য নিয়ে তিনি চিতোর উপস্থিত হলেন?' আল্লাউদ্দিন উত্তর করলেন, 'রানার সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতা নেই, আমি রানার খুড়ো ভীমসিংহের কাছে পদ্মিনীকে ভিক্ষা চাইতে এসেছি, তাকে পেলেই দেশে ফিরব।' দূত উত্তর করলে, 'শাহেনশা, আপনি রাজপুত জাতকে চেনেন না, সেই জন্য এমন কথা বলছেন, রানার কথা ছেড়ে দিন, আমরা দুঃখী রাজপুত, আমরাও প্রাণ দিতে পারি তবু মান খোয়াতে পারি না; আপনি রানীর আশা পরিত্যাগ করুন, বরং শাহেনশার যদি অন্য কিছু নেবার থাকে তবে—' আল্লাউদ্দিন দূতের কথায় বাধা দিয়ে বললেন, 'হিন্দুস্থানের বাদশার এক কথা—হয় পদ্মিনী, নয় যুদ্ধ।' রানার দূত পিছু হটে তিনবার কুর্নিশ করে বিদায় হল।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা চিতোরের রাজসভায় সমস্ত রাজপুত সর্দার একত্র হলেন, কি করে চিতোরকে মুসলমানের হাত থেকে রক্ষা করা যায়? রাজস্থানের রাজ মুকুটের সমান চিতোর; রাজপুতের প্রাণের চেয়ে প্রিয় চিতোর।

তখন বসন্তকাল। সমস্ত চিতোর জুড়ে দিকে দিকে আনন্দের রোল উঠেছে—'হোরি হ্যায়! হোরি হ্যায়!' ঘরে ঘরে আবিরের ছড়াছড়ি, হাসির হো হো আর বাসন্তী রঙের বাহার। সেই ফাগুনে, ভরা আনন্দ আর হাসি খেলার মাঝখানে, একদিন চিতোরে খবর পৌঁছল আল্লাউদ্দিন আসছেন—ঝড়ের মুখে প্রদীপের মতো চিতোরের সমস্ত আনন্দ এক নিমেষে নিভে গেল! তখন কোথায় রইল রানার রাজসভায় ধ্রুপদ খেয়ালে হোরি বর্ণনা, কোথায় রইল রানীদের অন্দরে 'ফাগুনমে হোরি মচাও' বলে মিষ্টি সুরে মধুর গান, কোথায় লালে লালে রাস্তায় দলে দলে হাসি-তামাশা আর কোথায় বা গোপালজির মন্দির থেকে রাগ বসন্তে নওবতের সুর!

আবিরে গোলাপে লালে লাল চিতোরের ঘরে ঘরে অস্ত্রশস্ত্রের ঝনঝনার সঙ্গে আর এক ভয়ঙ্কর খেলার আয়োজন চলতে লাগল—সে খেলা লোকের প্রাণ নিয়ে খেলা—তাতে বুকের রক্ত, ছুরির ঘা, কামানের গর্জন আর যুদ্ধের খোলা মাঠ! শেষে একদিন পাঠান বাদশার কালো নিশান শকুনির মতো মেবারের মরুভূমির উপর দেখা দিলে। ভীমসিংহ হুকুম দিলেন, 'কেল্লার দরজা বন্ধ করো।' ঝনঝন শব্দে চিতোরের সাতটা ফটক তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

আল্লাউদ্দিন ভেবেছিলেন—যাব আর পদ্মিনীকে কেড়ে আনব; কিন্তু এসে দেখলেন, বুকের পাঁজর প্রাণের চারিদিক যেমন ঢেকে রাখে, তেমনই রাজপুতের তলোয়ার পদ্মিনীর চারিদিকে দিবারাত্রি ঘিরে রয়েছে। সমুদ্র পার হওয়া সহজ, কিন্তু এই সাতটা ফটক পার হয়ে চিতোরের মাঝখান থেকে পদ্মিনীকে কেড়ে আনা অসম্ভব! পাঠান বাদশা পাহাড়ের নিচে তাঁবু গাড়বার হুকুম দিলেন।

সেইদিন গভীর রাত্রে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন শেষ করে রানা ভীমসিংহ পদ্মিনীর কাছে এসে বললেন, 'পদ্মিনী, তুমি কি সমুদ্র দেখতে চাও? যেমন অনন্ত নীল সমুদ্রের ধারে তোমাদের রাজপ্রাসাদ ছিল, তেমনই সমুদ্র?' পদ্মিনী বললেন, 'তামাশা রাখো, তোমাদের এ মরুভূমির দেশে আবার সমুদ্র পেলে কোথা থেকে?' ভীমসিংহ পদ্মিনীর হাত ধরে কেল্লার ছাদে উঠলেন। অন্ধকার আকাশ—চন্দ্র নেই, তারা নেই, পদ্মিনী দেখলেন সেই অন্ধকার আকাশের নিচে আর একখানা কালো অন্ধকার কেল্লার সম্মুখ থেকে মরুভূমির ওপর পর্যন্ত জুড়ে রয়েছে। পদ্মিনী বলে উঠলেন, 'রানা, এখানে সমুদ্র ছিল, আমি তো জানি না, মাগো সাদা সাদা ঢেউ উঠছে দেখো।' ভীমসিংহ হেসে বললেন, 'পদ্মিনী, এ যে সে সমুদ্র নয়; এ পাঠান বাদশার চতুরঙ্গ সৈন্যবল! ওই দেখো তরঙ্গের পর তরঙ্গের মতো শিবিরশ্রেণী; জলের কল্লোলের মতো ওই শোনো সৈন্যের কোলাহল! আজ আমার মনে হচ্ছে, সেই নীল সমুদ্র যার বুকের মাঝ থেকে আমি একটি সোনার পদ্মফুলের মতো তোমায় ছিঁড়ে এনেছি, সেই সমুদ্র যেন আজ এই চতুরঙ্গিনী মূর্তি ধরে তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে এসেছে। কেমন করে যে এই বিপদসাগর পার হব ভাবছি।'

ভীমসিংহ আরও বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা কালো পেঁচা চিৎকার করে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল; তার প্রকাণ্ড দু'খানা কালো ডানার ঠাণ্ডা বাতাস অন্ধকার ছাদে রানা-রানীর মুখের ওপর কার যেন দু'খানা ঠাণ্ডা হাতের মতো বুলিয়ে গেল। পদ্মিনী চমকে উঠে রানার হাত ধরে নেমে গেলেন। সমস্ত রাত ধরে তাঁর মন বলতে লাগল—একী অলক্ষণ! একী অলক্ষণ!

তার পরদিন পুবের আকাশে ভোরের আলো সবেমাত্র দেখা দিয়েছে, এমন সময় একজন রাজপুত সওয়ার পাঠান শিবিরে উপস্থিত হল। বাদশা আল্লাউদ্দিন তখন রুপোর কুর্শিতে বসে তশবী দানা জপ করছিলেন; খবর হল, 'রানা লক্ষ্মণসিংহের দূত হাজির।' বাদশা হুকুম দিলেন, 'হাজির হোনে কো কহো।' রানার দূত তিনবার কুর্নিশ করে বাদশার সামনে দাঁড়িয়ে বললে, 'রানা জানতে চান বাদশার সঙ্গে তাঁর কিসের বিবাদ যে আজ এত সৈন্য নিয়ে তিনি চিতোর উপস্থিত হলেন?' আল্লাউদ্দিন উত্তর করলেন, 'রানার সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতা নেই, আমি রানার খুড়ো ভীমসিংহের কাছে পদ্মিনীকে ভিক্ষা চাইতে এসেছি, তাকে পেলেই দেশে ফিরব।' দূত উত্তর করলে, 'শাহেনশা, আপনি রাজপুত জাতকে চেনেন না, সেই জন্য এমন কথা বলছেন, রানার কথা ছেড়ে দিন, আমরা দুঃখী রাজপুত, আমরাও প্রাণ দিতে পারি তবু মান খোয়াতে পারি না; আপনি রানীর আশা পরিত্যাগ করুন, বরং শাহেনশার যদি অন্য কিছু নেবার থাকে তবে—' আল্লাউদ্দিন দূতের কথায় বাধা দিয়ে বললেন, 'হিন্দুস্থানের বাদশার এক কথা—হয় পদ্মিনী, নয় যুদ্ধ।' রানার দূত পিছু হটে তিনবার কুর্নিশ করে বিদায় হল।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা চিতোরের রাজসভায় সমস্ত রাজপুত সর্দার একত্র হলেন, কি করে চিতোরকে মুসলমানের হাত থেকে রক্ষা করা যায়? রাজস্থানের রাজ মুকুটের সমান চিতোর; রাজপুতের প্রাণের চেয়ে প্রিয় চিতোর।

মুসলমানেরা প্রায় ভারতবর্ষ গ্রাস করেছে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধে কত বড়ো বড়ো হিন্দুরাজার রাজত্ব ছারখার হয়ে একেবারে লোপ পেয়ে গেছে, কিন্তু চিতোরের সিংহাসন সেই পুরাকালের মতো এখনও অটল, এখনও স্বাধীন আছে। কি করে আজ এই ঘোর বিপদে চিতোরের উদ্ধার করা যায়? অনেকক্ষণ ধরে অনেক পরামর্শ তর্কবিতর্ক চলল। শেষে রানা ভীমসিংহ উঠে বললেন, 'পদ্মিনীর জন্যে যখন চিতোরের এই সর্বনাশ উপস্থিত তখন না হয় পদ্মিনীকেই পাঠানের হাতে দেওয়া যাক, আমার তাতে কোনও দুঃখ নেই, চিতোর আগে না পদ্মিনী আগে'—কথাটা বলে ভীমসিংহ একবার রাজসভার এক পারে, যেখানে শ্বেতপাথরের জালির পিছনে চিতোরের রানীরা বসেছিলেন, সেইদিকে চেয়ে দেখলেন; তারপর সিংহাসনের দিকে ফিরে বললেন, 'মহারানা কি বলেন?' লক্ষ্মণসিংহ বললেন, 'যদি সমস্ত সর্দারের তাই মতন হয়, তবে তাই করা কর্তব্য।' তখন সেই রাজভক্ত রাজপুত সর্দারের প্রধান রাজসভায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'রানার বিপদে আমাদের বিপদ, রানার অপমানে আমাদের অপমান! পদ্মিনী শুধু ভীমসিংহের নন, তিনি আমাদেরও রানীও বটে। কেমন করে আমরা তাঁকে পাঠানের বেগম হতে পাঠিয়ে দেব? পৃথিবীসুদ্ধ লোক বলবে, রাজস্থানে এমন পুরুষ ছিল না যে তারা রানার হয়ে লড়ে? মহারানা, আমরা প্রস্তুত, হুকুম হলে যুদ্ধে যাই!' মহারানা হুকুম দিলেন, 'আপাতত যুদ্ধের প্রয়োজন নেই, সাবধানে কেল্লার দরজা বন্ধ রাখো, আল্লাউদ্দিন যতদিন পারে চিতোর ঘিরে বসে থাকুক!' সভাস্থলে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। চারিদিকে চিতোরের সমস্ত সামন্ত সর্দার তলোয়ার খুলে দাঁড়ালেন, সমস্ত রাজসভা একসঙ্গে বলে উঠল, 'জয় মহারানার জয়! জয় ভীমসিংহের জয়! জয় পদ্মিনীর জয়!' রাজসভা ভঙ্গ হল। সেই সময় রাজসভার এক পারে, শ্বেতপাথরের জালির আড়াল থেকে সোনার পদ্মফুল লেখা একখানি লাল রুমাল সেই রাজভক্ত সর্দারের মাঝে এসে পড়ল। সর্দারেরা পদ্মিনীর হাতের সেই লাল রুমাল বল্লমের আগায় বেঁধে 'রানীর জয়!' বলে রাজসভা থেকে বিদায় হলেন।

তারপর, দিন কাটতে লাগল। আলাউদ্দিন লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়ে চিতোরের কেল্লা ঘিরে বসে রইলেন। বাদশার আশা ছিল যে কেল্লার ভিতর বন্ধ থেকে রাজপুতদের খাবার ফুরিয়ে যাবে, তখন তারা প্রাণের দায়ে পদ্মিনীকে পাঠিয়ে দিয়ে সন্ধি করবে; কিন্তু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ক্রমে সম্বৎসর কেটে গেল, তবু সন্ধির নামগন্ধ নেই। বর্ষা, শীত কেটে গিয়ে গ্রীষ্মকাল এসে পড়েছে, পাঠান সৈন্যরা দিল্লীতে ফেরবার জন্য অস্থির হতে লাগল। এমন গরমের দিনে দিল্লীতে চাঁদনি চৌকে কত মজা! সেখানে কাফিখানায় কত আমোদ চলেছে! আর তারা কিনা কি বর্ষা, কি হিম, এই হিন্দুর মুল্লুকে এসে খোলা মাঠে পড়ে রয়েছে! এখানে না পাওয়া যায় ভালো পান-তামাক, না আছে ফুলের বাগিচা, না আছে একটা লোকের মিষ্টি গলা—যার গান শুনলে ভুলে থাকা যায়! এখানকার লোকগুলোও যেমন কাটখোট্টা, তাদের গানগুলোও তেমনই বেসুরো, পানগুলোও তেমনই পুরু, তামাকটাও তেমনই কড়ুয়া। এ হিঁদুর মুল্লুকে আর মন টেকে না।

আলাউদ্দিন দেখলেন, নিষ্কর্মা বসে থেকে তাঁর সৈন্যরা ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর ইচ্ছা আরও কিছুদিন চিতোর ঘিরে বসে থাকেন; যে কোনও উপায়ে হোক সৈন্যদের স্থির রাখতে হবে। বাদশা তখন এক একদিনে এক একদল সৈন্য নিয়ে শিকার করে বেড়াতে লাগলেন। সেই সময় একদিন শিকার শেষে আলাউদ্দিন শিবিরে ফিরে আসছেন। একদিকে সবুজ জনারের খেত সন্ধ্যার অন্ধকারে কাজলের মতো নীল হয়ে এসেছে, আর একদিকে পাহাড়ের উপর চিতোরের কেল্লা মেঘের মতো দেখা যাচ্ছে, মাঝে সুঁড়ি পথ, সেই পথে প্রথমে শিকারী পাঠানের দল-বড়ো বড়ো হরিণ ঘাড়ে গাইতে গাইতে চলেছে, তার পর বড়ো বড়ো আমির-ওমরা কেউ হাতির পিঠে, কেউ ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন, সব শেষে বাদশা আলাউদ্দিন—এক হাতে ঘোড়ার লাগাম আর হাতে সোনার জিঞ্জীর বাঁধা প্রকাণ্ড একটা শিকরে পাখি! বাদশা ভাবতে ভাবতে চলেছেন—এতদিন হয়ে গেল তবু তো চিতোর দখল হল না; সৈন্যরা দিল্লী ফেরবার জন্যে ব্যস্ত, আর কতদিন তাদের ভুলিয়ে রাখা যায়? যে পদ্মিনীর জন্যে এত সৈন্য নিয়ে এত কষ্ট সয়ে বিদেশে এলেন, সে পদ্মিনীকে তো একবার চোখেও দেখতে পেলেন না! বাদশা একবার বাঁ হাতের উপর প্রকাণ্ড শিকরে পাখিটার দিকে চেয়ে দেখলেন। হয়তো তাঁর মনে হচ্ছিল—যদি কোনও রকমে দু'খানা ডানা পাই, তবে এই বাজটার মতো চিতোরের মাঝখান থেকে পদ্মিনীকে ছোঁ মেরে নিয়ে আসি! হঠাৎ সন্ধ্যার অন্ধকারে ডানার একটুখানি ঝটাপট সেই ঘুমন্ত শিকরে পাখির কানে পৌঁছল, সে ডানা ঝেড়ে ঘাড় ফুলিয়ে বাদশার হাতে সোজা হয়ে বসল। আলাউদ্দিন বুঝলেন, তাঁর শিকারি বাজ নিশ্চয়ই কোনও শিকারের সন্ধান পেয়েছে। তিনি আকাশে চেয়ে দেখলেন, মাথার উপর দিয়ে দু'খানি পান্নার টুকরোর মতো এক জোড়া

শুক-সারী উড়ে চলেছে। বাদশা ঘোড়া থামিয়ে বাজের পা থেকে সোনার জিঞ্জীর খুলে নিলেন; তখন সেই প্রকাণ্ড পাখি বাদশার হাত ছেড়ে নিঃশব্দে অন্ধকার আকাশে উঠে কালো দু'খানা ডানা ছড়িয়ে দিয়ে শিকারীদের মাথার উপরে একবার স্থির হয়ে দাঁড়াল, তারপর একেবারে তিনশো গজ আকাশের উপর থেকে এক টুকরো পাথরের মতো সেই দুটি শুক-সারীর মাঝে এসে পড়ল। বাদশা দেখলেন একটি পাখি ভয়ে চিৎকার করতে করতে সন্ধ্যার আকাশে ঘুরে বেড়োচ্ছে, আর একটি পাখি প্রকাণ্ড সেই বাজের থাবার ভিতর ছটফট করছে। তিনি শিস দিয়ে বাজপাখিকে ফিরে ডাকলেন, পোষা বাজ শিকার ছেড়ে বাদশার হাতে উড়ে এল; আর ভয়ে মৃতপ্রায় সেই সবুজ শুক ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে পড়ল। বাদশা আনন্দে সেই তোতাপাখি তুলে নিতে হুকুম দিয়ে শিবিরের দিকে ঘোড়া ছোটালেন! আর সেই তোতাপাখির জোড়া পাখিটি প্রথমে করুণ সুরে ডাকতে ডাকতে সেই শিকারীদের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার আকাশ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে উড়ে চলল! শেষে, ক্রমে ক্রমে আস্তে আস্তে, ভয়ে ভয়ে যে ওমরাহের হাতে একটি ছোটো খাঁচায় ডানা-ভাঙা তার সঙ্গী তোতা ছটফট করছিল, সেই খাঁচার উপর নির্ভয়ে এসে বসল। ওমরাহ আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন, 'কী আশ্চর্য সাহস! তোতার বিপদ দেখে তুতীও এসে আপনি ধরা দিয়েছে!' আলাউদ্দিন তখন পদ্মিনীর কথা ভাবতে ভাবতে চলছিলেন; হঠাৎ ওমরাহের মুখে ওই কথা শুনে তাঁর মনে হল—যদি ভীমসিংহকে ধরা যায়, তবে হয়তো সেই সঙ্গে রানী পদ্মিনীও ধরা দিতে পারেন!

বাদশা শিবিরে এসে সমস্ত রাত্রি ভীমসিংহকে বন্দী করবার ফন্দি আঁটতে লাগলেন। দু'একদিন পরেই রানার সঙ্গে কথাবার্তা স্থির হল যে আলাউদ্দিন সমস্ত পাঠান সৈন্য নিয়ে বিনা যুদ্ধে দিল্লীতে ফিরে যাবেন, তার বদলে এক মাত্র তিনি একখানি আয়নার ভিতরে রাজপুত রানী পদ্মিনীকে একবার দেখতে পাবেন, আর চিতোরের কেল্লার ভিতর বাদশা যতক্ষণ একা থাকবেন ততক্ষণ তাঁর কোনও বিপদ না ঘটে সেজন্য স্বয়ং মহারানা দায়ী রইলেন। বাদশা চিতোর যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। শিকার যে এত শীঘ্র ফাঁদে পা দেবে, আলাউদ্দিন স্বপ্নেও ভাবেনি; তিনি মহা আনন্দে পাঠান-ওমরাহদের নিয়ে সমস্ত পরামর্শ স্থির করলেন! তারপর বৈকালে গোলাপ জলে স্নান করে, কিংখাবের জামাজোড়া, মোতির কণ্ঠমালা, হীরে-পান্নার শিরপ্যাঁচ পরে শাহেনশা সাদা ঘোড়ার উপর সোনার রেকাবে পা দিয়ে বসলেন—সঙ্গে প্রায় দুশোজন পাঠান বীর—যারা প্রাণের ভয় রাখে না, যুদ্ধই যাদের ব্যবসা। বাদশা ঘোড়ায় চড়ে একা পাহাড় ভেঙে কেল্লার দিকে উঠে গেলেন; আর সেই পাঠান সওয়ারেরা পাহাড়ের নিচে থেকে প্রথমে নিজের শিবিরে ফিরে গেল, তারপর আবার একে একে সন্ধ্যার অন্ধকারে কেল্লার কাছে ফিরে এসে পথের ধারে প্রকাণ্ড একটা আমবাগানের তলায় লুকিয়ে রইল।

সূর্যদেব যখন চিতোরের পশ্চিমদিকে প্রকাণ্ড একখানা মেঘের আড়ালে অস্ত গেলেন, সেই সময় পাঠান বাদশা আলাউদ্দিন রানা ভীমসিংহের হাত ধরে পদ্মিনীর মহলে শ্বেতপাথরের রাজদরবারে উপস্থিত হলেন। সেখানে আর জনমানব ছিল না—কেবল হাজার হাজার মোমবাতির আলো, সেই শ্বেতপাথরের রাজমন্দিরে, যেন আর একটা নতুন দিনের সৃষ্টি করেছিল। রানা ভীম সেই ঘরে সোনার মছনদে বাদশাকে বসিয়ে তাঁর হাতে এক পেয়ালা শরবত দিয়ে বললেন, 'শাহেনশা, একটু আমিল ইচ্ছা করুন।' আল্লাউদ্দিন সেই আমিলের পেয়ালা হাতে ভাবতে লাগলেন—যদি এতে বিষ থাকে, তবে তো সর্বনাশ! রাজপুতের মেয়েরা শুনেছি, শত্রুর হাতে অপমান হবার ভয়ে অনেক সময় এই রকম আমিল খেয়ে প্রাণ দিয়েছে। বাদশা পেয়ালা হাতে ইতস্তত করতে লাগলেন। রানা ভীম আলাউদ্দিনের মনের ভাব বুঝে একটু হেসে বললেন, 'শাহেনশা বিষের ভয় করবেন না। মহারানা স্বয়ং যখন আপনার কোনও বিপদ না ঘটে সে জন্য দায়ী, তখন আজ যদি আপনি সমস্ত চিতোর একা ঘুরে আসেন, তবু একজন রাজপুত আপনার গায়ে হাত তুলতে সাহস পাবে না! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। অতিথিকে আমরা দেবতার মতো মনে করি।' আলাউদ্দিন তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'রানা, আমি সে কথা ভাবছিনে। আমি ভাবছিলেম, আজ যেমন নির্ভয়ে আমি তোমার উপর বিশ্বাস করছি, তেমনই তুমিও আমাকে বিশ্বাস করতে পার কি না?' আলাউদ্দিন মুখে এই কথা বললেন বটে, কিন্তু সেই আমিলের পেয়ালায় চুমুক দিতে তাঁর প্রাণ কাঁপতে লাগল। তিনি অল্পে অল্পে সমস্ত আমিলটুকু নিঃশেষ করে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। শেষে যখন দেখলেন বিষের জ্বালার বদলে তাঁর শরীর মন বরং আনন্দে প্রফুল্ল হয়ে উঠল, তখন বাদশা ভীমসিংহের দিকে ফিরে বললেন, 'তবে আর বিলম্ব কেন? এখন একবার সেই আশ্চর্য সুন্দরী পদ্মিনী রানীকে দেখতে পেলেই খুশি হয়ে বিদায় হই।'

তখন রানা ভীম আলিপো দেশের প্রকাণ্ড একখানা আয়নার সম্মুখ থেকে একটা পর্দা সরিয়ে দিলেন—কাকচক্ষু

জলের মতো নির্মল সেই আয়নার ভিতর পদ্মিনীর রূপের ছটা, হাজার হাজার বাতির আলো যেন আলোময় করে প্রকাশ হল! বাদশা দেখতে লাগলেন সে কী কালো চোখ! সে কী সুটানা ভুরু! পদ্মের মৃণালের মতো কেমন কোমল দু'খানি হাত! বাঁকা মল পরা কী সুন্দর দুখানি রাঙা পা! ধানী রঙের পেশোয়াজে মুক্তোর ফুল, গোলাপি ওড়নায় সোনার পাড়, পান্নার চুড়ি, নীলার আংটি, হীরের চিক! বাদশা আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন—একী মানুষ না পরী? আলাউদ্দিন আর স্থির থাকতে পারলেন না; তিনি মছনদ ছেড়ে সেই প্রকাণ্ড আয়নার ভিতর ছায়া-পদ্মিনীকে ধরবার জন্য দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে চললেন; গ্রহণের রাত্রে রাহু যেমন চাঁদকে গ্রাস করতে যায়। ভীমসিংহ বলে উঠলেন—'শাহেনশা, পদ্মিনীকে স্পর্শ করবেন না।' রানার মনে হল, রাজদরবারে একদিকে বসে সত্যই তাঁর পুণ্যবতী রানী পদ্মিনী যেন পাঠানের হাতে অপমান হবার ভয়ে কাঁপছে! রাগে রানীর দুইচক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠল, তিনি সেই ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উঠে সোনার একটা পেয়ালা সেই আয়নাখানার ঠিক মাঝখানে সজোরে ছুঁড়ে মারলেন—ঝনঝন শব্দে সাত হাত উঁচু চমৎকার সেই আয়না চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ল। আলাউদ্দিন চমকে উঠে তিন পা পিছিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি মনে বুঝলেন, পাগলের মতো রানীর দিকে ছুটে যাওয়াটা বড়োই অভদ্রতা হয়েছে, এজন্য রানার কাছে ক্ষমা চাওয়া দরকার।

বাদশা ভীমসিংহের দিকে ফিরে বললেন, 'রানা, আমার অন্যায় হয়েছে, আমার মহলে এসে যদি কেউ এমন অভদ্রতা করত, তাহলে হয়তো আমি তার মাথা কেটে ফেলতে হুকুম দিতুম—আমায় ক্ষমা করুন।' তারপর অনেক তোষামোদ, অনেক অনুনয়-বিনয়ে রানাকে সন্তুষ্ট করে গভীর রাত্রে আলাউদ্দিন ভীমসিংহের কাছে বিদায় চাইলেন। পেয়ালার পর পেয়ালা আমিল খেয়ে একেই রানার প্রাণ খুলে গিয়েছিল তার উপর দিল্লীর বাদশা তাঁর কাছে যখন ক্ষমা চাইলেন, তখন তাঁর মন একেবারে গলে গেল—রানা আদর করে নতুন বন্ধু দিল্লীর বাদশাকে কেল্লার বাইরে পৌঁছে দিতে চললেন।

অমাবস্যার রাত্রি, আকাশে শুধু তারার আলো, পৃথিবীতে কালো অন্ধকার; ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ—সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর নগরের লোক ঘুমিয়ে আছে, চিতোরের রাজপথে জনমানব নেই, আলাউদ্দিন সেই জনশূন্য রাজপথ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন, সঙ্গে রানা ভীম আর কুড়িজন রাজপুত সেপাই।

আজ রানার মনে বড়ো আনন্দ—চিতোরের প্রধান শত্রু আলাউদ্দিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল, আর কখনও চিতোরকে পাঠানের অত্যাচার সহ্য করতে হবে না। রানা যখন ভাবলেন, কাল সকালে পাঠান সৈন্য চিতোর ছেড়ে চলে যাবে, যখন ভাবলেন চিতোরের সমস্ত প্রজা কাল থেকে নির্ভয়ে রানা-রানীর জয় জয়কার দিয়ে যে যার কাজে লাগবে, তখন তাঁর মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। তিনি মহা উল্লাসে বাদশার পাশে পাশে ঘোড়ায় চড়ে কেল্লার ফটক পার হলেন। তখন রাত্রি আরও অন্ধকার হয়েছে; পাহাড়ের গায়ে বড়ো বড়ো নিমগাছ কালো কালো দৈত্যের মতো রাস্তার দুই ধারে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। আর কোথাও কোনও শব্দ নেই, কেবল কেল্লার উপর থেকে এক একবার প্রহরীদের হই হই আর পাথরের রাস্তায় সেই বাইশটা ঘোড়ার খুরের খটাখট।

আলাউদ্দিন ভীমসিংহকে নিয়ে কথায় কথায় ক্রমে পাহাড়ের নিচে এলেন। সেখানে একদিকে জনারের খেত, আর একদিকে আমবাগান, মাঝে মেঠো রাস্তা। এই রাস্তার দুইধারে প্রায় দু'শো পাঠান আলাউদ্দিনের হুকুম মতো লুকিয়েছিল। ভীমসিংহ যেমন এইখানে এলেন অমনি হঠাৎ চারিদিক থেকে পাঠান সৈন্য তাঁকে ঘিরে ফেলল; তারপর সেই অন্ধকার রাত্রে শত শত শত্রুর মাঝে কুড়িজন মাত্র রাজপুত তাদের রানাকে উদ্ধার করবার জন্য প্রাণপণে যুঝতে লাগল! কিন্তু বৃথা! বাজপাখি যেমন ছোঁ মেরে শিকার নিয়ে যায়, তেমনই পাঠান আলাউদ্দিন রাজপুতদের মাঝখান থেকে রানা ভীমকে বন্দী করে নিয়ে গেলেন। কুড়িজনের মধ্যে পাঁচজন রাজপুত চিতোরে ফিরল। প্রতিপদের সকালবেলায় সমস্ত চিতোরে রাষ্ট্র হল—ভীমসিংহ বন্দী হয়েছেন; পদ্মিনীকে না দিয়ে তাঁর মুক্তি নেই।

আলাউদ্দিন যখন শিবিরে পৌঁছলেন, তখন রাত্রি আড়াই প্রহর। তিনি ভীমসিংহকে সাবধানে বন্ধ রাখতে হুকুম দিয়ে নিজের কানাতে বিশ্রাম করতে গেলেন। আজ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, রানা যখন ধরা পড়েছেন, তখন পদ্মিনী আর কোথায় যায়! হিন্দুর মেয়ে স্বামীর জন্যে প্রাণ দিতে পারে, বাদশার বেগম হতে কি রাজি হবে না? পদ্মিনীকে না পেলে রানাকে কিছুতেই ছাড়া হবে না—আলাউদ্দিন মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করে সোনার খাটিয়ায় দুধের ফেনার মতো ধপধপে বিছানায় শুয়ে হিন্দুরানী পদ্মিনীর কথা ভাবতে ভাবতে শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লেন।

সকাল হলে বাদশা মনে ভাবলেন, এইবার পদ্মিনী আসছেন। সকাল গিয়ে দুপুর কেটে সন্ধ্যা হল, পদ্মিনী

এলেন না। দিনের পর দিন রাতের পর রাত চলে গেল, তবু পদ্মিনীর দেখা নেই। বাদশা অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর মনে হতে লাগল এ ভীমসিংহ কি আসল ভীমসিংহ নয়? আমি কি ভুল করে সামান্য কোনও সর্দারকে বন্দী করে এনেছি? আলাউদ্দিন বন্দী রাজাকে হুজুরে হাজির করতে হুকুম দিলেন। লোহার শিকলে বাঁধা রানা বাঁধা সিংহের মতো বাদশার দরবারে উপস্থিত হলেন। শাহেনশা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমিই কি পদ্মিনীর ভীমসিংহ?' রানা উত্তর করলেন, 'পাঠান! এতে তোমার সন্দেহ হচ্ছে কেন?' আলাউদ্দিন বললেন, 'যদি তুমি সত্যিই ভীমসিংহ হবে তোমাকে উদ্ধার করবার জন্য রাজপুতদের কোনওই চেষ্টা দেখছি না যে?' রানা বললেন, 'যে মূর্খ নিজের বুদ্ধির দোষে মিথ্যাবাদী পাঠানের হাতে বন্দী হয়েছে, তার সঙ্গে চিতোরের মহারানা বোধ হয় আর কোনও সম্বন্ধ রাখতে চান না!' কথাটা শুনে বাদশার মনে খটকা লাগল—যদি, সত্যিই ভীমসিংহকে পাঠানের হাতে ছেড়ে দিয়ে থাকেন? আলাউদ্দিন মহা ভাবিত হয়ে দরবার ছেড়ে উঠে গেলেন।

সেই দিন শেষ রাত্রে চিতোরের উপরে কেল্লার খোলা ছাদে পদ্মিনী গালে হাত দিয়ে একা দাঁড়িয়েছিলেন! নীল পদ্মের মতো তাঁর দু'টি সুন্দর চোখ, পাঠান শিবিরের দিকে—যেখানে ভীমসিংহ বন্দী ছিলেন, সেই দিকে চেয়েছিল। আকাশ তখনও পরিষ্কার হয়নি, পূর্বদিকে সূর্যের আলো সোনার তারের মতো দেখা দিয়েছে, এমন সময় দুজন রাজপুত সর্দার পদ্মিনীর পায়ে এসে প্রণাম করলেন। একজনের নাম গোরা, আরেকজনের নাম বাদল! গোরার বয়স পঞ্চাশের উপর, আর তার বড়ো ভাইয়ের ছেলে বাদলের বয়স বছর বারো। গোরা-বাদল দু'জনেই পদ্মিনীর বাপের বাড়ির লোক। রাজকুমারী পদ্মিনী যখন ভীমসিংহের রানী হয়ে সিংহল ছেড়ে চলে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে এই গোরা এক হাতে তলোয়ার, আর হাতে মা-বাপ হারা কচি বাদলকে নিয়ে দেশ ছেড়ে চিতোরে এসেছিলেন। পদ্মিনী জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহারানা কি আমার কথামতো কাজ করতে রাজি হয়েছেন?' গোরা বললেন, 'তাঁরই হুকুমে রানীজিকে পাঠান শিবিরে পাঠাবার বন্দোবস্ত করার জন্যে এখনই বাদশার সঙ্গে দেখা করতে চলেছি।' পদ্মিনী একটু হেসে বললেন, 'যাও, বাদশাকে বলো, আমার জন্যে যেন দিল্লিতে একটা নতুন মহল বানিয়ে রাখেন।'

গোরা-বাদল বিদায় নিলেন। দেখতে দেখতে সমস্ত পৃথিবী প্রকাশ করে সূর্যদেব উদয় হলেন। পদ্মিনী দেখলেন, আলাউদ্দিনের লাল রেশমের প্রকাণ্ড শিবির সকালবেলার সূর্যের আলোয় ক্রমে ক্রমে রক্তময় হয়ে উঠল! তিনি বাদশাহের সেই কানাতের দিকে চেয়ে চেয়ে বলে উঠলেন—'ধূর্ত পাঠান, তোতে-আমাতে আজ যুদ্ধ আরম্ভ হল। দেখি, কার কতদূর ক্ষমতা।'

সেদিন শুক্রবার, মুসলমানদের জুম্মা। আলাউদ্দিন ফজিরের নমাজ করে দরবারে বসেছেন, এমন সময় মহারানার চিঠি নিয়ে গোরা-বাদল উপস্থিত হলেন। বাদশা মহারানার মোহর করা চিঠি হাতে নিয়ে পড়তে লাগলেন। তাতে লেখা রয়েছে—'পদ্মিনীকে বাদশার হাতে দেওয়াই স্থির হল, তার বদলে রানা ভীমসিংহের মুক্তি চাই! আরও, রাজরানী পদ্মিনী সামান্য স্ত্রীলোকের মতো দিল্লিতে যেতে পারেন না, তাঁর প্রিয় সখীরাও যাতে পদ্মিনীর সঙ্গে থেকে চিরদিন তাঁর সেবা করতে পারেন, বাদশাহ যেন সে বন্দোবস্ত করেন; তাছাড়া চিতোরের রানী পদ্মিনীকে শাহেনশার শিবিরে পৌঁছে দেবার জন্যে যে সব বড়ো বড়ো ঘরের রাজপুতানী সঙ্গে যাবেন, তাঁদের যাতে কোনও অসম্মান না হয়, সেজন্য বাদশা তাঁর সমস্ত সৈন্য কেল্লার সামনে থেকে কিছু দূরে সরিয়ে রাখবেন। শেষে মহারানার ইচ্ছা যে, এর পর থেকে আলাউদ্দিন আর যেন তাঁর সঙ্গে শত্রুতা না করেন।' চিঠিখানা পড়ে বাদশার মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল; তিনি হাসিমুখে গোরা ও বাদলের দিকে ফিরে বললেন, 'বেশ কথা! আমি আজ রাত্রের মধ্যেই সমস্ত ফৌজ কেল্লার সামনে থেকে উঠিয়ে নেব, রানীর আসবার কোনওই বাধা হবে না। তোমরা মহারানাকে জানাওগে তাঁর সকল কথাতেই আমি রাজি হলেম।'

গোরা-বাদল বিদায় হলেন। বাদশা কেল্লার সামনে থেকে সৈন্য উঠিয়ে নিতে হুকুম দিলেন। একদিনের মধ্যে এত সৈন্য অন্য জায়গায় উঠিয়ে নেওয়া সহজ নয়। বাদশা বললেন—তাম্বুকানাত, গোলাগুলি, অস্ত্রশস্ত্র, আসবাবপত্র যেখানকার সেইখানেই থাক, কেবল সেপাইরা নিজের ঘোড়া নিয়ে একদিনের মতো অন্য কোথাও আশ্রয় নিক। তাতেও প্রায় সমস্ত রাত কেটে গেল।

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চিতোরের প্রধান ফটক রামপালের উপর কড়কড় শব্দে নাকাড়া বাজতে লাগল। বাদশা দেখলেন, চিতোরের সাতটা ফটক একে একে পার হয়ে চার চার বেহারার কাঁধে, প্রায় সাতশো ডুলি তাঁর শিবিরের দিকে আসছে—মাঝে রানী পদ্মিনীর চিনাপোত-মোড়া সোনার চতুর্দোল, তার একপাশে

পঞ্চাশ বৎসরের সর্দার গোরা, আর একপাশে বারো বৎসরের বালক বাদল—দু'জনেই ঘোড়ায় চড়ে। পদ্মিনী আর তাঁর সহচরীদের থাকবার জন্যে বাদশা প্রায় আধ ক্রোশ জুড়ে কানাত ফেলেছিলেন। একে একে যখন সেই সাতশো পালকি কানাতের ভিতর পৌঁছল, তখন গোরা বাদশার হুজুরে খবর জানালেন, 'শাহেনশা, রানীজি উপস্থিত; এখন তিনি একবার ভীমসিংহের সঙ্গে দেখা করতে চান—বাদশাহের বেগম হলে আর তো দু'জনে দেখা হবে না।' বাদশা বললেন, 'পদ্মিনী যখন রানাকে দেখতে চেয়েছেন, তখন আর কথা কি! আমি আধঘণ্টা সময় দিলাম, তার বেশি রানা যেন পদ্মিনীর কাছে না থাকেন।' গোরা তথাস্তু বলে বিদায় হলেন।

আলাউদ্দিন একলা বসে দেখতে লাগলেন—এক, দুই করে প্রায় সাতশো পালকি, কানাতের ভিতর থেকে বেরিয়ে চিতোরের মুখে চলে গেল; সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বারো বৎসরের বাদল। বাদশা একজন ওমরাহকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ সব পালকিতে কারা যায়?' শুনলেন, চিতোর থেকে যে সকল বড়ো ঘরের রাজপুতানী রানীকে বিদায় দিতে এসেছিলেন, তাঁরা ফিরে গেলেন। বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভীমসিংহ কোথায়?' উত্তর হল, 'অন্দরে আছেন।'

আলাউদ্দিন শিবিরের এককোণে বালির ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন, আধ ঘণ্টা হয়ে গেছে। এইবার পদ্মিনীর সঙ্গে দেখা হবে। বাদশা সাজগোজ করবার জন্য অন্য এক শিবিরে উঠে গেলেন। সেখানে আতর গোলাপ, হীরে জহরতের ছড়াছড়ি—কোথাও সোনার আতরদানে হাজার টাকা ভরি গোলাপি আতর, কোথাও মুক্তোর তাজ, পান্নার শিরপ্যাঁচ, কৌটো ভরা মানিকের আংটি, আলনায় সাজানো কিংখাবের জামাজোড়া, রেশমি রুমাল, জরির লপেটা।

বাদশা যতক্ষণ কিংখাবের জামাজোড়া, জুরির লপেটা পরে আয়নার সম্মুখে পাকা দাড়িতে গোলাপি আতর লাগাচ্ছিলেন, ততক্ষণ সেই সাতশো পালকির একখানাতে রানা ভীমসিংহকে লুকিয়ে মেবারের বাছা বাছা রাজপুত সর্দারেরা পাঠান শিবিরের মাঝখান দিয়ে চিতোরের মুখে এগিয়ে চলেছেন।

ক্রমে আলাউদ্দিনের সাজগোজ সাঙ্গ হল। আধ ঘণ্টা শেষ হয়ে একঘণ্টা পূর্ণ হতে চলল, এখনও পদ্মিনীর শিবির থেকে ভীমসিংহ ফিরে এলেন না! বাদশা গোরাকে ডাকতে হুকুম দিলেন, গোরার কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না! আলাউদ্দিন আর স্থির থাকতে পারলেন না, ব্যস্তসমস্ত হয়ে যেখানে আধক্রোশ জুড়ে কানাত খাটানো হয়েছিল, সেইখানে উপস্থিত হলেন; দেখলেন পদ্মিনীর সোনার চতুর্দোল শূন্য পড়ে আছে। যে লাল মখমলের প্রকাণ্ড শিবিরে তিনি চিতোরের রানী পদ্মিনীকে মানিকের খাঁচায় পাখিটির মতো পুষে রাখবেন ভেবেছিলেন, সে শিবির অন্ধকার! কোথায় পদ্মিনী, কোথায় তাঁর একশো সখী আর কোথায় বা বন্দী ভীমসিংহ; পাঠান শিবিরে হুলস্থূল পড়ে গেল! সকলেই শুনলে পালকি বেয়ারা সেজে রাজপুতেরা বন্দী রানাকে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে গেল। বাদশা তখনই সমস্ত সৈন্য জড়ো করতে হুকুম দিয়ে দু'হাজার ঘোড়সওয়ার সঙ্গে চিতোরের মুখে বেরিয়ে গেলেন।

সবেমাত্র রানার পালকি চিতোরের ফটক পার হয়েছে, এমন সময় পাঠান বাদশার ঘোড়সওয়ার কালবৈশাখীর ঝড়ের মতন ধূলিধ্বজায় চারিদিক অন্ধকার করে দীন দীন শব্দে রাজপুত সৈন্যের উপর পড়ল।

তখন বেলা দুই প্রহর। আগুনের সমান তপ্ত রৌদ্রে বারো বৎসরের বাদল আর পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ গোরা একদল রাজপুতকে নিয়ে প্রাণপণে চিতোরের সিংহদ্বার রক্ষা করতে লাগলেন। সন্ধ্যা হয়ে এল, তবু যুদ্ধের শেষ হল না। চিতোর থেকে দলের পর দল রাজপুত এসে যুদ্ধে যোগ দিতে লাগল; বাদশা হাজারের পর হাজার পাঠান এনেও চিতোরের একখানা পাথর পর্যন্ত দখল করতে পারলেন না! শেষে, যে ভীমসিংহকে তিনি কাল রাত্রে লোহার শৃঙ্খলে বন্ধ রেখেছিলেন, সেই ভীমসিংহ যখন হাতির পিঠে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন, তখন পাঠান বাদশার আশা-ভরসা নির্মূল হল। সন্ধ্যার অন্ধকারে অর্ধেক ভারতবর্ষের সম্রাট আল্লাউদ্দিন চিতোরের সম্মুখ থেকে ঘোড়া ফিরিয়ে শিবিরে গেলেন। জয়! জয়! রবে চিতোর নগর পরিপূর্ণ হল!

সেইদিন গভীর রাত্রে যুদ্ধ শেষে রানা ভীমসিংহ যখন পদ্মিনীর শয়নকক্ষে বিশ্রাম করতে এলেন, তখন রানার দুই চক্ষে জল দেখে পদ্মিনী জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ সুখের দিনে চক্ষে জল কেন?' রানা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'পদ্মিনী, আজ আমার পরম উপকারী চিরবিশ্বাসী গোরা চিরদিনের মতো যুদ্ধের খেলা সাঙ্গ করে দেবলোকে চলে গেছে।' দু'জনে আর একটিও কথা হল না! রানী পদ্মিনীর শয়নঘরের প্রদীপ অন্ধকার করে দিলেন; দক্ষিণের হাওয়ায় সারারাত্রি চিতোরের মহাশ্মশানের দিক থেকে একটা হায় হায় হায় হায় শব্দ শেই ঘরের ভিতর ভেসে আসতে লাগল।

আল্লাউদ্দিন যখন পদ্মিনীর আশায় চিতোর ঘিরে বসেছিলেন, সেই সময় কাবুল থেকে মোগলের দল একটু একটু করে ক্রমেই ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে আসছিল! রাজপুতের কাছে হার মেনে বাদশা নিজের শিবিরে এসে শুনলেন মোগল বাদশা তৈমুরলং দিল্লী আক্রমণ করতে আসছেন। সেই সঙ্গে দিল্লী থেকে পিয়ারী বেগমের এক পত্র পেলেন; তার একজায়গায় বেগম লিখেছিলেন, 'শাহেনশা, আর কেন—পদ্মিনীর আশা পরিত্যাগ করুন। হে মধুকর, তুমি পদ্মের সন্ধানে মরুভূমির মাঝে ফিরতে লাগলে, আর বনের ভাল্লুক এসে তোমার সাধের মৌচাক লুটে গেল—সকল আল্লার ইচ্ছে! আজ অর্ধেক ভারতবর্ষের রাজা, কাল হয়তো পথের ভিখারি! হায় রে হায়, দিল্লীর পিয়ারী বেগমকে এতদিনে বুঝি মোগল দস্যুর বাঁদী হতে হল!' বাদশা পিয়ারীর চিঠি পড়ে স্তম্ভিত হলেন। বিপদ যে এত গুরুতর, তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। আল্লাউদ্দিন তৎক্ষণাৎ শিবির ওঠাতে হুকুম দিলেন। সেই রাত্রে পাঠান ফৌজ রাজস্থান ছেড়ে কাশ্মীরের মুখে চলে গেল!

তেরো বৎসর পরে, চিতোরের সম্মুখে পাঠান বাদশার রণডঙ্কা আর একবার বেজে উঠল। তখন চিতোরের বড়ো দুরবস্থা। সমস্ত দেশ দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে উজাড় হয়ে যাচ্ছে—দেশ প্রায় বীরশূন্য; নতুন নতুন লোকের হাতে যুদ্ধের ভার। রানা ভীমসিংহ সেই সব নতুন সৈন্য নতুন সেনাপতি নিয়ে গ্রামে গ্রামে পথে পথে, পাঠান সৈন্যকে বাধা দিতে লাগলেন; কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল।

যুদ্ধের পর যুদ্ধে রাজপুতদের হটিয়ে দিয়ে, গ্রামের পর গ্রাম, কেল্লার পর কেল্লা দখল করতে করতে একদিন আল্লাউদ্দিন চিতোরের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। বাদশাহী ফৌজ চিতোরের দক্ষিণে পাহাড়ের উপর গড়বন্দী তাঁবু সাজিয়ে রাজপুতের সঙ্গে শেষ যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। এবার প্রতিজ্ঞা, চিতোরের কেল্লা ভূমিসাৎ না করে দিল্লী ফেরা নয়।

মলিন মুখে রানা ভীমসিংহ চিতোর গড়ে ফিরে এলেন। মহারানা লক্ষ্মণসিংহ রাজসভায় ভীমসিংহকে ডেকে বললেন, 'কাকাজি, এত দিনে বুঝি চিতোর গড় পাঠানের হস্তগত হয়, আর উপায় নেই! প্রজাসকল হাহাকার করছে, সমস্ত দেশ দুর্ভিক্ষে উজাড় হয়ে যাচ্ছে, তার উপর এই বিপদ উপস্থিত! এখন কি নিয়ে, কাকে নিয়েই বা লড়াই করি?' ভীমসিংহ বললেন, 'চিতোর এখনও বীরশূন্য হয়নি, এখনও আমরা এক বৎসর পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে পারি, এমন ক্ষমতা রাখি!' লক্ষ্মণসিংহ ঘাড় নাড়লেন, 'কাকাজি, আর যুদ্ধ বৃথা! আমি বেশ বুঝতে পারছি, পাঠানের সঙ্গে সন্ধি না করলে আর রক্ষা নেই; তবে কেন এই দুর্ভিক্ষের দিনে সমস্ত দেশজুড়ে যুদ্ধের আগুন জ্বালাই? সমস্ত প্রজা আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে! আমার ক্ষতিতে রাজ্যে যদি শান্তি আসে, যদি আগুন নিভে যায়, তবে পাঠানের সঙ্গে সন্ধি করায় ক্ষতি কি? না হয় কিছুকাল পাঠান বাদশার একজন তালুকদার হয়েই কাটালেম।' ভীমসিংহের দুই চক্ষে জল পড়তে লাগল; তিনি মহারানার দু'টি হাত ধরে বললেন, 'হায় লছমন, মনে বেশ বুঝেছি আর উপায় নেই, তবু আমার একটি অনুরোধ আছে। দুই বৎসর বয়সে যখন তোর মা গেলেন, বাপ গেলেন, তখন আমিই তোকে ছেলের মতো বুকে টেনে নিয়েছিলেম; সমস্ত বিপদ-আপদ, রাজ্যের সমস্ত ভাবনাচিন্তা তোরই হয়ে অকাতরে সহ্য করেছিলেম। আজ আমার একটি অনুরোধ রক্ষা কর বৎস। সাতদিন সময়ে দে। আমি এই শেষবার চিতোর উদ্ধারের চেষ্টা দেখি! এই সাতদিন যেন পাঠানের সঙ্গে সন্ধি না হয়, এই সাতদিন যেন আমার হুকুম মহারানার হুকুম জেনে সকলে মান্য করে।'

লক্ষ্মণসিংহ বললেন, 'তথাস্তু।'

সেই দিন থেকে ভীমসিংহের হুকুম মতো এক একজন রাজপুত সর্দার পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে লাগলেন।

প্রতিদিন খবর আসতে লাগল—আজ অমুক রাজকুমার যুদ্ধে প্রাণ দিলেন, আজ অমুক সামন্ত বন্দী হলেন—চিতোরের ঘরে ঘরে হাহাকার উঠল! সেই হাহাকার, সেই হাজার হাজার অনাথ শিশু আর বিধবার ক্রন্দন, পদ্মসরোবরের মাঝখানে, যেখানে রাজরানী পদ্মিনী শ্বেতপাথরের দেবমন্দিরে পূজায় বসেছিলেন, সেইখানে পৌঁছল। পদ্মিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পূজা সাঙ্গ করলেন। তাঁর কোমল প্রাণ সেই সব দুঃখী পরিবার, অনাথ শিশুর জন্যে সারা দিন, সারা সন্ধ্যা কেবল কাঁদতে লাগল!

ভীমসিংহ যখন মহলে এলেন তখন পদ্মিনী দুই হাত জোড় করে বললেন, 'প্রভু, আর কতদিন যুদ্ধ চলবে?' ভীমসিংহ বললেন, 'তিন দিন মাত্র। কিন্তু যুদ্ধে আর কোনও ফল নেই, রাজপুতের প্রাণে সে উৎসাহ আর নেই। এখন উপায় কি? সূর্যবংশের মহারানাকে এইবার বুঝি পাঠান বাদশার তালুকদার হতে হল!' পদ্মিনী জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভু, চিতোর রক্ষার কি কোনওই উপায় নেই?' ভীমসিংহ বললেন, 'উবরদেবী যদি কৃপা করেন, তবেই

রক্ষে! হায় পদ্মিনী, কার পাপে চিতোরের এ দুর্দশা হল।' তারপর, দু'একটি কথার পর ভীমসিংহ অন্য কাজে চলে গেলেন।

একা ঘরে পদ্মিনীর কানে কেবলই বাজতে লাগল—হায় পদ্মিনী, কার পাপে আজ চিতোরের এ দুর্দশা! অন্ধকারে পদ্মিনী কপালে করাঘাত করে উঠলেন, 'হায়, হতভাগিনী পদ্মিনী, তোরই এ পোড়া রূপের জন্যে এ সর্বনাশ—তোরই জন্যে এ সর্বনাশ।'

নিঃশব্দ ঘরে প্রতিধ্বনিত হল —'তোরই জন্যে এ সর্বনাশ!'

ঠিক সেই সময়ে চৈত্র মাসের পরিষ্কার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। পদ্মিনী একটা মোটা চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে নিজের মহল থেকে চিতোরেশ্বরী উবরদেবীর মন্দিরে একা চলে গেলেন। রাত্রি দুই প্রহর, উবরদেবীর মন্দিরে সমস্ত আলো নিভে গেছে, কেবল একটিমাত্র প্রদীপের আলো! সেই আলোয় বসে দেবীর ভৈরবী রাজরানী পদ্মিনীকে বললেন, 'মহারানী, আমি আবার বলি, তুমি যে কাজ করতে যাচ্ছ, তার শেষ হচ্ছে মৃত্যু! দেবীর রত্ন-অলঙ্কার একবার অঙ্গে পরলে আর নিস্তার নেই! ছয় মাসের মধ্যে জীবন্ত অবস্থায় জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ হতে হবে!' পদ্মিনী বললেন, 'হে মাতাজি, আশীর্বাদ করুন, যে রূপসীর জন্যে রাজস্থানে আজ এ আগুন জ্বলেছে, তার সেই পোড়া রূপ জ্বলন্ত আগুনেই ভস্ম হোক।' ভৈরবী বললেন, 'তবে তাই হোক। বৎসে আমি আশীর্বাদ করি, যে চিতোরের জন্য তুমি নিজের প্রাণ তুচ্ছ করলে, সেই চিতোরে তোমার নাম চিরদিন যেন অমর থাকে; যে মহাসতীর রত্ন-অলঙ্কার আজ তুমি পরতে চললে, সেই মহাসতী মরণান্তে তোমায় যেন চরণে রাখেন।' রানী পদ্মিনী ভৈরবীর হাত থেকে একটি চন্দন কাঠের কৌটায় উবরদেবীর সমস্ত রত্ন-অলঙ্কার নিয়ে বিদায় হলেন।

সেই দিন রাত্রে প্রায় আড়াই প্রহরে চিতোরের রাজপ্রাসাদে একটুখানি সাড়াশব্দ ছিল না—মহারানা নির্জন ঘরে একা ছিলেন। যখন তাঁর সমস্ত প্রজা, পাঠানের সঙ্গে সন্ধি হবে, দেশে শান্তি আসবে মনে করে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়েছিল, সেই সময়ে সমস্ত মেবারের রাজা, ভগবান একলিঙ্গের দেওয়ান মহারানা লক্ষ্মণসিংহের চোখে ঘুম ছিল না। হায় অদৃষ্ট ! কাল সন্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিতোর ছেড়ে যেতে হবে, এ জীবনে আর হয়তো ফেরা হবে না! রাজ্য, সম্পদ, মান, মর্যাদা, আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে কোনও দূর দেশে সামান্য বেশে নির্বাসনে যেতে হবে। মহারানা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন—ঘরের এককোণে সোনার দীপদানে একটিমাত্র প্রদীপ জ্বলছিল, প্রকাণ্ড ঘরের আর সমস্তটা অন্ধকার। খিলানের পর খিলান, থামের পর থামের সারি অন্ধকার থেকে গাঢ় অন্ধকারে মিশে গেছে—একটিমাত্র প্রদীপের আলোয় নিঃশব্দ সেই প্রকাণ্ড ঘর আরও যেন অন্ধকার বোধ হতে লাগল। মহারানা অন্তঃপুরে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন।

হঠাৎ পায়ের তলায় মেঝের পাথরগুলো একবার যেন কেঁপে উঠল; তারপর মহারানা অনেকখানি ফুলের গন্ধ আর অনেক নূপুরের ঝিন ঝিন শব্দ পেলেন। কারা যেন অন্ধকারে ঘুরে বেড়োাচ্ছে! মহারানা বলে উঠলেন, 'কে তোরা? কি চাস?' চারিদিকে—দেওয়ালের ভিতর থেকে, ছাদের উপর থেকে, পায়ের নিচে থেকে শব্দ উঠল—'ম্যায় ভুখা হুঁ।' লক্ষ্মণসিংহ বললেন, 'আঃ, এতরাত্রে চিতোরের রাজপ্রসাদে উপবাসে কে জাগে?' আবার শব্দ উঠল—'ম্যায় ভুখা হুঁ।' তারপর গাঢ় ঘুমের মাঝখানে স্বপ্ন যেমন ফুটে ওঠে, তেমনও সেই শয়নঘরের অন্ধকারে এক অপরূপ দেবীমূর্তি ধীরে ধীরে উঠল! মহারানা বলে উঠলেন, 'কে তুমি, দেবতা না দানব, আমায় ছলনা করছ?' লক্ষ্মণসিংহ দীপদান থেকে সোনার প্রদীপ উঠিয়ে ধরলেন। প্রদীপের আলো দেবীর কিরীটকুণ্ডলে, রত্ন-অলঙ্কারে, অসংখ্য অসংখ্য মণিমানিক্যে হাজার হাজার আগুনের শিখার মতো দপ দপ করে জ্বলতে লাগল। লক্ষ্মণসিংহ দেখলেন—উবরদেবী!

ভয়-ভক্তি-বিস্ময়ে মহারানার সর্বশরীর অবশ হয়ে এল—পরমানন্দে দুর্বল তাঁর হাত থেকে সোনার প্রদীপ খসে পড়ল। তারপর সব অন্ধকার! সেই অন্ধকারে মহারানা স্বপ্ন দেখছেন, কি জেগে আছেন, বুঝতে পারলেন না! তিনি যেন শুনতে লাগলেন, দেবী বলছেন—'ম্যায় ভুখা হুঁ!—বড়ো ক্ষুধা, বড়ো পিপাসা, আমি মহাবলি চাই—রক্ত না হলে এ পিপাসার শান্তি নেই! মহারানা! ওঠো, জাগো, দেশের জন্য বুকের রক্তপাত করো—আমার খর্পর রক্তের শতধারায় পরিপূর্ণ করো! রাজ-প্রজা বালক-বৃদ্ধ যদি চিতোরের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করে, তবেই কল্যাণ! না হলে, সূর্যবংশের রাজপরিবার আর কখনও চিতোরের সিংহাসন পাঠানের হাত থেকে ফিরে পাবে না।'

পর্বতের গুহায় প্রতিধ্বনি যেমন ঘুরতে থাকে, তেমনই সেই প্রকাণ্ড ঘরে দেবীর শেষ কথা অনেকক্ষণ ধরে গম গম করতে লাগল।

রাত্রি শেষ হয়ে গেল। উষাকালে সোনার আলো আর শীতল বাতাসের মাঝখানে চিতোরেশ্বরী কোথায় অন্তর্ধান করলেন! অনেকদূরে পার্বতী মন্দির নহবতের সুরে ভৈরবী রাগিণীতে মহাদেবীর স্তুতিগান বাজতে লাগল।

প্রত্যূষে রাজদরবারে মহারানা লক্ষ্মণসিংহ যখন রাত্রের ঘটনা আর দেবীর আদেশ সকলের সম্মুখে প্রকাশ করলেন তখন সকলে বিস্মিত হল বটে, কিন্তু অনেকেই সেকথা বিশ্বাস করলে না। যাদের হৃদয়ে বিশ্বাস অটল, ভক্তি অচলা ছিল, যারা চিতোরের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তারা উৎসাহে উন্মত্ত হয়ে উঠল। আর যাদের প্রাণ নিরুৎসাহ, মন দুর্বল, যারা পাঠানের সঙ্গে সন্ধি হলে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাবে ভেবেছিল, তারা ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল! কিন্তু সেই রাত্রে মহারানার আদেশে মেবারের ছোটোবড়ো সামন্ত সর্দারেরা যখন দেবীর নিজের মুখের আদেশ শোনবার জন্য অন্তঃপুরে সেই ঘরে একত্র হলেন, যখন দ্বিপ্রহরের স্তব্ধ রাজপুরে হাজার হাজার রাজপুত বীরের চোখের সম্মুখে আবার সেই দেবীমূর্তি 'ম্যায় ভুখা হুঁ!' বলে প্রকাশ হলেন, তখন আর কারও মনে কোনও সন্দেহ রইল না—সকলের মন থেকে সমস্ত অবিশ্বাস, সকল দুর্বলতা নিমেষের মধ্যে দূর হল—আগুনের তেজে অন্ধকার যেমন দূর হয়ে যায়! সকলেই বীরত্বের নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠল; কেবল রানা ভীমসিংহ যেন সেই দেবীমূর্তির ভিতরে পদ্মিনীকে দেখে মনে মনে তোলা-পাড়া করতে লাগলেন—একি দেবী, না পদ্মিনী? পদ্মিনী, না দেবী?

তারপর, মহাবলির উদ্যোগ হল। মহারানা লক্ষ্মণসিংহ তাঁর বারোটি রাজপুত্রের মধ্যে সর্বপ্রধান, সবচেয়ে বড়ো রাজকুমার, যুবরাজ অরিসিংহের মাথায় চিতোরের রাজমুকুট দিয়ে বললেন, 'হে ভাগ্যবান, দেবীর আদেশ শিরোধার্য করো। পাঠানযুদ্ধে অগ্রসর হও! আজ তুমি সমস্ত মেবারের মহারানা। এই সমস্ত সামন্ত সর্দার তোমারই প্রজা বলে জানবে। আজ থেকে তোমারই হাতে যুদ্ধের ভার; জয় হলে তোমার পুরস্কার—ইহলোকে চিতোরের রাজসিংহাসন; আর যুদ্ধে প্রাণ গেলে তার ফল—পরলোকে মহাদেবীর অভয়চরণ।' বৃদ্ধ রাণা লক্ষ্মণসিংহ অরিসিংহকে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে নিচে দাঁড়ালেন—নতুন রানার মাথায় চিতোরের কিরীট শোভা পেতে লাগল। চারিদিকে রব উঠল—'জয় মহাদেবীর জয়।' 'জয় অরিসিংহের জয়!' লক্ষ্মণসিংহ বলতে লাগলেন, 'সর্দারগণ, আমার আর একটি শেষ কর্তব্য আছে। সে কর্তব্য দেবীর কাছে নয়, চিতোরের কাছে নয়, আমার পিতা-পিতামহ স্বর্গীয় মহারানাদের কাছে। এই মহাসমরে মেবারের রাজবংশ একেবারে নির্মূল না হয়, পরলোকে পিতৃপুরুষেরা যাতে জলগণ্ডুষ পান, রাজস্থানে বাপ্পার বংশ যুগে যুগে যাতে অমর থাকে, সেই জন্যে আমার ইচ্ছা, অজয়সিংহ নিজের স্ত্রী-পুত্র নিয়ে কৈলোরের নির্জন দুর্গে চলে যান।'

অজয়সিংহ মহারানার সম্মুখে জোড়হাত করে বললেন, 'পিতা, আমার এগারো ভাই চিতোরের জন্যে যুদ্ধে প্রাণ দেবে, আর আমি কিনা স্ত্রীলোকের মতো শিশুসন্তান মানুষ করবার জন্যে বসে থাকব? আমি কি এতই দুর্বল, এমনই অক্ষম?' লক্ষ্মণসিংহ বললেন, 'বৎস হতাশ হয়ো না, যে মহৎ কাজের ভার তোমায় দিলেম, চিতোরের যে কোনও রাজপুত সে ভার পেলে নিজেকে ধন্য বোধ করত! হয়তো আমাদের রক্তপাতে চিতোর উদ্ধার হবে না, হয়তো তোমাকেও চিতোরের জন্যে প্রাণ পণ করতে হবে। আমরা হয়তো চিতোরকে পরাধীন রেখে চলে যাব, আর হয়তো তুমি সূর্যবংশের উপযুক্ত কোনও বীরপুরুষের হাতে রাজ্যভার দিয়ে পরম সুখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারবে! মনে রেখো, চিতোরের জন্যে প্রাণ দেবার যে সুখ চিতোর পুনরুদ্ধারের সুখ তার শতগুণ!' লক্ষ্মণসিংহ নীরব হলেন। জয় জয় শব্দে রাজসভা ভঙ্গ হল। রাজসভা থেকে বিদায় নেবার সময় অরিসিংহ অজয়সিংহকে বলে গেলেন, 'চিতোর ছেড়ে যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যেয়ো।' যাত্রার সমস্ত আয়োজন শেষ করে অজয়সিংহ যখন বড়োভাইয়ের ঘরে গেলেন, তখন অরিসিংহ একখানি চিঠি শেষ করে ছোটোভাইয়ের দিকে ফিরে বললেন, 'ভাই, আজ আমাদের শেষ দেখা; কাল তুমি একদিকে, আমি একদিকে। এই শেষদিনে তোমায় একটি কাজের ভার দিচ্ছি।' অরিসিংহ চামড়ায় মোড়া একটি ছোটো থলি আর সেই চিঠিখানি অজয়সিংহের হাতে দিয়ে বললেন, 'অজয়, এ দুটি যত্ন করে রেখো, যদি আমি যুদ্ধ থেকে ফিরে আসি, তবে আবার চেয়ে নেব; নয়তো তুমি খুলে দেখো আমার শেষ ইচ্ছা কি।' তারপর অজয়সিংহকে আলিঙ্গন করে অরিসিংহ বললেন, 'চলো ভাই, মায়ের কাছে বিদাই হই! সেইদিন শেষ রাত্রে যখন রাজ অন্তঃপুর থেকে দুই রাজপুত্র দুইদিকে বিদায় হয়ে

গেলেন তখন বারো ছেলের মা-জননী চিতোরের মহারানী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাটির উপর লুটিয়ে পড়লেন—তাঁর সমস্ত শরীর পাষাণের মতো স্থির হয়ে গেল, কেবল সজল দুটি কাতর চোখ সেইদিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল—যেদিক দিয়ে দুটি রাজকুমার চলে গেলেন। মহারানা বলতে লাগলেন, 'প্রিয়ে, স্থির হও, ধৈর্য ধরো, বুক বাঁধো, মহাকালের কঠোর বিধান নতশিরে শান্ত মনে বহন করো।' তারপর রণরণ শব্দে রাজপুতের রণডঙ্কা দিগদিগন্ত কাঁপিয়ে বাজতে লাগল—যুবরাজ অরিসিংহ যুদ্ধযাত্রা করলেন।

সেইদিন থেকে একমাস কেটে গেল। পাঠানদের বিরুদ্ধে রাজপুতের চেষ্টা ব্যর্থ হল! একের এর এক, এগারোজন রাজকুমার যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। আর আশা নেই; আর উপায় নেই। কিন্তু তবু রাজপুতের বীরহৃদয় এখনও অটল রইল!

চিতোরের শেষ দুই বীর, লক্ষ্মণসিংহ আর ভীমসিংহ, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। রানার হুকুমে মেবারের লক্ষ লক্ষ সৈন্যসামন্তের অবশেষ—ভীষণমূর্তি ভগবান একলিঙ্গের দশহাজার দেওয়ানি ফৌজ একত্র হতে লাগল। তাদের একহাতে শূল, একহাতে কুঠার, দুই কানে শাঁখের কুণ্ডল, মাথায় কালো ঝুঁটি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গায়ে বাঘছালের অঙ্গরাখা, পিঠে একটা করে প্রকাণ্ড ঢাল! তাদের আসবাবের মধ্যে এক ঘোড়া, এক কম্বল, এক লোটা—পৃথিবীতে আপনার বলবার আর কিছুই ছিল না। তারা দেবতার মধ্যে একমাত্র একলিঙ্গজির উপাসনা করত, মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র মহারানার হুকুম মানত। সমরসিংহ এই ফৌজের সৃষ্টিকর্তা। ছোটোখাটো যুদ্ধে এদের কেউ দেখতে পেত না; কেবল মাঝে মাঝে ঘোর দুর্দিনে, যখন চারিদিকে শত্রু, চারিদিকে বিপদ ঘনিয়ে আসত, যখন বিধর্মীর হাতে অপমান হবার ভয়ে দেশের যত সুন্দরী—কি কুমারী, কি বিধবা, কি দশ বছরের কচি মেয়ে, কি ষোলো বছরের পূর্ণ যুবতী—চিতার আগুনে রূপযৌবন ছাই করে দিয়ে চিতোরেশ্বরীর সম্মুখে জীবনের শেষ ব্রত জহরব্রত উদযাপন করত, যখন আর কোনও আশা, কোনও উপায় নেই, সেই সময়, হতাশ রাজপুতের শেষ উৎসাহের মতো দুর্ধর্ষ, দুর্দান্ত এই দেওয়ানি ফৌজ চিতোরের কেল্লায় দেখা দিত! সত্তর বৎসর পূর্বে সমরসিংহের বিধবা রানী কর্মদেবী একদিন কুতুবুদ্দিনের হাত থেকে ছেলের রাজ সিংহাসন রক্ষা করবার জন্যে মেবারের সমস্ত সৈন্য একত্র করেছিলেন; সেইদিন একবার দেওয়ানি ফৌজের ডাক পড়েছিল, আর আজ কয় পুরুষ পরে মহারানা লক্ষ্মণসিংহের হুকুমে দেওয়ানি ফৌজ আর একবার চিতোরের কেল্লায় উপস্থিত হল।

কালরাত্রি, তিথি অমাবস্যা যখন জগৎ সংসার গ্রাস করছিল, মাথার উপর থেকে চন্দ্রসূর্য যখন লুপ্ত হয়েছিল, সেই সময় চিতোরের মহাশ্মশানের মধ্যস্থলে চিতোরেশ্বরীর মন্দিরে বারোহাজার রাজপুত সুন্দরীর জহরব্রত আরম্ভ হল।

মন্দিরের ঠিক সম্মুখে অন্ধকার একটা সুড়ঙ্গের উপর দাঁড়িয়ে রাজস্থানের প্রথম সুন্দরী রানী পদ্মিনী অগ্নিদেবের স্তব আরম্ভ করলেন, 'হে অগ্নি, হে পবিত্র উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি, এসো! পৃথিবীর অন্ধকার তোমার আলোয় দূরে যাক। হে অগ্নি, হে মহাতেজ, এসো! তুমি দুর্বলের বল, সবলের সহায়। হে দেবতা, হে ভয়ঙ্কর, আমাদের ভয় দূর করো, সন্তাপ নাশ করো, আশ্রয় দাও। লজ্জা নিবারণ, দুঃখ বিনাশন, বহ্নিশিখা, তুমি জীবনের শেষ গতি, বন্ধনের মহামুক্তি!' পদ্মিনী নীরব হলেন। বারোহাজার রাজপুতের মেয়ে সেই অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে গাইতে লাগল—'লাজহরণ! তাপবারণ!' হঠাৎ একসময় মহাকল্লোলে চারিদিক পরিপূর্ণ করে হাজার হাজার আগুনের শিখা মহা আনন্দে সেই সুড়ঙ্গের মুখে ছুটে এল। প্রচণ্ড আলোয় রাত্রির অন্ধকার টলমল করে উঠল। বারো হাজার রাজপুতনীর সঙ্গে রানী পদ্মিনী অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন—চিতোরের সমস্ত ঘরের সমস্ত সোনামুখ, মিষ্টি কথা আর মধুর হাসি নিয়ে এক নিমেষে চিতার আগুনে ছাই হয়ে গেল। সমস্ত রাজপুতের বুকের ভিতর হতে চিৎকার উঠল—'জয় মহাসতীর জয়!' আলাউদ্দিন নিজের শিবিরে শুয়ে চিৎকার শুনতে পেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত সৈন্য প্রস্তুত রাখতে হুকুম পাঠালেন।

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চিতোরের পাহাড় বেয়ে বর্ষাকালের স্রোতের মতো রাজপুত সেনা হর হর শব্দে দিগদিগন্ত কাঁপিয়ে ভয়ঙ্কর তেজে পাঠান সৈন্যের উপর এসে পড়ল।

আলাউদ্দিনের তাতার সৈন্য দেওয়ানি ফৌজের কুঠারের মুখে নিমেষের মধ্যে ছিন্নভিন্ন, ছারখার হয়ে পলায়ন করলে। আলাউদ্দিন নতুন নতুন সৈন্য এনে বারম্বার রাজপুতদের বাধা দিতে লাগলেন—স্রোতের মুখে বালির বাঁধের মতো তাঁর সমস্ত চেষ্টা প্রতিবার বিফল হল।

আলাউদ্দিন নিজে একজন সামান্য বীরপুরুষ ছিলেন না, এর চেয়ে ঢের কম সৈন্য নিয়ে তিনি মেবারের চেয়ে অনেক বড়ো বড়ো হিন্দু রাজত্ব অনায়াসে জয় করেছেন, কিন্তু আজ যুদ্ধে রাজপুতের বীরত্ব দেখে তাঁকে ভয় পেতে হল। বারো বার তিনি সৈন্য সাজিয়ে রাজপুতদের বাধা দিলেন, বারো বার তাঁকে হটে আসতে হল; আলাউদ্দিন বেশ বুঝলেন আজ যুদ্ধের সহজে শেষ নেই। একদিকে দিল্লীর বাদশাহীর তক্ত, আর একদিকে চিতোরের রাজসিংহাসন—কোনটা থাকে কোনটা যায়! তখন বেলা তৃতীয় প্রহর, আলাউদ্দিন নিজের সমস্ত ফৌজ একেবারে এক সময়ে এই বারো হাজার রাজপুতের দিকে চালাতে হুকুম দিলেন। নিমেষের মধ্যে পাঠান বাদশার লক্ষ লক্ষ হাতি-ঘোড়া সেপাই-শান্ত্রী প্রলয়ঝড়ের মতো ধূলায় ধূসর চারিদিক অন্ধকার করে দীন দীন শব্দে রাজপুতের দিকে ছুটে আসতে লাগল। তারপর হঠাৎ একসময় সমুদ্রের তরঙ্গে নদীর জল যেমন, তেমনই সেই অগণিত পাঠান সৈন্যের মাঝে কয়েক হাজার রাজপুত কোনখানে লুপ্ত হল, কিছু আর দেখা গেল না। কেবল সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে সেই যুদ্ধরত অসংখ্য সৈন্যের মাথার উপরে সূর্যমূর্তি লেখা চিতোরের রাজপতাকা একবার মাত্র সন্ধ্যার আলোয় বিদ্যুতের মতো চমকে উঠল, তারপরেই শব্দ উঠল—'আল্লা হো আকবর, শানেহশা কি ফতে!' পাঠানের পায়ের তলায় মহারানার রাজছত্র চূর্ণ হয়ে গেল! সূর্যদেব সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার করে অস্ত গেলেন; রক্তমাংসের লোভে রণস্থলের উপর দলে দলে নিশাচর পাখি কালো ডানা মেলে উড়ে বেড়োতে লাগল।

চিতোর হস্তগত হল।

পাঠানের তলোয়ার চিতোরের পথঘাট রক্তের স্রোতে রাঙা করে তুললে; ধনধান্যে, মণিমুক্তায়, লক্ষ লক্ষ তাতার ফৌজের বড়ো বড়ো সিন্দুক পরিপূর্ণ হল! কিন্তু যে রত্নের লোভে আল্লাউদ্দিন আজ অমরাবতীর সমান চিতোর নগর শ্মশান করে দিলেন, যার জন্যে দিল্লীর সিংহাসন ছেড়ে বিদেশে এলেন, সেই পদ্মিনীর সন্ধান পেলেন কি?

বাদশা চিতোরে এসে প্রথমেই শুনলেন—পদ্মিনী আর নেই—চিতার আগুনে সুন্দর ফুল ছাই হয়েছে!

সেইদিন রাত্রে বাদশার হুকুমে চিতোরের ঘর-দ্বার, মন্দির-মঠ—ছাইভস্ম চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল—কেবল প্রকাণ্ড সরোবরের মাঝখানে রানী পদ্মিনীর রাজমন্দির তেমনই নতুন, তেমনই অটুট রইল। আলাউদ্দিন সেই রাজমন্দিরে পদ্মসরোবরের ধারে শ্বেতপাথরের বারান্দায় ঘেরা পদ্মিনীর শয়নমন্দিরে তিনদিন বিশ্রাম করলেন। তারপর মালদেব নামে একজন রাজপুতের হাতে চিতোরের শাসনভার দিয়ে, ধীরে ধীরে দিল্লীর মুখে চলে গেলেন। পাঠান বাদশার প্রবল প্রতাপ হিন্দুস্তানের একদিক থেকে আর একদিকে বিস্তৃত হল; আর সেই বারো হাজার সতীলক্ষ্মীর পবিত্র নাম বারো হাজার রাজপুত বীরের কীর্তি, চিরদিনের জন্যে, জগত-সংসারে ধন্য হয়ে রইল। আজও চিতোরে মহাসতীর শ্মশানে পদ্মিনীর সেই চিতাকুণ্ড দেখা যায়; তার ভিতর মানুষে প্রবেশ করতে পারে না—একটি অজগর সাপ দিবারাত্রি সেই গহ্বরের মুখে পাহারা দিচ্ছে।



হাম্বির

চিতোর তখনও পাঠানের হস্তগত হয়নি। মেবারে তখনও ভীমরানার অটুট প্রতাপ। মহারানা লক্ষ্মণসিংহের সুশাসনে দেশ যখন শান্তিতে সুখে ধনে ধান্যে পরিপূর্ণ, সেই সময় একদিন যুবরাজ অরিসিংহ দলবল নিয়ে শিকারে গিয়েছিলেন। অন্ধোয়া বনের ধারে উজলা গ্রামে মেঠো রাস্তায় শিকারীর দল রাজকুমারের সঙ্গে সঙ্গে শিকারের পিছনে ছুটে চলছিল—শিকার একটা ছুঁচালো-মুখ দাঁতাল বরাহ। বেলা দুপুরে মেঠো রাস্তায় অনেকখানি ধুলো উড়িয়ে অনেকদূর ছুটে গিয়ে রাজকুমারের শিকার রাস্তার একধারে জনার খেতের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ল—সেখানে ঘোড়া চলে না, তীর তো ছোটেই না।

খেতের মাঝে মাচার উপরে দাঁড়িয়ে এক রাজপুতের মেয়ে এই তামাশা দেখছিল—পরনে তার পীলা ওড়নি, নীল আঙ্গিয়া। রাজকুমারের গায়ে ছিল সবুজ দোপাট্টা! দু'জনের চোখ দু'জনের উপর পড়েছিল। শিকারের আশায় হতাশ হয়ে অরিসিংহ যখন বুনাস নদীর তীরে আমবাগানে ফিরে চলেছিলেন, খেতের ভিতর থেকে রাজপুতের মেয়ে সেই সময় বরাহটা মেরে শিকারীদের ভেট দিয়ে গেল।

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করলেন, 'ক্যায়সে মারা?'

বালিকা বল্লমের মতো সিধে একটা জনারের শিষ দেখিয়ে বললে—'ইসিসে ঘায়েল কিয়া।' তার ধুলোমাখা কালো চুলগুলি সাপের ফণার মতো সুন্দর মুখের চারিদিকে বড়ো শোভা ধরেছিল। তার সুডৌল হাতে পিতলের কাঁকন সূর্যের আলোয় সোনার মতো কেমন ঝকঝক করছিল। বুনাস নদীর তীরে আমবাগানের শীতল ছায়ায় সেই কথাই ভাবতে ভাবতে রাজকুমারের তন্দ্রা আসছিল।

সবুজ খেতের মাঝে মাটির ঢেলা ফেলে পাখি আর ছাগল তাড়াতে তাড়াতে মেয়েটিও রাজকুমারের কথা ভাবছিল কিনা কে জানে; কিন্তু এক সময় তার হাত থেকে ঠিকরে একটা মাটির ঢেলা সেই আমবাগানের ধারে ঘোড়ার পায়ে এসে লাগল। হঠাৎ ঘোড়ার তড়বড় শব্দে চমকে উঠে রাজকুমার চেয়ে দেখলেন আমবাগানের ফাঁকে একটুখানি সবুজ খেত—তারই মাঝে সেই নীল আঙ্গিয়া, পীলা ওড়নি কৃষকনন্দিনী!

পশ্চিম বাতাসে অড়হরের খেতে ঢেউ উঠেছে, একদল টিয়া পাখি ঝাঁক বেঁধে উড়ে চলেছে, বেলাশেষে দিনের আলো নিবুনিবু, পাথরের মতো পরিষ্কার আকাশ, তার কোলে কালো মেঘের সরু রেখা—রাজকুমার শিকার শেষে বাড়ি চলেছেন। নদীর ধারে যেখানে গ্রামের পথ আর মাঠের রাস্তা এক হয়েছে সেইখানে দু'জনে

আবার দেখা হল—বালিকা মাথায় দুধের কলসী নিয়ে মাঠ ভেঙে গ্রামে চলেছে—সঙ্গে দু'টি চিকন কালো ছানা ভৈঁষ।

পরদিন উজলা গ্রামের সেই বালিকার ঘরে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে রাজকুমারের দূত এল! বালিকার পিতা চন্দাসো বংশের চৌহান রাজপুত কিছুতেই গেহলোট বংশে কন্যাদানে সম্মত নয়—রাজকুমার হতাশ হয়ে রাজ্যে ফিরলেন। এদিকে সেই বৃদ্ধ রাজপুতের ঘরে গৃহিণীর কাছে পাড়াপড়শির দুয়ারে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সীমা পরিসীমা রইল না। এমন কাজও করে? হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে আছে? যেমন বুদ্ধি, তেমনই চিরটা কাল চাষা হয়েই থাক।

বুড়ো কিন্তু সকলের কথায় একই জবাব দিত, 'তোমরা যাই বল, আমি কিন্তু লছমীকে কখনই রাজবাড়িতে পাঁচ সতীনের দাসী করে দিতে পারিনে; তার চেয়ে আমার মেয়ে গরিবের ঘরে গিন্নি হয়ে থাকে সে ভালো।'

কিন্তু বুড়োর প্রতিজ্ঞা বেশিদিন রইল না। চিতোর থেকে দূত এল, পদ্মিনী রানী লিখেছেন: 'আমি নিঃসন্তান, তোমার কন্যাকে ভিক্ষা চাই; আমার আশীর্বাদে চিতোরের রাজলক্ষ্মী তোমার বংশকে বরণ করুন।'

সতীর কথা ব্যর্থ হয় না। লছমীর সন্তান যে চিতোরের সিংহাসনে বসবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ রইল না। ধুমে ধামে আলো জ্বালিয়ে, ঘোড়া সাজিয়ে বর বেশে যুবরাজ এলেন যেন কোন স্বপ্নের রাজ্য থেকে। রাজপুত্র এসে উজলাগ্রামে উদয় হলেন—আনন্দে, আলোয়, নাচে-গানে সমস্ত গ্রাম এক রাতের মতো উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সুখের বাসর আনন্দের মধ্যে কখন কাটলো বোঝা গেল না।

এক বৎসর পরে যুবরাজ লছমীরানীকে আর এক মাসের শিশু রাজপুত্র হাম্বিরকে উজলাগ্রামে রেখে পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধে গেলেন। সে যুদ্ধে যে গেল তাকে আর ফিরতে হল না। রানা গেলেন, রাজপুত্রেরা গেলেন, ভীমসিংহ গেলেন, রানী পদ্মিনী, রাজবধূ, রাজমাতা, সকলে গেলেন। চিতোর-লক্ষ্মী অন্তর্ধান করলেন। রইলেন কেবল উজলাগ্রামে হাম্বিরকে নিয়ে রানী লছমী, আর কৈলোরের কেল্লায় মেবারের রানার বংশধর অজয়সিংহ।

একদিকে শোরোনাল বলে একখানি ছোটো গ্রাম, আর একদিকে আরাবল্লী পর্বত, মাঝে একটি ছোটো পাহাড়ের উপর কৈলোরের পুরাতন কেল্লা। এক সময়ে পাহাড়ি ভীলদের শাসনে রাখার জন্যে ওই কেল্লা প্রস্তুত হয়েছিল। তখন চিতোরের মহারানা বছরের মধ্যে প্রায় চার মাস এখানেই কাটাতেন, তখন কেল্লার শ্রী-ই ছিল এক! তারপর পাহাড়ি জাত যখন ক্রমে অধীন হয়ে শত্রুতা ছেড়ে বশ্যতা মানলে তখন আর বড়ো একটা এখানে আসার প্রয়োজন হল না। ক্বচিৎ দুই-একজন রাজকুমার শিকারে এসে রাত্রিবাস করে যেতেন। কেল্লাও ক্রমে ভেঙেচুরে বনজঙ্গল আর কাঁটাগাছে পরিপূর্ণ হয়েছিল।

ঝড়বৃষ্টি বিদ্যুতের মাঝে চিতোরের রানা লক্ষ্মণসিংহের বংশধর রাজ্যহারা অজয়সিংহ স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে একদিন এই কেল্লায় আশ্রয় নিলেন। সে দুঃখের রাত কি দুঃখে কেটেছিল কে বলবে! মাথার উপরে ফাটা ছাদ দিয়ে বৃষ্টির ধারা পড়ছে, ঘরের কোণে ইঁদুরের খুটখাট, বাদুড়ের ঝটাপট—রাজার ছেলে রাজার বউ তারই মাঝে ভিজে ঘরে খড়ের বিছানায় ঘোড়ার কম্বল ঢাকা দিয়ে রাত কাটালেন। সকালে গ্রামবাসীরা রাজা দেখতে এসে দেখলে তাদের রাজার বসবার সিংহাসন, শোবার খাটিয়া নেই; রাজার রানী, রাজার ছেলে, ঘোড়ার কম্বলে বসে আছেন। মেবারের রানা অজয়সিংহ আজ কোথায় সোনার সিংহাসনে রাজছত্র মাথায় দিয়ে বসবেন, রানীমা কোথায় দুই রাজকুমার অজিমসিংহ ও সুজনসিংহকে নিয়ে গজদন্তের পালঙ্কে আরাম করবেন, না তাঁদের একী দুর্দশা! গ্রামবাসীরা তখনই যত্ন করে কেল্লা পরিষ্কার করতে লাগল, ঘর সাজাতে লাগল, গ্রামের জোতদার গজদন্তের খাট-সিংহাসন, কিংখাবের সুজনি, জরির চাঁদোয়া, শ্বেত চামর, চন্দনের পাখা, রূপার প্রদীপ, সোনার বাটা, শ্বেতপাথরের বাসন হাজির করলে। খেত থেকে চাষীর মেয়েরা তরি-তরকারি, ঘিয়ের মটকি, দুধ দেবার গাই, ঘোড়ার ঘাস নিয়ে হাজির হল। দেখতে দেখতে সাজসরঞ্জামে কেল্লার শ্রী ফিরে গেল। সন্ধ্যার সময় গ্রামবাসী তাদের রাজার মুখে, রানীর মুখে, দুই রাজপুত্রের মুখে হাসি দেখে বিদায় হল।

ভক্ত প্রজার প্রাণপণ সেবায় অজয়সিংহ সব দুঃখ ভুললেন, কেবল চিতোর যে এখনও পাঠানের হস্তগত এ দুঃখ তাঁর মন থেকে কিছুতে গেল না। তিনি প্রায়ই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতেন, 'হায়! সূর্য এখনও রাহুগ্রস্ত, কবে এ গ্রহণ শেষ হবে তা কে জানে! সেই সুদিনের প্রতীক্ষা করে আমায় কতকাল থাকতে হবে কে বলতে পারে।'

দিন যেতে লাগল। কিন্তু যে সুদিনের প্রতীক্ষায় অজয়সিংহ রইলেন, সে সুদিন বুঝি বা আর এল না।

পাঠানের হাত থেকে চিতোর উদ্ধার করতে অজয়সিংহ প্রাণ দিতে প্রস্তুত কিন্তু তাঁর লোকবল অর্থবল কোথায়? বড়ো আশা ছিল দুই রাজকুমার অজিমসিংহ, সুজনসিংহ বড়ো হয়ে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করবে—কিন্তু হায়, বিধাতা সে সাধেও বাধ সাধলেন।

সেদিন বর্ষাকাল, মেঘের ঘটা আরাবল্লী পর্বতের শিখরে শিখরে কাজলের মতো ছায়া ফেলেছে। গ্রামের উপর খেতের উপর দিয়ে আলো-আঁধারের খেলা চলছে। দুই রাজকুমার শিকারে বেরিয়েছেন, রাজারানীতে মহলের ভিতর একলা আছে।

সন্ধ্যা হল—রাজকুমারেরা ঘরে ফিরছেন না, রানীমা এক একবার খোলা জানলায় চেয়ে দেখছেন। দেখতে দেখতে পশ্চিম মেঘের তীরে একটুখানি সোনার ঢেউ খেলিয়ে সূর্যদেব অস্ত গেলেন। রাত্রির অন্ধকার মেঘের অন্ধকারে গাঢ়তর হয়ে এল। রানীমা রাজার সঙ্গে কথা বলছেন আর বারে বারে জানালার পানে চেয়ে দেখছেন।

রাজা বললেন, 'তোমায় আজ আনমনা দেখছি যে?'

'কে জানে প্রাণটা কেমন করছে,' বলে রানীমা উঠে গেলেন। দাসী ঘরে এসে প্রদীপ দিয়ে গেল। টুপটাপ করে ক্রমে বড়ো বড়ো ফোঁটায় বৃষ্টি নামল।

রানীমা মলিন মুখে ফিরে এসে বললেন, 'এরা যে দুভায়ে সকাল থেকে শিকারে গেল, এখনও এল না কেন?'

রানা বলে উঠলেন, 'সে কী? এখনও ওরা ফেরেনি? এই ঝড়বৃষ্টিতে দু'জনে কোথায় রইল?' বলতে বলতে কেল্লার উঠানে লোকের কোলাহল শোনা গেল। তখন মেঘ কেটে গিয়ে চন্দ্রোদয় হচ্ছে; রাজারানী দেখলেন জন কয়েক গ্রামবাসী কাকে যেন ধরাধরি করে নিয়ে আসছে। একজন দাসী তাড়াতাড়ি এসে খবর দিয়ে গেল, 'রানীমা, দেখুন গিয়ে বড়ো কুমার অজিম বাহাদুরের কি হয়েছে,' বলতে বলতে লোকজনে ধরাধরি করে রাজকুমারকে নিয়ে উপস্থিত হল। রাজা-রানী শুনলেন পাহাড়ের উপর শিকার করতে গিয়ে মুঞ্জ বলে যে ভীল সর্দার, তার ছেলের সঙ্গে সুজন বাহাদুরের হরিণ নিয়ে ঝগড়া হয়, ক্রমেই লড়াই বাধে। বড়ো কুমার তাকে রক্ষা করতে গিয়ে মাথায় চোট পেয়েছেন। রানা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর সুজনসিংহ কোথায় গেলেন?'

লোকজনেরা মাথা চুলকে বললে, 'আজ্ঞে তিনি ভালো আছেন, আমাদের তিনি পাঠিয়ে দিলেন। নিজে একটা চটিতে বিশ্রাম করছেন, এলেন বলে!'

পথের ধারে চটিতে বিশ্রাম করার মানে পাঁচ ইয়ারে মিলে সিদ্ধি টেনে আড্ডা দেওয়া। রানা বুঝলেন; বুঝেই বললেন, 'বিপদের সময় বিশ্রাম না করলেই নয়!'

লোকজন সকলে বিদায় হল। রাজা-রানী রাজবৈদ্য আর দু-একজন দাসী অচৈতন্য অজিমকে ঘিরে রইলেন। সমস্ত রাত্রে রাজকুমারের চেতনা হল না। রাজবৈদ্য ঘাড় নেড়ে বললেন, 'আঘাত সাংঘাতিক।' ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমার একবার চোখ চাইলেন; একবার 'মা' বলে ডাকলেন; তারপর খাঁচা ছেড়ে পাখি যেমন উড়ে যায় তেমনই রাজকুমারের সেই সোনার দেহ ছেড়ে প্রাণপাখি চলে গেল। তারপর দিনের পর দিন কাটতে লাগল। অজয়সিংহ শোকে-দুঃখে নিরাশায় দিন দিন ম্রিয়মাণ হতে লাগলেন। আর সেই দুর্দান্ত মুঞ্জ ডাকাত দিন দিন প্রবল হয়ে গ্রামবাসীদের উপর প্রজালোকের ঘরে বিষম উৎপাত আরম্ভ করলে। এমন কি দুরন্ত ডাকাত এসে একদিন কৈলোরের কেল্লা পর্যন্ত লুট করে গেল। ডাকাত অজয়সিংহের মুকুট কেড়ে নিয়ে তাঁর মাথায় তলোয়ারের চোট মেরে চলে গেল। বৃদ্ধ অজয়সিংহ, নেশাখোর সুজন বাহাদুর—প্রজালোককে কে রক্ষা করে? একদিকে পাঠানের উৎপাত আর একদিকে মুঞ্জ ডাকাতের নিষ্ঠুর অত্যাচার। ওদিকে আবার চারিদিকে খবর হল—রানা আর বেশিদিন বাঁচেন কিনা সন্দেহ। রাজ্যে হাহাকার পড়ে গেল। সকলেই বলতে লাগল এতদিনে বুঝি সূর্যবংশের গৌরব শেষ হয়। সুজন বাহাদুর যে রাজ্য চালাতে পারেন, এমন তো বোধ হয় না।

রাজ্যের যখন এই দুরবস্থা সেই সময় উজলাগ্রাম থেকে লছমীরানী হাম্বিরকে নিয়ে কৈলোরে উপস্থিত হলেন। রানার আত্মীয়স্বজন দেশের সর্দার সামন্ত যে যেখানে ছিলেন উপস্থিত। রানা সকালে সভা করে বসেছেন, হাম্বির এসে প্রণাম করলেন। রানা আশীর্বাদ করে হাম্বিরকে কাছে বসালেন! হাম্বিরকে দেখে আজ তাঁর দাদা অরিসিংহকে মনে হল। সেই নাক সেই চোখ; দাদার মতো তেমনই সুন্দর বলিষ্ঠ শরীর, গলার স্বর তেমনই মধুর গম্ভীর। আজ অজয়সিংহের মনে পড়ল তাঁর দাদা অরিসিংহ পাঠানের সঙ্গে শেষ যুদ্ধে যাবার আগে তাঁর হাতে একখানি চামড়ার থলি আর একখানি চিঠি দিয়ে বলেছিলেন, 'এই চিঠিতে আমার শেষ ইচ্ছা রইল। আর এই থলিতে একখানি ছোরা রইল, হাম্বির বড়ো হলে এ দু'টি তাকে দিও।'

রানা অজয় আজ তাঁর সমস্ত সামন্ত সর্দারের সম্মুখে অরিসিংহের নিজের হাতের ছোরা আর মোহর করা সেই চিঠি হাম্বিরের হাতে দিয়ে বললেন, 'বৎস, পড়ে দেখো, তোমার পিতার শেষ ইচ্ছা কি।' পত্রে লেখা ছিল—

শ্রীরাম জয়তি

শ্রীগণেশ প্রসাদ শ্রীকলিঙ্গ প্রসাদ

মহারাজ অধিরাজ শ্রীঅরিসিংহ আদেশতু ঃ—

অতঃপর অজয়সিংহজি ও মেবারের দশ সহস্র অধিকারের সামন্ত সর্দার ও জনপদবর্গকে আমার আদেশ এই যে—ভবানী মাতার ইচ্ছায় পাঠানযুদ্ধ-সঙ্কট সমরে যদি আমার স্বর্গলাভ ঘটে, তবে দেশাচার মতো ভাইজি অজয়সিংহ একলিঙ্গজির দেওয়ানি গ্রহণ করিয়া যথাবিহিত প্রজাপালন ও রাজ্যচালনা করিতে থাকিবেন ও আমার বিধবা পত্নী রানী লছমীও শিশুপুত্র হাম্বিরকে লইয়া যাহাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে উজলাগ্রামে বাস করিতে পারেন সেজন্য উজলাগ্রাম ও তাহার সংলগ্ন সমুদয় জমিজমা রানীর নিজ নামে বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। আমি নিজ বুদ্ধি ও বিশ্বাস মতো দেওয়ানির বন্দোবস্ত করিয়া গেলাম, কিন্তু ইতঃপর সিংহাসন লইয়া হাম্বির ও ভাইজির সন্তানগণের মধ্যে বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা, সে নিমিত্ত শেষ অনুরোধ এই যে, আমাদের সামন্ত-সর্দার-মন্ত্রীবর্গ এবং প্রজালোক যাহাকে উপযুক্ত বিবেচনায় দেওয়ানিতে বহাল করিবেন তিনিই রাজ্যাধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইবেন। হাম্বির ও অন্যান্য কুমারের প্রতি আমার এই আদেশ যে তাঁহারা এই উত্তরাধিকার-সূত্র লইয়া বিবাদ না করেন। দেশের সঙ্কট অবস্থা—এ সময়ে গৃহবিবাদ বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের মধ্যে যে কুসন্তান এই গৃহবিবাদে লিপ্ত হইবে, ভগবান একলিঙ্গের অভিশাপ যেন তাহাকে স্পর্শ করে। ইতি সম্বৎ ১৩৩৩ চিতৈরগড়।

পত্র পাঠ শেষ হলে রানা সকলের দিকে চেয়ে বললেন, 'এখন কী করা কর্তব্য? রাজ্যের সমস্ত সামন্ত সর্দারই উপস্থিত আছেন; আমার ইচ্ছা, এই সভাতেই সিংহাসন সুজন বাহাদুরের কি হাম্বিরের এ বিষয়ে একটা মীমাংসা হোক। আমি বুঝেছি, আমি আর অধিক দিন নয়; অতএব আমি বেঁচে থাকতেই উপযুক্ত কোনও এক কুমারের হাতে দেওয়ানির ভার দিতে চাই। এখন দুই কুমারের মধ্যে কে উপযুক্ত তোমরা সকলে স্থির করো।'

রাজসভায় তুমুল তর্ক উঠল। সেই সময়ে পেট-মোটা, নেশায় ঢুলু ঢুলু রক্তচক্ষু সুজনসিংহ সভায় প্রবেশ করলেন। সভায় দুই দল হল। একদল বললেন, সুজন বাহাদুরেরই সিংহাসন পাওয়া উচিত, কেন না রাজ্য চালাতে বাহুবলের প্রয়োজন, এবং বাহুবলটা যে সুজন বাহাদুরের যথেষ্ট আছে সেটা সকলেই জানে। অন্য দল বলে উঠল, শুধু কি বাহুবলের কর্ম। রাজ্য চালাতে হলে ধৈর্য চাই, বুদ্ধি চাই, সুজন বাহাদুরের এ দু'টোর একটাও নেই। সৈন্যই রাজার বল, রাজাকে যদি নিজেই লড়াই করতে হল তবে আমরা আছি কি করতে? আমরা তো বলি হাম্বিরকেই রাজা করা উচিত। অন্য দল বলে উঠল, বাপু হে, যে দিনকাল পড়েছে, তাতে মুকুট মাথায় দিয়ে সিংহাসনে বসে থাকলে আর চলছে না; এখন রীতিমতো লড়াই করতে হবে। আমরা এমন রাজা চাই, যে একাই একশো পাঠান ঠেকাতে পারে। দুই দলে প্রচণ্ড তর্ক, শেষে হাতাহাতি হবার যোগাড়!

অজয়সিংহ বললেন, 'তোমরা স্থির হও, আমি যা বলি শোনো। তোমরা তো জানো ভীল সর্দার মুঞ্জ সেদিন কেল্লা লুট করে গেছে, আমাদের সাধ্য হয়নি যে তাদের বাধা দিই! সেই রাত্রে ডাকাত এই কেল্লা থেকে চিতোরের রাজমুকুট নিয়ে পলায়ন করেছে! শুধু তাই নয়, আমি সংবাদ পেয়েছি সে নাকি আবার সেই রাজমুকুট মাথায় দিয়ে নিজেকে রাজস্থানের রাজা বলে প্রচার করেছে। সূর্যবংশের এই ঘোর অপমানের একমাত্র প্রতিকার, সেই রাজমুকুট উদ্ধার করা। হাম্বির আর সুজন দু'জনেই এখন উপযুক্ত। দুইজনের মধ্যে যিনি সেই পাপাত্মার মুণ্ড সমেত মুকুট উদ্ধার করতে পারেন তিনিই রাজ্যের অধিকারী হউন। কৃতঘ্ন ভীল যে মাথায় মেবারের রাজমুকুট ধারণ করতে সাহসী হয়েছে, সে মাথা শীঘ্র আমি চাই, নচেৎ আমার জীবনে মরণেও শান্তি নেই। মেবারের দুই উপযুক্ত রাজকুমার বর্তমান থাকতে যদি সে মুকুট উদ্ধার না হয়, তবে জানলেম মেবারের সূর্যবংশ আজ নির্বংশ হয়েছে; রাজ্যে বীর নেই, রাজসিংহাসন ভীল আর পাঠানের পাওয়াই শ্রেয়। কেল্লার যত সৈন্য যত অস্ত্র আছে দুই কুমার ইচ্ছা মতো ব্যবহার করুন। আজ সভা ভঙ্গ করো।' কোলাহলে রাজসভা ভঙ্গ হল।

তার পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজের বন্ধুবান্ধব সৈন্যসামন্ত নিয়ে সুজন বাহাদুর ডাকাত ধরতে চললেন! আজ তিনি ভারি ব্যস্ত। অন্যদিন বেলা এগারোটার পূর্বে সুজন বাহাদুরের ঘুম ভাঙত না, আজ তিনি ভোর না হতেই প্রস্তুত। এত ব্যস্ত যে হাম্বিরকে সঙ্গে ডেকে নিয়ে যান তারও সময় হল না। কেল্লার জনপ্রাণী

না উঠতে উঠতে বড়োকুমার সুজনসিংহ দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। দু'একজন সামন্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'কই, ছোটো রাজকুমার গেলেন না?'

সুজনসিংহ হেসে বললেন, 'তিনি একটু আরাম করছেন। চল আমরা আগে যাই, তিনি আহারাদি করে পরে আসবেন এখন।'

অমনি একজন খোশামুদে রাজপারিষদ বলে উঠল, 'চলুন আমরা আগে তো গিয়ে ডাকাতের বাসা ঘেরাও করি, পরে না হয় ছোটোকুমার এসে তার মুণ্ডটা কেটে নিয়ে যাবেন।' অন্যজন বা বললে, 'হুঁ, রানার বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে। একী যার তার কর্ম? বুকের পাটা চাই। ডাকাত বলে ডাকাত—মুঞ্জ ডাকাত! নামে যার দেশসুদ্ধ থরহরি কম্প, তাকে ধরতে কিনা ছোটোকুমার! হাতি মারতে পতঙ্গ!' ওর মধ্যে কোনও এক মন্ত্রিপুত্র বলে উঠল, 'না হে না, রাজবুদ্ধির মধ্যে প্রবেশ করা কি তোমাদের কর্ম। কণ্টক দিয়ে কণ্টক উদ্ধার, বুঝলে কিনা।'

সুজনসিংহ হে[illegible] হে না, তোমরা জানো না, হাম্বিরের গায়ে বেশ শক্তি আছে। তবে কি জানো, ছেলেমানুষ, এখনও হাড় পাকেনি। আমি এবার লড়াই থেকে এসেই তাকে রীতিমতো কুস্তি শেখবার বন্দোবস্ত করছি, দেখো না।'

এদিকে সকালে উঠে হাম্বির একখানা পুরোনো তলোয়ার আর একখানা ছোরা শান পাথরে ঘষে ঘষে সাফ করছিলেন। ছোরাখানা পিতা অরিসিংহের, আর তলোয়ারখানা উজলাগ্রামের দাদামশায় হাম্বিরকে দিয়ে গিয়েছিলেন। আজ কতকাল পরে শান্ পেয়ে অস্তর দু'খানা বর্ষার জল পেয়ে নদীর স্রোতের মতো ক্রমে খরধার হয়ে উঠল। হাম্বির বসে বসে অস্তরে শান দিচ্ছেন, এমন সময় লছমীরানী সেখানে এসে বললেন, 'এখানে বসে কি করছিস?'

হাম্বিরা বললেন, 'জানো না মা? ডাকাত ধরতে যেতে হবে, তাই অস্তর দু'খানায় শান দিচ্ছি।'

লছমীরানী বললেন, 'হা কপাল! তুমি এখনও অস্তর শান দিচ্ছ, আর ওদিকে যে সুজনসিংহ সৈন্যসামন্ত নিয়ে ডাকাত ধরতে গেল। তোর চেয়ে তো সে কাজের লোক দেখি, লোক কেবল তার মিছে দুর্নাম রটায় বুঝলাম।'

হাম্বির যেন মায়ের কথায় একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'তাই তো মা, দাদা তো আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন না। রাজত্বিটা দেখছি আমার কপালে নেই। যাই হোক, আমি ছাড়চিনে।'

এই কথা বলে হাম্বির দ্বিগুণ উৎসাহে তলোয়ার শান দিতে লাগলেন। রানীমা বললেন, ' যা যা, বেলা হল—এখন কিছু খেয়ে আয়, আমি ততক্ষণ এ দু'খানায় শান দিচ্ছি!' হাম্বির উঠে গেলেন, লছমীরানী বসে বসে অস্তরে শান দিতে লাগলেন। রাজপুতের মেয়ে বাটনা বাটা কুটনো কোটার চেয়ে অস্তরে শান ভালো বোঝেন। তাঁর হাতে পড়ে অস্তর দ'খানা কিছুক্ষণের মধ্যেই চকচকে ঝকঝকে হয়ে উঠল। হাম্বির ফিরে এলে রানীমা তার হাতে ছোরাখানা দিয়ে বললেন, 'দেখ দেখি এটায় যেন ফাট ধরেছে বোধ হয়। আঁকা বাঁকা যেন কিসের দাগ দেখছি! এখানায় তো কোনও কাজই হবে না।'

হাম্বির বললেন, 'বলো কি মা, বাবার হাতের ছোরা কাজে লাগবে না কি? দাও দেখি একবার ভালো করে দেখি।' হাম্বির ছোরাখানা নিয়ে এদিক-ওদিক ফিরিয়ে দেখলেন, কিছু বোঝা গেল না। মনে হল যেন ছোরার ফলকটার একদিক থেকে আর একদিক জুড়ে একটা আঁকা বাঁকা ফাট। ফাট কি রক্তের দাগ চেনা যায় না!

হাম্বির বললেন, 'তাই তো, এটা তো কিছু বোঝা গেল না; ভালো করে দেখতে হবে! মা তুমি অস্তর দু'খানা আমার ঘরে রেখে দিয়ো। আমি একবার মহারাজার সঙ্গে দেখা করে আসি, একটা ভালো ঘোড়া দেখে নিতে হবে।'

অজয়সিংহ আজ সভায় যাননি। শরীর অসুস্থ, নিজের মহলে বিশ্রাম করছিলেন, হাম্বিরকে আসতে দেখে বললেন, 'সে কি, তুমি যাওনি? সুজন তো অনেকক্ষণ রওনা হয়েছে।'

হাম্বির বললেন, 'আজ্ঞে, একটি ঘোড়া বেছে নিতে কিছু বিলম্ব হবে, আমি আজ সন্ধ্যাকালেই রওনা হব।'

অজয়সিংহ বললেন, 'লোকজন তো সব বড়ো কুমারের সঙ্গে চলে গেছে, তুমি একা পথ চিনবে কেমন করে?'

হাম্বির বললেন, 'আজ্ঞে, একজন শিকারীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছি, সে-ই আমাকে ডাকাতের আড্ডা দেখিয়ে

দেবে। আমি মনে করেছিলুম, লোকজন নিয়েই যাব, কিন্তু পরে ভেবে দেখলুম, মুঞ্জ ভীল যে রকম দুর্দান্ত, তার সঙ্গে লোকজন নিয়ে পেরে ওঠা অসম্ভব। কৌশলে কার্য সিদ্ধ করা চাই।'

অজয়সিংহ বললেন, 'যা ভালো বোঝ তাই করো। আশীর্বাদ করি জয়ী হও।' হাম্বির প্রণাম করে বিদায় হলেন।

হাম্বির নিজের ঘরে বিশ্রাম করছিলেন, লছমীরানী এসে বললেন, 'কই তোর যাবার কি হল? তোর তো লড়ায়ে যাবার কোনও চেষ্টাই নেই দেখছি। ভয় পেলি নাকি? এই যে বললি, ঘোড়া ঠিক করতে যাচ্ছি, আর ঘরে এসে ঘুম দিচ্ছিস!'

হাম্বির একটুখানি হেসে বললেন, 'রোসো মা, ডাকাত ধরতে যাওয়া কি সহজ ব্যপার? একটু ভেবে নিতে দাও, ফন্দি আঁটতে দাও! একি বুনো শুয়োর, যে যাব আর জনারের শিষে গেঁথে আনব।'

লছমীরানী বুঝলেন, হাম্বির মুখে তামাশা করছেন, কিন্তু মনে মনে যেন কি একটা মতলব স্থির করে বসে আছেন। তিনি হাম্বিরের দিকে চেয়ে বললেন, 'বটে, আমার সঙ্গে তামাশা হচ্ছে? একটা জনারের শিষ দিয়ে বুনো শুয়োর গেঁথে আন, তবে বাহাদুর বুঝি। দেখা যাবে তোমার ঐ পুরোনো তলোয়ার আর দাগী ছোরায় কতদূর কি করো! এখন বল দেখি তোর মতলব কি?' তারপর মায়েতে ছেলেতে সেই নির্জন ঘরে সারাদিন কত কি পরামর্শ হল। সন্ধ্যা হয় হয়, রানী লছমী বললেন, 'তুই তবে প্রস্তুত হ—আর বিলম্ব করলে রাত্রি হয়ে পড়বে।'

হাম্বির বললেন, 'আর প্রস্তুত কি, এই যেমন আছি, তেমনই যাব। দেখো তো মা আমার ঘোড়াটা এল কিনা।'

রানী উঠে গেলেন। হাম্বিরের ঘোড়া প্রস্তুত হয়ে এল। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'দেখা যাক মা, পুরোনো তলোয়ার, দাগী ছোরা আর এই বেতো ঘোড়াটা নিয়ে কতদূর কি করতে পারি।'

মা আশীর্বাদ করলেন, 'জয়ী হও।'

হাম্বির সেকেল তলোয়ার কোমরে গুঁজে সামান্য বেশে সেই বেতো ঘোড়ায় চড়ে বসলেন, সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে এল। সূর্য অস্ত গেলেন। হাম্বিরকে নিয়ে সেই বেতো ঘোড়া খটর খটর করে গ্রাম ছাড়িয়ে বনের পথে প্রবেশ করলে।

আরবল্লী পর্বতের নিবিড় বনচ্ছায়ায় ঘোর অন্ধকার। দু'হাত তফাতে লোক চেনা যায় না। হাম্বির তাঁর বেতো ঘোড়াটাকে একদিকে ছেড়ে কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে সেই বনের অন্ধকারে লুকিয়ে পড়লেন। ছায়ার সঙ্গে যেন একটা ছায়া মিলিয়ে গেল। যেমন শিকারের সন্ধানে বাঘ ফেরে, তেমনই সেই অন্ধকার বনে হাম্বির নিঃশব্দে অতি সন্তর্পণে গিরি-নদীর পারে পারে, ঘনবনের ধারে ধারে, পাহাড়ের গহ্বরে গহ্বরে ডাকাতের সন্ধান করে চললেন। তৃষ্ণার সময় নদীর জল, ক্ষুধার সময় গাছের ফল, ঘুমের সময় পর্বতের গহ্বর, এমনি করে হাম্বিরের দিন কেটে চলল। যে সব মহাবনে মানুষের চলাচল নেই—দিবারাত্রি যেখানে কেবল সবুজ অন্ধকার আর বাঘ-ভালুকের গর্জনে পরিপূর্ণ, দিনের পর দিন হাম্বির সেই মহাবনের ভিতর ঘুরে বেড়াতে লাগলেন; বনের আর অন্ত নেই।

একদিন ঘোর অমাবস্যার রাত্রি—বনের ভিতর দিয়ে পথ দেখে চলা অসম্ভব, হাম্বির একটা প্রকাণ্ড শালগাছে চড়ে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখছেন আর মনে মনে ভাবছেন, দূর কর ছাই, ডাকাতের সন্ধান কি পাওয়া যাবে না? আজ তো এই অন্ধকারে আর পথ চলা অসম্ভব। আজ রাত্রি দেখছি এই গাছেই কাটাতে হল। উঃ, বনের তলায় মশাগুলো ভনভন করে ডাকছে দেখো। আবার ওই যে বাঘের গর্জন ঘন ঘন শোনা যাচ্ছে। এত মশার ভনভনানি আর বাঘের গর্জন কোনওদিন তো শুনিনি। যাই হোক আজ রাত্রিতে আর মাটিতে পা দেওয়া নয়। এ বনটায় তত গাছপালা নেই কিন্তু জীবজন্তু দেখছি অনেক আছে। হাম্বির নিজেকে বেশ করে গাছের সঙ্গে বেঁধে নিদ্রা গেলেন।

অনেক রাত্রে হাম্বিরের ঘুম ভাঙল। হাম্বির দেখলেন আকাশের একদিকে রাঙা আলো দেখা দিয়েছে। সকাল হয়েছে ভেবে হাম্বির উঠে বসলেন, কিন্তু সকাল হল তো পাখি ডাকে না কেন? তবে ভ্রম হল নাকি? হাম্বির বেশ করে চারিদিকে দেখতে লাগলেন। সেই সময় যেন দু'জন মানুষ সেই শালগাছের তলায় কথা কইছে শোনা গেল! লোক দু'টোর কথা বোঝা গেল না কিন্তু দু'একবার মুঞ্জ ডাকাতের আর সুজন বাহাদুরের নাম বেশ স্পষ্ট শুনতে পেলেন।

হাম্বির আস্তে আস্তে গাছের ডাল বেয়ে খানিকটা নেমে এসে কান পেতে শুনতে লাগলেন, দুই পাহাড়িতে কথা হচ্ছে, 'ওরে ভাই বদরী, তুই এখনও মুঞ্জ মুঞ্জ বলিস, তাই তো সে চটে যায়।'

'মুঞ্জকে মুঞ্জ বলব না তো কি? সে কি জানে না যে আমি তার চাচা হলেম?'

'ওরে ভাই, সে কি এখনও চাচা-ফাচা মানে? যেদিন থেকে সে সেই রাজপুতগুলোকে আর রানার ছেলেকে লড়ায়ে হারিয়ে দিয়েছে, সেইদিন থেকে তার মাথা বিগড়ে গেছে। সে এখন চায় আমরা তাকে রানা আর তার ছেলেকে কুমার বলি।'

'রেখে দে তোর রানা, রেখে দে তোর কুমার। আমি তাদের চিরকাল বলব মুঞ্জ আর ভুঞ্জ।'

'তবে ভাই রঞ্জু, আজ তুই লাচ দেখতে চলেছিস কেন! সর্দার আজ মেয়ের বিয়েতে মৌয়া খেয়ে নেশা করেছে—তোকে দেখলেই মাথা কাটতে আসবে।'

'ওরে একি বলিদানের মোষ পেয়েছিস যে টুক করে হাড়িকাঠে মাথা দেব? চল এখন নাতনির বিয়েতে একটু আমোদ করা যাক; বাজে কথায় কেবল রাত কাটালি।'

লোক দু'টো হন হন করে উত্তর-মুখো চলল। হাম্বির এতক্ষণে বুঝলেন, তিনি ডাকাতের আড্ডায় এসে পড়েছেন। দূর থেকে মাদল আর ঝাঁঝরের হুমহুম ঝুমঝুম আওয়াজ অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। মশালের আলো আকাশের একদিক রাঙা করে তুলেছে। হাম্বির তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে সেই লোক দুটোর সঙ্গ নিলেন।

কতদিন কেটে গেছে, সুজন বাহাদুর ডাকাত ধরতে না পেরে কৈলোরের কেল্লায় ফিরে এসেছেন। হাম্বিরের কিন্তু কোনও খবর নেই। সকলেই বলছে, নিশ্চয় তিনি ডাকাতের হাতে কাটা পড়েছেন। এমন সময় একদিন মহারানার সভায় হাম্বিরের এক পত্র এল। হাম্বির উজলাগ্রাম থেকে লিখেছেন—তিনি উজলাগ্রামে মুঞ্জ বাহাদুরকে মেবারের রানা করে রাজসিংহাসন দিয়েছেন। নতুন রানা হাম্বিরকে কৈলোরের কেল্লা আর একশোখানা গ্রাম জায়গীর দিয়েছেন। অজয়সিংহ যদি সহজে কেল্লা ছেড়ে দেন তো ভালো, নচেৎ লড়াই নিশ্চয়! এবং মুঞ্জ বাহাদুর সশরীরে সগণে এসে কেল্লা দখল করবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি।

শুনে সুজনসিংহ বলে উঠলেন, 'দেখলে, ছোকরার কাণ্ডটা দেখলে একবার। সে কি মনে করেছে, দু'মুঠো ডাকাতের দল নিয়ে মেবারের সিংহাসন দখল করবে? এত বড়ো তার স্পর্ধা।'

অজয়সিংহ বললেন, 'হাম্বির কি এতদূর নীচ হবে? এ তো আমার বিশ্বাস হয় না। চিঠিটা কেমন কেমন শোনাচ্ছে না?'

রাজমন্ত্রী বললেন, 'কথাটা যদিও বিশ্বাসযোগ্য নয়, কিন্তু বলাও যায় না। আমার মনে হয় প্রস্তুত হয়ে থাকাই ভালো। আজকালের ছেলে কখন কি করে বসে বলা যায় না।'

সুজনসিংহ বললেন, 'তবে একবার মেবারের সমস্ত সামন্ত সর্দারকে খবর পাঠানো হোক।'

অজয়সিংহ বললেন, 'তাতে কাজ নেই। এ কি পাঠান বাদশা আসছে, যে সামন্ত সর্দারকে খবর পাঠাতে হবে? লোকে যে হাসবে! সকলকে সাবধানে থাকতে বলো। হঠাৎ কেল্লায় ডাকাতি না হয়। হাম্বিরকে লিখে দাও যেন এমন দুঃসাহসের কাজ না করে। আর একদল সৈন্য নিয়ে তুমি উজলাগ্রাম থেকে ডাকাতের দল তাড়িয়ে দাও গে; আর পার তো হাম্বিরকে বেঁধে আনো।'

সুজনসিংহ 'যে আজ্ঞে' বলে উঠে গেলেন। কিন্তু তিনি মুঞ্জ ডাকাতের হাতে একবার পড়েছিলেন। সে যে কেমন সহজ ডাকাত, বেশ চিনেছেন। ঘরে গিয়ে রাজবৈদ্যকে দিয়ে মহারানাকে বলে পাঠালেন, শরীর তাঁর বড়ো অসুস্থ; কিছুদিন বিশ্রাম করতে পারলে ভালো হয়। ডাকাত ধরতে সেনাপতিকে পাঠালে চলে না?

অজয়সিংহ বললেন, 'আচ্ছা তাই হবে!'

সেদিন রাত্রে অজয়সিংহ লছমীরানীর সঙ্গে দেখা করে হাম্বিরের পত্র দেখালেন। রানীমার অন্দরমহলে সেনাপতির তলব হল। তারপর হাম্বিরের নামে চিঠি নিয়ে সেনাপতি বিদায় হলেন। তাঁর উপর হুকুম রইল—হাম্বিরের পরামর্শ মতো খুব সাবধানে কাজ করবে।

এদিকে উজলাগ্রামে শেয়ালরাজার মতো মুঞ্জ বাহাদুর রাজসিংহাসন আলো করে বিরাজ করছেন। ডাইনে বামে গম্ভীরমল আর চুয়োমল দুই নতুন মন্ত্রী কানে কলম গুঁজে বসে আছেন। আর রাজসভায় আছেন হাম্বির আর উজলাগ্রামের দু-এক পেট মোটা জোতদার আর দু-চার কালো মুস্কো পাহাড়ি ভীল।

একজন গরীব প্রজা খাজনা দিতে পারেনি, রাজার লোক তাকে বেঁধে এনেছে। মুঞ্জরাজ হুকুম দিলেন, 'ওর

মাথা কাটো।' অমনি হাম্বির কানে কানে বললেন, 'এরকম করলে প্রজালোকে খাপ্পা হবে। ওকে কিছু বকশিশ দিতে হুকুম হোক।' অমনি দুই মোহর ইনাম হয়ে গেল, গরিব প্রজা দুই হাতে সেলাম ঠুকে বিদায় হল। মনে মনে বললে, 'রাজা তো হাম্বির, এটা তো ডাকাতের সর্দার, ওর কি দয়ামায়া আছে?'

এমন সময়ে কৈলোরের কেল্লা থেকে সেনাপতি এসে মুঞ্জ বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করলেন। কথা স্থির হল মহারানা কৈলোরের কেল্লা হাম্বিরকে দিয়ে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে কাশীবাস করুন, তাঁর খরচপত্র রাজভাণ্ডার থেকে দেওয়া হোক, আর হাম্বির ভীল রাজার মন্ত্রী হয়ে রাজ্যশাসন করুন, সেজন্য তাঁকে সমস্ত খরচ-খরচা ও মাসিক ছ'হাজার তনখা ও চিতোরের কেল্লা জায়গীর দেওয়াই স্থির।

গম্ভীরমল শর্ত আওড়ালেন, চুয়োমল একরারনামা লিখে হুজুরে পেশ করলেন, কিন্তু হুজুর তো পড়তে জানেন কত—কলম হাতে হাম্বিরের দিকে চাইলেন।

হাম্বির বললেন, 'এ সব পাকা দলিলে কলমের সই দেওয়া ভালো নয়। আমি বলি মহারাজ এতে পাঞ্জা মোহর করে দিলেই ভালো হয়।

মুঞ্জবাহাদুর দুই হাতে কালি মেখে দলিলের পিঠে হাতের ছাপ লাগালেন।

সেনাপতি দলিল নিয়ে বিদায় হলেন। মুঞ্জবাহাদুর হাম্বিরের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'এ তো বড়ো মজা। লড়াই নেই, হাঙ্গামা নেই, এক হাতের ছাপেই কাজ সাফ? দিল্লীর বাদশাকে এমনই একটা পাঞ্জা পাঠিয়ে চিতোরের কেল্লাটা দখল নিলে হয় না?'

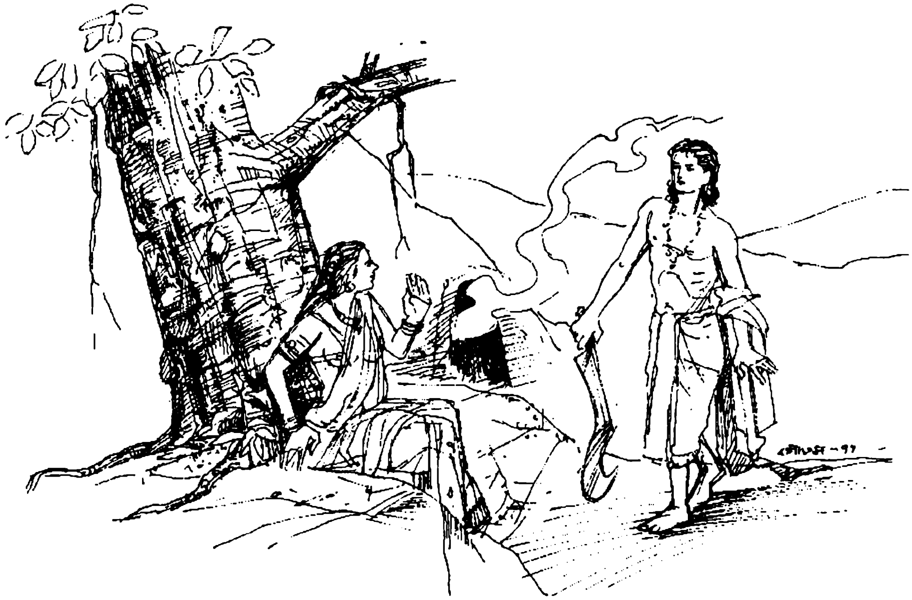
হাম্বির বললেন, 'আগে মেবার দখল করে নেওয়া যাক, তারপর দিল্লী পর্যন্ত ঠেলে যাওয়া যাবে। এখন একটু আমোদ-আহ্লাদের হুকুম হোক। রানার সেনাপতি আমাদের জাঁকজমক দেখে যাক।'

মুঞ্জরাজা বললেন, 'বন্ধু, তুমি যেমন ভালো বোঝো করো, কিন্তু দেখো, মাদলের বাজনা আর মহুয়ার কলসিটা ভুলো না। এ দু'টো না থাকলে আমোদ হবে না।'

হাম্বির ভারে ভারে মহুয়ার কলসি, দলে দলে মাদলের ব্যবস্থা করলেন। উজলাগ্রামে ভীল রাজার রাজপ্রাসাদে আমোদের ফোয়ারা খুলে গেল। সেনাপতি এলেন, গম্ভীরমল এলেন, চুয়োমল এলেন, হাম্বির এলেন, গ্রামের প্রজালোক পাড়া-প্রতিবাসী যে যেখানে ছিল সকলে এল। আর সেই সঙ্গে এল সাদা কাপড়ে ভদ্রলোক সেজে একদল রাজপুত সৈন্য! রাত্রি প্রায় শেষ হয়েছে, গ্রামবাসীরা যে যার ঘরে ফিরেছে; ভীলের দল মহুয়ার কলসি খালি করে যেখানে সেখানে গড়াগড়ি যাচ্ছে, সেই সময় হাম্বির তাঁর বেতো ঘোড়ার পিঠে একটা রক্তমাখা চটের থলি চাপিয়ে উজলাগ্রাম থেকে বিদায় হলেন। সেনাপতির উপর ভীল রাজার রাজপ্রাসাদ জ্বালিয়ে দেবার হুকুম রইল।

হাম্বির যেমন সন্ধ্যাবেলায় বেতো ঘোড়ায় চড়ে কৈলোরের কেল্লা থেকে বেরিয়েছিলেন, ঠিক তেমনই সন্ধ্যাবলো সেই বেতো ঘোড়ায় চড়ে কতদিন পরে রাজমুকুট সমেত মুঞ্জ ডাকাতের মুণ্ড নিয়ে ফিরে এলেন। কেল্লায় জয়জয়কার পড়ে গেল!

মহারানা সেই ভীলের কাঁচা রক্তে হাম্বিরের কপালে রাজটীকা লিখে দিয়ে বললেন, 'রাজপুতের নিয়ম সিংহাসনে বসবার আগে টীকাজের ব্রত সাঙ্গ করতে হয়। আজ এই শত্রুর রক্তে তোমার এই ব্রত উদযাপন হল। আজ থেকে সিংহাসন তোমার, রাজমুকুট তোমার। কিন্তু মনে রেখো, মেবারের মুকুট উদ্ধার হল বটে, রাজ্য এখনও পাঠানের হস্তগত।' তারপর মহারানা সুজনসিংহকে ডেকে পাঁচ হাতিয়ার আর এক ঘোড়া দিয়ে বললেন, 'তুমি মেবার ছেড়ে দক্ষিণ দেশে যাও। সেখানে তোমার ক্ষমতা থাকে তো নতুন রাজত্ব করো গিয়ে। মনে ভেব না যে তোমাকে আমি স্নেহ করি না, কিন্তু আমি বেশ বুঝছি, তোমার নির্বাসনে মেবারের মঙ্গল, তোমারও মঙ্গল। আর যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, তবে তোমার সন্তানেরা একদিন দক্ষিণ দেশে অখণ্ড রাজ্য বিস্তার করবে। যাও, মনে রেখো তুমি সূর্যবংশের সন্তান, তোমা হতে যেন সে বংশের কলঙ্ক না হয়। নিজের উপর নির্ভর করো, তবেই বড়ো হতে পারবে।'



হাম্বিরের রাজ্যলাভ

হাম্বির এখন শুধু হাম্বির নয়—ভগবান একলিঙ্গের দেওয়ান মহারানা হাম্বির! নামটা শুনতে যতখানি, হাম্বিরের রাজত্ব কিন্তু ততখানি ছিল না। থাকবার মধ্যে কৈলোরের কেল্লা, আশেপাশে খানকতক গ্রাম আর দুই হাজার মাত্র রাজপুত সেপাই। মেবারের মহারানা এখন ঠিক যেন একজন তালুকদার। এদিকে দিল্লীর বাদশা মহম্মদ খিলজির হয়ে মালদেব তখন চিতোরে বসে সমস্ত মেবার শাসন করছিলেন। চিতোর থেকে প্রায় বিশ ক্রোশ দূরে কৈলোরের কেল্লা। কোনও কোনও দিন আকাশ পরিষ্কার থাকলে কৈলোর থেকে পাহাড়ের উপর চিতোরের কেল্লা ঠিক যেন একখানি জাহাজের মতো আকাশ-সমুদ্রে ভেসে রয়েছে দেখা যেত।

হাম্বির লছমী মায়ের সঙ্গে কেল্লার ছাদে উঠে, লোক যেমন ঠাকুরদর্শন করে তেমনই—চিতোরদর্শন করতেন। সেই সময় সূর্যের আলোয় সকালবেলায় সোনার আকাশপটে রাজপ্রাসাদের পাথরের দেওয়াল, দেবমন্দিরের সোনার চুড়ো নিয়ে পাহাড়ের উপরে চিতোরের কেল্লা ধীরে ধীরে ফুটে উঠত। হাম্বির বলতেন, 'ওই দেখো মা, আমার জাহাজ দেখা দিয়েছে!'

রানীমা বলতেন, 'জাহাজ তো তৈরি আছে। তুই যদি ঘুম দিতে থাকিস তবে জাহাজ বেদখল হয়!'

হাম্বির বলতেন, 'এ জাহাজ মারে কার সাধ্য।'

হাম্বির যে ঘুম দিচ্ছিলেন না একথা লছমীরানী অতি অল্প দিনেই জানতে পারলেন। সেদিন দেওয়ালির পুজো! সন্ধ্যাবেলা হাম্বির এসে মাকে বললেন, 'মা, দেওয়ালির আলো দেখবে তো ছাদে এসো।'

রানীমা হেসে বললেন, 'আচ্ছা তুই এত বড়ো হলি তবু মায়ের সঙ্গে তামাশা করা রোগটা তোর এখনও গেল না? এই মাঠের মধ্যে দেওয়ালির আলো কোথায় পেলি? এ কি তোর চিতোর—যে ঘরে ঘরে লোকে আলো দেবে?'

'দেখবে এসো না মা' বলে হাম্বির লছমীরানীকে নিয়ে কেল্লার ছাদে উঠলেন। কার্তিক মাসের অমাবস্যা—কিন্তু আকাশ ছেয়ে তারা ফুটে ছিল; যেন দেবতারা ফুল ছড়িয়ে গেছেন! রানীমা অবাক হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছেন। হাম্বির হেসে বললেন, 'মা, কি চমৎকার বাহার দেখেছ! কিন্তু এ দেওয়ালি তো দেবতাদের—তোমারও নয় আমারও নয়। এখন একবার কৈলোরের দেওয়ালি—আমার দেওয়ালিরই আলোটা কেমন হয়েছে এদিকে দেখো দেখি।'

রানীমা চেয়ে চেয়ে দেখলেন—কৈলোরের কেল্লার চারিদিকে পাহাড়ে পাহাড়ে আলো জ্বলছে! গ্রামের পথে



হাম্বিরের রাজ্যলাভ

হাম্বির এখন শুধু হাম্বির নয়—ভগবান একলিঙ্গের দেওয়ান মহারানা হাম্বির! নামটা শুনতে যতখানি, হাম্বিরের রাজত্ব কিন্তু ততখানি ছিল না। থাকবার মধ্যে কৈলোরের কেল্লা, আশেপাশে খানকতক গ্রাম আর দুই হাজার মাত্র রাজপুত সেপাই। মেবারের মহারানা এখন ঠিক যেন একজন তালুকদার। এদিকে দিল্লীর বাদশা মহম্মদ খিলজির হয়ে মালদেব তখন চিতোরে বসে সমস্ত মেবার শাসন করছিলেন। চিতোর থেকে প্রায় বিশ ক্রোশ দূরে কৈলোরের কেল্লা। কোনও কোনও দিন আকাশ পরিষ্কার থাকলে কৈলোর থেকে পাহাড়ের উপর চিতোরের কেল্লা ঠিক যেন একখানি জাহাজের মতো আকাশ-সমুদ্রে ভেসে রয়েছে দেখা যেত।

হাম্বির লছমী মায়ের সঙ্গে কেল্লার ছাদে উঠে, লোক যেমন ঠাকুরদর্শন করে তেমনই—চিতোরদর্শন করতেন। সেই সময় সূর্যের আলোয় সকালবেলায় সোনার আকাশপটে রাজপ্রাসাদের পাথরের দেওয়াল, দেবমন্দিরের সোনার চুড়ো নিয়ে পাহাড়ের উপরে চিতোরের কেল্লা ধীরে ধীরে ফুটে উঠত। হাম্বির বলতেন, 'ওই দেখো মা, আমার জাহাজ দেখা দিয়েছে!'

রানীমা বলতেন, 'জাহাজ তো তৈরি আছে। তুই যদি ঘুম দিতে থাকিস তবে জাহাজ বেদখল হয়!'

হাম্বির বলতেন, 'এ জাহাজ মারে কার সাধ্য।'

হাম্বির যে ঘুম দিচ্ছিলেন না একথা লছমীরানী অতি অল্প দিনেই জানতে পারলেন। সেদিন দেওয়ালির পুজো! সন্ধ্যাবেলা হাম্বির এসে মাকে বললেন, 'মা, দেওয়ালির আলো দেখবে তো ছাদে এসো।'

রানীমা হেসে বললেন, 'আচ্ছা তুই এত বড়ো হলি তবু মায়ের সঙ্গে তামাশা করা রোগটা তোর এখনও গেল না? এই মাঠের মধ্যে দেওয়ালির আলো কোথায় পেলি? এ কি তোর চিতোর—যে ঘরে ঘরে লোকে আলো দেবে?'

'দেখবে এসো না মা' বলে হাম্বির লছমীরানীকে নিয়ে কেল্লার ছাদে উঠলেন। কার্তিক মাসের অমাবস্যা—কিন্তু আকাশ ছেয়ে তারা ফুটে ছিল; যেন দেবতারা ফুল ছড়িয়ে গেছেন! রানীমা অবাক হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছেন। হাম্বির হেসে বললেন, 'মা, কি চমৎকার বাহার দেখেছ! কিন্তু এ দেওয়ালি তো দেবতাদের—তোমারও নয় আমারও নয়। এখন একবার কৈলোরের দেওয়ালি—আমার দেওয়ালিরই আলোটা কেমন হয়েছে এদিকে দেখো দেখি।'

রানীমা চেয়ে চেয়ে দেখলেন—কৈলোরের কেল্লার চারিদিকে পাহাড়ে পাহাড়ে আলো জ্বলছে! গ্রামের পথে

মাঠে-ঘাটে দিকে দিকে লক্ষ লক্ষ প্রদীপ, যেন তারার মালা, আলোর জাল! লছমীরানী অবাক হয়ে হাম্বিরের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'এই জনমানবহীন কৈলোরে এত আলো, এত লোক কোথা থেকে এল?'

হাম্বির বললেন, 'ওই যে পাহাড়ের দিকে দেখছ ওই আলো সব ভীলেরা জ্বালিয়েছে। আর যে গ্রামের দিকে দেখছ এসব গ্রামবাসীদের দেওয়া।' রানীমা বললেন, 'এত প্রদীপ, এত তেল, তুই এসব বুঝি চিতোর থেকে আমদানি করলি?'

হাম্বির বললেন, 'শুধু চিতোর থেকে নয়, সমস্ত মেবার থেকে প্রদীপ আর তেল, প্রদীপ গড়বার কুমোর, তেল যোগাবার তেলিও আমদানি করেছি। ওই দেখো, কুমোর পাড়ায় মশাল জ্বলছে; যাত্রা শুরু হল। ওই শোনো তামুলি পাড়ায় ঢোল বাজছে; এখন সঙ বার হবে। ওই যে মহাজন পট্টিতে নহবত বাজল, তোপখানায় বোমা ফাটল। দেখছ মা, হাম্বির তালাও ঘিরে ব্রাহ্মণের মেয়েরা কেমন প্রদীপ দিয়েছেন।'

লছমীরানী বলে উঠলেন, 'কি আশ্চর্য; এ যে নগর বসিয়ে ফেলেছিস দেখি! আমি বলি বুঝি তুই বসে বসে কেবল ঘুম দিস। ভিতরে ভিতরে তোর এত বুদ্ধি!'

হাম্বির বললেন, 'তা যাই হোক মা, এখন আমার এই নগরের একটি ভালো নাম তোমায় বেছে দিতে হবে। লক্ষ্মীপুর কেমন নাম?

রানীমা বললেন, 'আরে না না, ও যে বাঙালি রকম শোনাচ্ছে। আমি একটা ভালো নাম সন্ধান করছি। শুধু নাম নয়, তার সঙ্গে একটি লক্ষ্মী বউ। তুই আর দিন কতক সবুর কর।'

দু'জনে যখন এই কথা হচ্ছে, সেই সময় চিতোর থেকে মালদেবের দূত আর একজন ব্রাহ্মণ হাম্বিরের বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে কৈলোরে উপস্থিত হল। ব্রাহ্মণ এসে মালদেবের চিঠি আর একটি রুপোর পাতে মোড়া নারকেল এনে লছমীরানীর সম্মুখে ধরে দিলেন। রানী চিঠিখানি খুলে পড়তে লাগলেন, লেখা রয়েছে—'আমার কন্যা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। তাকে আপনার চরণে দাসী করে আমার কুলকে পবিত্র করুন। আমি পাঠানের আশ্রয়ে আছি বটে, কিন্তু ধর্ম ছাড়িনি!'

রানী হাম্বিরের দিকে চেয়ে বললেন, 'দেখ দেখি, মালদেব চিতোর থেকে কেমন সুন্দর নারকেলটি পাঠিয়েছেন। এটা আজ দেওয়ালির পুজোর কাজে লাগবে।'

হাম্বির বললেন, 'বেশ ফলটি, কিন্তু মা, এটার উপর প্রথম থেকেই আমার লোভ পড়েছে। এটা আর দেবতাদের দিয়ে কাজ নেই, এটা আমাকে দাও।'

রানী হেসে বললেন, 'তা বেশ তোমাকেই দেওয়া গেল—রাজাও একরকম দেবতা তো। কিন্তু শুধু ফলটি নিলে তো চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে এই চিঠিখানি আর এখানি যে লিখেছে তার মেয়েটিকেও তোমায় নিতে হচ্ছে। যাও, এই ব্রাহ্মণকে নিয়ে এই চিঠির একটা ভালো করে জবাব লিখে নিয়ে এসো; আমি ততক্ষণ পুজো সেরে আসি!' রানী পুজোয় গেলেন। হাম্বির ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপারখানা কি বলো দেখি?'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'মহারানা, সভায় চলুন, সমস্ত খুলে বলব।'

বিয়ের সমস্ত ঠিকঠাক করে মালদেবের দূত চিতোরে ফিরে গেল। এদিকে কৈলোরে বরযাত্রার উদ্যোগ চলতে লাগল। যত বুড়ো বুড়ো রাজপুত সর্দার লছমীরানীকে ধরে বসলেন—'মালদেব হাজার হোক শত্রুপক্ষ তো বটে। মহারানাকে সেখানে বিনা পাহারায় পাঠানো কোনওমতেই উচিত নয়।' রানীর হুকুমে পাঁচশো রাজপুত সেপাই বরযাত্রীর সঙ্গে যাবার জন্যে প্রস্তুত হল। হাম্বির মাকে প্রণাম করে বিদায় হলেন। লছমীরানী আশীর্বাদ করলেন,'বৎস, মালদেবের কন্যার সঙ্গে মেবারের রাজলক্ষ্মীও তোমায় বরণ করুন।' কৈলোর থেকে চিতোর অনেক দূর, কিন্তু হাম্বিরের ঘোড়া যেন উড়ে চলল!

বরযাত্রীরা যখন চিতোরের সম্মুখে উপস্থিত হলেন তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়েছে। পশ্চিমের আলোয় আকাশ ছেয়ে গেছে। ঠিক যেন দেবদূতেরা মহারানার মাথায় ছাতা ধরেছেন।

কিন্তু মালদেব—যাঁর কন্যা আজ মেবারের অধিশ্বরী রাজরাজেশ্বরী হতে চলেছেন, তিনি কোথায়? কেল্লার দরজায় একটিমাত্র প্রহরী মহারানাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে দুয়ার ছেড়ে পাশে দাঁড়াল! মঙ্গল শাঁখ নেই, কন্যাযাত্রীর আনন্দ নেই, যেন কোনও নির্জন পুরীতে হাম্বির প্রবেশ করলেন।

বুড়ো মন্ত্রী এসে হাম্বিরের কানের কাছে বললেন, 'মহারানা, যেন কেমন কেমন ঠেকছে! মালদেবের লক্ষণ ভালো নয়। আমার মতে কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করা উচিত হয় না!'

মাঠে-ঘাটে দিকে দিকে লক্ষ লক্ষ প্রদীপ, যেন তারার মালা, আলোর জাল! লছমীরানী অবাক হয়ে হাম্বিরের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'এই জনমানবহীন কৈলোরে এত আলো, এত লোক কোথা থেকে এল?'

হাম্বির বললেন, 'ওই যে পাহাড়ের দিকে দেখছ ওই আলো সব ভীলেরা জ্বালিয়েছে। আর যে গ্রামের দিকে দেখছ এসব গ্রামবাসীদের দেওয়া।' রানীমা বললেন, 'এত প্রদীপ, এত তেল, তুই এসব বুঝি চিতোর থেকে আমদানি করলি?'

হাম্বির বললেন, 'শুধু চিতোর থেকে নয়, সমস্ত মেবার থেকে প্রদীপ আর তেল, প্রদীপ গড়বার কুমোর, তেল যোগাবার তেলিও আমদানি করেছি। ওই দেখো, কুমোর পাড়ায় মশাল জ্বলছে; যাত্রা শুরু হল। ওই শোনো তামুলি পাড়ায় ঢোল বাজছে; এখন সঙ বার হবে। ওই যে মহাজন পট্টিতে নহবত বাজল, তোপখানায় বোমা ফাটল। দেখছ মা, হাম্বির তালাও ঘিরে ব্রাহ্মণের মেয়েরা কেমন প্রদীপ দিয়েছেন।'

লছমীরানী বলে উঠলেন, 'কি আশ্চর্য; এ যে নগর বসিয়ে ফেলেছিস দেখি! আমি বলি বুঝি তুই বসে বসে কেবল ঘুম দিস। ভিতরে ভিতরে তোর এত বুদ্ধি!'

হাম্বির বললেন, 'তা যাই হোক মা, এখন আমার এই নগরের একটি ভালো নাম তোমায় বেছে দিতে হবে। লক্ষ্মীপুর কেমন নাম?

রানীমা বললেন, 'আরে না না, ও যে বাঙালি রকম শোনাচ্ছে। আমি একটা ভালো নাম সন্ধান করছি। শুধু নাম নয়, তার সঙ্গে একটি লক্ষ্মী বউ। তুই আর দিন কতক সবুর কর।'

দু'জনে যখন এই কথা হচ্ছে, সেই সময় চিতোর থেকে মালদেবের দূত আর একজন ব্রাহ্মণ হাম্বিরের বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে কৈলোরে উপস্থিত হল। ব্রাহ্মণ এসে মালদেবের চিঠি আর একটি রুপোর পাতে মোড়া নারকেল এনে লছমীরানীর সম্মুখে ধরে দিলেন। রানী চিঠিখানি খুলে পড়তে লাগলেন, লেখা রয়েছে—'আমার কন্যা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। তাকে আপনার চরণে দাসী করে আমার কুলকে পবিত্র করুন। আমি পাঠানের আশ্রয়ে আছি বটে, কিন্তু ধর্ম ছাড়িনি!'

রানী হাম্বিরের দিকে চেয়ে বললেন, 'দেখ দেখি, মালদেব চিতোর থেকে কেমন সুন্দর নারকেলটি পাঠিয়েছেন। এটা আজ দেওয়ালির পুজোর কাজে লাগবে।'

হাম্বির বললেন, 'বেশ ফলটি, কিন্তু মা, এটার উপর প্রথম থেকেই আমার লোভ পড়েছে। এটা আর দেবতাদের দিয়ে কাজ নেই, এটা আমাকে দাও।'

রানী হেসে বললেন, 'তা বেশ তোমাকেই দেওয়া গেল—রাজাও একরকম দেবতা তো। কিন্তু শুধু ফলটি নিলে তো চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে এই চিঠিখানি আর এখানি যে লিখেছে তার মেয়েটিকেও তোমায় নিতে হচ্ছে। যাও, এই ব্রাহ্মণকে নিয়ে এই চিঠির একটা ভালো করে জবাব লিখে নিয়ে এসো; আমি ততক্ষণ পুজো সেরে আসি!' রানী পুজোয় গেলেন। হাম্বির ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপারখানা কি বলো দেখি?'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'মহারানা, সভায় চলুন, সমস্ত খুলে বলব।'

বিয়ের সমস্ত ঠিকঠাক করে মালদেবের দূত চিতোরে ফিরে গেল। এদিকে কৈলোরে বরযাত্রার উদ্যোগ চলতে লাগল। যত বুড়ো বুড়ো রাজপুত সর্দার লছমীরানীকে ধরে বসলেন—'মালদেব হাজার হোক শত্রুপক্ষ তো বটে। মহারানাকে সেখানে বিনা পাহারায় পাঠানো কোনওমতেই উচিত নয়।' রানীর হুকুমে পাঁচশো রাজপুত সেপাই বরযাত্রীর সঙ্গে যাবার জন্যে প্রস্তুত হল। হাম্বির মাকে প্রণাম করে বিদায় হলেন। লছমীরানী আশীর্বাদ করলেন,'বৎস, মালদেবের কন্যার সঙ্গে মেবারের রাজলক্ষ্মীও তোমায় বরণ করুন।' কৈলোর থেকে চিতোর অনেক দূর, কিন্তু হাম্বিরের ঘোড়া যেন উড়ে চলল!

বরযাত্রীরা যখন চিতোরের সম্মুখে উপস্থিত হলেন তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়েছে। পশ্চিমের আলোয় আকাশ ছেয়ে গেছে। ঠিক যেন দেবদূতেরা মহারানার মাথায় ছাতা ধরেছেন।

কিন্তু মালদেব—যাঁর কন্যা আজ মেবারের অধিশ্বরী রাজরাজেশ্বরী হতে চলেছেন, তিনি কোথায়? কেল্লার দরজায় একটিমাত্র প্রহরী মহারানাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে দুয়ার ছেড়ে পাশে দাঁড়াল! মঙ্গল শাঁখ নেই, কন্যাযাত্রীর আনন্দ নেই, যেন কোনও নির্জন পুরীতে হাম্বির প্রবেশ করলেন।

বুড়ো মন্ত্রী এসে হাম্বিরের কানের কাছে বললেন, 'মহারানা, যেন কেমন কেমন ঠেকছে! মালদেবের লক্ষণ ভালো নয়। আমার মতে কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করা উচিত হয় না!'

মাঠে-ঘাটে দিকে দিকে লক্ষ লক্ষ প্রদীপ, যেন তারার মালা, আলোর জাল! লছমীরানী অবাক হয়ে হাম্বিরের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'এই জনমানবহীন কৈলোরে এত আলো, এত লোক কোথা থেকে এল?'

হাম্বির বললেন, 'ওই যে পাহাড়ের দিকে দেখছ ওই আলো সব ভীলেরা জ্বালিয়েছে। আর যে গ্রামের দিকে দেখছ এসব গ্রামবাসীদের দেওয়া।' রানীমা বললেন, 'এত প্রদীপ, এত তেল, তুই এসব বুঝি চিতোর থেকে আমদানি করলি?'

হাম্বির বললেন, 'শুধু চিতোর থেকে নয়, সমস্ত মেবার থেকে প্রদীপ আর তেল, প্রদীপ গড়বার কুমোর, তেল যোগাবার তেলিও আমদানি করেছি। ওই দেখো, কুমোর পাড়ায় মশাল জ্বলছে; যাত্রা শুরু হল। ওই শোনো তামুলি পাড়ায় ঢোল বাজছে; এখন সঙ বার হবে। ওই যে মহাজন পট্টিতে নহবত বাজল, তোপখানায় বোমা ফাটল। দেখছ মা, হাম্বির তালাও ঘিরে ব্রাহ্মণের মেয়েরা কেমন প্রদীপ দিয়েছেন।'

লছমীরানী বলে উঠলেন, 'কি আশ্চর্য; এ যে নগর বসিয়ে ফেলেছিস দেখি! আমি বলি বুঝি তুই বসে বসে কেবল ঘুম দিস। ভিতরে ভিতরে তোর এত বুদ্ধি!'

হাম্বির বললেন, 'তা যাই হোক মা, এখন আমার এই নগরের একটি ভালো নাম তোমায় বেছে দিতে হবে। লক্ষ্মীপুর কেমন নাম?

রানীমা বললেন, 'আরে না না, ও যে বাঙালি রকম শোনাচ্ছে। আমি একটা ভালো নাম সন্ধান করছি। শুধু নাম নয়, তার সঙ্গে একটি লক্ষ্মী বউ। তুই আর দিন কতক সবুর কর।'

দু'জনে যখন এই কথা হচ্ছে, সেই সময় চিতোর থেকে মালদেবের দূত আর একজন ব্রাহ্মণ হাম্বিরের বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে কৈলোরে উপস্থিত হল। ব্রাহ্মণ এসে মালদেবের চিঠি আর একটি রুপোর পাতে মোড়া নারকেল এনে লছমীরানীর সম্মুখে ধরে দিলেন। রানী চিঠিখানি খুলে পড়তে লাগলেন, লেখা রয়েছে—'আমার কন্যা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। তাকে আপনার চরণে দাসী করে আমার কুলকে পবিত্র করুন। আমি পাঠানের আশ্রয়ে আছি বটে, কিন্তু ধর্ম ছাড়িনি!'

রানী হাম্বিরের দিকে চেয়ে বললেন, 'দেখ দেখি, মালদেব চিতোর থেকে কেমন সুন্দর নারকেলটি পাঠিয়েছেন। এটা আজ দেওয়ালির পুজোর কাজে লাগবে।'

হাম্বির বললেন, 'বেশ ফলটি, কিন্তু মা, এটার উপর প্রথম থেকেই আমার লোভ পড়েছে। এটা আর দেবতাদের দিয়ে কাজ নেই, এটা আমাকে দাও।'

রানী হেসে বললেন, 'তা বেশ তোমাকেই দেওয়া গেল—রাজাও একরকম দেবতা তো। কিন্তু শুধু ফলটি নিলে তো চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে এই চিঠিখানি আর এখানি যে লিখেছে তার মেয়েটিকেও তোমায় নিতে হচ্ছে। যাও, এই ব্রাহ্মণকে নিয়ে এই চিঠির একটা ভালো করে জবাব লিখে নিয়ে এসো; আমি ততক্ষণ পুজো সেরে আসি!' রানী পুজোয় গেলেন। হাম্বির ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপারখানা কি বলো দেখি?'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'মহারানা, সভায় চলুন, সমস্ত খুলে বলব।'

বিয়ের সমস্ত ঠিকঠাক করে মালদেবের দূত চিতোরে ফিরে গেল। এদিকে কৈলোরে বরযাত্রার উদ্যোগ চলতে লাগল। যত বুড়ো বুড়ো রাজপুত সর্দার লছমীরানীকে ধরে বসলেন—'মালদেব হাজার হোক শত্রুপক্ষ তো বটে। মহারানাকে সেখানে বিনা পাহারায় পাঠানো কোনওমতেই উচিত নয়।' রানীর হুকুমে পাঁচশো রাজপুত সেপাই বরযাত্রীর সঙ্গে যাবার জন্যে প্রস্তুত হল। হাম্বির মাকে প্রণাম করে বিদায় হলেন। লছমীরানী আশীর্বাদ করলেন,'বৎস, মালদেবের কন্যার সঙ্গে মেবারের রাজলক্ষ্মীও তোমায় বরণ করুন।' কৈলোর থেকে চিতোর অনেক দূর, কিন্তু হাম্বিরের ঘোড়া যেন উড়ে চলল!

বরযাত্রীরা যখন চিতোরের সম্মুখে উপস্থিত হলেন তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়েছে। পশ্চিমের আলোয় আকাশ ছেয়ে গেছে। ঠিক যেন দেবদূতেরা মহারানার মাথায় ছাতা ধরেছেন।

কিন্তু মালদেব—যাঁর কন্যা আজ মেবারের অধিশ্বরী রাজরাজেশ্বরী হতে চলেছেন, তিনি কোথায়? কেল্লার দরজায় একটিমাত্র প্রহরী মহারানাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে দুয়ার ছেড়ে পাশে দাঁড়াল! মঙ্গল শাঁখ নেই, কন্যাযাত্রীর আনন্দ নেই, যেন কোনও নির্জন পুরীতে হাম্বির প্রবেশ করলেন।

বুড়ো মন্ত্রী এসে হাম্বিরের কানের কাছে বললেন, 'মহারানা, যেন কেমন কেমন ঠেকছে! মালদেবের লক্ষণ ভালো নয়। আমার মতে কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করা উচিত হয় না!'

হাম্বির বললেন, 'নিজের কেল্লায় প্রবেশ করব, তার আবার ভয়টা কি? চলে এসো—'

সেই সময় ফটকের এককোণ থেকে মালদেব এসে বললেন, 'মহারানা, আমারও সেই আশা ছিল, আপনি নিজের ঘরে আসছেন তার জন্যে আবার অভ্যর্থনাই বা কি, বাজনাবাদ্যিই বা কেন?'

মন্ত্রী বললেন, 'মালদেব, তুমি কি জান না রাজপুতদের নিয়ম আছে বিবাহের রাত্রে ফুলের কেল্লা দখল করে তবে কন্যাকর্তার বাড়িতে বর প্রবেশ করেন? তোমার কন্যার সখীরা সে আয়োজন করেননি কেন?'

মালদেব বললেন, 'মন্ত্রী, আমি কন্যার পিতা বটে, কিন্তু বাড়ি আমার কোথা? এটা যে মহারানার নিজেরই কেল্লা! নিজের ঘরে নিজে মহারানা এসে প্রবেশ করেছেন, সেখানে আমার কন্যার সখীরা এসে তাঁকে বাধা দিতে সাহস পাবে কেন?'

মন্ত্রী একটু হেসে বললেন, 'দেখছি বাদশাহের মজলিসে আনাগোনা করে আপনার কুসংস্কার অনেকটা দূর হয়েছে। এখন চলুন, বিবাহকার্য সুসম্পন্ন করুন! লছমীরানীর হুকুম, আজ রাত্রেই বরকন্যা নিয়ে আমরা কৈলোরে ফিরে যাব।'

হাম্বিরের পিতা পিতামহ যে রাজসভায় বসে রাজত্ব করতেন, সেই ঘরে হাম্বিরকে নিয়ে মালদেব যখন উপস্থিত হলেন, তখন হাম্বিরের বুকের ভিতরটা কেমন যে করে উঠল তা বলা যায় না। তাঁর মনে হল যেন সেই প্রকাণ্ড ঘরের একধারে চিতোরের শূন্য রাজসিংহাসন ঘিরে ছায়ার মতো সব বীরপুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে। তাঁদের গায়ে সোনার সাঁজোয়া, হাতে খোলা তলোয়ার, মুখে কারুর কথা নেই; হাম্বিরের সঙ্গে যত রাজপুত এসেছিল সবাইকার চোখ সেই সিংহাসনের দিকে! প্রকাণ্ড ঘরের আবছায়া অন্ধকারে চিতোরের শূন্য সিংহাসনের উপরে সোনার রাজছত্র আলো পেয়ে একবার ঝলমল করছে আবার যেন অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে। হাম্বিরের সঙ্গে পাঁচশো রাজপুত সেই সিংহাসনকে নমস্কার করে যেমন উঠে দাঁড়ালেন অমনি সেই অন্ধকার ঘর যেন আলো করে কমলকুমারী সখীদের সঙ্গে এসে হাম্বিরের গলায় পদ্মফুলের মালা দিলেন! চিতোরের রাজলক্ষ্মী এতদিন অনাথা বিধবার মতো শূন্য রাজপুরে যেন একা ছিলেন, আজ যেন কতদিন পরে চিতোরের রাজকুমার এসে তাঁকে হাত ধরে বরণ করে নিলেন!

কতদিন পরে চিতোরের কেল্লায় আর একবার মঙ্গলশাঁখ বেজে উঠল। চিতোরের গড় বড়ো বড়ো তালাবন্ধ ঘর নিয়ে এতদিন শূন্য পড়ে ছিল, আজ সেই শাঁখের শব্দে পাঁচশো রাজপুতের তলোয়ার ঝনঝনায় এক একবার যেন লোকে লোকারণ্য বোধ হতে লাগল; যেন তার আগেকার শ্রী আবার ফিরে এল।

সেই দিন থেকে দুই বৎসর না যেতে সত্যি সত্যিই হাম্বির এসে চিতোরের কেল্লা দখল করে নিলেন। দিল্লীর নবাব মহম্মদ খিলজির কাছে এ খবর পৌঁছাতে গেল মালদেবের পুত্র বনবীর। তার আশা ছিল মালদেবের পরে সে-ই চিতোরে বসে রাজত্ব করবে। তাই সে মহম্মদ খিলজির সঙ্গে পাঠান ফৌজ নিয়ে চিতোরের দিকে আসতে লাগল।

শিঙ্গোলীতে পাঠান বাদশা ফৌজ নিয়ে তাম্বু গেড়েছেন। লছমীরানীর সঙ্গে কমলকুমারী আর এক বছরের রাজকুমার ক্ষেতসিংহকে আর একবার কৈলোরের কেল্লায় পাঠিয়ে দিয়ে হাম্বির যুদ্ধে গেলেন।

বাঘ যেমন হরিণের পালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনই রাজপুত সৈন্য পাঠান ফৌজের উপর গিয়ে পড়ল। সেবার মহম্মদ খিলজিকে আর দিল্লীর মুখে ফিরে যেতে হল না। হাম্বির তাঁর দুই পায়ে শিকল দিয়ে চিতোরের কেল্লায় এনে তাঁকে বন্ধ করলেন। বনবীরেরও সেই দশা। কমলকুমারীর ভাই বলে সে যাত্রা হাম্বির তাঁকে প্রাণে না মেরে বন্দী করে কৈলোরে নিয়ে উপস্থিত হলেন।

হাম্বির থাকেন কৈলোরে, আর চিতোরে কড়া পাহারার মধ্যে থাকেন দিল্লীর বাদশা মহম্মদ খিলজি। এক-মাস, দু'মাস তিনমাস যায় হাম্বির আর চিতোরে যাবার নামগন্ধ করেন না! একদিন লছমীরানী তাঁকে ডেকে বললেন, 'তুই কি পাঠান বাদশাকে চিতোর ছেড়ে দিলি নাকি? যেখানে তোর রাজসিংহাসন, সেই চিতোর ছেড়ে কৈলোরে এসে বসে থাকা তো আর সাজে না। তোর রাজা হয়ে রাজসিংহাসনে বসবার ইচ্ছে নেই কি?

হাম্বির বললেন, 'মা, চিতোরের সিংহাসনে বসতে হলে কি চাই তা জানো? শুধু মুঞ্জ ডাকাতের হাত থেকে চিতোরের রাজমুকুট কিংবা পাঠান ফৌজের কাছ থেকে চিতোর গড়টা কেড়ে নিলে বাপ্পারাওর সিংহাসনে বসা যায় না! ভবানী মায়ের হাতের খাঁড়াখানি যতদিন না সন্ধান করে পাওয়া যায় ততদিন তো রাজা হওয়া যাবে না। আগে সেই খাঁড়াখানির পুজো দিয়ে তবে রাজসিংহাসনে বসা চাই। সে খাঁড়া যে এখন কোথায়, তা কেউ

জানে না। কেউ বলে পাঠানেরা লুটে নিয়ে গেছে, কেউ বলে রানী পদ্মিনীর সঙ্গে সে খাঁড়া চিতার আগুনে ছাই হয়ে গেছে।'

লছমীরানী বললেন, 'আমি এ দু'টো কথার একটাও বিশ্বাস করিনে। লোকে যাই বলুক, আমার বিশ্বাস ভবানীর খাঁড়া এখনও চিতোরেই আছে; কেবল, চিতোরে এমন কেউ কাজের লোক নেই যে সেই খাঁড়াখানি যত্ন করে সন্ধান করে। লোকেরই বা দোষ দিই কেন? চিতোরের যে রাজা, তাঁরই যখন কোনও চেষ্টা দেখা যাচ্ছে না তখন সামান্য লোকের এত কি গরজ যে খাঁড়াখানা সন্ধান করে তাদের রাজার হাতে তুলে দেয়!' সেই দিন হাম্বির মায়ের পায়ে হাত দিয়ে শপথ করলেন, 'ভবানীর খাঁড়া উদ্ধার করে তবে অন্য কাজ!'

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আকাশে মেঘ করে একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে, হাম্বির ও কমলকুমারী দু'জনে লুকিয়ে চিতোরের কেল্লায় এসেছেন। গ্রামবাসী চাষা-চাষীর সাজে কমলকুমারী পথ দেখিয়ে যাচ্ছেন আর হাম্বির তাঁর সঙ্গে গায়ে একখানা মোটা কম্বল জড়িয়ে মস্ত পাগড়িতে মুখের আধখানা ঢেকে গুটিগুটি চলেছেন বরাবর যেদিকে শ্মশান সেই দিকে। আকাশ দিয়ে কালো কালো মেঘ হু হু করে পুব থেকে পশ্চিমে ছুটে চলেছে। ঝড়ের তাড়ায় বড়ো বড়ো গাছের ডালগুলো মচমচ করে শব্দ করছে। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার, কেউ কোথাও নেই, বাতাস এমন ঠাণ্ডা যে গায়ে লাগলে গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। এই অমাবস্যার রাত্রে ঝড়ে জলে ঘোর অন্ধকারে কমলকুমারী হাম্বিরকে নিয়ে মহাশ্মশানের ভিতরে এসে উপস্থিত হলেন। চোখে কিছু দেখা যায় না, কেবল একদিক থেকে ঝরঝর করে একটা শব্দ আসছে—যেন অন্ধকারের ভিতরে একটা ঝরনা পড়ছে!

যেদিক থেকে জলের শব্দ আসছিল, সেইদিক দেখিয়ে কমলরানী হাম্বিরকে বললেন, 'ও ঝরনার ধারে পাহাড়ের গায়ে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ, তারই পাশ দিয়ে সুড়ঙ্গ পাতালের দিকে নেমে গেছে; সেই সুড়ঙ্গের ভিতরে পদ্মিনীরানী চিতার আগুনে পুড়ে মরেছিলেন। ওই সুড়ঙ্গের শেষে একটা গুহায় কারুণী দেবীর মন্দির! শুনেছি সেইখানে একটা অজগর সাপ পাহারা দিচ্ছে, আর ঠিক তার মাথার উপরে ভবানীর খাঁড়া ঝুলছে। আমি অনেকবার সেই সুড়ঙ্গ পর্যন্ত গেছি, কিন্তু ভিতরে যেতে সাহস হয়নি!'

হাম্বির বললেন, 'তুমি সুড়ঙ্গ পর্যন্ত আমার সঙ্গে চলো; সেই বটগাছের তলায় তোমাকে রেখে আমি ভিতরে যাব।'

শ্মশানের একধার দিয়ে একটা আঁকা-বাঁকা সুড়িপথ অন্ধকারের দিকে নেমে গেছে! দু'জনে সেই পথে পায়ে পায়ে চললেন; কতদূর চলে সামনে একটা জলের নালা—আর রাস্তা নেই! পাথর কেটে ঝরনার জল কলকল করে ছুটে চলেছে। নালার জল এক হাঁটু, কিন্তু বরফের মতো ঠাণ্ডা—পা রাখা যায় না।

হাম্বির কমলরানীকে দুই হাতে তুলে ধরে সেই জলের উপর দিয়ে হেঁটে সেই বটগাছের দিকে চলেছেন। শুনতে পাচ্ছেন, দূরে যেন পাহাড়ের ভিতর থেকে ঝনঝন করে একটা শব্দ আসছে! কারা যেন লোহার কপাট ধরে নাড়া দিচ্ছে। বট গাছের একটা শিকড় ধরে হাম্বির ডাঙায় উঠলেন। সেখানটা এমন নিস্তব্ধ, এমন অন্ধকার যে মনে হয়, পৃথিবী ছেড়ে কোথাও এসেছি!

সেই বটতলায় কমলরানীকে বসিয়ে রেখে হাম্বির অন্ধকারে দুই হাত বাড়িয়ে সুড়ঙ্গের ভিতর নেমে চললেন। দু'দিকে পাহাড়ের দেয়াল বেয়ে জল পড়ছে! একটু আলো নেই, একটু শব্দ নেই, সামনে কিছু দেখা যাচ্ছে না, পিছনে কিছু সাড়া দিচ্ছে না! নীল অন্ধকারের ভিতর দিয়ে হাম্বির একা চলেছেন। একবার তাঁর পায়ে ঠেকে কি একটা গড়গড় করে গড়িয়ে গেল। হাম্বির সেটা তুলে দেখলেন একটা মড়ার মাথা! কখনও তাঁর পায়ের চাপে একখানা শুকনো মড়ার হাড় মড়মড় করে গুঁড়িয়ে গেল। কখনও পাহাড়ের ফাটল বেয়ে একটা গাছের শিকড় নেমেছে, সেটা তাঁর হাতে ঠেকতে মনে হল যেন সাপের গায়ে হাত পড়েছে; কখনও তিনি দূর থেকে যেন ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন; কখনও মনে হচ্ছে কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে; আবার এক এক জায়গায় আলেয়া একবার দপ করে জ্বলেই নিভে যাচ্ছে; কোথাও মনে হচ্ছে পাথরের দেয়াল কত দূরে যেন সরে গেছে; আবার এক এক জায়গায় দেয়াল যেন চেপে পড়তে চাচ্ছে! এক জায়গায় শুনলেন মাথার উপর থেকে কাদের যেন কান্নার শব্দ আসছে, পা যেন তাঁর ছাইগাদায় বসে যেতে লাগল; মাথার উপর হাম্বির চেয়ে দেখলেন অনেক দূরে নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে—চারিদিকে তাঁর গোল পাথরের দেয়াল, কোনওদিকে আর যাবার পথ নেই! সেই অন্ধকূপের ভিতর হাম্বির চারিদিকে হাতড়ে বেড়ো াতে লাগলেন। নিচে পথ নেই, উপরে পথ নেই, আশে-পাশে পাথরের দেয়াল, তারই মাঝে স্তূপাকার ছাই, চলতে গেলে পা বসে যায়।

জানে না। কেউ বলে পাঠানেরা লুটে নিয়ে গেছে, কেউ বলে রানী পদ্মিনীর সঙ্গে সে খাঁড়া চিতার আগুনে ছাই হয়ে গেছে।'

লছমীরানী বললেন, 'আমি এ দু'টো কথার একটাও বিশ্বাস করিনে। লোকে যাই বলুক, আমার বিশ্বাস ভবানীর খাঁড়া এখনও চিতোরেই আছে; কেবল, চিতোরে এমন কেউ কাজের লোক নেই যে সেই খাঁড়াখানি যত্ন করে সন্ধান করে। লোকেরই বা দোষ দিই কেন? চিতোরের যে রাজা, তাঁরই যখন কোনও চেষ্টা দেখা যাচ্ছে না তখন সামান্য লোকের এত কি গরজ যে খাঁড়াখানা সন্ধান করে তাদের রাজার হাতে তুলে দেয়!' সেই দিন হাম্বির মায়ের পায়ে হাত দিয়ে শপথ করলেন, 'ভবানীর খাঁড়া উদ্ধার করে তবে অন্য কাজ!'

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আকাশে মেঘ করে একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে, হাম্বির ও কমলকুমারী দু'জনে লুকিয়ে চিতোরের কেল্লায় এসেছেন। গ্রামবাসী চাষা-চাষীর সাজে কমলকুমারী পথ দেখিয়ে যাচ্ছেন আর হাম্বির তাঁর সঙ্গে গায়ে একখানা মোটা কম্বল জড়িয়ে মস্ত পাগড়িতে মুখের আধখানা ঢেকে গুটিগুটি চলেছেন বরাবর যেদিকে শ্মশান সেই দিকে। আকাশ দিয়ে কালো কালো মেঘ হু হু করে পুব থেকে পশ্চিমে ছুটে চলেছে। ঝড়ের তাড়ায় বড়ো বড়ো গাছের ডালগুলো মচমচ করে শব্দ করছে। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার, কেউ কোথাও নেই, বাতাস এমন ঠাণ্ডা যে গায়ে লাগলে গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। এই অমাবস্যার রাত্রে ঝড়ে জলে ঘোর অন্ধকারে কমলকুমারী হাম্বিরকে নিয়ে মহাশ্মশানের ভিতরে এসে উপস্থিত হলেন। চোখে কিছু দেখা যায় না, কেবল একদিক থেকে ঝরঝর করে একটা শব্দ আসছে—যেন অন্ধকারের ভিতরে একটা ঝরনা পড়ছে!

যেদিক থেকে জলের শব্দ আসছিল, সেইদিক দেখিয়ে কমলরানী হাম্বিরকে বললেন, 'ও ঝরনার ধারে পাহাড়ের গায়ে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ, তারই পাশ দিয়ে সুড়ঙ্গ পাতালের দিকে নেমে গেছে; সেই সুড়ঙ্গের ভিতরে পদ্মিনীরানী চিতার আগুনে পুড়ে মরেছিলেন। ওই সুড়ঙ্গের শেষে একটা গুহায় কারুণী দেবীর মন্দির! শুনেছি সেইখানে একটা অজগর সাপ পাহারা দিচ্ছে, আর ঠিক তার মাথার উপরে ভবানীর খাঁড়া ঝুলছে। আমি অনেকবার সেই সুড়ঙ্গ পর্যন্ত গেছি, কিন্তু ভিতরে যেতে সাহস হয়নি!'

হাম্বির বললেন, 'তুমি সুড়ঙ্গ পর্যন্ত আমার সঙ্গে চলো; সেই বটগাছের তলায় তোমাকে রেখে আমি ভিতরে যাব।'

শ্মশানের একধার দিয়ে একটা আঁকা-বাঁকা সুড়িপথ অন্ধকারের দিকে নেমে গেছে! দু'জনে সেই পথে পায়ে পায়ে চললেন; কতদূর চলে সামনে একটা জলের নালা—আর রাস্তা নেই! পাথর কেটে ঝরনার জল কলকল করে ছুটে চলেছে। নালার জল এক হাঁটু, কিন্তু বরফের মতো ঠাণ্ডা—পা রাখা যায় না।

হাম্বির কমলরানীকে দুই হাতে তুলে ধরে সেই জলের উপর দিয়ে হেঁটে সেই বটগাছের দিকে চলেছেন। শুনতে পাচ্ছেন, দূরে যেন পাহাড়ের ভিতর থেকে ঝনঝন করে একটা শব্দ আসছে! কারা যেন লোহার কপাট ধরে নাড়া দিচ্ছে। বট গাছের একটা শিকড় ধরে হাম্বির ডাঙায় উঠলেন। সেখানটা এমন নিস্তব্ধ, এমন অন্ধকার যে মনে হয়, পৃথিবী ছেড়ে কোথাও এসেছি!

সেই বটতলায় কমলরানীকে বসিয়ে রেখে হাম্বির অন্ধকারে দুই হাত বাড়িয়ে সুড়ঙ্গের ভিতর নেমে চললেন। দু'দিকে পাহাড়ের দেয়াল বেয়ে জল পড়ছে! একটু আলো নেই, একটু শব্দ নেই, সামনে কিছু দেখা যাচ্ছে না, পিছনে কিছু সাড়া দিচ্ছে না! নীল অন্ধকারের ভিতর দিয়ে হাম্বির একা চলেছেন। একবার তাঁর পায়ে ঠেকে কি একটা গড়গড় করে গড়িয়ে গেল। হাম্বির সেটা তুলে দেখলেন একটা মড়ার মাথা! কখনও তাঁর পায়ের চাপে একখানা শুকনো মড়ার হাড় মড়মড় করে গুঁড়িয়ে গেল। কখনও পাহাড়ের ফাটল বেয়ে একটা গাছের শিকড় নেমেছে, সেটা তাঁর হাতে ঠেকতে মনে হল যেন সাপের গায়ে হাত পড়েছে; কখনও তিনি দূর থেকে যেন ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন; কখনও মনে হচ্ছে কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে; আবার এক এক জায়গায় আলেয়া একবার দপ করে জ্বলেই নিভে যাচ্ছে; কোথাও মনে হচ্ছে পাথরের দেয়াল কত দূরে যেন সরে গেছে; আবার এক এক জায়গায় দেয়াল যেন চেপে পড়তে চাচ্ছে! এক জায়গায় শুনলেন মাথার উপর থেকে কাদের যেন কান্নার শব্দ আসছে, পা যেন তাঁর ছাইগাদায় বসে যেতে লাগল; মাথার উপর হাম্বির চেয়ে দেখলেন অনেক দূরে নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে—চারিদিকে তাঁর গোল পাথরের দেয়াল, কোনওদিকে আর যাবার পথ নেই! সেই অন্ধকূপের ভিতর হাম্বির চারিদিকে হাতড়ে বেড়োাতে লাগলেন। নিচে পথ নেই, উপরে পথ নেই, আশে-পাশে পাথরের দেয়াল, তারই মাঝে স্তূপাকার ছাই, চলতে গেলে পা বসে যায়।

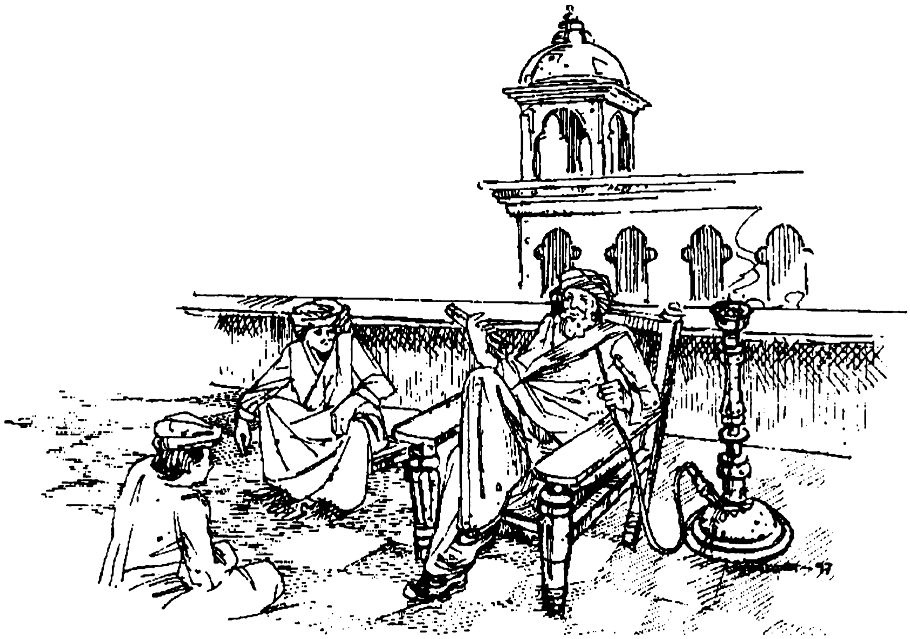
কতক্ষণ হাম্বির সেইখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এমন সময় পাথরের দেয়ালের উপর থেকে শুনলেন শাঁখ ঘণ্টার শব্দ আসছে! দেখতে দেখতে হাম্বিরের চোখের সামনে খানিকটা পাথরের দেয়াল দু'ফাঁক হয়ে সরে গেল; সেই ফাঁক দিয়ে হাম্বির দেখলেন, গেরুয়া কাপড়, রুদ্রাক্ষের মালা পরা পাঁচজন ভৈরবী আগুনের উপরে একখানা প্রকাণ্ড লোহার কড়া ঘিরে বসে রয়েছেন। অনেকদূরে কারুণী দেবীর সোনার মূর্তি আগুনের আলোয় ঝকঝক করছে। হাম্বির নির্ভয়ে কারুণীর মন্দিরে যেখানে ভৈরবীরা বসে রয়েছেন, সেখানে উপস্থিত হলেন। হাম্বিরকে দেখে ভৈরবীরা বিকট চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'কে রে তুই! কী চাস?'

হাম্বির নির্ভয়ে বললেন, 'আমি এসেছি যা আমার তাই চাইতে। মা ভবানী বাপ্পাকে যে খাঁড়া দিয়েছিলেন সে খাঁড়া এইখানে আছে, আমি তাই চাই! তারই জন্যে আমার মা আমাকে পাঠিয়েছেন—আমি চিতোরের রানা হাম্বির!'

ভৈরবীরা হাম্বিরের কথার উত্তর না দিয়ে আগুনের উপর সেই লোহার কড়াখানার দিকে দেখিয়ে দিলেন। হাম্বির ছুটে গিয়ে যেমন সেই কড়াখানার ভিতর হাত দিয়েছেন, অমনি কোথায় সে আগুন, কোথায় সে কড়া, কোথায় বা সে ভৈরবীর দল! হাম্বির দেখলেন ভবানীর খাঁড়া হাতে তিনি কমলরানীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন; আর অজগর সাপের মতো খানিকটা ধোঁয়া সেই সুড়ঙ্গের মুখ থেকে বেরিয়ে চলেছে আস্তে আস্তে। হাম্বির ভবানীর খাঁড়া হাতে যেদিন চিতোরের রাজসিংহাসনে উঠে বসলেন, সেদিন সমস্ত রাজস্থানে জয়জয়কার পড়ল। দিল্লীর বাদশা মহম্মদ খিলজি সেদিন পঞ্চাশ লাখ মোহর হাম্বিরকে নজর দিয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন এ জীবনে আর চিতোরমুখো হবেন না; তবে তিনি ছাড়া পেলেন।

কমলকুমারী হাম্বিরকে ভবানীর খাঁড়াখানির সন্ধান দিয়েছিলেন বলে হাম্বির তাঁর কথায় বনবীরকে ছেড়ে দিলেন আর কৈলোরের কেল্লার নাম রাখলেন—কমলমীর।

লছমীরানী হাম্বিরকে সিংহাসনে বসিয়ে উজলাগ্রামে তাঁর বাপের বাড়ি চলে গেলেন তাঁর সেই ছেলেবেলার ঘরে নদীর পারে খেতের ধারে।



চণ্ড

হাম্বিরের নাতি লখা রানা—লড়াই করতে করতে তিনি এখন বুড়ো হয়েছেন। আর তাঁর তলোয়ার, সে শত্রুর মাথা কাটতে কাটতে এমন ভোঁতা হয়ে গেছে যে কেবল মুঠসার একগাছা আখ কাটবারও ধার তাতে নেই। তলোয়ারের ধার না থাকুক লখা রানার কিন্তু কথার ধার খুবই ছিল; ঠাট্টায় তামাশায় তাঁর মুখের কাছে দাঁড়ায় কার সাধ্য। বয়সের সঙ্গে রানার মসকরা করবার বাতিক ক্রমেই বেড়ে চলেছিল।

সে একদিনের কথা—সাদা জামাজোড়া, সাদা দোপাট্টা পাকা চুলের উপরে ধ্বধবে পাগড়ি পড়ে লখা রানা লক্কা পায়রাটি সেজে বসে আছেন। পাহাড়ের উপর শ্বেত পাথরের খোলা ছাদ—আধখানায় চাঁদের আলো পড়েছে, আর আধখানায় কেল্লার উঁচু পাঁচিলের কালো ছায়া বিছিয়ে গিয়েছে; রানার চারিদিকে সভাসদ পারিষদ, সকলের হাতে এক এক খোরা সিদ্ধি। এখনই জলসা শুরু হবে—চাকরেরা বড়ো বড়ো থালায় ফুলের মালা, পানের দোনা এনে রেখেছে, গোলাপ আর আতরের গন্ধ, ছাদের এক কোণে একদল নাচনী সোনার ঘুঙুর এ ওর পায়ে জড়িয়ে দিচ্ছে। এমন সময় রাজকুমার চণ্ডের সঙ্গে মাড়োয়ারের রাজকুমারীর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে রণমল্লের দূত এসে উপস্থিত—রুপোর পাতে মোড়া একটি নারকেল হাতে। মাড়োয়ারের দূত বেশ একটু মোটা; তার উপর এগারগজি থানের প্রকাণ্ড একটা পাগড়ি বেঁধেছেন আর তাঁর আগে আগে পেটটি এগিয়ে চলেছে। দূতকে দেখে লখা রানা অনেক কষ্টে হাসি চাপলেন কিন্তু এই মানুষ-লাটিমকে নিয়ে একটু মসকরা করবার লোভ তিনি আর কিছুতেই সামলাতে পারলেন না।

রানা দূতের হাত থেকে রুপোয় মোড়া নারকেলটি নিজেই নিয়ে বলছেন, 'বা, বেশ তো, এটা বুঝি তোমার রাজা এই বুড়ো বয়সে আমার খেলার জন্যে পাঠিয়েছেন?'

দূতের বলা উচিত ছিল—আজ্ঞে না, এটি রাজকুমার চণ্ডের জন্যে, কেননা তাঁরই সঙ্গে আমাদের রাজকুমারীর বিয়ের কথা নিয়ে এসেছি, আপনার মতো পাকা দাড়ির খেলার জিনিস এটি নয়—কিন্তু রানার ভাবগতিক দেখে দূতের মুখে আর কথা সরছে না। এদিকে সভাসুদ্ধ মুখ টিপে হাসছে, ওদিকে লজ্জায় রাজকুমার চণ্ডের মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। দূত তখন বিষম সমস্যায় পড়ে বলছেন, 'মহারানা, বড়ো সুখের কথা যে আপনি নিজেই আমাদের রাজকুমারীকে চাইলেন, আমাদের দেশের রাজা গরিব, তাঁর এতদূর সাহস কেমন করে হবে যে বিয়ের সম্বন্ধ করে মহারানাকে নারকেল পাঠাবেন? তিনি চেয়েছিলেন রাজকুমারকে জামাই করতে, কিন্তু কী আশ্চর্য তিনি

স্বপ্নেও যা আশা করেননি তাই ঘটল! মহারানার যদি হুকুম হয় তবে আমি আমার রাজাকে গিয়ে এই সুখের খবর এখন পাঠিয়ে দিই'—বলেই দূত উঠতে যান—রানা তখন কি জবাব দেন, তাড়াতাড়ি দূতের হাত ধরে বললেন, 'বসো, আমি তামাশা করছিলাম, ডাকো কুমার বাহাদুরকে—'। কুমার তখন সভা ছেড়ে উঠে গেছেন। রানার দূত চণ্ডের কাছে ছুটল কিন্তু চণ্ড বলে পাঠালেন—মহারানা তামাশা করেও যে রাজকুমারীকে বিয়ে করতে চেয়েছেন তিনি আজ থেকে আমার মায়ের তুল্য, আমি কিছুতেই তাঁকে বিয়ে করব না।

বুড়ো রানা বড়োই বিপদে পড়লেন! কি আশ্চর্য, ছেলেটা তামাশা বোঝে না! লোকের পর লোক রাজকুমারকে বোঝাতে ছুটল কিন্তু চণ্ডের প্রতিজ্ঞা অটল। রানা নিজের কথার ফাঁদে নিজেই বাঁধা পড়লেন। এবারের তামাশা যে জাদুকরের আমগাছের মতো দেখতে দেখতে এমন সত্যি হয়ে উঠবে এটা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি; বিয়ে করতে দুঃখ নেই কিন্তু তামাশাটা যে দূতকে ছেড়ে উলটে তাঁকে নিয়েই শুরু হল এইটেতেই তাঁর আপত্তি।

অনেক বোঝানোর পরেও যখন চণ্ড বিয়ে করতে রাজি হলেন না, তখন রাগে বুড়ো রানা পাকা দাড়িতে মোচড় দিয়ে বললেন, 'দেখো চণ্ড, তোমার প্রতিজ্ঞা তুমি রাখো; কিন্তু আমিও প্রতিজ্ঞা করলেম, এবার আমার যে ছেলে হবে তাকেই আমি সিংহাসন দেব, সে-ই হবে রানা, আর তোমাকে তার একজন সামন্ত হয়ে থাকতে হবে।' চণ্ড একলিঙ্গ মহাদেবের নামে শপথ করে বললেন, 'তাই হবে!' সভাসুদ্ধ লোক চুপ হয়ে রইল। মাড়োয়ারের দূত রানার বিয়ের হুকুম নিয়ে বিদায় হল।

বুড়ো বয়সে বর সেজে যে তামাশা দেখাতে হল সেটা লখা রানার বড়োই বাজল; তিনি চণ্ডকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারলেন না। বিয়ের দু'বছর পরে দু'মাসের ছেলে মকুলকে মেবারের সিংহাসনে বসিয়ে তিনি এক কম্বল এক লোটা নিয়ে তীর্থ করতে বেরিয়ে গেলেন—কবে কোনখানে জীবনের বিষম তামাশার থেকে তাঁর নিষ্কৃতি হল তা জানা গেল না।

মকুল তখন ভারি ছোটো, নেহাত কচি—কাজেই রাজার যা কিছু কাজ সবই চণ্ডকে করতে হয়, রাজা না হয়েও তিনি রাজা। দেশের লোকের মুখে চণ্ডের সুখ্যাতি আর ধরে না। চণ্ডকে তারা যেমন ভয় করে তেমনই ভক্তিও করে, ভালোওবাসে, এটা কিন্তু মকুলের মায়ের আর যত মাড়োয়ারি মামার দলের প্রাণে সয় না। চণ্ড কাউকে কিছু বলেন না—কিন্তু বোঝেন তাঁর আর বেশিদিন এ রাজ্যে থাকা চলবে না। এই যে রাজবাড়ি যেখানে চণ্ড মায়ের কোলে মানুষ হয়েছেন, বাপের আদরে বেড়ে উঠেছেন, এখানে তাঁর আপনার বলতে আজ কে আছে? পুরানো চাকর যারা ছিল মহারানী তাদের তাড়িয়ে নিজের দেশ থেকে যত মাড়োয়ারি এনে কাজে রেখেছেন। তাঁর নিজের যে মহল সেখানে রানীর ভাইরা এসে ঢুকেছেন, তাঁর যে সোনারুপোর খাট-বিছানা আসবাবপত্র সবই এখন মকুলের, রাজবাড়িতে নিজের বলতে রয়েছে একমাত্র তাঁর তলোয়ার! কিন্তু মকুল—সেই অফুটন্ত ফুলের মতো কচি ভাই মকুল—যে এখনও চলতে শেখেনি, বলতে শেখেনি, সে কি তাঁর আপনার নয়? সকালে সন্ধ্যায় রাজসভাতে নিয়ে যাবার সময় সে যখন তার ছোটো দু'টি হাত দিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে, তখন কি আর চণ্ডের কোনও দুঃখ মনে থাকে? চণ্ড কতবার মনে করেছেন চলে যাই, কিন্তু এই ছোটো ভায়ের ছোটো হাতের বাঁধন—তাঁর সব দুঃখের উপর কচি দু'খানি হাতের পরশ—একে ছেড়ে যাওয়া, একে কাটিয়ে বেরিয়ে পড়া চণ্ডের আর হয়ে ওঠে না! তিনি বছরের পর বছর সব দুঃখ সয়ে এই ছোটো ভাই মকুলকে মেবারের রাজসিংহাসনে বসাবার মতো উপযুক্ত করে, মানুষ করে তুলতে লাগলেন। দারুণ গরমের দিনে সকাল সকাল সভা ভঙ্গ করে মকুলকে নিয়ে চণ্ড খোলা ময়দানে গোলা খেলা করতে যান, চণ্ড চড়েন এক ঘোড়ায় আর টাট্টুতে মকুল—মাথার উপর রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে, কোথাও একটু ছায়া নেই, এরই মাঝে দুই ভায়ের ঘোড়া বিদ্যুতের মতো গোলার পিছনে পিছনে ছুটে ছুটে চলেছে—মুখে চোখে আগুনের মতো বাতাস লাগছে, দুই ভায়ের মুখ রক্তের মতো রাঙা হয়ে উঠেছে সূর্যের তাপে। আবার হয়তো কোনওদিন ঘোরতর মেঘ করে ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি নেমেছে—চণ্ড চলেছেন মকুলকে নিয়ে শিকারে—কাদা ভাঙতে ভাঙতে জলে ভিজতে ভিজতে, থই থই করছে নদীর জল, সাঁতার দিয়ে তা পেরিয়ে, বাড়ি থেকে অনেক দূরে গ্রাম ছাড়িয়ে অনেকখানি জঙ্গল আর জলার মাঝে। শীতের দিনে তাঁদের খেলা পাহাড়ে পাহাড়ে, সেখানে বরফের মতো বাতাস ধারালো ছুরির মতো বুকে এসে লাগে। এমনি করে মকুল মানুষ হচ্ছেন, দিন দিন শক্ত হচ্ছেন, তাঁর খাওয়া পড়া খেলাধূলা রাজার ছেলে বলে কিছু যে আরামের ছিল তা নয়—চণ্ড মেবারের একজন সামান্য রাজপুতের ছেলের সঙ্গে যে একদিন মেবারের সর্বময় কর্তা হবে তার কোনও বিষয়ে কিছু তফাৎ রাখলেন না, এমনই করে লখা রানা চণ্ডকে মানুষ করেছিলেন, আর ঠিক তেমনই

করে চণ্ড তাঁর ছোটো ভাইকে সিংহাসনের উপযুক্ত হবার, আপদে বিপদে দুঃখে-কষ্টে বীরের মতো নির্ভয়ে থাকবার জন্যে ছোটোবেলা থেকেই তৈরি করছেন। এটা কিন্তু মকুলের মায়ের ভালো লাগে না; তিনি চান গরমে মকুল পাখার বাতাসে, বাদলে ছাতার তলায় শীতে লেপতোষকের মধ্যে থেকে মোমের পুতুলটির মতো গোলগাল মোটাসোটা হয়ে উঠুক! এর জন্য মকুলকে আর কখনও কখনও চণ্ডকেও মহারানীর কাছে গঞ্জনা সইতে হয়। মকুল ছেলেমানুষ, মায়ের ধমকে কখনও রাগ করে, কখনও খানিক কাঁদে আবার একটু পরেই সব ভুলে যায়—চণ্ডের প্রাণে কিন্তু রানীর বাক্যবাণ তীরের মতো গিয়ে বাজে।

এক একদিন তিনি আপনার খুব প্রাণের যাঁরা বন্ধু বুড়ো বুড়ো সর্দার তাঁদের কাছে বলেন—'আর না, এখানে আর থাকা চলে না। সবাই বলে আমি আমার ভাইকে বশ করে নিয়ে নিজে রাজাগিরি করছি; সে যখন আমার হুকুমে ওঠে বসে, তখন আমিই হলেম সত্যি রাজা আর সে একটা সাক্ষিগোপাল—নামে মাত্র মেবারের রাজা। আপনারা আমায় ছুটি দিন, আমি অন্য রাজ্যে গিয়ে থাকি!' বুড়ো সর্দারেরা বলেন, 'এখনও সময় হয়নি, যুবরাজ, আরও কিছু দিন থাকো, মকুল আর একটু উপযুক্ত হয়ে উঠুক।'

চণ্ড চান কোনও সর্দারের হাতে মকুলকে মানুষ করাবার ভার দিয়ে বেরিয়ে পড়েন কিন্তু কোনও সর্দার সে ভার নিতে চাইলে তবে তো! তাঁরা কেবলই বলেন—আমরা মকুলের জন্য সব করতে প্রস্তুত কিন্তু যুবরাজ, তবু আমরা পর মাত্র, আপনি তার ভাই। চণ্ড আর কোনও জবাব দিতে পারেন না। বাপ থাকলে কেউ তো চণ্ডকে মকুলের জন্য কষ্ট নিতে বলত না; কিন্তু এখন ভাই যদি তাকে না দেখে তবে মকুলকে রাজা হবার মতো শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে মানুষ করে তোলে কে?

এমনি করে দিন কাটছে, ইতিমধ্যে একদিন—কালবৈশাখের রাত দুপুরে অন্ধকার দিয়ে বড়ো বড়ো সাদা মেঘ একখানার পর একখানা আস্তে আস্তে পুব থেকে পশ্চিমে চলেছে, মনে হচ্ছে যেন বড়ো বড়ো পাল তুলে আকাশের এপার থেকে ওপারে, অন্ধকারে পাড়ি দিচ্ছে একটির পর একটি নৌকা! একটি তারা নেই, একটু শব্দ নেই। চণ্ড সারাদিনের কাজ সেরে সেই দিকে চেয়ে আছেন ঘরের আলো নিবিয়ে একলাটি, রাজবাড়ির সবাই ঘুমিয়ে, কেবল চণ্ড জেগে একা। আজ চণ্ডের বুকের ভিতরে একটা বেদনা থেকে থেকে দুই পাঁজরের হাড়গুলো মোচড় দিয়ে দিয়ে যেন ভাঙতে চেষ্টা করছে! ব্যথা যে কিসের, বেদনা যে কতটা, চণ্ড তা বুঝতে পারছেন না; তাঁর কেবলই মনে হচ্ছে মকুলকে একবার কাছে ডাকি কিন্তু উঠতেও পারছেন না, ডাকতেও পারছেন না। অন্ধকারের মধ্যে একলাটি চুপ করে পড়ে রয়েছেন। চণ্ডের দেহমন সমস্ত অসাড় হয়ে মরে গেছে, কেবল তাঁর চোখ যেন জীবনের সব আলোটুকু টেনে নিয়ে প্রহরের পর প্রহর বর্ষা রাতের অন্ধকারে কি যেন সন্ধান করে ফিরছে! একটা ঝড় অনেকখানি ঠাণ্ডা হাওয়ার ধাক্কায় গাছপালা ঘরবাড়ি জলস্থল আকাশ দুলিয়ে চলে গেল, অনেকখানি বৃষ্টির জল ঝরঝর করে চারিদিকে ঝরে পড়ল, বিদ্যুৎ বাজ খানিক চমক দিয়ে ধমক দিয়ে চলে গেল; তারপরে মেঘ আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে এল, রাত্রি শেষের সঙ্গে রুপোর মতো সাদা আলো ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে এসে অন্ধকারকে ক্রমে ফিকে করে ভোরের একটি ছোটো পাখির গানের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই ফুটে উঠতে লাগল; ঠিক সেই সময় বাদলা দিনের সকাল বেলায় ফুটন্ত কচি আলোর মাঝখানে একখানি জলে ভরা মেঘ! চণ্ড দেখছেন, সে কিবা চোখ জুড়োনো শান্ত রূপ—যেন তাঁর মা! চণ্ড সেই মেঘের দিক থেকে আর চোখ ফেরাতে পারছেন না, সারারাত্রি অন্ধকারের মধ্যে তাঁর দুই চোখ যে এরই সন্ধানে, তাঁর মরা মায়ের সন্ধানে ফিরছিল, এতক্ষণে দেখা পেলেন; তাঁর বুকের বেদনা, টানা তার ছেড়ে দিলে যেমন, তেমনই কাঁপতে কাঁপতে একেবারে শান্ত হয়ে গেল। সেই সারারাতে বাদল দিয়ে ধোয়া মেঘ, সেই মায়ের চোখের জলে জলভরা সেই সকালের মেঘ, তারই দিকে চেয়ে চণ্ড ঘুমিয়ে পড়লেন।

এদিকে বেলা হয়েছে। রাজসভায় যাবার ঘণ্টা পড়েছে—মহারানী মকুলকে সাজগোজ করিয়ে বসে রয়েছেন এমন সময় মকুলের দাই এসে বললে, 'রানীমা, আজ সভা বসবে না; বড়োকুমার চণ্ডের শরীর খারাপ হয়েছে।' সেখানে মহারানীর বাপ রণমল্ল বসেছিলেন; তিনি বলে উঠলেন, 'কেন, বড়োকুমার নইলে রাজসভা বন্ধ থাকবে, রানা মকুল কি কেউ নয়?' দাই সে অনেকদিনের, চণ্ডকেও সে মানুষ করেছে—রণমল্লের কথায় কি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, রানী তাকে ধমকে বললেন, 'যা তোর তকরার করতে হবে না; বাবা এখুনি মকুলকে নিয়ে সভায় যাচ্ছেন; তুই সর্দারদের বসতে বলগে যা!'

মেবারের সিংহাসনে সেই দিন সূর্যবংশের কেউ না বসে, বসল কিনা পেটমোটা মাড়োয়ারি রণমল্ল নাতি

মকুলকে কোলে নিয়ে! লজ্জায় সর্দারদের মুখ লাল হয়ে উঠল! সেই সময় চণ্ড হঠাৎ ঘুমের থেকে চমকে উঠে চেয়ে দেখলেন আকাশে গ্রহণ লেগেছে, সূর্য একখানা কলঙ্ক ধরা তামার থালার মতো দেখা যাচ্ছে, আর সেই বুড়ি দাই তাঁর পায়ের তলায় বসে দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে।

সেদিন সভাভঙ্গের পর বর্ষাকালের আকাশের মতো মুখ আঁধার করে রাজপুত সর্দারেরা যখন চণ্ডের কাছে উপস্থিত, তখন চণ্ড তাঁদের হাত ধরে অনুরোধ করে বললেন, 'দেখুন, মহারানীমার ইচ্ছা নয় যে আমি আর মেবারের কোনও রাজকার্য চালাই, কাল রাত্রে একথা মহারানীমা নিজের মুখে স্পষ্ট করে বলেছিলেন, আজ সকালে তাঁরই হুকুমে মাড়োয়ারের রাজা রণমল্ল মকুলের দেখাশোনার ভার নিয়েছেন, এখন থেকে রাজ্যের কাজ তিনিই চালাবেন, আমার এখন ছুটি; মায়ের আদেশ আজ সকালে আমার কাছে পৌঁচেছে, মকুলকে আর এই বাপ্পার সিংহাসন আপনাদের জিম্মায় রেখে আমি এখনই বিদায় হব, আমার ঘোড়া প্রস্তুত।'

বুকের ভিতর কী বেদনা নিয়ে চণ্ড যে সারারাত কাটিয়েছেন তা আর কারও বুঝতে বাকি রইল না, তাঁরা কোনও কথা না কয়ে চণ্ডকে প্রণাম করে বিদায় হলেন।

চণ্ড তখন তাঁর দাই মাকে কাছে ডেকে চুপি চুপি বললেন, 'মকুলের যাতে ভালো হয়, তার কোনও বিপদ না ঘটে দেখবে; আমার ছোটোভাই রঘুদেও কৈলোরে আছে, আমি তার সঙ্গে দেখা করে মাণ্ডুর রাজার কাছে চললেম। মহারানীকে বলবে যদি কোনওদিন কোনও বিপদ আসে, রাজ্যে যদি কোনও গোলমাল হয় তবে আমি কাছেই রইলেম, আমাকে ডেকে পাঠালেই আবার আসব, আমার তলোয়ার মকুলের শত্রুর জন্যে আর মেবারের জন্যে আমার প্রাণ। দাই মা, এরা কি যাবার আগে মকুলকে একবার দেখতে দেবে না।'

দাই ঘাড় নেড়ে চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে লাগল; চণ্ড বুঝলেন ছোটো ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার কোনও উপায় নেই; তিনি একটি কথা না কয়ে যেমন সাজে ছিলেন তেমনই, কেবল তলোয়ারখানা কোমরে বেঁধে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেলেন—তখন মাথার উপরে দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। মকুল যখন শিকার খেলতে যাবার সময় তার দাদাকে খুঁজতে লাগল, তখন রানী বললেন, 'তোর দাদাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে, সে আর আসবে না।'

সারাদিন মকুলের চোখ ছল ছল করলে লাগল, সে শূন্য রাজপুরীতে কোথাও তার দাদাকে খুঁজে পেল না। রাত্রে যখন সবাই শুয়েছে তখন মকুল তার দাই মা'র গলা জড়িয়ে বললে, 'যে বাঘ দাদাকে মেরেছে তাকে আমি বড়ো হয়ে নিশ্চয় মারব; তলোয়ারের এক চোটে তার মাথাটা কেটে এনে তোমায় দেব, কেমন?'

দাই বললে, 'রানাসাহেব, আমি সেই বাঘটা ধরবার একটা দড়ির শক্ত ফাঁদ কালই বানিয়ে রাখছি—বাঘটাকে কিছুতেই পালাতে দেওয়া হবে না।'

মকুল খানিক চুপ করে বললে, 'দাই মা, বাঘটা দেখতে কেমন? আমি তো বাঘ দেখিনি, তাকে চিনতে পারব তো?'

'ঠিক চিনতে পারবে, নয়তো আমি চিনিয়ে দেব। তোমার ওই মাড়োয়ারি দাদামশায়ের মতো তার পেটটা মোটা আর ঠিক এমনই খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফও আছে।'

তার পরদিন সকালে যখন দাই মকুলকে সাজ পরিয়ে রাজসভায় তার বুড়ো দাদার কাছে দিতে গেল তখন রণমল্ল পাকা গোঁফে চাড়া দিয়ে চোখ পাকিয়ে তার দিকে চেয়ে বললেন, 'দাই, বাঘ ধরবার ফাঁদ তৈরি করতে সময় লাগবে, যে জন্য আজ থেকে তোমায় ছুটি দিলেম। আমার দেশের এক ভালো দাই সে-ই রানীর কাজ করবে, তুমি বসে বসে ফাঁদ বাঁধো গিয়ে জঙ্গলে।' দাই 'যো হুকুম' বলে খুব একটা বড়ো সেলাম রণমল্লকে দিয়ে মকুলকে বললে, 'রানাসাহেব, বাঘটাকে চিনে রেখো—ঠিক তোমার বুড়ো দাদার মতো গোঁফ-দাঁড়ি, ওমনি মোটা পেট আর বড়ো বড়ো দাঁত।' সভাসুদ্ধ লোক মুখ টিপে হাসতে লাগল। মকুল দুইচোখে একটা ভয় নিয়ে রণমল্লের দিকে চেয়ে এক দৌড়ে দাইয়ের কোলে গিয়ে উঠল।

দাই তার মুখে চুমু খেয়ে বললে, 'বেটা ডরো মাত, শেরকো দেখকে ভাগনা কভি নেহি, মার তলোয়ার কী চোট, কাট লে শির।' সভাসুদ্ধ লোকের মুখে হাসি চাপা থাকে না দেখে রণমল্ল কথাটা চাপা দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি একটা কাষ্ঠ হাসি হেসে দাইয়ের পিঠ চাপড়ে তার হাতে এক জোড়া সোনার বালা দিয়ে বললেন, 'ভাল ভালো, আমি খুব খুশি হলেম, এমনি করে মকুলকে সাহস দিয়ে এখন থেকে বাঘ শিকারে মজবুত করে তোলো; আজ থেকে তোমার তলব আরও দশ তনখা বাড়িয়ে দেওয়া গেল, মকুলজি বড়ো হওয়া পর্যন্ত তুমিই তার

তদারক করবে।' সভাসুদ্ধ লোক বুঝলে রণমল্লকে কেউ যদি জব্দ করতে পারে তবে সে দাই, আর রাজবাড়িতে তার মতো মকুলের বন্ধুও আর কেউ নেই। মেবারের সমস্ত রাজপুত সর্দার, যাঁরা রানীর খাতিরে রণমল্লকে ভয় করে একটি কথা কইতেন না, তাঁরা আজ এই দাইকে মনে মনে তার সাহসের জন্য তারিফ না করে থাকতে পারলেন না! রণমল্ল সেদিন মাথা হেঁট করে রাজসভা থেকে বিদায় হলেন।

চণ্ডের ছোটো ভাই রঘুবীর, কিন্তু মেবারের সবাই তাঁকে নাম দিয়েছিল রঘুদেব—রূপে গুণে তিনি ছিলেন বাস্তবিকই দেবতার মতো। নগরের বাইরে রাজ্যের গোলমাল থেকে অনেক দূরে একখানি সুন্দর বাগানঘেরা ছোটোখাটো পাথরের বাড়ি, তারই মধ্যে রঘুদেব একলা রাজার ছেলে হয়ে তপস্বীর মতো দীন দুঃখী কাঙাল নিয়ে থাকতেন। তাঁর মুখের কথা—সে যেন ছোটো বড়ো সবার মন গলিয়ে গানের মতো গিয়ে প্রাণে বাজত। রাজ্যে তাঁর শত্রু ছিল না—এমনকি যে মহারানী চণ্ডকে বিষদৃষ্টিতে দেখতেন তিনিও রঘুদেবকে গুরুর মতো ভক্তি, ভায়ের মতো ভালোবাসা দিয়েছিলেন।

আর মকুল—সে ছোড়দাদার মুখের গল্প, তাঁর সেই বাগানের ফল পেড়ে বনভোজন, গাছের পাখিদের বাসার খুব কাছে গিয়ে তাদের ছোটো ছোটো ছানাগুলিকে খাইয়ে আসা, গাছের ছায়ায় বসে বাঁশের বাঁশিতে রাখাল ছেলেদের কাছ থেকে গান শেখা, এই সব আনন্দের কথা কখনও ভুলবে না।

চণ্ড গিয়ে অবধি সে তার ছোড়দার কাছে যাবার জন্যে রোজ কাঁদছে, রানীর ইচ্ছে তাকে কিছুদিনের জন্যে সেখানে পাঠিয়ে দেন কিন্তু রণমল্ল কেবলই বাধা দিচ্ছেন। রানী একবার রঘুদেবকে রাজবাড়িতেই না হয় আনবার কথা বললেন, কিন্তু তাতেও আপত্তি! শেষে একদিন রণমল্ল স্পষ্টই বলে দিলেন যে, তাঁর হুকুম ছাড়া রঘুদেবের সঙ্গে দেখা কিংবা তাঁকে এখানে আনানো হতে পারবে না—রানীর সেইদিন চোখ ফুটল; তিনি বুঝলেন, রাজ্যের কাজে তাঁর আর কোনও হাত নেই, এই পাথরের রাজবাড়ির চারখানা দেয়ালের মধ্যে তিনি আর মকুল দু'জনকে বন্দীর মতো থাকতে হবে।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন খবর এল রঘুদেব মকুলকে দেখতে নগরে আসছিলেন, হঠাৎ মারা পড়েছেন; দেশের লোক হাহাকার করে বলছে রণমল্ল তাঁকে বিষ দিয়ে খুন করেছে, সমস্ত মেবার তার মূর্তি ঘরে ঘরে রেখে পুজো করছে আর মাড়োয়ারি শেয়ালরাজা আর তার দলবলকে খুনে, বদমাস, চোর বলে অভিসম্পাত দিচ্ছে। বুড়ি দাই রানীকে এসে বললে, 'এখনও যদি ভালো চাও তো চণ্ডজিকে খবর পাঠাও, না হলে তোমার মকুলের দশা কোন দিন রঘুদেওজির মতো হবে।'

কিন্তু খবর তাঁকে দেয় কে? যে চিঠি বইবে সে রণমল্লের লোক, আপনার লোক দিয়ে সে রাজ্যটা ভরিয়ে রেখেছে; তার চর রানীর অন্দরে ঘুরছে, তার অনুচর সর্দারদের বাসায় বাসায়, গ্রামে গ্রামে, প্রজাদের ঘরে ঘরে পাঠশালায়, মন্দিরে, মঠে! কে কোথায় কি করছে, কি বলছে, সব খবর পাচ্ছে সেই পেটমোটা মাড়োয়ারি রাজা রণমল্ল ডাকাতের সর্দার, চোরের শিরোমণি। নগরের ফাটকে ফাটকে কেল্লার বুরুজে বুরুজে তার চেলারা সব থানা বসিয়ে পাহারা দিচ্ছে দিন রাত। রাগে ভয়ে দুঃখে রানী অস্থির হয়ে পড়লেন, চারিদিক অন্ধকার দেখতে লাগলেন, চণ্ডকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তিনি কি ভুলই করেছেন, আজ সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে তাঁর বাকি রইল না। রানী বুড়ি দাই-এর দুই পা জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'হায়, আমার কি হবে?' যে রানী একদিন তাকে দূর দূর করে তাড়িয়েছিলেন আজ তাঁকে পা জড়িয়ে কাঁদতে দেখে বুড়ির চোখে জল এল। সে রানীকে শান্ত করে বললে, 'আমি খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করছি; কিন্তু রানীমা, তুমি খুব সাবধানে কাজ করবে যেন আমাদের মনের কথা কেউ না জানতে পারে। তোমার বাপ শুনতে পেলে বড়ো বিপদ হবে, তার মুঠোর ভিতর এখন সমস্ত রাজ্য, সে যদি গলা টিপে তোমার মকুলকে মেরে ফেলে, তবে ভয়ে কেউ একটি কথাও বলবে না।'

রানীর সঙ্গে কথা ঠিক করে দাই যেখানে বুড়ো রণমল্লটা সন্ধ্যোবেলা একটা ঘরে নিজের মতো মোটা একটা গের্দা ঠেস দিয়ে একরাশ মোহর গুনে গুনে চটের থলিতে ভরে ভরে রাখছেন ঠিক বড়োবাজারের মাড়োয়ারি এক একটা মহাজনের মতো, সেইখানে আস্তে আস্তে এসে উপস্থিত হল। দাইকে হঠাৎ আসতে দেখে বুড়ো মোহরগুলো দুই থাবায় কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'তবে—তবে অসময়ে কি মনে করে?'

'আজ্ঞে, একটু সামান্য কাজ ছিল, যদি এখন ব্যস্ত থাকেন তো পরে আসব।'

রণমল্ল দাইকে ভয় করতেন, ঠিক দপ্তরখানার দপ্তরি যেমন তার মনিবকে ভয় করে। রাজ্যের সবাই

তদারক করবে।' সভাসুদ্ধ লোক বুঝলে রণমল্লকে কেউ যদি জব্দ করতে পারে তবে সে দাই, আর রাজবাড়িতে তার মতো মকুলের বন্ধুও আর কেউ নেই। মেবারের সমস্ত রাজপুত সর্দার, যাঁরা রানীর খাতিরে রণমল্লকে ভয় করে একটি কথা কইতেন না, তাঁরা আজ এই দাইকে মনে মনে তার সাহসের জন্য তারিফ না করে থাকতে পারলেন না! রণমল্ল সেদিন মাথা হেঁট করে রাজসভা থেকে বিদায় হলেন।

চণ্ডের ছোটো ভাই রঘুবীর, কিন্তু মেবারের সবাই তাঁকে নাম দিয়েছিল রঘুদেব—রূপে গুণে তিনি ছিলেন বাস্তবিকই দেবতার মতো। নগরের বাইরে রাজ্যের গোলমাল থেকে অনেক দূরে একখানি সুন্দর বাগানঘেরা ছোটোখাটো পাথরের বাড়ি, তারই মধ্যে রঘুদেব একলা রাজার ছেলে হয়ে তপস্বীর মতো দীন দুঃখী কাঙাল নিয়ে থাকতেন। তাঁর মুখের কথা—সে যেন ছোটো বড়ো সবার মন গলিয়ে গানের মতো গিয়ে প্রাণে বাজত। রাজ্যে তাঁর শত্রু ছিল না—এমনকি যে মহারানী চণ্ডকে বিষদৃষ্টিতে দেখতেন তিনিও রঘুদেবকে গুরুর মতো ভক্তি, ভায়ের মতো ভালোবাসা দিয়েছিলেন।

আর মকুল—সে ছোড়দাদার মুখের গল্প, তাঁর সেই বাগানের ফল পেড়ে বনভোজন, গাছের পাখিদের বাসার খুব কাছে গিয়ে তাদের ছোটো ছোটো ছানাগুলিকে খাইয়ে আসা, গাছের ছায়ায় বসে বাঁশের বাঁশিতে রাখাল ছেলেদের কাছ থেকে গান শেখা, এই সব আনন্দের কথা কখনও ভুলবে না।

চণ্ড গিয়ে অবধি সে তার ছোড়দার কাছে যাবার জন্যে রোজ কাঁদছে, রানীর ইচ্ছে তাকে কিছুদিনের জন্যে সেখানে পাঠিয়ে দেন কিন্তু রণমল্ল কেবলই বাধা দিচ্ছেন। রানী একবার রঘুদেবকে রাজবাড়িতেই না হয় আনবার কথা বললেন, কিন্তু তাতেও আপত্তি! শেষে একদিন রণমল্ল স্পষ্টই বলে দিলেন যে, তাঁর হুকুম ছাড়া রঘুদেবের সঙ্গে দেখা কিংবা তাঁকে এখানে আনানো হতে পারবে না—রানীর সেইদিন চোখ ফুটল; তিনি বুঝলেন, রাজ্যের কাজে তাঁর আর কোনও হাত নেই, এই পাথরের রাজবাড়ির চারখানা দেয়ালের মধ্যে তিনি আর মকুল দু'জনকে বন্দীর মতো থাকতে হবে।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন খবর এল রঘুদেব মকুলকে দেখতে নগরে আসছিলেন, হঠাৎ মারা পড়েছেন; দেশের লোক হাহাকার করে বলছে রণমল্ল তাঁকে বিষ দিয়ে খুন করেছে, সমস্ত মেবার তার মূর্তি ঘরে ঘরে রেখে পুজো করছে আর মাড়োয়ারি শেয়ালরাজা আর তার দলবলকে খুনে, বদমাস, চোর বলে অভিসম্পাত দিচ্ছে। বুড়ি দাই রানীকে এসে বললে, 'এখনও যদি ভালো চাও তো চণ্ডজিকে খবর পাঠাও, না হলে তোমার মকুলের দশা কোন দিন রঘুদেওজির মতো হবে।'

কিন্তু খবর তাঁকে দেয় কে? যে চিঠি বইবে সে রণমল্লের লোক, আপনার লোক দিয়ে সে রাজ্যটা ভরিয়ে রেখেছে; তার চর রানীর অন্দরে ঘুরছে, তার অনুচর সর্দারদের বাসায় বাসায়, গ্রামে গ্রামে, প্রজাদের ঘরে ঘরে পাঠশালায়, মন্দিরে, মঠে! কে কোথায় কি করছে, কি বলছে, সব খবর পাচ্ছে সেই পেটমোটা মাড়োয়ারি রাজা রণমল্ল ডাকাতের সর্দার, চোরের শিরোমণি। নগরের ফাটকে ফাটকে কেল্লার বুরুজে বুরুজে তার চেলারা সব থানা বসিয়ে পাহারা দিচ্ছে দিন রাত। রাগে ভয়ে দুঃখে রানী অস্থির হয়ে পড়লেন, চারিদিক অন্ধকার দেখতে লাগলেন, চণ্ডকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তিনি কি ভুলই করেছেন, আজ সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে তাঁর বাকি রইল না। রানী বুড়ি দাই-এর দুই পা জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'হায়, আমার কি হবে?' যে রানী একদিন তাকে দূর দূর করে তাড়িয়েছিলেন আজ তাঁকে পা জড়িয়ে কাঁদতে দেখে বুড়ির চোখে জল এল। সে রানীকে শান্ত করে বললে, 'আমি খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করছি; কিন্তু রানীমা, তুমি খুব সাবধানে কাজ করবে যেন আমাদের মনের কথা কেউ না জানতে পারে। তোমার বাপ শুনতে পেলে বড়ো বিপদ হবে, তার মুঠোর ভিতর এখন সমস্ত রাজ্য, সে যদি গলা টিপে তোমার মকুলকে মেরে ফেলে, তবে ভয়ে কেউ একটি কথাও বলবে না।'

রানীর সঙ্গে কথা ঠিক করে দাই যেখানে বুড়ো রণমল্লটা সন্ধ্যেবেলা একটা ঘরে নিজের মতো মোটা একটা গের্দা ঠেস দিয়ে একরাশ মোহর গুনে গুনে চটের থলিতে ভরে ভরে রাখছেন ঠিক বড়োবাজারের মাড়োয়ারি এক একটা মহাজনের মতো, সেইখানে আস্তে আস্তে এসে উপস্থিত হল। দাইকে হঠাৎ আসতে দেখে বুড়ো মোহরগুলো দুই থাবায় কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'তবে—তবে অসময়ে কি মনে করে?'

'আজ্ঞে, একটু সামান্য কাজ ছিল, যদি এখন ব্যস্ত থাকেন তো পরে আসব।'

রণমল্ল দাইকে ভয় করতেন, ঠিক দপ্তরখানার দপ্তরি যেমন তার মনিবকে ভয় করে। রাজ্যের সবাই

রণমল্লের ভয়ে সারা কিন্তু রণমল্ল কাঁপেন দাইয়ের ভয়ে; তাই তিনি তাড়াতাড়ি দাইকে বললেন, 'না, না, আগে তোমার কাজটাই সেরে নিই।'

দাই তখন বললে, 'আজ্ঞে মকুলজির একটু ফরমাস আছে, তাঁর কবুতর পালবার শখ হয়েছে, তাই হুজুরের কাছে দরবার করতে এসেছি!' 'মকুলজি পায়রা ওড়াবেন' বলেই বুড়ো হোঃ হোঃ করে খানিক হেসে বললেন—'তা ভালো, এসব শখ ভালো—পায়রা ওড়ান, ছাগল পালুন এতে আপত্তি নেই; ঘোড়া চড়া, তলোয়ার খেলা এগুলো ছাড়লেই বাঁচি, রাজার ছেলে ও সব কেন? খান-দান ঘুড়ি ওড়ান, সুখে থাকুন আর'—দাই বলে উঠল—'আর রাজার ছেলের দাদামশায় বুড়ো মাড়োয়ারি সিংহাসনে বসে কেবল মোহরের তোড়া বাঁধুন?'

'ঠিক বলেছ দাই, আমি তোমার উপর খুশি আছি। মকুলকে তুমি এরকম পায়রা আর ঘুড়ি দিয়ে ভুলিয়ে রাখো আর দু'টো বছর, তারপর দেখা যাবে সিংহাসন আমার কাছ থেকে কেমন করে এরা কেড়ে নেয়! এই, নাও'—বলেই একটা মোহর বুড়ো অনেক কষ্টে থলি থেকে বের করে দাইয়ের হাতে দিতে গেলেন।

দাই হাত জোড় করে বললেন, 'আপনার মোহর আপনার কাছেই থাক, মকুলজির কবুতর কেনবার পয়সার অভাব নেই।'

'হ্যাঁ, তা কি আর আমি জানিনে! তার মায়ের হাতে অনেক টাকা আছে, তা যাও তোমরাই তবে কবুতর জোড়ার দাম দিয়ো। প্রজাদের খাজনা অনেক বাকি পড়েছে, এখন আমার হাতে একটি পয়সাও নেই'— বলেই বুড়ো আবার টাকা গুনতে লাগলেন। দাই একটা মস্ত সেলাম করে সেখান থেকে চলে গেল।

কেল্লার ছাদের এককোণে পাথরের একটা টানা বারান্দার কার্নিস খানিক ছায়া ফেলেছে, তারই তলায় একটি বাঁশের খাঁচায় দু'টি পায়রা সকাল বেলার দিকে চেয়ে গলা ফুলিয়ে চুপটি করে বসে আছে, এখনই মকুল এসে খাঁচাটি খুলে আকাশের আলোর মাঝে তাদের ছেড়ে দেবে এই আনন্দে তাদের সাদা রঙের ডানা দুখানি থেকে থেকে উলসে উঠছে। এমন সময় মহারানীর সঙ্গে দাই এসে পায়রা দু'টির ডানার নিচে দু'খানি ছোটো চিঠি বেঁধে দিয়ে আস্তে আস্তে আবার খাঁচার দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

তখনও সূর্যের আলো পৃথিবীতে এসে পড়েনি, রাজকুমার মকুল নরম বালিশের উপরে মাথাটি রেখে একটি হাত পুবের জানালার দিকে ছড়িয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে আছে মুঠোয় এক টুকরো কাগজ ধরে। রানী এসে তার ঘুম ভাঙিয়ে কোলে করে দাইয়ের কাছে দিয়ে বললেন, 'তুই এখনও ঘুমোচ্ছিস? বেলা হয়েছে, কখন আর তোর দাদার কাছে পায়রার গলায় বেঁধে চিঠি পাঠাবি?' মকুল কোনও কথা না বলে দাইকে টানতে টানতে এক ছুটে ছাদে এসে উপস্থিত হল। দাই হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'কই, মকুলজি তুমি যে বলেছিলে, চিঠঠি লিখে রাখবে, তা কই?' মকুল হাতের মুঠো খুলে দেখালে সেই হিজি বিজি লেখা কাগজখানি। দাই কাগজটি এপিঠ-ওপিঠ উলটে-পালটে বললে, 'বহুৎ আচ্ছা, চিঠিটি পড়ো তো শুনি কুমার সাহেব, কি লিখেছ।' মকুল জানত কেমন করে চিঠি পড়তে হয়, তাই সে গম্ভীর হয়ে আরম্ভ করল :

দাদা, আমি তোমার ছোটো ভাই, তোমার জন্য কাঁদছি, একবার এসো, খুব খেলা হবে, কবুতর দুটো চিঠি নিয়ে যাচ্ছে জবাব দিয়ো। এদের ছানা হলে তোমায় একটা দেব। আমি খুব ভালো আছি। ইতি—

মকুল
তোমার ছোটো ভাই

পুঃ—মা আর দাই তোমার জন্য খালি কাঁদে।

'চিঠি যেমন হতে হয়'—বলে দাই কাগজখানা নিয়ে বেশ করে মুড়ে বললে, 'তবে এখন কোন দাদাকে চিঠিখানা পাঠাতে চাও বলো।' এইবার মকুল মুশকিলে পড়ল, বড়োদাদা আর ছোটোদাদা দুই দাদার মধ্যে বেছে নেওয়া তার পক্ষে শক্ত হল, দুইজনকেই সে সমান ভালোবাসে, দুইজনকেই সে চিঠি লিখে ডেকে পাঠাতে চায়; কিন্তু হায়, চিঠি তার একখানি বই নেই! ভাবনায় তার মুখ শুকিয়ে গেল, তখন রানী আস্তে আস্তে তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'এক কাজ করো, আধখানা চিঠি বড়োদাদাকে, আর আধখানা ছোড়দাদাকে পাঠিয়ে দে।' তাই হল। প্রথম টুকরো ছোড়দাদার আর বাকিটুকু বড়োদাদার জন্যে ছিঁড়ে মকুল দাইয়ের হাতে দিল।

সাদা ডানা দুই পায়রা সেই দু'টুকরো কাগজ গলায় বেঁধে আকাশে উড়ল, ডানার তলায় লুকানো রইল মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে চণ্ডের কাছে রানী আর দাইয়ের দু'খানি চিঠি। সোনা মাখানো মেঘের উপর দিয়ে উড়ে চলছে দু'টি পাখি ছোটো বড়ো দু'জনের ডাক বয়ে, সূর্যের আভা আকাশ রাঙিয়ে তাদের দু'জোড়া

ডানার পালকে এসে ঠেকেছে সাদা পালে হাওয়ার মতো। চিতোরের কেল্লায় বন্দী অসহায় মকুল আর তার মায়ের ডাক সকালের সোনায় মাখা, দুপুরের রোদে পোড়া, সন্ধ্যার মেঘে আর আলোর চিত্র-বিচিত্র দিনের মধ্যে দিয়ে রাত্রির নীল গোলা অন্ধকার আকাশ পার হয়ে যেদিন মাণ্ডুর কেল্লায় চণ্ডের কাছে এসে পৌঁছল, সেদিন চণ্ড সব দুঃখ সব অপমান ভুলে অনেক দিনের কোণে রাখা তলোয়ার আর একবার কোমরে বেঁধে উঠে দাঁড়ালেন।

আজ তিনদিন ধরে একটা প্রকাণ্ড ঝড় রাজস্থানের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে—তারই মধ্যে এক একবার সকাল সন্ধ্যায় সূর্যদেব দেখা দিচ্ছেন রক্তমূর্তি! চণ্ড যখন চিতোর ছেড়ে চলে আসেন তখন তিনশো ভীল তাঁর সঙ্গে তীরধনুক নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। আজ তারা চণ্ডের হুকুম নিয়ে চিতোরে আবার ফিরছে ঝড়-জল-বিদ্যুতের মধ্যে দিয়ে।

চিতোর থেকে খানিকটা দূরে গো-সুন্দ নগর, পাহাড়ের উপর একটা মজবুত কেল্লা আর তাকেই ঘিরে ছোটো ছোটো বাড়ি, পাহড়ের নিচে অনেকখানি ঘন বন, তার মধ্যে দিয়ে ছোটো ছোটো নদী বয়ে চলেছে, এই বনে চণ্ড তাঁর দলবল নিয়ে লুকিয়ে রইলেন! কথা ঠিক হল যে, মহারানী সুন্দেশ্বরীর পুজো দেবার ছল করে মকুলজিকে নিয়ে এইখানে এসে দেওয়ালির দিন চণ্ডের সঙ্গে মিলবেন।

এদিকে চণ্ডের অনুচর যত ভীল মেবারের গ্রামে গ্রামে ঘুরে রটিয়ে দিয়েছে—রণমল্ল মকুলজিকে মেরে ফেলেছে। লোকে সব গ্রামে গ্রামে মাঠে-ঘাটে এই সব গুজব শুনে একেবারে ক্ষেপে উঠে লাঠি-তলোয়ার তীর-ধনুক নিয়ে চিতোরের দিকে দল বেঁধে চলেছে—যদি একথা সত্যি হয় তবে পেটমোটা মাড়োয়ারের রাজা রণমল্লকে আর আস্ত রাখবে না। রণমল্ল এই খবর পেয়ে ভয়ে কাঁপছেন, কি উপায় করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। সেই সময় একদিন দাই এসে তাঁকে বললে, 'হুজুরের মেজাজ ভালো বোধ হচ্ছে না, একটা খবর শুনে আমারও ভয়ে গা কাঁপছে; শুনেছেন দেশের লোক তাদের রানা মকুলকে দেখবার জন্যে লাঠিসোটা নিয়ে এই দিকে আসছে।' রণমল্ল খবরটা খুব ভালো করেই শুনেছিলেন তবু দাইকে ধমকে বললেন, 'যাও যাও, মাড়োয়ারের রাজা আর মেবারের এখনকার সর্বেসর্বা দু-দশগাছা লাঠির ভয়ে কাঁপে না, আর কিছু খবর থাকে তো বলো!'

দাই তখন চুপি চুপি বললে, 'এবারে যে দল আসছে বড়ো শক্ত দল, মেবারের রাজপুতকে আপনি চেনেন না, এই বেলা যা হয় উপায় করুন!'

রণমল্ল মনে ভয় কিন্তু মুখে সাহস দেখিয়ে বলে উঠলেন, 'কি উপায় করতে হবে শুনি?'

দাই বললে, 'মুকুলজিকে একবার গ্রামে গ্রামে শিকার খেলার জন্যে পাঠিয়ে দিন। লোকে দেখুক তাদের রানা বেশ সুখে বেঁচে আছে আর খেলে বেড়াচ্ছে। তাহলেই তারা ঠাণ্ডা হবে আর আপনাকে বিরক্ত করতে আসবে না।'

রণমল্ল খানিক গম্ভীর হয়ে থেকে বললেন, 'মন্দ পরামর্শ নয়, কিন্তু হাতিয়ার বেঁধে গ্রামে গ্রামে শিকার খেলে বেড়ানো তো হতে পারে না, শিকার থেকে লড়াই বাধতে কতক্ষণ? অন্য কিছু উপায় থাকে তো বলো।'

'তবে রানীমা আর মকুলজিকে পালকি চড়িয়ে গ্রামে গ্রামে দেবতাদের পুজো দেবার জন্যে পাঠিয়ে দিন, কাজ একই হবে।' এ পরামর্শটা রণমল্লের মনোমত হল, দাই রানীকে আর মকুলজিকে পালকিতে চড়িয়ে চিতোরের কেল্লা পার করে দিয়ে এল। যাবার সময় মকুল বললে, 'দাই মা, তুমি যাবে না?'

'না জি, বাঘ ধরবার সেই ফাঁদটা শেষ করে তবে আমি তোমার কাছে যাব'— বলেই দাই চিতোরের কেল্লায় ফিরে এল। গো-সুন্দ নগরে দেওয়ালির আজ ভারি ধুম, মহারানী রানাজিকে নিয়ে কেল্লায় এসেছেন, খুব ঘটা করে আজ সুন্দেশ্বরীর পুজো দেওয়া হবে। ঘরে ঘরে আজ প্রজারা পিদিম জ্বালিয়েছে, রাস্তায় রাস্তায় দোকানিরা ঝাড়লণ্ঠন ছবি আয়না দিয়ে দোকান সাজিয়ে বসে লোকের গায়ে কেবল গোলাপ জলের পিচকিরি দিচ্ছে। শহরের ছেলেগুলো রাস্তার মাঠে তুবড়ি পুড়িয়ে ছুঁচো বাজি ছেড়ে মকুলজির সঙ্গে যে সব ঘোড়সওয়ার এসেছে তাদের ঘোড়াগুলোকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে তামাশা দেখছে। ছেলে বুড়ো সবাই মিলে হাউই উড়িয়ে, চরকি ঘুরিয়ে ফুলঝুরি, রংমশাল, বোমা, দোদমা, ভুঁইপটকা, চিনে পটকা পুড়িয়ে খুব খানিকটা ধোঁয়া আর খুব খানিকটা আমোদ করে নিচ্ছে।

মকুলের আর আনন্দের সীমা নেই! এক সোনার সাজ পরা কালো ঘোড়ায় চড়ে তিনি শহরময় ঘুরে ঘুরে দেওয়ালির আলো দেখে বেড়াচ্ছেন। আর রানীমা, কেল্লার ছাদে একলা তিনি চুপ করে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন, যত রাত বাড়তে ততই তাঁর মনে হচ্ছে চণ্ড বুঝি এলেন না। আজ যে এই গো-সুন্দ নগরে দেওয়ালিতে রাতে তার দলবল নিয়ে আসবার কথা, কিন্তু কই? দেখতে দেখতে শহরের আলো নিবে এল; মকুল তাঁর ঘোড়া ফিরিয়ে কেল্লায় এলেন কিন্তু চণ্ডের আসবার কোনও লক্ষণ নেই, এই রাতের মধ্যে তাঁদের চিতোরে ফিরতে হবে,

আর তো সময় নেই, রানী অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে কাঁদতে লাগলেন, দুই চোখের জল তাঁর বুকের কাপড় ভিজিয়ে দিতে লাগল।

এদিকে সুন্দেশ্বরীর মন্দির থেকে ঢং ঢং করে রাত দশটার ঘণ্টা পড়ছে, লোকজন প্রস্তুত হয়ে চিতোর যাবার জন্যে পালকি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, মকুল রানীকে ডাকছেন যাবার জন্যে কিন্তু রানীর পা আর উঠছে না। তাঁর বুকের ভিতরে যেন হাতুড়ির ঘা দিয়ে অন্ধকারে ঘণ্টা বাজছে এক. দুই, তিন, চার। রাত দশটার ঘণ্টা বেজে থেমেছে—অন্ধকার আকাশ-বাতাস তারই শব্দের রেশায় এখনও রি রি করে কাঁপছে, ঠিক সেই সময় পাহাড়ের নিচে বনের মাঝ দিয়ে দশটা হাউই আগুনের সাপের মতো ফোঁস করে ফণা ধরে আকাশে উঠে দপ করে আলোর ফুল হয়ে আকাশময় ছিটিয়ে পড়ল—আলোয় চারিদিক দিন হয়ে গেছে, শহরের লোক আশ্চর্য বাজি দেখতে হই-হই করে রাস্তায় ছাদে যে যেখানে পেরেছে বেরিয়ে এসেছে! রানী মকুলের হাত ধরে বললেন, 'সময় হয়েছে, আর দেরি না, চল্।' মকুলের ইচ্ছা আরও খানিকটা ছাদে দাঁড়িয়ে বাজি দেখেন। কিন্তু রানী তাঁকে জোর করে ধরে পালকিতে ওঠালেন, আকাশের হাউই তাঁদের মাথার উপর লাল আলোর পুষ্পবৃষ্টি করে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল! মকুল পালকি থেকে আবার কখন হাউই ওঠে দেখবার জন্য মুখ বাড়িয়ে বসে রইলেন কিন্তু আকাশ যে অন্ধকার সেই অন্ধকারই রইল।

মকুল রাত্রির মধ্যে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে থেকে ঘুমিয়ে পড়েছেন, রানীর পালকি নির্জন মাঠের পথে আস্তে আস্তে চলেছে, মাটির উপর আটটা পালকি-বেয়ারার খসখস পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোনওদিক থেকে কোনও শব্দ রানীর কানে আসছে না। রানী অন্ধকারের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে চেয়ে রয়েছেন। একবার মনে হল যেন একদল লোক খুব দূরে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল, একবার দেখলেন রাস্তার ধারে একজন কে বল্লম হাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে—পালকি কাছে আসতেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। গো-সুন্দ নগরে সেই দশটার তারাবাজি দেখে রাণী চণ্ড এসে পৌঁচেছেন বুঝেছিলেন, তারপর থেকে কিন্তু চণ্ডকে স্পষ্ট করে দেখা এখনও তাঁর ঘটে ওঠেনি। চণ্ড যে তাঁর কাছাকাছি আছেন, সেটা কেবল এই ছায়া ছায়া রকম দেখেছিলেন!

রাত গভীর—পালকি চিতোরের কাছাকাছি এসে পড়েছে, দূর থেকে কেল্লার দেয়াল আকাশের গায়ে কালো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পাহাড় বেয়ে রানীর পালকি কেল্লার ফটকের দিকে উঠে চলল কিন্তু তখনও চণ্ডের কোনও দেখা নেই। ঘোড়ার পায়ের শব্দ কি তলোয়ারের ঝনঝন কিছুই শোনা যাচ্ছে না; রানীর বুক কাঁপছে, তাঁর চোখের সামনে কেল্লার ফটকের বড়ো দরজা দু'খানা আস্তে আস্তে খুলে গেল যেন একটা রাক্ষস অন্ধকারে মুখটা হাঁ করলে। আস্তে আস্তে রানীর পালকি কেল্লার মধ্যে ঢুকল, রানী একবার পালকি থেকে মুখ ঝুঁকিয়ে পিছনের দিকে দেখলেন ফটকের সামনে একদল ঘোড়সওয়ার খোলা তলোয়ার মাথায় ঠেকিয়ে তাঁর সঙ্গে কেল্লায় প্রবেশ করলে, তাদের সর্দার প্রকাণ্ড এক কালো ঘোড়ায়—মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার কালো সাজ নিমেষের মধ্যে এই ছবিটা রানী দেখতে পেলেন; চণ্ডকে চিনতে তাঁর বাকি রইল না। তারপর 'জয় মকুলজি কি জয়! জয় চণ্ডজি কি জয়!' শব্দে আকাশ কেঁপে উঠল, অমনি চিতোরের ছোটো বড়ো ছেলে-বুড়ো তলোয়ার খুলে রাজপথে রানীর পালকির চারিদিক ঘিরে নিয়ে রাজবাড়ির দিকে চলল। যত মাড়োয়ারি, যারা এতদিন বুক ফুলিয়ে রাজাগিরি ফলাচ্ছিল, সব আজ চণ্ডের নাম শুনেই ইঁদুরের মতো গর্তে গিয়ে লুকোলো, কারও এমন সাহস হল না যে রণমল্লকে গিয়ে খবরটা দেয়। আর খবর দিয়েই বা কি হবে? দেওয়ালির রাতে খুব করে সিদ্ধি খেয়ে রণমল্ল খাটিয়ায় পড়ে নাক ডাকাচ্ছেন। দাই একগাছি মোটা দড়ি দিয়ে খাটিয়ার সঙ্গে তাঁকে আচ্ছা করে বেঁধে ছাদের উপর থেকে তামাশা দেখতে গেল। রণমল্লের ভোজপুরি আর মাড়োয়ারি দারোয়ানগুলো ঢাল তলোয়ার বেঁধে তালপাতার সেপাইয়ের মতো কেবল হাত পা ছুড়তে লাগল, লড়াই দেবার আর সাধ্য হল না।

চণ্ড জোর করে তালা ভেঙে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন। গোলমালে রণমল্ল জেগে উঠে দেখেন তাঁর চারিদিকে খোলা তলোয়ার, নিজের হাত-পা বাঁধা; তাঁর সাহসও ছিল জোরও ছিল; হাজার হোক তিনি মাড়োয়ারের রাজা, আর তলোয়ার দেখে তাঁর সিদ্ধির ঘোরও কেটে গেছে। তিনি পিঠে বাঁধা খাটিয়াখানাসুদ্ধ দাঁড়িয়ে উঠে চণ্ডকে বললেন, 'আমার বাঁধন খুলে দাও, তারপর দেখা যাবে কে জেতে কে হারে! তুমি বীর, রাজার ছেলে—আমিও একটা দেশের রাজা, আমাকে জানোয়ারের মতো বেঁধে মারা তোমার উচিত হয় না।'

চণ্ড রণমল্লের বাঁধন খোলবার জন্যে ঘরে ঢুকবেন এমন সময় দাই ছুটে এসে বললে, 'সাবধান, ওকে একা পুড়ে মরতে দাও, সরে যাও, না হলে সবাই মরবে।' দুম করে একটা ভয়ঙ্কর আওয়াজ হয়ে ঘরের কোণে একরাশ

বারুদ জ্বলে উঠল, তারপর দাউ দাউ করে ঘরখানায় আগুন লেগে গেল! ছুঁচোবাজি দিয়ে ঘরখানা দাই যে কখন ভর্তি করে রেখেছিল কে জানে? ছুঁচোর মতো রণমল্ল পুড়ে মোলেন—'খুলে দে! খুলে দে!' বলে চিৎকার করতে করতে। যাকে রাজবাড়ির দাসী বলে তিনি ঠাউরে ছিলেন, তারই হাতের বাঁধা দড়ির বাঁধন শেষ পর্যন্ত আগুনের নাগপাশের মতো তাঁকে জড়িয়ে রইল।

কোথায় মেবার মাড়োয়ার দু'টো দেশ রণমল্ল দখল করে বসবেন, না এখন তার মাড়োয়ারের সিংহাসনটা পর্যন্ত মেবারের রানার হাতে এল। তাঁর ছেলে যোধরাও বাপের সিংহাসন হারিয়ে এখন সামান্য গুটিকতক সেপাই নিয়ে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে চলল, অনেক দূরে লুনী নদীর ওপারে।

মহাবীর হরোয়া শংকল রাজর্ষি—লুনি নদীর ওপারের সমস্ত পাহাড় নদী বন তাঁর রাজত্ব। তাঁর নামে সবাই মাথা নোয়ায় এমনই তাঁর বীরত্ব, এমনই তাঁর দয়া, তাঁর হুকুম অমান্য করে রাজস্থানে এমন লোক নেই। বিপদে যে পড়েছে তাকে উদ্ধার করা, দুঃখীর দুঃখ মোচন, অনাথকে আশ্রয় দেওয়াই তাঁর কাজ, তাঁর যত অনুচর সবাই সন্ন্যাসী বীর, গাঁজাখোর নয়, কাজের মানুষ। কেউ কারুর উপর অন্যায় অত্যাচার করলে তাদের হাতে নিস্তার নেই, বনের ভিতর পাহাড়ের গুহায় তাদের সব কেল্লা, সেখানে জালা জালা টাকা পোঁতা আছে, লোকে চাইলে সেই টাকা দিয়ে তাঁরা তাদের দুঃখ ঘোচায়। মাটির নিচে বড়ো বড়ো ঘর, সেখানে তাদের অস্ত্রশস্ত্র লুকনো থাকে, কেউ বিপদে পড়ে তাদের কাছে এলে সেই অস্ত্র দিয়ে তারা সাহায্য করে, এমনই দলের রাজা তিনি হরোয়া শংকল। লুনি নদী সাঁতার দিয়ে পার হয়ে যোধরাও রাত দুপুরে এসে তাঁরই আশ্রয় চাইলেন; যোধরাও জানতেন চণ্ডও ইচ্ছে করলে এখানে এসে গোলমাল করতে পারবেন না।

হরোয়া শংকল আদর করে যোধরাওকে বসালেন; তাঁর ছোটো ঘর, রাজকুমারের সঙ্গে অনেক সেপাই, কাজেই সবাইকে গাছতলায় বসাতে হল, সন্ন্যাসী রাজা একটু ভাবিত হলেন এত রাত্রে এত লোকের খাবার কেমন করে যোগাবেন, লোকেরাও অনেক পথ চলে এসে খিদেয় কাতর হয়ে পড়েছে! রাজর্ষি তাঁর দলবলকে ডেকে সকলের আহারের সুবন্দোবস্ত করে দিতে বললেন, কিন্তু ঘরে তাঁর একটু খুদও নেই; সেদিনের যা কিছু চাল ডাল সব তিনি অতিথিদের বিলিয়ে দিয়েছেন! বিপদে পড়ে চেলারা সব মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে দেখে রাজর্ষি বললেন, 'অতিথিকে তো খেতে দিতে হবে, এসো দেখি ঘরে কি আছে।' ঘরের এক কোণে সন্ন্যাসীদের কাপড় রাঙাবার জন্য এক রাশ মূঁজলতা বোঝা বাঁধা ছিল, রাজর্ষি সেইগুলি দেখিয়ে বললেন, 'যাও, এইগুলো রেঁধে আন।'

রাঁধুনি এক সন্ন্যাসী, সে হেসে বললেন, 'প্রভু, এইবার অতিথি সেবার ঠিক বন্দোবস্ত করেছেন। যে মুখে ঠাকুরের ভোগ খাবে সেই মুখে কাল সকালে দেশে ফিরে কাউকে এবার আর ঠাকুরের অতিথি সেবার নিন্দে করতে হবে না, এইবার ঠিক হয়েছে!'

রাজর্ষি হেসে বললেন, 'আজ আমি নিজের হাতে রাঁধব, তোমাদের সবাইকে নিয়ে এক সঙ্গে খাওয়া যাবে, নিমন্ত্রণ করছি, সব চেলাদের ডাক দাও।'

গাছের তলায় আগুন জ্বালিয়ে রান্না শুরু হল, রান্নার গন্ধে বন আমোদ করলে কিন্তু তরকারি দেখে অবধি চেলাদের আজ আর মোটেই খিদে নেই, যদিও সকালে এক এক মুঠো ছোলা ছাড়া এ পর্যন্ত কারও পেটে কিছু পড়েনি। কিন্তু, প্রভুর নিমন্ত্রণ কারও অগ্রাহ্য করার জো নেই। রান্না শেষ হলে সবাই অতিথিদের জন্যে পাতা পেড়ে অপেক্ষা করতে লাগল। আগে যোধরাও আর তাঁর লোকজনদের মোটা আটার রুটি আর মূঁজলতার সেই তরকারি খাইয়ে রাজর্ষি সব চেলাদের নিয়ে খেতে বসলেন, কেবল সেই রাঁধুনি চেলাকে অনেক ডাকাডাকি করেও কেউ আনতে পারলে না, সে কম্বল মুড়ি দিয়ে জঙ্গলের কোনখানে যে লুকিয়ে রইল তার আর সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। খাওয়া শেষ হলে সবাই রাজর্ষির রাঁধা তরকারির সুখ্যাতি করতে করতে যে যার জায়গায় শুতে গেল। মূঁজশাকের এমন যে রান্না হয় তারা কেউ জানত না, এবার থেকে রোজ এই তরকারি দিয়ে তারা রুটি খাবে এই সব বলাবলি করছে এমন সময় রাঁধুনি এসে উপস্থিত! সবার মুখে তরকারির তারিফ শুনে তার আর আপসোসের সীমা রইল না! সে ভেবেছিল ওই রঙ করবার পাতাগুলো খেয়ে সবাই মাথা ঘুরে মরবে কিন্তু দেখলে সবাই দিব্যি পেট ভরিয়ে আরামে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোতে লেগেছে, কেবল শীতের রাতে খিদের জ্বালায় সে-ই মরছে কেঁপে।

শীতের রাত সহজে কাটতে চায় না, রাঁধুনি ঠাকুরটিকে অনেক যন্ত্রণা দিয়ে তবে সে রাত পোহাল। সকালে উঠে সে একখানা কুড়ুল নিয়ে রান্নার কাঠ কাটতে চলেছে এমন সময় একজন বুড়ো মাড়োয়ারি সেপাইয়ের সঙ্গে দেখা; পাহাড়ের ঝরনার ধারে সে হাত-মুখ ধুচ্ছে, তার দাড়ি-গোঁফ সব লাল রঙের ছোপ ধরা। কাল সন্ধ্যায় যার

দাড়ি ছিল সাদা, আজ লাল হয়ে গেল। এ ব্যাপার দেখে রাঁধুনি ঠাকুরটি আর হাসি রাখতে পারলে না, হোঃ-হোঃ করে হাসতে হাসতে সঙ্গীদের কাছে এই মজার খবরটা দিতে এসে দেখে, যত পাকা দাড়ি-গোঁফওয়ালা ছিল তারা নিজের নিজের দাড়িতে হাত বোলাচ্ছে আর এ ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখছে সবার দাড়ি-গোঁফে লাল রঙের ছোপ। ইতিমধ্যে রাজর্ষি বেরিয়ে এলেন, তাঁর কিন্তু সাদা দাড়ি ধবধব করছে. মূঁজপাতার যে রঙ লেগেছে এটা কারুর মনে এল না; দাড়িতে রক্ত কোথা থেকে লাগল এই ভেবে সবার যখন ভয়ে মুখ শুকিয়ে এসেছে তখন রাজর্ষি সবাইকে অভয় দিলেন, 'নির্ভয়ে থাকো, তোমাদের সুখের সূর্য উদয় হতে আর দেরি নেই; দেখো না এখনই তার রাঙা আলো তোমাদের মুখে এসে পড়েছে; এখন কিছুদিন এইখানে বিশ্রাম করো, তোমাদের রাজত্ব ফিরে পাবার বন্দোবস্ত করা যাবে।' সেইদিন কাঠ কেটে রাঁধুনি ঠাকুর রাজর্ষিকে আর এক বোঝা মূঁজপাতা এনে দিয়ে বললে, 'ঠাকুর, আমাকে আজ একটু সেই তরকারি রেঁধে দিতে হবে।' রাজর্ষি হেসে বললেন, 'তোমার কালো দাড়িতে লাল রঙের ছোপ তো খুলবে না, আগে দাড়ি পাকুক তবে একদিন মূঁজশাকের চচ্চড়ির ছোপ ধরিয়ে দেওয়া যাবে, আজ ভালো করে অন্য তরকারি দিয়ে অতিথি খাওয়াবার বন্দোবস্ত করো।' রাঁধুনি ঠাকুরটি খেতে যেমন মজবুত রাঁধতেও তেমনই, আর রাজ্যের আজগুবি গল্প তার কাছে; যোধরাও আর তাঁর সঙ্গীদের বেশ আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটতে লাগল, বনে আছেন মনেই হত না।

'এদিকে হরোয়া শংকলের হুকুম চণ্ডের কাছে পৌঁছল—যোধরাওকে যেন মাড়োয়ারের সিংহাসন ফিরিয়ে দিয়ে ঝগড়াঝাঁটি সব মিটিয়ে নেওয়া হয়—এর উপর কোনও কথা নেই। চণ্ডের দুই ছেলে মুঞ্জজি আর কণ্ঠজি মাড়োয়ার শাসন করছিলেন; তাঁদের হুকুম হল যে হরোয়া শংকল কিংবা তাঁর কোনও লোক যোধরাওকে সঙ্গে নিয়ে আসামাত্র মাড়োয়ারের সিংহাসন যেন তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। হরোয়া শংকল দূতের মুখে এই খবর পেয়ে নিজেই যোধরাওকে সঙ্গে নিয়ে মেবারে চললেন। সেখান থেকে চণ্ডকে নিয়ে মাড়োয়ার যাবার কথা। ঠিক সময়ে সবাই মেবার পৌঁছে চণ্ডকে সঙ্গে নিয়ে যোধরাওর রাজত্বে মুন্দরের কেল্লার দিকে চললেন; যোধরাও তখন ছেলেমানুষ—একরাত্রে সবাই মাঠের মধ্যে তাঁবু গেড়ে আছেন এমন সময় একটা বুড়ো মাড়োয়ারি যোধরাওর কানে কানে বললে, 'দেশে তো এসে পড়েছি, তবে এখন আর চুপ করে থাকা কেন? চলুন, আজ রাত্রেই গিয়ে কেল্লাটা দখল করে বসি, নিজের সিংহাসন পরের কাছ থেকে চেয়ে না নিয়ে জোরসে কেড়ে নেওয়াই ভালো, কি বলেন?' যোধরাও এ কথায় সায় দিলেন, আস্তে আস্তে মাড়োয়ারি সৈন্য সব মুন্দরের দিকে বেরিয়ে গেল।

চণ্ড আর হরোয়া শংকল এ খবর কিছুই জানেন না, সকালবেলা শিবির থেকে বেরিয়েছেন এমন সময় দেখলেন দূর থেকে এক ঘোড়সওয়ার ছুটে আসছে—তার মাথার পাগড়ি খোলা, বুকের কাপড়ে রক্তের দাগ। সওয়ার যখন ছুটে এসে চণ্ডের কাছে দাঁড়াল তখন চণ্ড তাঁকে নিজের ছেলে কণ্ঠজি বলে চিনতে পারলেন। হরোয়া শংকল তাঁকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে ঘাসের উপর শুইয়ে দিলেন, অমনি কণ্ঠজির প্রাণ বেরিয়ে গেল। কে তাঁকে এমন করে মারল এই দেখবার জন্যে তাঁরা এদিক-ওদিক দেখছেন এমন সময় যোধরাও ঘোড়া ছুটিয়ে এসে বললেন, 'প্রভু, আমার অপরাধ যদি হয়ে হয়ে থাকে তো ক্ষমা করবেন। বাপের সিংহাসন আমি কারু কাছে ভিক্ষা বলে চেয়ে নিতে পারলুম না, নিজের জোরে ফৌজ পাঠিয়ে দখল করেছি, লড়াই শেষ হয়ে গেছে। চণ্ডজির হাতে আমার বাপ পশুর মতো মারা পড়েছে, তারই ধার তাঁর দুই ছেলেকে যুদ্ধে বীরের মতো মেরে শোধ দিলেম, এতে যদি আমার দোষ হয়ে থাকে তো শাস্তি দিন।' চণ্ডের মুখে কোনও কথা সরল না। হরোয়া শংকল খানিক ঘাড় হেঁট করে রইলেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'যোধরাও ভুল করেছ, চণ্ডের কোনও দোষ ছিল না, তুমি বালক বলে এবার তোমায় শাস্তি দিলেম না, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করো, আর কখনও মেবারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে না। আর এই মাটিতে যেখানে এই বীর কণ্ঠজি পড়ে রয়েছেন, এই পর্যন্ত মেবারের রাজ্যের সীমা ঠিক হল, এর পর থেকে তোমার রাজত্ব।'

চণ্ড চোখের জলের মধ্যে দিয়ে দেখলেন যেখানে তাঁর কণ্ঠজি প্রাণশূন্য দেহে পড়ে রয়েছে সেখানে সকালের আলোতে সমস্ত মাঠ জুড়ে সোনার ফুলের মতো আঁওলার কচি ফুল ফুটে উঠেছে। তিনি হরোয়া শংকলের দিকে চেয়ে বললেন, 'এই আঁওলার ফুলই যেন শান্তির ফুল হয়, যত দূর এই ফুল ফুটবে ততদূর যেন মেবারের রাজ্য এইটেই সবাই বলে। আমার কাজ শেষ হয়েছে, প্রভু আমাকে এখন আপনার সঙ্গী করে লুনি নদীর পারে তপোবনে আশ্রয় দিন।'

রাজর্ষি বললেন, 'তথাস্তু।'



রানা কুম্ভ

রানা মকুলের দুই খুড়ো ছিলেন—চাচা আর মৈর। যদিও দু'জনে রাজার ছেলে; কিন্তু তাঁদের মা ছিলেন কাঠুরের মেয়ে; সেইজন্য রানাদের চেয়ে তাঁরা মানে খাটো! মেবারের সিংহাসনেও বসবার তাঁদের কোনও উপায় ছিল না। আর সে চেষ্টাও তাঁরা করেননি—মকুল তাঁদের যথেষ্ট জমিজমা দিয়েছিলেন। মকুলজি যদি তাঁর দুই চাচাকে কেবল রাজসভার শোভামাত্র করে রেখে চুপচাপ থাকতেন, তবে আর কোনও গোলই হত না; তা না, একদিন দুই খুড়োকে সাতশো করে সেপাইয়ের সর্দার বানিয়ে দিয়ে যুদ্ধে পাঠিয়ে মকুল রানা একটু মজা দেখতে চাইলেন।

খুড়ো দু'জনের কাজের মধ্যে ছিল দিবারাত্র আফিং খেয়ে ঝিমানো। হঠাৎ সর্দার বনে গিয়ে লড়াইয়ে যেতে হলে, তাঁরা না জানি কি বিপদেই পড়বেন—কোথায় থাকবে আফিং, কোথায় বা তামাক? দুধের পুরু সর, রাবড়ি, মালাই সেখানে তো পাওয়াই যাবে না; উলটে বরং মাঠের হিম খেয়ে মরতে হবে! মাদেরিয়ার ভীলদের হাঙ্গামা মেটাতে গিয়ে মকুল এই তামাশা দুই খুড়োকে নিয়ে শুরু করলেন। অনেক দিন বেশ আমোদে কাটল। তামাশার সঙ্গে সাতশো সেপাইয়ের সর্দারের মাসোহারা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ ভাইপোটিকে আমোদ দিতে দুই খুড়োর আপত্তি হল না। কিন্তু ঠাট্টা তামাশা ক্রমেই একটু কড়া-নরম হতে লাগল। এমনকি, আফিংচি হলেও তামাশার খোঁচার দিকে চোখ বন্ধ করে ঝিমানো দুই খুড়োর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। কিন্তু ভাইপোর অনুগ্রহ ছাড়া বেচারাদের পেট চালাবার অন্য উপায় ছিল না; কাজেই মনের রাগ তাদের মনেই জমা হতে লাগল। আর কোনও কোনও দিন মুখ ফসকে বেরিয়েও আসতে শুরু করলে! এতে মকুলজির আমোদ আরও বেড়ে চলল বই কমল না। লোককে নিয়ে তামাশা করার নেশা লখারানার মতো মকুলেরও কম ছিল না! একদিন দুই চাচা তাঁকে স্পষ্ট মুখের উপর শুনিয়ে দিলেন যে বাপের তামাশার ফলে তিনি যে সিংহাসন পেয়েছেন নিজের তামাশার দোষে সেটা কোনদিন বা তাঁকে হারাতে হয়! চাচার মনের কথা এমন স্পষ্ট শুনেও মকুলের চোখ ফুটল না। খুড়োদের ক্ষেপিয়ে তিনি তামাশা করেই চললেন।

সেদিন বনের মধ্যে একটা গাছে হঠাৎ রাত্রের মধ্যে রাঙা ফুল এত ফুটে উঠেছে যে মনে হচ্ছে বনে কে আগুন ধরিয়ে গেছে! মকুল সেই গাছটা দেখিয়ে পাশের একজনকে গাছের নামটা শুধোলেন। সে ঘাড় নেড়ে বললে, 'গাছের খবর আমরা রাখিনে রানাসাহেব।'

মকুল তাঁর দুই খুড়োর দিকে চেয়ে বললেন, 'গাছটার নাম কি আপনারা জানেন চাচা?'

সাদা কথা। কিন্তু দুই খুড়ো বুঝলেন, তাঁদের মা ছিলেন কাঠুরের মেয়ে, কাজেই গাছের খবর তাঁদেরই কাছে

পাওয়া সম্ভব—এইটেই রানা ইশারায় জানালেন। মা যেমনই হোক, সে তো মা, তাকে নিয়ে তামাশা কোন ছেলে সইবে! সেইদিনই দুই বুড়ো মকুলের কাজে ইস্তফা দিয়ে সভা ছেড়ে শুকনো মুখে বিদায় হয়ে গেলেন। রানার দেওয়া সাজসজ্জা, অস্ত্রশস্ত্র, টাকাকড়ি, লোকলস্কর, হাতিঘোড়া সব পড়ে রইল; কেবল একটি মা হারা মেয়ে, যাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে দুই ভায়ে আপনাদের সব ভালোবাসা দিয়ে পুষেছিলেন, তাকেই কোলে করে সেপাই সর্দার সবার মাঝখান দিয়ে মাথা নিচু করে চলে গেলেন—একেবারে বন ছেড়ে।

দুই খুড়োর উপর কতটা অন্যায় হয়েছে, মকুল তখন বুঝলেন। মাপ চেয়ে দুই খুড়োকে ফিরিয়ে আনতে লোকের পর লোক গেল, কিন্তু দুই খুড়ো আর ফিরলেন না! অনুতাপে মকুল সারাদিন দুঃখ পেতে থাকলেন। নিতান্ত ভালোমানুষ নিরুপায় দুই খুড়োর শুকনো মুখ তাঁকে আজ কেবলই ব্যথা দিতে লাগল। তিনি সন্ধ্যাবেলা শিবির ছেড়ে একা বনের মধ্যে বেড়াতে গেলেন! সর্দারেরা রানার মনের অবস্থা বুঝে কেউ আজ সঙ্গে যেতে সাহস পেল না। সবাই তফাতে তফাতে রইল। বনের তলায় আঁধার ক্রমে ঘনিয়ে এল, আকাশে আর আলো নেই, এ সময়ে যখন চারিদিকে বিদ্রোহী ভীল, তখন রানাকে আর বনের মধ্যে একা থাকতে দেওয়া উচিত হয় না ভেবে যখন সব সর্দার বনের দিকে এগিয়ে চলেছেন, সে সময়ে মনে হল যেন অনেকগুলো শুকনো পাতা মাড়িয়ে অন্ধকারে কারা ছুটে পালাল। তারপরই সর্দারেরা দেখলেন, সেই রক্তের মতো রাঙা ফুলগাছের তলায় রানা মকুল পড়ে রয়েছেন; বুকের দুই দিকে দুটো বল্লমের চোট দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। রানা সন্ধ্যার মালা জপ করছিলেন, এখনও তাঁর ডান হাতের আগায় মালা জড়ানো। রানার মতো রানা ছিলেন মকুল—মেবারে হাহাকার পড়ে গেল। সবাই বলতে লাগল, এ কাজ সেই দু'টি খুড়োর না হয়ে যায় না। মাদেরিয়ার বনে বিদ্রোহীদের কেউ এসে যে রানাকে মেরে যেতে পারে এটা সবার অসম্ভব বোধ হল। পায়ীগ্রাম থেকে একটু দূরে পাহাড়ের উপরে রাতকোটের কেল্লা। সেইখানে এ গ্রাম সে গ্রাম ঘুরে চাচা আর মৈর অতি কষ্টে এসে পৌঁছলেন। ওদিকে মকুলের উপযুক্ত ছেলে রানা কুম্ভ, তাঁর সঙ্গে মাড়োয়ারের যোধরাও এসে মিলেছেন; গ্রামে গ্রামে পরগণায় পরগণায় তাঁদের লোক চাচা-মৈর—দুই ভাইকে ধরবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পায়ীগ্রাম চিতোর থেকে বহুদূরে। ক'ঘর ছুতোর-কামার, জনকতক জোতদার কিষাণ, বেশির ভাগই গরিব-গুর্বো। চাচা আর মৈর দু'জন সর্দার তাদের মধ্যে এসে ভাঙা কেল্লাটা দখল করে ধুমধাম লাগিয়ে দেওয়াতে প্রথমটা তারা খুব খুশি হল। প্রথম প্রথম দু'একবার তাদের সবারই পালাপার্বণে কেল্লাতে নিমন্ত্রণ, আনাগোনাও হল; কিন্তু যতই টাকার টানাটানি হতে লাগল, ততই দুই সর্দার হাত গোটাতে লাগলেন। শেষে এমন দিন এল যে দুই সর্দারের কথা কেউ আর বড়ো একটা মুখেই আনত না। আবার পাহাড়ের উপর ভাঙা কেল্লার দুই বুড়োর নামে নানারকম গুজব রটতে লাগল। কেউ বললে, তাদের অনেক টাকা; কেল্লার মধ্যে তারা সেই সব ধনদৌলত এনে পুঁতে রেখেছে; রোজ তিনটে রাতে পাহাড়ের একটা দিকে কে যেন লণ্ঠন নিয়ে উঠছে সে স্বচক্ষে দেখেছে। কেউ বললে, দুই সর্দার কেল্লার মধ্যেকার একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে দিল্লী যাওয়া-আসা করে, নবাবও মাঝে মাঝে কেল্লায় এসে নাচ-তামাশা খাওয়া-দাওয়া করেন, তার ভাই একদিন হাট সেরে ফেরবার সময় সারঙ্গীর আওয়াজ আর মেয়েমানুষের গান স্পষ্ট শুনেছিল। একজন কামার কবে কেল্লায় দু'একটা মর্চে ধরা দরজার খিল মেরামত করে এসেছিল, সে বললে, স্বচক্ষে দেখে এসেছে দুই বুড়োতে একটা আগুনের উপরে লোহার কড়া চাপিয়ে মুঠো মুঠো লোহাচুর ফেলছে, আর সেগুলো সোনা হয়ে উথলে পড়ছে। কড়াখানা কিন্তু মানুষের টাটকা রক্তে ভরা; দুটো কালো বাঘ সেই কড়াখানার চারিদিকে কেবল মাটি শুঁকে শুঁকে ঘুরছে।

রাতকোটের কেল্লা ক্রমে নানা আজগুবি ভয়ঙ্কর কাণ্ডের, ভয়ের আর তরাসের জায়গা বলে রটে গেল। ভয়ে সেদিক দিয়ে লোক আনাগোনাই আর করত না, দিনে-দুপুরে যেন তারা বাঘের গর্জন শুনতে থাকল, আর সন্ধ্যার সময় দেখতে লাগল—যেন কারা ঘোড়া পিঠে থলে বোঝাই টাকা নিয়ে চলেছে—ঝম্‌ঝম্।

দুই সর্দার মাসে-দু'মাসে একবার হাটে নেমে আসতেন, কাপড়-চোপড় আটা গম একটা খোঁড়া ঘোড়ার পিঠে বোঝাই দিয়ে আবার পাহাড়ের উপর কেল্লায় উঠে যেতেন। কিন্তু এই ঘটনা নিয়ে সারা গ্রাম হপ্তাখানেক ধরে সরগরম থাকত। সে নানা কথা—আটাওয়ালা দুই বুড়োকে আটা বেচে টাকার বদলে মোহর পেয়েছে। ঘি দশ সের, তার দাম কতই বা? বুড়োদের ঘি বেচার পরদিনই গোয়ালার স্ত্রীর গলায় হঠাৎ রুপোর হাঁসুলিটা দেখা যায় কেন? আর সেই কাপড়ের মহাজন, তার দোকান থেকে দু'টো বুড়ো কেন যে এত শাড়ি কেনে, সেটা প্রকাশ হয়েও হচ্ছে না, সে কেবল মহাজনটা রীতিমতো কিছু মেরেছে বলে! এদিকে গ্রামের ঘরে ঘরে এই চর্চা, ওদিকে

পাহাড়ের উপরে দুই বুড়োতে সেই কুড়োনো মেয়েকে তাদের সব ভালোবাসা দিয়ে আদর-যত্নে মানুষ করছে। মেয়েটি তাদের প্রাণ, সেই ভাঙা কেল্লা সেই মেয়ের হাসিতে, তার কচি গলার মিষ্টি কথায়, পাপিয়ার মতো তার গানের সুরে, দিন রাত ভরে রয়েছে। তার হাতে লাগানো ফুলের লতা ভাঙা দেয়াল বেয়ে উঠে সকাল-সন্ধ্যায় ফুল ফোটাচ্ছে, গন্ধ ছড়াচ্ছে রাজার ভয়ে দেশ ছাড়া এই দুটো বুড়োর জন্যে। একলা কেল্লায় এই তিনটি প্রাণী। আর আছে—এক পাহাড়ি কুকুর, দেখতে যেন বাঘ। সেই কুকুরই চাকর, দারোয়ান, সান্ত্রী, পাহারা—অজানা লোক যে হঠাৎ কেল্লায় ঢুকবে, তার যো নেই! শঙ্খচিল যেমন পাহাড়ের চূড়ায় বাসা বেঁধে বাচ্চা নিয়ে থাকে, তেমনই সাদা চুল দুই বুড়োতে সেই অগম্য পুরীতে আদরের মেয়েকে নিয়ে রয়েছেন—অনেকদিন ধরে। এমন সময় একদিন পায়ীগ্রামের দফাদারের সুন্দরী মেয়েটি হারাল। নদীতে ডুবে সে মরল, কি বাঘেই তাকে ধরলে কিছুই ঠিক হল না। কিন্তু সবাই ঠিক করলে যে ঐ বুড়ো সর্দার দু'টো সুন্দরী দেখে মেয়েটিকে চুরি করেছে। মেয়ের বাপ পাগলের মতো হয়ে, কাজকর্ম ছেড়ে দিনরাত রাতকোটের কেল্লার আশেপাশে ঘুরতে লাগল। তার নিশ্চয় বিশ্বাস সুন্দরিয়া তার ঐ কেল্লাতেই আছে। কেননা একদিন সকালে সত্যিই সে একটি মেয়েকে এলোচুলে পাহাড়ের পাকদণ্ডি বেয়ে বেড়াতে দেখেছে—খুব দূর থেকে যদিও কিন্তু সে যে তারই মেয়ে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। দফাদারকে সবাই পরামর্শ দিলে, 'যাও, রানা কুম্ভের কাছে নালিশ করো গিয়ে। তোমার মেয়েটি যে ভয়ানক লোকদের হাতে পড়েছে, কুম্ভ ছাড়া কারও সাধ্যি নেই তাকে ছাড়িয়ে আনে।' বুড়ো দফাদার চলল। মরচে ধরা তলোয়ার কোমরে বেঁধে, আর নিজের চেয়ে একটু বুড়ো এক ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে একলা চিতোরের দিকে চলল সে।

রাতকোট থেকে চিতোর কত দিনরাতের পথ তা কে জানে, দফাদার কিন্তু চলেছে। মেয়ের শোকে পাগলের মতো চলেছে; আর ফিরে ফিরে রাতকোটের কেল্লাটার দিকে তলোয়ার উঁচিয়ে গালাগালি পাড়ছে; এমন সময় পথের মধ্যে তিন ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে দেখা। কথায় কথায় দফাদারের মুখে মেয়েচুরির খবর শুনে তিনজনেই বললে, 'চলো, দফাদার সাহেব, এর জন্যে আর রানার কাছে যেতে হবে না। আমরাই তোমার মেয়েকে উদ্ধার করে সেই দুই বুড়োর দফা রফা করে আসছি, চলো!' শুনে দফাদার ঘাড় নেড়ে বলল, 'চেনো না সেই দুই বুড়োকে, তাই এমন কথা বলছ। মানুষের অগম্য স্থানে থাকে তারা। যদি কেউ সে কেল্লা মারতে পারে তো রানা কুম্ভ! পাহাড় বেয়ে সেখানে উঠতে হবে—রাস্তা নেই। বনে-জঙ্গলে দিনে বাঘ হাঁকার দিয়ে ফেরে। কেউ সেখানে যেতে পারে না; আর গেলেও ফিরতে পারে না এমনই ভয়ানক পাহাড়ের চুড়োয় রাতকোটের কেল্লা! আর তারই মধ্যে রাক্ষসের চেয়ে ভয়ানক দুই বুড়ো বসে!' বলে দফাদার হাউমাউ করে মেয়ের জন্যে কাঁদতে লাগল। তিন সেপাইয়ের মধ্যে সব ছোটো যে সেপাই, সে বললে, 'ভয় নেই, আমরা ঠিক সেখানে যাব, চলে এসো।' ছোটো সেপাইয়ের কথা শুনে দফাদার একটু চটে বললে, 'আমার কথায় বিশ্বাস হল না? আমি বলছি, সেখানে যাবার রাস্তা নেই!'

ছোটো সেপাই আর কেউ নয়, রানা কুম্ভ নিজে। চাচা আর মৈরকে সন্ধান করে শাস্তি দিতে চলেছেন। দফাদারের কথায় রানা হেসে বললেন, 'কেউ যদি কেল্লায় উঠতেই পারে না, তবে বুড়ো দু'টো তোমার মেয়েকে নিয়ে সেখানে গেল কোথা দিয়ে? রাস্তা নিশ্চয়ই আছে।' দফাদার আরও রেগে বললে, 'ওহে ছোকরা, রাস্তা থাকলে আমি কি সেখানে না উঠে এদিকে আসি? নিজেই গিয়ে বদমাস দু'টোর মাথা কেটে আমার মেয়েকে'—বলেই বুড়ো আবার কাঁদতে লাগল। তিন সেপাই তাকে ঠাণ্ডা করে পায়ীগ্রামে ফিরিয়ে আনলেন।

গাঁয়ের মধ্যে সামান্য সেপাই বেশে দফাদারের সঙ্গে রানা কুম্ভ যখন উপস্থিত হলেন, তখন সন্ধ্যা উতরে গেছে—আকাশে কালো মেঘ জমে ঝড়বৃষ্টির উপক্রম হচ্ছে। গাঁয়ে এসে রানা খবর পেলেন, কেল্লার উপরে যে বুড়ো দু'টি আছেন তাঁরা হচ্ছেন তাঁর বাপের খুড়ো—চাচা আর মৈর। রাগে কুম্ভ লাল হয়ে উঠে বললেন, 'চলো, আর দেরি নয়, এখনই সেই দু'টো পাপাত্মার উচিত শাস্তি দেব!' রানা কেল্লার মুখে ঘোড়া ছোটালেন দেখে সঙ্গের দু'টো সেপাইও চলল—পিছনে। দফাদার অন্ধকারে খানিক ওদের দিকে হাঁ করে চেয়ে থেকে 'পাগল! পাগল! বলে ঘাড় নাড়তে নাড়তে নিজের বাসায় খিল দিলে। সোঁ সোঁ ঝড় বইতে লাগল আর তার সঙ্গে বৃষ্টি নামল। এক একবার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তারই আলোয় দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের উপর রাতকোটের কেল্লা—কালো অন্ধকারে একটা ঢেউ যেন আকাশ জুড়ে স্থির হয়ে রয়েছে। ভিজে মাটিতে তিনটে ঘোড়ার পায়ের ছপ ছপ শব্দ হতে থাকল। রানা বললেন, 'ঘোড়া এইখানে ছেড়ে পায়ে হেঁটে চলো।' বনের মাঝে ঘোড়া বেঁধে তিন সেপাই পাহাড়ে চড়তে শুরু করলেন!

এদিকে পাহাড়ের উপরে ভাঙা কেল্লায় দু'টি বুড়ো আর তাঁদের সেই কুড়নো মেয়েটি একটি পিদিমের একটুখানি আলোয় মস্ত একখানা অন্ধকারের মধ্যে বসে গল্প করছেন; আর কেল্লার ফটকে সিংহের মতো কটা চুল প্রকাণ্ড শিকারি কুকুর হিঙ্গুলিয়া ভাঙা দরজার চৌকাঠে মস্ত থাবা দু'টো পেতে মুখটি বাড়িয়ে দুই কান খাড়া করে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে—কেউ আসে কিনা! ভিজে বাতাসে শিকারি কুকুরের কাছে রাতে ফোটা একটা বনফুলের গন্ধ ভেসে এল; তার পরেই কাদের পায়ের তলায় বনে কুটো-কাটা ভাঙার একটুখানি শব্দ হল। কুকুর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে আস্তে আস্তে বার হল—জঙ্গলের পথে। বনের মধ্যে ভিজে পাহাড়ের তাত উঠছে। অন্ধকারে দু'চারটে জোনাকি পোকা লণ্ঠন জ্বালিয়ে কি যেন কি খুঁজে বেড়াচ্ছে! কুকুর পাহাড়ের পাকদণ্ডির ধারে চুপটি করে দিয়ে দাঁড়াল। রাতের বেলায় অচেনা কাদের পায়ের শব্দ শুনে শিকারী কুকুরের চোখ দু'টো জ্বলছে। কুকুর সজাগ হয়ে বসে আছে। কিন্তু যারা পাহাড়ে উঠছে, তারাও কম সজাগ নেই—পাকা শিকারি পাকা যোদ্ধা রানা কুম্ভ, তাঁর চারণ, আর মাড়োয়ারের যোধরাও। জানোয়ারের চোখ জ্বলছে কোন ঝোপের আড়ালে, সেটা এরা জোনাকির আলো বলে ভুল করলে না। রানার হাতের ছুরি সাঁ করে গিয়ে বিঁধল হিঙ্গুলিয়ার বিশ্বাসী প্রাণটি ধুক ধুক করছে ঠিক যেখানে! শিকারীর ছুরিতে কেল্লার একটি মাত্র রক্ষক, দু'টি বুড়ো একটি কচি মেয়ের একমাত্র বন্ধু আর বিপদের সহায়—সেই সিংহের মতো হিঙ্গুলিয়া মরল—একটিবার কাতর স্বরে ডাক দিয়ে। সে যেন বলে গেল—'সাবধান।' ঝড়ের বাতাসে সেই শেষ ডাকছেড়ে দিয়ে কুকুর স্তব্ধ হল! রানার বড়ো ফূর্তি হয়েছিল যে তিনি কেল্লা নেবার মুখেই একটা সিংহ শিকার করলেন। সঙ্গীরাও বললেন, 'রানা, এ বড়ো সুলক্ষণ।' কিন্তু সেই ডাক যখন অন্ধকার চিরে পাহাড়ের চুড়োয় কেল্লার দিকে একটা কান্নার মতো ছুটে গেল, তখন সবার মুখ চুন হয়ে গেল। দেখলেন একটা কুকুর পড়ে আছে। তিনজন আস্তে আস্তে আবার চললেন। মনে কারু আর তেমন উৎসাহ রইল না।

ওদিকে সেই আঁধার ঘরের একটি পিদিম বাতাসে নিবু নিবু করছে; তাকেই ঘিরে তিনটি প্রাণী। বুড়ো চাচা গল্প বলছেন; তাঁর ছোটো ভাই আর এক বুড়ো ছেঁড়া কাঁথায় বসে ঝিমোচ্ছেন, আর একটি মেয়ে অবাক হয়ে শুনছে: 'আমরা দুই ভাই তখন খুব ছোটো। আমি চলতে শিখেছি আর ও তখন মায়ের কোলে কোলেই ফেরে। মা আমার হাত ধরে চললেন—এতটুকু ওকে বুকে করে। গাঁয়ের সবাই বলতে লাগল, তুই কাঠুরের মেয়ে, কবে রানা ক্ষেতসিং তোকে বিয়ে করেছেন, তা কি তাঁর মনে আছে? মিছে চিতোরে যাওয়া! মা ঘাড় নাড়লেন; তারপর আমরা ঘর ছেড়ে বার হলেম। আমাদের সেই ছোটো ঘরখানি, সেই সবুজ মাঠের ধারে সেই মস্ত তেঁতুল-তলার দিকে চেয়ে আমার মনটা কেমন কেমন করতে লাগল। আমি কেবলই ঘরের দিকে ফিরে চলতে চাইলেম! মা কিন্তু আর সেদিকেও চাইলেন না—সোজা চললেন আকাশ যেখানে মাটিতে এসে মিলেছে, বরাবর সেই দিকেই চেয়ে। সন্ধ্যা হলে পথের ধারে, কোনওদিন গাছতলায় কোনওদিন খোলা মাঠে মা আমাদের নিয়ে রাত কাটান। সকালে আবার চলতে আরম্ভ করেন। দুপুরে কোনওদিন কোনও গাঁয়ে আসি, সেখানে যা ভিক্ষে পাই, তাই খাই। কোনওদিন কিছু পাইও না, খাইও না! এইভাবে মা আমাদের চলেছেন—চিতোরের রানার দুঃখিনী কাঠকুড়োনি রানী! কতকাল পথে পথে কাটল তার ঠিক নেই! সারা বর্ষা চলে গেল—ভিজতে ভিজতে পথ চলতে চলতে! শীত এল। মাঠের দুরন্ত বাতাস রাতের বেলায় গায়ে যেন বরফ ঢেলে দিতে লাগল। ছেঁড়া কাঁথায় আমাদের জড়িয়ে নিয়ে মা সারারাত কাঁদতেন আর জাগতেন। আমাদের দুঃখিনী মা—রানী মা! আমি এক একদিন বলতেম, মা, ঘরে চলো। মা বলতেন, আর একটু গেলেই ঘর পাব। আমি সামনের দিকে চেয়ে দেখতাম, দূরে কেবল একটা ঝাপসা পাহাড়ের ঠাণ্ডা নীল ঢেউ! মা সেই নীলের দিকে চেয়ে চলতেন, আর এক একবার তাঁর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ত। এমনি সে কত দিন, কতদূরে চলে একদিন আকাশে আজকের মতো বাদল লাগল, বাতাস বইল, বিদ্যুৎ চমকাল; মেঘের ছায়া পড়ে সামনের পাহাড় সেদিন যেন কালো হয়ে কাছে এগিয়ে এসেছে বোধ হল, মা আমার পথের ধারে চুপটি করে ঘুমিয়েছিলেন, আমি তাঁকে জাগিয়ে দিয়ে বললেম, মা চেয়ে দেখো পাহাড়ের উপর কত বড়ো বাড়ি! মা একবার চোখ মেলে দেখে বললেন, ওই আমার ঘর! খানিক পরে আস্তে আস্তে আমায় বুকের কাছে টেনে নিয়ে একটি সোনার হার আমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'রানাকে এইটে দেখাস, তিনি তোদের ঘরে ডেকে নেবেন।'

বুড়ো চাচার চোখে জল ভরে উঠল। মেয়েটি বললে, 'তারপর ? কি হল ?

কারও মুখে কথা নেই। অনেকক্ষণ পরে চাচা উত্তর দিলেন, 'তারপর আর কি? রাজার রাজা যিনি, তিনি আমার দুঃখিনী মাকে ডেকে নিলেন—নিজের ঘরে!'

'আর তোমাদের?' মেয়েটি শুধাল।

চাচা আস্তে বললেন, 'আমরা গেলাম রানার সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে কত কাল কাটালেম সুখে-দুঃখে দুই ভাই একলা! অতবড়ো রাজবাড়ি, সেখানে মাকে কোথায় খুঁজে পাব? দু'জনে একলা থাকি আর মায়ের জন্যে কাঁদি—'

মেয়েটি ভারি ব্যস্ত হয়ে শুধালে, 'রানার ঘরে মাকে পেলে না?' চাচা ঘাড় নাড়লেন, 'না। কোথায় যে গেলেন মা, তা কেমন করে জানব? সে অনেক দিন পরে, দুই ভাই যখন বুড়ো হয়েছি, তখন একদিন সকালে উঠে রাজসভায় যাব, এমন সময় দেখলেম, পথের ধারে মা আমাদের এতটুকু একটি কচি মেয়ে হয়ে একলাটি দাঁড়িয়ে ঘরে যাব বলে কাঁদছেন। আমরা সেই অনেক দিনের হারানো মাকে ফিরে পেয়ে কোলে করে একেবারে ঘোড়া হাঁকিয়ে এই পাহাড়ে এসে উপস্থিত হলেম।' মেয়েটি শুধাল, 'রানা আবার কাঠকুড়োনি রানীকে কেড়ে নিতে এলেন না।' চাচা, মৈর দুজনেই বলে উঠলেন, 'খুঁজে পেলে তো রানা? আমরা এমন জায়গায় মাকে লুকিয়ে রেখেছি, রানার সাধ্যি কি, সেখান থেকে মাকে খুঁজে বার করেন!' গল্প শুনতে শুনতে মেয়েটির চোখ ঘুমিয়ে পড়ছিল। সে চাচার কোলে মাথা রেখে বললে, 'আমাকে একদিন তোমাদের মাকে দেখাবে?' চাচা আস্তে মেয়েটির চুলে হাত বুলিয়ে বললেন, 'আর একটু বড়ো হও, তারপরে সেই নিরালা ঘরে একটি পিদিম জ্বালিয়ে মা যেখানটিতে একলা বসে আছেন সেখানে আমরা সবাই মিলে চুপি চুপি চলে যাব।' মেয়েটি ঘুমের ঘোরে দরজার দিকে চেয়ে বললেন, 'হিঙ্গুলিয়া?' চাচার ভাই আফিমের ঝোঁকে মাথা দুলিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটাকেও সঙ্গে নিতে হবে।' যারা গল্প বলছিল, আর যারা শুনছিল, সবাই আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল। জেগে রইল কেবল একটি পিদিমের আলো—অন্ধকারের মাঝে যেন কষ্টিপাথর ঘষা একটুখানি সোনালি রঙ।

কোন সময়ে ঝড়-বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে, কেউ জানে না—কখন রানা কুম্ভ তলোয়ার খুলে ঘরে ঢুকেছেন, হঠাৎ একটা মেঘ গর্জনের সঙ্গে কড় কড়; করে বাজ পড়ল। তিনজনেই চমকে উঠে দেখলেন তিনখানা খোলা তলোয়ার মাথার উপর ঝকঝক করছে। রানা কুম্ভ ডাকলেন, 'ওঠো!' দুই বুড়োতে উঠে দাঁড়ালেন—মেয়েটির হাত ধরে। কুম্ভ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'রানাকে খুন করেছ, রাজপুতের মেয়েকে চুরি করে পালিয়ে এসেছ, এর শাস্তি আজ তোমাদের নিতে হবে!'

চাচা অবাক হয়ে বললেন, 'রানাকে?'

মৈর আস্তে আস্তে বললেন, 'মকুলজিকে?'

কুম্ভ বললেন, 'হ্যাঁ, তাঁরই খুনের শাস্তি এই নাও!' দু'খানা তলোয়ার একই সঙ্গে দুই বুড়োর মাথায় পড়ল। মেয়েটি 'মা'! বলে একবার ডেকে অজ্ঞান হল। ঝড়ের বাতাস কোথা থেকে হঠাৎ এসে ঘরের পিদিম নিভিয়ে দিলে! কুম্ভ জানলেন, তাঁর বাপের খুনের শাস্তি দিলেন, রাজস্থানের সবাই জানলে তাই, কেবল ক্ষেতসিংহের কাঠকুড়োনি রানীর দুই ছেলে, যাঁদের মাথা কাটা গেল, তাঁরাই জানলেন না, কেন রানা তাঁদের শাস্তি দিলেন! আর সেই মেয়েটি জানলে না দফাদারের ঘরে রাতারাতি কারাই বা তাকে রেখে গেল, আর কেনই বা সকালে গাঁয়ের লোক তাকে ঘিরে বলাবলি করলে—এ তো নয়, সে তো নয়! এমনি নানা কথা কয়ে সবাই মিলে সন্ধ্যাবেলা গাঁয়ের বাইরে, মাঠের ধারে কেন যে তাকে একা বসিয়ে দিয়ে সবাই যে যার ঘরে চলে গেল, আর কেনই বা সারারাত চাচা, চাচা, হিঙ্গুলিয়া, হিঙ্গুলিয়া বলে কেঁদে ডাকলেও কেউ সাড়াশব্দ দিলে না, আর সেই রাতকোটের কেল্লা অন্ধকারে কোথায় যে হারিয়ে গেল, খুঁজে খুঁজে চলে চলে পা ধরে গেল, তবু তো আর সেখানে সে ফিরতে পারলে না! —কেন? কেন?

তারপরে রানা কুম্ভ চিতোরের সিংহাসনে বসেছেন। তাঁর রানী মীরা দেখতে যেমন, গান গাইতেও তেমনই। রতিয়া রানার মেয়ে মীরা! তাঁর গান শুনে রূপ দেখে রানা কুম্ভ তাঁকে বিয়ে করেন। রানী স্বামীর সেবা করেন কিন্তু মন তাঁর পড়ে থাকে—রণছোড়জির মন্দিরে বাঁশি হাতে কালো পাথরের দেবমূর্তির পায়ের কাছে।

রানার কিন্তু এ ভালো লাগে না। তিনি নিজে কবি, গান রচনা করেন, আর সেই গান মীরা গায় রাজমন্দিরে বসে—এই চান রানা। কিন্তু সে তো হল না! মীরা দেবতার দাসী, তিনি রণছোড়জির মন্দিরেই সারা দিনমান ভক্তদের মধ্যে গাইতে লাগলেন, 'মীরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা!'

চিতোরেশ্বরী মীরা সবার মাঝে গান গাইবে একতারা বাজিয়ে, এটা ভারী লজ্জার কথা হয়ে উঠল। রানা হুকুম দিলেন, 'মন্দিরে বাইরের লোক আসা বন্ধ করো।'

একরাতের মধ্যে মন্দিরটা কানাতে ঘেরা হয়ে গেল। মীরাকে আর কেউ দেখতে পায় না কিন্তু তাঁর গানের সুর

শুনতে কানাতের বাইরে দেশ-বিদেশের লোক জড়ো হয়। বাঁশি শুনে হরিণ যেমন, তেমনই সবাই একমনে কান পেতে প্রাণ ভরে মীরার গান শুনতে থাকে—তাড়ালে যায় না, হুকুম শোনে না, কাউকে মানেও না।

জোছনারাতে মন্দিরের সামনে শ্বেতপাথরের বেদীতে বসে সোনা আর হীরেজড়ানো সাজে সেজে মীরা স্বর্গের অপ্সরীর মতো দেবতার সামনে একলা নাচছেন, গাইছেন, রানা বীণা বাজাচ্ছেন, বাইরে লোকের ভিড়, এমন সময় আকাশ থেকে তারার মালার মতো একগাছি হীরের হার মীরার গলায় এসে পড়ল। রানা চমকে উঠে বীণা বন্ধ করলেন, মীরা সেই অমূল্য হার নিজের গলা থেকে খুলে মন্দিরের মধ্যে বংশীধারী রণছোড়জির গলায় পরিয়ে দিয়ে সে রাতের মতো গান বন্ধ করলেন। হার যে কে দিয়ে গেল, তার আর খোঁজ হল না, কিন্তু দেশে নানা কথা রটল। কেউ বললে, দিল্লীর বাদশা দিয়ে গেছেন— কেউ বললে, কে এক উদাসীন, কেউ বা আরও কত কি! কিন্তু মীরা অমূল্য হার রানাকে না দিয়ে যে রণছোড়জিকে নিবেদন করে দিয়েছেন তাতে সবাই খুশি হল। ভক্তেরা মীরার জয়জয়কার দিলে! কিন্তু কুম্ভ রানা একটু চটলেন। তিনি হুকুম দিলেন, 'এবারে ভক্তেরা আসুন মন্দিরে আর মীরা থাকুন বন্ধ অন্দরে।' এই হুকুম দিয়ে রানা মহম্মদ খিলজির সঙ্গে লড়ায়ে চলে গেলেন। মীরার গান বন্ধ হল। সেই সঙ্গে চিতোর নিরানন্দ হয়ে গেল! মন্দিরে কাঁদে ভক্তেরা; অন্দরে কাঁদেন মীরা। নন্দলালার দেখা না পেয়ে বন থেকে ছিঁড়ে আনা ফুলের মতো মীরা দিন দিন মলিন হচ্ছেন, এমন সময় একদিন যুদ্ধ জয় করে ধুমধামে মহারানা চিতোরে এলেন। মামুদ শা-কে তাঁর মুকুটের সঙ্গে রানা চিতোরে বন্ধ রাখলেন। রাজ্যের কারিগর মিলে পাথর কেটে চিতোরের মাঝখানে প্রকাণ্ড জয়স্তম্ভ তুলতে আরম্ভ করলে। কিন্তু মীরার মন রানা জয় করতে পারলেন না; মীরা বললেন, 'রানা, আমি নন্দলালার দাসী, আমাকে ঘরে বন্ধ করো না। আমি শুনতে পাচ্ছি আমার নন্দলালা বাইরে থেকে আমাকে ডাকছেন—'মীরা আয়!' আমাকে ছেড়ে দাও রানা, আমি পথের কাঙালিনী হয়ে নন্দলালার সঙ্গে বৃন্দাবনে চলে যাই!' রানা রেগে বললেন, 'রতিয়া সামান্য সর্দার, তার মেয়ে তুমি! তোমার কপালে সিংহাসন জুটবে কেন? যাও বেরিয়ে—যেখানে খুশি—আমি নতুন রানী নিয়ে আসছি।' সেই দিন চিতোরেশ্বরী মীরা, নন্দলালার মীরা, ভিখারিণীর মতো একতারা বাজিয়ে পথে বার হলেন। আর রানা বার হলেন নতুন রানীর খোঁজে।

মন্দুর রাজকুমারের সঙ্গে ঝালোয়ারের রাঠোর সর্দারের মেয়ের বিয়ে, বর আসছে ধূমধাম করে, এমন সময় রাণা কুম্ভ এসে ঝলকুমারীকে সভার মধ্যিখান থেকে কেড়ে নিয়ে চিতোরে আনলেন। একে মহারানা, তাতে কুম্ভ, তাঁর উপর কথা কয় রাজস্থানে এমন তো কেউ নেই! কেবল বৃন্দাবনে মীরা যখন শুনলেন, মন্দুর রাজকুমারের মুখে, রানা দুই প্রাণীর ভালোবাসার উপরে কি বিষম ঘা দিতে প্রস্তুত হয়েছেন, তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। ঝলকুমারীর বরকে নিয়ে চিতোরে চললেন! রানার কাছে খবর পৌঁছল মীরা আসছেন। আর কেন আসছেন সেটাও শুনলেন কুম্ভ। রানা কড়া হুকুম দিলেন, 'ঝলোয়ান বাগানের মধ্যে ঝলকুমারীকে কড়া পাহাড়ায় যেন বন্ধ রাখা হয়!' তারপর কুম্ভ মীরাকে এক চিঠি পাঠালেন—চিতোরেশ্বরী মীরা, চিতোরেশ্বর তাঁকে পেলে সুখী হবেন। তিনি যা ভিক্ষা চাইতে এসেছেন, সেই স্ত্রী-রত্ন যেখানে বন্ধ আছে, সেই ঝলোয়ানের চাবিও রানা পাঠালেন! ইচ্ছা করলে বাগানের দরজা খুলে রানী মীরা ঝলকুমারীকে দেখে আসতে পারেন। কিন্তু মন্দুরের রাজকুমার যদিও বা কোনও উপায়ে ঝলোয়ানের বাগানে প্রবেশ করেন কুমারীর দেখা পাবেন না নিশ্চয়। কেননা, রানার অন্দরে রানীর ছাড়া কোনও পুরুষের যাবার হুকুম নেই। যদি যায়, তবে মাথা বাইরে রেখে যায় এটা জানা কথা!

তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আকাশে একটিমাত্র তারা; আর দূরে ঝলোয়ানের বাগানের মধ্যে, পাথরের রাজপ্রাসাদের উপরে একটি ঘরে একটি আলো জ্বলজ্বল করে জানাচ্ছে মন্দুরের রাজকুমারের উপরে ঝলকুমারীর জ্বলন্ত ভালোবাসা! ঠিক সেই সময় রানার চিঠি মীরা পেলেন! চিঠি পড়ে মীরা বুঝলেন, উপায় নেই। তিনি দু'টি কথা রানাকে লিখলেন—'প্রেম না করলরে, বিনা প্রেমসে প্রেম না মিললরে!' মীরা মন্দুরের রাজকুমারের হাতে ঝলোয়ানের চাবি দিয়ে চিতোর ছেড়ে চলে গেলেন, আর মন্দুর রাজকুমার ঝলকুমারীকে শেষ দেখা দেখে নিতে বাগানে ঢুকলেন—আলো নিশানার দিকে চেয়ে।

সেই রাতকোটের কেল্লায়, অন্ধকার রাতে দু'টি বুড়ো আর একটি কচি মেয়ের ভালোবাসার প্রদীপ যেমন করে হঠাৎ নিবেছিল, আজও আবার তেমনই করে রানা কুম্ভ নিজের অন্দরে ঝলকুমারীর ভালোবাসার প্রদীপটি তলোয়ারের চোটে নিভিয়ে দিয়ে সকালে রাজসভায় এসে বসলেন। কারিগর এসে জোড় হাতে বলল, 'মহারানার কীর্তিস্তম্ভ শেষ হয়েছে! স্তম্ভের নাম কি, জানতে চাই। পাথরে খোদাই করতে হবে।'

কুম্ভ রানা খানিক ভেবে বললেন, 'লেখোগে যাও—কুম্ভশ্যাম।'



সংগ্রামসিংহ

রানা কুম্ভ অনেক লড়াই করেছিলেন, অনেক দেশও জয় করে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন, কিন্তু ঝুনঝুনের লড়াই যেমন, তেমন আর কোনও লড়াই হল না। আর লড়াই ফতে হবার পর নাচ-তামাশা গান-বাজনা, আতসবাজি, আলো যেমন হতে হয়! একমাস, চিতোর শহর রাতে দিন হয়ে গেল। কিন্তু একটা কাণ্ড ঘটল। লড়াই জিতে আসবার পরদিন থেকে কুম্ভ হাতের তলোয়ার তিনবার মাথার উপর ঘুরিয়ে ফার্সি না আরবিতে কি জানি কি সাপের মন্তর না ব্যাঙের মন্তর আউড়ে তবে নিজের সিংহাসনে বসতে লাগলেন। শুধু এক আধ দিন নয়, এই কাণ্ড বরাবর চলল! রানা বুড়িয়ে গেলেন তবু তলোয়ার ঘোরানো আর মন্তর পড়া একটি দিন কামাই গেল না। রানার কাণ্ড দেখে সভাসুদ্ধ অবাক হয়ে যেত, কিন্তু কেন যে রানা এমন করেন সে কথা জানতে কেউ চেষ্টাও করত না। একবার রানার বড়ো ছেলে সভার মাঝে রানাকে শুধিয়েছিলেন—মাথার উপর তিনবার তলোয়ারখানা ঘোরাবার কারণটা কি, আর ওই সাপের মন্তরগুলোরই বা মানে কি? সেইদিন রানা কুম্ভ জবাব দিলেন, 'বারো ঘণ্টার মধ্যে চিতোর ছেড়ে চলে যাও, বাপ কি করেন, না করেন, সে খোঁজ ছেলের রাখবার কিংবা জানবার দরকার নেই।' তারপর তিনবার করে ঠিক নিয়মিত রানার তলোয়ার মাথার উপরে ফিরতে লাগল কিন্তু হুকুম আর ফিরল না। রানার বড়ো ছেলে রায়মল নির্বাসনে গেলেন, রইলেন কেবল ছোটো ছেলে সুরজমল আর মেজ ছেলে—তার নাম রাজস্থানে কেউ এখনও করে না—'ঘাতীরাও' 'হাতিয়ারো' এমনই নানা নামে সে লোকটাকে ডাকে। এই 'ঘাতীরাও' বিষ খাইয়ে বুড়ো রানা কুম্ভকে মেরে চিতোরের সিংহাসনে বসল। রাজপুত প্রজারা এই বিষম ঘটনায় একেবারে খাপ্পা হয়ে খুনের শোধ খুনই ঠিক বলে স্থির করে রায়মলকে আবার সিংহাসন দেবার ফন্দি করলে। দিল্লীতে তখন প্রথম পাঠান সুলতান বহলোললোদী। তাঁর সঙ্গে 'ঘাতীরাও' কুটুম্বিতা করে, নিজের মেয়ের সঙ্গে সুলতানের বিয়ে দেবার ফন্দি করে খুব শক্ত হয়ে চিতোরের সিংহাসনে বসে থাকার মতলব করছে, এমন সময় ইদর রাজ্য থেকে রায়মলকে রাজপুত সর্দারেরা খুঁজে বার করলেন। 'ঘাতীরাও' বড়ো বড়ো সর্দারদের বড়ো বড়ো জমিদারির লোভ দিয়েও নিজের দলে টানতে পারলে না। যে নিজের বাপকে খুন করতে পারে, রাজপুতের মেয়েকে পাঠানের বেগম করে দিতে চায়, তার দলে কোন রাজপুত থাকতে পারে? 'ঘাতীরাও' কাজেই গতিক খারাপ দেখে একদিন রাতারাতি সুলতানের দরবারে গিয়ে মেয়ের বিয়ের সব পাকা করে চুপি চুপি আবার চিতোরে এসে বসবার মতলবে ঘোড়া ছুটিয়ে একা আসছে, এমন সময় পথের মধ্যে বজ্রাঘাতে তার মৃত্যু হল।

এই অবসরে রায়মল চিতোর দখল করে বসলেন।

সুলতান বহলোল চিতোরের রাজকুমারীকে বিয়ে করতে এসে দেখলেন বাহান্ন হাজার সওয়ার আগে, এগারো হাজার পাইক সঙ্গে, রায় বাঘের মতো রায়মল তাঁকে ধরবার জন্যে পাহাড়ের উপর বসে আছেন। পাঠান সুলতান বিয়ে করতে এসেছিলেন বর সেজে, কিংখাবের লুঙ্গি কোমরে জড়িয়ে, জরির লপেটা ফেলে চম্পট দিলেন যেখান থেকে এসেছিলেন সেই দিল্লীতে!

রায়মল, তাঁর তিন ছেলে সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ, জয়মল আর একটি মাত্র ছোটো ভাই সুরজমল এই চারজনকে নিয়ে চিতোরে বসে রাজত্ব করতে থাকেন, সেই সময়ে একদিন—তখন রানা হয়েছেন বুড়ো, ছেলেরা হয়েছে বড়ো, দেশে রয়েছে শান্তি, আর সুখে রয়েছে রাজা-প্রজা সবাই—তখন প্রচণ্ড গরমকালে দুপুরবেলায় বাইরে আগুন হাওয়া, বুড়ো রানাজি ভীম তালাওয়ের মাঝখানে জলের উপর শ্বেতপাথরের তাওখানায় আরাম করছেন। রাজকুমার তিনজন ছোটোখুড়ো সুরজমলের বাগানবাড়িতে আড্ডা করেছেন আর তাস, দাবা, গোলাপ জলে ভিজানো খসখসের পাখা এমনই সব নানা কুড়েমি ও আয়েসির সরঞ্জামের মাঝে বসে এ গল্প সে গল্প চলেছে, কিন্তু বাইরে বইছে গরম বাতাস—এমন গরম যে পাহাড়গুলো পর্যন্ত ফেটে তো গেছেই, ঘরের মধ্যেকার দেয়ালগুলো থেকেও তাপ উঠছে। কাজেই ঘরের মধ্যে রাজকুমারেরা ঠাণ্ডা হতে চাইলেও বেশিক্ষণ ঠাণ্ডা রইলেন না।

এ কথায় সে কথায় ক'জনের মধ্যে কে কেমন বীর, কোন লড়াই কে ফতে করে কোন কোন পরগনা দখল করেছেন, প্রজারা কার নামে কি বলে, এমন নানা খুটিনাটি খিটিমিটি থেকে রাজসিংহাসন উচিত মতো কে পেলে প্রজারা সুখী হয়, দেশের ভালোও হয়—এই তর্ক উঠল! রানার মেজছেলে পৃথ্বীরাজ যেমন সুপুরুষ তেমন সাহসী; বড়োছেলে সঙ্গ দেখতে মোটেই রাজপুত্রের মতো নন—সাদাসিধে ছোটোখাটো মানুষটি ধীর-গম্ভীর বড়ো বড়ো টানা চোখ; ছোটোছেলে জয়মল কাটখোট্টা, মোটা সোটা যেন চোয়াড়ে গোছের, আর রানার ভাই সুরজমল খুব, সুপুরুষ নন খুব কদাকারও নন—অনেকটা বুড়ো রানারই মতো নাক-চোখ। তিন ভায়ে বিষম তর্ক বাধল সিংহাসন নিয়ে। পৃথ্বীরাজ বললেন, 'প্রজাদের হাতে যদি রাজা বেছে নেবার ভার পড়ে তো দেখে নিও আমাকেই রাজপুতেরা রাজা করবে।' জয়মল বলে উঠলেন, 'ওসব বুঝিনে। দেখছ এই হাতখানা। জোর যার মুলুক তার!' সঙ্গ, তিনি সবার বড়ো, একটুখানি হেসে বললেন, 'ভবানীমাতা যাকে সিংহাসন দেবার দিয়ে বসে আছেন, বিশ্বাস না হয়, চলো চারণীদেবীর মন্দিরে, গুনিয়ে দেখি কার অদৃষ্টে সিংহাসন লেখা রয়েছে।' সুরজমল তিনজনকে ধমকে বললেন, 'আঃ, এ সব কি কথা হচ্ছে? দাদা শুনলে রক্ষা থাকবে না। হয়তো তোমাদের সঙ্গে আমাকেও দেশছাড়া করবেন। সিংহাসন নিয়ে নাড়াচাড়া কেন বাপু! একি শতরঞ্চ না দাবা খেলা পেলে, যে এখনই রাজা উজির মারছ? নাও, একটু গোলাপজল মাথায় দাও, ঠাণ্ডা হও, থাক ওসব কথা।' কিন্তু বাইরের গরম তখন রাজকুমারদের মগজে চড়েছে, ঠাণ্ডা হবে কে! সবাই উঠে বললেন, 'চলো খুড়ো, থাক এখন ঠাণ্ডা হওয়া, চারণীর কাছে গণিয়ে আজ ঠিক করব সিংহাসনটি কার পাওনা।' বুদ্ধিমান সুরজমল দেখেন বিপদ—গেলে রাগেন দাদা, না গেলে রাগেন দাদার তিন পুত্তুর, তার মধ্যে একজন গুণ্ডা, আর একজন বেজায় সাহসী; কাজেই সুরজমল চললেন বলতে বলতে, 'শেষে দেখছি রাজত্বটা আমারই হবে, তোমরা তিন ভাই হয় দেশছাড়া হবে কালই দাদার হুকুমে, নয়তো দু'দিন পরে নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করে মরবে; বাকি থাকব আমি রাজ্যের ভোগ ভুগতে।'

পৃথ্বীরাজ বলে উঠলেন, 'সেইজন্যে তোমাকেও সঙ্গে নিচ্ছি, তোমারও কপালে কি আছে দেখা চাই তো?'

সুরজমল নিজের আর তিন ভায়ের কপালে এক একবার টোকা মেরে বললেন, 'গুণে দেখার প্রয়োজন নেই, আওয়াজেই বুঝেছি সব ফোঁপরা!'

উদয়পুর থেকে পাঁচ ক্রোশ হবে নাহরামুংরা। সেইখানেই এক পাহাড় তাকে বলে ব্যাঘ্রমেরু; তারই উপরে থাকেন চারণীমন্দিরের সিদ্ধিকরী যোগিনী। পাহাড়ের অন্ধকারে গুহার মধ্যে দেবীর দেউল। রাজপুত্রেরা দুরন্ত গরমে ঘোড়া ছুটিয়ে যখন মন্দিরে উপস্থিত হলেন তখন সন্ধ্যাপূজার যোগাড় করতে সিদ্ধিকরী বাইরে গেছেন, মন্দির খালি; তারই মধ্যে অন্ধকারে কালো পাথরের চারণীদেবীর ফটিকের তিনটে চোখ মাত্র দেখা যাচ্ছে, আর সামনে মস্ত একটা পাথরের চাতালে সন্ধ্যাবেলার আলো পড়েছে—রক্ত যেন ঢেলে দিয়েছে। সিদ্ধিকরীকে মন্দিরে না দেখে সুরজমল বলে উঠলেন, 'কেমন, বলেছিলাম তো কপাল ফোঁপরা! মন্দির খালি, এখন দেবীকে একটি করে প্রণাম দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে চলো।' পৃথ্বীরাজ ঘাড় নেড়ে বললেন, 'তা হবে না, এখানে বসতে হবে,

সুলতান বহলোল চিতোরের রাজকুমারীকে বিয়ে করতে এসে দেখলেন বাহান্ন হাজার সওয়ার আগে, এগারো হাজার পাইক সঙ্গে, রায় বাঘের মতো রায়মল তাঁকে ধরবার জন্যে পাহাড়ের উপর বসে আছেন। পাঠান সুলতান বিয়ে করতে এসেছিলেন বর সেজে, কিংখাবের লুঙ্গি কোমরে জড়িয়ে, জরির লপেটা ফেলে চম্পট দিলেন যেখান থেকে এসেছিলেন সেই দিল্লীতে!

রায়মল, তাঁর তিন ছেলে সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ, জয়মল আর একটি মাত্র ছোটো ভাই সুরজমল এই চারজনকে নিয়ে চিতোরে বসে রাজত্ব করতে থাকেন, সেই সময়ে একদিন—তখন রানা হয়েছেন বুড়ো, ছেলেরা হয়েছে বড়ো, দেশে রয়েছে শান্তি, আর সুখে রয়েছে রাজা-প্রজা সবাই—তখন প্রচণ্ড গরমকালে দুপুরবেলায় বাইরে আগুন হাওয়া, বুড়ো রানাজি ভীম তালাওয়ের মাঝখানে জলের উপর শ্বেতপাথরের তাওখানায় আরাম করছেন। রাজকুমার তিনজন ছোটোখুড়ো সুরজমলের বাগানবাড়িতে আড্ডা করেছেন আর তাস, দাবা, গোলাপ জলে ভিজানো খসখসের পাখা এমনই সব নানা কুড়েমি ও আয়েসির সরঞ্জামের মাঝে বসে এ গল্প সে গল্প চলেছে, কিন্তু বাইরে বইছে গরম বাতাস—এমন গরম যে পাহাড়গুলো পর্যন্ত ফেটে তো গেছেই, ঘরের মধ্যেকার দেয়ালগুলো থেকেও তাপ উঠছে। কাজেই ঘরের মধ্যে রাজকুমারেরা ঠাণ্ডা হতে চাইলেও বেশিক্ষণ ঠাণ্ডা রইলেন না।

এ কথায় সে কথায় ক'জনের মধ্যে কে কেমন বীর, কোন লড়াই কে ফতে করে কোন কোন পরগনা দখল করেছেন, প্রজারা কার নামে কি বলে, এমন নানা খুটিনাটি খিটিমিটি থেকে রাজসিংহাসন উচিত মতো কে পেলে প্রজারা সুখী হয়, দেশের ভালোও হয়—এই তর্ক উঠল! রানার মেজছেলে পৃথ্বীরাজ যেমন সুপুরুষ তেমন সাহসী; বড়োছেলে সঙ্গ দেখতে মোটেই রাজপুত্রের মতো নন—সাদাসিধে ছোটোখাটো মানুষটি ধীর-গম্ভীর বড়ো বড়ো টানা চোখ; ছোটোছেলে জয়মল কাটখোট্টা, মোটা সোটা যেন চোয়াড়ে গোছের, আর রানার ভাই সুরজমল খুব সুপুরুষ নন খুব কদাকারও নন—অনেকটা বুড়ো রানারই মতো নাক-চোখ। তিন ভায়ে বিষম তর্ক বাধল সিংহাসন নিয়ে। পৃথ্বীরাজ বললেন, 'প্রজাদের হাতে যদি রাজা বেছে নেবার ভার পড়ে তো দেখে নিও আমাকেই রাজপুতেরা রাজা করবে।' জয়মল বলে উঠলেন, 'ওসব বুঝিনে। দেখছ এই হাতখানা। জোর যার মুলুক তার!' সঙ্গ, তিনি সবার বড়ো, একটুখানি হেসে বললেন, 'ভবানীমাতা যাকে সিংহাসন দেবার দিয়ে বসে আছেন, বিশ্বাস না হয়, চলো চারণীদেবীর মন্দিরে, গুনিয়ে দেখি কার অদৃষ্টে সিংহাসন লেখা রয়েছে।' সুরজমল তিনজনকে ধমকে বললেন, 'আঃ, এ সব কি কথা হচ্ছে? দাদা শুনলে রক্ষা থাকবে না। হয়তো তোমাদের সঙ্গে আমাকেও দেশছাড়া করবেন। সিংহাসন নিয়ে নাড়াচাড়া কেন বাপু! একি শতরঞ্চ না দাবা খেলা পেলে, যে এখনই রাজা উজির মারছ? নাও, একটু গোলাপজল মাথায় দাও, ঠাণ্ডা হও, থাক ওসব কথা।' কিন্তু বাইরের গরম তখন রাজকুমারদের মগজে চড়েছে, ঠাণ্ডা হবে কে! সবাই উঠে বললেন, 'চলো খুড়ো, থাক এখন ঠাণ্ডা হওয়া, চারণীর কাছে গণিয়ে আজ ঠিক করব সিংহাসনটি কার পাওনা।' বুদ্ধিমান সুরজমল দেখেন বিপদ—গেলে রাগেন দাদা, না গেলে রাগেন দাদার তিন পুত্তুর, তার মধ্যে একজন গুণ্ডা, আর একজন বেজায় সাহসী; কাজেই সুরজমল চললেন বলতে বলতে, 'শেষে দেখছি রাজত্বটা আমারই হবে, তোমরা তিন ভাই হয় দেশছাড়া হবে কালই দাদার হুকুমে, নয়তো দু'দিন পরে নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করে মরবে; বাকি থাকব আমি রাজ্যের ভোগ ভুগতে।'

পৃথ্বীরাজ বলে উঠলেন, 'সেইজন্যে তোমাকেও সঙ্গে নিচ্ছি, তোমারও কপালে কি আছে দেখা চাই তো?'

সুরজমল নিজের আর তিন ভায়ের কপালে এক একবার টোকা মেরে বললেন, 'গুণে দেখার প্রয়োজন নেই, আওয়াজেই বুঝেছি সব ফোঁপরা!'

উদয়পুর থেকে পাঁচ ক্রোশ হবে নাহরামুংরা। সেইখানেই এক পাহাড় তাকে বলে ব্যাঘ্রমেরু; তারই উপরে থাকেন চারণীমন্দিরের সিদ্ধিকরী যোগিনী। পাহাড়ের অন্ধকারে গুহার মধ্যে দেবীর দেউল। রাজপুত্রেরা দুরন্ত গরমে ঘোড়া ছুটিয়ে যখন মন্দিরে উপস্থিত হলেন তখন সন্ধ্যাপূজার যোগাড় করতে সিদ্ধিকরী বাইরে গেছেন, মন্দির খালি; তারই মধ্যে অন্ধকারে কালো পাথরের চারণীদেবীর ফটিকের তিনটে চোখ মাত্র দেখা যাচ্ছে, আর সামনে মস্ত একটা পাথরের চাতালে সন্ধ্যাবেলার আলো পড়েছে—রক্ত যেন ঢেলে দিয়েছে। সিদ্ধিকরীকে মন্দিরে না দেখে সুরজমল বলে উঠলেন, 'কেমন, বলেছিলাম তো কপাল ফোঁপরা! মন্দির খালি, এখন দেবীকে একটি করে প্রণাম দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে চলো।' পৃথ্বীরাজ ঘাড় নেড়ে বললেন, 'তা হবে না, এখানে বসতে হবে,

আরতির পর হাত গুণিয়ে তবে ছুটি!' একদিকে একটা বাঘের ছাল পাতা ছিল আর একদিকে সিদ্ধিকরীর খাটিয়া, তার উপরে ছেঁড়া কাঁথা। পৃথ্বীরাজ তাড়াতাড়ি গিয়ে খাটিয়াতে বসলেন, দেখাদেখি জয়মলও উঁচুতে খাটিয়ায় বসল। বাঁশের খাটিয়া একবার মচাৎ শব্দ করেই চুপ করল। সঙ্গ গিয়ে বসলেন বাঘছালের উপর মাটিতে, আর সুরজমল বসলেন একটা হাঁটু বাঘছালে রেখে একেবারে আগুনের মতো তপ্ত পাথরের মেঝেয়।

ভর সন্ধ্যায় গুহার মধ্যে অন্ধকার বেশ একটু ঘনিয়ে এসেছে, সেই সময় প্রদীপ হাতে সিদ্ধিকরী গুহাতে ঢুকেই দেখেন চারমূর্তি। সঙ্গ উঠে সিদ্ধিকরীকে নমস্কার করে বসলেন। সুরজমলকে আর উঠতে হল না—তিনি যে মাটিতে বসেছিলেন, সেই মাটিতেই সাষ্টা হয়ে প্রণাম করলেন। পৃথ্বীরাজ খাটিয়া ছেড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘাড়টা নোয়ালেন, হাত দু'টো কপালের দিকে উঠেই আবার নেমে গেল; আর জয়মলটা উঠল না, নমস্কারও দিলে না, বসে বসেই বললে, 'মাতাজি, গণনা করে বলুন তো আমাদের মধ্যে কার কপালে চিতোরের সিংহাসনটা রয়েছে?' সিদ্ধিকরী কোনও উত্তর না দিয়ে কেবল নিজের কপালে হাত বোলাতে লাগলেন আর গেরুয়া কাপড়ের খুঁটে মুখ মুছতে থাকলেন দেখে পৃথ্বীরাজ বলে উঠলেন,—'ভাবেন কি? বড়ো জরুরি কথা। বেশ করে ভেবেচিন্তে গণনা করে উত্তর দেবেন।' সঙ্গ বললেন, 'আগে চারণীর পুজোটা ওঁকে সেরে নিতে দাও, পরে ওসব করো!'

'সেই ভাল।' বলে সিদ্ধিকরী পুজোয় বসলেন।

তারপর চারণীর সামনে একবার পিদিম নেড়ে ঘণ্টাটা বাজিয়ে গোটাকতক প্রসাদী গাঁদাফুল চারপুত্রের মাথায় পাগড়িতে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'রাজকুমারেরা একটা ইতিহাস বলি শোনো—পূর্বকালে উজ্জয়িনীনগরে একদিন মহারাজা বিক্রমাদিত্য রাজসভা ছেড়ে অন্দরে গিয়ে জলযোগ করতে বসলেন, এমন সময় লক্ষ্মী-সরস্বতী বিবাদ করতে করতে সেখানে উপস্থিত! মহারাজা তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে উঠে বললেন, 'দেবী আপনাদের কি প্রয়োজনে আগমন, দাসকে বলুন।' দুইজনেই রাজাকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'বৎস বিক্রমাদিত্য, তুমি তো রাজা, বিচার করো দেখি আমাদের দু'জনের মধ্যে কে বড়ো?' বীণা হস্তে সরস্বতী ঝংকার দিয়ে বললেন, 'আমি বড়ো, না ও বড়ো?' লক্ষ্মী বীণাপাণির ঝংকারের উপর অলংকার দিয়ে বললেন, 'এই আমি, না ওই ওটা, কে বড়ো?' রাজা দেখেন বড়ো গোলযোগ—এঁকে বড়ো করলে উনি চটেন ওঁকে খাটো করলে তিনি চটেন। রাজা দু'জনের মধ্যে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোচ্ছেন দেখে বিক্রমাদিত্যের ছোটো রানী বলে উঠলেন—'ঠাকরুণরা রাজাকে কিছু খেয়ে নিতে দিন, সারাদিন বিচার করে ওঁর এখন মাথার ঠিক নেই, সুবিচার করেন কেমন করে? আজকের রাতটা ওঁকে ভেবে ঠিক করতে দিন, কাল রাজসভায় ঠিক বিচার হয়ে যাবে দেখবেন।'

রাজা বললেন, 'এ পরামর্শ মন্দ নয়, কঠিন সমস্যা, একটু সময় পেলে ভালো হয়।' দেবীরা 'তথাস্তু' বলে বিদায় হলেন। রাজা জলযোগে বসে ছোটোরানীকে বললেন, 'দেবীদের আজকের মতো তো বিদায় করলে কিন্তু কালকের বিচারটা কি হবে কিছু ঠাউরেছ কি?' রানী ভিরঘুটি করে বললেন, 'বিচারের আমি কি জানি! তোমার সভায় নবরত্নের মধ্যে কেউ পণ্ডিত, কেউ কবি, কেউ মন্ত্রী, কেউ যন্ত্রী, তাঁদের শুধোও না। রাজা মাথা চুলকে সভায় প্রস্থান করলেন। সভার মধ্যে নবরত্ন হাজির—ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির, বররুচি। রাজার প্রশ্ন শুনে ন'জনেই মাথা চুলকোতে আরম্ভ করলেন; রাত্রি দুই প্রহর বাজল কিছুই মীমাংসা হল না, দুই দেবীর বিচার কি হিসাবে করা যায়? সরস্বতীকে বড়ো বললে চটেন লক্ষ্মী, রাজ্যপাট সব যায়; নবরত্নের মাসোহারাও বন্ধ হয়! আবার যদি বলা যায় সরস্বতী ছোটো, লক্ষ্মীই বড়ো, তবে বিদ্যে পালায়, বুদ্ধি পালায়, কালিদাসের কবিতা লেখা বন্ধ, ধন্বন্তরির চরকসংহিতা, বরাহমিহিরের পাঁজি পুঁথি, খনার বচন সবই মাটি। রাজাই বা কি বুদ্ধি নিয়ে রাজ্য চালান, হিসেব দেখেন, বিচার করেন? বিক্রমাদিত্য বিষম ভাবিত হয়ে অন্দরে এসে বিছানা নিলেন। রানী দেখেন রাজার নিদ্রা নেই, কেবল এপাশ-ওপাশ করছেন; যেন শয্যাকণ্টকী হয়েছে। তারপর—'

এমন সময় পৃথ্বীরাজ বলে উঠলেন—'ও গল্প তো আমরা জানি। দুই দেবীর একজন এসে বসেছিলেন স্বর্ণ-সিংহাসনে, অন্যে বসেছিলেন রুপোর খাটে— ছোটো বড়ো বিচার আপনি হয়েছিল। গল্প থাক, এখন দেখুন দেখি বিচার করে, আমাদের মধ্যে রাজা হবে কে?'

সিদ্ধিকারী একবার চারজনের দিকে চেয়ে বললেন, 'রাজকুমার, তোমরা নিজেই নিজের বিচার শেষ করে বসে আছ! সঙ্গ—যিনি বসে আছেন বাঘছালে বীরাসনে উনি ঠিক রাজার উপযুক্ত জায়গায় রয়েছেন—রাজ্যেশ্বর!

সুরজমল রয়েছেন মাটিতে—সঙ্গের কাছেই মাটিতে, কাজেই দেখা যাচ্ছে জমিতে ওঁর দখল, সিংহাসনের কাছাকাছি উনি থাকবেন— হয় মন্ত্রী, নয় সর্দার, নয় জমিদার! পৃথ্বীরাজ, জয়মল, তোমরা বসেছ সন্ন্যাসিনী যে আমি, আমার আসনে ছেঁড়া কাঁথায়, কাজেই ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে রাজ্যের স্বপ্ন দেখা ছাড়া তোমাদের অদৃষ্টে আর কিছুই নেই!' এই কথা বলেই সিদ্ধিকরী গুহার অন্ধকারের মধ্যে চলে গেলেন, চার রাজকুমারের চোখ বাঘের মতো কটমট করে এর ওর দিকে চাইতে থাকল!

সর্বপ্রথম সুরজমল কথা বললেন, 'তাহলে?'

'তাহলে সিংহাসন কার এখানেই স্থির হয়ে যাক আজই! বলেই পৃথ্বীরাজ তলোয়ার খুলে সঙ্গকে আক্রমণ করলেন। সঙ্গ ছুটে গুহার বাইরে যাবেন, তলোয়ারের কোপ পড়ল তাঁর একটি চোখের উপরে। চারণীদেবীর সামনে ভায়ের হাতে ভাইয়ের রক্তপাত ঘটল। সঙ্গ প্রাণভয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। একদিকে গেলেন সুরজমল; পৃথ্বীরাজ, জয়মল গেলেন আর একদিকে—এঁর পিছনে উনি তাঁর পিছনে তিনি; অন্ধকার ঢেকে নিলে চারজনকেই।

চারণীমন্দির থেকে প্রায় এক রাতের পথ রাঠোর সর্দার 'বিদা'র কেল্লার বুরুজের ধরনে কাঁচামাটির দেওয়াল ঘেরা খামার বাড়ি। ভোর হয়ে আসছে কিন্তু মেঘঢাকা আকাশে তখনও আলোর টান একটিও পড়েনি। উঠোনের মাঝে মস্ত তেঁতুল গাছটার আগায় পোষা ময়ূরটা ডানায় মুখ গুঁজে চুপ করে আছে! গাছের তলায় হালের গরু দু'টো মাটিতে পড়ে আরামে ঝিমোচ্ছে। কোথাও কোনও শব্দ নেই; কেবল সর্দারের ঘোড়া নিয়ে দরজার কাছে একটা ছোকরা রাজপুত দাঁড়িয়ে আছে, সেই ঘোড়া এক একবার ঘাড় নাড়ছে আর তারই মুখের লাগামে পরানো লোহার আংটা আর কড়াগুলো এক একবার আওয়াজ দিচ্ছে—টিংটিং ঝিনঝিন। বিদা দূরগ্রামে পুজো দিতে যাবেন, তাই ভোর না হতেই প্রস্তুত হয়ে ঘর থেকে বার হবেন, এমন সময় দূরে অন্ধকারের মধ্যে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল—কে যেন তেজে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। দেখতে দেখতে রক্তমাখা রাজকুমার সঙ্গ 'রক্ষা করো' বলে বিদায় দরজায় এসে ধাক্কা দিলেন। তাঁর একটা চোখের উপরে তলোয়ারের চোট পড়েছে, শরীরও অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত। বিদা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে রাজপুত্রকে দেখেই বলে উঠলেন, 'একি! এমন দশা আপনার কে করলে?' সঙ্গ দু'কথায় তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন—প্রাণ সংশয়, পৃথ্বীরাজ আর সুরজমল দু'জনেই অজ্ঞান হয়ে রাস্তার মাঝে পড়েছেন কিন্তু জয়মল এখনও পিছনে তাড়া করে আসছেন তাঁকে মারতে। বিদা সঙ্গকে তাঁর নিজের ঘোড়া দিয়ে বললেন, 'রাজকুমার, ভিতরে গিয়ে বিশ্রাম করুন, পরে নতুন ঘোড়ায় অন্য গ্রামে রওনা হবেন।' ওদিকে জয়মল আসছেন একটা ঝড়ের মতো—মাঠের উপর দিয়ে। সঙ্গের ইচ্ছা তখনই তিনি পলায়ন করেন, কিন্তু রাজভক্ত বিদা কিছুতেই তাঁকে ছাড়তে চায় না কিছু না খাইয়ে দাইয়ে। ওদিকে বিপদ ক্রমে এগিয়ে আসছে! সঙ্গ ইতস্তত করছেন দেখে বিদা বললেন, 'কোনও ভয় নেই, আপনি ভিতরে যান। নিশ্চিন্ত হয়ে একটু বিশ্রাম করে যতক্ষণ না আপনি খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন ততক্ষণ জয়মলকে এই দরজার চৌকাঠ পার হতে হবে না, আমি তাকে ঠেকিয়ে রাখব।' তাই হল। সঙ্গের নতুন ঘোড়া সূর্যোদয়ের সঙ্গে পুবমুখে অনেক দূরে ছোটো একটা কালো ফোঁটার মতো আস্তে আস্তে দূর মাঠের একেবারে শেষে বনের আড়ালে মিলিয়ে গেছে, সেই সময় তিনঘণ্টা ধস্তাধস্তির পরে বিদাকে মেরে তবে জয়মল বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন সঙ্গ চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর অকর্মণ্য ক্ষতবিক্ষত ঘোড়াটা উঠোনের মাঠে তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে খানিক শুকনো ঘাস চিবুচ্ছে আরামে। জয়মল রাজভক্ত রাজপুতবীরের রক্তে রাঙা হাতখানি দিয়ে নিজের কপাল চাপড়ে হতাশ মনে প্রাণশূন্য বিদার দিকে খানিক চেয়ে রইলেন—তারপর ঘাড় নিচু করে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন।

এদিকে সকাল হয়ে গেল, কোন অজানা গাঁয়ের কিষানরা সকালে খেতে যেতে যেতে পথের ধারে দেখলে রক্তমাখা দুই রাজকুমার সুরজমল আর পৃথ্বীরাজ। সবাই মিলে ধরাধরি করে রাজপুত্রদের ডুলিতে তুলে গাঁয়ে নিয়ে রাখলে। এদিকে মহারানারও লোকজন—তারাও বেরিয়েছে সন্ধানে ঘোড়া পালকি সব নিয়ে, রাজকুমারদের ফেরাতে, কিন্তু কেবল পৃথ্বীরাজ সুরজমল দু'জনকে তারা সন্ধান করে ফিরে পেল, আর দু'জন যে কোথায় তার খবরই হল না।

পৃথ্বীরাজ রানীদের যত্নে আস্তে আস্তে সেরে উঠলেন, সুরজমলের চোট বেশি, অনেক তদবিরে তিনি সুস্থ হলেন।

মহারানা চার কুমারের ব্যাপার শুনে একদিন পৃথ্বীরাজকে ডেকে বললেন, 'এই যে ঘটনা ঘটেছে, এর জন্যে তুমিই দায়ী। সঙ্গ একেবারে নির্দোষ। সে কোথায় আছে, কি নেই, কিছুই জানা যাচ্ছে না; বেঁচে থাকে তো তোমারই

ভয়ে সে কোথায় লুকিয়ে আছে। মনে করো না তোমাকে আমি চিতোরে বেশ আরামে বসিয়ে রাখব, আর আমি চোখ বুঝলেই আস্তে আস্তে সিংহাসনে তুমি উঠে বসবে। আজই তুমি ঘোড়া অস্ত্র যা তোমার ইচ্ছে হয় নিয়ে বিদায় হও। লড়তেই চাও তো বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে না লড়ে পার তো রাজ্যের শত্রুদের জব্দ করোগে, তবে বুঝব তুমি বীর—যাও।'

ছেলের উপর এই হুকুম দিয়ে সুরজমলকে রানা ডেকে বললেন, 'তুমি সঙ্গকে বাঁচাতে চেয়েছিলে সেই জন্যে তোমাকে শাস্তি দেব না, আজ থেকে তুমি আমার আত্মীয় সারংদেবের ওখানে গিয়ে থাকো, চিতোরমুখো হয়ো না।'

সুরজমল তো নির্বাসনে যান।

এখন পৃথ্বীরাজ বার হলেন চিতোর ছেড়ে দিকবিজয়ে। তিনি জানতেন মহারানার কাছে যদি কখনও ক্ষমা পান তো সে বীরত্ব দেখিয়ে, মেবারের শত্রুদের শাসন করে তবে। রানা রাগলেও, প্রজারা পৃথ্বীরাজকে সত্যিই ভালোবাসত, কাজেই তাঁকে একেবারে একলা পড়তে হল না! দু'একজন করে ক্রমে একটি ছোটোখাটো দল তাঁর সঙ্গে জুটল, যাদের কাজই হল এখানে-ওখানে লড়াই করে বেড়ানো। এমনই এদেশে-সেদেশে দল নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে পৃথ্বীরাজের যা কিছু টাকাকড়ি সম্বল ছিল গেল ফুরিয়ে। শেষে এমন দিন এল যে দিনের খোরাক, তাও জোটানো ভার! এখন একটা ছোটোখাটো রাজ্য জয় করে না বসতে পারলে আর উপায় নেই। এই অবস্থায় পৃথ্বীরাজ একদিন নিজের হাতের একটা মানিকের আংটি গদাওয়ারের উঝা নামে এক জহুরির কাছে বাঁধা দিয়ে কিছু টাকা আনতে পাঠালেন। এই উঝাই একদিন ঐ আংটিটা পৃথ্বীরাজকে অনেক টাকায় বেচেছিল; আংটি দেখেই জহুরি তাড়াতাড়ি টাকাকড়ি নিয়ে যেখানে পৃথ্বীরাজ ছদ্মবেশে সামান্য লোকের মতো একটা সরাইখানায় দিন কাটাচ্ছিলেন সেইখানে উপস্থিত হয়ে বললে, 'এ কি দেখছি রাজকুমার! টাকার দরকার ছিল তা একটু লিখে পাঠালে হত, আংটিটা বাঁধা দিয়ে বাজারে কেন বদনাম কিনছেন?' পৃথ্বীরাজ উঝাকে চুপিচুপি বুঝিয়ে বললেন, 'ওই আংটি ছাড়া আমার এমন কোনও সম্বল নেই যে তোমার টাকা দেব, তাছাড়া আংটি তো একদিন না একদিন পেটের দায়ে বেচতেই হবে। আমার কতগুলি সঙ্গী দেখছ তো! এদের শুকনো মুখে আধপেটা তো রাখতে পারিনে!' পৃথ্বীরাজের দুঃখের কহিনী শুনে উঝার চোখে জল এল। সে দুইহাত জোড় করে বললে, 'কুমার, এই নিন টাকা! আমি আংটি চাইনে। আমি আপনার প্রজা, মহারানার নুন চিরকাল খাচ্ছি।' পৃথ্বীরাজ উঝাকে নিজের বুকে টেনে নিয়ে বললেন, 'ভাই, আজ যেন তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে, কিন্তু এর পরে কি হবে?' উঝা পৃথ্বীরাজকে চুপিচুপি বললে, 'দেখুন মীনা সর্দারের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এই দেশটা আপনি দখল করে বসুন। রাজ্যের একটা শত্রুও নাশ হবে, আপনারও মান বাড়বে।'

পৃথ্বীরাজ ছদ্মবেশে সেই দিনই গিয়ে মীনা সর্দারের কাজে দলবল নিয়ে ভর্তি হলেন। রাজস্থানের মীনারা জংলি, দুর্দান্ত জাত; লুটপাট করাই তাদের কাজ। এদেরই রাজা মীনারায় নাম নিয়ে সমস্ত গদাওয়ার শাসন করছে। মহারানাকেও সে তুচ্ছ করে, নদালা বলে একটা গ্রামে তার আড্ডা। পৃথ্বীরাজ তাঁর পাঁচটি সঙ্গী—যশ, সিন্ধিয়া, সঙ্গমদেবী, অভয় আর জহ্নুকে নিয়ে এই দুর্দান্ত মীনাকে জব্দ করার মতলব করলেন। আহেরিয়া পরব রাজস্থানে একটা মস্ত আনন্দের দিন। সেইদিন চাকর-মনিব সব এক হয়ে শিকার, বনভোজন—এমনই নানা আমোদে দিনরাত মত্ত থাকে। সে আনন্দের দিনে মীনারায় বড়ো বড়ো মীনাকে নিয়ে বনের মধ্যে যখন তাড়ি খেয়ে আনন্দ করছে, সেই সময় নিজের দলবল সমেত পৃথ্বীরাজ তাকে আক্রমণ করে তাদের ঘর-দুয়ার জ্বালিয়ে ছারখার করে দিলেন। রাজা কাটা পড়ল। মীনারা যারা বাকি রইল, বন-জঙ্গলে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করলে। উঝাকে পৃথ্বীরাজ গদাওয়ারের শাসনকর্তা করে নিজের ধার শুধে আবার দিকবিজয়ে বার হলেন—রীতিমতো ফৌজ আর রসদ সঙ্গে।

এদিকে জয়মল, তিনি ঘুরতে ঘুরতে, বেদনোরে গিয়ে হাজির। সে সময় বেদনোরে টোডার রাজা রায় শূরতান সিং পাঠানদের উৎপাতে রাজ্যসম্পদ সব হারিয়ে নিজের একমাত্র কন্যা পরমাসুন্দরী তারাবাইকে নিয়ে মহারানার আশ্রয়ে বাস করছিলেন। তারাবাই যেমন সুন্দর, তেমনই বুদ্ধিমতী, গুণবতী, তেজস্বিনী। কত রাজপুত্র তাঁকে বিয়ে করতে চায় কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞা পাঠানদের হাত থেকে যে বাপের সিংহাসন উদ্ধার করবে, তাকেই বিয়ে করবেন। জয়মল বেদনোরে এসে এই খবর শুনলেন; একদিন তারাবাইকেও দেখলেন—ঘোড়ায় চড়ে ধনুর্বান হাতে শিকারে চলেছেন—যেন দেবী দুর্গা! জয়মল টোডা রাজ্য উদ্ধার করে দেবেন বলে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখে শূরতানের কাছে ঘটক পাঠালেন। শূরতান সিং জয়মলকে খুব খাতির করে নিজের বাড়িতে স্থান দিলেন। কিন্তু দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস, জয়মল পাঠানদের সঙ্গে লড়তে যাবার নামও করেন না; উলটে বরং হঠাৎ রাতারাতি শূরতানকে মেরে

ভয়ে সে কোথায় লুকিয়ে আছে। মনে করো না তোমাকে আমি চিতোরে বেশ আরামে বসিয়ে রাখব, আর আমি চোখ বুঝলেই আস্তে আস্তে সিংহাসনে তুমি উঠে বসবে। আজই তুমি ঘোড়া অস্ত্র যা তোমার ইচ্ছে হয় নিয়ে বিদায় হও। লড়তেই চাও তো বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে না লড়ে পার তো রাজ্যের শত্রুদের জব্দ করোগে, তবে বুঝব তুমি বীর—যাও।'

ছেলের উপর এই হুকুম দিয়ে সুরজমলকে রানা ডেকে বললেন, 'তুমি সঙ্গকে বাঁচাতে চেয়েছিলে সেই জন্যে তোমাকে শাস্তি দেব না, আজ থেকে তুমি আমার আত্মীয় সারংদেবের ওখানে গিয়ে থাকো, চিতোরমুখো হয়ো না।'

সুরজমল তো নির্বাসনে যান।

এখন পৃথ্বীরাজ বার হলেন চিতোর ছেড়ে দিকবিজয়ে। তিনি জানতেন মহারানার কাছে যদি কখনও ক্ষমা পান তো সে বীরত্ব দেখিয়ে, মেবারের শত্রুদের শাসন করে তবে। রানা রাগলেও, প্রজারা পৃথ্বীরাজকে সত্যিই ভালোবাসত, কাজেই তাঁকে একেবারে একলা পড়তে হল না! দু'একজন করে ক্রমে একটি ছোটোখাটো দল তাঁর সঙ্গে জুটল, যাদের কাজই হল এখানে-ওখানে লড়াই করে বেড়ানো। এমনই এদেশে-সেদেশে দল নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে পৃথ্বীরাজের যা কিছু টাকাকড়ি সম্বল ছিল গেল ফুরিয়ে। শেষে এমন দিন এল যে দিনের খোরাক, তাও জোটানো ভার! এখন একটা ছোটোখাটো রাজ্য জয় করে না বসতে পারলে আর উপায় নেই। এই অবস্থায় পৃথ্বীরাজ একদিন নিজের হাতের একটা মানিকের আংটি গদাওয়ারের উঝা নামে এক জহুরির কাছে বাঁধা দিয়ে কিছু টাকা আনতে পাঠালেন। এই উঝাই একদিন ঐ আংটিটা পৃথ্বীরাজকে অনেক টাকায় বেচেছিল; আংটি দেখেই জহুরি তাড়াতাড়ি টাকাকড়ি নিয়ে যেখানে পৃথ্বীরাজ ছদ্মবেশে সামান্য লোকের মতো একটা সরাইখানায় দিন কাটাচ্ছিলেন সেইখানে উপস্থিত হয়ে বললে, 'এ কি দেখছি রাজকুমার! টাকার দরকার ছিল তা একটু লিখে পাঠালে হত, আংটিটা বাঁধা দিয়ে বাজারে কেন বদনাম কিনছেন?' পৃথ্বীরাজ উঝাকে চুপিচুপি বুঝিয়ে বললেন, 'ওই আংটি ছাড়া আমার এমন কোনও সম্বল নেই যে তোমার টাকা দেব, তাছাড়া আংটি তো একদিন না একদিন পেটের দায়ে বেচতেই হবে। আমার কতগুলি সঙ্গী দেখছ তো! এদের শুকনো মুখে আধপেটা তো রাখতে পারিনে!' পৃথ্বীরাজের দুঃখের কহিনী শুনে উঝার চোখে জল এল। সে দুইহাত জোড় করে বললে, 'কুমার, এই নিন টাকা! আমি আংটি চাইনে। আমি আপনার প্রজা, মহারানার নুন চিরকাল খাচ্ছি।' পৃথ্বীরাজ উঝাকে নিজের বুকে টেনে নিয়ে বললেন, 'ভাই, আজ যেন তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে, কিন্তু এর পরে কি হবে?' উঝা পৃথ্বীরাজকে চুপিচুপি বললে, 'দেখুন মীনা সর্দারের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এই দেশটা আপনি দখল করে বসুন। রাজ্যের একটা শত্রুও নাশ হবে, আপনারও মান বাড়বে।'

পৃথ্বীরাজ ছদ্মবেশে সেই দিনই গিয়ে মীনা সর্দারের কাজে দলবল নিয়ে ভর্তি হলেন। রাজস্থানের মীনারা জংলি, দুর্দান্ত জাত; লুটপাট করাই তাদের কাজ। এদেরই রাজা মীনারায় নাম নিয়ে সমস্ত গদাওয়ার শাসন করছে। মহারানাকেও সে তুচ্ছ করে, নদালা বলে একটা গ্রামে তার আড্ডা। পৃথ্বীরাজ তাঁর পাঁচটি সঙ্গী—যশ, সিন্ধিয়া, সঙ্গমদেবী, অভয় আর জহ্নুকে নিয়ে এই দুর্দান্ত মীনাকে জব্দ করার মতলব করলেন। আহেরিয়া পরব রাজস্থানে একটা মস্ত আনন্দের দিন। সেইদিন চাকর-মনিব সব এক হয়ে শিকার, বনভোজন—এমনই নানা আমোদে দিনরাত মত্ত থাকে। সে আনন্দের দিনে মীনারায় বড়ো বড়ো মীনাকে নিয়ে বনের মধ্যে যখন তাড়ি খেয়ে আনন্দ করছে, সেই সময় নিজের দলবল সমেত পৃথ্বীরাজ তাকে আক্রমণ করে তাদের ঘর-দুয়ার জ্বালিয়ে ছারখার করে দিলেন। রাজা কাটা পড়ল। মীনারা যারা বাকি রইল, বন-জঙ্গলে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করলে। উঝাকে পৃথ্বীরাজ গদাওয়ারের শাসনকর্তা করে নিজের ধার শুধে আবার দিকবিজয়ে বার হলেন—রীতিমতো ফৌজ আর রসদ সঙ্গে।

এদিকে জয়মল, তিনি ঘুরতে ঘুরতে, বেদনোরে গিয়ে হাজির। সে সময় বেদনোরে টোডার রাজা রায় শূরতান সিং পাঠানদের উৎপাতে রাজ্যসম্পদ সব হারিয়ে নিজের একমাত্র কন্যা পরমাসুন্দরী তারাবাইকে নিয়ে মহারানার আশ্রয়ে বাস করছিলেন। তারাবাই যেমন সুন্দর, তেমনই বুদ্ধিমতী, গুণবতী, তেজস্বিনী। কত রাজপুত্র তাঁকে বিয়ে করতে চায় কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞা পাঠানদের হাত থেকে যে বাপের সিংহাসন উদ্ধার করবে, তাকেই বিয়ে করবেন। জয়মল বেদনোরে এসে এই খবর শুনলেন; একদিন তারাবাইকেও দেখলেন—ঘোড়ায় চড়ে ধনুর্বান হাতে শিকারে চলেছেন—যেন দেবী দুর্গা! জয়মল টোডা রাজ্য উদ্ধার করে দেবেন বলে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখে শূরতানের কাছে ঘটক পাঠালেন। শূরতান সিং জয়মলকে খুব খাতির করে নিজের বাড়িতে স্থান দিলেন। কিন্তু দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস, জয়মল পাঠানদের সঙ্গে লড়তে যাবার নামও করেন না; উলটে বরং হঠাৎ রাতারাতি শূরতানকে মেরে

তারাবাইকে বন্দী করে নিয়ে পালাবার মতলবে রইলেন। শেষে অন্ধকার রাতে একদিন জয়মল হাতিয়ার হাতে চুপিচুপি শূরতানের অন্দরমহলের দিকে অগ্রসর হলেন—ভূতের মতো মুখে কালিঝুলি মেখে! বেশিদূর যেতে হল না, অন্দরের দরজাতেই ধরা পড়ে গেলেন। কিন্তু জয়মল দুর্দান্ত গুণ্ডা; তাঁকে ধরে রাখা প্রহরীদের সাধ্য হল না। তিনি তলোয়ার খুলে তারাবাইকে তাঁর শয়নঘর থেকে একেবারে হাত ধরে টেনে বাইরে আনবার চেষ্টা করলেন। তারাবাই সামান্য মেয়ে তো ছিলেন না! এক ঝাপটায় জয়মলকে দশহাত দূরে ফেলে দিয়ে একেবারে বাঘিনীর মতো তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, একটি ছুরির ঘায়ে তাঁর সব আস্পর্ধা শেষ করে দিলেন। শূরতান সিং ছুটে এসে জয়মলের মাথাটা সঙ্গে সঙ্গে কাঁধ থেকে ভুঁয়ে নামিয়ে মিথ্যাবাদীর শাস্তি দিলেন রীতিমতো। জয়মল মহারানার ছেলে; আর শূরতান রাজা হলেও এখন মহারানার আশ্রিত; কাজেই চিতোরে যখন এই খবর পৌঁছল, তখন সবাই ভাবল এইবার শূরতান গেলেন! কিন্তু মহারানা সমস্ত ব্যাপার শুনে দূতদের বললেন, 'জয়মল শুধু যে আশ্রিত রাজার অপমান করেছে তা নয়, সে মিথ্যাবাদী, চোর, নির্বোধ, গোঁয়ার। কোন বাপ তার নিজের কন্যার অপমান সইতে পারে? শূরতান তার উপযুক্ত শাস্তিই দিয়েছেন। এমন অপদার্থ ছেলে গেছে, ভালোই হয়েছে। আমার কোনও আক্ষেপ নেই। যাও শূরতানকে বলো গিয়ে—আজ থেকে বেদনোর রাজ্য তাঁকে দিলেম।'

পৃথ্বীরাজ যখন শুনলেন ছোটোভায়ের কাণ্ড, তখন রাগে লজ্জায় তাঁর মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। তিনি সেইদিনই বেদনোরের দিকে রওনা হলেন। রাজপুত্র পৃথ্বীরাজ, রাজকুমারী তারাবাই—দু'জনেই সমান সুন্দর, সমানে-সমানে মিলল। ইনি দেখলেন ওঁকে, উনি দেখলেন এঁকে। ভালোবাসলেন দু'জনেই দু'জনকে; কিন্তু প্রতিজ্ঞা রয়েছে, সেটা না পূর্ণ করতে পারলে বিয়ে হবার উপায় নেই! পৃথ্বীরাজ নিজের তলোয়ার ছুঁয়ে শপথ করলেন টোডারাজ্য তিনি উদ্ধার করবেনই; আর সেইদিন তারাবাইকে সঙ্গে নিয়ে আজমীরের দিকে ছদ্মবেশে রওনা হলেন। সঙ্গে গেল পৃথ্বীরাজের সেই পাঁচ সঙ্গী আর অনেক পিছনে চললেন শূরতান অসংখ্য রাজপুত সেপাই নিয়ে। তখন আশ্বিন মাস, মহরমের দিন। টোডাশহরের মোগলবাজারের প্রকাণ্ড চক—নিশান আর ঘোড়া আর নানাবর্ণের কাগজের তাজিয়া, দুলদুল, পাঞ্জা, লাঠি-সড়কি, ঢাল-তলোয়ার আর লোকে লোকে গিসগিস করছে! স্বয়ং সুলতান জুম্মা মসদিজের ছাদে উঠে তামাশা দেখছেন, এমন সময় মস্ত একটা তাজিয়া সঙ্গে হাসান-হোসেন করতে করতে একদল লোক ঠিক সুলতান যেখানে রয়েছেন সেখানে গিয়ে থামল। সুলতান ঝরকা থেকে মুখ ঝুঁকিয়ে দেখলেন ছ'জন ফকির সেই তাজিয়ার সঙ্গে! আর বেশি কিছু সুলতানকে দেখতে হল না; ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা তীর এসে সুলতানের বুকের মাঝ থেকে প্রাণটা শুষে নিয়ে সোঁ করে বেরিয়ে গেল—আকাশের দিকে! টোডার সুলতান উলটে পড়লেন; সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত ফৌজ এসে শহরে হানা দিলে। রাজপুত যারা, তারা গিয়ে পৃথ্বীরাজ আর তারাবাইকে ঘিরে লড়তে লাগল—মুসলমানদের সঙ্গে। সেই অবসরে সুলতানের যত আমীর-ওমরা লুঙ্গি ছেড়ে আজমীরের দিকে চম্পট দিল। সকালবেলা পৃথ্বীরাজ টোডা দখল করে নিলেন।

পৃথ্বীরাজ আর তারাবাইয়ের বীরত্বের কথা মহারানার কাছে পৌঁছল। এইবার বাপের প্রাণ গলল। জয়মল নেই, সঙ্গ কোথায় তা কেউ জানে না, একমাত্র রয়েছেন পৃথ্বীরাজ—ছেলের মতো ছেলে; মহারানা পৃথ্বীরাজের সঙ্গে তারাবাইয়ের বিয়ে দিয়ে কমলমীরের কেল্লায় দু'জনকে থাকবার হুকুম দিলেন। মেবারের একেবারে শেষ সীমায় কমলমীর। এ সেই কেল্লা যেখানে লছমীরানী এতটুকু হাম্বিরকে নিয়ে বাস করতেন। কতদিন কেটে গেছে, কেল্লা শূন্য পড়েছিল; আর আজ আবার কত পুরুষ পরে পৃথ্বীরাজ-তারাবাই—বর আর বৌ—হাসি বাঁশি গান দিয়ে সেই পুরোনো কেল্লার শূন্য ঘরগুলি পূর্ণ করে দেখা দিলেন। এই বাপেতে-ছেলেতে বরেতে-বধূতে মিলন আর আনন্দের দিনে একসময় চিতোরে পৃথ্বীরাজ মহারানার সভায় বসে আছেন, সভা প্রায় ভঙ্গ হয়, মহারানা উঠি উঠি করছেন—এমন সময় মালোয়া থেকে দূত এসে খবর পাঠালে এখনই মহারানার সঙ্গে দেখা করতে চাই! একসময় ছিল, যখন চিতোরের মহারানার সঙ্গে দেখা করতে হলে দিল্লীর বাদশার দূতকেও অন্তত পনেরো দিন মহারানার সুবিধার জন্য অপেক্ষা করতে হত, কিন্তু আজ মালোয়ার দূত এসেই বুক ফুলিয়ে, কোনও হুকুমের অপেক্ষা না রেখে মহারানার দরবারে ঢুকল। শুধু তাই নয়, লোকটা একেবারে মহারানার গা ঘেঁষে বসে যেন সমানে-সমানে কথাবার্তা শুরু করে দিলে। দূতের এই আস্পর্ধা দেখে পৃথ্বীরাজ একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। খুব খানিক বাজে বকে দূত বিদায় হবার পর পৃথ্বীরাজ ঐ মালোয়ার দূতকে এত ভয় আর খাতির করবার কারণটা মহারানাকে শুধোলেন। বুড়ো রানা পৃথ্বীরাজের পিঠে হাত বুলিয়ে জবাব দিলেন, 'বুঝলে না, আমি বুড়ো হয়েছি, তাই দন্তহীন সিংহের মতো গাধাও আমাকে লাথি মারতে চাচ্ছে। তোমরা নিজেদের মধ্যেই ভায়ে ভায়ে লড়তে

ব্যস্ত রয়েছ, তাই আমাকে সবদিক ঠাণ্ডা রেখে, খুশি রেখে কোনও রকমে শান্তিতে নিজের আর প্রজাদের জমিজমা জরু-গরু সামলে চলতে হচ্ছে—আজ ক'বছর ধরে।' পৃথ্বীরাজ বাপের কথার কোনও জবাব দিলেন না, কিন্তু বাপের কত যে দুঃখ, তা বুঝতে আজ তাঁর দেরি হল না। তিনি লজ্জায় ঘাড় হেঁট করে সভা থেকে বেরিয়ে একেবারে নিজের দলবল নিয়ে সোজা মালোয়া রাজার রাজ্যে গিয়ে হাঁক দিলেন, 'যুদ্ধং দেহি!'

দুই দলে লড়াই বাধল। মাঠের মাঝে দুই দলের তাঁবু পড়েছে। যুদ্ধের আগের রাতে মালোয়ারাজ নিজের শিবিরে মখমলের গদিতে তাকিয়া ঠেস দিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে মহা ধূমধামে নাচ দেখছেন, এমন সময় ঝড়ের মতো পৃথ্বীরাজ এসে রাজাকে একেবারে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে নিজের কোটে এনে বন্ধ করলেন। মজলিস ভেঙে গেল—ঝাড়লণ্ঠনগুলোর সঙ্গে চুরমার হয়ে! নাচনী, গাইয়ে সবাই হাঁ করে চেয়ে রইল—পৃথ্বীরাজের অদ্ভুত সাহস দেখে।

রানার সেনাপতি তাড়াতাড়ি সৈন্য সাজাচ্ছেন এমন সময় পৃথ্বীরাজ মালোয়ারাজেরই লিখন সেনাপতির কাছে দিয়ে পাঠালেন, 'আমি চিতোর চললেম—বন্দী হয়ে। কিন্তু খবরদার আমাকে ছাড়াবার চেষ্টাও কোরো না। তাহলেই আমার প্রাণ যাবে, এখনই এসে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করো, যুদ্ধ বন্ধ করে দাও।'

রাজা-রাজড়ার কথা—সেনাপতি সমস্ত সৈন্য ফিরিয়ে শুকনো মুখে একা পৃথ্বীরাজের শিবিরে হাজির হলেন। পৃথ্বীরাজ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'রাজার প্রাণের জন্যে কোনও ভয় নেই; আমি ওঁকে চিতোরে নিয়ে যাচ্ছি, খুব যত্নেই রাখব আর সুস্থ শরীরেই ফিরিয়ে দেব; তোমাদের রাজার সেই হামবড়া দূতটাকেও ফিরে পাবে। মহারানা দূতকেও চান না, বন্দীকেও নয়, কেবল মালোয়ার কাছ থেকে যে নমস্কারটা তাঁর প্রাপ্য তাই তিনি আমাকে আনতে হুকুম দিয়েছেন। তাই তোমাদের রাজার একবার স্বশরীরে চিতোর যাওয়া দরকার। কিন্তু এখান থেকে কিংবা পথের থেকে যদি রাজাকে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা কর, তবে ওঁর ধড়টিই শুধু ফিরে পাবে, মাথাটি গিয়ে পড়ে থাকবে চিতোরের মহারানার সিংহাসনের নিচেই—পা রাখবার পিঁড়িখানির ঠিক সামনেই!'

মহারানা সভায় বসে আছেন, পৃথ্বীরাজ মালোয়াকে বন্দী অবস্থায় নিয়ে উপস্থিত। সবাই দেখে অবাক হয়ে গেল! সেই সময় একজন পৃথ্বীরাজের চর দূতের ঘাড় ধরে এনে বললে, 'শিখে নাও মহারানার সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে হয়—তোমার নিজের দেশের রাজার কাছে।' দূত থরহরি কাঁপতে লাগল; তার কপাল বেয়ে কালঘাম ছুটল। মহারানা ব্যাপার বুঝে খুব খাতির করে মালোয়াকে নিজের কাছে বসালেন, তারপর কিছুদিন চিতোরে আরামে থাকার পর মালোয়ার রাজা আর রাজদূত দু'জনেই ছুটি পেয়ে দেশে গেলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে রানার আত্মীয় সারংদেব আর সুরজমল দু'জনে মিলে হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। পৃথ্বীরাজ তখন অনেক দূরে—কমলমীরে; সওয়ার খবর নিয়ে সেদিকে ছুটল—মহারানা দলবল নিয়ে চটপট লড়াইয়ে বেরিয়ে গেলেন। সদরী, বাটোরা, নায়ি আর নিমচ, এর মধ্যে যত পরগনা সমস্ত দখল করে চিতোরের খুব কাছে গাভিরী নদীর ওপারে সুরজমল এসে দেখা দিলেন প্রকাণ্ড ফৌজ নিয়ে। সেইখানে ভীষণ যুদ্ধ বাধল। রানার ফৌজ ক্রমেই হঠতে লাগল। সন্ধ্যা প্রায় হয়, বাইশটা অস্তরের ঘা খেয়ে মহারানা দুর্বল হয়ে পড়েছেন, সুরজমলের সৈন্যরা নদীর এপারটাও দখল করেছে, বিদ্রোহীদের আর ঠেকিয়ে রাখা চলে না, এমন সময় এক হাজার রাজপুত নিয়ে পৃথ্বীরাজ এসে পড়লেন; যুদ্ধ সেইদিনের মতো স্থগিত রইল। দুই দলের লড়াই বন্ধ রেখে যে যার তাঁবুতে বিশ্রাম করছে, মাঠের দিকে দিকে মশাল আর ধুনি জ্বলছে; সারাদিনের পর সুরজমল অনেকগুলো অস্ত্রের চোট খেয়ে নাপিত ডেকে কাটা ঘাগুলো ধুয়ে-পুঁছে পটি বেঁধে একটু বিশ্রামের চেষ্টায় আছেন, এমন সময় হঠাৎ সামনে পৃথ্বীরাজকে দেখে সুরজমল খাটিয়া ছেড়ে এমন বেগে দাঁড়িয়ে উঠলেন যে, তাঁর বুকে বাঁধা কাপড়ের পটিটা ছিঁড়ে ঘা দিয়ে রক্ত ছুটল। পৃথ্বীরাজ তাড়াতাড়ি খুড়োকে ধরে খাটিয়ায় শুইয়ে দিয়ে বললেন, 'ভয় নেই, কেমন আছ তাই জানতে এলেম।' সুরজমল একটু হেসে বললেন, 'হঠাৎ তুমি এসে পড়ায় একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেম! যা হোক, অনেকদিন পরে তোমাকে দেখে খুশি হলেম। মহারানার সঙ্গে সাক্ষাৎ করনি?' পৃথ্বীরাজ হেসে বললেন, 'কমলমীরে তোমার খবর পেয়েই ছুটে এসেছি, বাবার সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি।' এই সময় এক দাসী সোনার থালায় খাবার নিয়ে হাজির হল। সুরজমল বললেন, 'আরে দেখছিসনে কে এসেছে। যা দৌড়ে আর এক থালা নিয়ে আয়!' দাসী এদিক-ওদিক চাইছে দেখে সুরজমল বললেন, 'বুঝেছি সারংদেব এই একথালা বই আর কিছু পাঠায়নি; খুড়ো-ভাইপোতে আজ এক থালেই খাব।' শুনেই পৃথ্বীরাজ একটা মিষ্টি তুলে মুখে দিলেন। দিনের বেলার শত্রুতা গল্প-হাসি খাওয়া-দাওয়ার চোটে কোথায় পালিয়ে গেল। বিদায়ের সময় পৃথ্বীরাজ খুড়োকে বললেন, 'আমাদের পুরানো ঝগড়াটা তাহলে আজ

তোলা থাক, কাল সকালেই শেষ করা যাবে, কি বল?' সুরজমল হেসে বললেন, 'বেশ, আজকের মতো একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক! কিন্তু কাল খুব সকালেই আমি তৈরি থাকব জেনো।'

তার পরদিনের লড়াইয়ে বিদ্রোহীদের পৃথ্বীরাজ হারিয়ে দিলেন। সুরজমল সারংদেবকে নিয়ে পালিয়ে চললেন। পৃথ্বীরাজও তাঁদের পিছনে তাড়িয়ে চললেন—একটার পর একটা পরগণা বিদ্রোহীদের হাত থেকে আবার জয় করতে করতে। শেষে সুরজমলের একটু দাঁড়াবারও স্থান রইল না। সারংদেবের রাজ্যটা পর্যন্ত পৃথ্বীরাজ দখল করে নিলেন। দুই বিদ্রোহী তখন স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে নিমচের জঙ্গলে বড়ো বড়ো গাছের গুঁড়ি আর ডালপালা দিয়ে খুব মজবুত রকম বরোজ বানিয়ে তার মধ্যে লুকিয়ে রইল। একদিন সুরজমল নিশ্চিন্ত মনে বনে গল্পগুজব করছেন—দুপুরবেলা বাইরে বনের মধ্যেটা সুনসান, কোনখানে ঘনপাতার আড়ালে বসে দুটো নীল পায়রা কেবলই বকম বকম করছে—এমন সময় বাঘ যেমন চুপিসাড়ে এসে হঠাৎ শিকারের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনই পৃথ্বীরাজ ঘরের বেড়া ডিঙিয়ে একেবারে সুরজমলকে চেপে ধরলেন। দু'জনে ধস্তাধস্তি চলল। পৃথ্বীরাজ খুড়োকে কাবু করেছেন, এমন সময় সারংদেব দু'জনের মাঝে পড়ে পৃথ্বীরাজকে ঠাণ্ডা করে বললেন, 'করো কি! দেখছ না তোমার খুড়োর অবস্থা? কি রকম কাহিল, এক চড়ে উলটে পড়েন! দাও, ছেড়ে দাও বেচারাকে!' সারংদেবের মোড়লি সুরজমলের মোটেই ভালো লাগল না, তিনি বুক ফুলিয়ে বললেন, 'দেখো সারংদেব, যে চাপড়টার কথা বললে সে চাপড়টা এখন আমার এই ভাইপোর হাত থেকে এলে আমি কাবু হব বটে, কিন্তু তোমাদের কারু হাত থেকে এলে এই কাহিল শরীরও শক্ত হয়ে দাঁড়াবে, আর এক চাপড়ের বদলে তোমার নাকে দশটা ঘুষি বসিয়ে দেবে নিশ্চয়ই। সরে দাঁড়াও, লড়তে হয় আমরা খুড়ো-ভাইপোতে লড়ব; মিটমাট করতে হয় তো আমরাই করব—বুঝেচ?' সুরজমলের তেজ দেখে পৃথ্বীরাজ অবাক হলেন, সারংদেব রেগে কটমট করে চাইতে চাইতে বেরিয়ে গেলেন; ঝনাৎ করে সুরজমল নিজের তলোয়ার খাপে বন্ধ করে বললেন, 'দেখো পৃথ্বীরাজ, তোমাতে-আমাতে লড়াই—এতে আমি যদি মরি তোমার হাতে, তাতে কোনও দুঃখও নেই, ক্ষতিও নেই—ছেলে দু'টো আমার উপযুক্ত হয়েছে, কিছু না জোটে তো মহারানার ফৌজে গিয়ে ভর্তি হবে, তবু তোমাদের বিরুদ্ধে আমার মতো তারা অস্ত্র ধরবে না। কিন্তু তুমি যদি আমার হাতে মর তবে শুধু যে আমার লজ্জার উপর লজ্জা, দুঃখের উপর দুঃখ পেতে হবে, তা নয়; দাদার পরে তুমি না থাকলে চিতোরের দশাটা কি হবে ভেবেছ কি? আমি লড়ব না। ইচ্ছা হয় তুমি আমাকে মেরে ফেলো, কিন্তু বন্দী করে যে আমায় নিয়ে যাবে তা হবে না।' সুরজমল যে চিতোরের সঙ্গে প্রাণে প্রাণে এক, তা বুঝতে পৃথ্বীরাজের দেরি হল না। তলোয়ার বন্ধ করে তিনি খুড়োকে প্রণাম করলেন। সুরজমল ভাইপোকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'এতদিনে আমার অদৃষ্টের লিখন একটু ফলল—তোমার হৃদয়-সিংহাসনের খুব কাছে আমি এলেম; এখন বাকি শুধু যে মাটিতে জন্মেছি সেই মাটির এক টুকরোতে মাথা রেখে মরার ব্যবস্থা করে নেওয়া।' পৃথ্বীরাজ খুড়োর পাশে বসে সেই আগেকার মতো আবার হাসিমুখে শুধোলেন, 'আমি আসবার আগে তুমি কি করছিলে খুড়ো?'

'ছেলেদের রাজস্থানের ইতিহাস আর গল্প শুনিয়ে খানিক বাজে সময় কাটাচ্ছিলেম'—বলে খুড়ো হাসলেন।

পৃথ্বীরাজ অবাক হয়ে বললেন, 'আমি তাড়া করে আসতে পারি জেনেও সেজন্য সতর্ক না থেকে বেশ আরামে শুয়ে গল্প করছিলে?'

সুরজমল হেসে বললেন, 'লড়াই করা কি পালানো—এ দু'টোই করবার পথ তুমি বন্ধ করেছ, কাজেই ছেলেদের নিয়ে খোশগল্প করে সময় কাটানো ছাড়া করবার কার কি আছে বলো?'

পৃথ্বীরাজ শুনে বললেন, 'কেন, আমার সঙ্গে বাবার কাছে গিয়ে মাথা গোঁজবার জায়গাটা করে নেবার চেষ্টা করো না কেন!'

সুজরমল খানিক গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আগে হলে যেতেম কিন্তু এই বিদ্রোহের পরে মাথা গোঁজবার জায়গা চিতোরের বাইরে করে নেওয়াই ঠিক; আর তা হলেই ধড় এবং মাথা—দু'টো নিয়ে কিছুদিন আরাম করা যেতে পারবে।' পৃথ্বীরাজ খানিক ভেবে বললেন, 'তা যেন হল, কিন্তু মহারানাকে একটা মাথা হাজির না করে দিতে পারলে আমার যে মাথা হেঁট হবে, কাটাও যাবে—তার কি বলো!'

সুরজমল পৃথ্বীরাজের কানে কানে বললেন, 'সারংদেবের মাথাটা যদি কাজে লাগে তো নিয়ে যাও; ওর মাথার সঙ্গে ওর রাজ্যটাও হাতে আসবে, আমার মাথার সঙ্গে এই ছেঁড়া পাগড়িটা ছাড়া আর তো কিছুই পাচ্ছ না! বেশি সুখ্যাতি পাবে ওই মাথাটা নিলে।'

পৃথ্বীরাজ প্রস্তুত হয়ে উঠলেন, কিন্তু বরোজের মধ্যে সারংদেবকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। তিনি চোখ রাঙিয়ে খুড়োকে বললেন, 'আমাকে ফাঁকি দিতে চাচ্ছ?'

সুরজমল খানিক ভেবে বললেন, 'এসো আমার সঙ্গে বাইরে, বড়ো মাথা না পাও, ছোটো মাথাই নিও।' বনের মধ্যে খানিক এগিয়ে গিয়ে সুরজমল একটা ভাঙা মন্দির দেখিয়ে বললেন, 'দেখছ মন্দিরটা, ওখানে এক সময় নরবলি হত! বহুদিন হল বন্ধ হয়ে গেছে; দেবীও মানুষের কাঁচা মাথা অনেককাল পুজো পাননি, ওইখানে সারংদেব আমাকে পুজো করতে যেতে আজ ডেকে গেছে, কিন্তু আমার হয়ে ওখানে যেতে তোমার সাহস হবে কি?'

'খুব হবে!'—বলেই পৃথ্বীরাজ সুরজমলকে নিজের পাগড়ি দিয়ে কষে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে মন্দিরে ঢুকলেন। বেশি দেরি হল না; সারংদেবের কাঁচা মাথাটা কেটে নিয়ে খুড়োর বাঁধন খুলে দিয়ে পৃথ্বীরাজ যুদ্ধ বন্ধ করে চিতোর চলে গেলেন। যে সব পরগনা জয় করতে করতে সুরজমল ফৌজের পায়ের তলায় প্রজার সুখ-শান্তি চূর্ণ করে ধুলোর মতো উড়িয়ে দিয়েছিলেন সেদিন, সেই নায়ি, বাটেরা, নিমচের রাস্তা ধরেই হেরে ফিরতে হল—তাঁকে ঘাড় হেঁট করে। তিনটে বড়ো বড়ো রাজত্ব তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেল, রইল কেবল একটুখানি সদ্রিপরগনা। কিন্তু সেটুকুও বেশিদিন থাকবে কি না সুজরমল ভাবছেন—এমন সময়ে একদিন দেখলেন গাঁয়ের ধারে মন্দিরের সামনে একটি ডালকুত্তো ছোটো একটি ছাগলছানা শিকার করবার চেষ্টা করতেই একটা রামছাগল তাকে ঢুঁ মেরে তাড়িয়ে ছানাটাসুদ্ধ মন্দিরে গিয়ে সেঁধাল। কুকুরটা মন্দিরের সামনে ঘেউ ঘেউ করে চেঁচাতে লাগল—কিন্তু ভিতরে ঢোকবার সাহস করলে না।

সুরজমল ঠিক করলেন এখানেই নিরাপদ থাকা যাবে—এই মন্দির হবে আমার ঘর, কেল্লা, সমস্তই। সেইদিন সুরজমল সদ্রি থেকে কারিগর ডাকিয়ে সেই মন্দির ঘিরে ছোটো এক কেল্লা তুললেন, তার চারিদিকে বাজার-হাট বসালেন; সবশেষে 'দেওলা' গ্রাম মায় সমস্ত সদ্রিপরগনা আর কনখল পাহাড়ের উপর তাঁর কেল্লাটি পর্যন্ত দেবতার নামে উৎসর্গ করে সমস্তটার নাম রাখলেন দেউলগড়। দেবতার কেল্লা, তার উপর চড়াও হতে রানারও সাধ্য নেই, ষাট হাজার বছর নরকের ভয় আছে। সব রাজার রাজ্যের সীমানার বাইরে এই দেউলগড়ে, সুরজমল নির্ভয়ে রইলেন, নিশ্চিন্ত হয়ে মরবার সময় পেলেন। তাঁর কপালের লিখন এমনই করে ফলল।

জয়মল, সুরজমল, দু'জনেই চিতোরের সিংহাসন আর পৃথ্বীরাজের মাঝ থেকে সরে পড়লেন; রইলেন কেবল সঙ্গ। একদিন কমলমীরে পৃথ্বীরাজের চর এসে খবর দিলে—সঙ্গ বেঁচে আছেন; শ্রীনগরের রাজার মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ের উদযোগ হচ্ছে। পৃথ্বীরাজ তখনই নিজের দলবল নিয়ে সঙ্গকে জালে বাঁধার পরামর্শ করতে বসলেন; কিন্তু পৃথ্বীরাজের অদৃষ্টও বসে ছিল না, সে দিনে-রাতে আলোতে-অন্ধকারে সুখে-দুঃখে মিলিয়ে যে বেড়াজাল পৃথ্বীরাজকে ধরবার জন্যে বুনে চলেছিল, এতদিনে সেটা শেষ হল। সকালে পৃথ্বীরাজ সেজেগুজে সঙ্গকে ধরবার জন্যে বার হবেন, এমন সময় শিরোহী থেকে পৃথ্বীরাজের ছোটোবোন এক পত্র পাঠালেন। সে অনেক দুঃখের কাহিনী। বিয়ে হয়ে অবধি তাঁর স্বামী তাঁকে অপমান করছে, লাথি মারছে, ঘরের বার করে দিতে চাইছে। সে নেশাখোর, দুষ্ট এবং একেবারে নির্দয়। বাবা বুড়ো হয়েছেন, এখন দাদা এসে এই অপমানের প্রতিশোধ না নিলে তাঁর ছোটোবোন মারা যাবে। ছোটোবোনের কান্নাভরা সেই চিঠি পড়ে, পৃথ্বীরাজ চলেছিলেন শ্রীনগরে, বাইরের দিকে তলোয়ার উঁচিয়ে—কিন্তু যাওয়া হল না, পৃথ্বীরাজের ঘোড়া ফিরল শিরোহীর মুখে—বোনকে রক্ষা করতে। অদৃষ্ট টেনে নিয়ে চলল পৃথ্বীরাজকে সঙ্গের দিক থেকে ঠিক উলটো মুখে—অনেক দূরে।

রাতের অন্ধকারে শয়নঘরের মেঝেয় পড়ে রানার মেয়ে কেবলই চোখের জল ফেলছেন, রানার দেওয়া সোনার খাটে শিরোহীর রাজা ভরপুর নেশায় নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, হঠাৎ সেই সময় পৃথ্বীরাজ ঘরে ঢুকে এক লাথিতে শিরোহী রাজাটাকে ভুঁয়ে ফেলে দাড়ি চেপে ধরলেন। রানার মেয়ে পৃথ্বীরাজের তলোয়ার চেপে ধরলেন, 'দাদা থামো, প্রাণে মেরো না।' পৃথ্বীরাজ রেগে বললেন, 'এত বড়ো ওর সাহস, তোর গায়ে হাত তোলে। জানেনা তুই মহারানার মেয়ে। ওকে কুকুরের মতো চাবুক মেরে সিধে করতে হয়।'

শিরোহীর তখন নেশা ছুটে গেছে, সে পৃথ্বীরাজের পা জড়িয়ে বললে, 'এমন কাজ আর হবে না, ক্ষমা করো।'

পৃথ্বীরাজ তার ঘাড় ধরে দাঁড় করিয়ে বললেন, 'নে, আমার বোনের জুতোজোড়া মাথায় করে ওর কাছে ক্ষমা চা—তবে রক্ষে পাবি।'

'একথা আগে বললেই হত,' বলে তাড়াতাড়ি জুতোজোড়া তুলে নেয় দেখে রানী বললেন, 'থাক এবার এই পর্যন্ত। যাও এখন দাদাকে জলটল খাইয়ে ঠাণ্ডা করোগে, আমায় একটু ঘুমুতে দাও।'

রানার জামাই খুব খাতির করে পৃথ্বীরাজকে বাইরে নিয়ে বসিয়ে সোনার রেকাবিতে শিরোহীর খাসা নাড়ু গুটিকতক জল খেতে দিলেন। শিরোহীর খাসা নাড়ু—অমন নাড়ু কোথাও হয় না, পৃথ্বীরাজ তাই গোটা চার-পাঁচ মুখে ফেলে এক ঘটি জল খেয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে কমলমীরে আপনার দলবলের সঙ্গে মিলতে চললেন। কমলমীরে আর তাঁকে পৌঁছতে হল না; শিরোহীর মতিচুর সেঁকোবিষ আর হীরেচুরে মেখে তাঁর ভগিনীপতি খেতে দিয়েছিল—জুতো তোলার শোধ নিতে!

তখন রাত কেটে সবে সকাল হচ্ছে, দূর থেকে কমলমীর অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেই সময় পৃথ্বীরাজ ঘোড়া থেকে ঘুরে পড়লেন—রাস্তার ধুলোয়। কমলমীর—যেখানে তাঁর তারারানী একা রয়েছেন, সেইদিকে চেয়ে তাঁর প্রাণ হঠাৎ বেরিয়ে গেল—দূরে—দূরে—কতদূরে সকালের আগুনবরণ আলোর মাঝে নীল আকাশের শুকতারার অস্তপথ ধরে। আর ঠিক সেই সময় সঙ্গের অদৃষ্ট শ্রীনগরের নহবতখানায় বসে আশা রাগিণীর সুর বাজিয়ে দিলে—'ভোর ভয়ি, ভোর ভয়ি।'